সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত

সেরা সন্দেশ

১৩৬৮—১৩৮৭

www.BanglaBook.org

সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত

সেরা সন্দেশ

১৩৬৮—১৩৮৭

শুরু হয়েছিল ১৩২০ সালে। আর শেষ ? অমন কথা ভাবাই যায় না। হারিয়ে গিয়েও যে আবার নতুন চেহারায় সামনে এসে দাঁড়ায়, সেই সন্দেশ আজও ছোটদের জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ।

নিতান্ত একটি পত্রিকা তো নয়, আশ্চর্য রকমের সুন্দর আর সম্ভ্রান্ত একটি প্রতিষ্ঠান। সেই প্রতিষ্ঠানের দরজা দু-দুবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রথমবার বন্ধ হয়েছিল সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পর। আর দ্বিতীয়বার, ১৩৩৮ সালে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ওই যে বলেছেন : 'শেষ হয়ে হইল না শেষ', সন্দেশ-এরও সেই একই ব্যাপার। সন্দেশ শেষ হলে তো ছোটদের আনন্দেরও সমাপ্তি, সন্দেশ তাই শেষ হয়নি। দ্বিতীয়বার বন্ধ হবার তিরিশ বছর বাদে সে আবার নতুন করে দেখা দিল।

এবং এতই দীপ্ত সুন্দর কান্তি নিয়ে দেখা দিল যে, বিস্ময়ে আর আনন্দে ছোটদের তো বটেই, বড়দেরও যেন চোখের পলক আর পড়তে চায় না। দেখে, পড়ে একবাক্যে সবাইকে বলতে হয় যে, হ্যাঁ, ছোটদের জন্য এমন ভাল পত্রিকা এ-দেশে আর কখনও বার হয়নি। রবীন্দ্রনাথ যেন অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে আছেন এই পত্রিকার সঙ্গে। যে-বছর তিনি নোবেল পুরস্কার পান, সেই বছরেই উপেন্দ্রকিশোরের হাতে সন্দেশ-এর সূচনা, আর দু-দুবার বন্ধ হয়ে যাবার পরে সত্যজিতের হাতে ১৩৬৮ সালে যখন তৃতীয়বারের জন্য তার সূচনা হল, স্বদেশে-বিদেশে তখন রবীন্দ্রশতবর্ষের উৎসব চলছে। তৃতীয় পর্যায়ের সেই সন্দেশ-এর বয়সও ইতিমধ্যে কুড়ি পেরিয়েছে। বারবার পড়বার মতো কত-যে লেখা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকায়, এবং বারবার দেখবার মতো কত ছবি, তার আর ইয়ত্তা নেই। কুড়ি বছরের সেইসব লেখা আর ছবির থেকেই বেছে নিয়ে, ছেঁকে নিয়ে বার করা হল এই অসামান্য সংকলন—সেরা সন্দেশ।

কী আছে সেরা সন্দেশে ? এর উত্তরে বলতে হয়, কী নেই ? রবীন্দ্রনাথের নাটিকা, শরদিন্দুর সদাশিবের কাণ্ডকাহিনী, তারাশঙ্করের গল্প, অজিত দত্তের ছড়া, সুখলতা রাওয়ের কবিতা, ক্ষিতিমোহন সেনের চিঠি, পরিমল গোস্বামীর প্রবন্ধ—এমনসব দুর্লভ লেখার পাশাপাশি এ-যুগের প্রবীণ আর নবীন প্রায় প্রত্যেকের সৃষ্টি নিয়েই এই দারুণ বৈচিত্র্যময় সংকলন। শুধু গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-ছড়া-শিকারকাহিনী-গোয়েন্দা উপাখ্যান-রূপকথা-অ্যাডভেনচার-ইতিহাস বা বিজ্ঞানই নয়, ম্যাজিক-ধাঁধা-হেঁয়ালি, ছবি আর শব্দের খেলা, এমনকি কার্টুনও বাদ যায়নি।

সেরা সন্দেশ বাছাই করার দায়িত্ব পালন করেছেন তিনজনে—লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ ও সত্যজিৎ রায়। মাসিক সন্দেশ সম্পাদনার ভারও এঁরা তিনজনেই বহন করে আসছেন বহুদিন থেকে। রচনা নির্বাচনের পর সেগুলিকে সাজিয়ে দেবার কাজটা করেছেন সত্যজিৎ রায়। অজস্র নতুন ছবি এঁকেছেন তিনি এই সংকলনটির জন্য। সেরা সন্দেশ যেন একটি রেখে দেবার মতো বই হয়, এই কথাটা মনে রাখা হয়েছিল যেমন রচনা নির্বাচনের সময়, তেমনি বইয়ের অঙ্গসজ্জার পর্বে।

এই সংকলন তাই শুধু আজকের দিনের ছেলেমেয়েদের জন্য নয়, আগামী যুগের শিশুরাও যাতে বহুকাল ধরে এর কদর করে, সেটাও হল সেরা সন্দেশ-এর একটা প্রধান লক্ষ্য।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত

সেরা সন্দেশ

১৩৬৮-১৩৮৭

আনন্দ

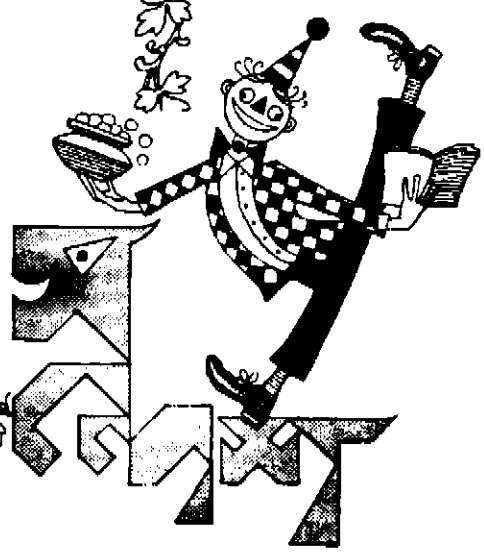

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শিশির মজুমদার
প্রণব মুখোপাধ্যায়
ভবানীপ্রসাদ দে
ভবানী মজুমদার
অজেয় রায়
রেবন্ত গোস্বামী
সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
সুজয় সোম
মঞ্জিল সেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৩৮৮ থেকে দ্বাদশ মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪১২ পর্যন্ত
মুদ্রণ সংখ্যা ৬২০০০
ত্রয়োদশ মুদ্রণ আষাঢ় ১৪১৫ মুদ্রণ সংখ্যা ২০০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ সত্যজিৎ রায়

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও রূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7066-886-7

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুধীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে মুদ্রিত।

৩০০.০০

www.BanglaBook.org

সূচীপত্র

লীলা মজুমদার ভূমিকা ৯
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রথম সন্দেশ-এর ভূমিকা ১১
পুণ্যলতা চক্রবর্তী ১৩৬৮-র সন্দেশ-এর ভূমিকা ১২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা ও রাজদ্রোহী ১৪
রেলগাড়ির আদিপর্ব—১ ২০
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়...কত্তাবাবা ২১
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সদাশিবের ঘোড়া-ঘোড়া কাণ্ড ২৩
সুখলতা রাও...তারার ঘর ৩১
ক্ষিতিমোহন সেন গাছের নাম বাঘশাল ৩৩
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানন্দের কাশীযাত্রা ৩৪
নরেন্দ্র দেব মানিকের ফ্যাসাদ ৩৯
অন্নদাশঙ্কর রায় নাই মামা আর কানা মামা ৪১
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক ভাল্লুকের গল্প ৪২
যোগেশচন্দ্র মজুমদার স্মৃতিকণা ৪৪
অজিত দত্ত ঘোড়া গিন্নির ছড়া ৪৯
রেলগাড়ির আদিপর্ব—২ ৫০
স্বপনবুড়ো শশিশেখরের শিক্ষানবিশী ৫১
শিবরাম চক্রবর্তী মেলায় গেলেন হর্ষবর্ধন ৫৫
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বাটুল এবং ৫৭
প্রেমেন্দ্র মিত্র তরফু-শল্লকী সংবাদ ৬০
অরুণনাথ চক্রবর্তী দাদুর গল্প ৬১
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য মৎস্য-পুরাণ ৬৮
প্রবাসজীবন চৌধুরী চন্দ্রাবতী ৭১
লীলা মজুমদার দ্বিতীয় টিকটিকি ৭৫
জসীমউদ্দীন ছড়া ৭৮
সৈয়দ মুজতবা আলী প্রদীপের তলাটাই অন্ধকার ৭৮
সুভাষ মুখোপাধ্যায় খেলা দেখে যান ৭৮
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পর্যটন ৭৯
অমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী মিতবায়ী ৭৯
হাসিরাশি দেবী আজগুবি মামা ৮০
মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু কাক-তাড়ুয়া ৮০
করুণাময় বসু কপি ও কড়া ৮১
বেণু গঙ্গোপাধ্যায় খুকী রাঁধুনী ৮১
রেলগাড়ির আদিপর্ব—৩ ৮২
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় হরিশপুরের রসিকতা ৮৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পত্তি সমর্পণ ৮৭
সুবিমল রায় সদানন্দ স্বদেশলাল ৯৩
ননীগোপাল মজুমদার ছোট্ট যাদুকর ৯৮
প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পাত্র-পাত্রী ১০০
রণজিৎ রায় খুটিমারীর বেয়াড়া বাঘ ১০৫
নলিনী দাশ ছেমেশিজফদা বা [illegible]তী জাদু ১১২
রেলগাড়ির আদিপর্ব—৪ ১১৪
মহাশ্বেতা দেবী বীরে ডাকাত ও ছিরে ডাকাত ১১৫
সুনির্মল বসু ঘেণ্টুলালের চটি ১২২
পুণ্যলতা চক্রবর্তী ছোট্ট ছোট্ট গল্প ১২৪
সৌরেন্দ্রকুমার পাল মানুষখেকোর অন্তিম অনুরোধ ১২৬
আশাপূর্ণা দেবী ভেটো আর রাগীদাদাবাবু ১২৯
আদিনাথ নাগ চামচিকিৎসা ১৩৩
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জোড়া সাপ ১৩৫
গৌরী ধর্মপাল চাঁদনি ১৪০
পরিমল গোস্বামী ভেলকি ১৪৩
সত্যজিৎ রায় মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প ১৪৫
'ব'-এর বাড়াবাড়ি ১৫২—১৫৩ পৃষ্ঠার মাঝখানে
রবীন্দ্রলাল রায় দ্বিজেন্দ্রলাল ১৫৩
শিবশঙ্কর মিত্র দুগ্যো-সন্দার ১৫৪
রেলগাড়ির আদিপর্ব—৫ ১৫৭
সুলতা সেনগুপ্ত কাক ১৫৮
বিমল দত্ত ছড়াছড়ি ১৫৯
চুণী দাশ ছোট্ট ছড়া ১৫৯
প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় চলুন চাঁদে ১৫৯
সুধীন্দ্র সরকার নেকী ১৬০
ভবানীপ্রসাদ মজুমদার টিকটিকি ১৬০
রেবন্ত গোস্বামী পুজো-স্পেশাল ১৬১
সামসুল হক ভাই বোন ১৬২
সরল দে মশা ১৬২
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় পটকান যখন পটকালো ১৬৩
নবনীতা দেব সেন চিকচিক ও রাজহাঁস দাদু ১৬৫
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বড়মামা ও নরনারায়ণ ১৬৮
অশোক মুখোপাধ্যায় তারিক আলি-দ্বারিক মালি ১৭৪
জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় সিগারেটের টুকরো ১৭৫
প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত হাওর ১৭৯
অজেয় রায় মুখুটি স্পেশাল ১৮১
শিশিরকুমার মজুমদার তিন বন্ধু ১৮৫
রেলগাড়ির আদিপর্ব—৬ ১৯০
প্রদীপকুমার রায় আয় আয় চাঁদমামা ১৯১
রেবন্ত গোস্বামী কমল ১৯৬
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কবি ও নোবেল পুরস্কার ১৯৭
তমাল চট্টোপাধ্যায় মনের বহর ১৯৮
শব্দছক ১৯৯
নলিনী দাশ গণ্ডালু ও হিড়িম্বাদেবীর রহস্য ২০০
প্রণব মুখোপাধ্যায় কাক্কোকিল ২১২
বাণী রায় রতন ২১৪
রেলগাড়ির আদিপর্ব—৭ ২১৭
সন্দীপ রায় কং ২১৮
লীলা মজুমদার গল্পসল্প ২২১
অমিতানন্দ দাশ ইচিংকা ২২৪
বিশ্বপ্রিয় এই বাঘটাই সেই বাঘটা ২২৭
হিতেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী গিরিডির স্মৃতি ২২৯

www.BanglaBook.org

অজয় হোম লাস্ট ম্যান ২৩২
শৈল চক্রবর্তী ভূতের ওঝা ২৩৪
সত্যজিৎ রায় ক্লাস ফ্রেন্ড ২৩৫
গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাদুলে ২৩৯
হেঁয়ালি ২৪১
সুকুমার দে সরকার টিয়া-ডাক ২৪২
রেলগাড়ির আদিপর্ব—৮ ২৪৪
বারীন বসু রূপ বদলের রূপকথা ২৪৫
অশোকানন্দ দাশ আবহাওয়ার কথা ২৫১
এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় একানড়ের ছুরি ২৫৪
শিবানী রায়চৌধুরী ইন্তাবিলের পুঁথি ২৫৬
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্ভুত যতো আউট ২৫৮
সত্যজিৎ রায় জবরখাকি ২৬০
ভবানীপ্রসাদ দে মিশন ২৬১
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কুমড়ো-লতা ২৬২
সুফি কার্টুন ২৬৩
সুরুচি সেনগুপ্ত নতুন বছর ২৬৪
তুষারকান্তি বসু একটি ভয়ংকর গ্রেপ্তারের কাহিনী ২৬৫
শ্যামলী বসু ভাষাজ্ঞান ২৬৮
লীলা মজুমদার চিড়িয়াখানা ২৬৯
রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী রাজবৈদ্য জীবক ২৭০
দে. না. বি. ঘুড়ির কথা ২৭৩
রেলগাড়ির আদিপর্ব—৯ ২৭৬
মঞ্জিল সেন ঘরছাড়া ২৭৭
অমল চক্রবর্তী কার্টুন ২৮৪
উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় আগ্নেয়গিরি! আগ্নেয়গিরি! ২৮৫
আর. এস. ফজরুল ইসলাম আজব আমন্ত্রণ-লিপি ২৮৭
বুদ্ধদেব গুহ যমদুয়ারের ছোকরা বাঘ ২৮৮
শুভ্রবন্তী পাল হারানো ছেলে ২৯০
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মাকড়সার লড়াই ২৯২
অমল চক্রবর্তী কার্টুন ২৯৩
জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধ ২৯৪
সুধীরকুমার চৌধুরী মন্দোদরী ২৯৫
কার্তিক ঘোষ পত্রমিতা চাই নাকি? ২৯৬
অসিতবরণ হাজরা নামকরণ ২৯৭
বিনোদ বেরা এক যে ছিল ডাইনি ২৯৭
রাধারমণ গোস্বামী হবে না কেন? ২৯৮
আশানন্দন চট্টরাজ ছড়া ২৯৮
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ছড়া ২৯৮
রাম চট্টখুণ্ডী মিটমাট ২৯৯
পৃথ্বীরাজ রায় লিমেরিক ২৯৯
বীণা দেবী দেখুন খাতা খুলে ৩০০
অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই চিঠিটা পেলে ৩০০
সর্বাণী দাশগুপ্ত ছড়া ৩০০
যাদুকর এ. সি. সরকার তাল-বেতালের ছড়া ৩০১
রেলগাড়ির আদিপর্ব—১০ ৩০২
ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় 'মাজের পাড়া জুবক শংঘো' ৩০৩
রুনু চট্টোপাধ্যায় কনু ৩০৬
কানাই পাকড়াশী চক্রান্ত ৩০৮
তারাপদ রায় কাগজ ফুলের গাছে ৩১০
ধীরেন্দ্রলাল ধর বাংলার বাঘ ৩১৩
শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ পুলকের অ্যাডভেঞ্চার ৩১৬
পূর্ণেন্দু পত্রী জলে ডাকাত ডাঙায় রাজা ৩২৩
সুনন্দা দাশগুপ্তা নিঝুম রাতে ৩২৪
আশা দেবী আসল টেনিদা ৩২৬
শৈবাল চক্রবর্তী কারু গেল সার্কাসে ৩২৮
রঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় হাবুলের বুদ্ধি ৩৩০
উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক ছন্দ-যুদ্ধ ৩৩১
রেলগাড়ির আদিপর্ব—১১ ৩৩৪
সুজয় সোম ক্রিকেট খেলার খোশ গপ্পো ৩৩৫
সুবীর চট্টোপাধ্যায় ব্যাঙ রোগী আর বদ্যি শেয়াল ৩৩৭
ধূর্জটিপ্রসাদ দত্ত বেলা শেষের বাঁশী ৩৩৯
নির্মলেন্দু গৌতম নিজের পাড়ায় ৩৩৯
জীবন সর্দার প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর ৩৪০

হাত পাকাবার আসর :—
- **নির্মাল্য বন্দ্যোপাধ্যায়** দমকল ও গরু ৩৪৫
- **বাসব চট্টোপাধ্যায়** সে এক সামান্য কর্মী ৩৪৫
- **কৃষ্ণা সরকার** উদাস বাউল ৩৪৬
- **সিদ্ধার্থ প্রধান** আমার ভূত দেখা ৩৪৬
- **অবন্তী অধিকারী** ছুটির শেষে ৩৪৭
- **চান্দ্রেয়ী গোস্বামী** ঝলমলীর পরিবর্তন ৩৪৭
- **অনীতা চট্টোপাধ্যায়** 'যদি হই' ৩৪৭
- **রূপালী বেগম** রোদ বৃষ্টি রোদ ৩৪৮
- **সুদীপ্তা পাল** টবিতা ৩৪৮
- **শুভব্রত রায়** অংক শিক্ষা ৩৪৮
- **সরসিজ সেনগুপ্ত** একটি শীতের রাত্রি ৩৪৮

অমল চক্রবর্তী কার্টুন ৩৪৮
রেলগাড়ির আদিপর্ব—১২ ৩৪৯
সত্যজিৎ রায় গোলোকধাম রহস্য ৩৫০
গঙ্গেশ বিশ্বাস সর্বেশ্বরের কুমীর শিকার ৩৬৬
শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় সাড়া ৩৭০
সুনির্মল চক্রবর্তী খাতার পাতায় ৩৭০
জগদানন্দ গোস্বামী কুস্তিডাঙার খাস্তগীর ৩৭০
লেখকের পরিচয় ৩৭১
শব্দছক, হেঁয়ালি ও 'ব'-এর বাড়াবাড়ির উত্তর ৩৭৭

www.BanglaBook.org

সেরা সন্দেশ

১৩৬৮-১৩৮৭

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ভূমিকা

লীলা মজুমদার

বৈশাখ ১৩৬৮ থেকে চৈত্র ১৩৮৭ খুব কম সময় নয়। এই কুড়ি বছরে আমাদের কত খুদে গ্রাহক নাম-করা লেখক হয়ে উঠেছে। গোড়ার কথাটাই গোড়ায় বলি। শুরু হয়েছিল তারো অনেক আগে, ১লা বৈশাখ ১৩২০ সালে, উপেন্দ্রকিশোরের হাতে। তিন বছর না যেতেই তিনি মারা গেলেন, তাঁর বড় ছেলে সুকুমার সম্পাদক হলেন। আট বছর পরে তিনিও চলে গেলেন। তারপর কিছুদিন বন্ধ থেকে, সুকুমারের মেজ ভাই সুবিনয়ের সম্পাদনায় আরো কিছুদিন সন্দেশ চলেছিল। তারি মধ্যে আমার নিজের লেখক জীবন-ও শুরু হয়েছিল। ১৩৪২ নাগাদ সন্দেশ বন্ধ হয়ে গেল।

বন্ধ হল তো বন্ধই হল। ত্রিশ বছর কেটে গেল। সুকুমারের দু-বছরের ছেলে সত্যজিৎ বড় হয়ে উঠল। ১৩৬৮ সালে, যেবার রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর একশো বছর পূর্ণ হল, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়, একা সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে, খানিকটা মায়ের ইচ্ছা পালন করবার জন্য, সত্যজিৎ নতুন সন্দেশের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করল। আমরা তার লেখক হলাম। আরো দু-বছর পরে আমি সম্পাদনাতেও যোগ দিলাম। তারো পরে উপেন্দ্রকিশোরের মেজ মেয়ে পুণ্যলতার মেয়ে নলিনীও সম্পাদক হল। নলিনীর স্বামী অশোকানন্দ দাশ মাসিক সন্দেশের প্রকাশক। তারপর অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে, প্রেম আর পরিশ্রম আর বন্ধুদের সহযোগিতাকে মূলধন করে, সন্দেশের কুড়ি বছর পূর্ণ হল। সেকালে শুনতাম একুশে সবাই সাবালক হয়। তবে সন্দেশ হল গিয়ে বালখিল্যদের ব্যাপার, সাবালকত্বের সে ধার ধারে না। তার আসল কারবার হল যাদের ৫ বছর থেকে ১৭ বছরের মধ্যে বয়স, তাদের সঙ্গে। অবিশ্যি 'তাদের সঙ্গে' মানে গোটা ভবিষ্যতের সঙ্গে।

অনেকে জানতে চান, এই মাগ্যি-গণ্ডার বাজারে এত অসুবিধার মধ্যেও এমন একটা কাগজ কেন চালাই আমরা, যে নিজের খরচটুকুই বইতে পারে, আমাদের বড়লোক করে দেয় না?

এর উত্তর দিতে গেলে আবার পুরনো কথা তুলতে হয়। উপেন্দ্রকিশোরের সময়-ও সন্দেশ থেকে এক পয়সা লাভ হত না। ছোটদের পত্রিকা বা বই থেকে লাভের কথা তাঁরা ভাবতেও পারতেন না। ঐ সুন্দর কাগজ, বহু-রঙা ছবি, সাদা-কালো ছবি, চমৎকার মলাট, নিজের ছাপাখানায়, নিজের খরচে প্রকাশিত হত। দাম ছিল তিন আনা। আমাদের সে অবস্থা নেই, যতই না ইচ্ছা থাকুক। আমরা গ্রাহকদের চাঁদা বাড়াতে বাধ্য হই, বহু-রঙা ছবি, চকচকে কাগজ দিতে পারি না ; আমাদের ছাপাখানা নেই, অন্য প্রেসে ছাপতে হয়, অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। মনের মত চেহারা দিতে পারি না।

কিন্তু উদ্দেশ্যটা সেই এক-ই আছে। ছোটদের দেখাতে চাই এই জীবনটা কত ভালো। জানাতে চাই ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় কি ঘটেছে, ঘটছে, ঘটতে যাচ্ছে। মানুষের মত মানুষ দেখাতে চাই। এমন মানুষ যাদের সাহস আছে, যারা ভালোকে ভালো আর মন্দকে মন্দ বলে। যারা দলাদলির বাইরে ; যারা ঘৃণা করে শুধু মিথ্যাকে আর নিষ্ঠুরতাকে আর কুঁড়েমিকে। বাদ দেয় যত রাজ্যের ন্যাকামি আর ঢং। যারা বিশ্ব-প্রকৃতিকে তার ন্যায্য জায়গা দিতে প্রস্তুত। যাদের মন উদার। এত সবের সঙ্গে আমরা পাঠকদের খুশি-ও করতে চাই। খুশি করতে না পারলে আমাদের সব চেষ্টাই বৃথা।

কি করে করব এ-সব? না, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গল্প, কবিতা, নাটক, ছবি, ছড়া, সব দিয়ে।

www.BanglaBook.org

এই কুড়ি বছরে অনেক ভালো ভালো লেখা ছাপা হয়েছে; অনেক নতুন লেখক দেখা দিয়েছে; পুরনো লেখক সুযোগ পেয়েছে, জোর পেয়েছে। তার পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগেরও এই বইতে জায়গা কুলোয়নি। কুড়ি বছর হল দু-শো চল্লিশ মাস। আমাদের দেশে প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের অভাব নেই। প্রতি মাসে যত পত্রিকা বেরোয় তার তিনগুণ ভরে যেতে পারে। কিন্তু লেখা বিচার করতে হয় কঠোর ভাবে। যতই মায়া লাগুক, দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখা না শুধরিয়ে যদি প্রকাশ করা যায়, তাহলে পত্রিকার মান নেমে যায়। আমরা অনেক ভুল করেছি; লেখা হারিয়ে গেছে; মতে মেলেনি; একশো রকম অসুবিধায় পড়েছি; তবু চেষ্টা করেছি যাতে ভালোকে সুযোগ, কম ভালোকে উৎসাহ দিতে পারি।

কুড়ি বছরের ফসলের সামান্য একটা ভাগ আছে এই বইতে, গড়পড়তা হয়ত মাসে একটি করে লেখা। অবিশ্যি সে-ভাবে নির্বাচন করা হয়নি; তিন সম্পাদক পরামর্শ করেও করেননি; অনেক বন্ধু-পাঠক-লেখক মিলে বসে কাজটি করেছেন। তাঁদের কাউকে আলাদা করে ধন্যবাদ দেব না, খালি স্বীকৃতিটুকুই দেব। খুশি হয়ে খেটেছেন, না ডাকতেই এসেছেন। কারণ সেরা সন্দেশের মালিক তাঁরা সবাই। মাসিক সন্দেশ-ও সমবায় নীতিতেই চলে। যাঁদের জিনিস তাঁরাই এ-বইটি করেছেন।

তবে প্রকাশকদের কথা আলাদা। তাঁদের কাছে আমরা গভীর ভাবে ঋণী, শুধু সেরা সন্দেশের ঝুঁকি নেবার জন্যে নয়, তাঁদের বহু দিনের অকৃত্রিম বন্ধুত্বের জন্যেও বটে। বন্ধু ছাড়া কেউ বাঁচে?

কেমন দাঁড়াল, শেষ পর্যন্ত পাঠকরাই তার বিচার করবেন। ভালো হয়ে থাকলে, সহৃদয় বড়দেরও ভালো লাগবে। আর ছোটদের শুধু এই কথা বলি, ১৩২০ সালের আদর্শ আমরাও রক্ষা করতে চেষ্টা করি। আদর্শ কখনো পুরনো হয় না; আজো যা সত্যি, ৬৮ বছর পরেও তা সত্যি। নইলে সে আসলে সত্যিই নয়। আবার আদর্শকে কখনো মুঠোর মধ্যে ভরে ফেলাও যায় না।

আমাদের তরুণ পাঠকদের হাসাতে চেষ্টা করেছি; না হাসলে কেউ বাঁচে? ভাবাতে চেষ্টা করেছি; না ভাবলে কেউ চোখ মেলে কিছু দেখতে পায়? এই সুন্দর পৃথিবীটাকে আর চারদিকের বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে দেখতে, কল্পনা করতে, দেখে দেখে উপভোগ করতে বলেছি। আশা করেছি তারো পরে আরো যা আছে, সেটি তারা নিজেরাই খুঁজে নিতে পারবে। ইতি—

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

সুকুমার রায়

www.BanglaBook.org

প্রথম সন্দেশ-এর প্রথম পৃষ্ঠা।

প্রথম সন্দেশ-এর ভূমিকা

একটি বাঙালীবাবু এলাহাবাদে ডাক্তারি করিতেন ; তাঁহার একটি খোট্টা চাকর ছিল। চাকরটি সবে পাড়া গাঁ হইতে আসিয়াছে, শহরের চাল-চলন এখনও ভাল করিয়া শিখে নাই; আর বাঙালীর রীতিনীতি কিছুই জানে না।

বাবু তাহাকে বলিলেন, "দেখ, দু'আনার সন্দেশ কিনিয়া আন ত।" চাকরটি দু'আনার পয়সা লইয়া সন্দেশ কিনিতে বাহির হইল, আর ভাবিল সে কি বিপদেই পড়িয়াছে! 'সন্দেশ' বলিলে তাহার দেশের লোকে বুঝে 'সংবাদ' ; সে জিনিস যে আবার কি করিয়া পয়সা দিয়া কিনিতে পারা যায়, আর গেলেও তাহা যে কোথায় মিলে, তাহা সে কোনমতেই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। কাজেই বেচারা আর কি করে? সে পয়সা ক'টি হাতে লইয়া পথের পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। যে আসে তাহাকেই বিনয় করিয়া বলে, "এ ভাইয়া! দো আনাকা সন্দেশ কাঁহা মিলি?"

এ কথা যে শোনে সেই হাসে। শেষে একজন তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, সন্দেশ বলিতে তুমি যাহা বুঝিয়াছ তাহা নয় : বাঙালীবাবুরা এক রকম লাড্ডু খায় তাহারই নাম 'সন্দেশ'। ময়রার দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়।"

তখন সে ভারি খুশী হইয়া ময়রার দোকান হইতে সন্দেশ কিনিয়া আনিল, আর মনে করিল খুব একটা কাজ করিয়াছে।

চাকর বেচারা লাড্ডুকে খবর ভাবিয়া ভাবনায় পড়িয়াছিল। আমরাও যদি লাড্ডু বলিতে খবর বুঝিয়া লই, তাহাতে কাজের অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু খবরকে যদি লাড্ডু মনে করা যায় তবে সেটা বোধ হয় তেমন দোষের কথা হয় না।

লাড্ডু খাইবার জিনিস। সে জিনিস ভাল হইলে মিষ্টও লাগে বলও বাড়ে। ভাল বস্তু খাইয়া যেমন শরীরে বল হয়, তেমনি ভাল কথা জানিয়া মনে বল হয়; উহাই মনের আহার। তাহা যদি মিষ্ট হয়, তবে তাহাকে মনের লাড্ডু বলিতে দোষ কি?

'সন্দেশ' বলিলেই যে আমরা সকলের আগে একটা খাইবার জিনিসের কথা ভাবি সে আমাদের অভ্যাসের দোষ। ঐ শব্দের আসল অর্থ যে 'সংবাদ', সংস্কৃত অভিধান খুলিয়া দেখিলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। 'সংবাদে'র অর্থ বদলাইয়া 'মিঠাই' হওয়া খুবই আশ্চর্য, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ ঘটনা একেবারে অসম্ভব নহে। আজকাল যেমন 'তত্ত্ব' পাঠান হয়, তেমনি আগে হয়ত লোকে 'সন্দেশ' পাঠাইত। তত্ত্ব, কিনা, কুশল মঙ্গলের সংবাদ, সেইটিই আসল

www.BanglaBook.org

কথা ; সঙ্গের মিষ্টান্ন এবং উপহার স্নেহের চিহ্নমাত্র। কথা এই বটে, কিন্তু কাজে এখন দাঁড়াইয়াছে—কেবল মিঠাই সন্দেশ; আসল খবরের কথা চাপা পড়িয়াছে। সে খবর না থাকিলেও কেহ কিছু মনে করে না, কিন্তু মিঠাই না থাকিলে হয়ত চটে। 'সন্দেশে'র বেলায়ও বোধহয় এমনিতর একটা কিছু হইয়াছিল ; আর 'তত্ত্বে'রও হয়ত কালে 'সন্দেশে'র দশা হইয়া উহা ময়রার দোকানে সের হিসাবে কিনিতে পাওয়া যাইবে।

যাহা হউক, আমরা যে সন্দেশ খাই, তাহার দুটি গুণ আছে। উহা খাইতে ভাল লাগে, আর উহাতে শরীরে বল হয়। আমাদের এই যে পত্রিকাখানি 'সন্দেশ' নাম লইয়া সকলের নিকট উপস্থিত হইতেছে, ইহাতেও যদি এই দুটি গুণ থাকে,—অর্থাৎ ইহা পড়িয়া যদি সকলের ভাল লাগে আর কিছু উপকার হয়, তবেই ইহার 'সন্দেশ' নাম সার্থক হইবে।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

১৩২০

১৩৬৮-র সন্দেশ-এর ভূমিকা

সন্দেশ! কত যত্ন করে ক্ষীর-ছানা-চিনিতে পাক করে, তার মধ্যে নানা উপাদান মিশিয়ে, নানা রকম ছাঁচে ফেলে, কত রকম সন্দেশই না তৈরী হয়। আবার, কত রকম তাদের নাম—"মনোহরা", "প্রাণহরা", "দেল্‌খোস্‌", "মধুক্ষরা", "অবাক্‌", "আবার খাবো"—শুনলেই খেতে ইচ্ছা হয়, না? দেখতে যেমন লোভনীয়, খেতে তেমনি উপাদেয়, আবার তেমনি উপকারী আর পুষ্টিকর—সন্দেশ কে না ভালবাসে? তাই তো দোকানে নিত্য নতুন নামের নতুন নতুন রকমের সন্দেশ তৈরী হয়।

কিন্তু একবার যে এক আজব 'সন্দেশ' সৃষ্টি হয়েছিল—ক্ষীর নয়, ছানা নয়, পেস্তা-বাদাম-নারকল নয়—কাগজের তৈরি! সে-সন্দেশ দেখে যেমন চোখ জুড়োত, চেখে তেমনি আনন্দ ও তৃপ্তি হত—তার স্বাদ যারা পেয়েছিল, তারা আজও সে অপরূপ স্বাদ ভুলতে পারেনি।

সার্থক হয়েছিল সেই নাম! সেদিনকার ছেলেমেয়েদের কাছে—শুধু ছেলেমেয়ে কেন, বড়দের কাছেও, এই "সন্দেশ" আসল সন্দেশের মতই লোভনীয় আর প্রিয় হয়েছিল। সন্দেশের জন্য সকলে পথ চেয়ে থাকত, সন্দেশ এলেই বাড়িতে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। কত সুন্দর রঙিন ছবি, কত সুন্দর সুন্দর গল্প কাহিনী ও কবিতা, কত রকম আশ্চর্য খবর, কত জানবার কথা ও ভাববার কথা, আবার কত হাসির কথা, কি মজার মজার সব ছবি, নতুন রকম ধাঁধা, নতুন মজাদার খেলা—একবার হাতে পেলে, কেউ আর ছাড়তে চাইত না!

এমন সুন্দর করে সন্দেশ যাঁরা গড়েছিলেন, তাঁদের নাম তো তোমাদের কাছে অচেনা নয়—আমাদের দেশের শিশুসাহিত্যে তাঁদের নাম যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

প্রথম যাঁরা বাংলাদেশে ছোটদের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করেন, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁদের মধ্যে একজন অগ্রণী ছিলেন। নানাদিকে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল—যেমন লেখায়, তেমন ছবি আঁকায়, তেমনি গান-বাজনায়—তার উপরে ছোটদের মন ভোলাবার ক্ষমতা ছিল তাঁর আশ্চর্য রকম! ছোট ছেলেমেয়েদের তিনি খুব ভালবাসতেন আর সর্বদা চিন্তা করতেন—কিসে তারা খুশী হয়, কিসে তাদের ভাল হয়।

তখন আমাদের দেশে ছোটদের জন্য কোন পত্রিকা ছিল না, ছোটদের মনের মত ভাল বইও ছিল না। প্রায় সত্তর বছর আগে, ছোটদের জন্য প্রথম বাংলা পত্রিকা বেরিয়েছিল—"সখা ও সাথী", তার কিছুকাল পরেই এল "মুকুল"। এই দুটি কাগজেরই প্রধান উদ্যোক্তা আর লেখকদের মধ্যে ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তখনকার দিনে আমাদের দেশে ভাল ছবি তৈরী কিংবা ছাপার কোন উপায় ছিল না, তাই তিনি স্থির করলেন যে আমাদের দেশেও ভাল ছবি তৈরী করতে ও ছাপাতে হবে। নিজের চেষ্টায় সব শিখে নিয়ে, তিনি আমাদের দেশে উঁচুদরের ছবি তৈরি করা ও ছাপানোর ব্যবস্থা করলেন।

ছোটদের জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর বই তিনি লিখলেন—সে সব বইয়ের চমৎকার ছবিগুলিও সব তাঁর নিজের আঁকা—যেমন মিষ্ট, মজার ও সুন্দর লেখা, তেমনি সুন্দর ও মজার ছবি! ছোটদের ঠিক মনের মত, ভাল একখানি পত্রিকা করবার ইচ্ছা তাঁর মনে অনেকদিন থেকেই ছিল, এবার তিনি "সন্দেশ" তৈরি করে দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে দিলেন। সে সন্দেশ পেয়ে ছেলেমহলে যেমন সাড়া পড়ে গেল, বড়রাও তেমনি আগ্রহ দেখালেন। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে, অনেক বড় বড় লেখক সন্দেশে লেখা দিলেন। সন্দেশ শিশুসাহিত্যে এক

www.BanglaBook.org

১৩৬৮-র সন্দেশের মলাট

নতুন যুগ এনে দিল, দিন দিন সন্দেশের আদর বেড়ে চলল।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মৃত্যুর পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকুমার রায় যোগ্যতার সঙ্গে সন্দেশের ভার নিলেন। সন্দেশের পাতায় সুকুমার রায় যে নির্মল আনন্দ পরিবেশন করলেন, তার তুলনা নেই। আমাদের দেশে সে যেন এক আশ্চর্য নতুন জিনিস! তাঁর কবিতার ছন্দে লেখায়, ছবির রেখায় রেখায় যে হাসি ভরা থাকত, প্রাণখোলা সে হাসিতে মনের সব গ্লানি দূর হয়ে গিয়ে মন নির্মল তাজা হয়ে উঠত। কিন্তু হায়, সে হাসির উৎস বন্ধ হয়ে গেল! অকালে অতি অল্প বয়সে তিনি এ পৃথিবী থেকে চলে গেলেন।

সুকুমার রায়ের পরে তাঁর ভাই সুবিনয় রায় সন্দেশের ভার নিলেন। তাঁরও ছোটদের জন্য সুন্দর ও মজার করে লিখবার ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল, প্রাণপণ চেষ্টা আর ইচ্ছারও অভাব ছিল না, কিন্তু কঠিন অসুখে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল—এ ভার তিনি বেশী দিন বইতে পারলেন না।

কয়েক বৎসর ধরে ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে মুখভরা হাসি, আর প্রাণভরা আনন্দ বিলিয়ে, আনন্দের মধ্যে দিয়েই তাদের শিক্ষা দিয়ে, তাদের বুদ্ধি ও জানবার ইচ্ছে ফুটিয়ে তুলে তারপর যেদিন সন্দেশ বন্ধ হয়ে গেল, সেদিন সকলের মনে কি দুঃখ! কোনো অতিপ্রিয় আপনার জনকে হারালে যেমন হয়। সেদিনের ছেলেমেয়েরা এখন বড় হয়েছেন, কিন্তু সন্দেশকে তাঁরা এখনও ভোলেননি।

এতদিন পরে সন্দেশ আবার এসেছে—কত আশা আর আনন্দের সঙ্গে তাকে আদরে বরণ করছি। আবার সন্দেশ ঘরে ঘরে নির্মল হাসি ও আনন্দের ভাণ্ডার খুলে দিক, হাসি ও আনন্দের মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েদের জ্ঞান বুদ্ধি ফুটিয়ে তুলুক, তাদের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকশিত করে দিক।

—সন্দেশের নবজন্ম সার্থক হোক!

পুষ্পলতা চক্রবর্তী
১৩৬৮

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাজা ও রাজদ্রোহী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ইংরেজি The King and The Rebel কৌতুক নাটিকাটি রবীন্দ্রনাথ ১৯১২-১৩ খৃষ্টাব্দে, শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের ডাইরেক্ট মেথডে ইংরেজি শেখাবার জন্য লিখেছিলেন। মূল ইংরেজি লেখার পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্রভবনে রাখা আছে, এবং সম্প্রতি 'রবীন্দ্রবীক্ষা'র তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে এর বাংলা রূপান্তর সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হল।]

॥ পাত্রপাত্রী ॥

প্রথম অংক	দ্বিতীয় অংক	তৃতীয় অংক	চতুর্থ অংক	পঞ্চম অংক
রাজা	রাজা	রাজা	রাজা	রাজা
রাজদ্রোহী হেম	সেনাপতি	মন্ত্রী	প্রধান বিচারক	রাজদ্রোহী
সেনাপতি	প্রধান বিচারক	সেনাপতি	প্রজাগণ	সেনাপতি
প্রধান বিচারক	সৈনিকগণ	সৈনিকগণ		বিচারপতি
সৈনিকগণ	প্রজাগণ			সৈনিক
	রক্ষীদল			প্রজাগণ
	বন্দীগণ			

www.BanglaBook.org

প্রথম অঙ্ক

রাজেন। আমি তোমাদের রাজা।
হেম। বটে! তুমি রাজা! কেন?
রাজা। কারণ, আমি তোমাদের সবার চেয়ে বড়।
হেম। হতে পার বড়, তা বলে তোমার শক্তি যে বেশি হবে এমন কথা নেই।
রাজা। আমার শক্তি বেশি নয়? বেশ, হোক তবে যুদ্ধ।
হেম। বেশ! আমি তোমার মাথা গুঁড়িয়ে দেব।
রাজা। তোমার চোয়াল ভেঙে ফেলব।
হেম। নাক থেঁতো করে দেব।
রাজা। তোমার সব দাঁত আমি উপড়ে ফেলব।
(মতির প্রবেশ)
মতি। একি কাণ্ড! ঝগড়া কিসের?
হেম। রাজেন বলে, সে হবে রাজা; কারণ তার জোর বেশি। সে কথা আমি মানি না। আমি ওকে ভয় করি নাকি?
সেনাপতি। তোমরা তো আচ্ছা বেকুব। এ একটা খেলা বৈ তো নয়, সে কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? রাজেন হলই বা রাজা, পরে তোমারও পালা আসবে—তখন তুমি রাজা হবে। জয় মহারাজ রাজেন্দ্রের জয়! তা বেশ রাজামশাই, তোমার মন্ত্রী কে?
রাজা। জিতেন হবে আমার মন্ত্রী।
সেনাপতি। সেনাপতি?
রাজা। তুমি সেনাপতি হবে।
সেনাপতি। আর বিচারক?
রাজা। কেন, উপেন।
সেনাপতি। আর যে-সব ছেলেরা বাকি রইল?
রাজা। তারা সবাই সৈনিক।
সেনাপতি। বেশ তবে তাই হোক। সৈনিকগণ, তোমরা সার বেঁধে দাঁড়াও। রাজাকে কুর্নিশ করো। মহারাজ রাজেন্দ্রের জয়!

দ্বিতীয় অঙ্ক

রাজা। সেনাপতি মতি, তোমার উপর আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি।
সেনাপতি। কেন মহারাজ?
রাজা। কারণ তুমি কুঁড়ে হয়ে গেছ, কিছুতেই উৎসাহ নেই তোমার।
সেনাপতি। আদেশ করুন মহারাজ; আপনার ইচ্ছার চেয়ে বড়ো আমার কাছে কিছুই নেই।
রাজা। সেনাপতির পদ লাভ করে এখন পর্যন্ত তুমি কোনো যুদ্ধের আয়োজন করনি!
সেনাপতি। না মহারাজ, যুদ্ধের আয়োজন করিনি, সে কথা

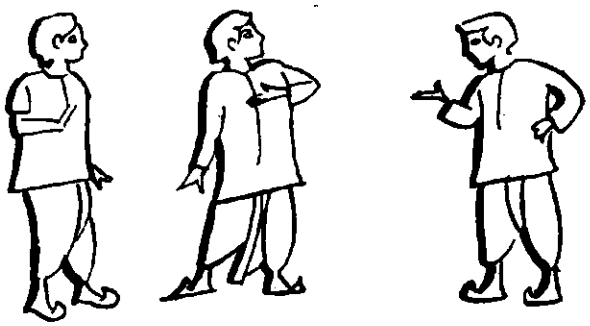

ঠিক। যুদ্ধ করবার কোনো সংগত কারণও তো দেখিনি।
রাজা। খাসা তুমি সেনাপতি বটে! যুদ্ধের কারণ ঘটবার জন্য বসে আছ!
সেনাপতি। মহারাজের যে কোনো শত্রু নেই।
রাজা। শত্রু নেই! শত্রু সৃষ্টি করতে পার না? তুমি রাজকোষ থেকে মোটা মাইনে পাচ্ছ, আর তোমার সৈনিকরা নিষ্কর্মা হয়ে বসে বসে অধৈর্য হয়ে পড়ছে—বাইরে শত্রু না যদি জোটে, কোনদিন তারা আমাকেই ধ্বংস করতে আসবে।—সৈনিকগণ!
সৈনিকরা। আজ্ঞা করুন প্রভু।
রাজা। মনে করো যদি একটা যুদ্ধ বাধে, তা হলে কেমন হয়?
সৈনিকরা। যুদ্ধ! সে তো ভারি মজাই হবে!
রাজা। ঠিক কথা। মজা হবে। সেনাপতি!
সেনাপতি। আদেশ করুন মহারাজ।
রাজা। শত্রু একটা খুঁজে বের করা চাই। তার পরেই শুরু হবে যুদ্ধ।
সেনাপতি। আপনার আদেশ শিরোধার্য মহারাজ।
(রাজার প্রস্থান। হেম ও প্রজাগণের প্রবেশ)
সেনাপতি। বন্ধুগণ, তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে যে মহারাজের সঙ্গে ঝগড়া করতে রজী?
প্রজারা। কেউ না। কেউ না।
সেনাপতি। একজনও নেই? ধিক্ কাপুরুষ!
প্রজারা। কে বলে কাপুরুষ? আমরা ভয় পাই নাকি? শুধু মহারাজের আমরা অনুগত প্রজা কিনা, তাই।
সেনাপতি। কিন্তু হেম, তুমি মহারাজকে অপমান করেছ। ঠিক কিনা? তোমার সঙ্গেই তবে যুদ্ধ হবে।
প্রজারা। হা হা! কী মজা!
হেম। আমি কখনোই মহারাজের অসম্মান করিনি।
সেনাপতি। সৈনিকগণ, হেম মহারাজের অসম্মান করেনি কি?
সৈনিকরা। আলবৎ করেছে। সে কথা ও মানতে না চায় তো ওর মাথা ভেঙে ফেলব।
হেম। কিন্তু কেমন করে আমি মহারাজকে অসম্মান করলাম?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেনাপতি। আমাদের মহারাজা যখন তোমাদের ঘরের সুমুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তুমি জানলায় দাঁড়িয়ে হাই তুলেছ!

সৈনিকরা। হাই তুলেছে! হা—হা!

প্রজারা। হাই তোলা! কী ভয়ঙ্কর! এমনি স্পর্ধা!

সৈনিকরা। কি জঘন্য!

প্রজারা। কী সাংঘাতিক অপমান!

হেম। রাজা হবার পর মহারাজ রাজেন্দ্র একবারও তো আমার বাড়ির পথ মাড়ানিনি।

সেনাপতি। তা হতে পারে। কিন্তু বাপু, তুমি কি বলতে পার যে তুমি কখনো হাই তোলনি?

সৈনিকরা। প্রাণের মায়া থাকে তো এ কথা অস্বীকার কোরো না, বুঝলে? অস্বীকার করলে পরে অনুতাপ করতে হবে—মনে রেখো।

হেম। তোমরা যদি এমন করে বলতে থাক, তাহলে আমাকে মানতেই হবে যে, হাই আমি কোনো এক সময় তুলেছি বৈকি!

সেনাপতি। সাবাস! এই তো বীরের মতো কথা! ধন্য তোমার বুকের পাটা, হেম!

প্রজারা। যাকে বলে রাজার একেবারে যোগ্য শত্রু! বটে কিনা?

সৈনিকরা। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে সত্যিই আনন্দ হবে।

সেনাপতি। এসো সৈনিকগণ, আমরা এই মহান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হই।

প্রজারা। জয় রাজাধিরাজ রাজেন্দ্রের জয়! তাঁর শত্রুরা নিপাত যাক। দিকে দিকে তাঁর বিজয় পতাকা উড্ডীন হোক।

(সেনাপতির প্রস্থান। বিচারকের প্রবেশ)

বিচারক। তোমরা সকলে জেনে রাখো, মহারাজ রাজেন্দ্র আমাকে প্রধান বিচারক নিযুক্ত করেছেন। মহারাজ রাজেন্দ্রের জয়!

প্রজারা। জয় মহারাজ রাজেন্দ্রের জয়!

বিচারক। এবার আমার বিচারসভা বসবে। প্রহরী!

প্রহরী। আদেশ করুন, মাননীয় বিচারপতি।

বিচারক। বন্দীদের একে একে আমার সামনে হাজির কর।

(প্রহরীর সঙ্গে যদুর প্রবেশ)

প্রহরী। এই এক নম্বর আসামী, এর নাম যদু।

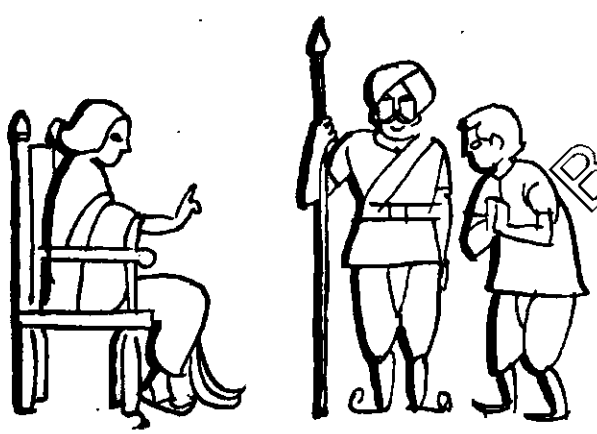

বিচারক। এর অপরাধ?

প্রহরী। ভোলা যখন একমনে পড়া করছিল, এ তখন তার খাবার খেয়েছে।

বিচারক। এক নম্বর বন্দী!

যদু। বলুন মাননীয় বিচারপতি!

বিচারক। তুমি ভোলাকে জিজ্ঞাসা না করেই কি তার খাবার খেয়েছ?

যদু। হ্যাঁ, মাননীয় বিচারপতি।

বিচারক। এই অপরাধের জন্য কী সাজা তুমি চাও?

যদু। আমাকে জিজ্ঞাসা না করে ভোলা আমার খাবার খেয়ে নিক।

বিচারক। ভোলা, যদুর এই দণ্ডে তোমার সম্মতি আছে?

ভোলা। হ্যাঁ, মাননীয় বিচারপতি, আমি রাজী।

বিচারক। বেশ, তোমরা যেতে পার। প্রহরী!

প্রহরী। আদেশ করুন, মাননীয় বিচারপতি।

বিচারক। দু'নম্বর বন্দীকে নিয়ে এসো।

(দুই নং বন্দীকে নিয়ে প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। দু'নম্বর বন্দী হাজির, মাননীয় বিচারপতি।

বিচারক। বন্দী, তুমি কি করেছ?

বন্দী। মধু যখন ঘুমিয়ে ছিল, তার নাকে সুড়সুড়ি দিয়েছি মাননীয় বিচারপতি।

বিচারক। বলো কী! তারপর?

বন্দী। সে ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠেই বেদম হাঁচতে শুরু করল।

বিচারক। কী ভয়ানক! কী সাজা তোমার পাওয়া উচিত মনে কর।

বন্দী। সাজা আমার হয়েই গেছে, মাননীয় বিচারপতি। মধুর দাদা আমাকে ভালোরকম উত্তম-মধ্যম দিয়েছে।

বিচারক। প্রহরী!

প্রহরী। আদেশ করুন, মাননীয় বিচারপতি!

বিচারক। বন্দীকে ছেড়ে দাও।

(ক্রন্দনরত ভোলার প্রবেশ)

বিচারক। কী ব্যাপার ভোলা? যদুর খাবার তুমি খেতে পারনি?

ভোলা। অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারলাম না।

বিচারক। কেন?

ভোলা। যদুর গায়ে খুব জোর যে।

বিচারক। প্রহরী!

প্রহরী। আদেশ করুন, মাননীয় বিচারপতি!

বিচারক। যদুকে ধরে আন।

(যদুকে নিয়ে হরির পুনঃ প্রবেশ)

বিচারক। যদু, তুমি ভোলার কি করেছ?

যদু। ভোলা আমার খাবার খেতে চেষ্টা করেছে, আমি তাকে সাধ্যমত বাধা দেবার চেষ্টা করেছি মাত্র।

বিচারক। তুমিই জিতলে?

যদু। হ্যাঁ, মাননীয় বিচারপতি।

বিচারক। তোমার লজ্জা নেই?

যদু। আমি নিশ্চয় জানি, আমার মতন অবস্থায় পড়লে মাননীয় বিচারপতি নিজেও অন্যরকম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আচরণ করতে পারতেন না।

বিচারক। আমিও জানি। কিন্তু তুমিই প্রথম অন্যায় করেছ।

যদু। তা ঠিক। তবে আমার কাজটা যদি অন্যায় হয়ে থাকে, ভোলাকে সেই কাজটা করবার নির্দেশ কেন দিলেন, মাননীয় বিচারপতি?

বিচারক। এ ন্যায়নীতির জটিল প্রশ্ন—তা নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি তর্কে প্রবেশ করব না। তুমি যে অপরাধ করেছ তার শাস্তি তোমাকে পেতে হবে। উপযুক্ত দণ্ড প্রার্থনা কর।

যদু। তিনদিন আমাকে খাবার দেওয়া বন্ধ থাক। আমি অন্যের খাবার কেড়ে খাব।

বিচারক। সাবাস! তুমি ধন্য, যে, নিজেই এমন কঠিন দণ্ড চেয়ে নিলে! প্রহরী!

প্রহরী। আদেশ করুন, মাননীয় বিচারপতি।

বিচারক। বন্দীকে ছেড়ে দাও।

তৃতীয় অঙ্ক

রাজা। মন্ত্রী জিতেন!

মন্ত্রী। আদেশ করুন মহারাজ।

রাজা। সেনাপতি মতি কি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন?

মন্ত্রী। তাই তো মনে হয় মহারাজ।

রাজা। বিদ্রোহী হেমকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে।

মন্ত্রী। হেমের প্রতি আপনার এই রোষের কারণ কী, মহারাজ?

রাজা। সে অত্যন্ত দুর্বিনীত। তার স্পর্ধা সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করেছে।

মন্ত্রী। সে বাস্তবিক কী দোষ করেছে, মহারাজ?

রাজা। বল' কী? তুমি আমাদের মন্ত্রী, আর তুমি জান না হেমের কী দোষ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে মহারাজ—স্বীকার করতেই হয় যে, সঠিক জানি না।

রাজা। ভালো! হেমের আচরণে বিদ্রোহের আভাস পাওয়া গেছে।

মন্ত্রী। কৌতূহল মার্জনা করবেন। মহারাজ! কী সেই আচরণ?

রাজা। তা—হ্যাঁ—আমার ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। সেনাপতি জানে। জানি না, সেও ভুলে বসে আছে কিনা।

মন্ত্রী। আচ্ছা! ঐ সেনাপতি আসছেন।

(সেনাপতির প্রবেশ)

রাজা। সেনাপতি!

সেনাপতি। মহারাজ!

রাজা। মন্ত্রী জানে না, বিদ্রোহী হেমের বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ কী? তুমি নিশ্চয় বলতে পারবে।

সেনাপতি। কিন্তু, মহারাজ, ব্যাপারটা আমার যে পরিষ্কার স্মরণ হচ্ছে না।

রাজা। নাই হল। সে অপরাধ যে ক্ষমার অযোগ্য তা তো ঠিক?

সেনাপতি। হ্যাঁ, তা তো বটেই! নিশ্চয়।

মন্ত্রী। কিন্তু সেনাপতি, প্রজারা যখন জানতে চাইবে কেন এই যুদ্ধ, তার একটা উত্তর তৈরি রাখা চাই। একটা কারণ তো তাদের বলতে হবে!

সেনাপতি। হ্যাঁ—ঠিক হয়েছে—রাজসভায় মহারাজ যখন হেঁচেছিলেন, হেম তখন তুড়ি দেয়নি।

১ম সৈনিক। ভাবো একবার! তুড়ি দিলে না!

২য় সৈনিক। তুড়ি দেয়নি? অহো, কী স্পর্ধা!

সেনাপতি। সৈনিকগণ, মহারাজের এ অপমান ভুলবার নয়!

১ম সৈনিক। ভুলব না, কখনোই ভুলব না।

২য় সৈনিক। মনে রেখো, মহারাজ যখন হেঁচেছিলেন, হেম তুড়ি দেয়নি।

৩য় সৈনিক। এমনি অপমান! এ অপমানের প্রতিকারে আমরা প্রাণ দেব।

১ম সৈনিক। হেমের ক্ষমা নেই।

২য় সৈনিক। কিছুতেই না। নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলেও না।

সেনাপতি। ধন্য! ধন্য তোমাদের আনুগত্য! ধন্য রাজভক্তি।

রাজা। মন্ত্রী! আমাদের সেনারা যখন যুদ্ধ জয় করে ফিরবে, তাদের প্রত্যেককে পদক দিতে হবে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে মহারাজ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাজা। আর যারা যুদ্ধে প্রাণ দেবে, সমারোহের সঙ্গে তাদের সৎকার করা চাই।

মন্ত্রী। চাই বৈকি মহারাজ।

রাজা। সেনাপতি! তুমি যে কোনো কথা বলছ না।

সেনাপতি। ঘৃণায় আমার গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেছে মহারাজ।

রাজা। চুপ করে বসে আছ কেন? যুদ্ধযাত্রায় আর বিলম্ব কিসের?

সেনাপতি। না, আর বিলম্ব নয়। সেনাগণ, এগিয়ে চলো তোমরা।

সৈনিকগণ। জয় মহারাজা রাজেন্দ্রের জয়। তাঁর প্রভুত্ব চরাচরে ব্যাপ্ত হোক। তাঁর পবিত্র হাঁচি অনুগত প্রজাপুঞ্জের সমবেত তুড়িবাদনে সম্মানিত হোক।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রজারা। মাননীয় বিচারপতি! আমরা জানতে চাই, হেমের সঙ্গে মহারাজের এই যে যুদ্ধ—এ কি ন্যায়সংগত?

বিচারক। আরে! শোনো কথা! তিনি যে রাজা!

প্রজারা। সেজন্যই তো তিনি হবেন ন্যায়ধর্মের পালক।

বিচারক। ন্যায়-অন্যায় রাজাই জানেন। আমরা কী করতে পারি?

প্রজারা। আমরা মনে করি, যতক্ষণ মহারাজ ন্যায়ের অনুশাসন মেনে চলবেন ততক্ষণই তিনি আমাদের রাজা।

বিচারক। কিন্তু রাজার ইচ্ছার কাছে আমাদের নতশির হতেই হবে।

প্রজারা। সে ইচ্ছা যদি অন্যায় হয়, অধর্ম হয়—তবু?

বিচারক। হ্যাঁ, তবু।

প্রজারা। কেন?

বিচারক। অবাক্ কাণ্ড! আশ্চর্য তোমাদের নির্বুদ্ধিতা! কেন? কারণ, মহারাজের আছে বিপুল সেনাবল।

প্রজারা। সেই সেনাবলকে আমরা কানাকড়ি ভয় করি না। যিনি রাজা হবেন তাঁকে ন্যায়ধর্ম পালন করতে হবে।

বিচারক। বলা সহজ। কিন্তু করব কী শুনি?

প্রজারা। মহারাজকে বিচারশালায় ডেকে পাঠাবেন। তিনি আমাদের বলবেন, কেন এই যুদ্ধ।

বিচারক। হা ঈশ্বর! মহারাজের উপর সমন জারি! করে তোমরা বলে বসবে—আকাশের বাজকে ডাকুন, আমার ঐ নারকেল গাছের মাথায় কেন পড়ল তার জবাব দিক।

প্রজারা। যদি আপনি বিচারকের কর্তব্য পালন করতে অক্ষম হন তা হলে আপনার কোনো বিচার আমরা মানব না। তখন আমরা আপনাকে গারদে পুরব।

বিচারক। মানছি তোমাদের কথা। মহারাজকে ডেকে পাঠাবার আর দরকার নেই, ঐ তিনি নিজেই আসছেন।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। এখানে ভিড় কিসের? কী চাই তোমাদের? এত হল্লা করছ কেন?

প্রজারা। আমরা ন্যায় বিচার চাই, মহারাজ।

রাজা। সেজন্য বিচারশালা আছে। সেখানে গেলে বিচারের জন্য ভাবতে হবে না।

প্রজারা। আমরা বিচারপতির কাছে জানতে এসেছি, হেমের বিরুদ্ধে মহারাজের এই যে যুদ্ধ, এ কি সংগত?

রাজা। সংগত? রাজা কখনো অন্যায় করেন না।

প্রজারা। কেননা, রাজা যখন অন্যায় করেন তখন তিনি আর রাজা থাকেন না।

রাজা। তোমরা শক্ত কথা বলেছ—এর তাৎপর্য গভীর।

প্রজারা। রাজা কখনো অন্যায় করেন না, সে কথার তাৎপর্য ঢের বেশি গভীর আর গুরুতর, মহারাজ। সেজন্যই মহারাজের কাছে সবিনয়ে জানতে ইচ্ছা করি—হেমের অপরাধ কী, যে, মহারাজ তার প্রতি এমন রুষ্ট!

রাজা। সে তো আমি নিশ্চয় করে বলতে পারিনে। এ কথা তো সকলেই জানে, ছোটখাটো ব্যাপার রাজা মনে রাখতে পারেন না। যতদূর মনে পড়ে—একদিন রাজবাড়ির হাতি যখন বেড়াতে বেরোয়, ঠিক তখনই হেম থুথু ফেলেছিল। সকলেই দেখেছে।

প্রজারা। এ রাজ্যের আইনে হেমের এই কাজ যদি দণ্ডনীয় হয় তবে বিচারশালায় হেমের যথাবিধি বিচার হোক।

রাজা। অর্থাৎ, যুদ্ধের আনন্দ আর উল্লাস থেকে তোমরা আমাকে বঞ্চিত করতে চাও?

প্রজারা। হ্যাঁ, যেহেতু এ যুদ্ধ অন্যায়।

রাজা। কিন্তু, নিতান্ত প্রয়োজন।

প্রজারা। প্রয়োজন! কেন?

রাজা। চর্চার অভাবে আমার সেনাদল যুদ্ধবিদ্যা ভুলতে বসেছে।

প্রজারা। মহারাজ, এই তবে যুদ্ধের আসল কারণ?

রাজা। নিশ্চয়।

প্রজারা। বেশ! আমরা তবে হেমের দিকে। মহারাজের সেনাদলের যুদ্ধের আশ মিটতে দেরি হবে না। চলো ভাই, হেমের দলে যোগ দেবে চলো।

পঞ্চম অঙ্ক

রাজা। সেনাপতি, তোমাকে চিন্তিত দেখছি কেন?

সেনাপতি। আজ্ঞে মহারাজ, সব কথা শুনলে আপনিও চিন্তিত হবেন, সন্দেহ নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাজা। কেন, কী সংবাদ, বলো।

সেনাপতি। মহারাজের প্রজারা দলে দলে বিদ্রোহীর দিকে চলে যাচ্ছে। যে কারণে এই যুদ্ধ, তার যৌক্তিকতা তারা মানে না।

রাজা। তাতে এই প্রমাণ হল, যুদ্ধের কারণ প্রচার করার কাজে তুমি গাফিলতি করেছ।

সেনাপতি। আজ্ঞে না, মহারাজ। আমরা যে-সব যুক্তি দেখিয়েছি তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। কিন্তু আমাদের স্মৃতিভ্রংশতার দরুণ যুক্তিগুলো পরস্পর-বিরোধী হয়ে গেছে।

রাজা। কী দুর্ভাগ্য। অবিলম্বে দলত্যাগ বন্ধ করা চাই। প্রজারাই যদি না থাকল, রাজা সেজে লাভ কী?

সেনাপতি। মহারাজ, ওদিকে যুদ্ধ যে চলছে, সেদিকে তো আমাকে আগে ছুটতে হবে।

রাজা। তাই যাও। কিন্তু মনে রাখবে—বিদ্রোহীর কিছুতে ক্ষমা নেই। আর, রাজঘাতকদের জন্য চাই যথেষ্ট পরিমাণ রশির ব্যবস্থা—দলত্যাগী-দের সকলকে ফাঁসিতে ঝোলাতে হবে।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। সেনাপতি মশায়, আমরা পরাজিত।

সেনাপতি। পরাজিত! বল কী হে? এই তো যুদ্ধ শুরু হল।

সৈনিক। আমাদের লোকরা দলে দলে পালাচ্ছে।

রাজা। যাও যাও, তাদের বলো—যে ফিরে দাঁড়াবে সেই পুরস্কার পাবে—রাজকীয় সম্মানে তাকে ভূষিত করা হবে।

(সেনাদলসহ হেমের প্রবেশ)

হেম। রাজেন, তুমি বন্দী।

রাজা। সাবধান হেম! আত্মবিস্মৃত হয়ো না। আমি রাজা!

হেম। রাজার অধিকার তুমি হারিয়েছ। প্রজার দরবারে তুমি এখন অপরাধী। তাদের রায় পালন করতে আমি এসেছি।

রাজা। এ দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে—সে হবে না।

(প্রজাদের প্রবেশ)

প্রজারা। পাপী রাজেন নিপাত যাক!

রাজা। সেনাপতি! তোমার সামনে এইসব দুরাচার তোমাদের মহারাজকে এমন করে অপমান করতে সাহস করে?

সেনাপতি। আমার যে আর কোনোই ক্ষমতা নেই।

রাজা। বিচারপতি! এইসব দুর্বৃত্তকে তুমি সাজা দিচ্ছ না কেন?

বিচারপতি। কারণ, ন্যায় যে এদেরই পক্ষে। আর সেই সঙ্গে আছে গোটা সেনাবাহিনী। আপনি আর কথাটি কইবেন না; রাজমুকুট ফেলে দিয়ে, জনতায় মিশে যান—সেই হবে সুবুদ্ধি।

রাজা। যুদ্ধ তবে শেষ? কিন্তু হলই বা যুদ্ধ শেষ, বিচারশালা তো আছে। সেখানে আমার কথা বলতে পারি না ভাবছ? রাজসভার ভাট বিচার-শালায় আমার হয়ে এমনি ভাষণ দেবে যে, প্রমাণ পেতে দেরি হবে না আমার নীতিই ঠিক।

বিচারপতি। রাজভাটের উচ্চকথায় প্রজাদের কান ভারী হতে বাকি নেই।

রাজা। আমি জানি, তার নিষ্ঠা অবিচল। নুনের গুণ সে গাইবেই। সময় এলেই তাকে যথোচিত পুরস্কৃত করব।

বিচারপতি। রাজভাট বলছেন, শুধু মুকুট কেড়ে নিলেই হবে না; এমন কি প্রাণদণ্ড দিলেও রাজার অপরাধের উপযুক্ত সাজা হয় না।—তাঁর মর্মস্পর্শী কথায় জনচিত্ত আলোড়িত।

রাজা। সে কী কথা! তবে তো সত্যই আমার বিপদ আসন্ন? জানতে পারি কি, আমার সভাকবি কি বলেন?

বিচারপতি। সভাকবি বিজয়ী জনতার যশোগাথা রচনায় নিরত।

রাজা। তবে এসো বন্ধু, হেম, তোমাকে অভিনন্দন! ধন্য তোমার কৃতিত্ব!—যাবার আগে তোমাকে দু-একটি পরামর্শ দিয়ে যাই—রাজভাটের পদটি তুলে দিয়ো; আর ঐ যে সভাকবি, তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার জন্যে বিশেষ যত্নে যে রশিগাছি তুলে রেখেছিলাম, তা দিয়ে ওকে এখনি ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দাও। বিলম্বে বিপদ অনিবার্য। বিদায় বন্ধুগণ।

[অনুবাদ—জগদিন্দ্র ভৌমিক]

১৩৮৪

www.BanglaBook.org

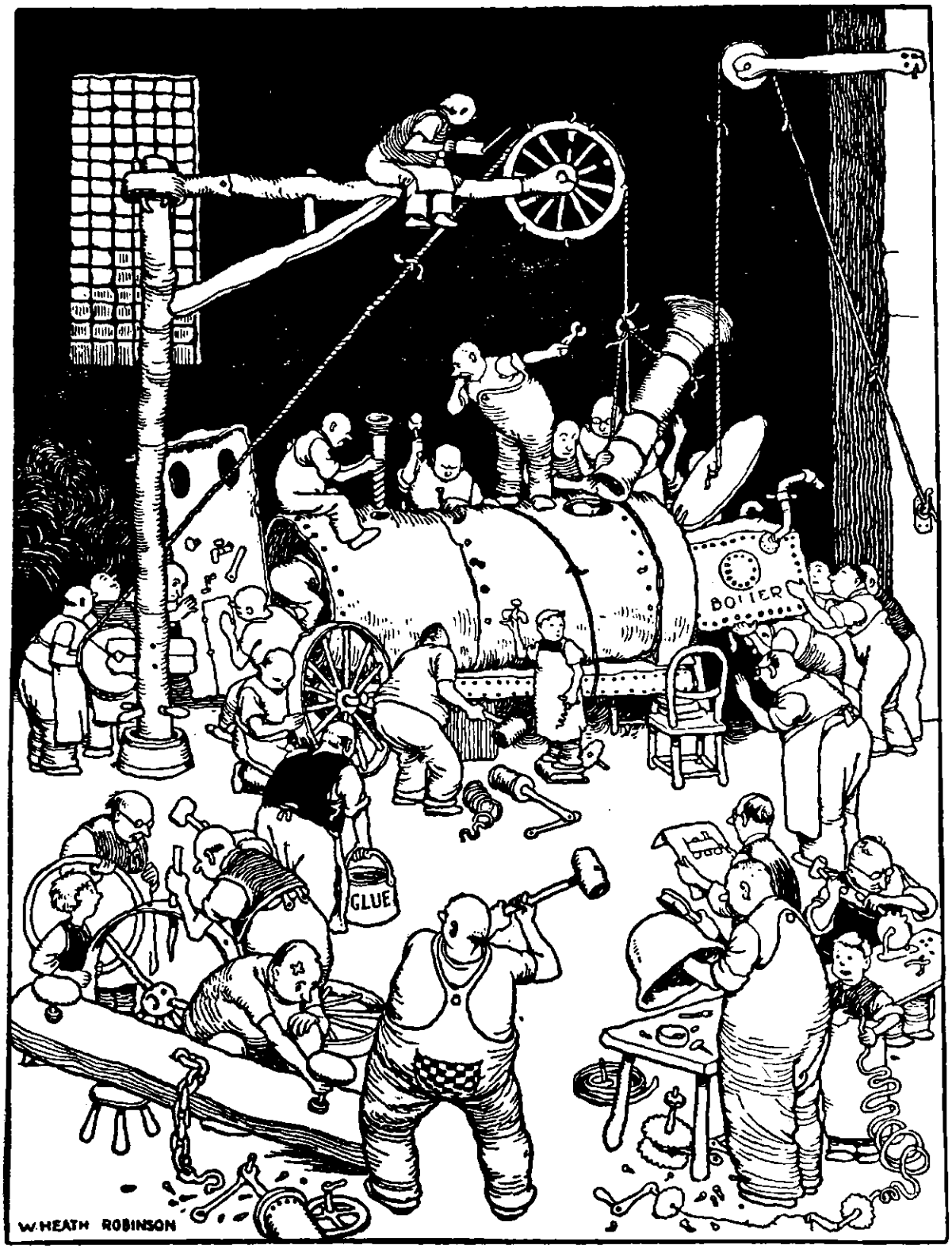

কত লোক খাটে কারখানাতে কত মাথা করে ঝিম ঝিম
কত কাঠখড় পোড়ে বানাতে সেকালের রেলের ইনজিন।

www.BanglaBook.org

কত্তাবাবা

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

আমরা বলতুম কত্তাবাবা। কত্তাবাবারা অনেক ভাই ছিলেন, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সবার ছোট। বড়-কত্তাবাবাদের সঙ্গে বিশেষ আমাদের যোগাযোগ ছিল না ; দেখেছি তাঁদের অল্পই, কাকে কি বলে ডাকতে হবে তাও কেউ আমাদের শিখিয়ে দেননি। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে আমরা ছেলেবেলায় প্রায়ই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে পেতুম—তাই তিনিই ছিলেন আমাদের কত্তাবাবা।

কত্তাবাবা জোড়াসাঁকো-বাড়িতে সব সময় থাকতেন না। তিনি থাকতেন শান্তিনিকেতনে, কখনও কখনও বিদেশে। কিন্তু যখন দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের ছ-নম্বর বাড়িতে আসতেন তখন ঠাকুরবাড়ির চেহারাই বদলে যেত। চেহারা বদলে যেত মানে, দরজায় জানলায় রঙিন পর্দা টাঙানো হত বা ঝালর ঝোলানো হত বা ফুল-পাতা দিয়ে বাড়ি সাজানো হত তা তো নয়। বাড়ি যেমনকার তেমনিই থাকত। শুধু মনে হত মানুষরা সব যেন আস্তে আস্তে জেগে উঠছে। কিসের একটা ছোঁয়া লেগে যেত চারিদিকে। অন্যরকম মনে হত সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি দিনগুলিকে। ছ-নম্বর বাড়ি থেকে কত্তাবাবা চলে আসতেন আমাদের পাঁচ-নম্বর বাড়িতে আমাদের দাদামশায়দের কাছে। গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, তিন দাদামশায় ছিলেন কত্তাবাবার বিশিষ্টতম সহচর। তাঁরাও যেতেন ছ-নম্বর বাড়িতে। আনাগোনা চলত কেবলই। এই চারজনে এমন জমত যে কি বলব। এঁদেরই ঘিরে এসে পড়তেন জোড়াসাঁকো-বাড়িতে কলকাতার জ্ঞানী-গুণীরা, মনীষীরা। অভিনয়ের তোড়জোড় হত, নতুন নতুন গান শোনা হত, নতুন রচনা পাঠ হত, কত কি আশ্চর্য জিনিস সৃষ্টি হত ; রঙ্গমঞ্চ রচনায়, অভিনয় কৌশলে, সাজ-সজ্জায় নতুন নতুন চিন্তা, নতুন সুর, নতুন কথা, নতুন ঢং নিয়ে চলত উৎসাহপূর্ণ পরখ। আর আমাদের ছোটদের যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য লাগত সেটা হচ্ছে এই যে, আমরাও অনায়াসে অবলীলাক্রমে বুড়োদের এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারতুম ; কোথাও একটুও বাধত না। অথচ আমাদের পরিবারের সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অন্যান্য বুড়োরা যখন এসে মিলিত হতেন তখন তাঁদের সেই জগতের প্রকৃতি হত একেবারেই অন্যরকম। বিদ্বান বুদ্ধিমান অনেকে সেখানে থাকলেও তাঁদের চোখা-চোখা বাক্যজাল জোড়াসাঁকো-বাড়ির ছেলেমেয়েদের কোনদিন আকৃষ্ট করতে পারত না। কত্তাবাবার অদ্ভুত কথা বলবার ধরন ছিল। সবার থেকে স্বতন্ত্র। কেউ অমন করে আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন না। কেমন করে জানি না নিজে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কথা বলিয়ে নিতেন। বড়রা আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন হয় ধমকের সুরে নয় আদরের সুরে। দুটোতেই আমাদের বুঝতে কষ্ট হত না বড়দের সঙ্গে কতটা আমাদের তফাত। কত্তাবাবার কাছে কিন্তু যদি হঠাৎ সাহস করে এগিয়ে যেতুম সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ খুলে যেত আর মুহূর্তের মধ্যে ভুলিয়ে দিতেন বক্তা এবং শ্রোতার মধ্যে বয়সের কোন পার্থক্য আছে কি না! এদিকে কত্তাবাবার সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান ছিল পঞ্চাশ বছরের। কেমন করে এটা ঘটাতেন জানি না, কিন্তু এই জন্যেই বোধহয় আমাদের ছেলেবেলায় তাঁকে একটুও অসাধারণ লাগেনি। আর 'ছুটির পড়া' আর 'কথা ও কাহিনী' পড়ে যতই ভালো লাগুক, যতই মনকে নাড়া দিক—ওগুলো আমাদের চোখে ঘরের জিনিসের মতই ছিল, তাই কোনদিন অসামান্য বলে মনে হয়নি।

নতুন গান, নতুন রচনা, নতুন নাট্য, নতুন অভিনয়—এ সব ছাড়াও তখনকার দিনে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ঘটত নানারকম বিচিত্র ঘটনা, তার মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে।

হয়ত কলকাতায় এসে পড়েছেন ভারতের বা বিদেশের কোন খ্যাতনামা পুরুষ, তাঁরাও জোড়াসাঁকোর আকর্ষণে পড়ে চলে আসতেন। এইভাবে ইংলণ্ডের বিখ্যাত শিল্পী উইলিয়াম রথেনস্টাইন এসে পড়েছিলেন গগনেন্দ্রনাথের আর অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখতে। তখনকার দিনের বাংলাদেশের সাহেব-গভর্ণর দাদামশায়দের বন্ধু এবং তাঁদের ছবির ভক্ত ছিলেন। তিনিই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রথেনস্টাইনকে। রথেনস্টাইন আসছেন শুনে গগনেন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথ পাশের বাড়ি থেকে রবীন্দ্রনাথকে ধরে নিয়ে এলেন, সকলে মিলে একসঙ্গে গল্প-কথা যাবে এই ভেবে। আলাপ হল কত্তাবাবার সঙ্গে রথেনস্টাইনের। খুব আলাপ জমল। রথেনস্টাইন যখন শুনলেন রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের একজন প্রধান কবি, তিনি দুঃখ করে বললেন—আমি তো বাংলা জানি না যে ওঁর লেখা পড়ব? লেখা পড়তে না পারলেও মনের মিল হল দুজনের খুবই। সেই থেকে দুজনে চিঠি লেখালিখিও চলত। সে সময় রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতাই ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়নি। তখনকার দিনে বাংলা কবিতাই বা পড়ত কজন? কত্তাবাবার কবিতার একদল অনুরাগী ভক্ত থাকলেও বহু বিরুদ্ধ সমালোচক ছিলেন যাঁরা বলতেন—

www.BanglaBook.org

রবীন্দ্রনাথ কবিনামের যোগ্যই নন।

রথেনস্টাইন চলে যেতে রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিতা নিজেই ইংরেজিতে তর্জমা করতে শুরু করে দেন। এর কিছু দিন পরেই কত্তাবাবার বিলেতে আর আমেরিকায় যাবার কথা ওঠে। গীতাঞ্জলির শ'খানেক কবিতা ইংরেজিতে লেখা হয়ে গেল। সেগুলি নিয়ে কত্তাবাবা বিলেতের পথে বেরিয়ে পড়লেন। লন্ডনে গিয়ে দুই বন্ধুর দেখা হল অনেকদিন পরে। কত্তাবাবা রথেনস্টাইনকে সেই একশোটি কবিতার একটি খাতা উপহার দিলেন। রথেনস্টাইন পড়ে মুগ্ধ হয়ে তখনকার দিনের ইংলন্ডের প্রধান কবি ইয়েট্‌স্‌কে দিলেন খাতাটি পড়তে। পড়ে ইয়েট্‌স্‌-এর মনে হল অমন কবিতা কোনদিন চোখে দেখেননি। তিনি লন্ডনবাসী কবি-সাহিত্যিক-সমালোচকদের একটি সভা ডেকে রবীন্দ্রনাথকে কবিতাগুলি পড়ে শোনাতে অনুরোধ করলেন। সেই কবিতা পাঠের ফলে লন্ডনের সুধীসমাজে যে চাঞ্চল্য হয়, তারই ফলে গীতাঞ্জলির অনুবাদ ছাপা হয়ে বেরল। তারই ফলে ঘটল কত্তাবাবার কপালে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি।

কত্তাবাবা জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রয়েছেন, হঠাৎ একদিন শুনলুম গান্ধী আসছেন। সে কি কান্ড! ফিস্‌ফাস্‌ করে কথা কইতে লাগলেন সবাই। কী গোপন পরামর্শ হবে কত্তাবাবার সঙ্গে গান্ধীর, কেউ জানে না। হয়ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই এবার উল্টে যাবে। কলকাতায় সে সময় কংগ্রেসের এক অধিবেশন হচ্ছে। সেই উপলক্ষে এসেছেন মহাত্মা গান্ধী। অসহযোগ আন্দোলন আর বিলিতি জিনিস বর্জন পুরোদমে চলেছে তখন। আমাদের বলে দেওয়া হল আমরা যেন গোলমাল না করি, উঁকিঝুঁকি একেবারেই না দিই। কিন্তু অদম্য কৌতূহল আমরা চাপব কি করে? এন্ডরুজ সাহেবের সঙ্গে যখন মহাত্মা গান্ধী এসে দোতলার ফালি ঘরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মেঝের উপর আসন নিলেন, তখন সকলের চোখ এড়িয়ে পিছনের বারান্দায় বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে আমরা কয়েকটি শিশু প্রাণ-পণে দেখবার এবং শোনবার চেষ্টা করতে লাগলুম ভিতরে কিসের মন্ত্রণা চলেছে। কিন্তু কিছুই বোধগম্য হল না। দেখলুম চৌকাঠের উপর একটু দূরে বসে দাদামশায় অবনীন্দ্রনাথ একটুকরো কাগজে তিনজনের ছবি আঁকছেন। এইটিই দাদা-মশায়ের আঁকা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও এন্ডরুজ-এর বিখ্যাত চিত্র—শান্তিনিকেতনের কলাভবনে রক্ষিত আছে। মহাত্মা গান্ধীর বয়স তখন বেশি হয়নি—মাথায় গান্ধীটুপি পরতেন। কাউকে খবর না-দিয়েই চুপি-চুপি এসেছিলেন জোড়াসাঁকোতে। প্রথমটা কেউ জানতে পারেনি, কিন্তু হঠাৎ কেমন করে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ভিড় জমে গেল পাঁচ-নম্বর আর ছ-নম্বর বাড়ির মাঝখানের রাস্তাটুকুতে। ক্রমে মানুষের মাথা বাড়তে বাড়তে আমাদের ফটক পেরিয়ে গেল। শেষে জনতা আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল—গান্ধী মহারাজ কি জয়!

গান্ধী তখন ঘর থেকে উঠে এসে পশ্চিমের বারান্দায় হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। গান্ধীর সামনে আমাদের বাড়ির রাস্তার উপর বিলিতি কাপড় পোড়ানো হল। আরো জোরে সমবেত কণ্ঠে গান্ধীর জয়ধ্বনি উঠল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি ভরে গেল এই শব্দে। গান্ধী আবার হাত জোড় করে সকলকে নমস্কার জানালেন, তখন ক্রমে ক্রমে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। কিন্তু কত্তাবাবার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর চার ঘণ্টা ধরে কি যে বিচার-বিতর্ক হল আজ অবধি কেউ তা জানতে পারেনি।

১৩৬৮

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সদাশিবের ঘোড়া-ঘোড়া কাণ্ড

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

সদাশিব কুঙ্কুকে নিয়ে গ্রাম থেকে পালিয়ে এসেছিল এবং কুঙ্কুকে জিজাবাঈ-এর হাতে সঁপে দিয়েছিল, সে কাহিনী আগে বলেছি। সদাশিবের মাথায় বুদ্ধি ছিল অনেক, কিন্তু অহংকার এক ফোঁটা ছিল না ; নিজের চেয়ে পরের কথাই সে বেশি ভাবত। তার নিজের যে কোনো যোগ্যতা আছে এ কথা তার মনেই আসত না। তাই শিবাজি থেকে আরম্ভ করে সবাই তাকে এত ভালবাসতেন।

ওদিকে শিবাজি চাকন দুর্গ দখল করেছেন বটে, কিন্তু সে কতটুকু ? সারা মহারাষ্ট্র দেশে অসংখ্য দুর্গ আছে ; প্রত্যেক দুর্গের মালিক স্বাধীনভাবে থাকেন। কেউ বা বিজাপুর রাজ্যের অধীনে থেকে দুর্গ রক্ষা করেন। শিবাজির উদ্দেশ্য মহারাষ্ট্র দেশে যত দুর্গ আছে সব নিজের দখলে এনে, একচ্ছত্র রাজ্য স্থাপন করবেন ; সমস্ত মারাঠা জাতি এক হবে, স্বাধীন হবে। বাইরের শত্রুর উপদ্রব থেকে মুক্ত হবে। কিন্তু এ কাজ তো সোজা কাজ নয়, একদিনের কাজও নয়। শিবাজি কখনো ছল-চাতুরি দ্বারা, কখনো লড়াই করে একটির পর একটি দুর্গ অধিকার করছেন। কিন্তু এখনো অনেক দুর্গ বাকি।

বলা বাহুল্য সদাশিব সর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছে। এতদিন সে একটু মনমরা হয়ে ছিল, কারণ তার গোঁফ ছিল না ; যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করতে গিয়ে যদি গোঁফ না থাকে সে বড় লজ্জার কথা। কিন্তু এখন তার প্রাণে আর দুঃখ নেই, তার নাকের নীচে কুরকুরে এক জোড়া গোঁফ গজিয়েছে। কেউ আর তাকে ছেলেমানুষ বলে অবজ্ঞা করে না, সে এখন জোয়ান মর্দ, জঙ্গী বাহাদুর।

কিন্তু সম্প্রতি মহারাষ্ট্র দেশে এক মহা দুর্যোগ উপস্থিত হয়েছে : ঘোড়ার মড়ক এসে দেশের প্রায় অর্ধেক ঘোড়া শেষ করে দিয়ে গেছে। অথচ ঘোড়া না হলে যুদ্ধ হয় না, পাহাড়ী দেশে এখান থেকে ওখানে যাওয়া যায় না। শিবাজি ভারি মুশকিলে পড়েছেন। তাঁর নিজের এবং অধীন সৈন্যদের মিলিয়ে আন্দাজ পাঁচ হাজার ঘোড়া ছিল, তার অধিকাংশ মড়কে মারা গেছে। এখন তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন কি করে ? ভরসা শুধু এই যে শত্রুদেরও ঘোড়া মরেছে ; কেউ আর এগিয়ে এসে যুদ্ধ করতে পারছে না। সবাই প্রাণপণে ঘোড়া সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঘোড়া কোথায় ? বিদেশ থেকে যে-সব ঘোড়ার সওদাগর ঘোড়া বিক্রি করতে আসত তারা মড়কের ভয়ে আর আসে না।

সারা মহারাষ্ট্র দেশে কেবল একটি লোকের কাছে ঘোড়া আছে, তিনি হচ্ছেন চন্দ্রগড় দুর্গের অধিপতি বলবন্ত রাও। চন্দ্রগড় দুর্গ পুনা থেকে বেশি দূরে নয়, ঘোড়ার পিঠে এক-বেলার রাস্তা। কিন্তু পথ বড় দুর্গম, জঙ্গলে গিরিসঙ্কটের গোলকধাঁধার মধ্যে নিরালা দুর্গটি চুপচাপ বসে আছে। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ কম বলেই বোধহয় চন্দ্রগড় দুর্গে ঘোড়া-মড়কের ছোঁয়াচ লাগেনি। বলবন্ত রাও-এর দু' হাজার ঘোড়া সব জ্যান্ত আছে।

বলবন্ত রাও-এর অনেক বয়স হয়েছে ; লোকটি যেমন ধূর্ত তেমনি কৃপণ। তিনি দূর সম্পর্কে শিবাজির মামা হন। শোনা যায়, ছ-সাত বছর আগে তিনি একবার ভগিনী জিজা-বাঈ-এর সঙ্গে দেখা করতে পুনায় এসেছিলেন। শিবাজির তখন কিশোর বয়স, কিন্তু বলবন্ত রাও তাঁকে দেখেশুনে বুঝলেন, এ ছেলে সামান্য নয় ; একদিন এ ছেলে সমস্ত মহারাষ্ট্র দেশ নিজের কবলে আনবে। তিনি মধুর হেসে বললেন, 'বাবা শিব, তোমার কপালে রাজতিলক দেখতে পাচ্ছি। আশীর্বাদ করি তুমি দিগ্‌বিজয়ী হও।'

শিবাজি চুপ করে রইলেন। বলবন্ত রাও তখন তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তুমি আমার বোন জিজার ছেলে, আমার

www.BanglaBook.org

পরমাত্মীয়। দেখো বাবা, তুমি যেন বড় হয়ে আমার দুর্গের পানে নজর দিও না!'

শিবাজি সবিনয়ে বললেন, 'না না, সে কী কথা!'

জিজাবাঈ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, বলবন্ত রাও তাঁর পায়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'তাহলে মায়ের পা ছুঁয়ে দিব্যি করো।'

শিবাজি নিরুপায় হয়ে মায়ের পা ছুঁয়ে শপথ করলেন যে তিনি কোনো দিন ছলে বলে কৌশলে চন্দ্রগড় দুর্গ দখল করবার চেষ্টা করবেন না। বলবন্ত রাও খুশী হয়ে নিজের দুর্গে ফিরে গেলেন।

এই তো গেল আগের কথা! বর্তমানে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, বলবন্ত রাও নিজের দুর্গে দু' হাজার ঘোড়া নিয়ে বসে আছেন। তাঁর দুর্গে যত সৈন্য আছে ঘোড়া তার চারগুণ। বলবন্ত রাও মনের আনন্দে ঘোড়া বিক্রি করছেন ; মড়কের পর তিনি ঘোড়ার দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন—একটা ঘোড়ার দাম দশ আসরফি, ইচ্ছে হয় কেনো না হয় কিনো না।

গরজ বড় বালাই। যাদের গরজ বেশি তারা দু-চারটে ঘোড়া কিনছে, কিন্তু এত দাম দিয়ে বেশি ঘোড়া কেনার ক্ষমতা ক'জনের আছে? শিবাজি একবার বলবন্ত রাও-এর কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু বলবন্ত রাও অটল। নিজের ভাগনের প্রতি তিনি তো আর পক্ষপাত দেখাতে পারেন না, লোকে বলবে কী! যে ঘোড়া কিনতে চায় তাকেই দশ আসরফি দিতে হবে, এক কানা কড়ি কম হবে না।

শিবাজি ভারি প্যাঁচে পড়ে গিয়েছেন। মায়ের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারেন না। দুর্গটা ইচ্ছে করলেই তিনি জয় করতে পারেন, কিন্তু চন্দ্রগড় দুর্গের প্রতি তাঁর লোভ নেই। তাঁর চাই ঘোড়া। তিনি মনে মনে নানা রকম ফন্দি আঁটছেন, কী করে বলবন্ত রাও-এর ঘোড়াগুলো হস্তগত করা যায়, অথচ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ না হয়। বলবন্ত রাও কেবল নামেই শিবাজির মামা, কাজের বেলা কেউ নয়। বুড়োকে জব্দ করতে না পারলে জীবনই বৃথা।

এই সব নানা চিন্তায় মগ্ন হয়ে শিবাজি একদিন বিকেল-বেলা প্রাসাদের ছাদে উঠলেন। ছাদে কুঙ্কু আর জিজাবাঈ ছিলেন, কুঙ্কু জিজাবাঈ-এর চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল। শিবাজিকে দেখে জিজাবাঈ ভুরু তুলে চাইলেন—'কী রে?'

শিবাজি বললেন, 'কিছু নয় মা, ছাদে একটু বেড়াতে এলাম।'

জিজাবাঈ আর কিছু বললেন না ; শিবাজি চিন্তিত মুখে ছাদে পায়চারি করতে লাগলেন। ছাদের কিনারা থেকে পুনার ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে, দূরে মুথা নদী দেখা যাচ্ছে কিন্তু সেদিকে শিবাজির দৃষ্টি নেই, তাঁর মন চিন্তায় মগ্ন।

ওদিকে জিজাবাঈ কুঙ্কুর সঙ্গে গল্প করছেন। দু-একটা কথা শিবাজির কানে যাচ্ছে, কিন্তু তাঁর মন অন্য দিকে ; তিনি ভাবছেন কোন্ উপায়ে মামা বলবন্ত রাও-এর ঘোড়াগুলো হস্তগত করা যায়। ভাবতে ভাবতে তিনি এক সময় জিজাবাঈ-এর কয়েকটা কথা শুনতে পেলেন, শুনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। জিজাবাঈ বলছেন, '...সামনের পূর্ণিমা তিথিতে আমার ব্রত উদ্‌যাপন ; ব্রাহ্মণভোজন করাতে হবে...জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের নেমন্তন্ন করতে পারলে ভাল হত, কিন্তু পুনায় জ্ঞাতিগোষ্ঠী ক'জনই বা আছে...'

শিবাজি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর নিঃশব্দে ছাদ থেকে নেমে গেলেন।

সিঁড়ির নীচে সদাশিব দাঁড়িয়ে ছিল, শিবাজি তাকে বললেন, 'দেখ্ তো তানাজি কোথায়। তাকে ডেকে নিয়ে আয়, পরামর্শ আছে।'

শিবাজি গুপ্ত মন্ত্রণাকক্ষে গিয়ে বসলেন। ছোট ঘর, মেঝের ওপর জাজিম পাতা, কয়েকটা মোটা তাকিয়া ছড়ানো রয়েছে। শিবাজি একটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আপন মনে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। চমৎকার বুদ্ধি মাথায় এসেছে!

কিছুক্ষণ পরে তানাজিকে নিয়ে সদাশিব এল। তখন তিন-জনে মুখোমুখি বসে মন্ত্রণা আরম্ভ করলেন। শিবাজি দু-চার কথায় তাঁর মতলব খুলে বললেন, 'আগামী পূর্ণিমার দিন মায়ের ব্রত উদ্‌যাপন হবে। মায়ের ভারি দুঃখ জ্ঞাতিগোষ্ঠী বেশি পুনায় নেই ; তা আমি ঠিক করেছি চন্দ্রগড় দুর্গে লোক পাঠিয়ে মামা বলবন্ত রাওকে নেমন্তন্ন করব, দুর্গের সবাইকে নেমন্তন্ন করব। তারা অন্তত তিন-চারশো লোক আসবে ; ঘোড়ায় চড়ে আসবে। তার মানে তিন-চারশো ঘোড়া। বুঝেছ? ওরা দুপুরবেলা এসে পৌঁছুবে, সারা দিন খাওয়া-দাওয়া হৈ-হল্লা চলবে। সে রাত্রে ওরা ফিরে যেতে পারবে না, এখানেই রাত কাটাতে হবে। পরদিন সকালবেলা বলবন্ত রাও ঘুম থেকে উঠে দেখবেন সব ঘোড়া চুরি হয়ে গেছে। —কেমন?'

তানাজি মহানন্দে হাঁটু চাপড়ে বললেন, 'বাহবা! খাসা বুদ্ধি বার করেছ। যদি তিন-চারশো ঘোড়া পাওয়া যায় তাই বা মন্দ কী।—তা, কাকে নেমন্তন্ন করতে পাঠাচ্ছ?'

শিবাজি বললেন, 'সদাশিবকে। সঙ্গে পুরুতমশাই যাবেন।'

॥ ২ ॥

শিবাজি জিজাবাঈকে বললেন, 'মা, এবার খুব ঘটা করে তোমার ব্রত উদ্‌যাপন হবে।

মা খুশী হলেন, বললেন, 'বেশ তো, তুই যা করবি তাই হবে।'

শিবাজি বললেন, 'চন্দ্রগড় দুর্গের সবাইকে নেমন্তন্ন করব। হাজার হোক বলবন্ত রাও তোমার দাদা। আমার মামা। তাঁকে এবং তাঁর দুর্গের লোকদের নেমন্তন্ন না করলে ভাল দেখায় না।'

জিজাবাঈ মনে মনে হাসলেন, বললেন, 'তা ভাল। কিন্তু দাদার দুর্গের পানে যেন নজর দিস নে, পা ছুঁয়ে দিব্যি করেছিস।'

শিবাজি জিভ কেটে বললেন, 'ছি ছি, সে কী কথা!'

দুপুর রাত্রে সদাশিব গোরুর গাড়িতে চড়ে যাত্রা করল। তার সঙ্গে বৃদ্ধ পুরোহিত রামদেও এবং একা বস্তা সুপুরি। লোককে নেমন্তন্ন করার সময় তার হাতে সুপুরি দিতে হয়।

শুক্লা দশমীর রাত্রি, আকাশে চাঁদ আছে। সদাশিব নিজেই গোরুর গাড়ি হাঁকিয়ে চলল। ঘোড়ায় না গিয়ে গোরুর গাড়িতে যাওয়ার কারণ, প্রথমত, সঙ্গে বৃদ্ধ রামদেও আছেন। মহারাষ্ট্র দেশে যদিও সকলেই ঘোড়ায় চড়তে জানে, তবু পুরোহিত মশায়ের বয়স হয়েছে। এতদূর রাস্তা ঘোড়ার পিঠে যেতে তাঁর কষ্ট হবে। দ্বিতীয়ত, মাত্র দুজন লোকের পক্ষে ঘোড়ায় চড়ে বাইরে যাওয়া নিরাপদ নয় ; আজকাল চারিদিকে রাহা-

www.BanglaBook.org

জানের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, সুবিধে পেলেই অসহায় পথিকের ঘোড়া কেড়ে নিচ্ছে। মহারাষ্ট্র দেশে ঘোড়া সবচেয়ে দুর্মূল্য বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সারা রাত সদাশিব উঁচুনীচু পাথুরে পথ দিয়ে গোরুর গাড়ি চালাল ; রামদেও গাড়িতে শুয়ে নিদ্রা দিলেন। রাত্রি শেষ হবার আগেই চাঁদ অস্ত গেল। সদাশিব তখন গাড়ি দাঁড় করাল। তারপর ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার চলল।

তারা যখন চন্দ্রগড় দুর্গের সামনে উপস্থিত হল তখন বেলা প্রথম প্রহর পার হয়ে গেছে।

চন্দ্রগড় দুর্গটি খুব পুরনো, বোধ হয় তিন-চার শো বছর আগে তৈরি হয়েছিল। মস্ত বড় দুর্গ, বড় বড় পাথরের বিশ হাত উঁচু প্রাকার দিয়ে ঘেরা। বলবন্ত রাও দুর্গটিকে অটুট রেখেছেন, সর্বদা তার দেখাশোনা করেন, কোথাও প্রাকারের পাথর খসে গেলে তৎক্ষণাৎ মেরামত করান। তবু প্রাকারের পাথরের খাঁজে খাঁজে গাছ গজিয়েছে ; প্রাচীনতার চিহ্ন দুর্গটির গায়ে ছাপ মারা রয়েছে। সদাশিব দেখেশুনে নিজের মনে মন্তব্য করল—'শিবাজির পক্ষে এ দুর্গ দখল করা মোটেই শক্ত নয়। কিন্তু রাজা যে মায়ের পা ছুঁয়ে দিব্যি করেছেন—' সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল।

দুর্গের তোরণ-দ্বার খোলা ছিল। সদাশিবের গোরুর গাড়ি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিন-চারজন লশকর বেরিয়ে এল, একজন জিগ্যেস করল, 'কী চাই ?'

রামদেও গাড়ি থেকে নামলেন, সদাশিব সুপুরির বস্তা নিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়াল। রামদেও বললেন, 'আমরা পুনা থেকে আসছি। আমি শিবাজির কুলপুরোহিত। কিল্লাদার বলবন্ত রাও-এর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

শিবাজির নাম এখন সকলেই জানে, লশকরদের চোখে সম্ভ্রম ফুটে উঠল। একজন বলল, 'একটু দাঁড়ান, রাওকে খবর দিচ্ছি।'

লশকর দুর্গের ভিতর চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, 'আসতে আজ্ঞা হোক।'

রামদেও এবং সদাশিবকে নিয়ে লশকরেরা দুর্গে প্রবেশ করল।

দুর্গের একটি চাতালের ওপর গদি পাতা, তার ওপর বলবন্ত রাও বসে আছেন। কয়েকজন অনুচর তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ; একজন তালপাতার প্রকাণ্ড পাখা দিয়ে বাতাস করছে। বলবন্ত রাও-এর মুখখানি তাল-তোবড়া বেগুন-পোড়া গোছের ; মাথার চুল কামানো। কিন্তু চোখ দুটি ভারি তীক্ষ্ণ। তিনি সন্দেহভরা চোখে রামদেও-এর পানে চাইলেন।

রামদেও হাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ জানালেন, তারপর সদাশিবের ঝোলা থেকে পাঁচটি সুপুরি নিয়ে বলবন্ত রাও-এর সামনে রাখলেন, বললেন, 'আগামী পূর্ণিমা তিথিতে জিজা-বাঈ-এর ব্রত উদ্‌যাপন হবে। আপনি তাঁর পরমাত্মীয় ; তাই তিনি আপনাকে এবং আপনার দুর্গের সকলকে নিমন্ত্রণ করেছেন। পূর্ণিমার দিন আপনারা সকলে পুনায় গিয়ে তাঁর ব্রত উদ্‌যাপনে অন্ন গ্রহণ করলে তিনি কৃতার্থ হবেন।'

বলবন্ত রাও-এর পাশে গদির ওপর তাঁর বাঁধা-পাগড়ি রাখা ছিল, তিনি সেটি মাথায় পরে নিয়ে সুপুরিগুলি তুলে নিলেন ; মাথায় পাগড়ি না পরে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা নিয়ম নয়। রামদেও-এর পানে একটু হেসে বললেন, 'আসন গ্রহণ করুন।'

রামদেও গদির পাশে বসলেন। সদাশিব সুপুরির ঝোলা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান, তাকে কেউ

www.BanglaBook.org

বসতে বলল না।

বলবন্ত রাও মুখে মেকি হাসি এবং চোখে সন্দেহ নিয়ে রামদেওকে নানা প্রশ্ন করলেন। প্রথমে কুশল প্রশ্ন, তারপর নানা কথা। কিসের ব্রত, অন্য কে কে নিমন্ত্রিত হয়েছে, এই সব। রামদেও সরল ব্রাহ্মণ, ভিতরের কথা কিছু জানতেন না, তিনি সরলভাবে উত্তর দিলেন। শেষে বলবন্ত রাও বললেন, 'বেশ বেশ, শিব্বা মায়ের ব্রত উপলক্ষে খুব ঘটা করছে দেখছি।'

রামদেও বললেন, 'জানেন তো শিবাজি কী রকম মাতৃভক্ত ছেলে। মায়ের ব্রত উদ্‌যাপনে সে ঘটা করবে না তো কে করবে!'

'তা বটে—তা বটে।' বলবন্ত রাও একটু ইতস্তত করে বললেন, 'খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কী রকম হয়েছে?'

রামদেও লম্বা ফিরিস্তি দিলেন: আম্বা মোর চালের ভাত; আমটি সম্বর কোশাম্বি, পুরণপুরী লাড্ডু পেঁড়া জিলিপি, দই দুধ-পাক দহি বড়া, আরো কত কী! বলবন্ত রাও কিপটে মানুষ, নিজের মাতৃশ্রাদ্ধে পাঁচজন ব্রাহ্মণ খাইয়েছিলেন, ফিরিস্তি শুনে তিনি প্রকাণ্ড হাঁ করলেন, 'এত খরচ করবে শিবাজি মায়ের ব্রত উদ্‌যাপনে! আমার দুর্গেই তো পাঁচশো জোয়ান আছে, সবাইকে এত খাওয়াবে?'

রামদেও হেসে বললেন, 'তা খাওয়াবে বৈকি। এ তো আর সামান্য ব্যাপার নয়, মায়ের ব্রত উদ্‌যাপন।'

ইতিমধ্যে দুর্গের অনেক লোক এসে চারিদিক থেকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল; ভোজের ফিরিস্তি শুনে তাদের জিভে জল এল। তারা সাধারণ সৈনিক, তাদের সৈনিক রসদ জোয়ারের রুটি আর ধনে-পাতার চাটনি; এর বেশি তাদের ভাগ্যে বড় একটা জোটে না। শিবাজি তাদের নেমন্তন্ন করেছেন এবং রকমারি অন্নব্যঞ্জন দধি দুগ্ধ মিষ্টান্ন খাওয়াবেন জেনে তারা উল্লসিত হয়ে উঠল।

রামদেও বললেন, 'তাহলে আমি সকলকে নিমন্ত্রণ করি?'

'করুন।' বলবন্ত রাও হাসিমুখে কথা বললেন বটে কিন্তু তাঁর মনটা সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে রইল। শিবাজি অবশ্য শপথ-ভঙ্গ করবে না, কিন্তু তার মতলবটা কী? নিশ্চয় অন্য কোনো মতলব আছে। নইলে এত লোককে কেউ কখনো নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়!

রামদেও উঠলেন, চারদিকে ঘুরে ঘুরে সকলের হাতে সুপুরি দিয়ে নেমন্তন্ন করলেন। দুর্গের ভিতরটা ছোটখাটো একটি শহরের মতন; রাস্তা আছে, বাজার আছে, পুকুর আছে। দুর্গের উত্তর দিকে ঘোড়াশালা, তার পাশে গোশালা। রামদেও যেমন ঘুরে ঘুরে নেমন্তন্ন করছেন, সদাশিবও সুপুরির ঝোলা নিয়ে সঙ্গে আছে। সদাশিব বোকার মতন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, যেন এমন দৃশ্য সে আগে কখনো দেখেনি। তার দিকে কারুর দৃষ্টি নেই, কিন্তু সে সবকিছু দেখে নিচ্ছে।

নিমন্ত্রণ সারা হতে বেলা দুপুর কেটে গেল। অপরাহ্নে রামদেও বলবন্ত রাওকে বললেন, 'আমার কাজ শেষ হয়েছে, আমি তাহলে বিদায় নিই। জিজাবাঈকে জানাব যে পূর্ণিমার দিন মধ্যাহ্নে আপনি সদলবলে পুনায় উপস্থিত হবেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় নিশ্চয়।'

গোরুর গাড়ি চলে যাবার পর বলবন্ত রাও গদির ওপর বসে অনেকক্ষণ আপন মনে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। হাজার হোক তিনি শিবাজির মামা, বাঁশের চেয়ে কি কঞ্চি দড় হয়? শিবাজির মতলব তিনি বুঝে নিয়েছেন।

॥ ৩ ॥

শুক্লা একাদশীর রাত্রি তিন প্রহরে, চাঁদ তখন অস্ত যাচ্ছে, সদাশিবের গোরুর গাড়ি পুনায় ফিরে এল। শিবাজি তাদের জন্যে রাত জেগে বসে ছিলেন, রামদেওকে বললেন, 'আপনি বুড়ো মানুষ, ক্লান্ত হয়েছেন। শুয়ে পড়ুন গিয়ে।'

তিনি চলে গেলেন। শিবাজি তখন সদাশিবকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রণাকক্ষে গিয়ে বসলেন, প্রদীপের আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর নিলেন। তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'জয় ভবানী। লক্ষণ ভালই মনে হচ্ছে।—কিন্তু তুই দু-রাত্রি জেগে গোরুর গাড়ি চালিয়েছিস, যা, লম্বা এক-ঘুম ঘুমিয়ে নে। কাল থেকে ভোজের আয়োজন শুরু করতে হবে। মাঝে মাত্র তিনটি দিন বাকি।'

পরদিন সকাল থেকে কাজের ধুম পড়ে গেল। শিবাজি এবং তাঁর আশেপাশে যাঁরা আছেন সকলেই নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পুনরায় যত গণ্যমান্য লোক আছেন সকলকে নিমন্ত্রণ করতে হবে; শিবাজির প্রায় পাঁচ হাজার সিপাহী পুনায় উপস্থিত আছে, তারাও খাবে; তাছাড়া চন্দ্রগড় দুর্গের পাঁচশো লোক। সব মিলিয়ে দশ হাজার আসবে। প্রকাণ্ড প্রাসাদের প্রকাণ্ড রসুইঘরে ভিয়েন বসে গেল। মা জিজাবাঈ-এর আনন্দের আর সীমা নেই, তিনি চারদিকে কাজকর্ম তদারক করে বেড়াচ্ছেন। কুঙ্কু সর্বদা তাঁর সঙ্গে আছে।

শিবাজির মনে অন্য চিন্তাও আছে। উৎসবের সময় শত্রুরা সুযোগ পায়; শিবাজির শত্রুর অভাব নেই। তাই তিনি চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। শিবাজির বন্ধু যেসাজির অধীনে কয়েক দল লশকর পুনার চারিধারে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে; তাছাড়া গুপ্তচরের দল চুপি চুপি সুলুকসন্ধান নিচ্ছে। শত্রু যে আচমকা আক্রমণ করবে তার উপায় নেই।

এইভাবে তিন দিন কেটে গেল, পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত। উদ্যোগ-আয়োজন সব শেষ হয়েছে, এখন অতিথিরা এলেই হয়। বিশেষত শিবাজির মন পড়ে আছে চন্দ্রগড়ের অতিথিদের দিকে। তারা ঘোড়ায় চড়ে কখন আসবে!

বেলা প্রথম প্রহর পার হবার পর পুনার অতিথিরা আসতে আরম্ভ করলেন। নাড়া মাথায় বাঁধা-পাগড়ি-পরা ব্রাহ্মণ, কোমরে তলোয়ার বাঁধা মারাঠা। সবাই সভামণ্ডপে গিয়ে বসলেন; আতর গোলাপ মাখলেন। সভা গমগম করতে লাগল।

শিবাজি এবং তাঁর বন্ধুরা অতিথিদের অভ্যর্থনা করছেন, সকলের সঙ্গে মিষ্টালাপ করছেন। শিবাজি সদাশিবকে ছাদে পাঠিয়ে দিয়েছেন; যেদিক থেকে চন্দ্রগড়ের অতিথিরা আসবে সদাশিব সেইদিকে চোখ মেলে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের আসতে দেখলেই শিবাজিকে গিয়ে খবর দেবে। শিবাজিও একটু ফুরসত পেলে ছাদে গিয়ে দেখে আসছেন। কিন্তু চন্দ্রগড় দুর্গের অতিথিদের এখনো দেখা নেই।

বেলা বাড়ছে। একদল ব্রাহ্মণ মহোদয় ভোজনে বসলেন। চর্ব্য-চুষ্য এত খেলেন যে নড়বার ক্ষমতা নেই; কোনোমতে আসন থেকে উঠে ঢেকুর তুলতে তুলতে দক্ষিণা নিয়ে প্রস্থান করলেন। তারপর অব্রাহ্মণের দল বসলেন। এঁরাও কম নন। প্রচণ্ড বেগে চর্ব্য-চুষ্য চলতে লাগল।

www.BanglaBook.org

কিন্তু শিবাজির মন ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে। বেলা দুপুর অতীত হয়ে গেছে, এখনো মামা আসে না কেন? সূর্যোদয়ের সময় ঘোড়ায় চড়ে বেরুলে অনেক আগেই পৌঁছুনোর কথা। তবে কি মামা আসবে না? যদি না আসে তাহলে এত উদ্যোগ-আয়োজন সব মাটি।

আরো এক-ঘড়ি কেটে গেল। শিবাজি অতিথি-ভোজনের দেখাশোনা করছেন আর মনে মনে ছটফট করছেন এমন সময় দেখতে পেলেন সদাশিব সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে নেমে আসছে। দূর থেকে চোখাচোখি হতেই সদাশিব দাঁড়িয়ে পড়ল। শিবাজি দেখলেন সদাশিবের চোখ গোল-গোল হয়ে আছে, মুখে হাসি নেই। তিনি ভুরু তুলে নীরবে প্রশ্ন করলেন, সদাশিব ঘাড় নেড়ে নীরবে উত্তর দিল; কিন্তু তার চোখ গোল হয়ে রইল, মুখে হাসি ফুটল না। শিবাজি তখন অতিথিদের এড়িয়ে তার কাছে গেলেন, খাটো গলায় বললেন, 'কী রে!'

সদাশিব চুপি চুপি বলল, 'ওরা আসছে, কিন্তু—'

'কিন্তু কী—?'

সদাশিব বলল, 'তুমি নিজের চোখে দেখবে এসো রাজা।'

শিবাজি সদাশিবের সঙ্গে ছাদে গেলেন। ছাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে কংরজ্ ঘাটের দিকে তাকিয়ে তাঁর চক্ষুস্থির। মামা বলবন্ত রাও দলবল নিয়ে নেমন্তন্ন খেতে আসছেন বটে, কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে নয়। লম্বা এক সারি গোরুর গাড়ি আসছে, সব-সুদ্ধ বোধহয় একশোখানা গোরুর গাড়ি। তাইতে চেপে মামার দল নেমন্তন্ন খেতে আসছে।

শিবাজি হতাশ চোখে সদাশিবের পানে তাকালেন। সদাশিব বলল, 'রাজা, এখন উপায়?'

শিবাজি বললেন, 'উপায় কিছু নেই। সব ভেস্তে গেল!' তিনি ছাদ থেকে নেমে গেলেন।

সদাশিব একা দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। উঃ, কী সাংঘাতিক মামা! মতলব বুঝে নিয়েছে। কিন্তু—কোনো উপায় কি নেই? ঘোড়া যে আমাদের চাই! কোনো উপায় কি নেই?

প্রাসাদের সামনে গোরুর গাড়ির সারি এসে দাঁড়িয়েছে। শিবাজি মুখে হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথম গাড়ি থেকে বলবন্ত রাও নামলেন; শিবাজি তাঁর পদবন্দনা করলেন। বলবন্ত রাও দাঁত ছিরকুটে হেসে বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবা। উদ্যোগ-আয়োজন তো ভালই করেছ, অনেক লোক নেমন্তন্ন করেছ দেখছি।'

শিবাজি বললেন, 'আজ্ঞে। আপনি সবাইকে এনেছেন তো?'

বলবন্ত রাও হাত উলটে বললেন, 'সবাইকে আনতে পারলাম কৈ। দুর্গ পাহারা দেবার জন্য একশো জোয়ানকে রেখে এসেছি।'

শিবাজি বললেন, 'দুর্গ পাহারার জন্যে এত লোক রেখে এলেন!'

বলবন্ত রাও বললেন, 'হেঁ হেঁ, তা রাখতে হয় বৈকি বাবাজি। তুমি না-হয় মায়ের পা ছুঁয়ে দিব্যি করেছ আমার দুর্গের পানে হাত বাড়াবে না, কিন্তু অন্য শত্রু তো আছে—হেঁ হেঁ হেঁ—'

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। শিবাজি হেসে বললেন, 'তা বটে।' তিনি মামাকে এবং তাঁর দলবলকে নিয়ে গিয়ে সভায় বসালেন; আদর আপ্যায়ন আতর গোলাপ চলতে লাগল। তারপর মামা অনুচরদের নিয়ে আহারে বসলেন। দীয়তাং ভুজ্যতাং আরম্ভ হল। শিবাজির মুখ দেখে কেউ ঘুণাক্ষরে তাঁর মনের অবস্থা জানতে পারল না।

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ল। চারিদিকে হৈ-হৈ চলেছে, কিন্তু সদাশিব সিঁড়ির ওপর গালে হাত দিয়ে ভাবছে। কাজকর্মের দিকে তার মন নেই; আসল কাজই যখন হল না তখন বাজে কাজ করে লাভ কী!

চুপটি করে বসে ভাবতে ভাবতে সদাশিব একবার চিড়িক মেরে উঠল, যেন তার মাথার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছে। কিছুক্ষণ সে শরীর শক্ত করে বসে রইল, তারপর পা টিপেটিপে নীচে নেমে গেল।

শিবাজির সঙ্গে তার দেখা হল মহলের একটা নিরিবিলি অংশে। সে আস্তে আস্তে বলল, 'রাজা, একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে।'

শিবাজি চকিতে তার পানে চাইলেন, তারপর তার হাত ধরে আবার ছাদে উঠে গেলেন।

ছাদ নির্জন। সদাশিব শিবাজিকে তার মতলবের কথা বলল। শুনে শিবাজির দুই চোখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করে উঠল। তিনি উত্তেজনা দমন করে বললেন, 'দুর্গে কিন্তু একশো রক্ষী আছে।'

সদাশিব বলল, 'রাজা, তুমি আমাকে বাছা বাছা পঞ্চাশটি মাওলা দাও, আমি পারব।'

শিবাজি সদাশিবের দুই কাঁধে হাত রেখে কম্পিত স্বরে

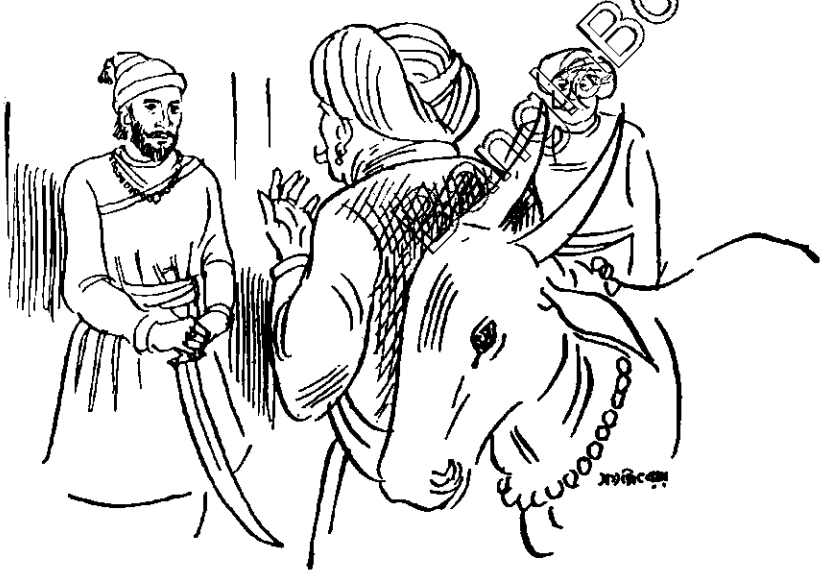

www.BanglaBook.org

বললেন, 'যদি পারিস সদাশিব, তাহলে—তাহলে কুঙ্কুর সঙ্গে তোর বিয়ে দেব।'

॥ ৪ ॥

সূর্যাস্ত হতে দেরি নেই। বলবন্ত রাও এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা এমন খাওয়া খেয়েছেন যে হাত-পা ঢিলে হয়ে গেছে, আজই গোরুর গাড়ি চড়ে দুর্গে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। বলবন্ত রাও ঠিক করলেন আজ রাত্রিটা পুনায় বিশ্রাম করে কাল ভোরে দুর্গে ফিরে যাবেন।

ওদিকে মহলের পিছন দিকে চুপি চুপি যে ব্যাপার ঘটছিল তা কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল না। সদাশিব ঘোড়ায় চড়ে রসুইয়ের বাইরে এসে দাঁড়াল, শিবাজি দুটি খাবার-ভরা ছালা ঘোড়ার পিঠের দুদিকে ঝুলিয়ে দিলেন। সদাশিব কদম চালে ঘোড়া চালিয়ে চলে গেল, যেন তার কোনই তাড়া নেই।

সদাশিব চলে যাবার পর আর একজন ঘোড়সওয়ার এল, শিবাজি তার ঘোড়ার পিঠেও দুটি খাবারের ছালা ঝুলিয়ে দিলেন, সে চলে গেল। তার পরে আর একজন এল। এইভাবে পঞ্চাশজন সওয়ার যখন খাবারের ছালা নিয়ে চলে গেল তখন সূর্য অস্ত গিয়েছে।

শিবাজির মহলের ছাদে দাঁড়িয়ে কেউ যদি কংরজ্ ঘাটের দিকে তাকিয়ে থাকত তাহলে দেখতে পেত অশ্বারোহীরা একে একে সেই রাস্তা ধরেছে। তাদের গন্তব্য স্থান চন্দ্রগড় দুর্গ।

পুব দিকে পাহাড়ের আড়াল ছাড়িয়ে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল। তখন পঞ্চাশজন ঘোড়সওয়ার 'জয় ভবানী' বলে এক সঙ্গে ঘোড়া চালাল। ঘোড়ার খুরের সমবেত খটাখট শব্দ পাহাড় থেকে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বেড়াতে লাগল।

দলের আগে আগে চলেছে সদাশিব। বয়স কম বটে, কিন্তু সেই এই দলের নায়ক। যে কাজ তারা করতে চলেছে তাতে বিপদ আছে, সাহস এবং বুদ্ধি দরকার। সদাশিব কাজের কথাই ভাবতে ভাবতে চলেছে, কিন্তু তার বুকের মধ্যে থেকে থেকে চমকে উঠছে শিবাজির কথা—'কুঙ্কুর সঙ্গে তোর বিয়ে দেব।'

আশ্চর্য মানুষ শিবাজি। সত্যি কি মানুষ, না অন্তর্যামী দেবতা। নিজের মনের যে কথাটি সদাশিব নিজেই জানত না, তিনি কেমন করে জানলেন?

চন্দ্রগড় দুর্গ থেকে দুশ গজ দূরে একটা টিলার আড়ালে সদাশিবের দল এসে দাঁড়াল। চাঁদ তখন মাথার ওপরে উঠেছে, জ্যোৎস্নায় চারদিক ঝিমঝিম করছে। দুর্গ থেকে মানুষের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, দুর্গটা নিষ্প্রাণ একটা স্তূপের মতন দাঁড়িয়ে আছে।

সদাশিব ঘোড়া থেকে নামল, অন্য সকলেও নামল। সদাশিব কয়েকজনের সঙ্গে চুপিচুপি পরামর্শ করল, তারপর হুকুম

www.BanglaBook.org

দিল, 'সব খাবারের ঝোলা দশটা ঘোড়ার পিঠে চাপাও।'

নিঃশব্দে কাজ হল ; সদাশিব আর দশজন সওয়ার ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল, তারপর দুর্গতোরণের দিকে অগ্রসর হল ; বাকি চল্লিশজন টিলার আড়ালে লুকিয়ে রইল।

দুর্গের তোরণদ্বার বন্ধ। সদাশিবের দল তোরণের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, সদাশিব মুখ উঁচু করে হাঁক দিল, 'হো ফাটক্‌দার হো!'

কিছুক্ষণ পরে তোরণের ডগার ওপর থেকে কয়েকটি মুণ্ডু উঁকি মারল, একজন ভারী গলায় বলল, 'কে তোমরা?'

সদাশিব বলল, 'আমরা শিবাজির লোক, পুনা থেকে আসছি।'

প্রশ্ন হল, 'কী চাও?'

সদাশিব বলল, 'বলবন্ত রাও পুনায় পৌঁছেছেন, কিন্তু নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একশো জন পুনায় যায়নি, তাই শিবাজি তাদের জন্যে খাবার পাঠিয়েছেন। আমরা খাবার এনেছি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর তোরণশীর্ষ থেকে আবার প্রশ্ন হল, 'তোমরা কজন?'

'এগারোজন। ফাটক খুলে দাও।'

মুণ্ডুগুলি অদৃশ্য হয়ে গেল। তোরণরক্ষীরা বোধহয় নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করছে। খানিক পরে আবার মুণ্ডুগুলি উঁকি মারল, আওয়াজ হল,—'তোরণ খোলবার হুকুম নেই। আমরা দড়ি ফেলছি, দড়িতে খাবার বেঁধে দাও।'

সদাশিব হেসে উঠল, 'এত ভয়! আচ্ছা, দড়ি ফেলো, খাবারের ছালা বেঁধে দিচ্ছি!'

কয়েকটি দড়ি তোরণের মাথা থেকে নেমে এল ; সদাশিবের দল খাবারের ছালাগুলি দড়িতে বেঁধে দিতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে ছালাগুলি দড়ির সাহায্যে দুর্গের মাথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

সদাশিব বলল, 'আচ্ছা, তাহলে চললাম। তোমরা তো দুর্গে ঢুকতে দিলে না, পুনায় ফিরে যাই।'

ওপর থেকে সাড়াশব্দ এল না। সদাশিব তার সঙ্গীদের নিয়ে ঘোড়ার খুরের আওয়াজে চারিদিকে প্রতিধ্বনি তুলে চলে গেল। দুর্গের রক্ষীরা শুনল অনেক দূরে গিয়ে খুরের শব্দ মিলিয়ে গেল। তারা জানতে পারল না যে সদাশিবের দল টিলার পিছনে গিয়ে বাকি চল্লিশজনের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

দলে ফিরে গিয়ে সদাশিব সকলকে নিজের কাছে ডাকল। সবাই ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। সদাশিব তখন সকলকে আসল কথা বলল ; কাকে কি করতে হবে, কী ভাবে কাজ করতে হবে, সব বুঝিয়ে দিল। চাঁদের আলোয় পঞ্চাশজন জোয়ানের চোখ উৎসাহে চকচক করে উঠল। জয় ভবানী! এই তো জীবন।

তারপর আরম্ভ হল দীর্ঘ প্রতীক্ষা। এখনো সময় হয়নি।

এক-ঘড়ি কেটে গেল। চারদিক নিস্তব্ধ, দুর্গ থেকে কোনো শব্দ আসছে না। কদাচিৎ নিশাচর পাখি মাথার ওপর দিয়ে চ্যাঁ-চ্যাঁ শব্দ করে উড়ে চলে যাচ্ছে। একবার একদল শেয়াল টিলার পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ অনেকগুলো মানুষকে বসে থাকতে দেখে ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া করে ছুটে পালাল।

দু-ঘড়ি কেটে গেল। চাঁদ দুর্গের পরপারে ঢলে পড়ল ; দুর্গের প্রকাণ্ড ছায়া সামনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

তারপর দুর্গের ছায়া যখন টিলার গায়ে এসে লাগল তখন সদাশিব উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে ইশারা করল। সবাই উঠে দাঁড়াল, ঘোড়ার পিঠ থেকে লম্বা দড়ি নিয়ে কোমরে জড়িয়ে নিল, তলোয়ার আঁট করে বাঁধল। সদাশিব বলল, 'আমি আগে যাচ্ছি, তোমরা একে একে আমার পিছনে এসো।'

একে একে তারা দুর্গের ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল ; কেবল ঘোড়াগুলো টিলার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। দুর্গচ্ছায়ার অন্ধকারে মানুষ দেখা যায় না, প্রাকারের ওপর থেকে যদি কেউ এদিকে তাকায় কিছুই দেখতে পাবে না।

সদাশিব কিন্তু তোরণের দিকে গেল না। উলটো দিকে চলল। সুপুরির বস্তা নিয়ে যেদিন নেমন্তন্ন করতে এসেছিল সেদিন সে দুর্গের অন্দর-বাহির সব ভাল করে দেখে নিয়েছে, প্রাকারের গায়ে কোথায় কী আছে সে জানে।

দুর্গ-প্রাকারের গা ঘেঁষে তারা চলল। প্রাকার চাকার মতন গোল, বিশ-বাইশ হাত উঁচু। সদাশিব আগে আগে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে ঘাড় তুলে দেখছে। এক জায়গায় এসে সে থামল।

পনেরো-ষোলো হাত উঁচুতে প্রাকারের গায়ে গাছ গজিয়েছে। বেশি বড় নয়। কিন্তু পাথরের খাঁজে শিকড় গেড়ে শক্তভাবে প্রাকারকে আঁকড়ে আছে।

সদাশিবের ঠিক পিছনে যে লোকটি ছিল তার নাম গজানন। সদাশিব ফিসফিস করে তার সঙ্গে কথা বলল ; গজানন নিজের কোমর থেকে দড়ি খুলে সদাশিবকে দিল। সদাশিব দড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওপর দিকে ছুঁড়ে দিল। দু-তিন বার ছোঁড়ার পর দড়ির আগা গাছের গায়ে আটকে গেল।

তখন ভবানীর নাম স্মরণ করে সদাশিব দড়ি ধরে ওপরে উঠে গেল। সে গাছের ওপর পৌঁছাতেই গজাননও দড়ি ধরে উঠে এল। প্রাকারের গায়ে গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে আর একবার চুপিচুপি পরামর্শ হল। এখান থেকে প্রাকারের মাথা বেশি দূর নয়, কিন্তু হাতের নাগালের বাইরে। গজানন লম্বা মানুষ, সে গাছের ডালে পা রেখে প্রাকারে ভর দিয়ে দাঁড়াল, সদাশিব সাবধানে তার কাঁধে উঠল, উঁচু দিকে হাত বাড়াল ; কিন্তু তবু প্রাকারের কিনারার নাগাল পেল না। আর একটু বাকি, আধ হাতেরও কম। সদাশিব তখন গজাননের মাথায় পা দিয়ে ডিঙি মেরে উপর দিকে হাত বাড়াল। এবার প্রাকারের কিনারা তার নাগালের মধ্যে এসেছে।

দুই বাহুর বলে শরীরটাকে ওপর দিকে টেনে তুলে সদাশিব প্রাকারের ওপরে উঠে বসল।

॥ ৫ ॥

প্রাকারের ওপরে বসে সদাশিব সন্তর্পণে চারদিকে চাইল, কোথাও মানুষ নেই। কান খাড়া করে শুনল, আস্তাবলের দিক থেকে মাঝে মাঝে ঘোড়ার খুরের খটখট শব্দ আসছে। অন্য কোনো শব্দ নেই।

সদাশিব তখন নীচের দিকে মুখ বাড়িয়ে হাত নেড়ে ইশারা করল ; নিজের কোমর থেকে দড়ি খুলে নীচে ঝুলিয়ে দিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সদাশিবের অনুচরেরা একে একে দড়ি ধরে ওপরে উঠে এল। দুর্গের কেউ জানতে পারল না।

পশ্চিম আকাশে চাঁদের মুখ ম্লান হয়ে গিয়েছে, চাঁদ অস্ত যেতে বেশি দেরি নেই। তবে একটা সুবিধা এই যে চাঁদ অস্ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সূর্যোদয় হবে।

সদাশিব সঙ্গীদের বলল, 'এইবার আসল কাজ আরম্ভ। তোমরা এখানে বসে থাকো, আমি চট করে একবার দুর্গের হালচাল দেখে আসি।'

কোমর থেকে তলোয়ার বের করে সদাশিব হাতে নিল, তারপর ছায়ার মতন নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সঙ্গীরা বসে রইল, নড়নচড়ন নেই। অস্তমান চাঁদের আবছায়া আলোয় তাদের দেখে বোঝা যায় না এতগুলো মানুষ পাশাপাশি বসে আছে, মনে হয় একসারি কলসী প্রাকারের আলসের ধারে সাজানো রয়েছে।

সে রাত্রে দুর্গের লোকেরা যখন অনেক খাবার পেল তখন তাদের মনে একটু সন্দেহ হয়েছিল ; কী জানি শিবাজি যদি খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়ে থাকে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা লোভ সামলাতে পারেনি। এত ভাল খাবার তারা অনেকদিন খায়নি। একটু একটু করে চাখতে চাখতে তারা শেষ বরাবর সমস্ত খাবার সাবাড় করে দিয়েছিল।

খাবারে অবশ্য বিষ-টিষ কিছু ছিল না। কিন্তু গুরুভোজন করলে শরীরে আলস্য আসে ; ওরা পেট ভরে খেয়ে কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে গালগল্প করেছিল, তারপর হাই তুলতে তুলতে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সদাশিব পরিদর্শন করে ফিরে এসে সঙ্গীদের বলল, 'সবাই ঘুমোচ্ছে, কেউ জেগে নেই। এখন কী করতে হবে শোনো।—বেশির ভাগ লোক যে-যার কুঠুরিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে ; আর দুর্গের মাঝখানে 'ওটা'*র ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে পঁচিশ-ত্রিশজন। গজানন, তোমরা বিশজন ওটায় গিয়ে তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকো, যদি কারুর ঘুম ভাঙে, দেখো যেন সে চীৎকার করতে না পারে।—টিকারাম, তুমি দশজন লোক নিয়ে যাও, কুঠুরিগুলোর বাইরে থেকে দোরের শিকল তুলে দাও, যারা ভেতরে আছে তারা যেন বেরুতে না পারে। আমি বাকি লোক নিয়ে যাচ্ছি দুর্গের তোরণ খুলে দিতে। হুঁশিয়ার, নিঃশব্দে কাজ হওয়া চাই।—সবাই তলোয়ার বার করো।'

তলোয়ার হাতে নিয়ে তিন দল তিন দিকে চলল। কারুর মুখে কথা নেই, কারুর পায়ে শব্দ নেই ; যেন ছায়াবাজির খেলা।

সদাশিব তার দল নিয়ে তোরণে গিয়ে দেখল চারজন তোরণ-প্রহরী কপাটে ঠেস দিয়ে দিব্যি আরামে ঘুমোচ্ছে। তারা মধ্যরাত্রি পর্যন্ত জেগে ছিল ; কিন্তু শিবাজির দল পুনায় ফিরে গিয়েছে, অন্য কোনো শত্রুও কাছাকাছি নেই, সুতরাং জেগে থাকার কোনো মানে হয় না ; তাই তারা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মুহূর্তমধ্যে চারজন প্রহরীর মুখ এবং হাত-পা বেঁধে ফেলা হল। তারা একটা কথাও বলতে পারল না, কেবল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। তাদের এক পাশে শুইয়ে রেখে সদাশিবের দল দুর্গের কপাট খুলতে আরম্ভ করল। প্রকাণ্ড ভারী হুড়কো খুলে আস্তে আস্তে কপাট খুলতে হবে। বেশি শব্দ করা চলবে না, কপাট খোলার ঘড়ঘড় শব্দে ঘুমন্ত ব্যক্তিদের ঘুম ভেঙে যেতে পারে।

শেষ পর্যন্ত কপাট খুলল। বেশি শব্দ হল না।

তবু, ওটায় যারা শুয়ে ছিল তাদের মধ্যে একজনের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে চোখ রগড়ে উঠে বসল, সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে তলোয়ারের নখ বিঁধল, কানের কাছে শব্দ হল—'চুপ! কথা বলছ কি মরেছ।' লোকটা কিছুক্ষণ হাঁ করে রইল, তারপর আবার শুয়ে পড়ল।

যন্ত্রের মতন কাজ হচ্ছে, শব্দহীন যন্ত্র। যারা কুঠুরিগুলো বন্ধ করতে গিয়েছিল তারা সমস্ত কুঠুরির দোরে শিকল তুলে দিয়েছে, ভিতরে যারা ছিল তারা জানতেও পারেনি। তাদের যখন ঘুম ভাঙবে, তারা যখন বাইরে আসতে চাইবে তখন দেখবে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ।

তোরণদ্বার খুলে দিয়ে সদাশিব সেখানে পাঁচজন পাহারাদার দাঁড় করিয়ে বাকি লোকজন নিয়ে আস্তাবলের দিকে চলল। এবার আসল কাজ, ঘোড়া পাচার করতে হবে।

ওদিক থেকে টিকারামের দল কাজ শেষ করে আস্তাবলে হাজির হয়েছে। কেবল গজাননের দল ওটার ওপর ঘুমন্ত লোকগুলোকে আগলে আছে।

প্রকাণ্ড ডেউনির মতন আস্তাবল। তাতে দু'হাজার ঘোড়া। ঘেরা জায়গায় ঘোড়াগুলো ছাড়া রয়েছে ; কেউ বসে আছে, কেউ বা দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ দেখে তাদের মধ্যে কেউ কেউ গলার মধ্যে মিহি সুরে চিঁহিঁহিঁ করল।

অবিলম্বে কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। সদাশিব দাঁড়িয়ে তদারক করতে লাগল, বাকি লোক প্রত্যেকে দুটো ঘোড়ার গলায় দড়ি পরিয়ে দুর্গের বাইরে রেখে ফিরে আসতে লাগল। এ কাজ অবশ্য নিঃশব্দে হয় না ; ঘোড়ার খুরের শব্দ বন্ধ করা অসম্ভব। ওটায় যারা ঘুমোচ্ছিল তারা জেগে উঠল। কিন্তু তারা নিরস্ত্র, তাদের ঘিরে খোলা তলোয়ার হাতে শত্রু দাঁড়িয়ে আছে। এ অবস্থায় বুক চাপড়ানো ছাড়া আর কিছু করবার নেই।

* ওটা—উঠান

www.BanglaBook.org

যারা কুঠুরির মধ্যে বন্ধ হয়েছিল তারা দোরে ধাক্কা দিয়ে চেঁচামেচি করছিল। কিন্তু বেরুবে কী করে?

দু' হাজার ঘোড়া চন্দ্রগড় দুর্গের বাইরে চালান দিয়ে সদাশিবের দল যখন দুর্গ থেকে বেরুল তখন পুবের আকাশ ফরসা হয়ে গেছে।

টিলার কাছে ফিরে গিয়ে তারা নিজের নিজের ঘোড়ায় চড়ল, তারপর চোরাই ঘোড়াগুলোকে ঘিরে পুনার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল।

সদাশিব বুক-ভরা আনন্দ নিয়ে ভাবতে লাগল—শিবাজি যে কাজের ভার দিয়েছিলেন তা সিদ্ধ হয়েছে ; তাঁর শপথ ভঙ্গ হয়নি, এক ফোঁটা রক্তপাত হয়নি, অথচ কাজ হাসিল হয়েছে। জয় মা ভবানী! শিবাজি দু'হাজার ঘোড়া পেয়ে নিশ্চয় খুব খুশী হবেন। আর কুঙ্কু—

কিছু দূর চলবার পর সূর্যোদয় হল। সদাশিব গজাননকে বলল, 'মামা বলবন্ত রাও এতক্ষণে পুনা থেকে যাত্রা করেছেন। তিনি এই পথেই ফিরবেন ; তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ বাঞ্ছনীয় নয়। এসো, আমরা অন্য রাস্তা ধরি।'

পুনায় যাবার সিধা রাস্তা ছেড়ে তারা বাঁ দিকে মোড় ঘুরল। এদিকে একটা সরু উপত্যকা আছে। সেদিক দিয়ে গেলে পুনায় পৌঁছুতে দেরি হবে বটে, কিন্তু মামার দলের সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয় নেই। মামা সিধা পথেই দুর্গে ফিরবেন। তারপর তাঁর কী অবস্থা হবে তা না ভাবাই ভাল।

॥ ৬ ॥

পুনায় মহলের ছাদে উঠে শিবাজি একলা পায়চারি করছেন। তাঁর কপালে উদ্বেগের ভ্রূকুটি। দিন শেষ হয়ে এল, এখনো সদাশিবের দেখা নেই।

তানাজি এসে শিবাজির সঙ্গে যোগ দিলেন। শিবাজির মুখ দেখে বললেন, 'ভাবছ কেন? সদাশিব খলিফা ছেলে, সে কাজ ফতে না করে ফিরবে না।'

শিবাজি বললেন, 'তা তো জানি। আজ পর্যন্ত কোনো কাজে সে নিষ্ফল হয়নি। কিন্তু হাজার হোক ছেলেমানুষ তো—'

মা জিজাবাঈ ছাদে এলেন, সঙ্গে কুঙ্কু। জিজাবাঈ বললেন, 'কোথায় পাঠালি তুই ছেলেটাকে! বলেছিলি আজ বেলা দুপুরের আগেই ফিরবে। তা এখনো ফিরল না।'

শিবাজি বললেন, 'সূর্যাস্তের আগে যদি সদাশিব না ফেরে, আমাকে দলবল নিয়ে বেরুতে হবে।'

কংরজ্ ঘাটের দিকে কারুর নজর ছিল না ; এই সময় কুঙ্কু আঙুল তুলে সেই দিকে দেখাল। সে সকলের আগে দেখতে পেয়েছে।

সকলে একসঙ্গে সেইদিকে ফিরলেন। দেখলেন কংরজ্ ঘাটের সংকীর্ণ ঢালু সংকটপথে পিলপিল করে ঘোড়ার পাল নেমে আসছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন প্রকাণ্ড একপাল ভেড়া।

তানাজি নাচতে শুরু করে দিলেন—'দু' হাজার ঘোড়া! দু' হাজার ঘোড়া! জয় ভবানী।'

শিবাজি দু' হাত তুলে লাফিয়ে উঠলেন—'পেরেছে—সদাশিব পেরেছে। মা, তোমার কোলের ছেলেটা সবাইকে হারিয়ে দিয়েছে।'

তানাজির হাত ধরে তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে শিবাজি ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন, 'মা, কুঙ্কুর জন্যে আমি পাত্র ঠিক করেছি। ওকে জিগেস করো সদাশিবকে ওর পছন্দ কিনা।'

এই বলে একটু হেসে শিবাজি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

১৩৬৯

তারার ঘর

সুখলতা রাও

ভাই। পেতাম যদি পক্ষিরাজ ঘোড়া
প্রকাণ্ড গা, মস্ত ডানা জোড়া,
যেতাম আমি একেবারে চলে
ওই যেখানে সূর্যিমামা জ্বলে।
শরীরটা তার আগুন-ভরা শুধু,
ভীষণভাবে জ্বলছে ধু ধু ধু ধু ;
আগুনের ঝড় করছে দাপাদাপি,
জ্বলন্ত ঢেউ করছে লাফালাফি,
লকলকিয়ে হলকা ছোটে যত,
লক্ষ হাজার সাপের ফণার মত।

বোন। গিয়ে দাদা কাজ নেই,
থাকো তুমি এখানেই।
সূর্যটা জোর তেজে
ভয়ানক জ্বলছে যে,
ঘোড়া হবে ভাজা-ভাজা
হোক না সে যত তাজা।
মানুষও বাঁচবে কি?
ফিরে ফের আসবে কি?
নীচে থেকে দেখা ভালো
ঝলসানো তার আলো।

ভাই। তবে গিয়ে দেখে আসি এক ফাঁকে,
পৃথিবীর খোকা-ভাই বুধটাকে।
সূর্যের সব কাছে সেটা ঘোরে,
ঠোক্করে তেতে পুড়ে, হাঁপ ধরে।

বোন। না না, থাকো,
যেয়ো নাকো
তুমি ভাই।
আইঢাই
করবে তো শেষটায়
সেই পোড়া দেশটায়?

ভাই। তবে যেটা পোড়া নয়,
মেঘ-ঢাকা ছায়াময়,
যাই সেই শুক্রের

www.BanglaBook.org

সূর্যের আরও দূরে,
আমাদের কাছে ঘেঁষে
আরামেতে রয়েছে সে ;
সবচেয়ে ঝকঝকে,
শুকতারা বলে লোকে।

বোন। কেন যাবে ঘুরতে,
আকাশেতে উড়তে ?
পৃথিবী কি ভালো না ?
চারিদিকে চাও না,—
মাথা নাড়ে গাছেরা,
দোল খায় ঘাসেরা,
ফুল হেসে চাইছে,
পাখি গান গাইছে।

ভাই। আজব যে কথা শুনি কত,
বলে লোকে—গ্রহ আছে যত
ঘোরে তারা বন্ বন্ বন্
ছোটে তারা শন্ শন্ শন্,
সূর্যকে মাঝখানে রেখে,
নিজেদের পথে ঠিক থেকে।
তাই চাই ছুটে চলে যেতে
মাটি ছেড়ে, নীল আকাশেতে।
যাবি যদি তুই, বল্,
এক্ষুনি যাই, চল্,
আকাশের ময়দানে
আগে চাঁদটার পানে,
পরে আরও আরও দূরে
চলে যাব উড়ে উড়ে।
যাচ্ছি তো দুজনেই,
কোনো কিছু ভয় নেই।

বোন। ঘোড়াটাকে ডাকো তো !
কোথা থাকে বলো তো !
আকাশে কি আছে তার ঘর ?
'মন-পবনের না'
গল্পেতে ছিল না ?
সে বইতে পাবে কি খবর ?

ভাই। কার ঘোড়া সে, কোন্ রাজা সে,
কী তার নাম,
খবর নিয়ে, করছি গিয়ে
টেলিগ্রাম।
আজব ঘোড়া শূন্যে-ওড়া পক্ষিরাজ
আসবে ছুটে, আমরা উঠে উড়ব আজ।
যতই যাব, দেখতে পাব সমুখ-পানে,
আগুন-জামা সূর্যিমামা মধ্যিখানে,
আলোর ছটা, গ্রহের ঘটা, চৌদিকেতে,
ছুটছে তারা, ঘুরছে তারা, আলোয় মেতে।
মঙ্গলেতে মানুষ যদি থাকে,
চমকে দেব তাদের, হাঁকডাকে ;
অবাক হয়ে রইবে তারা চেয়ে,
ভাববে, 'এল কাদের ছেলেমেয় !'
তারপরেতে মিলবে দেখা যার
বৃহস্পতি নামটা বুঝি তার,
মস্ত বড় শরীরখানা ঘোরে,
তেজ হারিয়ে গুমরে যেন পোড়ে।
এইবারেতে শনিগ্রহের পালা,
বুকেতে তার লক্ষ চাঁদের মালা !
আরও দূরে, আরও আছে কারা
ছায়ার দেশে, রোদ পায় না তারা।

(মেঘের ডাক, বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ)

দেখ দেখি চেয়ে, ওই মেঘ বেয়ে,
কালো ডানা খুলে, উঁচু ঘাড় তুলে,
ঘোড়া বুঝি যায় চার পায় পায়
চুল তার ওড়ে চোখ দুটো ঘোরে,
সাজ ঝন্‌ঝন্, মন চন্‌মন্,
ছোটে হুড়মুড়। মেঘ গুড়গুড়
ডাকে,—এল এই, আর দেরি নেই,
বিদ্যুৎ আঁকা ঝলছে যে পাখা—
—হোই ঘোড়া, থাম্, এইখানে নাম্
হেথা এই বাড়ি আয় তাড়াতাড়ি।
শোন্ বোন্ জ্বলজ্বলে
ধূমকেতু ছুটে চলে
সাঁঝেকে বোঁ করে
ঘুরে এক চক্করে
শূন্যের থেকে এসে
ফিরে যায় কোন্ দেশে।
আগুনের গাটা, আর
পিছনেতে ল্যাজ তার ;
আকাশের ঝাঁটা যেন।
ঝাড়ে নাকো কেউ কেন ?
জ্বলছে যে এত চুলো,
নিশ্চয় ছাই ধুলো
ভরে গেছে আকাশেতে
দেখব তা যেতে যেতে।

দুইজনে। যেখানেতে ছায়াপথ ওঠে,
যেখানেতে তারাগুলি ফোটে,
সেইখানে যাব সব শেষে,
খুঁজব কে আছে সেই দেশে,
দেখব সে কোথা বাস করে,
এত আলো জ্বলে কার ঘরে।

www.BanglaBook.org

গাছের নাম বাঘশাল

ক্ষিতিমোহন সেন

...সেদিন যে আমি বাঁকুড়ার জঙ্গলে গিয়েছিলাম তার মধ্যে এক জায়গায় একটা বাঘশাল গাছ আছে। কী হয়েছে জান? একটা খুব দুষ্টু বাঘ ছিল—পথে একলা কাউকে পেলেই ধরে খেত। হাট থেকে বাজার থেকে বাড়ি ফিরতে গিয়ে অনেক লোক তার পেটের মধ্যে গেছে, বাড়ি আর যেতে পারেনি। একবার একটি ছোট ছেলে তার মায়ের জন্য ওষুধ আনতে দূর গ্রামে গিয়েছিল—মার খুব অসুখ। কবিরাজ বাড়ি ছিলেন না, সন্ধ্যার সময় এসে তিনি ছেলেটিকে ওষুধ দিলেন কিন্তু তাকে বললেন, 'আজ আর যেও না, পথে বড়ই বাঘের ভয়।' ছেলেটি কী করে? খেয়েদেয়ে কবিরাজের বৈঠকখানায় শুয়ে রইল।

কিন্তু অনেক রাত্রে তার মনে হল, মার তো খুব জ্বর, আজ ওষুধ না হলে মা কি বাঁচবে? আর ঘরে তো কেউ নেই মাকে জল দেবে! এইসব ভেবে সে রাত্রি একপ্রহর থাকতেই উঠে রওনা হল। সবাই তখন ঘুমিয়ে, তাই কেউ তাকে মানাও করতে পারল না।

ঘোর অন্ধকার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সে চলেছে—অনেক দূরের পথ, একটা লোকেরও সাড়াশব্দ নেই। এমনি তো জঙ্গলের নির্জন পথ, তার উপর রাত্রি, তাতে আবার ভীষণ বাঘের ভয়। তায় ছেলেমানুষ—বারো বছর মোটে বয়স, তবু মায়ের কথা ভেবে সে কিছু গ্রাহ্য না করে ঐ অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে। তখন শেষরাত্রির পাখিগুলি ডাকতে আরম্ভ করেছে। গাছের আগায় আগায় একটুখানি ভোরের হাওয়া লাগতে আরম্ভ হয়েছে। তার গ্রামও পাহাড়ের ঐ পারে, তখন আর খুব দূরে নয়। ছেলেটি ভাবল, 'যাক, আর ভয় নেই, এখনই গিয়ে মাকে জল দেব, ওষুধ দেব—এসেই তো পড়েছি।' ওমা! তখন কী ভয়ংকর শব্দ! জঙ্গলের সেই প্রকাণ্ড বাঘ তার ল্যাজটা লটপট করে তার পথ বন্ধ করে সামনে এসে দাঁড়াল। ছেলেটি তো ভয়ে কেঁপে উঠল। তার গায়েই বা জোর কী! আর হাতে একটি লাঠিও নেই। থাকলেই বা কী করত? সে ওষুধটা কোমরের কাপড়ে বেঁধে কাঠবেড়ালির মত তরতর করে একটা জোড়া শালগাছের উপর উঠে চড়ে গেল। জঙ্গলের দেশের ছেলে তো, সবাই তাই খুব গাছে চড়তে পারে।

বাঘ তো রেগেই খুন। তার জিভ দিয়ে জল বেরুচ্ছিল, দুই-একবার জিভ দিয়ে তাই চাটল। তারপর একটু দূরে সরে গিয়ে সেই ছেলেটিকে লক্ষ্য করে ভয়ংকর গর্জন করে প্রকাণ্ড একটা লাফ দিল। লাফ দিয়ে বাঘটা এত উঁচুতে উঠল যে ছেলেটি তখনও অত দূরে উঠতে পারেনি। ছেলেটির তো ভয়ে হাত-পা অবশ হয়ে এল। বাঘটা একেবারে তার মাথার উপর গিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল। ওমা! হল কী! ঐ শালগাছটা কিনা জোড়া শালগাছ ছিল—বাঘটা ঐ উঁচুতে দুটো শালগাছের ফাঁকের মধ্যে গেল পড়ে—তার নিজের ভারে জোড়া গাছের সংকীর্ণ ফাঁকে সে নিজেই জাঁতাকলে গেল আটকে। ছেলেটির চাদরটা বাঘের নখে লেগেছে তবু তার গায়ে আঁচড় লাগেনি।

ছেলেটি ভয়ে একেবারে মেরে গেল মাটিতে। তখন আরম্ভ হল খুব ঝড়। দুই গাছের পেষণ লেগে বাঘটা খাঁউ খাঁউ করে চিৎকার করে কাঁচকলের ই দুরের মত পিষে মারা গেল। তখন ভোর হল। ছেলেটি মার কাছে দৌড়ে গিয়ে ওষুধ দিল। গ্রামের লোক দেখে অবাক। রাজা ছেলেটিকে খুব পুরস্কার দিলেন। মার ওষুধপথ্য রাজাই ব্যবস্থা করলেন। গ্রামের লোকেরা এখনও সেই দিনে ঐ জোড়া শালগাছের তলায় মাতৃভক্ত ছেলের নামে মেলা বসায়।

[উপরের লেখাটি একটি চিঠি। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে লখনৌতে তাঁর নাতি-নাতনীকে লিখেছিলেন। এতে একটি স্থানীয় কিংবদন্তীর কথা বলা হয়েছে।]

১৩৬৮

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভবানন্দের কাশীযাত্রা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরাকালে, মানে অনেক কাল আগে, একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। সংসারে তাঁর কেউ ছিল না, একলা মানুষ, শুধু পড়াশুনা পূজা-অর্চনা নিয়ে থাকতেন। যার ফলে তিনি ত্রিকালজ্ঞ হয়েছিলেন। ত্রিকালজ্ঞ মানে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তিনই তিনি জ্ঞাত ছিলেন। তা বলে গণক নন। পড়াশুনা করে পৃথিবীর ইতিহাস তিনি জেনেছিলেন এবং বর্তমান কালে কোথায় কী ঘটছে তাও তিনি খবর রাখতেন ; এর ফলে দুইকে মিলিয়ে আগামী কালে কী ঘটবে তাও তিনি নির্ভুলভাবে বুঝতেন, বলতে পারতেন। বয়স অনেক হয়েছিল। একদিন বুঝলেন—শরীর যেন খারাপ হচ্ছে ঘন-ঘন। সুতরাং তিনি নির্ভুল ভাবে বুঝলেন, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই মারা যাবেন। তখন মনে মনে চিন্তা করলেন—আমরা মৃত্যুর সময় তীর্থে যাই, সেইখানে মারা যাওয়াটা ভাগ্য বলে মনে করি। ভগবানকে ভাবতে হয় না চেষ্টা করে—ভগবানের মন্দির, তাঁর নাম, তাঁর পূজার ধূপ-দীপ ফুলের গন্ধে সেখানকার বাতাস ভরে থাকে। সেখানে মৃত্যু সৌভাগ্য। তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীর্থ কাশী। এখন তা হলে আমার কাশী যাওয়া উচিত। কিন্তু—কিন্তু কাশী তো অনেক পথ। এবং তীর্থস্থল হলেও বিদেশ। পথে বিপদ হতে পারে, সেখানেও পৌঁছে রোগ হলে একলা পড়ে থাকতে হবে। একজন লোকের দরকার—যে পথে সংগী হবে এবং সেখানেও কাছে থাকবে, কথাবার্তা বলবে, রোগে একটু জলও মুখে দিতে পারবে। কিন্তু কে যাবে? আমার না-হয় কেউ নেই। অন্যের তো তা নয়! ঘর-বাড়ি ছেলেপুলে আছে—তারা তাদের ফেলে যেতে চাইবে কেন? হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর এক বন্ধু আছে, ভবানন্দ ভারী, লেখাপড়া শেখেনি, ভার বয়ে খায়, তাই তাকে লোকে খেতাব দিয়েছে 'ভারী' ; আর যেখানেই থাক না কেন, তার মুখে হাসি লেগেই থাকে। তাই লোকে তাকে বলে 'ভবানন্দ'। বিয়েটিয়ে করেনি, সংসারে তাঁরই মত কেউ নেই, বয়সও তাঁরই সমান, ছেলেবেলার বন্ধু। এই ভবানন্দ ভারী যদি সংগে যায় তবে বড় ভাল হয়। যাবার সময় মোট-টোটগুলি বইতেও পারবে। সর্বত্রই আনন্দ তার, সুতরাং বলবে না ঘরের জন্য, গাঁয়ের জন্য মন কেমন করছে। আর ছেলেবেলার বন্ধু, বেশ প্রাণ খুলে কথাবার্তা হবে! এই ভেবে তিনি চলে গেলেন ভবানন্দের আস্তানায় সন্ধ্যেবেলায়। একটি গাছতলায় ছোট একখানা চালাঘর। ভবানন্দ চালেডালে খিচুড়ি চাপিয়েছিল। তিনি ডাকলেন—ভবানন্দ ভাই, বাড়ি রয়েছ?

ভবানন্দ হেসে বললে—ভবানন্দকে ভাই ডাকছ, দাদাঠাকুর তুমি নিশ্চয়ই, এসো এসো।

ব্রাহ্মণ বললেন, ভবানন্দ, একটি কথা বলছি।

—বলো।

তখন ব্রাহ্মণ তাঁর কথাটি বললেন—দেখো ভাই, তোমারও বয়স হয়েছে। চলো না। যাবে আমার সংগে? আমি প্রতিজ্ঞা করছি যদি কাশীতে তোমার অসুখ করে তবে আমি তোমার সেবা করব। যদি আমার আগে মারা যাও তবে তোমার সৎকার করব। আর আমি আগে যদি মারা যাই, অসুখ করে, তবে তুমি সেবা করবে, মারা গেলে সৎকার করবে। আমার সংগে আমি কিছু টাকা নিয়ে যাব, সে টাকা তোমাকে দিয়ে যাব। ওই টাকায় তুমি বাকী দিনগুলো কাটাবে। দেখো, রাজী?

ভবানন্দ বললে—ভবানন্দ ভারী মোট বয়ে খেতে পারবে, ভবানন্দের সর্বত্র সদাই আনন্দ, সুখে আনন্দ, দুঃখে আনন্দ ; ভবানন্দের কাছে দুঃখের ভাগ্যে কাঁচকলা। ভিক্ষে করেও খেতে ভবানন্দের বাধবে না। সেসব কথা ভুয়ো কথা। আসল শর্ত শোনো, সেই শর্ত মানলে যাব, নইলে যাব না।

ব্রাহ্মণ বললেন—বলো।

ভবানন্দ ভারী বললে—ভারীর বল আছে, ভার বয়, ভয় নাই। ভবানন্দের আনন্দ আছে, সুখের অভাব হয় না। কিন্তু বিদ্যে নাই, মুখ্যু। তুমি পণ্ডিত, লোকে বলে—ত্রিকালজ্ঞ, সব জান। কাশীতে যাব, যেতে হবে অনেক পথ, পথে বন আছে, পাহাড় আছে, গেরাম আছে, শহর আছে, কতরকমের মানুষ আছে, কত জন্তু আছে, পক্ষী আছে, কত ঘটনা ঘটবে। এর মধ্যে যা আমার আশ্চর্য ঠেকবে, বুঝতে পারব না, কিন্তু বুঝতে বাসনা হবে, আমি তোমাকে বলব কী ব্যাপার, বুঝিয়ে দাও। তোমাকে কিন্তু সেই দণ্ডে তৎক্ষণাৎ বুঝিয়ে দিতে হবে। যদি বুঝিয়ে না দাও কি না দিতে পার তাহলে সেইখান থেকে ভবানন্দ ভারী কাঁধের ভার পথে নামিয়ে দেবে। উলটো মুখে পাড়ি, সটান এসে হাজির হবে বাড়ি। কাজ নাই তার কাশীতে। বুঝেছ?

ব্রাহ্মণ হেসে বললেন—বুঝেছি।

ভারী বলল—রাজী?

ব্রাহ্মণ বললেন—রাজী না হয়ে উপায় কী? রাজী।

—বেশ, চলো। শুধু খিচুড়িটা নামার অপেক্ষা। খেয়ে নিলেই তৈরী।

ব্রাহ্মণ আবার হেসে ফেললেন। বললেন—না আজ না। সাত দিন পর।

—বেশ।

সাত দিন পর ব্রাহ্মণ আর ভবানন্দ ভোর-ভোর বেরিয়ে পড়লেন। সবে কাক ডাকছে, কোকিল ডাকছে বাসায় বসে ; বাসা

www.BanglaBook.org

ছাড়েনি। ওঁরা গ্রামকে প্রণাম করে বেরুলেন। ভবানন্দের মাথায় মোট। ব্রাহ্মণের বগলে ছাতা, হাতে লাঠি। ভবানন্দ গান ধরে দিলে—

'কাশীর পেঁড়া ও পেয়ারা কী মিষ্টি,
পেঁড়া বানায় ময়রাতে, পেয়ারা বিশ্বনাথের ছিষ্টি।'

এইভাবে চলেন দুজনে। এক ক্রোশ, দু' ক্রোশ, পাঁচ ক্রোশ। দুপুর হলে রোদ উঠলে পথের ধারে চটিতে ঘরভাড়া নিয়ে স্নান আহার করেন, একটু বিশ্রাম করে রোদ্দুর পড়লে আবার রওনা দেন ; রাত্রে অন্য চটিতে খেয়েদেয়ে ঘুমোন, আবার ভোর-ভোর উঠে রওনা হন। এইভাবে একদিন দুদিন তিনদিন কেটে গেল। চারদিনের দিন সেদিন খুব রোদ্দুর উঠেছে, রাস্তাটাও ন্যাড়া—মানে দু'পাশে গাছপালা নেই, গ্রাম বা বসতিও নেই—ওঁরা চলছেন তো চলছেনই। চলতে চলতে একটা চড়াইয়ের উপরে উঠে নজরে এল ঢালের নীচে সামনে মস্ত একটা শহর। দুজনে ভারী ক্লান্ত। ব্রাহ্মণের তো কথা নেই, ভবানন্দ ভারী পর্যন্ত গান থামিয়েছে। কাশীর পেঁড়া-পেয়ারার কথাও ভুলে গেছে। এতক্ষণে সে বললে—বাবা বাঁচলাম। চলো দাদাঠাকুর, পা চালিয়ে।

এসে দুজনে হাজির হলেন এক সিংহদ্বারের সামনে। একটা গেট। গেটটার দুদিকে দুটো থাম। উপরে খিলান। থাম দুটো বেশ মোটা, চৌকো গড়নের—দুটোর গায়েই দুটো কাচ লাগানো প্রকাণ্ড তাক। একটা থামের তাকের উপর বাঘ-নখের মত অস্ত্র, তার পাশে বড় বড় সত্যকার নখ, তার পাশে ভীষণাকৃতি মুখোশ—রাক্ষসের মুখ—তাতে তেমনি দাঁত লাগানো। ভীষণ গদা, অগ্নিমুখ বাণ, তলোয়ার, আর একটা মস্ত কাচের পাত্রে স্বচ্ছ আরকে ডুবানো একটা মরা রাক্ষসের দেহ। নীচে লেখা—অভিশাপ। আর একদিকের থামের মধ্যের তাকে একটি একতারা, একছড়া তুলসীকাঠের মালা, একখানি কাপড় আর চাদর, একটি সিংহাসনের উপর রাখা রয়েছে। নীচে লেখা—শাপমোচন।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল ভবানন্দ ভারী—দাদাঠাকুর!

ক্লান্ত ব্রাহ্মণ বললেন—কী ভবানন্দ?

—এ তো ভারী আশ্চর্য!

ব্রাহ্মণ সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন—দেখে একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললেন—সঙ্গে সঙ্গে একটু আশ্চর্য স্বর্গীয় হাসিও মুখে ফুটে উঠল। তিনি বললেন—হ্যাঁ আশ্চর্য। সত্যই সব থেকে বড় আশ্চর্য ভবানন্দ!

—এর কারণ? এই লেখার মানে? বলো দাদাঠাকুর। তুমি তো ত্রিকালজ্ঞ।

—হ্যাঁ রে জানি আমি। জানি। কিন্তু এই রোদে দাঁড়িয়ে নয়। চল, শহরে গিয়ে কোন চটিতে—

—তা হলে রইল তোমার মোট।

—ভবানন্দ? খিদে পায়নি? তেষ্টা পায়নি?

—পেয়েছে। কিন্তু জানবার আগে ওসব রুচবে না।

—এখুনি বলতে হবে? [illegible]ড়িয়ে?

—তা না-হয় বোসো। [illegible] এখুনি।

পথের ধারে থামগুলো[illegible]মনে রেখে বসলেন দুজনে।

ব্রাহ্মণ বলতে লাগলেন অনেক কাল—কত কাল তার হিসেব ঠিক কেউ বলতে পারে না ভবানন্দ। হিসেব কষতে গিয়ে বার বার হিসেব ভুল হয়েছে। কখনও লক্ষ বছর দাঁড়ায়, কখনও দশ হাজার বিশ হাজার। কখনও একশো, কখনও দাঁড়ায় দশ-বিশ দিন আগে। কেউ বলে বার বারই এমনি ঘটে—এমনি ঘটছে বলে হিসেব এমনি দাঁড়ায়।

ভবানন্দ বললে—হিসেব বাদ দাও। দশের বেশি হলে আমার মাথা ঘোরে। গুণতে জানিনে। মেরেকেটে কুড়ি। একশো গুনতে হলে পাঁচ কুড়ি না সাজিয়ে ধরতে পারিনে। তুমি ব্যাপারটা বলো।

—এই নগর, এটি হল এই রাজ্যের রাজধানী। তখন শুধুই বন—শুধুই বন চারিদিকে। বনের ভিতর একটি রাজ্য। এই দেশের মানুষদের পূর্বপুরুষেরা বাস করত। তখন বনে ফল ছিল, নদীতে জল ছিল, মাঠে চাষ হত, ফসল ফলত। লোকেরা হাসত খেলত গান করত, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকত। মাঝে মাঝে বন থেকে জন্তু আসত, তারা দল বেঁধে তাদের তাড়াত। মানুষে মানুষে ঝগড়াও হত। কিন্তু নিয়ম ছিল—যা নিয়ম তাই ন্যায়। সেই ন্যায় অনুসারে প্রবীণেরা বিচার করে দিত। সবাই তা মেনে নিত। মারামারি বা যুদ্ধ হত। তারও নিয়ম ছিল। যুদ্ধ হবে সমানে সমানে। যুদ্ধ হবে সামনাসামনি। রাত্রে যুদ্ধ হবে না। তলোয়ারে তলোয়ারে যুদ্ধ হবে। তলোয়ারে-লাঠিতে, লাঠিতে-শুধুহাতে যুদ্ধ হবে না। একজনের সঙ্গে একজনের যুদ্ধ ; পাঁচজনের নয়। যুদ্ধে কেউ মারা গেলে যে তাকে মারত সে তার সৎকার করত। শুধু তাই নয়—তার তর্পণ করত, শ্রাদ্ধ করত। শুধু এই রাজ্যেই নয়—পাশাপাশি রাজ্যেও এই নিয়ম ছিল।

হঠাৎ গোলমাল ঘটল।

ব্রাহ্মণ বললেন—বুঝলি ভবানন্দ—সংসারে পাপ হল শয়তান। তার বড় দুঃখ—তার স্থান হয় না—সে ঠাঁই পায় না কোথাও।

সে রাজ্যের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। কেবল ঘোরে—কী করে কোন্ ফাঁকে ঢুকতে পারবে। একদিন তার চোখে পড়ল—অনেকটা দূরে একটা আশ্চর্য রাজ্য। বন-পাহাড়। কিন্তু রাশি রাশি মণি-রত্ন-সোনা। ছড়ানো রয়েছে মাটির উপর, নদীর জলে মাটি ধুয়ে গিয়েছে। তার কিনারায় চোখে পড়ে, স্তরে স্তরে থাকে থাকে সোনা হীরে [illegible] সোনা ঝকমক করছে। পাপের চোখ দুটো ঝকমক করে উঠল। এই তো!

কিছু মণি-রত্ন-সোনা নিয়ে সে এল এই দেশে—মণি-রত্ন-সোনা চাই!

লোকে তার ডালা দেখে অবাক হয়ে গেল।

—কী দাম?

—দাম আর কী? যা দেবে। আমি তো কুড়িয়ে এনেছি। নাও যার যা পছন্দ। যা পার দাও। লোকে নিয়ে গেল, যে যা পারলে নিয়ে এবং দিয়ে। যাবার সময় বললে—যাও না, ওই পথে অনেকটা দূর, সেখানে ছড়ানো রাশি রাশি!

—ছড়ানো? রাশি রাশি?

—হ্যাঁ।

—আমাদের নিয়ে যাবে?

—যাব। চলো!

সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁড়া পড়ল, চল্ চল্! কাল যেতে হবে সেই দেশে।

তাই গেল। ভেঙে পড়ল গিয়ে সেখানে। আরম্ভ হল

www.BanglaBook.org

খোঁড়ার কাজ—সোনা মণি তোলার কাজ। তুলছে তারা সোনা-মণি-মাণিক্য। হঠাৎ একদিন দেখলে, আর একদিক থেকে আর-এক দেশের লোক আসছে। তাদেরও নিয়ে এসেছে—সেই পাপ। এদের এখানে রেখে সে আর-একদেশের লোকদেরও নিয়ে এসেছে।

এরা বললে—বাঃ, এ কী? এ তো আমাদের জায়গা!

তারা বললে—বাঃ, তা কী করে হবে? এ তো পতিত জায়গা। তোমরা ওদিকটায় খুঁড়ছ। আমরা এদিকটা খুঁড়ব।

হল খানিকটা কথার ঝগড়া। তারপর নিয়মানুযায়ী যুদ্ধ। কেউ হারে না, কেউ জেতে না। যুদ্ধ চলে। একদিন পাপ একদলকে এসে বললে, তোমরা কী? শুধু হাতাহাতি করছ। লাঠালাঠি করছ। তলোয়ারে তলোয়ারে ঠোকাঠুকি করছ। তার থেকে আমি বাঘনখ দিচ্ছি, তাই দিয়ে দাও না মল্লযুদ্ধের সময় পেটটা ফেড়ে!

—সে যে অন্যায় হবে, পাপ হবে। অধর্ম হবে।

—অধর্ম হবে! তবে ধর্ম করে হারো, মরো। বাড়ি চলে যাও। ওরা সব নিক দখল করে।

—তাই তো!

পাপ আবার বললে—ধর্ম করলে কী হয়?

—পুণ্য হয়।

—পুণ্য হলে কী হয়!

—সগ্‌গে যায়।

—সগ্‌গ কোথায়?

—তা জানি না।

—হ্যাঁ গো, মরে যেতে হয় বল তোমরা।

—হ্যাঁ।

—সব মিথ্যে কথা। সব মিথ্যে।

—মিথ্যে?

—হ্যাঁ। সত্য যা তা চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়। এই সোনা সত্যি, এই হীরে সত্যি, এই মণি সত্যি, মানিক সত্যি। স্বর্গ নরক চোখে কেউ দেখেনি। সব মিথ্যে সব মিথ্যে।

—ঠিক। ঠিক। ঠিক বলেছ। কাল থেকে চালাও বাঘনখ।

ওদেশের লোকের কাছেও গিয়ে তাই বললে। পর দিন থেকে আরম্ভ হল নতুন যুদ্ধ। ওরা পেয়েছিল ছুরি। এরা বাঘনখ। ওরা ছুরি নিয়ে যুদ্ধ শুরু করলে।

সন্ধ্যায় দেখা গেল—মরেছে প্রায় সমান সমান। কিছু কম-বেশি। তারপর শুরু হল রাত্রে যুদ্ধ। গাছের উপর উঠে আগুনের গোলা ছোঁড়া হতে লাগল। ক্রমে এ দেশ জয়ী হল। ওদের দেশের লোকদের কতক ধরে আনলে। তারা ক্রীতদাস হল। এদের দেশে ধনসম্পদ মণিমাণিক্য সোনায় ভরে উঠল। কিন্তু আরও চাই। চলো পৃথিবী খুঁজব। এমন দেশ নিশ্চয় আরও আছে।

পাপ বললে—আছে, নিশ্চয় আছে। কিন্তু আরও দেশের মানুষ আছে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। তার জন্য তৈরী হয়ে বের হও।

—ঠিক কথা। ডাকো পণ্ডিতদের।

পণ্ডিতরা এল। তাদের রাজা বললে, শুনুন পণ্ডিতগণ। পৃথিবীর যেখানে যত ধনরত্ন আছে আমরা জয় করে আনবার জন্য বের হব। যুদ্ধ করে জিততে হবে সকল দেশকে। আপনারা এই ধরনের অস্ত্র বের করুন। বাঘনখের মত, ছুরির মত। আর এমন তলোয়ার এমন গদা এমন মুষল তৈরি করুন যা থেকে আগুন বের হয়। আর সমস্ত লোকে শুধু যুদ্ধকৌশল শেখো; আর মনকে এমন করে তৈরী কর যেন মানুষ মারতে বুক না কাঁপে। মরতেও ভয় না হয়। শুধু চিৎকার কর—আমরাই শ্রেষ্ঠ, আমরাই বিধাতা, আমরাই সমস্ত সুখ সমস্ত সম্পদের মালিক।

তাই আরম্ভ হয়ে গেল। দিবারাত্র মানুষ করে ওই চীৎকার। বড় বড় গদা নিয়ে মুষল নিয়ে আস্ফালন করে, বনে যায়, মারে সেই গদা জন্তুর মাথায়, চুরমার হয়ে যায় জন্তুর মাথা। ক্রীত-দাসদের ডেকে আনে, তাদের চাবকায়, বলে—বল্ বল্, তোমরা কে? তোমরা বিধাতা। কেউ যদি বলে তা কেন বলব? তা তো নয়—সঙ্গে সঙ্গে মুষল দিয়ে ভেঙে দেয় তার বুকের পাঁজরা। দাঁতে দাঁতে টিপে ক্রোধে দম্ভে চোখ রক্তবর্ণ করে নিজেরাও চীৎকার করে ওই বনে।

শুধু একটি পরিবার এতে যোগ দেয় না। তারা ঘরে বসে এর জন্যে দুঃখ পায়, কাঁদে। সেটি রাজার ছোট মেয়ে আর স্বামী। তারা কিছুতেই এতে সায় দিতে পারে না। ছোট মেয়ের স্বামী, ছোট জামাই—সে ছিল অকেজো লোক, সে গাইত গান।

www.BanglaBook.org

গায়ক ছিল।

রাজার কানে এ খবর গোপন রইল না। কোটাল এসে কানে তুললে। মহারাজ, এত বড় দেশব্যাপী সাধনা চলছে আর ছোট জামাই ঘরে বসে এর জন্যে কাঁদছেন!

—বল কী?

—হ্যাঁ মহারাজ। বিশ্বাস না হয় ডাকুন, ডেকে পরীক্ষা করুন।

রাজা তাকে ডাকলেন পরদিন সভায়। প্রশ্ন করলেন—তুমি দেশের এত বড় যে আয়োজন চলছে এতে যোগ দিচ্ছ তো নিয়মিত?

ছোট জামাইটি শুধু গায়ক এবং দুর্বলচিত্তই নয়, সে ছিল সত্যবাদী। সে বললে, না মহারাজ!

—না?—কেন?

—আমার সাধনার মধ্যে আমি অবকাশ পাই না।

—কী তোমার সাধনা?

—গানের।

—গানের? কী গান তুমি গাও? গাও তো শুনি!

গায়ক গান ধরলে—আমাকে সকল লোভ জয় করবার শক্তি দাও। আমাকে নির্লোভ করো—হে রাজাধিরাজ। আমার সকল ভয় দূর করে নির্ভয় করো হে মৃত্যুঞ্জয় অভয়দাতা। আমাকে রাক্ষসত্ব থেকে রক্ষা করো, হে চিরকোমল, হে চিরসুন্দর। আমার অন্তর মানুষের প্রেমে জীবের প্রেমে পূর্ণ করো—হে পূর্ণ পুরুষ।

গর্জে উঠল রাজা—কে তোমার রাজাধিরাজ? কে তোমার অন্তর মানুষের প্রেমে, জীবের প্রেমে পূর্ণ করো—হে পূর্ণ পুরুষ? আমি?

—না মহারাজ। তিনি আপনারও রাজাধিরাজ। ভগবান।

—ভাল। রাক্ষসত্ব থেকে রক্ষা পেতে চাও। সে রাক্ষসত্ব কী?

—দেশে যার সাধনা চলছে, মহারাজ, তাই!

—ভয়? ভয়টা কিসের? কাকে তোমার? আমাকে? দণ্ডের?

—না মহারাজ, তার থেকেও বড় ভয় লোভের এবং পাপকে!

রাজা ডাকলেন—ঘাতক!

ঘাতক এসে দাঁড়াল। রাজা সভাসদদের বললেন, আমাদের এই বীর্যের সাধনায়—এ পশ্চাৎপদ কাপুরুষ। আমাদের এ নিন্দা করে। এ ব্যক্তি রাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী। এক অস্তিত্বহীন অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এ ব্যক্তি দুর্বল এবং মূর্খ। কী বলেন আপনারা?

ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করে ভয়ংকর মুখে সকলে বললে—নিশ্চয়। নিঃসন্দেহে!

—এর আমি শাস্তিবিধান করব। মৃত্যুদণ্ড। কী বলেন?

—সাধু সাধু মহারাজ। এমন দৃঢ়চিত্ত না হলে রাজা! এমন রাজা নায়ক না হলে জাতি কি কখনও শ্রেষ্ঠ হতে পারে?

রাজা বললেন জামাইকে—আমি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম। ডাকো তোমার মৃত্যুঞ্জয়কে। আসুন তিনি দেখি!

—না মহারাজ, তা আমি ডাকব না। তাঁকে শুধু ডেকে বলে যাব—প্রভু, আমার পিতৃতুল্য শ্বশুরকে এবং আমার জাতির মানুষকে তুমি রাক্ষসত্ব থেকে রক্ষা করো।

—রাক্ষসত্ব?

—হ্যাঁ মহারাজ। আসছে। আমিও দেখতে পাচ্ছি। জাতিটা রাক্ষসে পরিণত হবে আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে।

রাজা বললেন—তবে ঘাতক, এই মুহূর্তে এই রাজসভায় একে হত্যা করো। রাক্ষসত্বের জন্য মুহূর্তের বিলম্ব আমার সহ্য হচ্ছে না।

মুহূর্তে ঘাতকের খড়্গ উঠল। নামল। রাজজামাতার মাথা ছিটকে পড়ল। রক্তে রাজসভা রক্তাক্ত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য ক্রিয়া হল। সকলের কণ্ঠ থেকে এক বিরাট উল্লাসধ্বনি বের হল। তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেহ বাড়তে লাগল, মুখ চোখ দাঁত নখে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটল। এ ওর মুখের দিকে চায়, ও এর মুখের দিকে চায়। এ-কী এ-কী এ-কী?

সমস্ত রাজ্য জুড়ে ধ্বনি উঠল—এ-কী?

সমস্ত রাজ্য হয়ে গেল রাক্ষস।

আনো, মদ আনো—আনো ভারে ভারে মাংস, আনো প্রমোদ, আনো বিলাস। আনো অস্ত্র, সাজাও সৈন্য। রাবণের মত বিশ্বজয় করব!

মধ্যরাত্রে রাজার ঘুম ভেঙে গেল। শুনলেন নারীকণ্ঠে কে গাইছে সেই গান—

আমার সকল ভয়কে দূর করো হে মৃত্যুঞ্জয়। আমাকে রাক্ষসত্ব থেকে রক্ষা করো হে চিরসুন্দর চিরপবিত্র!

রাজা চীৎকার করে উঠল—কল্যাণী!

কল্যাণী রাজার ছোট মেয়ের নাম। তাই তো, তার কথা তো মনে হয়নি। কোটাল, নিয়ে এসো। কল্যাণীকে নিয়ে এসো।

কোটাল ছুটে গেল। ফিরে এসে বললে, মহারাজ, তাকে তো পেলাম না। তিনি আমাদের প্রমত্ত ঘুমের মধ্যে কোথায় চলে গেছেন।

—চলে গেছেন?

—হ্যাঁ।

কল্যাণী চলে গেল? রাজার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

কোটাল বললে—মদ আনব?

—না। বসে থাকতে থাকতে চীৎকার করে উঠল রাজা—কল্যাণী, ফিরে আয়।

কে যেন ফিসফিস করে বললে—তোমাদের রাক্ষসত্ব যেদিন মোচন হবে সেদিন সে ফিরবে।

—সে কবে?

—যেদিন সত্যকারের মানুষ এসে এ রাজ্যে পদার্পণ করবে এবং তোমাকে জয় করবে সেই দিন।

—কিন্তু তুমি কে?

—আমি এ দেশের দেবতা—বিবেক। আমি বিদায় নিয়ে যাচ্ছি। যাবার সময় বলে যাচ্ছি—

রাজা চীৎকার করে উঠল—দেখো তো কোটাল, কে কোথা থেকে লুকিয়ে কথা কয়?

তন্নতন্ন করে খুঁজল কোটাল। বললে—কেউ তো নেই মহারাজ!

—উত্তম! সকালবেলাতেই তুমি কাউকে পাঠাবে—আমাদের পাশের রাজ্য থেকে মানুষ নিয়ে এসো।

—যে আজ্ঞা মহারাজ।

পরদিন মানুষকে ধরে আনা হল।

রাজা বললেন—আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে তোমাকে।

সে ভয়ে চীৎকার করে উঠল—হে মহারাজ, তুমি অজেয়। আমি কী যুদ্ধ করব তোমার সঙ্গে?

www.BanglaBook.org

—তবে হার মানো! স্বীকার করো আমার শ্রেষ্ঠত্ব!

—তুমি শ্রেষ্ঠ—তুমি শ্রেষ্ঠ—তুমি শ্রেষ্ঠ!

—দাও, একে ধনরত্ন দাও। এবং দাসখত লিখে নাও। বলে হা-হা করে হেসে উঠল রাজা।

এমনি করে দিনের পর দিন। রোজ মানুষ ধরে আনে, স্বেচ্ছায় আসে, দাসখত লিখে দিয়ে ধনরত্ন নিয়ে ফিরে যায়। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর। অন্যদিকে বিশ্বপৃথিবীর বুক চিরে উঠছে রাশি রাশি সম্পদ। আর অস্ত্রের পর অস্ত্র নির্মাণ চলছে। অজেয়ত্ব বজায় রাখতে হবে।

চলে গেল ষোলো বছর। ষোলো বছর পরও সেই একধারায় চলছিল রাজা। মানুষ এসে দাসখত লিখে ধনরত্ন প্রসাদ নিয়ে চলে যায়। সকাল হতে না হতে এই যে তোরণ—এরই দরজায় মানুষের ভিড় জমে। তারা জয়ধ্বনি তোলে—জয় রক্ষরাজের জয়। তুমি শ্রেষ্ঠ তুমি শ্রেষ্ঠ তুমি শ্রেষ্ঠ!

ষোলো বছর পর সেদিন সকালে তাদের কণ্ঠস্বর থামতেই ধ্বনি উঠল—জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়, জয় অভয়ংকরের জয়! যে নির্লোভ সেই শ্রেষ্ঠ। যে মানুষ সেই শ্রেষ্ঠ। যে ভয়হীন সেই শ্রেষ্ঠ!

ভীষণ হুংকার উঠল রাক্ষস-প্রহরীদের কণ্ঠে—কে? কে? কে রে হতভাগ্য?

ষোলো বছরের একটি ছেলে এগিয়ে এল, প্রসন্ন প্রশান্ত কণ্ঠস্বরে বলল—আমি।

রাক্ষস প্রহরীরাও হতবাক্ হয়ে গেল বিস্ময়ে। সুন্দর সুঠামগঠন একটি কিশোর, হাতে বীণা, গলায় মালা আর উত্তরীয়। পরনে শুভ্রশুচি বস্ত্র, ঠোঁটে হাসি। সে বলছে এই কথা!

একজন বললে—কী বললি? কার জয়!

সে প্রসন্ন হেসে বললে—মৃত্যুঞ্জয়ের জয়! অভয়ংকরের জয়!

আর একজন প্রশ্ন করলে—কে শ্রেষ্ঠ?

—যে নির্লোভ সেই শ্রেষ্ঠ। যে ভয়হীন সেই শ্রেষ্ঠ। যে মানুষ সেই শ্রেষ্ঠ!

—সে কি আমি?

রথ এসে দাঁড়াল। রাজা নামল। সংবাদটা ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে পৌঁছে গেছে রাজপুরী পর্যন্ত। রাজা মুক্ত অসি হাতে এসে উপস্থিত হয়েছেন।—বর্বর বুদ্ধিহীন বালক! যা বলেছিস প্রত্যাহার কর!

—তা কেমন করে করব? মিথ্যা বলা হবে যে!

—মিথ্যা বলা হবে? আমি শ্রেষ্ঠ নই? এত সম্পদ এত প্রাসাদ এত সুখ কোথাও দেখেছিস?

—সম্পদ দিয়ে কি মৃত্যুকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়? প্রাসাদে যারা বাস করে তারা কি মরে না? আর সুখ? বলো তো রাজা তুমি এখানকার শ্রেষ্ঠ প্রাসাদে বাস কর, তুমি তো রাজা, তোমার সুখ কত? সুখ কি আছে? চিন্তা থাকলে সুখ থাকে না। তোমার চিন্তা নেই? অহরহ চিন্তা কর কিনা—ভাব কিনা কখন কে তোমার রাজ্য থেকে সমৃদ্ধ হবে—অধিক শক্তিশালী হবে। বল?

রাজা গর্জে উঠল—জানিস আমার কত শক্তি, কত অস্ত্র—

হেসে উঠল বালক—কত শক্তি তোমার? যেসব অদ্ভুত অস্ত্র তোমার আছে তাতে তোমার মৃত্যু হয় না?

—কী? এর অর্থ কী?

—অর্থ সহজ। ভেবে দেখ যেসব অস্ত্র তুমি তৈরী করেছ অন্যকে মারবার জন্যে, তা কি তুমি সহ্য করতে পার? তাতে কি তোমার মৃত্যু হবে না? যদি হয় রাজা, তবে এই অস্ত্র তুমি যখন তৈরী করেছ অন্যেও তা তখন তৈরী করতে পারে এবং তোমাদের উপর প্রয়োগ করতে পারে? পারে না?

রাজার ক্রোধের সীমা রইল না, সে বললে—ওরে মূর্খ, এর জন্য তোকে হত্যা করব আমি।

এই সত্য কথার জন্য আমাকে হত্যা করবে?

—হ্যাঁ। যে আমাকে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার না করবে তাকে আমি হত্যা করব। তোর অস্ত্র থাকে তো যুদ্ধ কর।

—অস্ত্র আমার নেই।

—তবে এখনও স্বীকার কর।

—না। তুমি রাক্ষস-স্বভাব পেয়েছ। তুমি লুব্ধ, তুমি উদ্ধত, তুমি ভীত।

—তোর ভয় নেই?

—না। কারণ আমি মানুষ।

অস্ত্র তুললে রাজা—তবে এই তার শাস্তি!

ছেলেটি বুক পেতে দাঁড়াল। রাজার অস্ত্র নামল। বুকে লাগল। রক্ত ঝরতে লাগল। বালক পড়ে গিয়েও গাইতে লাগল—

আমাকে লোভ জয় করতে শক্তি দিয়েছ, আমাকে নির্লোভ

www.BanglaBook.org

করেছ, হে রাজাধিরাজ! তুমি ধন্য। আমাকে অভয় দিয়ে নির্ভয় করেছ—হে অভয়ংকর মৃত্যুঞ্জয় তুমি ধন্য।

রাজার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে উঠল—এ কে? এ কে? এ কোন্ গান?

সমস্ত লোকের বুকও সঙ্গে সঙ্গে তোলপাড় করে উঠল। এ কী গান—এ কে?

কী সুন্দর গান—কী সুন্দর বালক!

রাজার চোখে জল এসেছে—সেই জলে-ধোওয়া চোখে তিনি কী দেখছেন? এ কার মুখ?

ছেলেটির কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে এসেছে তবু গাইছে—আমাকে রাক্ষসত্ব থেকে রক্ষা করেছ হে সুন্দর—তুমি ধন্য হে প্রভু, বিশ্বের যেখানে রাক্ষসত্ব আছে—তাকে তোমার স্পর্শে অমৃত করো, মনুষ্যত্বে পরিণত করো।

দরদর ধারায় চোখ থেকে জল নামল রাজার। তিনি চীৎকার করে উঠলেন—কল্যাণী—কল্যাণী—কল্যাণী মা!

কল্যাণী এসে দাঁড়াল! তপস্বিনী।

—বাবা!

—এ কে?

—আমার ছেলে। তোমার দৌহিত্র!

বুক চাপড়ে কেঁদে উঠল রাজা, হায়-হায়-হায়। সারা রাজ্য হায় হায় হায় ধ্বনিতে ভরে উঠল। চোখের জলে ভাসতে লাগল সকল বুক।

দেখতে দেখতে রাক্ষসত্বের মোচন হল।

রাজা শুধু আছাড় খেয়ে পড়ে আর উঠলেন না।

এদিকের তাকে রাজার সেই দেহ রেখেছে আরকে ডুবিয়ে। ওই সেই মারণাস্ত্র। ওদিকে সেই দৌহিত্রের উত্তরীয় বস্ত্র বীণা। সিংহাসনে রেখে দিয়েছে। মানুষ রাক্ষস হয় কর্মদোষে ভবানন্দ—আবার মানুষই তাকে মুক্ত করে! তাই—তাই রয়েছে ফটকে। এ যত স্বাভাবিক ভবানন্দ, তত আশ্চর্য। এখন চল্ চটিতে গিয়ে রান্নাবান্না করি—হাতমুখ ধুই।

—কাশী কত দূর দাদাঠাকুর?

—অনেক।

—চলো, জলদি চলো। রান্না সেরে খেয়ে নিয়ে আবার চলো। দেখব আরও কত আশ্চর্য পথে অপেক্ষা করে আছে।

—পেয়ারা, পেঁড়া?

—সে তো কাশী পেঁছে। শেষ আশ্চর্য।

১৩৬৯

মাণিকের ফ্যাসাদ

নরেন্দ্র দেব

বাপ-মা মরা ছেলে মাণিক। পাঁচজনের দয়ায় মানুষ। আপনার জন বলতে তার কেউ নেই। বড় দুঃখী, বড় গরীব। সবে তেরো বছর বয়স। লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পায়নি তাই, নইলে সে একজন পণ্ডিত হতে পারত। খুব বুদ্ধি আর অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি তার। একবার যা শুনত তা আর ভুলত না।

একদিন সে এক ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বাড়ি ছোকরা চাকরের কাজ করছিল। কিন্তু, ব্রাহ্মণী মারা যাওয়াতে মাণিকের কাজ গেল। সে আবার নিরাশ্রয় হয়ে পড়ল। কোথায় থাকবে, কী খাবে? ভেবে ভেবে সে বেরিয়ে পড়ল পাড়ায়। প্রত্যেক ভদ্রলোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'আপনাদের কারুর ছোকরা চাকর রাখবার দরকার আছে কি?'

সব বাড়িতেই প্রায় বলল, না দরকার নেই। আমাদের লোক আছে।

মাণিক হতাশ হয়ে ফিরে আসছিল এমন সময় দেখতে পেলে গলির শেষে একখানা ছোট্ট কুঁড়েঘরের চালের মাথায় একটা মস্ত নিশান উড়ছে। ঠিক সেই সময় সেই বাড়ির দরজায় একজন যাত্রাদলের রাজার মত পোষাক পরা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে মাণিক তাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম জানিয়ে হাতজোড় করে বললে, 'প্রভু, গরীবের একটা নিবেদন আপনার চরণে। আমি একজন অনাথ বালক। লোকের বাড়ি ছোকরা চাকরের কাজ করি। সম্প্রতি আমার পুরনো মনিব স্বর্গে যাওয়ায় আমার কাজ গেছে। আপনি যদি দয়া করে আমায় রাখেন আমি আপনার সব কাজ করে দেবো।

যাত্রার দলের রাজার মত পোষাক পরা লোকটি মাণিকের দিকে চেয়ে তার আপাদমস্তক দেখে বললেন, 'সব কাজ করতে পারবে?' মাণিক ঘাড় নেড়ে সায় দিলে, 'হ্যাঁ পারব।' লোকটি বললে, 'উত্তম! তবে প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করো।'

মাণিককে বাড়ির ভেতর নিয়ে লোকটি জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার নাম কি?'

মাণিক সবিনয়ে বললে, 'আজ্ঞে—মাণিক!'

লোকটি বিরক্ত হয়ে উঠে বললে, 'উঁহু! চলবে না। অত ক্ষুদে নাম আমার এখানে চলবে না। জেনে রাখো আজ থেকে তোমার নাম হল শ্রীমন্ত মহামাণিক্যদেব!'

মাণিক হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললে, 'যে আজ্ঞে হুজুর!'

লোকটি হুংকার দিয়ে বলে উঠল—'ওকি! ওকি! ওসব হুজুর-টুজুর ম্লেচ্ছ সম্বোধন আমার রাজ্যে চলবে না। আমাকে কি বলবে জানো?'

মাণিক থতমত খেয়ে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। বলব, কর্তাবাবু। মুনিবজী! বাবুজী—'

লোকটি আবার ভীষণ গর্জন করে উঠল, 'খবরদার! আবার ওই ম্লেচ্ছ সম্বোধন? মুনিবজী! বাবুজী!—চলবে না! চলবে না ওসব! এ বাড়িতে যদি থাকতে চাও আজ থেকে আমাকে বলবে—রাজাধিরাজ! মহারাজ! রাজেন্দ্রপতি! লোকেশ্বরনাথ—এই রকম,—বুঝলে? আচ্ছা! ওই যে—দেখছো ঘরের ভেতর—ওটা কী রয়েছে? বলো দেখি?' লোকটা তার শোবার

www.BanglaBook.org

সেই চারপাই খাটিয়াখানা মাণিককে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে।

মাণিক বার দুই সেটাকে দেখে হাতজোড় করে বললে—'আজ্ঞে, ওটাকে খাট, পালংক, শয্যা, তক্তাউস্—যা আপনার ইচ্ছা বলতে পারি—'

আবার গর্জন। 'খবরদার! ফের ওই ম্লেচ্ছ নাম—তক্তাউস! জেনে রাখো ওটা হল মহামান্য মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ-সিংহাসন!'

মাণিক মাথা হেঁট করে বললে, 'যে আজ্ঞে মহারাজ!'

লোকটা শুনে খুশি হল। ঘরের ভেতর দেওয়ালের গায়ে একটা কাঠের আলনায় কিছু কাপড়জামা ঝুলছিল; সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা, ওগুলো কী বলো তো—মহামাণিক্যদেব?'

মাণিক একবার সেদিকে চেয়ে দেখেই বললে, 'আজ্ঞে, মহাধিরাজ! ওগুলো বস্ত্র, বসন, কটিবাস, আঙ্রাখা—যা ইচ্ছে বলতে পারেন।'

আবার গর্জন। 'আঙ্রাখা! ফের ওই ম্লেচ্ছ নাম! ওগুলোকে বলবে—ওগুলোকে বলবে, চীনাংশুক, পট্টবাস, উত্তরীয় বা এক কথায়—রাজবেশ, রাজকীয় পরিচ্ছদ!'

মাণিক ঘাড় নুইয়ে বললে—'যথা আজ্ঞা রাজাধিরাজ!'

লোকটা এবার আরও খুশি হয়ে তার খাটের নিচের একটা মেনি বেড়ালের ছানা চোখ বুজে ঝিমুচ্ছিল, সেটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'ওটাকে কী বলবে বলো তো শুনি?'

মাণিক বিড়ালছানাটাকে উঁকি মেরে দেখে বললে, 'আজ্ঞে মহারাজ! ওটাকে বিড়াল, মার্জার, মেনিছানা, বিল্লী—যা ইচ্ছে বলতে পারা যায়!'

আবার গর্জন। 'বিল্লী! ফের ম্লেচ্ছ নাম? ও বিড়াল নয়, ওকে বলবে 'নৃপনন্দিনী রাজকুমারী রাজশ্রী!'

'যে আজ্ঞে, তাই বলব লোকেশ্বরনাথ! কিন্তু, ওখানে দেখছি উনুনটা ধরে গেছে, গন্‌গনে আঁচ হয়েছে আগুনে—'

লোকটা চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলে—'কী বললে তুমি? কী বললে? উনুন! আগুন! তাই চলবে না—তোমায় নিয়ে চলবে না—'

মাণিক হাত জোর করে জিজ্ঞেস করলে, 'কী বলব তবে বলে দিন রাজাধিরাজ!'

লোকটি এবার বিরক্ত হয়ে বললে—'আগুন, উনুন, আঁচ, তাপ, ওসব বলা চলবে না এখানে। এখানে যদি থাকতে চাও, উনুনকে বলতে হবে 'যজ্ঞের আহিতাগ্নি কুণ্ড! বুঝলে? আর আগুনকে বলবে হোমহবিজাত বহ্নিশিখা!'

মাণিক মনে মনে বললে, 'ও বাবা!' মুখে বললে, 'যথা আজ্ঞা রাজ রাজেশ্বর! এবার থেকে তাই বলব।'

ঘরের এক কোণে এক বালতি জল ছিল। লোকটা মাণিককে সেটা দেখিয়ে বললে, 'কী রয়েছে ওখানে বলো?'

মাণিক দেখে বললে, 'আজ্ঞে, জল, বারি, উদক, পানি—'

লোকটা রেগে ক্ষেপে উঠে বললে—'পানি! আবার ম্লেচ্ছ শব্দ বললে? খবরদার! আর কখনো যেন না শুনি। বলবে, ব্রহ্ম কমণ্ডলু ধৃত পূত মন্দাকিনী ধারা। অথবা হেমভৃঙ্গার সঞ্চিত বারি!'

মাণিক অপরাধীর মত নাককান মলে জোড় হাত করে

www.BanglaBook.org

বললে, 'যে আজ্ঞে রাজ রাজেন্দ্র। এবার থেকে তাই বলব!'

লোকটা তার হাতের লাঠিটা মাণিককে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—'এটা কী বলো তো? এটাকে কী বলবে তুমি?'

মাণিক এবার একটু ভেবে বললে, 'আজ্ঞে মহারাজ, ওটাকে লাঠি, যষ্টি, ডাণ্ডা, বাড়ি, যা খুশি আপনি বলতে পারেন—'

লোকটি বিরক্ত হয়ে বললে, 'মহামাণিক্যদেব! তুমি দেখছি মহামূর্খ! তুমি সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে এখনও বুঝতে পারলে না সীতা কার ভার্যা? এটা হল দণ্ডমুণ্ডের বিধায়ক রাজ্যেশ্বরের রাজদণ্ড! রাজদণ্ড! বুঝলে? আচ্ছা, ওই যে ওখানে কাষ্ঠাধারের উপর একটি মৃৎপ্রদীপ রয়েছে দেখছো—ওটাকে কী বলবে?'

মাণিক বললে, 'আজ্ঞে, ওটাকে, দীপালোক, প্রদীপ শিখা—বাতি—বা—'

বিকট চিৎকারের চোটে মাণিককে থামিয়ে দিয়ে লোকটি বললে—'কী বললে তুমি? বাতি? আবার ম্লেচ্ছ শব্দ! নাঃ! তোমার দেখছি গর্দান নিতে হবে—না না না, তোমাকে আমি শূলে চড়াব!'

মাণিকের মুখ তখন ভয়ে শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে! হাতজোড় ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'মহারাজ! ক্ষমা করুন। ভুলে বলে ফেলেছি। আর কখনো আমার মুখে ম্লেচ্ছ শব্দ শুনতে পাবেন না। দয়া করে বলে দিন—কী বলব?'

লোকটা শান্ত হয়ে বললে, 'বলবে, বৈজয়ন্ত প্রাসাদের বৈদূর্যমণিদীপা—'

মাণিক যুক্ত কর কপালে ঠেকিয়ে করুণ কণ্ঠে বললে, 'যে আজ্ঞে মহারাজাধিরাজ! আর এমন ভুল কখনই হবে না।'

তখন লোকটার মুখ আবার প্রসন্ন হল। মৃদু হেসে তার সেই চালাঘর কুটীরখানার চারদিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে বললে—'এটাকে কী বলবে বলো দেখি?'

মাণিক খুব ভাল করে চারিদিক দেখে বললে, 'মহারাজ! একে বাড়ি গৃহ হর্ম্য আবাস কুটীর নিকেতন—যে কোন কিছু একটা বলতে পারেন।'

'মূর্খ!' লোকটি বললে, 'একেবারে অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ দেখছি! ওরে নির্বোধ মহামাণিক্য, এটাই তো বৈজয়ন্তী রাজপ্রাসাদ! মহারাজের দুর্ভেদ্য দুর্গ!'

মাণিক এবার একেবারে হাঁটু গেড়ে বসে লোকটির পা ছুঁয়ে বললে, 'জয় হোক মহারাজ! রাজ রাজেশ্বরের জয় হোক। আপনার এই শ্রীবৈজয়ন্ত রাজপ্রাসাদে আমার যেন চিরস্থায়ী বসবাসের সৌভাগ্য হয় লোকেশ্বর রাজ রাজেন্দ্র!'

লোকটি পুলকিত হয়ে বললে, 'তথাস্তু! তুমি যদি তোমার কার্যকুশলতা প্রদর্শন করতে পার, তোমাকে আমি অচিরে আমার প্রধান অমাত্যের পদে নিয়োগ করব।

* * *

কিন্তু মাণিকের দুর্ভাগ্য তার সঙ্গে ফিরছে। সারাদিন বেশ ভালই কাটল। নিজের হাতে ইচ্ছে মত রান্না করে দু'বেলা খাওয়াও হল ভালো। রাত্রে 'শয়নে পদ্মনাভঞ্চ' বলে মাণিক আরামে শুয়ে পড়ল মহারাজের শয়নকক্ষের পাশের ঘরে একখানা মাদুর পেতে। ওঘর থেকে রাজাধিরাজের নাকডাকার শব্দ পেয়ে বুঝল মহারাজ অঘোরে ঘুমুচ্ছে। মাণিকেরও দু'চোখ বুজে এল। গভীর নিদ্রা! চাকরি পেয়েছে। আজ সে নিশ্চিন্ত।

তারপর হল কি, তখন প্রায় অর্ধেক রাত! মেনি বেড়ালটার করুণ মিউ মিউ ডাকে মাণিকের ঘুম ভেঙে গেল! চোখ মেলে দেখে ঘরে আগুন লেগেছে! তাড়াতাড়ি উঠে ছুটে পাশের ঘরে গিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোনো রাজাসাজা লোকটাকে ধাক্কা মেরে বিছানা থেকে তুলে হাঁপাতে হাঁপাতে মাণিক বললে ডেকে—উঠুন! উঠুন! মহারাজ! রাজাধিরাজ! রাজেন্দ্রপতি! লোকেশ্বরনাথ! মহামান্য বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ-সিংহাসন যদি বাঁচাতে চান এইবেলা গাত্রোৎপাটন করুন। যজ্ঞের আহিতাগ্নি কুণ্ডচ্যুত হোমহবিজাত বহ্নিশিখা লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করেছে। গেল বুঝি আপনার চীনাংশুক, পট্টবাস, উত্তরীয়াদি রাজকীয় পরিচ্ছদ ভস্মীভূত হল। উঠুন! উঠুন! ওদিকে নৃপনন্দিনী রাজকুমারী রাজশ্রী বহ্নিতাপে রোরুদ্যমানা। শীঘ্র উঠে ব্রহ্মকমণ্ডলু ধৃত পূত মন্দাকিনী ধারা, বা হেমভৃঙ্গার সঞ্চিত বারি সিঞ্চনে যজ্ঞানলকে শান্ত করুন। আপনার দণ্ডমুণ্ডের বিধায়ক রাজদণ্ড ফটাফট্ শব্দে ফাটতে শুরু করেছে! বৈজয়ন্ত প্রাসাদের মণিদীপ নির্বাপিত। মহারাজের দুর্ভেদ্য দুর্গ রাজপ্রাসাদ ভস্মীভূত হল বলে! আমি পালাচ্ছি—আপনি পালান মহারাজ!

মাণিক পালিয়ে এসে পিছু ফিরে দেখলে আফিমের নেশায় বুঁদ মহারাজের ভূতে-পাওয়া লোকটার কুঁড়েঘরখানা দাউ দাউ করে জ্বলছে। মাণিকের মনে কষ্ট হল। আহা! পাগল লোকটা কিন্তু ভালই ছিল!

১৩৭১

নাই মামা আর কানা মামা

অন্নদাশঙ্কর রায়

নাই মামা বললেন
কানা মামাকে,
'ভাগনে ভাগনী নাই
তাই আমাকে
সংসারে মামা বলে
কেউ না ডাকে।'

কানা মামা বললেন
নাই মামাকে,
'চোখে যার নাই তার
কী হবে ডাকে
মামা হওয়া মিছে, যদি
চোখ না থাকে।'

১৩৮২

www.BanglaBook.org

এক ভাল্লুকের গল্প

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সে অনেক বছর আগেকার কথা। ১৯১৪ সালে ইউরোপে মহাযুদ্ধ বেধেছিল। যুদ্ধ বাধবারও কয়েক মাস আগেকার একটা গল্প বলছি। গল্পটা বানানো নয়, একেবারে সত্যি ঘটনা।

সেই সময় নইনিতাল ও আলমোড়ার মাঝামাঝি রামগড় পাহাড়ে আমাদের একটা বাড়ি ছিল। সেখানে যাওয়া সহজ ছিল না, এত চড়াই ভাঙতে হয় যে সে রাস্তায় মোটর যেতে পারত না। রামগড়ে যেতে গেলে বেরিলিতে গাড়ি বদল করে ছোট রেল লাইনে পাঁচকে ট্রেনে করে কাঠগুদাম স্টেশনে নামতে হত। এখান থেকেই ঐ অঞ্চলের হিমালয় পাহাড় আরম্ভ হয়েছে। কাঠগুদাম থেকে ঘোড়ার পিঠে পাহাড়ে উঠতে হয়। যারা ঘোড়ায় চড়তে ভয় পায় তাদের জন্যে ডাণ্ডী বলে একরকম হাতলওয়ালা আরাম-চেয়ার পাওয়া যায়, চারজন বাহক সেটা কাঁধে করে নিয়ে যায়। আমাদের বাড়িটা রামগড় পাহাড়ের উপরে ৭০০০ ফিট উঁচুতে ছিল, কাঠগুদাম থেকে ১৬ মাইল পথ উঠে যেতে হত। আমার বাবা বাড়িটার নাম দিয়েছিলেন 'হৈমন্তী'। বেশ সুন্দর নাম নয় কি? হৈমন্তী নামের মধ্যেই পাহাড়ের ঠাণ্ডা ভাব যেন বেশ রয়েছে।

গরমের ছুটি পড়লে বাবা আমাদের নিয়ে গেলেন রামগড়ে। শান্তিনিকেতনে তখন দারুণ গরম লু বইছে, জলের অভাবে গাছপালা সব মরমর। পাহাড়ে পৌঁছে সেই গরম থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বড় আরাম বোধ হল। আমরা কয়েকজন হৈমন্তীতে গিয়ে গুছিয়ে বসবার পর অনেক লোক সেখানে এসে পড়লেন। অতিথিতে বাড়ি ভরে গেল। যদিও হৈমন্তী পাহাড়ের একটা নিতান্ত নিরালা জায়গায়, লোকের বসতি বা হাটবাজার থেকে দূরে, আমাদের খাওয়া-দাওয়ার অভাব হল না। বাড়ির সঙ্গে মস্ত বড় বাগান ছিল ; আপেল, পেয়ারা, পীচ, চেরি প্রভৃতি ভাল ভাল ফলের গাছ ছিল বিস্তর। বাগানে সব্জীও হত প্রচুর। খুব মজা করে আমরা সেই সব ফল ও সব্জী খেতুম।

গণ্যমান্য অতিথিদের মধ্যে এলেন অতুলপ্রসাদ সেন ও সি. এফ. এন্‌ড্রুজ। অতুলবাবুর নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তিনি ছিলেন কবি—অনেক গান বেঁধেছিলেন, তাঁর গান শুনতে সকলে ভালবাসতেন। আর সি. এফ. এন্‌ড্রুজ সাহেব হলে কি হয়, তিনি আমাদের দেশকে নিজের দেশ করে নিয়েছিলেন। তিনি উৎপীড়িত ও গরিবদের সর্বদা সাহায্য করতেন বলে লোকে তাঁর 'দীনবন্ধু' নাম দিয়েছিল। আমাদের কাছে আরো এলেন আমার ভাইপো দিনেন্দ্রনাথ ও মুকুল দে। দিনেন্দ্রনাথ খুব ভাল গান গাইতে পারতেন, বাবার সব গান তিনি জানতেন বলে লোকে তাঁকে বলত 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাণ্ডারী'। মুকুল দে তখন শান্তিনিকেতন ইস্কুলের ছাত্র, তার আঁকার খুব শখ, রাতদিনই কাগজ পেন্সিল নিয়ে সকলের ছবি এঁকে বেড়াত। পরে সে আর্টিস্ট বলে নাম করেছে।

এতগুলি লোক এক বাড়িতে, আমাদের খুব জমেছিল সেবার। রোজ সকালবেলায় পাহাড়ের গায়ে একটা গুহার সামনে আমরা সকলে বসতুম। সেখান থেকে যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই মনোরম দৃশ্য। কত পাহাড়-পর্বতের শ্রেণী, তাতে কতরকমের গাছ। পিছন দিকে পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত গভীর বন, তার ভিতর কত বিচিত্র রকমের সুন্দর অর্কিড ফুল। সবচেয়ে ভাল লাগত দেখতে বরফের পাহাড়ের অপূর্ব দৃশ্য। সকালবেলার রোদে বরফে ঢাকা পর্বতশিখরগুলি ঝক্‌ঝক্ করত আমাদের চোখের সামনে। রোজই সেখানে আমাদের গানের মজলিস বসত। কত নতুন গান বেঁধে বাবা আমাদের শোনাতেন। অতুলপ্রসাদ সেনও তাঁর অনেক গান শোনাতেন। অতুলবাবুর ফরমাসমত দিনেন্দ্রনাথকে বাবার পুরনো গান গাইতে হত। গানের মজলিস চলত দুপুর পর্যন্ত। বনমালীর তাগিদে তখন গান বন্ধ করে খেতে যেতে হত।

গান, গল্পগুজব, কাব্য-আলোচনা, কবিতাপাঠ নিয়ে রামগড়ের হৈমন্তী বাড়িতে আমাদের দিনগুলি খুব আনন্দে কেটেছিল। এর মধ্যে একটি ঘটনা হল—তারই গল্প তোমাদের বলব বলে লিখতে বসেছি।

মুকুল কারো কাছ থেকে শুনেছিল রামগড় পাহাড়ের আশেপাশে অনেক বুনো জন্তু-জানোয়ার আছে। সাহেবরা এখানে শিকার করতে প্রায়ই আসে। সেই শুনে অবধি তার শিকারের ভারি লোভ হল। আমাকে রাতদিন অনুরোধ করত, "চলুন, শিকারে যাই ; দাদা, আমাকে শিকারে নিয়ে চলুন।" তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম—শিকার করতে গেলে বন্দুক লাগে, এখানে শিকার করতে আসিনি, বেড়াতে এসেছি, বন্দুক আনা হয়নি। এই কথা শুনে সে চুপ করে গেল, ক'দিন আর কিছু বলে না। আমিও নিশ্চিন্ত হলুম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রেহাই পেলুম না। একদিন ভোরবেলায় আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে মুকুল আমাকে বলে, "দাদা, উঠুন, চলুন—সব ঠিক আছে।" দেখলুম ঠিকের মধ্যে একটি মান্ধাতা আমলের গাদা বন্দুক। আমাদের বাড়ি তদারক করে যে মুন্সী, তার কাছ থেকে বন্দুক জোগাড় করেছে কেবল নয়, তাকে সুদ্ধু ধরে নিয়ে এসেছে।

মুকুল বললে, "মুন্সীকে নিয়ে এসেছি। সে আমাদের পথ দেখাতে পারবে, জঙ্গলে আমরা হারিয়ে যাব না।"

মুকুল নাছোড়বান্দা। না গিয়ে উপায় নেই। পকেটে কিছু খাবার নিয়ে আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের বাড়ি ছাড়িয়ে খানিকটা গেলেই বন। গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়লুম।

www.BanglaBook.org

সেখানে আদ্যিকালের বুড়ো বুড়ো 'ওক' গাছ। তাদের ডালপালা শ্যাওলার মত 'মস্' দিয়ে ঢাকা। গাছের তলায় এত অন্ধকার যে যেতে গা ছম্‌ছম্ করে। 'ওকে'র বন শেষ হল ত পাইনের বন আরম্ভ হয়। পাইনের পাতা সুতোর মত সরু লম্বা বলে ইংরেজিতে 'নীড্‌ল্‌স্' (সূচ) বলে। শুকনো সেই পাতা পড়ে মাটিতে পুরু হয়ে বিছিয়ে থাকে। তার উপর দিয়ে হাঁটা বড় মুশকিল, পা হড়কে যায়। প্রত্যেক গাছের গায়ে একটি করে মাটির ভাঁড় বাঁধা থাকে, গাছ থেকে যে আঠা বেরয় তাই ধরবার জন্য। পাইনের আঠা থেকে রজন ও তারপিন তৈরি হয়। তাই পাইনের বন সুগন্ধে ভরা।

এইরকম কত বন, কত পাহাড়, কত ঝরনা পার হয়ে আমরা চললুম। সমস্ত দিন ঘুরে বেড়ালুম, না একটা বাঘ, না একটা ভাল্লুক, এমন কি না একটা শেয়াল দেখতে পাওয়া গেল। কোথাও উপরের পাহাড় থেকে ঝিরঝির করে জল নেমে আসে। জল দেখলেই মুকুল থমকে দাঁড়ায়। জলের ধারে পায়ের কোনো দাগ দেখতে পেলেই কানে কানে আমাকে বলে—"দাদা, আছে, আছে, বাঘের পায়ের দাগ দেখেছি, চলুন দাগ ধরে এগিয়ে যাই।"

আবার চলতে থাকি। কিন্তু জ্যান্ত কোনো জীবেরই সন্ধান পাওয়া গেল না। পেলে যে কী বিপদ হত তা আমি বুঝতে পারছিলুম। সঙ্গে একটিমাত্র বন্দুক, তাও সিপাহী বিদ্রোহ আমলের হবে। ভগবানের দয়ায় বাঘ-ভাল্লুকরা দেখা দিল না। সন্ধ্যা হয়ে আসে, মুন্সীকে বললুম এখন বাড়ি ফেরবার পথ দেখিয়ে দাও। হৈমন্তী থেকে অনতিদূরে একটি মস্ত বড় 'ওক' গাছ ছিল। সমস্তদিন পাহাড়ে ওঠা-নামা করে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলুম। পা আর চলে না। আমরা তিন জনে বসে পড়লুম সেই গাছতলার গাছের গুঁড়ি ঠেসান দিয়ে। যেই বসে একটু আরাম করছি, মাথার উপরে ডালপালার মধ্যে খড়খড় শব্দ হল, ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালুম। দাঁড়িয়েছি আর মেটে রঙের একটা ভাল্লুক ঝুপ করে পড়ল মাটিতে ঠিক আমাদের সামনে। নেমে পড়েই দু' পা তুলে আমাদের দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমার পিছনে একটি গোঙানির শব্দ শুনতে পেলুম। বন্দুক তুলতে যাব—কে আমাকে জাপটে ধরল। বন্দুকটা তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য টানাহেঁচড়া করছি—এমন সময় ভাল্লুকটা মুখ ফিরিয়ে হুড়মুড় করে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমার মনে হল চলে যাবার সময় তার মুখে যেন একটু বিদ্রূপ-হাসি দেখা গেল। ভাল্লুক কি হাসতে পারে? কে জানে! আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে সে কি সত্যি কৌতুক বোধ করল? কি জানি, তবে চলে গেল তাই রক্ষে। আমরা আর দেরি করলুম না, বিশ্রাম করা চুলোয় গেল—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলুম পা চালিয়ে।

যতদিন তারপর আমরা রামগড়ে ছিলুম, মুকুল আমার কাছে শিকারের কথা ঘুণাক্ষরেও আর তোলেনি।

১৩৬৮

www.BanglaBook.org

স্মৃতিকণা

যোগেশচন্দ্র মজুমদার

হিমালয়ের এক সুবৃহৎ বিষাক্ত জীবন্ত সর্পের সহিত আমাকে কি ভাবে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছিল, আমি তাহাই বর্ণনা করিব। সেই দিনটির কথা মনে করিলে এখনও যেন মনে আতঙ্ক জাগিয়া উঠে। এই ঘটনাটির সঙ্গে হিমালয়ের পশু ও পাখির দুই একটি ঘটনারও উল্লেখ করিব। উহা হয়ত তোমাদের কৌতূহল উদ্রেক করিতে পারে।

সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর কাল শিমলার কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসে আমার অতিবাহিত হয়। অবশ্য সারা বৎসর শিমলায় থাকিতে হইত না। গ্রীষ্মের সাতমাস শিমলায় থাকিতাম এবং বাকি পাঁচ মাস কলিকাতায় কাটিত। ১৯১২ সালে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইলে উহা শিমলা-দিল্লী হইয়া দাঁড়ায়। ১৯৪০ সালে দিল্লী থাকিতে আমি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করি। দিল্লীর প্রখর গ্রীষ্ম ও প্রচন্ড 'লু' এড়াইবার জন্য ইহার পরে উপর্যুপরি চারি বৎসর শিমলায় কাটাই। যে ঘটনাটি উল্লেখ করিব এই সময়েই তাহা ঘটে।

১৯০৭ সালে যখন শিমলায় প্রথম যাই তখন ছোট শিমলা পল্লীতে আসিয়া উঠি। এই পল্লীটিতে তখন পঁচিশ-ত্রিশ ঘর বাঙ্গালী পরিবার বাস করিতেন। পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ ছিল। পল্লীটির পরিবেশও বেশ সুন্দর ছিল। পল্লীটির ভিতর কয়েকটি সুবৃহৎ পাইন (স্থানীয় ভাষায় কেলু) গাছ ছিল। নিকটেই পাঞ্জাব সেক্রেটেরিয়েটের Ellerslic নামক সুবৃহৎ প্রস্তর নির্মিত সুদৃশ্য প্রাসাদ স্বরূপ ভবন। ছোট শিমলার বাজার যেখানে শেষ হইয়াছে 'কুসুমটি' নামক উপকণ্ঠটি সেখানেই আরম্ভ। ইহার ভিতর দিয়া একটি রাস্তা 'জুংগা' নামক তদানীন্তন ভারতীয় একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। পথে অশ্বিনী নামে একটি পার্বত্য নদী পড়িত। ইহা ছাড়া ছোট শিমলার কাছাকাছি অনেকগুলি সুন্দর বেড়াইবার স্থান ছিল। অবসর গ্রহণের পর যখন শিমলায় পুনরায় আসি তখন এই ছোট শিমলা পল্লীতেই আসিয়া উঠি।

প্রাতর্ভ্রমণ আমার চিরকালের অভ্যাস। শিমলায় থাকিতে সূর্যোদয়ের পূর্বে ভোরে বেড়াইতে বাহির হইতাম। প্রত্যহ প্রায় ৫।৬ মাইল বেড়াইয়া আসিতাম। এমন কি তুষারপাতের সময়েও দুই-তিন মাইল বেড়াইয়া আসিয়াছি। সূর্যোদয় কালে চির-তুষার শ্রেণী হিমালয়ের সুউচ্চ পর্বত শিখরগুলি যে অপরূপ রূপে রঞ্জিত হইয়া উঠিত তাহা দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়া উঠিত। ছোট শিমলার অনতিদূরেই যে সর্বাপেক্ষা মনোরম স্থানটি ছিল, উহার নাম ছিল Chota Chelsea। ইহা একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র পর্বত। ইহার শীর্ষদেশে Jesus-Marie Convent ও তৎসংশ্লিষ্ট হোস্টেল। ইহার নিকটেই গির্জার Archbishop-এর বাড়ি। পর্বতের অপর পার্শ্বে পাঞ্জাবের মালের-কোটলা নামক স্থানের জমিদারের বৃহৎ ভবন। আর কোনও বাড়ি ছিল না।

এই পাহাড়টি ঘিরিয়া যে নির্জন পথটি চলিয়া গিয়াছে উহা সহজেই মনকে আকর্ষণ করে। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক Sir Edward Buck তাঁহার Simla—Past and Present বহিতে (যাহা লর্ড কার্জনের আদেশে লিখিত হয়) এই পথটিকে One of the finest walks in and around Simla বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই পথটির এক স্থানে একটি বেঞ্চ পাতা ছিল। তাহার পাশ দিয়া দিদারগড় নামক ছোট পাহাড়ী গ্রামের পথটি নামিয়া গিয়াছে। আমি এই বেঞ্চে বসিয়া অনেক সময় পথশ্রম দূর করিতাম। সম্মুখে পর্বতের দৃশ্য অতি মনোরম।

যে ঘটনাটির কথা উল্লেখ করিব তাহা এই পথটিতেই ঘটে। সেইদিন প্রাতর্ভ্রমণের পর, বেঞ্চটিতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বাড়ি ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হই। তখন সবে মাত্র সূর্যোদয় হইয়াছে। রাস্তায় লোক চলাচল আরম্ভ হয় নাই। বেঞ্চটি ছাড়িয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি বাঁকের নিকট যেমন পৌঁছিয়াছি তখন মনে হইল পিছন হইতে আমার মস্তক লক্ষ করিয়া একটি ছোট গাছের শাখা অথবা ঐরূপ কোন দ্রব্য কেহ ছুঁড়িয়া মারিল।

মনে হইল নিকটস্থ গ্রামের কোনও দুষ্ট ছেলের কাজ, মজা দেখিবার জন্য এরূপ করিয়াছে। কিন্তু পাহাড়ী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার যেরূপ পরিচয় ছিল তাহারা যে অমন কাজ করিবে তাহা মনে হইল না। ইহারা অত্যন্ত শান্ত ও সরল প্রকৃতির। তবুও একবার পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে সম্মুখে একবার চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু এবারেও কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অতঃপর যাহা চোখে পড়িল তাহা দেখিয়া মনে যে আতঙ্ক জাগিয়া উঠিল তাহা বলিবার নহে। চোখে না দেখিলে উহা বিশ্বাস করিয়া উঠা কঠিন।

দেখি যে আমার ডান পায়ের কাছেই, এক হাত দূরে হইবে,

www.BanglaBook.org

একটি সুবৃহৎ গোখুরা সাপ (Hamadryad) কয়েকটি কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বুঝিলাম পার্শ্বে পাহাড়ের শীর্ষদেশ হইতে পড়িয়াছে এবং নামিবার সময়ে আমার শরীরে প্রতিহত হইয়া নিচে রাস্তায় পড়িয়াছে। পাহাড়টি বৃক্ষলতাহীন, সমতল চট্টানের মত ; কোনও অবলম্বন না পাইয়া সাপটি ২০০।৩০০ ফিট নিচে আসিয়া পড়িয়াছে। সাপটিকে দেখিয়া মনে হইল উহা হয়ত মরিয়া গিয়া থাকিবে, অথবা অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। সত্যই কি হইয়াছে দেখিবার জন্য ঐ স্থানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম।

প্রায় দশ মিনিট অপেক্ষা করিবার পর দেখি উহার দেহ সামান্য নড়িয়া উঠিল এবং কিছু পরে সাপটি কষ্ট করিয়া তাহার মাথাটি তুলিবার চেষ্টা করিল। আমি তাহা লক্ষ করিয়া কিছু দূরে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলাম। কিছুক্ষণ পরে সাপটি পাহাড়ী রাস্তার ধারে যে বড় বড় ঘাসের ঝোপ ছিল তাহার মধ্যে নিজের শরীরটি প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতেছে দেখিলাম। সমস্ত শরীরটি যে তাহার কত দীর্ঘ তাহা এইবার আমার দেখিবার অবকাশ হইল। মনে হইল উহার যেন শেষ নাই। দশ-বারো হাত দীর্ঘ হইবে মনে হইল, কারণ তাহার লেজটি অদৃশ্য হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। পাহাড়ী গোখুরা সাপ যে এত দীর্ঘ হইয়া থাকে তাহা আপিসের এক সাহেবের নিকট শুনি। তিনি বন্দুকের গুলি করিয়া এইরূপ সাপ একবার মারিয়াছিলেন।

অতঃপর সাপটি কোথায় গেল তাহা দেখিবার জন্য উহার পিছন লইবার ইচ্ছা হইল, তবে এ কথাও একবার মনে হইল যে উহা করা যুক্তিসঙ্গত হইবে কি না। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম যে যখন আমি সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও উহার কোন অনিষ্ট করি নাই, উহা হইতেও আমার অনিষ্ট হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

যাহা হউক, সম্মুখেই পাহাড়ের যে বাঁকটি ছিল তাহা অতিক্রম করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি, দেখি যে সাপটি ঘন ঝোপের ভিতর হইতে প্রায় দুই তিন ফুট উচ্চে, মুখ বাহির করিয়া, দেহটি স্থির রাখিয়া অবস্থান করিতেছে। দুইটি জিহ্বা বিদ্যুৎগতিতে মুখের মধ্যে যাতায়াত করিতেছে। আশ্চর্যের বিষয় আমি উহার নিকট দিয়া গেলেও (এক হাত দূরে) আমাকে কিছুই করিল না, একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল মাত্র।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি, দেখি যে একটি ইংরাজ মহিলা তাঁহার terrier কুকুরটিকে লইয়া প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ভাবিলাম তাঁহাকে একবার সতর্ক করিয়া দিই, কিন্তু মনে হইল যদি ইতিমধ্যে সাপটি আত্মগোপন করিয়া থাকে ত মহিলাটি আমি যে তাঁহাকে খুব পরিহাস করিয়াছি মনে করিয়া আমাকে অভিশাপ দিতে কার্পণ্য করিবেন না! যাহা হউক আরও কিছু-দূর অগ্রসর হইবার পর দেখি আর একজন ব্যাঘ্রোরস্ক, বৃষস্কন্ধ ইংরাজ যুবক হন্‌হন্‌ করিয়া আগাইয়া আসিতেছে। হাতে তাহার বেতের ক্ষুদ্র সংস্করণ। ভাবিলাম ভালই হইল, মহিলাটি যদি সত্যই কোনও বিপদে পড়িয়া থাকেন ত সে গিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে পারিবে।

বাড়িতে ফিরিয়া কাহাকেও এই বিপজ্জনক ঘটনাটির কথা প্রকাশ করিলাম না। কিন্তু পরদিন প্রাতে বহুবিলম্বে যখন আমাদের পাহাড়ী গোয়ালা পরশুরাম দুধ লইয়া আসিল, বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে জানাইল যে, যে রাস্তা দিয়া প্রত্যহ সে দুধ আনে সেই পথে একটি সুবৃহৎ বিষাক্ত সাপ দেখা দিয়াছে। এরূপ বড় সাপ নাকি প্রায় দেখা যায় না। তাহাকে মারিবার অনেক চেষ্টা হইতেছে কিন্তু উহা বিফল হইয়াছে। সকলে ঐ পথে চলা ত্যাগ করিয়াছে। অনেক পথ তাহাকে ঘুরিয়া আসিতে হইয়াছে। বাড়ির সকলেই জানিতেন আমি ঐ পথে প্রায়ই প্রাতর্ভ্রমণে যাই, সুতরাং আমাকে সাবধান করিয়া দিলেন যেন ঐ পথে কিছুদিনের জন্য আর না যাই। তাঁহাদের কথা শুনিয়া আমি মনে মনে হাসিলাম, মুখে কিছু প্রকাশ করিলাম না। কয়েক মাস পর সমগ্র ঘটনাটি সকলের কাছে বিবৃত করি। তাঁহারা উহা শুনিয়া আমার যে অসীম সাহসের প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ বাহুল্য!

পরবর্তী ঘটনাটি পাহাড়ী 'লক্কড়' (নেকড়ে) বাঘ সম্বন্ধে। এই ঘটনাটিও উপরিউক্ত পথটিতেই ঘটে। অক্টোবরের শেষ, শীত ত পড়িয়া গিয়াছে, নিয়মিত প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। সমস্ত পাহাড়টি পরিভ্রমণ করিয়া বাড়ি ফিরিতেছি, হঠাৎ একটি বাঁক যেমন পার হইয়াছি দেখি যে সম্মুখেই, ২০।২৫ হাত দূরে,—এক জোড়া সুপুষ্ট বৃহৎকায় 'লক্কড়' বাঘ। ইহাদের নাম পূর্বে শুনিয়াছিলাম, কখনও দেখি নাই। নূতন জন্তু দেখিয়া যেমন আনন্দ হইল, আতঙ্কও যে হয় নাই এমন নহে। যদিও জানিতাম ইহারা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের আক্রমণ করে না। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, Convent-এর হোস্টেলের রান্নাঘরটি যেখানে অবস্থিত তাহার ঠিক নিম্নেই পথের উপরে দাঁড়াইয়া ইহারা হাড় চিবাইতে ছিল। রান্নাঘর হইতে বাবুর্চিরা এই স্থানটিতে উপর হইতে হাড়, মাংস প্রভৃতি ফেলিয়া দিত। কতক পথে পড়িত, কতক খড়ে পড়িত। সেজন্য এই স্থানটিতে চিল, কাক, শৃগাল প্রভৃতি প্রাণীরা ভিড় করিত। আজ শুধু বাঘ দুইটিই চোখে পড়িল।

ইহারা শীতের সময়, উপর পাহাড়ে যখন খাদ্যের অভাব ঘটে, নিচে নামিয়া আসে। শিমলা সহরেও সেই সময়েই ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। ঘরের পোষা বিড়াল, কুকুর, ছাগল প্রভৃতির বাঁধন ছিঁড়িয়া রাত্রে চুপে চুপে আসিয়া লইয়া যায়। পাহাড়ীদের শিশুদিগকেও ধরিয়া লইয়া যায় বলিয়া শুনিয়াছি কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের আক্রমণ করে না।

তবে একবার আমার অফিসের এক বুড়া চাপরাশিকে এক জঙ্গলের পথে তাড়া করিয়াছিল। সে একাকী পার্বত্য পথে দেশে ফিরিতেছিল। সে এতদূর ভয় পায় যে তাহাকে তিন চারিদিন শয্যাতে থাকিতে হয়।

বাঘ দুটি সম্ভবতঃ আমাকে লক্ষ করে নাই। আমি আর অগ্রসর না হইয়া ধীরে ধীরে পিছু হটিয়া বহু পথ ঘুরিয়া শেষে বাড়ি ফিরিলাম।

শিমলায় লক্কড় বাঘ ছাড়া শীতের সময় snow leopard দেখা দেয়। একবার ডিসেম্বর মাসে প্রাতর্ভ্রমণের সময় পথে দেখি দুইজন পাহাড়ী বাঁশে বাঁধিয়া একটি মৃত snow leopard লইয়া যাইতেছে। আকারে দেখিলাম ইহারা প্রায় লক্কড় বাঘের মতই এবং দেখিতে অতি সুন্দর। তুষারশুভ্র গাত্রচর্মের উপর কয়েকটি কালো কালো ছোপ (spots)। বাঘটির প্রতি অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। এমন সুন্দর

www.BanglaBook.org

জন্তুটিকে যে মারিয়া ফেলা হইয়াছে তাহা জানিয়া মন দুঃখিত হইয়া উঠিল।

ভারতবর্ষের কোনও পশুশালায় এই বাঘ আছে কি না জানি না তবে কলিকাতা ও দিল্লীর পশুশালায় দেখি নাই। এই জাতীয় বাঘ গ্রীষ্মের সময়ে সমতলে থাকিতে পারে না। একবার কলিকাতায় পশুশালায় শীতকালে একজোড়া মেরুপ্রদেশের সুবৃহৎ ভল্লুক দেখি। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তাহাদের বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। সেই শীতকালে সন্ধ্যার সময় জলে বরফ গলাইয়া Hose দিয়া তাহাদের স্নান করাইয়া দেওয়া হইতেছিল। তাহাদের নাম ছিল—Darby and Joan (ডার্বি ও জোন) অর্থাৎ বুড়া-বুড়ী! দুঃখের বিষয়, শিমলায় যখন ফিরিয়া যাই, সংবাদপত্রে জানিতে পারি যে গ্রীষ্মের কষ্ট সহ্য না করিতে পারিয়া তাহারা উভয়েই মারা পড়ে।

লক্কড় বাঘ ও snow-leopard ভিন্ন শিমলার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে হিমালয়ের বৃহদাকার কালো ভল্লুক দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে ইহারা শস্য (ভুট্টা প্রভৃতি) পাকিলে ক্ষেতে প্রবেশ করিয়া খাইয়া যায় ও নানাবিধ ক্ষতিসাধন করে। ইহারা হিংস্র প্রকৃতির, মানুষকে মারিয়া না ফেলিলেও আক্রমণ করিতে পিছুপাও হয় না। সেজন্য সন্ধ্যার পর স্থানান্তরে যাইতে হইলে গ্রামবাসীরা দল বাঁধিয়া যায়।

১৯১২ সালে গ্রীষ্মকালে আমরা কয়জন আত্মীয় ও বন্ধু মিলিয়া শিমলা হইতে ২৭ মাইল উত্তরে শতদ্রু নদী ও তাহার তীরস্থ উষ্ণ প্রস্রবণগুলি দেখিতে যাই।

শিমলা হইতে পাঁচহাজার ফুট নিম্নে অবতরণ করিয়া তদানীন্তন ক্ষুদ্র ভারতীয় রাজ্য ভোজ্জি নগরীর পাশ দিয়াই শতদ্রু বহিয়া গিয়াছে। বহু দূর হইতে ইহার ভীষণ গর্জন শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারই অপর তীরে অন্তঃসলিলা প্রস্রবণগুলি। আমরা প্রাতে যাত্রা করিয়া রাত্রি নয়টার সময় ভোজ্জি পৌঁছাই। বসন্তপুর পৌঁছতে সন্ধ্যা হইয়া যায়।

সেই স্থান হইতে সমতল উপত্যকাভূমি আরম্ভ হইয়াছে। পরিবেশ ঠিক বাংলা দেশের মত বোধ হইল। বহু চাষের ক্ষেত দেখিলাম। বাগানে আম, কলা, নেবু প্রভৃতি ফলিয়া রহিয়াছে চোখে পড়িল। মনে বড় আনন্দ হইল। কিন্তু এই স্থানটিতে যেমন পৌঁছিয়াছি, কয়েকটি পাহাড়ী গ্রাম্য লোকেদের সহিত দেখা হইল। আমাদের বিদেশী লোক দেখিয়া তাহারা সতর্ক করিয়া দিল যে এই পথ ধরিয়া সন্ধ্যাবেলায় ভল্লুকেরা উপদ্রব করিতে আসে। সুতরাং আমরা যেন এই স্থানটি অবিলম্বে পরিত্যাগ করি নতুবা হিংস্র ভল্লুক দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। আমরা ঐ স্থান শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া রাত্রি নয়টার সময়ে 'ভোজ্জি' নগরে পৌঁছি ও রাজার অতিথি হই। সুবৃহৎ ও মনোরম অতিথিশালা দেখিয়া মুগ্ধ হই। রাজার মন্ত্রী আমাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে আমরা শতদ্রু নদী ও উষ্ণ প্রস্রবণগুলি (স্থানীয় ভাষায় 'তাতা পানি') দেখিয়া প্রভূত আনন্দ পাই। যদি সুবিধা হয় ত এই উষ্ণ প্রস্রবণগুলি সম্বন্ধে পরে কিছু লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

ইহার পরে যে ঘটনাটির উল্লেখ করিব তাহা বহুকাল পূর্বে ঘটে। ১৯১১ সাল। আমি তখন কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসে নিযুক্ত। সে সময়ে আমাদের অফিস কলিকাতা যাতায়াত করিত তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রাজধানীর পরিবর্তন তাহার পর বৎসরে হয়। সাধারণতঃ আমরা অক্টোবরের শেষে নিচে নামিয়া যাইতাম কিন্তু সে বৎসরে George V দিল্লীতে আসিয়া দরবার করিবেন বলিয়া নভেম্বর পর্যন্ত আমাদের শিমলায় থাকিতে হয়। ১১ই নভেম্বর জীবনে প্রথম তুষারপাত দেখিবার সুযোগ হয়। সে যে কি অপরূপ সুন্দর তাহা বলিবার নহে। সে সময়ে আমার সতীর্থ সুলেখক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শিমলায় ছিলেন। তাঁহাকে লইয়া কয়েকটি ফটোগ্রাফ তোলা হয়।

যে সময়ের কথা লিখিতেছি সে সময়ে আমার প্রায় সমবয়সী এক খুড়তুতো ভাইও কর্মোপলক্ষে শিমলায় থাকিতেন। ছোট শিমলা হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে। প্রত্যেক রবিবারে আমাদের ছোট শিমলার বাড়িতে আসিয়া তিনি সমস্ত দিন কাটাইয়া যাইতেন। দুজনে বৈকালে একত্রে বেড়াইতে বাহির হইতাম। যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিন বেলা পড়িয়া যাইবার জন্য, বেশিদূর না গিয়া, উপরে যে মনোরম রাস্তাটির কথা লিখিয়াছি সেই পথের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। তখন সন্ধ্যা হইবার বেশি বিলম্ব ছিল না। পথের যে স্থানটি হইতে দিদারগড় গ্রামে যাইবার জন্য অন্য একটি পাকদণ্ডির পথ নিচে নামিয়া গিয়াছে, তাহার উপরেই যেখানে পাহাড়ের ঢালটি নামিয়া আসিয়াছে, সেই ঢালটির উপরে গিয়া আমরা বসিয়া পড়িলাম।

বসিলাম বলা ঠিক হইল না, অর্ধশায়িত অবস্থায় থাকিতে হইল। স্থানটি খুব নির্জন। কিছুক্ষণ পরে মনে হইল, আমাদের পিছনে যে পাকদণ্ডিটি ছিল, তাহা দিয়া কেহ নামিয়া আসিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড গড়াইয়া আসিতেছে। আমরা ভাবিলাম কোনও পাহাড়ী হয়ত গ্রামের দিকে যাইতেছে। কিন্তু তাহাকে সম্মুখে রাস্তায় নামিতে দেখিলাম না। তখন পিছন ফিরিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে উভয়েরই হৃৎকম্প উপস্থিত হইল এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়াইল।

এরূপ পরিবেশের মধ্যে যে পড়িতে হইবে তাহা পূর্বে কল্পনাও করি নাই। যখন পিছন দিকে তাকাইলাম, দেখি যে আমার গা ঘেঁষিয়া একটি সুবৃহৎ স্বর্ণশীর্ষ ঈগল আসিয়া বসিয়াছে ও পাহাড়ের মধ্যে তাহার আহার অন্বেষণ করিতেছে। নিশ্চিন্ত চিত্তে সে চারিদিকে চলাফেরা শুরু করিল, আমাদের গ্রাহ্যের মধ্যে আনিল না।

এই পাখিটির একটু বর্ণনা আবশ্যক। এক উষ্ট্র পাখি (ostrich) ভিন্ন এত বড় পাখি এই প্রথম দেখিলাম। সমস্ত দেহ সোনার বরণ পালকে আবৃত। সুচিক্কণ, সুপুষ্ট দেহ। তাহার দৃপ্ত ভঙ্গীতে যে ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা সত্যই রাজকীয়।

পুরাকালে ইহাকেই বোধকরি পক্ষীরাজ গড়ুর বলিয়া অভিহিত করা হইত। চোখ দুইটির সুতীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বৃহৎ বক্র চঞ্চু এবং দু পায়ে চারিটি করিয়া বৃহৎ নখর ও দুই পায়ের দৃঢ় মাংসপেশী চোখে পড়িল। ইহারা যে অনায়াসে মেষ ও ছাগশিশু প্রভৃতি ছোট জন্তু লইয়া আকাশে উড়িয়া যাইতে পারে তাহা আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইল না। ছাত্রাবস্থায় স্কুলে Royal Reader নামক পাঠ্য পুস্তকে আছে যে সুইট্জারল্যান্ডের এক কৃষক রমণীর ক্ষেত্রে শায়িত শিশুপুত্রকে একটি ঈগল পর্বতশীর্ষে নিজ বাসায় লইয়া যায় ও পরে কিরূপে ঐ রমণী অসম সাহসে দুরধিগম্য পর্বত শিখর

www.BanglaBook.org

হইতে নিজ সন্তানকে অক্ষত দেহে উদ্ধার করিয়া আনে। সেই অদ্ভুত ঘটনাটির কথা মনে জাগাইয়া তুলিল।

অতঃপর আমরা ভাবিলাম ঈগলটি যদি আমাদের আক্রমণ করে, আমরা কি করিয়া আত্মরক্ষা করিব। আমাদের কাছে লাঠি দেখিয়া যে সে ভয় পাইয়াছে তাহা মনে হইল না। আহার অন্বেষণ করিয়া চারিদিকে ঘোরাফেরা শুরু করিল। আমাদের সমস্যা হইল কি করিয়া এ স্থান ত্যাগ করা যায়। শেষে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন 'সড়-সড়ি' দিয়া নিচে নামিয়া পড়ে সেই উপায় অবলম্বন করিয়া আমরা পাহাড় হইতে নিচে নামিয়া আসিলাম, গাত্র অনেক জায়গায় ছড়িয়া গেল। শেষকালে পাহাড় হইতে লাফ দিয়া নিচের রাস্তায় পড়ি ও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি। তখনও দিনের সামান্য আলো ছিল।

পক্ষীটি পক্ষ বিস্তার করিয়া কি ভাবে উড়িয়া যায় তাহা দেখিবার খুবই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পাখিটির উড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। স্কুলে যখন পড়ি, তখন একবার Strand magazine-এ একটি হিমালয়ের সুবৃহৎ স্বর্ণশীর্ষ ঈগলের ছবি (ফটো) প্রকাশিত হইয়াছে দেখি। পত্রিকাটিতে Curiosities বিভাগে উহা অন্তর্গত করা হইয়াছিল। শিমলার একজন ইংরাজ ঐ পাখিটি শিকার করিয়াছিলেন। পাখিটির বর্ণনায় বলা হইয়াছিল যে উহার পক্ষবিস্তৃতি ছিল ১৮ ফুট। আমাদের পাখিটির পক্ষ বিস্তার দেখিতে পাইবার কোনও সুবিধা হইল না।

ইহা ভিন্ন আর একবার কাছাকাছি ঈগল দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলায় জুংগার পথ হইতে ফিরিবার সময়ে শিমলার উপকণ্ঠ কুসুমটির নিকটবর্তী হইয়াছি, দেখি যে সম্মুখে অনতিদূরে পাহাড়ের একটি খাঁজে (ledge) একটি বাছুর চরিয়া বেড়াইতেছে। স্থানটি অনধিগম্য বলিলেই হয়, বাছুরটি কি করিয়া ঐ স্থানে পৌঁছিল তাহা বুঝা গেল না। ভাবিলাম হয়ত উপর পাহাড় হইতে নিচে হঠাৎ পড়িয়া থাকিবে, অনাহারে হয়ত মারা যাইবে। যাহা হউক, সেই পাহাড়টির খুব নিকটে যখন আসিয়া পড়িয়াছি, দেখিলাম যাহাকে বাছুর বলিয়া ভাবিয়াছিলাম উহা একটি সুবৃহৎ স্বর্ণশীর্ষ ঈগল। কিছু পরে পক্ষ বিস্তার করিয়া সে উপরের পাহাড়ের দিকে উড়িয়া গেল।

শিমলায় নভেম্বর মাসে Ladies Mile নামক রাস্তার উপরের আকাশে অনেক ঈগল উড়িতেছে দেখা যায়। উহারা এত ঊর্ধ্বে উড়ে যে তাহাদের চিল বলিয়া ভুল হয়। কাছে আসিলে উহাদের প্রকৃত রূপ ধরা পড়ে। কলিকাতায় চিড়িয়াখানায় ঈগল পাখি বলিয়া যে নমুনাটি আছে তাহা শিমলার ঈগলের কাছে চিলের মতই দেখিতে। দেখিলে হতাশ হইতে হয়।

শিমলার পশুপাখিদের লইয়া কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি। এখন দেখিতেছি যে আর একটি জন্তুর কথা বাদ পড়িয়া গিয়াছে। সে হইল আমাদের অতি পরিচিত প্রাণী—চতুর্ভুজ বানর। শিমলায় হনুমান ও বানর দুই-ই দেখা যায়। হনুমানেরা সংখ্যায় কম ও স্বভাবে অপেক্ষাকৃত শান্ত। ইহাদের সহরে আসিয়া উৎপাত করিতে দেখি নাই। কিন্তু বানরের কথা স্বতন্ত্র। ইহাদের উৎপাতে সহরবাসীদের সদাই সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। কাশী, বৃন্দাবন, পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানের বানরের উৎপাতের কথা অনেকেই জানেন। তাহাদের তুলনায় উৎপাতে যে শিমলার বানরগুলি কম দক্ষ তাহা মনে হয় না।

এই বানর লইয়া আমাদের যে একবার কী দুর্গতি হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিব। ইহারা এক এক সময়ে যে কিরূপ ক্রূর হইয়া উঠে তাহা বুঝা যাইবে।

একদিন রবিবারে প্রবাসস্থ এক বন্ধুকে লইয়া প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হই। আমরা দুজনেই ছুটির দিনে বাড়িতে আবদ্ধ না থাকিয়া নিকটে বা দূরে বেড়াইতে যাইতাম। যেদিনের কথা লিখিতেছি সেদিন আমাদের 'জ্যাকো' (যক্ষ) পাহাড়ের শীর্ষে যে হনুমানজীর মন্দির আছে সেখানে যাইবার কথা হয়। 'জ্যাকো' কথাটি যক্ষের অপভ্রংশ। শুনা যায় এককালে নাকি যক্ষেরা এখানে বাস করিত। পাহাড়ীরা ইহাকে 'জাখু' বলিয়া অভিহিত করে।

বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছি, দেখি প্রবেশদ্বারের মুখে বেড়াইতে যাইবার ফিটফাট পোষাক পরিয়া পাড়ার রজনীবাবুর ছোট ছেলেটি তাহার দিদির হাত ধরিয়া উপস্থিত হইয়াছে। উভয়ের বয়ঃক্রম যথাক্রমে আট ও দশ। তাহাদের দেখিয়া একটু আশ্চর্য বোধ করিলাম। কথাবার্তায় জানিলাম তাহাদের পিতা আমাদের সঙ্গে বেড়াইয়া আসিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। অত দূরে ও অত উচ্চ পাহাড়ে (৮০৪৮ ফুট) তাহারা যাইতে পারিবে কি না সন্দেহ প্রকাশ করাতে তাহারা বলিল যে দীর্ঘ ভ্রমণ তাহাদের অভ্যাস আছে। কোনও কষ্টবোধ হইবে না।

অগত্যা তাহাদের সঙ্গে লইতে হইল, তবুও তাহাদের জন্য একটা ভাবনা রহিয়া গেল। কিছু পরে বাজারের রাস্তায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যখন পৌঁছিয়াছি, দেখি যে আর একটি তের-চৌদ্দ বৎসরের বালক (বন্ধুপুত্র) তাহাদের বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া। আমরা হনুমানজীর মন্দির যাইতেছি শুনিয়া সে দৌড়িয়া বাড়ির ভিতর গিয়া মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিল ও নিকটস্থ দোকান হইতে বানরদের দিবার জন্য ছোলাভাজা প্রভৃতি কিনিয়া রুমালে বাঁধিয়া লইল ও নিজেদের জন্য একটি বড় কাঁচি শসাও সঙ্গে লইল। শসাটি শেষে আমার বন্ধুটিকে পকেটে রাখিতে বলিলাম। তিনি উহা নিজের ওভারকোটের পকেটে রাখিয়া দিলেন।

পথে Ridgewood নামে একটি বাংলো বাড়ি পড়িল। উহার সম্মুখেই কতকটা মাঠের মত। উহার এক পার্শ্বে কতকগুলি বেঞ্চ রাখা ছিল, এখানে সকলে মিলিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। মনে পড়িল কিছুদিন পূর্বে তক্ষশীলার নিকটে বুদ্ধদেবের যে অস্থি ও ভস্মরাশি আবিষ্কৃত হয় তাহা দেখিতে এই বাড়িতে আসি। Sir John Marshall, Director-General of Archaeology তখন এই বাড়িতে বাস করিতেন। অস্থি ও ভস্মরাশি আমরা দেখিতে পাই নাই। উহার আধারটি দেখিয়াছিলাম। অস্থি ও ভস্মরাশি মার্শেল সাহেব নিরাপত্তার জন্য safe-এ রাখিয়া দেন।

পথে কয়েকবার বিশ্রাম করিতে হইল। অবশেষে মন্দিরচূড়া দেখিতে পাওয়া গেল এবং আমাদের দেখিতে পাইয়া কেলু গাছ হইতে অনেকগুলি বানর আমাদের পিছু লইল।

মন্দিরে পৌঁছিয়া দেখিলাম ইহার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে কয়েকটি তক্তাপোশ পাতা রহিয়াছে। প্রাঙ্গণ হইতে কিছুদূরে গিয়া দাঁড়াইলাম। যে বালকটির হাতে ছোলাভাজা প্রভৃতি ছিল তাহা বানরদের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে বলিলাম। রুমালটি সে এতক্ষণ লুকাইয়া রাখিয়াছিল, যেমন বাহির করিয়াছে কোথা হইতে এক বৃহৎ বানরী (পাটরানী) আসিয়া উহার হাত হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া এক লাফ দিয়া গাছে উঠিল। এইবারে বিপদ দেখা গেল। ৫০।৬০টি বানর তখন তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া দাঁত খিঁচাইয়া কামড়াইবার চেষ্টা করিল। আমরা মন্দিরের পূজারীকে বালকটিকে রক্ষা করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলাম। তিনি বাহিরে আসিয়া ব্যাপার বুঝিয়া মন্দিরের ভিতর হইতে ছোলাভাজা প্রভৃতি আনিয়া চারিদিকে বানরদের মধ্যে ছড়াইয়া দিলেন। বালকটি পরিত্রাণ পাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল ও বলিল যে সে আর কখনও এখানে পদার্পণ করিবে না।

এই ব্যাপারটি যখন হয় তখন আমরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম সেখানেও এক ব্যাপার ঘটিয়া উঠে। একটা বুড়া কানা গোদা বানর (দফাদার নামে পরিচিত) আমার বন্ধুর ওভারকোটের পকেটে শসা দেখিতে পাইয়া, উহা পাইবার জন্য পকেটে হাত ঢুকাইয়া উহা লইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বন্ধুটি পকেটের ঢাকনা জোর করিয়া চাপিয়া থাকায় সে উহাতে অকৃতকার্য হইয়া তাঁহার পায়ের বুটজুতা সজোরে কামড়াইয়া দিল। তাহাতেও কোনও ফল হইল না দেখিয়া বন্ধুটির বাঁ হাতের তেলোতে দাঁত বসাইয়া সেই স্থানটি চিরিয়া দিল, ক্ষতস্থান হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। নিমেষের মধ্যে ইহা ঘটিয়া

গেল। ক্ষতস্থান টিপিয়া ধরিয়া রক্ত বন্ধ করা হইল ও পরে রুমাল দিয়া উহা Pressure Bandage করা হইল। পূজারী উহা দেখিয়া বলিলেন যে উহা তেমন কিছু নহে। সাহেবদের ছেলেমেয়েদের প্রায়ই বাঁদরেরা কামড়াইয়া দেয়, বিশেষ কিছু হয় না। এইসব দেখিয়া আমাদের সঙ্গে যে বালক ও বালিকাটি আসিয়াছিল তাহারা কাঁদিয়া ফেলিল ও বাড়ি যাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

বাড়ি ফিরিবার মুখে বন্ধুটি বলিলেন যে শসাটির প্রতি যখন বাঁদরদের দৃষ্টি পড়িয়াছে তখন উহাদেরই উহা দেওয়া হউক। সেই উদ্দেশ্যে পূজারীর হাতে উহা দেওয়া হইল। তিনি মন্দিরের ভিতর গিয়া উহা টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া একটি ধাতুপাত্রে লইয়া বাহিরে আসিলেন ও বারান্দায় দাঁড়াইলেন। আমাকে শসার টুকরাগুলি ছড়াইয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের একটি ব্যাপার দেখাইবার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিলেন। থালাটি হাতে লইয়া তিনি 'রাজা, রাজা, আ যা, আ যা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে দূর হইতে গাছের ডাল ভাঙ্গিবার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল এবং ক্রমশঃ ঐ শব্দ নিকটবর্তী হইল। দেখি যে এক বৃহৎকায় পীতবর্ণ ভল্লুকের ন্যায় গোদা বাঁদর উচ্চ কেলু গাছ হইতে নিচে মন্দিরের ছাদে প্রকাণ্ড এক লাফ দিয়া পড়িল। সমস্ত ছাদটি কাঁপিয়া উঠিল। এমন বৃহৎ বানর জীবনে কখনও দেখি নাই মনে হইল। তাহার হাত ও পায়ের মাংসপেশী দেখিয়া পালোয়ানদের কথা মনে পড়িল। ছাদের ধারে আসিয়া সে হাত বাড়াইয়া পূজারীর প্রসারিত হাত হইতে থালাটি লইল। সে যে প্রকৃত রাজা তাহার পরিচয় সে এবারে দিল। দু' এক টুকরা শসা মুখে দিয়া সশব্দে শসাসুদ্ধ থালাটি অন্য বানরদিগের মধ্যে ফেলিয়া প্রস্থান করিল।

১৩৭৬

www.BanglaBook.org

ঘোড়া গিন্নির ছড়া

অজিত দত্ত

ঘোড়াদের গিন্নিরা রাত্রে আসে
ঘুমটাকে ভেঙে দিতে ভয়-তরাসে।
আগুনের চোখ আর কাঁটার কেশর।
তাই নিয়ে উঠে আসে খাটের উপর।

খুর দিয়ে মাথাটাতে লাগায় চাঁটি,
মনে হয় লেগে যাবে দাঁতকপাটি।
নিয়ে আসে ভাবনা ও নিয়ে আসে ভয়,
রাত্তিরে নিরিবিলি ঘুমের সময়।

রাত্রের অশ্বিনী, কেন যে আসো!
বিছানায় উঠে এসে বিকট হাসো!
বিচ্ছিরি কালো কালো তোমার খুরে
কেন মারো চাঁটি মাথা-মুণ্ডু জুড়ে?

তুমি বুঝি মাঠে-ঘাটে-ক্ষেতে চরো না?
মানুষের দেশটাকে ভয় করো না?
কোনোদিন দৈবাৎ সুযোগ হলে
ধরে নিয়ে পুরে দেব আস্তাবলে!
লাগাম পরিয়ে কষে লাগাবো চাবুক,
তখন বুঝবে ভয় দেখানোর সুখ।

রাত্রের ঘোড়া-বউ আর এসো না।
একপাটি দাঁতে মিহি চিঁহি হেসো না।
চলে যাও দূরে কোনো গভীর বনে,
মানুষের দেশ থেকে নির্বাসনে।

মিথ্যে দেশের তুমি মিছে জানোয়ার,
যত জ্বালাতন করো, সব মিছে তার।
তোমাদের ভয় আমি করি না মোটে
ঘুম যদি তাড়াও তো ছড়াটা জোটে।

১৩৬৮

www.BanglaBook.org

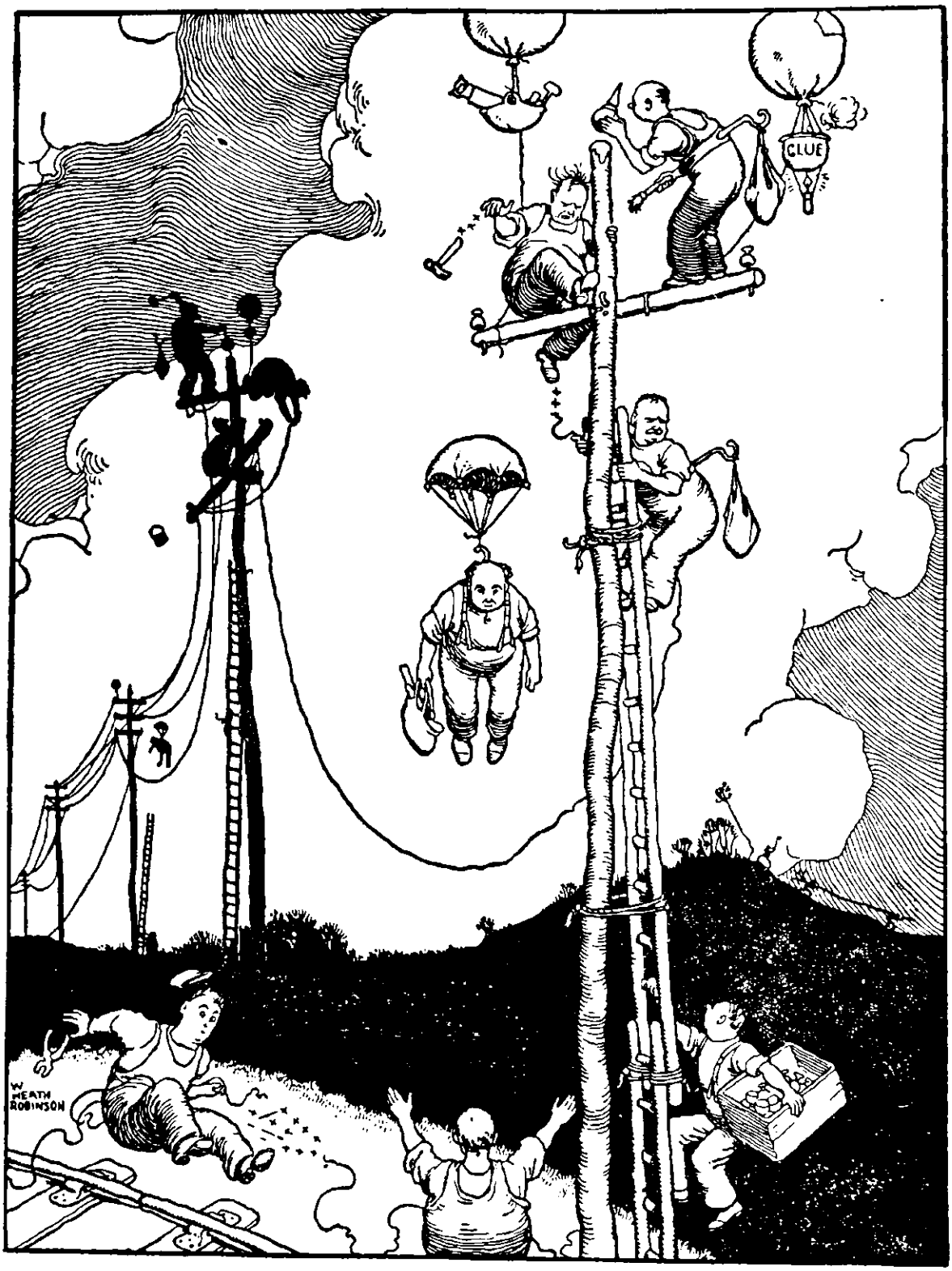

এ এক কাণ্ড কারখানা— রকম দেখে যাচ্ছে বোঝা কাজটা মোটে নয়কো সোজা
টেলিগ্রাফের পোস্টে গোঁজা টেলিগ্রাফের তারখানা।

www.BanglaBook.org

শশিশেখরের শিক্ষানবিশী

স্বপনবুড়ো

হ্যাঁরে, তোর নাম কি?

—আজ্ঞে আমার নাম শশিশেখর।

শশিশেখর যে বড্ড বড় নাম! ডাকতে গেলে দাঁত ভেঙে যাবে। হয় 'শশী', না হয় 'শেখর', একটা কিছু বেছে নে!

—না বাবু, সেটি হবার যোটি নেই। এই শশিশেখর নামটি আমার ঠাকুমার দেয়া। ন্যাজা-মুড়ো কিছুই ওর বাদ দেয়া চলবে না!

বটে! বটে! ন্যাজা-মুড়ো কিছুই ওর বাদ দেয়া চলবে না!

—এ'জ্ঞে!

—তা বাবা শশিশেখর, কলকাতার কলের জল খেতে কি নতুন এলে?

—এ'জ্ঞে! বাবা ব'লেছে, গাঁয়ে বসে থাকলে ত আর চলবে না। কলকাতায় এসে চালাক-চতুর হতে হবে।

—বটে! বটে! বটে! তা বেতন কত?

—সব কথা হরি খুড়োকে জিজ্ঞেস করে—কাল জানিয়ে যাবো। হরি খুড়ো আমাদের মোড়ল ত! তার কথাতেই আমরা পাঁচজন উঠি-বসি!

—তা হলে হরি খুড়োকে সঙ্গে নিয়ে কালকেই এসো। আমাদের আবার তাড়াতাড়ি কাজ দরকার।

—আচ্ছা পেন্নাম হই বাবু—

অল্প বয়েসের সবল চালাক-চতুর ছেলেটি বাড়ির বুড়ো-কর্তার পায়ে প্রণাম ঠুকে চলে গেল।

দলের মোড়ল হরি সব কথা শুনে বললে, হুঁ। বুঝলাম। কিন্তু হুট্ করে কোনো বাড়িতে কাজে লাগা ঠিক হবে না। আগে সব খবর বার্তা নিতে হবে। আর শোন শশিশেখর, তোকে এখন এক বছর শিক্ষানবিশী করতে হবে।

শশিশেখর ভয় পেয়ে উত্তর দিল, অ্যাঁ, খুড়ো, তুমি বলছ কি? শিক্ষানবিশী? আমি আবার সেই পাঠশালে ভর্তি হতে পারবো না। 'অঙ্ক' বানান করতে পারলাম না বলেই ত টেকো পণ্ডিতের চাঁদিতে চাপড় মেরে পালিয়ে এলাম। বাবা বললে এইবার কলকাতায় গিয়ে চালাক-চতুর হ'!

হরি বললে, আরে বোক্‌চন্দর, তোকে পাঠশালায় ভর্তি হতে কে বললে? শিক্ষানবিশী। তার মানে—আমার কাছে সব শিখে-জেনে নিবি। কি করতে হবে, কি খেতে হবে, কি ভাবে 'ব্যাভার' করতে হবে, কেমন করে ধুতি, গামছা বাবুদের কাছ থেকে আদায় করতে হবে; আর কেমন করে দিদিমণিদের ফাই-ফরমাস করে দিয়ে—নগদ টাকাটা-সিকিটা বকশিশ নিতে হবে—সব আমি তোকে পাখি-পড়া করে শিখিয়ে দেবো। কত অঘা ছেলেকে মানুষ করে দিলাম,—আর তুই ত চালাক-চতুর আছিস। আচ্ছা শশিশেখর, তুই রোজ সকালে চা খাস ত?

শশিশেখর আঁতকে উঠে বললে, না-না, চা আমি খাইনে। একদিন খেতে গিয়ে জিব পুড়ে গিয়েছিল।

হরি ধমক দিয়ে উঠে কইলে, ওই ত তোর দোষ। খাবিনে কেন? বাবুদের বাড়ির পয়সায় তৈরী চা অবশ্য খাবি—

—কিন্তু যদি জিব পোড়ে?

—দূ' একদিন অমন জিব পোড়ে। তারপর দেখবি, ঠিক অভ্যেস হয়ে যাবে। জিব পুড়বে বলে হক্কের পাওনা ছেড়ে দিবি?

—সে ত ঠিক কথাই খুড়ো!

—তারপর ধর,—বাবুরা, কি গিন্নিরা যদি পান সেজে দিতে বলে,—তাহলে প্রতিবার একটি করে পান নিজে খেয়ে নিবি—। হক্কের পাওনা ছাড়বি কেন?

—হঃ! সে ত ঠিক কথাই খুড়ো!

—বুঝলি বোক্‌চন্দর, একেই বলে শিক্ষানবিশী।

—তোমার কাছ থেকে সব শিখে নেবো খুড়ো!

—আর শোন। বাজার করবার সময়ও উপরি পাওনা আছে।

—সেটা কেমন খুড়ো!

—এই ধর, বাড়ির বাবু যদি বাজার করবার সময় সঙ্গে যায়, তবে—আলুওয়ালা, পটলওয়ালা, মেছুনীদের সঙ্গে তোর তলে তলে ব্যবস্থা রাখতে হবে। অন্য সময় গিয়ে 'দস্তুরি' নিয়ে আসবি। সবাই তোর পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দেবে। আর বাজারের সময় বাবুরা যদি সাথে না থাকে ত একেবারে পোয়া বারো। প্রতিটি জিনিস কিনে পয়সা সরাবি। মাসের শেষে হিসেব করে দেখবি—মাইনের চাইতে অনেক বেশি আয় হয়েছে তোর। সেই টাকা দেশে পাঠিয়ে দিবি। জমিয়ে জমিয়ে ধানী জমি কেনা হবে।

—বাঃ খুড়ো, তোমার ত অনেক বুদ্ধি।

—বুদ্ধি না থাকলে চলে। এই করে আমি দেশে অনেক বিঘে ধানী জমি করেছি। বুড়ো বয়েসে পায়ের ওপর পা রেখে বসে থাকবো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তোমার কথা বুঝে নিয়েছি খুড়ো।

—কিছু বুঝিসনি, আরো অনেক জানবার কথা আছে।

—আবার কি কথা?

—শোন শশিশেখর, গায়ে-গতরে খেটে বাড়ির সবাইকে বশে আনবি। তখন সবাই বলবে শশিশেখর ছাড়া আর আমাদের একদিনও চলবার যো নেই! হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসতে

www.BanglaBook.org

হবে—বাড়ির ছোট-বড় সকলকে। আর এইভাবে জাল বিছাতে হলে—জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ অবধি সব কাজ তোকে একহাতে করতে হবে। তখন দেখবি—শশিশেখর বলতে সবাই অজ্ঞান। তখন আবার ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হবে।

—ঝোপ বুঝে কোপ? সেটা আবার কি খুড়ো বল ত?

সময় মত সব বুঝিয়ে দেবো। একদিনেই কি তুই সব কৌশল শিখে নিতে চাস নাকি?

পরের দিন যথা সময়ে হরি খুড়োর সঙ্গে গিয়ে শশিশেখর বুড়ো কর্তার বাড়িতে কাজে বহাল হল!

এই বুড়ো কর্তার বাড়িতে অনেক মানুষ। পাঁচজন ছেলে। বড়, মেজ, সেজ, রাঙা, ছোট। সবাই বড়সড় চাকরী-বাকরী করে। তাদের বৌ ছেলেমেয়ে—একেবারে রমরমা গমগমা সংসার।

ছেলেরা সভা-সমিতি করে, ফুটবল খেলে, কলেজে যায়, থিয়েটার করে। আর মেয়েরা কলেজে যায়—গান-বাজনা-নাচ শেখে। গিন্নিরা লাইব্রেরী থেকে ক্রমাগত মোটামোটা উপন্যাস নিয়ে আসে, দুপুরে ঘুমুবার ওষুধ হিসেবে পাতা খুলে শুয়ে পড়ে, তারপর খানিক বাদেই বই পড়ে গড়িয়ে, আর তাদের নাসিকা ধ্বনি শোনা যায়। সকালে-দুপুরে-বিকেলে প্রচুর পান চিবোয় গিন্নিরা।

সব কাজ শশিশেখরকে সামলে চলতে হয়।

বুড়ো কর্তা ত একাই একশ'। তাঁকে ঘড়ি-ঘড়ি তামাক সেজে দিতে হয়।

তা ছাড়া দিনে দু'বার তিনি আফিং খান। সে ব্যবস্থাও শশিশেখরকে করতে হয়। একবার বিকেল পাঁচটা আর একবার রাত দুটো। রাত দুটোর সময় বুড়ো কর্তার ঘুম একবার ভাঙবেই। বিছানায় উঠে তিনি যেই উসখুসু করবেন,—অমনি তার মুখের কাছে এক ডেলা আফিং ধরতে হবে। ওটা মুখে দিয়ে তিনি আবার অঘোরে ঘুমিয়ে পড়বেন।

বুড়ো কর্তার এই বিরাট সংসার নিয়ে শশিশেখর একেবারে হিমসিম্।

সকাল থেকেই নানা সুরে—নানা গলায় তার ডাক পড়তে থাকে।

বাড়ির দাদাবাবুরা চোখ কচলেই চা-চা-চা বলে চীৎকার শুরু করে দেয়।

যে সব বাচ্চা ছেলেমেয়ে সক্কাল বেলা ইস্কুলে যায়—তাদের বরাদ্দ দৈ চিঁড়ে কলা। বেশ করে ফলার মেখে নিয়ে তাদের মুখে ধরতে হয়।

ওদিকে গিন্নিরা আড়মোড় ভেঙে কলতলায় জমায়েৎ হয়েছেন। তাদের মুখে-মুখে পান-দোক্তা সেজে ধরতে হবে।

বুড়ো কর্তার ঘুম থেকে উঠেই খবরের কাগজ চাই। গলির মোড় থেকে এক ফাঁকে সেটা ছোঁ মেরে নিয়ে আসতে হবে।

দাদাবাবুদের চা একবারে শেষ হলে চলবে না। ন'টার মধ্যে বার তিনেক চাই।

এর মধ্যে উনুন ধরিয়ে তৈরী হয়ে থাকতে হবে। তড়িৎ-গতিতে বামুন ঠাকুর এসে ঝড়ের বেগে রান্না করে দিয়ে অন্য বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করবে। মেল ট্রেনকে মধ্য পথে আটকাবার ক্ষমতা কারো নেই। সে আসবে মিলিটারী, যাবে মিলিটারী।

এরই মধ্যে দিদিমণিরা ইস্কুল-কলেজের জন্যে তৈরী হয়েছে। কেউ কেউ আবার গরম জলে স্নান করে। ওদের জন্যে সে ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

ইস্কুল-কলেজের দল বেরিয়ে চলে গেলে—অফিস-আদালতের দল। কেউ কেউ আবার বাড়ি থেকে টিফিন বাক্সে খাবার নিয়ে যায়। বামুন-ঠাকুর তৈরী করে গেছে খাবার। টিফিন-বাক্সে ভর্তি করতে হয়েছে সেই খাবার। হাতে হাতে পান আর সেই টিফিনের বাক্স!

ওদিকে বাড়ির বুড়ী গিন্নি চেঁচিয়ে গলা চিরে ফেলছেন।

—ওরে শশিশেখর, আমার পুজোর ফুল কই? বাজার থেকে হয়ত ফুল আনতে ভুলে গেছে!

আবার ছোট্ ছোট্—সেই বাজারের দিকে—

কিন্তু বিশ্রামের সময় নেই আমাদের শশিশেখরের। পণ্ডিত জহরলালের বাণী লেখা আছে—বুড়ো কর্তার মাথার ওপরে—দেয়ালে—'আরাম হারাম হ্যায়'।

বুড়ো কর্তা কিন্তু আফিম খেয়ে সর্বক্ষণ ঝিমুচ্ছেন। মনীষী-বাণী তাঁর জন্যে নয়। তিনি সবাইকে শুধু জ্ঞান বিতরণ করে চলেছেন।

গিন্নিদের খাওয়ার সময় শশিশেখরকে সব সময় কাছে কাছে থাকতে হবে।

—শশিশেখর, নুনের পাত্রটা এগিয়ে দে।

—শশিশেখর, কাঁচা লংকা দিস্ একটা—

—শশিশেখর, আর দুটো ভাত দে—

—শশিশেখর, আচারের বৈয়মটা এগিয়ে দে—

www.BanglaBook.org

এই ভাবে চোখ-কান খুলে সব সময় তৎপর হয়ে থাকতে হয় শশিশেখরকে।

দুপুর বেলা হয়ত ছোটগিন্নির ঘর থেকে হুমকি এল, শশিশেখর, আমার উপন্যাসটা শেষ হয়ে গেছে! কাল বিকেল-বেলা কেন লাইব্রেরী থেকে নতুন বই এনে রাখিসনি?

শশিশেখর আপন মনে মাথা চুলকায়!

গিন্নিরা কখন কোন্ বই শেষ করেন—তারও হদিশ রাখতে হবে শশিশেখরকে!

দুপুর গড়িয়ে যায়—কিন্তু শশিশেখর একটু শুতে পারে না।

বুড়ী গিন্নি তাঁর পুজোর ঘর থেকে হাঁক দেন,—ওরে শশিশেখর, আমার গঙ্গাজলের ঘটিটা ফুটো হয়ে গেছে। বাজার থেকে ওটাকে ঝালা দিয়ে আনতে হবে।

শশিশেখর আবার ঘটি হাতে বাজারের পথে পা বাড়ায়।

এই সময় সে দোকানীদের কাছ থেকে তার পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেয়। আলুর দোকান, আনাজ-তরকারীর দোকান, মেছুনীর দোকান, মাংসের আর ডিমের দোকান থেকে তার দৈনিক বরাদ্দ আছে।

কথায় বলে পেটে খেলে পিঠে সয়।

হরি খুড়োর শিক্ষানবিশীতে শশিশেখর এরই মধ্যে সব কিছু শিখে নিয়েছে।

বেশীক্ষণ বাইরে থাকতে পারে না শশিশেখর।

ইস্কুল থেকে পঙ্গপালের দল ফিরে আসবে। ওদের জন্যে রুটি তরকারী বরাদ্দ আছে। রুটিগুলো হাতে হাতে ভেজে গরম গরম ওদের পাতে ফেলে দিতে হবে।

রুটি তরকারী খেতে খেতে ওদের কত বায়নাক্কা।

—শশিদা, আমার চারখানা বাঁধানো খাতা চাই, দিদিমণি বলেছেন।

—শশিদা, আমার পেন্সিলটা পথে পড়ে গেছে। আর একটা কিনে দিতে হবে।

—শশিদা, আমার ইনস্ট্রুমেন্ট বক্সের স্কেলটা হারিয়ে গেছে। আর একটা কিনে দিতে হবে।—

—শশিদা, কাল আমার মাইনের তারিখ। ইস্কুলে গিয়ে মাইনেটা দিয়ে এসো—

এমনি হাজার ফরমাস শুনতে হয় শশিশেখরকে। কিন্তু সে এতটুকু চটে না।

বুড়ো কর্তার মাথার ওপর ঝুলছে—মনীষী-বাণী—'আরাম হারাম হ্যায়!'

তার ওপর হরি খুড়োর শিক্ষানবিশী—'পেটে খেলে পিঠে সয়'—

এই দুই বাণী মিলে তার মনে এক অপরূপ জগা-খিচুড়ি তৈরী হয়।

শশিশেখর আপন মনে সেই খিচুড়ি চাখতে চাখতে মনের আনন্দে নৃত্য করতে থাকে।

গভীর রাত্রে রোজ বটুয়া খুলে গুনে দেখে,—কত টাকা তার জমল! এবার দেশে গিয়ে কয় বিঘে ধানী জমি সে কিনবে।

ওই হচ্ছে শশিশেখরের জীবনের টনিক। হরি খুড়ো বলে, এর নাম ৯৯-এর ধাক্কা। ৯৯ হলেই এক ধাক্কায় একশ' পুরো করতে হবে।

টাকা জমানোর মত বড় নেশা জীবনে আর কিছু নেই।

শশিশেখরের শিক্ষানবিশী নাকি এখনো শেষ হয়নি। হরি খুড়ো সেই কথাই বলে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা হরি খুড়ো শশিশেখরকে নিয়ে গোপনে বসে সেই কথাই বোঝাচ্ছিল।

বললে, তবে শোন, আমি খবর পেয়েছি তোদের বাড়ির সবাই এক দিন এক বিয়ে বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে যাবে। তারপর ভোজ খেয়ে ফিরে এসে বাড়ির গিন্নিরা গায়ের গয়নাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে নিশ্চয়ই ঘুমের ঘোরে গা এলিয়ে দেবে। ওই দিনই আমাদের সুবর্ণ সুযোগ—

শশিশেখর শুধোলো, সুবর্ণ সুযোগ? সেটা আবার কি? তুমি যে পাঠশালার পণ্ডিতমশায়ের মত শক্ত শক্ত কথা বলতে শুরু করেছ হরি খুড়ো?

হরি খুড়ো বললে, শোন, হাসি-মস্করার কথা নয়। ঠিক দুটোর সময় আমরা তোদের সদর দরজায় টক্ টক্ শব্দ করবো—তুই এসে দরজাটা শুধু খুলে দিবি। তারপর যা করবার

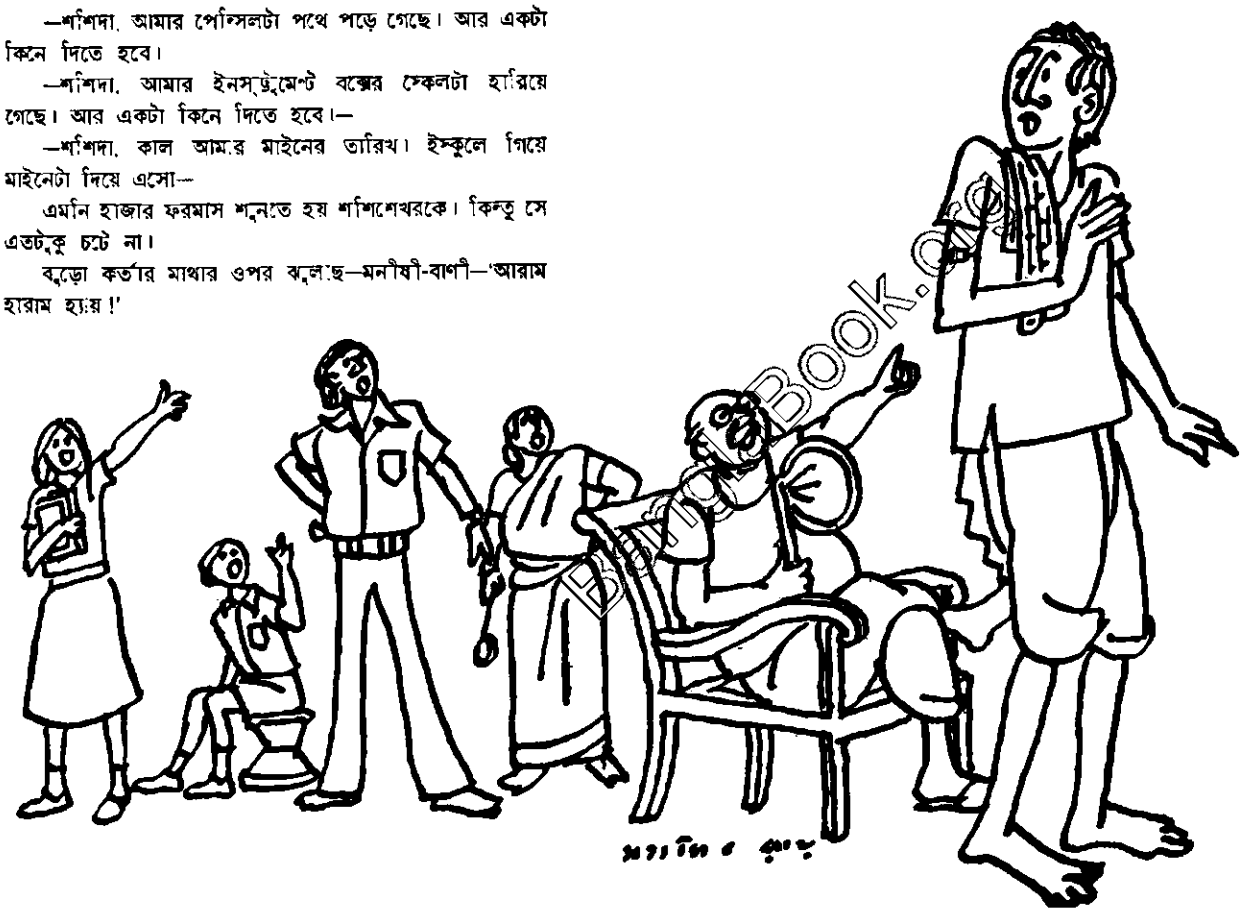

www.BanglaBook.org

আমরা করবো—

ভয়ে ভয়ে শশিশেখর শুধোলো, কিন্তু গিন্নিমারা যদি কেউ জেগে ওঠে? একেবারে থানায় চালান করে দেবে—

হরি খুড়ো ওকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলে। বললে, তোর শিক্ষানবিশী এখনো শেষ হয়নি। আমরা কি কাঁচা কাজ করবো? এক রকম ঘুমের গ্যাস আছে, তাই ছড়িয়ে দেওয়া হবে তোদের বাড়ির ভেতর। সবাই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়বে। ঠিক মরার মত। আর আমরা কয়েকজন দশ মিনিটের মধ্যে কাজ হাসিল করে পগার পার। তোকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসবো। আর আমাদের টিকিটি ছুঁতে পারবে না কেউ। হ্যাঁ, মনে রাখিস, তোকে শুধু একটি কাজ করতে হবে। রাত দুটোর সময় টক্ টক্ শব্দ হলেই সদর দরজাটা খুলে দিবি।

শশিশেখর ভয়ে ভয়ে বললে, আচ্ছা, সে না হয় আমি পারবো। কিন্তু বাড়ির গিন্নিদের গয়না কিন্তু আমি সরাতে পারবো না।

হরি খুড়ো আবার ওকে ধমক দিয়ে বললে, তোকে ত আগেই বলেছি, কিচ্ছু তোকে করতে হবে না। যা করবার সব আমরাই করবো, তোকে শুধু রাত দুটোর সময় দরজাটা খুলে দিতে হবে।

রাজী হল বটে, কিন্তু শশিশেখর দু'দিন ধরে কেবল উসখুস করতে লাগলো।

বাড়ির গিন্নিরা বললে, ওরে শশিশেখর, তোর কাজে মন নেই কেন? বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে?

শশিশেখর জবাব দেয়, না মা, মন কেমন করবে কেন?

গিন্নিমা ওকে বোঝান, শোন শশিশেখর, এই সামনের পুজোর পর তোকে ছুটি করিয়ে দেবো। একমাস বাড়িতে থেকে আসবি। তখন আমরা হাতে-হাতে কাজ চালিয়ে নেবো। নতুন লোক আর রাখবো না।

শশিশেখর উত্তর করে, আচ্ছা, তাই হবে গিন্নিমা—

অবশেষে সেই নেমন্তন্নের দিন এসে হাজির হল। গিন্নিরা বললে, শোন শশিশেখর, আমরা এক বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি। বাড়িতে বুড়ো কর্তা রইলেন। খুব সাবধানে থাকবি। সজাগ থাকবি। দেখবি—বাড়িতে চোর-ছ্যাঁচড় না ঢোকে—

শশিশেখর মাথা দুলিয়ে জবাব দিলে, আজ্ঞে গিন্নিমা, দেখবো বৈ কি,—নিশ্চয়ই দেখবো।

তখন শুরু হল দিদিমণিদের সাজগোজের পালা। রাশি রাশি শাড়ী বের করা হল আলমারী থেকে। স্নো-পাউডার, ক্রিম, ভেসেলীন, এসেন্স, আতর স্তূপীকৃত করা হল ড্রেসিং টেবিলের ওপর। তবু চাহিদা মেটে না।

শশিশেখরকে ঘন ঘন বাজারে-দোকানে ছুটতে হল। আরো নতুন ধরনের ক্রীম চাই, কুচ্‌কুচে কাজল চাই, খোপায় জড়াবার জন্যে বেল ফুলের মালা চাই।

ছুটে ছুটে শশিশেখরের পায়ের গোড়ালির খিল খুলে যায় আর কি!

গিন্নিরা যাবার সময় বলে গেলেন, ওরে শশিশেখর, তোর খাবার ঢাকা দেয়া রইল। আজ তোর জন্যে দৈ, সন্দেশ সব রেখেছি।

তারপর রাত গভীর হল!

পথে ফেরিওয়ালার ডাক থেমে গেল।

গলির মোড়ের লাইট পোস্টটা ঝিমিয়ে পড়ল। আর তাতে ঠ্যাসান দিয়ে পাহারাওয়ালা নাক ডাকাতে লাগলো।

আরো অনেক রাত্তিরে বাড়ির গিন্নিরা দিদিমণিদের নিয়ে অনেকগুলি ট্যাক্সি করে ফিরে এলেন।

তারপর হরি খুড়ো যা বলেছিল তাই!

নিজেদের গায়ের গয়নাগাটি, নেকলেস, ব্রেসলেট, ইয়ারিং, আংটি, মালা, সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে বিছানায় গড়িয়ে পড়লেন।—যা হয় কাল সকালে করা যাবে।

শশিশেখরের চোখে আর ঘুম নেই!

কখন টক্ টক্ আওয়াজ হবে, কখন দরজা খুলে দিতে হবে।

এক-একবার চোখ বুজতে যায়—হয়ত একটা ইঁদুর লাফিয়ে উঠে শব্দ করে, আর শশিশেখর আচমকা আঁতকে ওঠে! এ কী অস্বস্তি তার!

ঢং ঢং করে ঘড়িতে দুটো বাজলো। সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজায় টক্ টক্ শব্দ।

শশিশেখর ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল। হরি খুড়োর দল তৈরী হয়েই ছিল।

তারা কয়েকজন দোতলায় উঠে এল।

এমন সময় বুড়ো কর্তার হাঁক শোনা গেল,—শশিশেখর, আফিং দে—

বুড়ো কর্তার আওয়াজ শুনে বাড়ির ভুলো কুকুরের ঘুম ভেঙে গেল।

সিঁড়িতে অচেনা লোকের পায়ের শব্দ...ওর কান খাড়া! ভুলো ছুটে গিয়ে হরি খুড়োর পা কামড়ে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে হুটোপাটি চীৎকার—গেলুম গেলুম রব।

ওপর থেকে বুড়ো কর্তা হাঁক দিলেন, চোর চোর—ধর ধর—ভুলো—পাক্‌ড়ো—

বুড়ো কর্তার হাঁকডাক শুনে মোড়ের পাহারাওয়ালার নিদ টুটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার বাঁশীর আওয়াজ...আরো বহু লোক ছুটে গেল—আশপাশ থেকে।

তারা মধ্যে দরজা আটকে দাঁড়ালো। হরি খুড়ো দল শুদ্ধ ধরা পড়লো।

শশিশেখর কপালে চাপড় মেরে বললে, শিক্ষানবিশী আমার শেষ হয়নি! আগে যদি বুড়ো কর্তাকে আফিমের ডেলাটা খাইয়ে দিতাম...!!!

১৩৭৩

www.BanglaBook.org

মেলায় গেলেন হর্ষবর্ধন

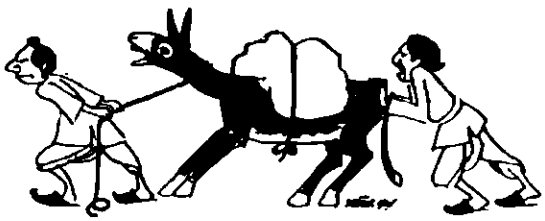

শিবরাম চক্রবর্তী

জয়দেবের মেলায় গেছেন হর্ষবর্ধন—ভ্রাতৃবর গোবর্ধনকে সঙ্গে নিয়ে।

বিরাট মেলা। কত দোকান কত পসারী। কোথাও নাচ কোথাও গান কোথাও বাউল কোথাও বা কীর্তন। কোনোখানে তর্জার লড়াই কোথাও আবার ম্যাজিক! ভাইকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখছেন সব। দেখছেন, শুনছেন।

কত লোক এসেছে মেলায়! লাখ খানেক হবে হয়ত। যত লোক তত বালক তত নাবালক। একধারে একটা নাগরদোলা ঘুরছিল—হাসিখুসি ছেলেমেয়েরা চেপেছে তাতে।

একটা বেলুনওলা বেলুন বিক্রি করছিল।

'দেখি একটা বেলুন।' বললেন হর্ষবর্ধন: 'দাম কত?'

'চার পয়সা বাবু।'

'একটা দাও ত।...না, একটাতে কি হবে! দু'হাজার বেলুন নিয়ে এসো—দু'হাজার চার হাজার পাঁচ হাজার—যা পারো। পারবে আনতে?'

'ডিপু থেকে আনতে পারি। লেকিন আগাম কিছু রুপিয়া চাহিয়ে।'

'এই নাও একশো টাকার নোট। তারপর যা লাগে দেবো।'

'আমার জন্য কিনছো বুঝি দাদা?' জানতে চাইল গোবরা।

'অত বেলুন তোকে দিলে আর দেখতে হবে না। কোথায় উড়ে চলে যাবি! ঐ মোটাসোটা হিন্দুস্থানী বেলুনওলাই অত বেলুন নিয়ে আসতে পারে কিনা দেখা যাক।'

উড়তে উড়তে এল বেলুনওলা। মেলার সবাইকার মাথার উপর দিয়ে এল। হর্ষবর্ধনদের কাছাকাছি আসতেই গোবরা লাফিয়ে উঠে তার একটা ঠ্যাং ধরে ফেলল, আর হর্ষবর্ধন জাপটে ধরলেন গোবরাকে। কোনো রকমে ভূমিষ্ঠ হল বেলুন-ওলা—গোবর্ধনকে নিয়ে।

দু' ভাই শক্ত করে ধরে থাকলেন তাকে।

'আউর কেতনা দিতে হবে?'

'কুছ নেহি। লেকিন আপ্‌কো বেলুন তো লিজিয়ে। হামকো বাঁচাইয়ে পহেলে।'

'না বাবা, আমরা উড়ে যেতে রাজী নই।' বললেন শ্রীহর্ষ। সহর্ষেই বললেন—এই সব বেলুন তুমি মেলার সব ছেলেমেয়েদের একটা একটা করে বিলিয়ে দাও গে।'

একটা খোঁটা পুতে তাতে বাঁধা হল বেলুনের গোছা। তারপর শুরু হল বিলোনো। হৈচৈ পড়ে গেল মেলায়।

দুই ভাই সেখান থেকে সটান চলে গেলেন নাগরদোলার কাছে। হর্ষবর্ধন বললেন—'চাপতে কত লাগে? কত করে টিকিট?'

'চার চার পয়সা।' বলল দোলাওয়ালা।

'দাও একটা টিকিট। চাপব আমি।'

'না বাবু, আপনাকে তুলতে পারব না। তাহলে আমার নাগরদোলা ছিঁড়ে পড়বে এক্ষুনি। বহুৎ লোকসান হবে আমার।' বলল লোকটা: 'আপনাদের জন্য না, বাচ্চাদের জন্য হচ্ছে এ জিনিস।'

'কত লোকসান হবে শুনি—দোলা যদি তোমার ছিঁড়ে পড়ে?' জানতে চাইলেন হর্ষবর্ধন।

'হাজার টাকা ত হবেই—আপনার প্রাণের দাম যদি কানাকড়িও হয়।'

'এই নাও হাজার টাকা।' দশখানা বড় বড় নোট গুণে দিয়ে তিনি বললেন: 'এইবার চাপতে পারি ত?'

গোবর্ধন বাধা দিলো—'চাপবে যে, যার জিনিস তার অনুমতি নিয়েছ?'

'অনুমতি কিসের আবার! কিনে নিলাম ত।'

'না না, সে কথা নয়। তুমি কার জিনিস সে খেয়াল আছে? তুমি ত বৌদির জিনিস। তার অনুমতি নিয়েছ আগে? দোলা ছিঁড়ে পড়ে মরলে কে বিধবা হবে? তুমি না বৌদি?'

'তবে কাজ নেই চেপে। তোর বৌদি মেলার থেকে এক গাদা জিনিস কিনে নিয়ে যাবার ফরমাস দিয়েছে—না নিয়ে গেলে রক্ষে রাখবে না। আর আমি যদি এখনকার হাসপাতালেই থেকে যাই তাহলে কুরুক্ষেত্র বাধাবে। এই দোলাওয়ালা, আর ক'দিন চলবে তোমাদের এই মেলা?'

'মাসখানেক ত চলবেই বাবু!'

'এই নাগরদোলা এখন আমার। তুমি আমার কর্মচারী। এই নাও তোমার এক মাসের বেতন—একশ টাকা। সব ছেলেমেয়েদের তুমি অমনি চড়াবে আমার দোলায় এই এক মাস ধরে—একটি পয়সা নিতে পাবে না। এক মাস পরে এটা আবার তোমার হয়ে যাবে। হ্যাঁ গোবরা এবার মেলার থেকে বেছে বেছে জিনিস-গুলো কিনগে।'

ঘুরে ঘুরে পছন্দ করে দু'ভাইয়ে মিলে এক গাদা জিনিস কিনলেন। কিনে কিনে জড়ো করতে লাগলেন একটা জায়গায়। খাগড়ার বাসন, বাঁকড়োর পেতলের পুতুল, মেদিনীপুরের গামছা, শান্তিপুরের ধুতি শাড়ি—কত কি!

'এইবার এগুলো ইস্টিশনে নিয়ে যাওয়া যায় কি করে?'

'মুটে ডাকতে হবে দাদা!'

কিন্তু মেলা দেখার মজা ফেলে মোট বয়ে নিয়ে যেতে রাজী নয় কেউ—একশ টাকা দিলেও নয়।

'ভারী মুশকিল হল ত! নে, আমরা দুই ভাইয়ে ভাগ করে

www.BanglaBook.org

ঘাড়ে করে নিয়ে যাই।'

'এ যে একটা গাধার মোট দাদা!' বাধা দিল গোবর্ধন: 'আর আমরা দুজনে মিলে আদ্ধেক গাধাও নই!'

'তাহলে কি করা যায়?'

'একটা গাধা কিনে ফ্যালো বরং! সে-ই অম্লানবদনে সব বয়ে নিয়ে যাবে।'

মেলার ধারে মেলাই গাধা চরছিল। কোদালীদের মালপত্তর বয়ে এনেছিল মেলায়। হৃষ্টপুষ্ট দেখে তাদের একজনকে পছন্দ করলেন দু' ভাই। তারপর মালিককে খুঁজে বার করে কিনে ফেললেন গাধাটা।

তারপর তার পিঠে জিনিসপত্র চাপিয়ে স্টেশনের পথে রওনা দিলেন দু'ভাই।—'দেখছিস গোবরা, গাধাটা কী ভালো। এত মোট চাপিয়ে দিলাম ওর ঘাড়ে, একটু দ্বিরুক্তি করল না।'

'দ্বিরুক্তি! ওরা কখনো দ্বিরুক্তি করে না।' বলল গোবরা, 'মাঝে মাঝে ওরা একটা উক্তিই যা করে তারই একটা বাজখাঁই আওয়াজে কান যায় যায়! তারপর দ্বিরুক্তি করলে আমাদের আর বাঁচতে হত না!'

কিন্তু ভালো হলে কী হবে, চলতেই চায় না গাধাটা। এক পা নড়ে তো তিন মিনিট দাঁড়িয়ে পড়ে। আবার তাকে ঠেলে-ঠুলে চালাতে হয়। আবার একটু পরেই তার নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু।

'দু'-দুটো গাধাকে নিয়ে আমার হয়েছে মুশকিল!' বিরক্তি প্রকাশ করেছেন দাদা, 'মেলায় এসে এত ঝামেলা হবে কে জানত!'

'দুটো গাধা পাচ্ছো কোথায় দাদা! একটাই তো দেখছি।'

'নিজেকে বাদ দিয়ে গুনছিস বুঝি তুই?' হর্ষবর্ধন বলেন, 'আমার দুই দিকে দুই চাঁদ। গোবর্ধন চন্দ্র আর গর্দভ চন্দ্র!'

শুনে গোবরা গুম হয়ে থাকে খানিকক্ষণ, তারপর গুমরে ওঠে: 'আমরা যদি গাধা হই ত তুমি হলে আমাদের দাদা। দুজনেরই দাদা তুমি! আমাদের উপর দিয়ে যাও।'

পরস্পরের টানাপোড়েনে হয়রান হয়ে তিনজনে স্টেশনে এসে পেঁছলেন। কাটলেন তিনখানা কলকাতার টিকিট। তারপর গাধাটাকে কি করে কামরায় তুলবেন সেই হল সমস্যা। জানতে গেলেন গার্ডবাবুর কাছে। বললেন, 'মশাই, এ যা গাধা, নিজ-গুণে ত উঠবে না। তেমন পাত্র নয়, কুলীর মাথায় চাপিয়ে তুলব? আমাদের কামরায় আমাদের সঙ্গে যাবে গাধাটা!'

'টিকিট দেখি আপনাদের!'

তিনখানা টিকেট দেখিয়ে দিলেন তিনি। তিনখানা ফাসকেলাসের টিকিট দেখে হাসলেন গার্ডবাবু।

'গাধা কি আবার ফাসকেলাসে যায় নাকি!'

'কেন, গেলে কী হয়? গাধা বলে কি মানুষ নয়?' দাদার প্রতিবাদ।

'আমাদের ফাসকেলাস গাধা মশাই!' আপত্তি করেছে ভাইও, 'অনেক দু'পেয়ে গাধার চেয়ে ভালো।'

'গাধা যাবে পেছনের ভ্যানে। গাড়ীর সব পেছনে।' বলে দিয়েছেন গার্ডবাবু।

গাধাটাকে যথাস্থানে সুরক্ষিত করে দুই ভাই এসে উঠেছেন নিজেদের কামরায়।

আধঘণ্টা কেটে যাবার পর দাদার কী খেয়াল হল, পাশের সহযাত্রীকে শুধিয়েছেন তিনি: 'রেলগাড়ী কত জোরে যাচ্ছে মশাই?'

'তা—ঘণ্টায় ষাট মাইল ত হবে।'

'ষা—ট মাইল!' হর্ষবর্ধন হতবাক্: ঘণ্টায় ষাট—মানে, মিনিটে এক মাইল? বলেন কি!'

'তা, ষাট না হলেও চল্লিশ ত বটেই?'

তাহলেও হর্ষবর্ধনের চমক কমে না: 'কিন্তু আমার গাধা যে মিনিটে এক পাও হাঁটতে পারে না।'

'রেলগাড়ী আর গাধা কি এক হল?' সহযাত্রীও তাঁর কথা শুনে কম চমৎকৃত নন: 'গাধা ত রেলগাড়ী নয়—মানে, রেলগাড়ী ত—কি বলে—আর গাধা নয়!'

'তা ত নয়।' বলে তিনি যেন অগাধ ভাবনায় পড়ে গেলেন। তারপর ভাবনার সমুদ্র থেকে ডুব দিয়ে উঠলেন যখন, বেশ পুলকিত দেখা গেল তাঁকে: 'যাক্ গে, রেলগাড়ীর পাল্লায় পড়ে গাধাটা এবার হাঁটতে শিখবে।'

'মানুষ হয়ে গেল গাধাটা?'

'কত গাধাই ত হচ্ছে!' সায় দেন সহযাত্রী: 'তবে সব গাধা কিছু সমান নয়। মানে, সবটা কিছু সমান গাধা নয়। অনেক গাধা গাধাই থেকে যায়, কিছুতেই আর মানুষ হয় না।'

'তা না হোক, এই ধাক্কায় আমাদের গাধাটা যদি একটু চটপটে হতে শেখে তাহলেই বাঁচি। দেখতে শুনতে মন্দ নয় কিন্তু নড়াচড়ায় নারাজ। কথায় বলে গাধা পিটে ঘোড়া করতে হয়। কিন্তু এইটুকু রাস্তা আসতে কি কম পিটেছি! ঘোড়ার ঘ-ও হয়নি। এখন রেলগাড়ীর জগতে বেকায়দায় পড়ে বাধ্য হয়ে যদি ওটা ঘোড়া হয়ে যায়—দেখা যাক্!'

'একটা গাধাও নিয়ে চলেছেন নাকি? রাখলেন কোথায় তাকে?'

'এখানেই ত রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুলতে দিলে কই? বললে যে গাধার স্থান কখনো মানুষের পাশে হতে পারে না। কিন্তু কেন মশাই, কেন বলুন ত? মানুষের সঙ্গে গাধার তুলনা হতে পারে না—মানুষ কি এতই অপদার্থ? এমনই কি যে একটা গাধারও অধম?'

'তা, কোথায় রেখে এলেন গাধাটাকে তাহলে?'

'কোথায় আর রাখব, যেখানে বললে সেখানেই। রেলগাড়ীর সব পিছনে তাকে বেঁধে দিয়েছি। মোটা দড়ায় বেশ শক্ত করে বাঁধা—পালাতে পারবে না গাধাটা। বলব কি মশাই, ইস্টিশনের এইটুকু পথ আসতে ও যা নাকাল করেছে আমাদের, আজ প্রায় কাঁদিয়ে দিয়েছিল। এখন? এখন কেমন? ঘণ্টায় ষাট মাইল করে রেলগাড়ীর পিছু পিছু ছুটতে হচ্ছে—রাম ছুটুনি যার নাম!'

'ছাড়ান্ নেই কিছুতেই!' গোবর্ধনও যোগ দিয়েছে দাদার উৎসাহে: 'কেমন জব্দ! মরুক ব্যাটা দৌড়ে দৌড়ে এমনি করে—সেই কলকাতা অব্দি! কেমন জব্দ!'

১৩৭১

www.BanglaBook.org

বাঁটুল এবং...

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বহুযুগ আগেকার কথা। জন্তু-জানোয়ারেরা তখন থাকত লোকালয়ের বাহিরে—তাদের মনে হিংসা-দ্বেষ ছিল না, রেষারেষি ছিল না, সকলে মিলেমিশে থাকত আর ভাত ডাল তরিতরকারি ফলমূল খেত।

গ্রামে এক গৃহস্থঘরের ছেলে বাঁটুল—বাঁটুলের বয়স পাঁচ বছর, কিন্তু এই বয়সেই ভয়ানক জোয়ান আর দুরন্ত। তার দৌরাত্ম্যে পাড়ার কারো বাগানে ফলমূল থাকত না, আর সকলের উপর এমন অত্যাচার করত যে পাড়ার লোক অতিষ্ঠ হয়ে এল একদিন বাঁটুলের মায়ের কাছে। বাঁটুলের বাপ ছিল না। বাড়িতে সে আর তার বিধবা মা—এই দুটি প্রাণী। পাড়ার লোকে এসে বললে বাঁটুলের মাকে,—তোমার ছেলেকে নিয়ে তুমি এ গাঁ থেকে চলে যাও। তোমার ছেলের জ্বালায় আমরা অস্থির হয়ে আছি। হয় ছেলেকে তুমি ত্যাগ করো, আর যদি তা না পার তো ঐ ছেলেকে নিয়ে আজ এখনি গাঁ ছেড়ে চলে যাও।

ছেলের জন্য এমন অপমান! মা রেগে বাঁটুলকে বললে,—তুই দূর হয়ে যা এ বাড়ি থেকে। আমি তোর মুখ দেখতে চাই না। দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ঢের ভাল। আমি এ ভিটে ছেড়ে কোথাও যাব না—তুই দূর হয়ে যা।

এ কথা শুনে বাঁটুল তখনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর চলে চলে কত মাঠ বাট পেরিয়ে সন্ধ্যার আগে সে এল লোকালয়ের বাহিরে এক জঙ্গলের ধারে। সেখানে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা একখানা বাড়ি। বাড়ির সামনে বাঁটুল দেখে, এক হাতী, এক সিংহ, এক বাঘ আর এক ছাগল বসে গল্প করছে।

বাঁটুলকে দেখে হাতী বললে,—তুমি এখানে হঠাৎ এসেছ কেন গো মানুষের ছেলে?

বাঁটুল বললে,—আমার ঘর নেই, বাড়ি নেই, কেউ নেই—আমি চাকরির চেষ্টায় ঘুরছি। আমাকে তোমরা চাকর রাখবে? আমি তোমাদের জন্য কাঠ কেটে আনব, জল তুলব, রান্নাবান্না করব। মানে, যে কাজ বলবে, সব করব। মাহিনা চাই না—তোমরা শুধু আমাকে এখানে থাকতে দেবে আর খেতে দেবে।

জানোয়ারেরা ভাবলে, মন্দ কী! তারা বললে,—বেশ, তুমি থাকো আমাদের কাছে—আমরা তোমাকে থাকতে দেব।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সিংহ বললে বাঁটুলকে,—ভোর হলেই পালা করে আমাদের মধ্যে একজন রোজ যায় হাটে জিনিসপত্র কিনতে বড় চাঙারি নিয়ে, তাইতে করে বাজার নিয়ে আসে। কাল ভোরে ছাগলের পালা—ছাগল যাবে হাটে—তুমি যাবে ওর সঙ্গে চাঙারি নিয়ে—সেই চাঙারিতে জিনিসপত্র নিয়ে আসবে।

বাঁটুল বললে,—বেশ, তাই হবে।

পরের দিন ভোরে ছাগল বেরুল হাটে—বাঁটুল চলল তার সঙ্গে চাঙারি মাথায় নিয়ে।

অনেক দূরে হাট। হাটে গিয়ে ছাগল বললে বাঁটুলকে,—তুমি এইখানে চাঙারি নিয়ে বোসো—আমি জিনিসপত্র কিনে চাঙারি বোঝাই করব—তারপর সেই চাঙারি নিয়ে বাড়ি ফিরব।

ছাগল গেল জিনিসপত্র কিনতে—বাঁটুল দেখে, এক জায়গায় কতকগুলো ছেলে ডাণ্ডা-গুলি খেলছে। দেখে সে তাদের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠল।

জিনিসপত্র কিনে ছাগল চাঙারি বোঝাই করল; তারপর বাঁটুলকে আর খুঁজে পায় না। এদিকে-ওদিকে চাইছে—কোথায় গেল বাঁটুল? হঠাৎ দেখে বাঁটুল ডাণ্ডা-গুলি খেলছে। রেগে ছাগল গিয়ে বাঁটুলের কান ধরে বললে,—তবে রে বদমায়েশ, তুমি এখানে খেলায় মেতেছ?

কানমলা খেয়ে বাঁটুল খেপে উঠল। কোন কথা না বলে ছাগলের গালে সে এমন জোড়ে চড় মারল যে, ভ্যা করে ডেকে ছাগল সেখানে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তবু ছাড়ান নেই,—ছাগলকে খিমচে আঁচড়ে তাকে এমন লাথি চড় ঘুসি মারতে লাগল যে ছাগলের প্রাণ যায়। হাটের লোকজন কোনমতে ছাড়িয়ে দিলে। তারপর ছাগলের আর ভরসা হল না বাঁটুলকে বলবে চাঙারি বইতে। সে নিজেই বাজারের চাঙারি মাথায় নিয়ে বাড়ির পথে ফিরল—বাঁটুলও ফিরল তার সঙ্গে, বাড়ির কাছে আসতেই ছাগলের কাছ থেকে চাঙারি নিয়ে বাঁটুল ঢুকল বাড়িতে—ছাগল তার পিছনে।

ছাগলের দু' গালে ঝরঝর রক্ত ঝরছে আর মুখখানা ফুলে যেন ঢোল। দেখে জানোয়ারেরা বললে,—এ কী রে, তোর এমন দুর্দশা হল কী করে?

চাকরের হাতে মার খেয়েছে, সে কথা বলতে ছাগলের লজ্জা হল। ছাগল বললে,—আর বল কেন? পথে আসতে এক জায়গায় ভীমরুলের চাক ছিল—নজর করিনি—সেই চাকে ঢিল লেগেছিল, তারপর চাকের যত ভিমরুল একেবারে কামড়ে কোপিয়া করে দিয়েছে।

পরের দিন বাঘের পালা—চলল হাটে—তার পিছনে চাঙারি মাথায় বাঁটুলও চলল। সেদিনও হাটে বাঁটুলের ডাণ্ডা-গুলি খেলায় মাতা—বাঘের হাতে কানমলা খেয়ে বাঁটুল বাঘেরও দশা করল ঠিক ছাগলের মতন। বাঘেরও ছাগলের মত ফোলা মুখ আর গালে রক্ত ঝরছে, বাজার করে বাড়ি ফিরল। বাঘও বললে,—ভিমরুলের কামড়ে তার এই দুর্দশা। হাতী আর সিংহ ভাবল, তাই হবে! ছাগল শুধু বুঝল আসল ব্যাপার, কিন্তু সে কথা সে প্রকাশ করে বলল না। বাঘ শুধু চুপি চুপি ছাগলকে

www.BanglaBook.org

বললে,—ছেলে ত নয়—ভিমরুলই বটে! উঃ, কী মার না মেরেছে! তার পরের দিন আর তার পরের দিন সিংহ আর হাতী হাটে বেরুল বাঁটুলকে নিয়ে—তাদেরও ঠিক এই দুর্দশা।

তখন চারজনে মিলে পরামর্শ করলে, ছেলে নয় তো অজগর ভিমরুল! ওর হাত থেকে রেহাই পেতে হলে আমাদের চুপি চুপি এখান থেকে পালাতে হবে। কেননা ওকে বরখাস্ত করে যদি বলি, যাও, আমাদের চাকরের দরকার নেই—তাহলে ও আমাদের হাড়মাস চুর করে দেবে! সেইজন্যে বলি, খাবার-দাবার তৈরি করে আমরা চাঙারি ভরতি করি—তারপর রাত্রে ও যখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে তখন ঐ চাঙারি নিয়ে আমরা নিঃশব্দে সরে পড়ব। ও জানতেও পারবে না আমরা কোথায় কোন্ দিকে গিয়েছি।

বাঁটুল ওদের এ পরামর্শটুকু শুনে ফেলল। শুনে সে বিছানায় পড়ে নাক ডাকাতে লাগল—যেন কত ঘুমোচ্ছে! আসলে সে ঘুমোয়নি, শুধু মটকা মেরে পড়ে নাক ডাকাচ্ছে। জানোয়ারেরা ভাবলে, ও খুব ঘুমোচ্ছে। তারা খাবার-দাবার তৈরি করে চাঙারি ভরল, ভরে আকাশের পানে তাকাচ্ছে, ভোর হবার একটু আগেই চাঙারি নিয়ে চারজন বেরোবে। তখন সেই ফাঁকে বাঁটুল উঠে চাঙারির মধ্যে ঢুকে চাঙারির ঢাকনি এঁটে দিল।

ভোরের আলো ফোটবার আগেই জানোয়ারেরা চাঙারি নিয়ে বেরল। ঠিক হল প্রথম খানিকটা পথ চাঙারি বইবে ছাগল, তারপর বাঘ, তারপর সিংহ, তারপর হাতী। জানোয়ারেরা চলেছে জঙ্গলের পথে। ছাগলের মাথায় চাঙারি—সে চলেছে আস্তে আস্তে—বাঘ, সিংহ আর হাতী তারা খুব জোরে পা চালিয়ে চলেছে। অনেকখানি পথ চলবার পর ছাগল আর পারে না, চাঙারির ভারে তার পিঠ টনটন করছে আর খুব খিদে পেয়েছে। ছাগল ভাবল চাঙারি নামিয়ে বসে একটু জিরুবে। চাঙারি নামিয়ে সে বসল—হাতী, সিংহ আর বাঘ মোড় বেঁকে অন্য পথ ধরেছে, তাদের দেখা যাচ্ছে না—বেলা তখন প্রায় নটা—চড়চড়ে রোদ। ছাগল ভাবল, ওরা তো দেখতে পাবে না, চুপি চুপি একটু খেয়ে নি। চাঙারির ডালা সে খুলল। খুলতেই দেখে—সর্বনাশ, ওমা, চাঙারির মধ্যে বাঁটুল! ছাগল ভয়ে কাঁটা—খাবে কি, ভয়ে সে কাঁপছে। বাঁটুল বললে,—চুপ, কাকেও বলবে না আমি আছি চাঙারির মধ্যে। তুমি কিছু খাও, আমিও কিছু খাই।

দুজনে কিছু কিছু খেয়ে নিল। খাবার পর বাঁটুল চাঙারির মধ্যে আর চাঙারি পিঠে বয়ে ছাগল আবার চলতে শুরু করল। খানিক যেতেই ওদের সঙ্গে দেখা—ওরা বসে জিরুচ্ছে। হাতী বললে, ছাগল, এবারে চাঙারি দাও বাঘকে, বাঘ চাঙারি বইবে। বাঘ নিল চাঙারি পিঠে, নিয়ে সে আস্তে আস্তে চলতে লাগল—হাতী, সিংহ আর ছাগল তিনজনে হনহনিয়ে এগিয়ে চলল। খানিকদূর গিয়ে হাতীরা আর একটা মোড় বাঁকল, তখন বেলা প্রায় বারোটা—রোদ আরো চড়চড়ে। বাঘের খুব খিদে পেয়েছে, বাঘ ভাবল, চাঙারি নামিয়ে একটু বসি, বসে চুপিচুপি কিছু খেয়ে নি।

এই বলে চাঙারি নামিয়ে বসে বাঘ যেমন ঢাকনি খুলল, দেখে, চাঙারির মধ্যে বাঁটুল। বাপ্ বলে বাঘ লাফিয়ে উঠল। বাঁটুল বললে,—চুপ—আমি আছি, এ কথা যদি ফাঁস কর, তাহলে মেরে হাড় ভেঙে দেব।

বাঘ বললে,—না, না, এ কথা কি ফাঁস করতে আছে? বাঁটুল বললে,—খিদে পেয়েছে তোমার বুঝেছি—কিছু খাও—আমিও কিছু খাই।

দুজনে কিছু কিছু খেল; তারপর বাঁটুল আবার ঢুকল চাঙারির মধ্যে—বাঘকে বললে, চাঙারির ঢাকনি বন্ধ করে এবার চল।

খানিকদূর গিয়ে ওদের তিনজনের সঙ্গে দেখা—বাঘ চাঙারি নামাল—সিংহ চলল চাঙারি বয়ে—হাতী, বাঘ আর ছাগল বেশ জোর পায়ে চলেছে—চাঙারি বয়ে সিংহের গতি মৃদু-মন্থর। তারপর সিংহেরও অবস্থা হল চাঙারি নামাবামাত্র ঐ বাঘ আর ছাগলের মত।

তারপর হাতীর পালা। সিংহ, বাঘ আর ছাগল এ ব্যাপারের কথা কাকেও কিছু বলেনি—চুপচাপ আছে।

তারপর হাতী যখন চাঙারি বয়ে যেতে যেতে এক জায়গায় চাঙারি নামাল কিছু খাবে বলে, তখন সন্ধ্যা হয়েছে। চাঙারি খুলে হাতী দেখে, চাঙারি খালি, খাবার সব সাফ আর চাঙারির মধ্যে বাঁটুল ঘুমোচ্ছে। হাতী তখন ভাবল, বাঁটুলই সব খাবার খেয়ে সাফ করেছে—এর হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যই তারা চিরদিনের ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে—কিন্তু কী মুশকিল, এ যে সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। এর হাত থেকে নিস্তার পাবার উপায়?

আস্তে আস্তে চাঙারির ঢাকনি বন্ধ করে সে এসে বসল সিংহ, বাঘ আর ছাগলের কাছে। চুপিচুপি হাতী বললে,—যার হাত থেকে বাঁচব বলে পালিয়েছি, সে তো দেখছি সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। ও চাঙারির মধ্যে ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক। এখানে চাঙারি রেখে আমরা পালাই, চলো। তবেই বাঁচোয়া।

চাঙারি রেখে চারজনে চলল তখন জঙ্গলের পথ ধরে এগিয়ে। চলেছে তো চলেছেই—এক মিনিট থামা নয়—মাঝে মাঝে শুধু পিছন পানে তাকিয়ে দেখে কেউ আসছে কিনা। এমনি করে সারা রাত পথ চলা...

ওদিকে অনেক রাত্রে চাঙারির মধ্যে বাঁটুলের ঘুম ভাঙল। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। ঢাকনি খুলে চাঙারি থেকে বেরিয়ে বাঁটুল দেখে জানোয়ারেরা কেউ নেই। বুঝল, তাকে ফেলে রেখে জানোয়ারেরা পালিয়েছে। বাঁটুল তখন তাদের পায়ের চিহ্ন দেখল—দেখে ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে সেও চলল যে পথে জানোয়ারেরা গিয়েছে, সেই পথে।

বাঁটুল বেশ জোরে জোরেই চলছে—কেননা তার ক্লান্তি নেই—এতখানি পথ সে চাঙারির মধ্যে আরামে এসেছে। অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে সে একটা বড় ঝাঁকড়া গাছের ডালে উঠে বসল—এই পথেই জানোয়ারেরা আসবে।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে গাছের ডালে বসে বাঁটুল দেখল, ওরা আসছে। ওরা হেঁটে হেঁটে একেবারে এমন ক্লান্ত যে ধুঁকছে। তারা এসে সেই গাছতলায় বসল জিরুবে বলে। নিশ্বাস ফেলে হাতী বললে,—এবারে তাহলে তার হাত থেকে ছাড়ান পেলাম—নিশ্চিন্ত হতে পারব।

সিংহ, বাঘ আর ছাগল বললে,—হ্যাঁ, এইবার দেখেশুনে এখানে ঘর বেঁধে বাস করতে পারব।

একটু পরে হাতী বললে,—সব দোষ ঐ ছাগলের। হাটে মার খেয়ে ও কেন এসে সে কথা বলল না—মিথ্যে করে কেন বললে ভিমরুলের কামড়?

ছাগল খ্যাঁক করে উঠল,—আমি তোমাদের সকলের চেয়ে ছোট, আমি তাই ভয়ে বলিনি। কিন্তু এই বাঘমশাই—এমন

www.BanglaBook.org

জোয়ান জাঁদরেল জানোয়ার, উনি কী বলে মার খেয়ে সে কথা ন বলে বললেন ভিমরুলের কামড় ?

বাঘ খ্যাঁক করে উঠল—বললে,—সিংহ তো আমার চেয়ে জাঁদরেল, সে কেন বলেনি ?

সিংহ কেশর ফুলিয়ে বললে,—আর এই হাতী ? এত বড় দেহ—অমন গোদা গোদা পা আর এত বড় শুঁড়—মানুষের ছেলেটাকে শুঁড়ে পাকিয়ে আছাড় দিতে পারত ত !

কার দোষে এই বিপদ—তাই নিয়ে চারজনে মহাতর্ক, সে তর্ক আর থামে না—হঠাৎ ছাগল বলে উঠল,—কেউ ত নিজের দোষ দেখবে না—এ ওকে আর সে তাকে দোষী বলবে ! এতে বিচার হয় না। থাকত সেই মানুষের ছেলে, তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করলে...

ছাগল যেই এইটুকু বলেছে অমনি গাছের ডাল থেকে ঝুপ করে বাঁটুল পড়ল তাদের মাঝখানে। তাকে দেখে সকলের চক্ষুস্থির—কারো মুখে রা সরে না—প্রায় অজ্ঞানের মত ভাব। তারপর জ্ঞান হতেই আর কোন কথা নয়, কোন দিকে চাওয়া নয়, চার জানোয়ার চারদিকে ছুটল—হাতী ছুটল গভীর জঙ্গলে—সিংহ ধু ধু মরুভূমিতে—বাঘ পাহাড়ের গুহায়—আর ছাগল লোকালয়ে।

সেই থেকে হাতীর বাস জঙ্গলে, সিংহের বাস মরুভূমিতে, বাঘের বাস পাহাড়ের গুহায় আর ছাগলের বাস লোকালয়ে।

১৩৬৮

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

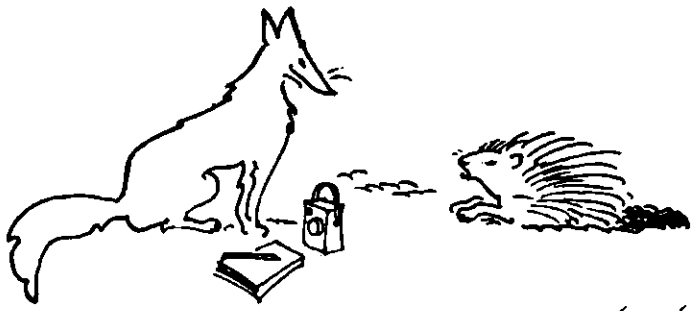

তরক্ষু-শল্লকী সংবাদ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শল্লকী এক অতি সজ্জন
সদা সাবধানে থাকে
তরক্ষু এক একদিন তার
বিবরেতে গিয়ে ডাকে।

বলে, 'মহাশয়, দয়া যদি হয়
দর্শন শুধু চাই'
শল্লকী তার বিবর থেকেই
বলে 'অবসর নাই।'

তরক্ষু করে সাধ্য সাধনা
কত তার গুণ গায়।
সোজা বাংলায় নেকড়েটা ওই
সজারুকে খেতে চায়।

অবশেষে বলে তরক্ষু, 'শুণু!
দরশনে কেন মাগি,
এসেছি বনের দৈনিক থেকে
সাক্ষাৎকার লাগি।

বন অরাজক, খাদ্য খাদক
সকলি অনিশ্চিত।
দন্তী কিংবা শৃঙ্গী, কার বা
কে জানে হবে যে জিৎ!

সমাজ ও দেশ ধর্ম কর্ম,
তা নিয়ে কি তব বার্তা,
শোনার জন্যে আজ সমস্ত
বনভূমি পিপাসার্তা।'

শল্লকী আর থাকতে কি পারে
গোপন নিজের বিবরে,
বেরিয়ে সে আসে, তরক্ষু তারে
তোষে মহা সমাদরে।

সাক্ষাৎকার নিয়ে সবিশেষ
ছবি তোলবার জন্য
বলে, 'প্রসাধন একটু তো চাই
নইলে দেখাবে বন্য।'

এক-একটি করে কাঁটা তুলে ফেলে
সাজিয়ে নধর নব্য
আলেখ্য নিয়ে ভাবে তরক্ষু
এখন কি কর্তব্য!

সার্থক আর সরস করতে
হেন সাক্ষাৎকার
জবর একটা খবর সঙ্গে
জোড়া শুধু দরকার।

তরক্ষু তাই ভক্ষণ করে
শলকীরে নিরুপায়।
সোজা বাংলায় নেকড়েটা বোকা
সজারুকে ধরে খায়।

১৩৮৪

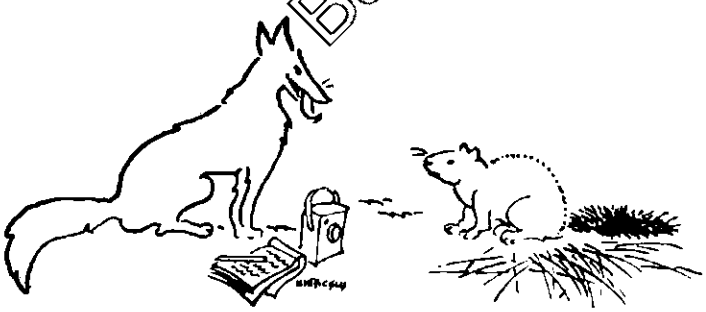

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাদুর গল্প

অরুণনাথ চক্রবর্তী

কু-ঝুক্-ঝুক্!

"কুউ-ঝুক্-ঝুক্-ঝুক্"—কানফাটা চিৎকারে হুইস্‌ল্ ছেড়ে, কাচঘেরা লম্বা বারান্দায় আমি রেলগাড়ি চালাচ্ছি—ছেলেবেলার এই দৃশ্যটা আমার মনে বেশ স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। নিজেই এঞ্জিন, নিজেই ড্রাইভার ও গার্ড, আবার নিজেই যাত্রী—রোজ কত রাজ্যই যে ঘুরে আসতাম মনে মনে! রেলগাড়ি চড়ে বেড়াবার শখটা প্রায় সব ছেলেমেয়েরই বোধহয় থাকে, আমার ত যেন একেবারে নেশার মত ছিল—একলা আপন মনে সারাদিন রেলগাড়ি-রেলগাড়ি খেলতাম ; তাই আমার ডাকনাম হয়েছিল "কু-ঝুক্-ঝুক্।"

এই ঘুরে বেড়াবার শখটা আমার ভাল করেই মিটেছিল—বলতে গেলে সারাজীবনটা আমার ঘুরে ঘুরেই কেটেছে। কিছু একটা আশ্চর্য অ্যাড্‌ভেঞ্চারপূর্ণ ভবঘুরে জীবন নয়, সরকারী কাজে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো, তবে তার মধ্যেই বেশ রকমারি ছিল ; অনেক মজা ছিল। এখন বুড়ো হয়েছি, আর ঘুরতে পারি না। বসে বসে সেসব পুরনো কথা ভাবতে খুব ভালো লাগে। সেই পুরনো দিনের গল্পই কিছু তোমাদের বলব—হয়ত তোমাদেরও ভাল লাগবে।

জন্ম হয়েছিল আমার দার্জিলিঙে ; তারপর সেখান থেকে বাবা নানা জায়গায় বদলি হলেন ; আমরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলাম।

সেকি আজকের কথা? কটক যখন বদলি হয়েছিলাম তখন ওদিকে রেল-লাইনই হয়নি—আমরা কত ঘুরে গিয়েছিলাম জানো? কলকাতা থেকে জাহাজে চড়ে, গঙ্গার মুখ দিয়ে বেরিয়ে, বঙ্গোপসাগরের দিকে গিয়ে উড়িষ্যার ব্রাহ্মণী নদীর মুখে ঢুকলাম ; ব্রাহ্মণী নদী থেকে বৈতরণী নদী দিয়ে চাঁদবালিতে পৌঁছে, সেখানে সমুদ্রগামী জাহাজ ছেড়ে ছোট কেনাল-ষ্টিমারে চড়লাম ; কেনাল দিয়ে গিয়ে, বিরূপা নদী হয়ে মহানদীতে পড়লাম। মহানদীর তীরে কটক—উত্তরে মহানদী, দক্ষিণে কাঠজুড়ি নদী, মাঝখানে শহরটি।

কটক থেকে পুরী আজকাল ট্রেনে যেতে তিন ঘণ্টাও লাগে না, গরুর গাড়িতে চড়ে কটক থেকে পুরী যেতে আমাদের তিন দিন লেগেছিল!

চট্টগ্রাম যখন গিয়েছিলাম, তখন বড় হয়েছি, কলেজে পড়ি। কর্ণফুলী নদীর তীরে, ছোট ছোট পাহাড়ে ভরা সুন্দর শহরটি। একেকটি "টিলা"র (ছোট পাহাড়) উপরে একেকটি বাড়ি, নিচেও অনেক বাড়ি আছে। আমাদের বাংলোটি ছিল অমনি একটি টিলার উপরে।

একদিন কি কাণ্ড হল, সেই টিলার গায়ের জঙ্গলে কেমন করে যেন আগুন লেগে গেল, আর দেখতে দেখতে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, চারদিক থেকে বেড়া-আগুনে আমাদের ঘিরে ফেলল! টিলার উপরে জল নেই, চারদিকে আগুন—আমরাও নিচে নামতে পারছি না, আমাদের বিপদ দেখে নিচে থেকে লোকজন ছুটে এসে, জল টেনে এনে আগুন নিভিয়ে আমাদের বাঁচালো।

আবার আরেকদিন গভীর রাত্রে সে কি ভীষণ সাইক্লোন! প্রচণ্ড ঝড়ে আমাদের বাংলোর টিনের চাল উড়িয়ে নিয়ে গেল ; এই দুর্যোগের মধ্যে কে কার সাহায্য করতে ঘরের বার হবে? আমরা খাটের তলায় ঢুকে কোনোমতে রাতটা কাটালাম, সকাল হতেই নিচে নেমে এলাম। বাড়িওয়ালা পাহাড়ের নিচে তাঁর আরেকটা বাড়ি আমাদের জন্য খালি করে দিলেন।

চট্টগ্রাম শহর থেকে নদী দিয়ে গেলে সমুদ্র প্রায় কুড়ি মাইল দূর হয়, আর মাঠঘাটের উপর দিয়ে 'শর্টকাট' করে গেলে, সাত মাইল। একবার আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে শর্ট-কাট দিয়ে হেঁটে সমুদ্র দেখতে গেলাম। তখন ভাঁটার সময়, সমুদ্র বেশ স্থির ছিল, জল অনেক দূর সরে গিয়েছে—মনের আনন্দে হাঁটুজল ভেঙে আমরা বহুদূরে চলে গেলাম। আমরা বেশ জলের মধ্যে হুড়োহুড়ি করে খেলা করছি, আর কোনো দিকে দৃষ্টি নেই, হঠাৎ খেয়াল হল—কল্‌কল্ করে জল বেড়ে উঠছে, তীরের দিকে ঢেউ ছুটেছে—জোয়ার এসে পড়েছে! তখন ছুট্—ছুট্—ছুট্! ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটা কি সোজা কথা? দেখতে দেখতে হাঁটুজল থেকে কোমর জল হল, কোমর-জল থেকে বুকজল হল—এবার তলিয়ে নেয় আর কি! প্রাণের ভয়ে একটা শেষ চেষ্টা করে তীরের বালিতে এসে আছড়িয়ে পড়লাম, দম নিয়ে সুস্থ হতে হতে অনেকক্ষণ সময় লাগল।

এমনি আরো নানা জায়গায় ঘুরে, নানা স্কুল-কলেজে পড়ে, তারপর কলকাতায় এসে আমি পড়াশোনা শেষ করলাম। পাশ করে বেরিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ পেলাম। তখন থেকে আসল ঘোরাঘুরি শুরু হল। ১৩৬৮

ভালুক ভয়া

চাকরি আরম্ভ হল রাঁচি থেকে। আমি যখন প্রথম রাঁচি গিয়েছিলাম তখনও রাঁচিতে রেল-লাইন হয়নি—পুরুলিয়া থেকে পুশপুশ গাড়িতে রাঁচি যেতে দেড় দিন লাগল। রাঁচি জেলায় 'সেট্‌ল্‌মেণ্ট' হচ্ছে—সমস্ত জমি জরিপ করে মেপে, সীমানা ঠিক করে, কোন্ জমির মালিক কে, খাজনা কত, ইত্যাদি সব হিসাব করে লেখা হচ্ছে—সেই কাজ পরিদর্শন করবার জন্য সারা জেলার থানায় থানায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে 'টুর্' করতে হবে।

www.BanglaBook.org

যথাসম্ভব হাল্কা মালপত্র নিয়ে রওনা হলাম—সঙ্গে চলল সাহামৎ চাপরাশি, জোসেফ্ বেয়ারা, আর কাঁধের উপর 'শিকা-বাঙ্গি'তে মালপত্র নিয়ে একজন 'ভারিয়া'। আমি সাইকেল চড়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি আর ওরা পাথর ডিঙিয়ে জঙ্গল ভেঙে শর্টকাট্ করে চলে যাচ্ছে—কাজেই, অনেক সময় দলছাড়া হয়ে পড়ছি।

কোথাও পাকা রাস্তা, কোথাও কাঁচা রাস্তা, আবার কোথাও মাঠের উপর দিয়ে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, সামান্য পায়ে-চলা পথ। চারদিকে পাহাড়, ঝরণা, জঙ্গল ; আবার খেলার মাঠ, শস্যক্ষেত, তার মাঝে মাঝে গ্রাম ; গ্রামের লোক অধিকাংশই ওরাঁও, হো ইত্যাদি আদিবাসী—ভারি সরল ফুর্তিবাজ মানুষ তারা, কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে নাচ-গান করে দিন কাটিয়ে দেয়। সারা-দিন বাইরে ঘুরে কাজ করি, ডাকবাংলোয় কিংবা তাঁবুতে থাকি। কত সময় রাত্রে বাঘের ডাক শুনতে পাই ; মাঝে মাঝে দেখতে পাই বাঘে মানুষ মেরেছে—থানায় তার মৃতদেহ নিয়ে এল ; ভাল্লুকের উৎপাত তো লেগেই আছে!

কোচেডেগা ডাকবাংলোর সামনে একসারি পেঁপে গাছ, তাতে ছোটবড় অসংখ্য পেঁপে ফলেছে। চাঁদনী রাতে ঘরের মধ্যে বসে বন্ধ জানালার সার্সির ভিতর দিয়ে ভারি মজার তামাসা দেখতাম—এক ভাল্লুক-ভায়া সপরিবারে পেঁপে খেতে আসত! মস্ত ভাল্লুকটা দু'পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দুই পায়ে গাছ ধরে ঝাঁকাত, আর টুপটাপ করে পাকা পেঁপে খসে পড়ত। সবাই মিলে পেট ভরে খেয়ে নিয়ে, মা ভাল্লুকটা মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ত আর ছানাগুলো তার গায়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে গড়িয়ে, কুকুর ছানার মত কিল্‌বিল করে খেলা করত—তার পর আবার তারা ধীরে সুস্থে হেলতে দুলতে সার বেঁধে বাড়ি চলে যেত।

চারদিকের দৃশ্য ভারি সুন্দর—কোথাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের উপর দিয়ে বড় বড় নদী হুড়হুড় করে নেমে চমৎকার সব 'জলপ্রপাত' সৃষ্টি করেছে। এদেশে জলপ্রপাতকে বলে 'ঘাগ'—যেমন সুবর্ণরেখা নদীর 'হুড্রু ঘাগ', কোয়েল নদীর 'পেরোয়া ঘাগ', কাঁচি নদীর 'দশম্ ঘাগ'। আবার কোথাও গভীর বন—বিরাট বিরাট সব বনস্পতি মাথার উপরে ঘন ডালপালা মেলেছে, দিনের বেলাতেও সেখানে অন্ধকার!

এই রকম একটা বনের ভেতর দিয়ে একবার চলেছি, রাস্তার মধ্যে একটা পাহাড়ী নালা—এপারে রাস্তা ঢালু হয়ে নালার মধ্যে নেমে গিয়েছে, আবার ওপারে খাড়া হয়ে উঠেছে। ঢালু পথে গড়গড় করে নামছি, নিচের দিকে চেয়ে দেখি—ওরে বাবা! নালার মধ্যে তিনটে ভাল্লুক! ঢালুর মুখে তো আর থামা যায় না, কপাল ঠুকে জোরে 'বেল্' বাজাতে বাজাতে নেমে চললাম। ওপারে আবার চড়াই পথ—নেমে, দু'হাতে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে হেঁটে উঠতে হবে—কি সর্বনাশ! ভাল্লুকও দেখি সেই পথে চলল! কিন্তু হঠাৎ আমার দিকে ফিরে তাকিয়েই, কি মনে করল জানি না—একেবারে হুড়মুড় করে জঙ্গলের ভেতরে পালিয়ে গেল। বোধহয় ভাবল যে—

"হ্যাট্ কোট্ চশমাধারী
চ'ড়ে দুই চাকার গাড়ি
কিড়িং কিড়িং ডাক ছাড়ি
কে রে এটা, দেয় পাড়ি?
চেহারাটা কিম্ভূত ভারি—
সরে পড়ি তাড়াতাড়ি!" ১৩৬৮

বাঘ! বাঘ!!

একবার গয়া জেলার শেরেঘাটি থানায় একটা তদন্তে গিয়েছিলাম। 'শের' মানে বাঘ, সুতরাং বুঝতেই পারছ জায়গাটা বাঘের আড্ডা।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরে রওনা হওয়া গেল। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে সরু রাস্তা দিয়ে চলেছি ; সামনে দুজন বন্দুকধারী কনস্টেবল, তারপর সারি সারি তিন-খানা ডুলী—প্রথমটায় আমি, দ্বিতীয়টায় পুলিশ ইন্সপেক্টর, শেষেরটায় সাব-ইন্সপেক্টর—আরো কয়েকজন চৌকিদার আর গ্রামের লোক পিছনে রয়েছে। ডুলী বেহারারা তাদের গানের তালে তালে পা ফেলে চলেছে, গ্রামবাসীরাও হাকিম আর পুলিশকে সমীহ করে একটু নিচু গলায় গল্প করতে করতে চলেছে।

পথে এক জায়গায় খুব গভীর বন—দিনের বেলাতেও অন্ধকার। এখানে নাকি দিন-দুপুরে বাঘ বেরোয়! বেহারাদের গান থেমে গিয়েছে, লোকজনদের মুখেও কথাটি নেই, সবাই ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে—চারদিকে একটা নিস্তব্ধ থমথমে ভাব।

হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করে পিছন দিক থেকে একটা গম্ভীর চাপা গর্জন শোনা গেল—

"গ-র্-র্-র্—ঘঁ!"

সকলে চম্‌কিয়ে থেমে গেল!

"গ-র্-র্-র্—ঘ্যাঁও!"

www.BanglaBook.org

কনস্টেবল দু'জন বন্দুক নিয়ে পিছনে যেদিক থেকে আওয়াজটা আসছিল সেই দিকে এগিয়ে গেল ; আমরাও যে যার পিস্তল বাগিয়ে ধরে খাড়া হয়ে বসলাম।

দু-চার মিনিটের মধ্যে কনস্টেবলরা ফিরে এল—উত্তেজনায় তাদের মুখ লাল হয়ে গিয়েছে, ঠোঁট কামড়িয়ে চেপে রেখেছে—ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ? কি দেখলে ?" অনেক কষ্টে তাদের মুখে কথা ফুটল—"হুজুর, ছোটদারোগা-সাব তো এক-দম শো গিয়া !"—আর তারা সামলাতে পারল না, হাসিতে একেবারে ফেটে পড়ল।

ছোটদারোগা বেচারা বেজায় মোটা মানুষ, দুপুরের ভোজনটাও হয়েছিল বেশ গুরুতর। তারপর ডুলীতে চেপে দুলতে দুলতে দিব্য আরামে ঘুমিয়ে পড়েছেন—আর তাঁর সেই বিশাল বপুর অনুপাতে ব্যাঘ্রগর্জনে নাসিকা গর্জন করে সকলের প্রাণে চমক লাগিয়ে দিয়েছেন !

যাহোক, সকলের হাসির সঙ্গে তিনিও লজ্জিতভাবে যোগ দিলেন। ১৩৬৮

সত্যি বাঘ

নাকডাকাকে বাঘডাকা ভেবে ভয় পাওয়ার গল্প শুনে তোমরা হাসছ ? আচ্ছা, এবার তাহলে সত্যি বাঘের গল্পই বলি।

পালামৌ, হাজারিবাগ, গয়া, এসব জায়গায় জঙ্গলে লেপার্ড, প্যান্থার, রয়াল বেঙ্গল টাইগার, সব রকম বাঘই আছে ; বাঘ ভাল্লুক ছাড়াও নেকড়ে, হায়না, বুনোশুয়র, ছোটবড় হরিণ, নানারকম পাখি প্রভৃতি অনেক শিকার আছে। আমি শিকারী নই, পাখি বা হরিণ মারবার ইচ্ছা তো আমার কোন-দিনই হয়নি, তবে 'বিগ গেম্' শিকারের শখটা মনে মনে একটু ছিল—অবসর পেলে মাঝে মাঝে শিকারীদের দলে জুটে যেতাম। নিজে কিন্তু একটাও বাঘ মারতে পারিনি।

প্রথম বাঘ শিকারে গিয়েছিলাম পালামৌ জেলায়। 'কেমো-পর্তাবপুর' বলে একটা জায়গায় সেট্‌ল্‌মেন্টের ক্যাম্প করেছি, এখানে বাইশটা মৌজা 'বে-চেরাগী' অর্থাৎ সেখানে চেরাগ (প্রদীপ) জ্বলে না— কারণ মানুষের বসতি নেই। চারদিকে পাহাড় জঙ্গল, বাঘের ভয়ে রাত্রে কেউ সেখানে থাকে না ; শুধু চাষের জমি আছে, দিনের বেলায় এসে চাষবাস সেরে সূর্যাস্তের আগেই সবাই দূরের গ্রামে চলে যায়। জঙ্গলের মধ্যে একটা গুহার ভিতরে এক রয়াল বেঙ্গল টাইগারের বাসা—খবর পেয়ে, যত বড়-সাহেবের দল এসে জুটলেন শিকারের জন্য।

দু'ধারে পাহাড়, মাঝখানে সরু একটা 'ভ্যালি'—তার একমুখে 'বীটার'রা রইল, অন্যমুখে গাছের উপর শিকারের মাচান তৈরী হল। সূর্যোদয়ের অনেক আগেই গিয়ে যে যার মাচান অধিকার করলাম—একেক মাচানে তিনজন—সেট্‌ল্‌মেন্ট বিভাগের কর্তা মিস্টার ব্রীজ, একজন শিকারী, আর আমি এক মাচানে। 'বীটার'রা টমটম বাজিয়ে, হল্লা করে, শিকার তাড়িয়ে আনছে, চোখের সামনে দিয়ে কত হরিণ শুয়র ইত্যাদি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে, সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই—সবাই বাঘের পথ চেয়ে রয়েছি।

অবশেষে, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল—প্রকাণ্ড এক রয়াল বেঙ্গল টাইগার ! গর্বিতভাবে মাথা তুলে একবার চারদিক দেখে নিল, তারপর ধীর গম্ভীর চালে নিজের গুহার দিকে এগিয়ে চলল। কি জাঁদরেল তার চেহারা ! কি চমৎকার তার চলার ভঙ্গি ! বনের মধ্যে স্বাধীন অবস্থায় বাঘকে দেখলে, তবেই তার আসল সৌন্দর্য বোঝা যায়।

আমাদের মাচানের সামনে আসতেই, একসঙ্গে তিনটে বন্দুক গর্জন করে উঠল। প্রচণ্ড হুঙ্কারে বন কাঁপিয়ে, এক-লাফে বাঘ আবার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। মিস্টার ব্রীজ বলে উঠলেন, 'লেগেছে, নিশ্চয় গুলি লেগেছে।' ভয়টয় কিছু মনে হল না, শুধু একটা রোমাঞ্চকর উত্তেজনা—উৎসাহের চোটে তাড়াতাড়ি মাচান থেকে নামতে যাচ্ছি, খপ করে দু'হাতে আঁকড়িয়ে ধরলেন ব্রীজ সাহেব। মহাব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ওহে ইয়ং ম্যান্, এমন গোঁয়ার্তুমি কখনও করো না—'উন্ডেড' টাইগারের মত ডেঞ্জারাস্ জিনিস আর নেই !'

সে বাঘের কিন্তু আর কোনো খবর পাওয়া গেল না—শিকারীরা এবং গ্রামের লোকেরা পরে অনেক সন্ধান করেও তার কোন পাত্তা পায়নি। কাজেই মনে হয়, যদি গুলি লেগেও থাকে, তাতে বাঘটা মরেনি।

হাজারিবাগ জেলায় চাতরা রোড দিয়ে একবার বাঘের সন্ধানে বেরিয়েছি, সঙ্গে আছেন 'নয়াগড়'-এর রাজা আর শ্রীমান অজয়—দুজনেই ভাল শিকারী। মোটরের হুড নামিয়ে দিয়ে, দু'ধারে তাকাতে তাকাতে আস্তে আস্তে চলেছি, হঠাৎ রাস্তার ধারে জঙ্গলের মধ্যে একজোড়া জ্বলজ্বল চোখ দেখা গেল—মাটি থেকে হাতখানেকের বেশী উঁচু হবে না, সুতরাং বোঝা গেল যে কোন ছোট জন্তু ; তারপরেই আরো উঁচুতে আরেকজোড়া চোখ জ্বলজ্বল করেই আবার মিলিয়ে গেল। খানিক পরে দেখি, আমাদের সামনে দিয়ে কি একটা জন্তু খুব আস্তে আস্তে রাস্তা পার হচ্ছে—আয়তনে ছোট হলেও, গড়ন আর চলার ধরন ঠিক বাঘের মত। অজয় তখনই দাঁড়িয়ে উঠে গুলি করতে যাচ্ছিল, রাজা সাহেব তার হাত টিপে ইসারায় তাকে বারণ করলেন।

হঠাৎ আমাদের মাথার উপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল—প্রকাণ্ড এক রয়াল বেঙ্গল টাইগেস্ সোঁ-ও করে, আমাদের মাথা ডিঙিয়ে রাস্তার এপারের জঙ্গল থেকে ওপারে লাফিয়ে পড়ল। রাজা বললেন, 'দেখলেন ত ? বাচ্চা রাস্তা পার হচ্ছিল, মা আড়ালে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল—যদি বাচ্চাকে গুলি করতেন, তখনই ঐ বাঘিনী এসে আমাদের ঘাড়ে পড়ত !'

আরেকবার, হাজারিবাগ জেলায় সেমারিয়া বলে একটা জায়গায় শিকারে গিয়েছি। অনেকক্ষণ ধরে সমানে একটা বাঘকে লক্ষ করতে করতে চলেছি—রাস্তার ধারে ধারে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সে চলেছে, মাঝে মাঝে একটু তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে, আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমরা একমনে সামনের দিকে চেয়ে দেখছি, হঠাৎ একজন বলে উঠলেন, 'বাঘ তো পিছনে !' পিছনের জানালা দিয়ে দেখা গেল, মস্ত বড় এক লেপার্ড—কোথায় আমরা তাকে তাক করছিলাম, সেও আবার কখন ঘুরে পিছনে গিয়ে, আমাদের তাক করে গুটিগুটি এগিয়ে আসছে ! এক গুলিতেই অজয় তাকে শেষ করল।

বাঘ যখন কোন বড় জন্তুকে শিকার করে, একবারে ত খেয়ে শেষ করতে পারে না—খানিকটা খেয়ে রেখে যায়, পরদিন আবার এসে খায়। এইরকম বাঘে শিকার করা জন্তুর মৃতদেহ ('কিল') দেখতে পেলে, শিকারীরা সেইখানে মাচান বেঁধে বাঘের অপেক্ষায় বসে থাকে—যেই বাঘ খেতে আসবে অমনি তাকে গুলি করবে। ধৈর্য ধরে স্থির হয়ে চুপচাপ বসে থাকতে

www.BanglaBook.org

হয়—জোরে কথা বলবার জো নেই, নড়াচড়া উশখুশ করা মানা—কিন্তু তবু সব সময় সহজে বাঘের দেখা মেলে না। হয়ত সারারাত মাচানে বসেই কেটে গেল, বাঘ আশপাশেই ঘুরছে বোঝা গেল, কিন্তু চোখের সামনে দেখা দিল না। ভারি হুঁশিয়ার জানোয়ার, একটুখানি আওয়াজ কানে এল, কিংবা এতটুকু গন্ধ নাকে ভেসে এল, অমনি তার মনে সন্দেহ হয়, আর তখনই সাবধান হয়ে যায়।

কিংবা হয়ত জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা দিয়ে মাইলের পর মাইল মোটরে চলে গেলাম, সারারাত ঘুরে কোথাও বাঘের দর্শন মিলল না। মোটরের হেডলাইট খুব কমিয়ে দিয়ে, নিঃশব্দে আস্তে আস্তে চালাতে হয় ; একটা স্পটলাইট থাকে, হঠাৎ সেটাকে জ্বালালেই একেবারে সার্চলাইটের মত তীব্র আলোয় বনের ভিতরটা অনেকদূর পর্যন্ত দিনের বেলার মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমার এক বন্ধু মিঃ গাঙ্গুলীর খুব শিকারের শখ ছিল। শিকারের জন্য একটা নতুন মোটর কিনেছেন, সেটা দেখাবার জন্য একদিন চাঁদনি রাতে ছেলেপুলে সুদ্ধ আমাদের হাজারিবাগের জঙ্গলে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। কয়েক মাইল গিয়ে তাঁর স্পটলাইটটা কেমন 'পাওয়ারফুল' তাই দেখাবার জন্য হঠাৎ জঙ্গলের ভিতরে আলো ফেললেন—সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত বিকট একটা আওয়াজ! আমরা সবাই চমকিয়ে উঠলাম, গাঙ্গুলী-ভায়া তো তক্ষুনি "অ্যাবাউট টার্ন" করে ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি ছোটালেন—অন্তত পাঁচ মাইল 'ফুল্ স্পীডে' এসে, তবে থামলেন। সে ব্যাপারটা কিন্তু বাঘ নয়, হাতি! ঐ জঙ্গলে রামগড়ের রাজা সদলে শিকারে এসেছিলেন, নিজেরা ডাকবাংলোয় থেকে, হাতিগুলোকে একটু দূরে শালবনের ভিতরে রাখিয়েছিলেন। বেচারারা বোধ হয় নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়েছিল, হঠাৎ চোখ-ধাঁধানো আলো লেগে চমকিয়ে উঠে, সমস্বরে আমাদের অভদ্র আচরণের প্রতিবাদ জানিয়েছিল। গাঙ্গুলী বললেন, 'বাঘকেও অতটা ডরাই না, কিন্তু একসঙ্গে অতগুলো হাতি তেড়ে এলে গিয়েছিলাম আর কি!'

অনেক কষ্ট করেও যেমন সব সময়ে বাঘের দেখা মেলে না, তেমনি আবার হঠাৎ কখনও অপ্রত্যাশিতভাবে তার দেখা পাওয়া যায়।

একবার গয়া জেলার 'কহ্‌দাগ' বলে একটা জায়গায় বাঘ শিকারের দলের সঙ্গে জুটে গিয়েছি—সারারাত শিকারের সন্ধান না পেয়ে, নিরাশ হয়ে ভোরের দিকে ডাকবাংলোয় ফিরে আসছি ; লোকালয়ের মধ্যে পৌঁছে গিয়ে আমরা কার্তুজ বার করে বন্দুক গুছিয়ে তুলে ফেললাম, তারপর বাংলোর একেবারে কাছে এসে দেখি—রাস্তার ধারেই মস্ত এক প্যান্থার বসে আছে! আমরা ত ততক্ষণে পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলেছি, বন্দুক বার করে গুলি ভরবার অপেক্ষায় বাঘ কি আর বসে থাকে? আমাদের দেখেই সে সোজা জঙ্গলের দিকে দৌড় দিল। তার সেই মসৃণ, কোমল, চকচকে, চমৎকার চামড়াটার কথা ভেবে তখন শিকারীদের কি আফসোস!

আরেকবার, কোডার্মায় একটা কাজ সেরে হাজারিবাগ ফিরছি, সূর্য তখনও অস্ত যায়নি ; রাস্তার বাঁ দিকে এক ঝাঁক ময়ূর চরে বেড়াচ্ছে, আমি তাদের শোভা দেখবার জন্য খুব আস্তে আস্তে মোটর চালাচ্ছি। হঠাৎ পিছন থেকে চাপরাশি ভয়ে-ভাঙা চাপা গলায় বলল, 'হু-জু-র, র-য়া—ল টাইগার!' চমকিয়ে ডাইনে ফিরে দেখি, ওরে বাবা! রাস্তার ধারেই নালার মধ্যে ব্যাঘ্রমশাই বসে আছেন! গুলিভরা পিস্তলটা সঙ্গেই আছে, চাপরাশিও কানের কাছে ফিসফিস করছে, 'মারুন, মারুন!' ওস্তাদ শিকারী হলে হয়ত অনায়াসে মারতে পারত, কিন্তু আমি একে আনাড়ি তায় একলা নিজেই মোটর চালাচ্ছি ; গুলি যদি ঠিকমত না লাগে? গুলি খেয়ে বাঘ যদি না মরে? পিস্তল নামিয়ে মোটর স্টার্ট করবার আগেই হয়ত ঘাড়ে এসে পড়বে! অতএব পলায়নই শ্রেয় মনে করলাম। বাঘও ততক্ষণে উঠে, 'ঘোঁৎ' করে আমাকে এক ধমক দিয়ে, জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল।

প্রথম যেবার হাজারিবাগ গিয়েছিলাম—প্রায় সাঁইত্রিশ বছর আগে, তখন শহরটা অনেক ফাঁকা ছিল। একটা নির্জন বাংলোবাড়িতে মিসেস টম্‌সন্ বলে এক বুড়ি মেম থাকতেন। একদিন ভোরবেলায় মেম-সাহেবের আয়া তাঁর জন্য গরম জল আনবে বলে দরজা খুলেই, হাত থেকে কেটলি ফেলে হাঁউমাউ চিৎকার করে উঠল। বেয়ারা, খানসামা ছুটে এসে দেখল কি, গেটের পাশেই ঝাঁকড়া গাছের তলায় মস্তবড় এক লেপার্ড দিব্যি মেনীবেড়ালের মত থাবা পেতে বসে আছে! তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিয়ে তারা ক্যানেস্তারা পিটিয়ে, বাসনপত্র ঝন্‌ঝনিয়ে, আর প্রাণপণ চেঁচিয়ে, বিষম সোরগোল জুড়ে দিল!

এত হট্টগোল বাঘের পছন্দ হল না, সে গেট দিয়ে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে, সামনেই আরেকটা গেটের মধ্যে দিয়ে প্রকাণ্ড এক বাগানবাড়িতে ঢুকল। বাড়ির মালিকরা তখন ছিলেন না, বাড়ি তালাবন্ধ ; বাঘ বাগানে ঘুরে ঘুরে একটা নিরিবিলি আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে—দূর থেকে তাকে দেখেই, মালীরা ত খুরপি কোদালি সব ফেলে পিট্টান দিল। ঘুরতে ঘুরতে, একটা বাথরুমের বাইরের দিকের দরজা খোলা পেয়ে, বাঘ সেখানে ঢুকল—অমনি এক সাহসী আর বুদ্ধিমান মালী গুটিগুটি এগিয়ে এসে চট করে বাইরে থেকে ছিটকিনি বন্ধ করে দিল। তারপর ছুটে গিয়ে পুলিস ট্রেনিং কলেজের মেসে খবর দিতেই, দুজন পুলিস অফিসার বন্দুক নিয়ে এলেন। বাঘ বেচারা ঘরের মধ্যে বন্ধ রইল, আর বাইরে থেকে জানালা দিয়ে গুলি করে সাহেবরা তাকে মারল! ১৩৬৮

দুর্ভিক্ষের দেশে

পালামৌ জেলাতে দুর্ভিক্ষ লেগেছে, সেখানে গেলাম রিলিফের কাজে।

বৃষ্টির অভাবে চারদিক শুকনো খটখটে—মাঠে ঘাস নেই, খেতে ফসল নেই, ধান একেবারে হয়নি ; গরিব লোকের ভয়ানক কষ্ট—এইবেলা কিছু ব্যবস্থা না করলে হয়ত অনেকে না খেয়ে মারা পড়বে। তাদের সাহায্যের জন্য তাড়াতাড়ি কতগুলো রাস্তা মেরামত আর বাঁধ তৈরির কাজ খুলে দেওয়া হল—সেখানে মজুরি করে অনেক লোক চাল আর নগদ পয়সা পাবে।

ক্যাম্প জাপ্‌লা—রেললাইনের ধারে বেশ বড় একটা গ্রাম। এখানে রিলিফের প্রধান কেন্দ্র হল। রিলিফ-প্রার্থীদের জন্য এখানে অন্নসত্র খোলা হল আর তাদের থাকবার জন্য সারি সারি লম্বা লম্বা চালাঘর তোলা হল।

রোজ চারদিক থেকে দলে দলে লোক আসছে। যারা সুস্থ সবল তারা সোজাসুজি নাম লিখিয়ে কাজে লেগে যাচ্ছে ; যারা না খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে, তারা দু-চারদিন বিশ্রাম করে আর অন্নসত্রে খিচুড়ি খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে নিয়ে, তারপর কাজে লাগছে। কেউ কেউ একেবারে কঙ্কালসার অবস্থায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

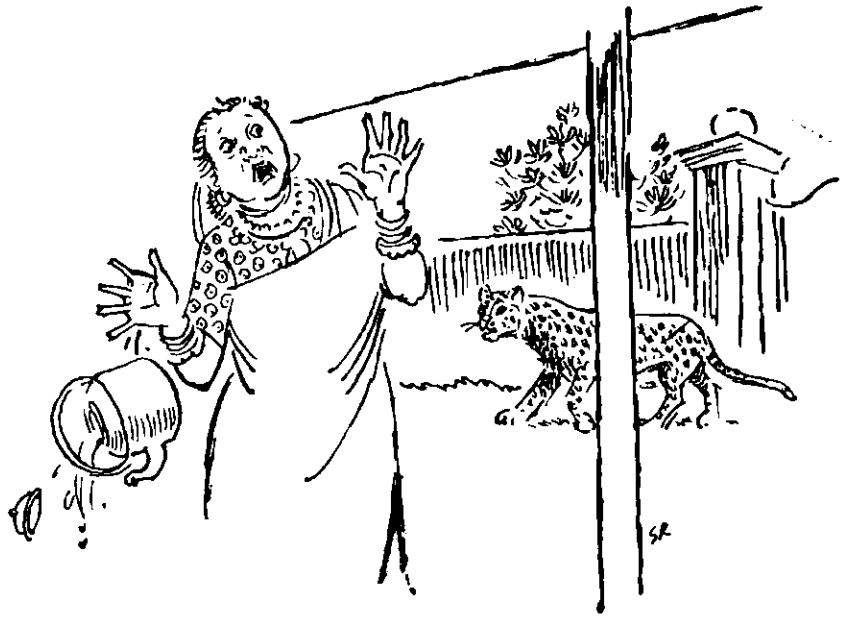

কোনমতে ধুঁকতে ধুঁকতে এসে পৌঁছচ্ছে, কাউকে বা রাস্তার ধারে আধমরার মত পড়ে থাকতে দেখে চৌকিদাররা তুলে আনছে—এদের প্রথমে খুব সাবধানে অল্প অল্প করে দুধ-সাগু খাইয়ে একটু সুস্থ করে নিয়ে, তবে আস্তে আস্তে ক্রমে পুরো খাবার দেওয়া যাচ্ছে। অনাহারে শরীর যেমন দুর্বল হয়ে পড়ে, সেইসঙ্গে হজম করার শক্তিও দুর্বল হয়ে যায় ত! তখন হঠাৎ খাবার খেলে অনেক সময় অসুখ করে। ক্যাম্পে ডাক্তার আছেন, তিনি প্রত্যেক লোককে পরীক্ষা করে দেখে বলে দিচ্ছেন—কার কী রকম খাবার চাই, কতদিন বিশ্রাম দরকার, ওষুধপত্র দরকার কিনা।

জোয়ান লোকেরা মাটি কাটছে, পাথর ভাঙছে ; মেয়েরা আর অল্পবয়সী ছেলেরা সেগুলি ঝুড়ি করে মাথায় করে বয়ে নিচ্ছে ; শিশু, বৃদ্ধ কিংবা রুগ্ন, যারা কাজ করতে পারে না, তারা বিনা পরিশ্রমে অন্নসত্রে খাবার আর চালাঘরে আশ্রয় পাচ্ছে।

খুব ভোরে উঠে ঘোড়ায় চড়ে দূরের কাজগুলি পরিদর্শন করতে বেরিয়ে যাই, রোদ বেশি কড়া হবার আগেই ফিরে এসে দেখি ততক্ষণে চারদিক থেকে রিলিফ-প্রার্থীরা এসে জমায়েত হয়েছে ; গাছতলায় চেয়ার টেবিল পেতে তাদের তদবির তদারক করতে বসে যাই।

একদিন এইরকম তদারকে বসেছি, সামনে গাছের ছায়ায় লোকজনেরা বসেছে, একে একে তাদের ডেকে নামধাম লেখানো হচ্ছে ; একটি সতেরো-আঠারো বছরের মেয়েকে ডাকতেই, সে দিব্যি মুখ বাড়িয়ে দেখলাম—খেতের আল বেয়ে, মাঠের উপর মাটিতে বসে বসে দুই হাতে ভর করে কষ্টেসৃষ্টে ছেঁচড়িয়ে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ ডাক্তারবাবু চেঁচিয়ে তাকে এক ধমক দিলেন, 'ও কী হচ্ছে! হাকিমের সামনে কি অমন করে আসতে হয়? শিগগির ভালো করে এসো।' বলবামাত্র মেয়েটা তড়াক করে খাড়া হয়ে উঠে দিব্যি হেঁটে আমাদের সামনে এসে লম্বা সেলাম ঠুকল! ডাক্তার হেসে বললেন, 'দেখলেন তো মজা? পা খোঁড়া হলে ত কাজ করতে হবে না, তাই বিনা মেহনতে বসে খাবার লোভে ঐ রকম ভান করছিল। আমি কিন্তু ওর পায়ের দিকে তাকিয়েই ওর চালাকি বুঝতে পেরেছি। খোঁড়া মানুষের পায়ে কোন না কোনরকম খুঁত থাকবেই—হয় সরু হবে, নয় বাঁকা হবে, কিংবা গড়নের কোন দোষ থাকবে—অমন সুস্থ সবল পা দুটি কখনই খোঁড়া হতে পারে না।' ডাক্তারের চোখে দুষ্টু মেয়ের চালাকি ধরা পড়ে গেল, কাজেই তাকেও আর পাঁচজন সুস্থ মানুষের মত খেটে খেতে হল।

একদিন একজন মেয়ে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে কোনোমতে ক্যাম্পে এসে পৌঁছল, সঙ্গে তার তিন বছরের ছেলে! দুদিন পরেই মেয়েটি মারা গেল। তার কোথায় বাড়ি, কে কে আছে, কিছুই বলে যেতে পারেনি, আত্মীয়-স্বজন কারো খবর জানা গেল না, ছেলেটি ক্যাম্পেই রয়ে গেল। এই রকমে একটি দুটি করে অনাথ ছেলেপিলে ক্যাম্পে জুটতে লাগল ; তা ছাড়া গ্রামে অনেক অনাথ ছেলেমেয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়, গাছতলায় শুয়ে থাকে, তাদের কেউ নেই, কেউ তাদের ভার নিতে চায় না। শেষটায় কোনও এক অনাথাশ্রম সেই ছেলেমেয়েদের ভার নিতে রাজী হয়ে তাদের নেবার জন্য একজন পাদ্রীকে পাঠিয়ে দিল।

পাদ্রীসাহেবের যেদিন আসবার কথা তার আগের রাত্রে চৌকিদারদের বলে দেওয়া হল, সকালে যখন কাজে আসবে তখন নিজের নিজের এলাকার ভিখারি ছেলেমেয়েদের যেন সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

সকালবেলায়, বিশ্রীরকম বেসুরো বিদঘুটে একটা আওয়াজে চমকিয়ে ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম—খেতের আল বেয়ে, মাঠের উপর দিয়ে দশ-বারো জন চৌকিদার আসছে আর তাদের সঙ্গে গোটাচল্লিশেক ছেলেমেয়ে নানা সুরে নানা ছন্দে বিলাপ করে, ডাক ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে আসছে—সরুগলা, মোটাগলা, ভাঙা-গলা, চাঁছাগলা—সব মিলিয়ে ঐ অদ্ভুত লোমহর্ষক আওয়াজটা হচ্ছে!

পৌঁছিয়েই চৌকিদাররা নালিশ করল, গ্রামের লোকগুলো এমনি শয়তান, এদিকে নিজেরা ত খেতে দিতে পারে না, ওদিকে আবার ছেলেগুলোকে ভয় দেখিয়ে দিয়েছে যে ওদের

www.BanglaBook.org

বলি দিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাই বেচারাদের এত কান্না!' অনেক বুঝিয়ে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে একঝুড়ি মিঠাই খাইয়ে ছেলেমেয়েদের শান্ত করা গেল—অনেকে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

একটু পরেই আবার, 'বাপ-বাপ-হায়-হায়-হাঁউমাউ' বেজায় সোরগোল—এবার ওদের বাপ-মায়েরা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসছে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে ঐ চল্লিশটি ছেলেমেয়ের মধ্যে মাত্র তেরোটি হচ্ছে সত্যিই অনাথ, আর সকলেরই বাবা মা কাকা জ্যাঠা রয়েছে। ঘরে চাল নেই, খেতে দিতে পারে না, তাই অনাথ সেজে ভিক্ষা করতে শিখিয়ে দিয়েছে। একে একে সবগুলি ছেলেমেয়েকে নামধাম লিখে অভিভাবকের জিম্মা করলাম, তাদের জন্য 'ডোল'-এর ব্যবস্থা করলাম, আর বলে দিলাম যে এর পর যদি ঐ ছেলেমেয়েরা ভিক্ষা করে বেড়ায় তবে চৌকিদার অভিভাবকদের ধরে আনবে।

এখন বাকি রইল সেই তিন বছরের খোকা থেকে আরম্ভ করে দশ-বারো পর্যন্ত বয়সের তেরোটি অনাথ ছেলে—রোগা হাড্ডিসার চেহারা, পরনে ছেঁড়া ময়লা জামা, চোখে পিঁচুটি, নাকে সর্দি, রুক্ষ ঝাঁকড়া মাথায় উকুনের বাসা! প্রথমেই নাপিত ডেকে তাদের মাথা নেড়া করা হল; তারপর জমাদাররা তাদের পুকুরঘাটে নিয়ে সাবান ঘষে, তেল চকচকে করে, স্নান করাল, ততক্ষণে বাজার থেকে একখান কাপড় এসেছে আর দুজন দরজি সেলাই করতে বসে গিয়েছে—দেখতে দেখতে তেরোটা পাজামা তৈরি হয়ে গেল। ওদিকে আমার বাড়িতে ওদের জন্যে অনেক রান্নাবান্না হয়েছে। স্নান করে পরিষ্কার হয়ে, নতুন জামাকাপড় পরে, পেট ভরে নেমন্তন্ন খেয়ে তারা হাসিমুখে পাদ্রীসাহেবের সঙ্গে চলে গেল।

কোয়েল নদীর ধারে ক্যাম্প মহম্মদগঞ্জ—এদিকে নদী, ওদিকে পাহাড় জঙ্গল, ভারি চমৎকার জায়গাটা। দূরে, শোণ নদীর ওপারে, রোটাস পাহাড়ের মাথায় রোহিতাশ্ব মন্দিরের চূড়াটি এখান থেকে বেশ সুন্দর দেখায়। মহাভারতে রাজা হরিশচন্দ্র, রাণী শৈব্যা আর তাঁদের ছেলে রোহিতাশ্বর গল্প তোমরা নিশ্চয় শুনেছ? সেই রোহিতাশ্বর নামেই এই মন্দির ও পাহাড়—'রোহিতাশ্ব' কথাটাই লোকের মুখে এসে 'রোটাস' হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোটাস-গড় বলে খুব পুরনো একটা দুর্গও পাহাড়ের উপরে আছে।

এখানে ডাকবাংলো নেই, আফিম কুঠিতে রইলাম—জেল-খানার মত উঁচু পাঁচিল-ঘেরা আঙিনার মধ্যে তিনদিকে সারি সারি গুদামঘর, আর অন্য দিকে দুটো বেশ ভাল ঘর; ঘর দুটোর জানালা-দরজায় আর বারান্দায় খুব মোটা মোটা লোহার শিক বসানো—ঠিক যেন একটা খাঁচা। প্রথমে ভাবলাম, এককালে সরকারী আফিম কুঠি ছিল, হয়ত অনেক টাকাপয়সা থাকত, তাই বুঝি চোর-ডাকাতের ভয়ে এই রকম সুরক্ষিত করা হয়েছে; তারপর বুঝলাম, চোর-ডাকাত ছাড়া অন্য ভয়ও আছে। চাঁদনি রাত্রে খাঁচা-বারান্দায় বসে দেখতে পেতাম, বনের জন্তুরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে কুঠির সামনে দিয়েই নদীতে জল খেতে যেত—হরিণ, নেকড়ে, চিতা; রয়াল বেঙ্গলও বাদ যেতেন না।

রিলিফের জন্য যেসব রাস্তা মেরামত, বাঁধ তৈরি ইত্যাদি কাজ খোলা হয়েছিল, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে, কুকুহি নদীর বাঁধ। অনেক লোক সেখানে মজুর খাটছে, কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় হঠাৎ জুন মাসের প্রথমেই পাঁচদিন ধরে অনবরত মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টিতে বাঁধটার কোন ক্ষতি হল না, কিন্তু নদীটা একদিন রাতারাতি বাঁধের পাশ কাটিয়ে ডবল চওড়া একটা নতুন পথ কেটে নিয়ে বেরিয়ে গেল! অনেক খেত মাঠ ভেসে গেল। তবে সে পথের উপর কোন গ্রাম ছিল না তাই রক্ষা—গ্রাম ভাসিয়ে নিলে সর্বস্বান্ত হত, হয়ত কত লোক মারা যেত।

এতদিন আমি চার্জে ছিলাম, আর আমাকে সাহায্য করবার জন্য কয়েকজন সার্কল অফিসার ছিলেন; কাজ যখন খুব বেড়ে গেল, তখন সদর থেকে সাব-ডেপুটি রমেশবাবু এলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনচার্জ হয়ে। ক্রমাগত চারিদিকে কাজ পরিদর্শন করে ঘুরে বেড়াতে হয়, বলতে গেলে এক রকম ঘোড়ার পিঠেই দিনটা কাটে। রমেশবাবুর ঘোড়া নেই, তার জন্য শোণপুরা রাজার এক ঘোড়া জোগাড় করা হল—প্রকাণ্ড উঁচু ঘোড়া, দেখতেও চমৎকার, কিন্তু এমনি শয়তান, যখনই কোন নদী পার হতে হবে, মাঝনদীতে সে একবার বসবেই বসবে—বেচারা রমেশবাবুকে একেবারে নাকানি-চোবানি খাইয়ে ছাড়ল।

কোশিয়ারার জমিদার মহম্মদ হাসান একজন অনারারি সার্কল অফিসার; তাঁর সার্কল পরিদর্শন করতে গিয়ে যেমন ভেবেছিলাম তার আগেই কাজ শেষ হয়ে গেল। তখন পরামর্শ হল যে একটু অবসর যখন পাওয়া গেছে সেই ফাঁকে রোটাস্‌গড় দেখে আসা যাক। আমাদের ঘোড়া দুটো শোণ নদীর ধারে বুধুয়াঘাটে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা নৌকায় চড়ে কোয়েল নদী দিয়ে গিয়ে শোণ নদীতে পড়লাম—শোণ নদীর ওপারে, রোটাস পাহাড়ের গোড়ায়, আকবরপুরে যাব। হঠাৎ মাঝনদীতে এমন ভীষণ ঝড় উঠল যে নদী পার হওয়া দূরের কথা, কোনোমতে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে হল। বুধুয়াঘাটে আমাদের ঘোড়া অপেক্ষা করছে কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই বুধুয়া-ঘাটে পৌঁছানো গেল না—দারুণ স্রোতে হু-হু করে টেনে নিয়ে গেল একেবারে সাত মাইল উত্তরে দাঙ্গোয়ার ঘাটে! সেখানে থাকবার মত কোন জায়গা নেই, মুষলধারে বৃষ্টি, চারদিকে জলকাদা, অনেক কষ্টে একটা মাত্র ঘোড়া জোগাড় হল; একবার আমি ঘোড়ায় চড়ি হাসান সাহেব হাঁটেন, আবার তিনি ঘোড়ায় চড়েন আমি হাঁটি, এমনি পালা করে চলতে চলতে গভীর রাত্রে বাংলোয় এসে পৌঁছোলাম—ততক্ষণে লণ্ঠন নিয়ে লোকজন চারদিকে আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে!

যেমন অনাবৃষ্টি গিয়েছিল, তেমনি প্রবলভাবে বর্ষা নামল। এবার হেমন্তকালে ফসল খুব ভালই হল, লোকের অন্নকষ্ট ঘুচল, কাজেই আমাদেরও কাজ ফুরাল।

পাততাড়ি গুটিয়ে নিয়ে যেদিন চার্জ দিলাম সেদিন রমেশবাবুকে বললাম, 'কাল থেকে ত আর ভোরে উঠতে হবে না, কাল যত বেলা অবধি ইচ্ছা হয়, ঘুমাবো।' রমেশবাবুরও তাই মত। কিন্তু বদভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছে, ভোর না হতেই আপনিই ঘুম ভেঙে গেল—চোখ পিট্‌পিট্‌ করে দেখলাম রমেশবাবু তখনও দিব্যি আরামে ঘুমোচ্ছেন। অমনি আবার চোখ বুজলাম; রমেশবাবুও চোখ মেলে যেই দেখেন আমি ঘুমোচ্ছি অমনি তিনিও চোখ বোজেন। প্রায় বেলা দশটা অবধি এইরকম মট্‌কা মেরে পড়ে থেকে, আর পারলাম না—একলাফে দুজনেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম।

১৩৬৮

www.BanglaBook.org

বেদের উৎপাত

ধানবাদ শহরে একবার বেদেদের ভারি উৎপাত হয়েছিল। বেদেরা হল ভবঘুরে—ঘরবাড়ি জমিজমা কিছুই নেই, যেখানে খুশি তাঁবু ফেলে তালপাতার ছাউনি তুলে কিছুদিন রইল, আবার হঠাৎ একদিন পাততাড়ি গুটিয়ে, পোঁটলাপুঁটলি ঘাড়ে করে চলল নতুন জায়গার সন্ধানে—এমনি ঘুরে ঘুরেই তারা জীবন কাটায়। বেদের দল এলেই শহরে চুরিচামারি বেড়ে যেত, সেজন্য পুলিস তাদের শহরের ত্রিসীমানার মধ্যে থাকতে দিত না—দূরে মাঠের মধ্যে তাঁবু ফেলে তারা থাকত।

একদিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পোষা কুকুরটা হঠাৎ রাতারাতি কোথায় উধাও হয়ে গেল। পুলিস সাহেব এ কথা শুনেই বললেন, 'দু মাইল দূরে জিপসিদের ক্যাম্প পড়েছে, এ নিশ্চয় তাদেরই কাজ।' দুই সাহেব তখন ঘোড়ায় চড়ে বেদেদের ক্যাম্পের দিকে বেড়াতে চললেন।

দূর থেকে সাহেবদের আসতে দেখেই বেদের দলের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল—তাড়াতাড়ি তাঁবুর সামনে, খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে তারা সাহেবদের বসবার জন্য দুটো মোড়া পেতে দিল। সামনে তাঁবুর মুখেই কম্বলঢাকা খাটিয়ার উপরে বেদেদের বুড়ো সর্দার চাদর মুড়ি দিয়ে বসে জ্বরে ঠকঠক করে কাঁপছে। উঠে দাঁড়িয়ে সাহেবদের অভ্যর্থনা করবার শক্তি তার নেই, হাত জোড় করে কসুর মাফ করতে অনুরোধ করল।

ছেঁড়াখোঁড়া সামান্য তাঁবু, তার মধ্যে আসবাবপত্র কিছু নেই ; ঘাঘরাপরা লম্বা-বিনুনি-দোলানো বেদে মেয়েরা গাছতলায় ডালপালা কুড়িয়ে আগুন জেলে রান্নার জোগাড় করছে ; একজন মেয়ে ছাগলের দুধ দুইছে। ছেলেপিলেরা দুধের আশায় তাকে ঘিরে বসেছে ; পায়ে-দড়ি-বাঁধা একটা ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে, হাঁস মুরগীও দু-একটা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কুকুরের কোন চিহ্ন কোথাও নেই।

চারদিক তাকিয়ে দেখে নিরাশ হয়ে সাহেবরা ফিরে আসবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময় হঠাৎ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সর্দারের সেই কম্বলঢাকা খাটিয়াটার নীচে কিসের যেন একটা চাঞ্চল্য লক্ষ করলেন—অমনি শিস দিয়ে তিনি ডাকলেন, 'রোভার! রোভার!'

আর কোথায় যায়! হড়াস করে খাটিয়া উলটিয়ে গেল, সর্দার ডিগবাজি খেয়ে ছিটকিয়ে পড়ল, আর খাটিয়ার তলা থেকে দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে রোভার সাহেবের গায়ে পড়ে হাত-মুখ চেটে একাকার।

সর্দারের জ্বরের কাঁপুনি এবার ভয়ের কাঁপুনিতে দাঁড়িয়েছে।

১৩৬৮

আড্ডাবাজ পুলিস

কোনও কয়েদীর যখন মেয়াদ ফুরোয় তখন তাকে ছাড়বার জন্য কোর্ট থেকে একটা ছাড়পত্র দেওয়া হয়—সেই ছাড়পত্রে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সই থাকা চাই।

আরা শহরে একবার একজন কনেস্টবল দুজন কয়েদীর ছাড়পত্র সই করাবার জন্য আমার বাড়িতে নিয়ে এল। বাইরে চাপরাশিরা বসে ছিল, কনেস্টবল এসেই তাদের সঙ্গে গল্পসল্প জুড়ে দিল। দেখাদেখি মালিও এসে গল্পে যোগ দিল ; বাড়ির ভিতর দিক থেকে গোয়ালা দুধ দুইয়ে গাই-বাছুর নিয়ে বেরিয়ে আসছিল, সেও ওদের সঙ্গে জুটে গেল—গাড়িবারান্দার নিচে বেশ একটা মজলিস বসে গেল।

কাজের কথা ভুলে গিয়ে পুলিস তো দিব্যি মজা করে আড্ডা দিচ্ছে, হঠাৎ তার হাতে একটা হ্যাঁচকা টান পড়ল—'কৌন্ হ্যায় রে?' বলে চমকিয়ে ফিরে দেখেই ত তার চক্ষুস্থির!

কোমরে হাত রেখে, থামে হেলান দিয়ে আরামে দাঁড়িয়ে সে গল্প করছিল, কাগজ দুখানা হাতেই ঝুলছিল। পিছন থেকে গোয়ালার গোরুটা এসে খপ করে সেটা মুখে পুরে নিয়েছে।

গেল! গেল! ধর্! ধর্!—হৈহৈ করে গোরুর মুখ থেকে সে কাগজ কাড়তে গেল ; গোরু মুখ খুলবে না—কাগজটা খেতে ভারি উপাদেয় লেগেছে তার, গাল ফুলিয়ে চপর চপর করে ঠিক যেন পান চিবোচ্ছে।

তখন গোয়ালা, পুলিস, মালি, চাপরাশি সবাই মিলে গোরুকে ঠেসে ধরল—তার শিং চেপে, রোপে, চোয়াল টিপে ধরে মেরে-পিটে জোর করে তাকে হাঁ করাল, আর সেই হাঁ-এর মধ্যে দিয়ে গোরুর লম্বা গলার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে গোয়ালা অনেক কষ্টে কাগজ দুটোকে উদ্ধার করল।

কাগজ কিন্তু ততক্ষণে আর কাগজ নেই—বিশ্রীরকম হড়হড়ে একটা মণ্ড হয়ে গিয়েছে।

সূর্যাস্তের আগেই কয়েদীকে ছাড়তে হবে, এই নিয়ম। তার আগে ছাড়পত্র চাই—ছাড়পত্র না পেলে সেদিন তাকে ছাড়া যাবে না। নির্দিষ্ট দিনে যদি কয়েদী খালাস না পায় তাহলে অনেক ঝামেলা—সরকার থেকে কৈফিয়ত তলব করা হবে—কেন হয়নি হল না। যার দোষে এরকম হল তার নামে রিপোর্ট হবে, উপযুক্ত সাজা হবে তার। আড্ডা দিতে কনেস্টবল এমনি মত্ত ছিল যে, সময়ের দিকে তার কোনও খেয়ালই ছিল না—এদিকে সূর্য প্রায় অস্ত যায়! হন্তদন্ত হয়ে সে ছুটল নতুন ছাড়পত্র আনবার জন্য—কাগজ এনে সই করিয়েই আবার হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটল যথাসময়ে জেলখানায় সেগুলি পৌঁছাবার জন্য।

নতুন কাগজ আনতে গিয়ে, পুরনো কাগজ দুটো কী করে হারাল সে বিষয়ে সে কী কৈফিয়ত দিয়েছিল তা বলতে পারি না। তবে আশা করি এতে তার একটা শিক্ষা হয়েছিল—ভবিষ্যতে আর জরুরী কাজ ফেলে সে আড্ডা দেয়নি।

১৩৬৮

www.BanglaBook.org

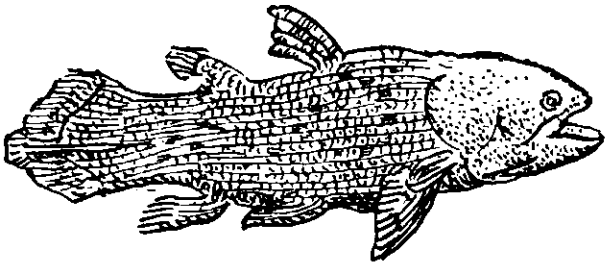

প্রথম মাছ (গ্রীলাকান্থ)

মৎস্য-পুরাণ

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

বুচকুণ্ডি এসে পরম বিজ্ঞের মত বলল, 'জান দাদু, আজ বাজারে মাছ পাওয়া যায়নি। পণ্ডা বাজারে গিয়েছিল, এই মাত্র ফিরে এসেছে। বলছে, সামান্য যেটুকু মাছ উঠেছিল তা আঠারো টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছিল। পয়সাওয়ালা লোকেরা সেই দরেই সব নিয়েছে।'

বুচকুণ্ডির বয়স চার বছর। এরই মধ্যে সংসারের ভাবনা তাকে বিচলিত করেছে দেখে বেশ মজা লাগল। তাকে প্রবোধ দিয়ে বললাম, 'মাছ না থাক মাংস আছে ত। আজ ত আর মিট্‌লেস্‌ ডে নয়। একদিন না হয় মাছ না-ই খেলি। তার চেয়ে বরঞ্চ আজ মাছের গল্প শোন্‌।'

গল্প বলতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ল আমাদের সেই হারানো দিনের কথা। বছর চল্লিশও হয়নি, গরমের ছুটিতে ফরিদপুর গেছি ছুটি কাটাতে ; ফরিদপুর শহরের প্রায় পাশ দিয়ে তখনও পদ্মা বয়ে চলেছে আর এন্তার ইলিশ মাছ! এক একটা এক সের মত (তখনও কে-জির চলন হয়নি এদেশে) ইলিশের দাম চার পয়সা কি পাঁচ পয়সা। বাজারে গিয়ে মাছের দর জিজ্ঞেস করলে এখন যেমন দোকানী বলে এত করে কিলো, ওখানে দোকানীদের দর জিজ্ঞেস করলে বলত এত করে হালি। হালি মানে একগণ্ডা বা চারটে। ইলিশের হালির দর ছিল চার আনা কি বড়জোর পাঁচ আনা, অর্থাৎ ঐ দামে চারটে এক কে-জি ইলিশ কিনে বাড়ি ফিরতাম।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—'ফিরিবে না ফিরিবে না অস্ত গেছে সে গৌরব শশী...'

বুচকুণ্ডি অধীর হয়ে বললে, 'কই, গল্প শুরু করলে না? কি বললে ওটা?'

'ও কিছু না, তুই বুঝবি না। ওকে বলে স্মৃতিচারণ। তুই হয় মাছের গল্প শোন্‌।'

ততক্ষণে গল্পের লোভে ওদের দলবল সকলেই এসে জুটেছে। সকলেই অবশ্য বুচকুণ্ডির মত ছোট্ট নয়—দশ, বারো, চৌদ্দ, ষোল বছর বয়সী শ্রোতাও আছে। তাই সকলকার বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গল্প শুরু করতে হল।

'পুকুরে, খালে, বিলে, নদীতে আমরা প্রচুর মাছ দেখতে পাই, কিন্তু মাছের আসল আস্তানা হচ্ছে সমুদ্র। সেখানে ওরা অনেক সময়েই ঝাঁক বেঁধে থাকে। এক একটা ঝাঁকে লক্ষ লক্ষ মাছ ঘুরে বেড়ায়। বিশেষ করে বছরের এক-একটা বিশেষ সময়ে ঐ ঝাঁক এত বিরাট হয়ে পড়ে যে কল্পনা করাও কঠিন। আর তখনই হচ্ছে মাছ শিকারের সময়।

'হেরিং মাছ ইয়োরোপের একটি সুস্বাদু মাছ বলে খ্যাত। এক আটলাণ্টিক সমুদ্র থেকেই প্রতি বছর বেশ কয়েক কোটি হেরিং ধরা হয়। অমনি ধারা ব্লু-ফিশ বা নীল মাছও ওদেশের একটি জনপ্রিয় মাছ। এগুলো আকারে আরও বড়—প্রায় আমাদের রুই-কাৎলার মত। ১০।১৫ কে-জি হামেশাই হয়। ঐ ব্লু-ফিশও ঐ একই অঞ্চলে পাওয়া যায় প্রতি বছর ৬।৭ কোটি কে-জি। এ ছাড়া কড্‌ মাছ—আকারে আরও বড়। এক একটা ২০।২৫ কিলোগ্রামের কম নয়। বছরে এক ইয়োরোপেই ৮ কোটি টন কড্‌ মাছ ধরা পড়েছিল।

'কিন্তু ও ত হল শুধু ইয়োরোপের হিসাব। ইয়োরোপই ত আর গোটা পৃথিবী নয়! আসল মাছের আড্ডা হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর আর মাছ ধরার ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি নাম জাপানীদের ; মাছ ধরার জন্য রকমারি আধুনিক যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম যে তারা তৈরি করে নিয়েছে তার ঠিক নেই। বিশেষ ভাবে তৈরি মাছ-ধরা নৌকো বা মাছ-ধরা জাহাজ নিয়ে তারা দূর সমুদ্রে পাড়ি দেয় আর এক-এক বারে সমুদ্র চষে লক্ষ লক্ষ টন মাছ নিয়ে আসে। পৃথিবীর নানান জায়গায় তা চালান যায়। এ ব্যাপারে অস্ট্রেলিয়ানরাও কম পোক্ত নয়। তাদের ধরা এক-একটি টিনে ভর্তি মাছ—তোমরাও হয়ত খেয়েছ। দক্ষিণ ভারতেও এই ভাবে মাছ ধরে টিনে করে দেশ-বিদেশে চালান দেওয়া হচ্ছে। এই টিনে ভরা মাছ, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'টিন্‌ড্‌ ফিশ্‌', কলকাতার বাজারেও পাওয়া যায়। আমরাও খেয়ে দেখেছি। ভালোই লাগে খেতে।'

আমার গল্প বেশ চলছিল, হঠাৎ সোমা বাধা দিয়ে বলল, 'দাদু কি শুধু মাছ খাবার গল্পই বলবে আজ?'

সোমা বায়োলজী পড়তে শিখেছে। কাজেই ওর দিকে চেয়ে গল্পের মোড় ফেরাতে হল। বুচকুণ্ডিকে বললাম, 'শুনলি ত গল্প? এবার ছাদে একটু দৌড়ে আয়। নয়না আর কঙ্কাকেও নিয়ে যা। দেখি কে বেশি দৌড়তে পারে।'

www.BanglaBook.org

অনুমতি পেয়ে ওরা তিনজনেই দৌড় লাগাল। আমি বললাম, 'বেশ, এবার তবে নতুন ভাবে শুরু করা যাক।

'মাছ হচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষ। বিজ্ঞানীরা বলেন ক্রম-বিবর্তনের ফলে মাছই একটু একটু করে বদলাতে বদলাতে শেষ পর্যন্ত মানুষে এসে ঠেকেছে। অর্থাৎ আমরা, গুণধর সন্তানেরা অবলীলাক্রমে আমাদেরই জ্ঞাতিদের ধরে ধরে খাচ্ছি। তা মানুষ ত মানুষও খায় কোন কোন জায়গায়।

'যাক্ ওসব তত্ত্বকথা। বিজ্ঞানীরা মাছকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। সবচেয়ে পুরোনো যুগের মাছকে বলা হয় 'অ্যাগ্নাথা' জাতের মাছ। অ্যাগ্নাথা বলতে বোঝায় যাদের চোয়াল নেই। সত্যি এই জাতের মাছের মুখে চোয়াল বলে কিছু ছিল না, তার বদলে মুখের মধ্যে ছিল শুধু একটা গর্ত। তাই ওদের দেখলে ঠিক মাছ বলে চেনাই যাবে না। অবশ্য ওদের বংশধরদের মধ্যে খুব অল্পই এখন টিকে আছে, বেশির ভাগই লোপ পেয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। তা পাবে না? ওরা যে এসেছিল প্রায় চল্লিশ কোটি বছর আগে! সাধারণ মাছের মত এদের গায়ে আঁশও নেই, এমন কি কোন খোলাও নেই। তবে সেকেলে অ্যাগ্নাথাদের যে সব ফসিল পাওয়া গেছে তাতে এই খোলা বা বর্ম-আঁটা অ্যাগ্নাথাও পাওয়া গেছে।

'দ্বিতীয় জাতের মাছকে বলা হয় 'প্ল্যাকোডার্মি'। অর্থাৎ যাদের চামড়া পাতের মত। কতগুলো পাত বা প্লেট জুড়ে জুড়ে যেন এদের শরীরটা তৈরি, তাই এই নাম। অবশ্য এ জাতের মাছ আর এখন পৃথিবীতে নেই। ফসিল দেখেই কেবল এদের অস্তিত্ব জানা গেছে। পণ্ডিতদের অনুমান, এ জাতের মাছ অন্ততঃ কুড়ি কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে।

'তৃতীয় জাতের মাছ দেখা দিয়েছিল প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে, কিন্তু এখনও এদের বংশ লোপ পায়নি। এদের বলা যায় কোমল হাড়ের মাছ। বৈজ্ঞানিক নাম 'কন্ড্রিকথিস্'। ও কথাটারও মানে নরম হাড়।

'নরম হাড় আবার কি জিনিস এ প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক, কারণ হাড়কে ত আমরা বেশ শক্ত বলেই জানি! কিন্তু কানের হাড়, নাকের হাড় এগুলোও ত হাড়, আর এদেরকেই বলা হয় নরম হাড়, সাধুভাষায় কোমলাস্থি। ইংরেজিতে বলে কার্টিলেজ। নরম হাড় দিয়ে শরীর গড়া বলে এদের কিন্তু তুচ্ছ করো না। সমুদ্রের হিংস্রতম জন্তু হাঙ্গর—যাকে বলা হয় সমুদ্রের শয়তান—এই জাতের মাছ।

'বাকি রইল আর একটি। সচরাচর যে সব মাছ আমরা দেখি এবং খাইও—সেগুলিই এই জাতের মাছ—যাদের বৈজ্ঞানিক নাম 'অস্টিকথিস্'। অস্টিকথিস্ বলতে হাড়ওয়ালা মাছ বলা যায়। গ্রীক্ অস্টিওম কথাটার মানে হচ্ছে হাড়, আর তাই থেকেই এসেছে অস্টিকথিস্ শব্দটাও।'

'মাছের বংশ পরিচয় ত শুনলাম, কিন্তু ওর মধ্যে মজা কই? মাছ সম্বন্ধে মজার মজার খবর দাও তবেই না শুনতে ভালো লাগবে।'—টাফি আমার বক্তৃতায় বাধা দিয়ে বলে উঠল।

'বেশ তাই বলি। বল্ ত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ছোট মাছ কোন্‌টা আর সবচেয়ে বড় মাছই বা কোন্‌টা?'

নাতি-নাতনীর দল এবার ভাবতে বসে গেল, কিন্তু সঠিক জবাব দিতে পারল না কেউই। অগত্যা আমিই আবার বলে চললাম।

'সবচেয়ে ছোট মাছকে বলা হয় পান্ডাকা। পরিণত বয়সেও এরা এক একটা লম্বায় আধ ইঞ্চির বেশি হয় না। তবে পৃথিবীর সর্বত্র এদের দেখা যায় না, আমাদের দেশেও না। দেখা যায় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে। আর সবচেয়ে বড় মাছ? না, অস্টিকথিস্‌দের কেউ নয়, সবচেয়ে বড় মাছ দেখা যায় কন্ড্রিকথিস্‌দের মধ্যে। এক জাতের হাঙ্গর—যাদের নাম দেওয়া হয়েছে হোয়েল-শার্ক বা তিমি-হাঙ্গর। তিমির মত বিরাট বলেই ঐ নাম। এক একটা তিমি-হাঙ্গর লম্বায় ষাট ফুট পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। তিনি অবশ্য আরও বড় হতে পারে, কিন্তু তিমি যে মাছ নয়—স্তন্যপায়ী জীব একথা নিশ্চয়ই জানিস। কাজেই তিমি মাছ সবচেয়ে বড় মাছ একথা বললে নিশ্চয়ই ভুল বলা হবে। তেমনি চিংড়িও মাছ নয়। আমরা চিংড়িমাছ বললেও ওকে কোনকালেই মাছের মধ্যে ফেলা যায় না। ওরা আরও নীচুস্তরের প্রাণী। কাজেই কাদা-চিংড়িকে সবচেয়ে ছোট মাছ বললেও ভুলই বলা হবে।

'সবচেয়ে ছোট না হলেও প্রশান্ত মহাসাগরের জলে আর এক রাশ মাছ দেখতে পাওয়া যায় যার মত হাল্কা মাছ দুনিয়ায় আর নেই। হাল্কা বলে হাল্কা?—সোলার চেয়েও হাল্কা! একবার এক বিজ্ঞানী এক কে-জি এই ধরনের মাছ তুলে গুণে দেখতে গিয়েছিলেন কটা মাছ হল। সওয়া লক্ষ পর্যন্ত গুণে তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, কারণ তখনও সব মাছ গুণে শেষ করা সম্ভব হয়নি। এই মাছের নাম সিন্ডলেরিয়া।

'সমুদ্রের অতল তলে নিবিড় অন্ধকার। এক ফোঁটা সূর্যের আলো সেখানে ঢুকতে পায় না। অথচ কোন কোন জাতের মাছ সে রাজ্যেও বাস করে। কি করে তারা অন্ধকারে পথ চেনে? কি করেই বা শিকার ধরে? প্রকৃতিই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এদের শরীরের দু পাশে ঠিক বোতামের মত কতকগুলো জিনিস বসানো থাকে। ঠিক টর্চের বাল্‌ব আর কি! জোনাকি পোকার মতই সেগুলো থেকে থেকে জ্বলে ওঠে আর সেই আলোয় ওরা দিব্যি আশপাশ দেখে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে, শিকার ধরতেও

BanglaBook.org

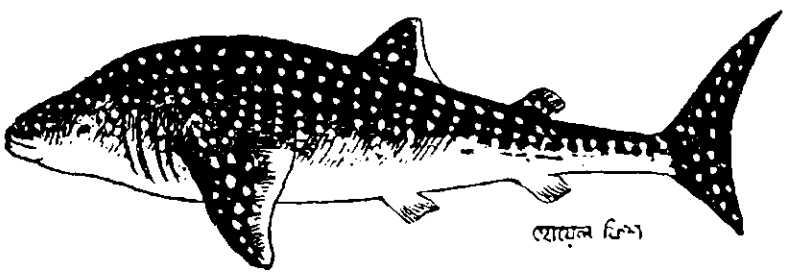

হোয়েল শার্ক

www.BanglaBook.org

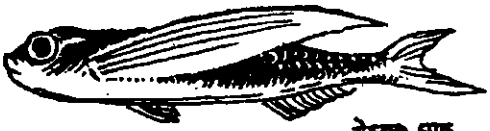

উড়ুক্কু মাছ

পারে। এই জাতীয় কোন কোন মাছের আবার দু'পাশে টর্চ না থেকে থাকে মাথার ঠিক ওপরে একটি, ঠিক রেল-ইঞ্জিনের সার্চ লাইটের মত। সেই সার্চ লাইট জ্বালিয়ে ওরা যখন অতল সাগরের নীচে ছুটে বেড়ায় তখন সে আলোয় ছোটখাট প্রাণীদের চোখ ধাঁধিয়ে যায় নিশ্চয়ই। আলো নিয়ে ঘোরে বলে এই দু'-জাতের মাছকেই ল্যান্টার্ন ফিশ বা লণ্ঠন মাছ বলা হয়। কি ভাবে ঐ আলো জ্বলে ওঠে তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেছেন। ওদের ভাষায় ব্যাপারটার নাম 'বায়োলিউ-মিনিসেন্স'। আমরা সাদামাঠা বাংলায় ওর নাম দিয়েছি জীবন্ত আলো।

'মজার মজার মাছ আরও অনেক আছে। কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ ফর্দ দিতে গেলে সে এক মহাভারত হয়ে দাঁড়াবে। যেমন ধর, চারচোখো মাছ—যাদের চারটে করে চোখ, দু'টি থাকে জলের ওপরে, দু'টি জলের নীচে। যখন জলের ঠিক মাথায় উঠে সাঁতরাতে থাকে তখন কী সুবিধে ভাব দেখি! আবার মহাদেবের মত ত্রিনয়ন মাছও আছে। যার তিনটে চোখ। দুটো দু'পাশে, একটা কপালে। চার চোখ হল, তিন চোখ হল, একচোখো মাছও কি নেই? আছে বই কি! ঠিক নাকের ডগায় একটি মাত্র চোখ এমন মাছও দেখা গেছে। আবার এমন মাছও আছে যার একটি মাত্র চোখ, কিন্তু মাথার একপাশে। এই জাতের মাছ প্রায় সর্বদাই কাদায় কাত হয়ে পড়ে থাকে, তাই একদিকের চোখের কোন দরকারই হয় না।

'আলোর সাহায্যে শিকার করা শিকারী মাছ যেমন আছে তেমনি বিদ্যুতের শক্ দিয়ে শত্রুকে অসাড় করে শিকার করে এমন মাছও আছে সমুদ্রে। ইলেক্‌ট্রিক ঈল বা বৈদ্যুতিক বান মাছ, ক্যাটফিশ বা বেড়াল মাছ এই জাতের মাছ। শিকারীরা এদের নিয়েও গবেষণা করেছেন এবং কি করে এদের শরীরে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় সে রহস্যও বার করেছেন। কোন কোন বৈদ্যুতিক ঈল ৫০০ ভোল্টেরও বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারে। আমরা দেখেছি ৪০০ ভোল্ট বিদ্যুৎ যেখানে ব্যবহার করা হয় সেখানেই লেখা থাকে ডেঞ্জার। সময় সময় তার সঙ্গে একটা মড়ার মাথার খুলি আর এক জোড়া ক্রস্ করা মানুষের হাড়ের ছবিও লটকানো থাকে, তার মানে, সাবধান না হলে তোমারও এই দশা হবে। সুতরাং এই ৫০০ ভোল্টের বিদ্যুতের শক্ খেলে যে বড় বড় জানোয়ারও ঘায়েল হয়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

'উড়ুক্কু মাছ অর্থাৎ যে মাছ উড়তে পারে, তার কথা আমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। এদের দু'পাশে থাকে ডানা। সেই ডানার সাহায্যে ঠিক পাখীর মত উড়তে না পারলেও দশ-বিশ ফুট পথ উড়ে যাওয়া কিছু কষ্টকর নয়। শুনেছি রেড্ সি-তে জাহাজ চলবার সময় কখনও কখনও উড়ুক্কু মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে এসে জাহাজের ডেকে আছড়ে পড়ে। ইংরেজিতে এদের নাম ফ্লাইং ফিশ্।

'মাছ গাছে উঠছে, বঁড়শি (নিজেদের নাকের ডগায় বসানো) গেঁথে অন্য মাছ শিকার করছে, জলের তলে জলজ শ্যাওলা দিয়ে পাখীর বাসার মত বাসা বেঁধে সেখানে ডিম পাড়ছে—এ রকম কত আজব কাণ্ডই না দেখা যায়! আবার ঝগড়াটে গোঁয়ার গোবিন্দ মাছেরও অভাব নেই—যারা নিজেদের চাইতে অনেক বড় জন্তুকেও আক্রমণ করতে পিছপা হয় না। সোর্ড ফিশ্ বা তলোয়ার মাছ এই রকম বদরাগী মাছ। এদের মুখের ওপরের ঠোঁটটা ৭।৮ ফুট লম্বা, আর দেখতে ঠিক তলোয়ারের মত। যেমনি ধারাল, তেমনি ছুঁচলো। ঐ ধারাল অস্ত্র নিয়ে ওরা যখন-তখন যাকে-তাকে আক্রমণ করে বসে। তিমি, হাঙ্গর, অক্টোপাস কাউকে বাদ দেয় না। এমন কি সমুদ্রগামী জাহাজের তলায়ও ঢুঁ মারতে দেখা গেছে ওদের। কলকাতার যাদুঘরে এই রকম তলোয়ার মাছের গুঁতো খাওয়া জাহাজের খোলের খানিকটা অংশ সংরক্ষিত আছে। যখন মিউজিয়ামে যাবে, ওটা খুঁজে নিয়ে দেখে নিও। অবাক্ হয়ে যাবে ওদের কাণ্ড দেখে।

'তবে মাছের দুর্দান্তপনার কাহিনী বলতে গেলে হাঙ্গরদের কথাই বলতে হয়। ওরকম অতিকায় হিংস্র মাছ বোধ হয় আর নেই। তাই বলে সব হাঙ্গরই হিংস্র ভাবিস না। প্রাণি-বিজ্ঞানীরা বলেন পৃথিবীতে এখনও প্রায় আড়াইশ' জাতের হাঙ্গর আছে। এদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি নিরীহ প্রকৃতির, অর্থাৎ ছোট ছোট মাছ মেরেই তারা খুশি। সে ত সব জানোয়ারই করে। ওকে হিংস্র বলা যায় না। হিংস্র বলব তাদের যারা তিমির সংগে লড়াই করে, অক্টোপাসের সঙ্গে লড়াই করে, আর মানুষ পেলে ত কথাই নেই। মানুষ ওদের প্রিয় খাদ্য। বাগে পেলে আর রক্ষা নেই। এ পর্যন্ত কত ডুবুরি যে হাঙ্গরের আক্রমণে প্রাণ দিয়েছে তার হিসাব নেই। সবচেয়ে দুর্দান্ত হচ্ছে সাদা হাঙ্গর। টাইগার শার্ক (শার্ক মানে হাঙ্গর) বা ডোরা-কাটা বাঘা হাঙ্গরও কম দুর্দান্ত নয়। আর এক রকম হাঙ্গর হচ্ছে শেয়াল-হাঙ্গর, যাদের আর এক নাম থ্রেশার শার্ক। থ্রেশ্ মানে ঝাপ্‌টা মারা। এই জাতের হাঙ্গরের শরীরের অর্ধেকটাই লেজ আর সেই লেজ দিয়ে এরা এত জোরে ঝাপ্‌টা মারতে পারে যে সেই ঝাপ্‌টায় সমুদ্র তোলপাড় হয়ে ওঠে। আশপাশের প্রাণীরা সেই ঝাপ্‌টা সামলাতে না পেরে ওদের মুখের কাছে এসে পড়ে। তারপর? তারপর কি হয় সে ত বুঝতেই পারছিস।'

১৩৮২

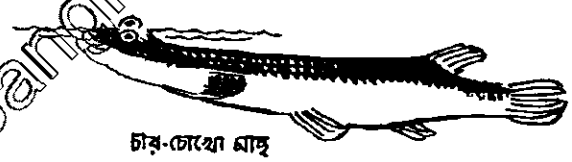

চার-চোখো মাছ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চন্দ্রাবতী

প্রবাসজীবন চৌধুরী

॥ ১ ॥

বারো শতাব্দীর কাহিনী।

রাজপুতানায় আলওয়ারের কাছে একটি বেশ বর্ধিষ্ণু পাহাড়ী গ্রামে থাকত এক বাজিকর আর তার স্ত্রী। ওদের ছেলেমেয়ে ছিল না। ওরা ছোট ছেলেমেয়েদের নানা রকম খেলা দেখিয়ে পয়সা রোজগার করত। ওদের দুটি বাঁদর আর একটি ভাল্লুক ছিল: এদের নিয়ে নানারকম খেলা ওরা দেখাত রাস্তায় রাস্তায়, আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকরকম পুতুলের খেলা আর গল্পসল্পও করত। ওদের দেখলেই চারদিক থেকে ছোট ছেলে-মেয়ের দল ছুটে আসত, আর মহা আনন্দ-উৎসাহে কলরব করতে করতে ওদের ঘিরে দাঁড়াত।

খেলা দেখানো শেষ হলে ওদের ছোট বাঁদরটি একটি বাটি হাতে ছেলেমেয়েদের মাঝে ঘুরত, আর যারা পয়সা দিত তাদের সেলাম করত। বাজিকর আর তার স্ত্রীকে সকলেই চিনত। ওরা আবার মাঝে মাঝে নানারকম আজগুবি পোষাক পরে বেরিয়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে চমক আর হুল্লোড় লাগিয়ে দিত। সকলেই ওদের খুব ভালোবাসত, কেবল পাঠশালার মাস্টারমশাইরা ওদের তেমন সুনজরে দেখতেন না—কারণ ওদের দেখলেই পাঠশালার ছেলেরা বাইরে যাবার জন্য হৈ চৈ শুরু করে দিত। অবশ্য বাজিকরও খুব কদাচিৎ পাঠশালার পড়ার সময় রাস্তা পার হত, কেননা সেও চাইত যে ছেলেদের পড়ার ব্যাঘাত না হয়।

এখন আলওয়ারে এল ঘোর বিপদ। শুরু হল পাঠানের আক্রমণ। দেখতে দেখতে দিগন্ত ছেয়ে তারা এগিয়ে এল। রাজপুত সৈন্যরা হারতে লাগল প্রত্যেক লড়াইয়ে। বীরেরা দলে দলে প্রাণ দিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। খবর শুনে মেয়েরাও দলে দলে জহর-ব্রত করে আগুনে ঝাঁপ দিতে লাগলেন।

এই পাহাড়ী গ্রামটিতেও এইসব খবর এসে পৌঁছল। অনেকেই পালিয়ে গেল পাহাড়ের আরও দুর্গম স্থলে—যেখানে ঘনঘোর অরণ্য আর বাঘ-ভাল্লুকের ভয়। কি দুঃসহ ক্লেশ আর ত্রাসের করাল ছায়াই এসে পড়ল ওদের উপর! তবু অনেকেই পারল না পালাতে। কোথায় পালাবে? ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, বউ আর বুড়ো-বুড়ীদের নিয়ে কত দূর বা যাবে! কি খাবে? বহু লোকই গ্রামে রয়ে গেল—নিয়ত ডাকতে লাগল ভগবানকে। জানে যদি পাঠানেরা আসে তাদের আর নিস্তার নেই। আরও জানে—ধ্বংসের শেষ মুহূর্তে ওরা মেয়েদের আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে, আর নিজেরা যুদ্ধ করতে করতে মরবে। শুধু শিশুদের আর অক্ষম বৃদ্ধদের নিয়েই ভাবনা। চাপা কান্নার ব্যথায় সারা গ্রামটি গুমরাতে লাগল।

॥ ২ ॥

বাজিকর তার স্ত্রীকে বললে, 'আমাদের আর ভাবনা কি হে—কাচ্ছাবাচ্ছা, লটবহর কিছুই নেই। আমাদের এ সামান্য মাল-পত্র আর খেলার সরঞ্জাম জানোয়ারগুলোই নিয়ে যেতে পারবে।

বাজিকরের স্ত্রী চন্দ্রাবতী বললে, 'তা ত বটেই।'

চন্দ্রাবতী মুখে বলল বটে, আসলে কিন্তু চিন্তার ভারে তার নাওয়া-খাওয়া ঘুচে গেছে। মনে এতটুকু স্বস্তি পায় না—ভাবনার নেই অন্ত।

বাজিকর পরদিনই ভোরে বেরিয়ে পড়বে স্থির করে ফেলল। ওরা যাবে দক্ষিণের দিকে।

গভীর রাতে চন্দ্রাবতী স্বামীকে জাগিয়ে বললে, 'ওগো একটা কথা শোনো। আমি ভাবছি—আমাদের সেই ছোট ছোট শিশু-মুখগুলোকে এখানে দুশমনদের হাতে ফেলে যাই কি করে?...কোন ব্যবস্থা করা যায় না?'

'সে কি করে হবে বল চন্দ্রা?' বিস্মিত স্বরে জবাব দেয় বাজিকর।

'ওরাই এতদিন আমাদের খাওয়াল', বলতে লাগল চন্দ্রা-বতী—'কত যে ভালোবাসে আমাদের—আর আজ কিনা ওদের বিপদের মুখে ফেলে রেখে আমরা পালিয়ে যাব?'

রুদ্ধ কান্নার স্রোত চন্দ্রাবতীর কথার সঙ্গে ঝরতে থাকে। একটু থেমে চন্দ্রাবতী আবার ধীরে ধীরে বলে, 'শোন গো, এক কাজ করা যায় না? সকলের বাড়ি বাড়ি সকালে গিয়ে বলে আসি—যারা তাদের ছেলেমেয়ে আমাদের সঙ্গে দিতে চায়—আমরা সঙ্গে নেবো। সঙ্গে বেশি করে আটা, চাল আর চিনি নিয়ে আমরা যদি ওপরের ভৈরব-মন্দিরে চলে যাই—তা'লে কেমন হয়? ছেলেমেয়েরা আমাদের কাছে বেশ ভুলে থাকবে। আর সঙ্গে আরও ক'জন ঝি-চাকর নিতে হবে ওদের কাজকর্ম করার জন্য। দুশমনরা চলে গেলে আমরা আবার ওদের নিয়ে গ্রামে ফিরে আসব।'

বাজিকরকে হাসিমুখে উঠে বসতে দেখে চন্দ্রাবতীর মুখেও হাসি ফুটে উঠল। অনেক পরামর্শ করে ওরা দু'জনে এই উপায়টাই স্থির করে ফেলল।

www.BanglaBook.org

॥ ৩ ॥

ভোরেই ওরা গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি ঘুরে ওদের প্রস্তাব জানালে। গ্রামের বুড়োরাও অনেক ভেবে প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন। সেই আসন্ন বিভীষিকার ভয়-ভাবনায় কাতর বেশির ভাগ বাপ-মাই অশ্রু গোপন করে, পরের দিন ভোরে ছেলেমেয়েদের ওদের কাছে এনে দিল। শিশুগুলো এই বিচ্ছেদের দুঃখের তীব্রতা বিশেষ অনুভব করল না—বহুদিন পর বাজিকর ও তার দলবলের মধ্যে এসে তারা আনন্দে কলরব করতে করতে পথ চলতে লাগল। চন্দ্রাবতী ওদের মধ্যে কখনও কারুর হাত ধরে, কখনও কারুকে কোলে নিয়ে নানারকম নাচ-গান করতে করতে এগোতে লাগল। বাপ-মার অশ্রুতে ঝাপ্‌সা দৃষ্টিপথ হতে আস্তে আস্তে প্রায় আশি-নব্বইটি শিশুর অবোধ আনন্দের করুণ শোভাযাত্রা ক্রমেই ওপর দিকের পাহাড়ে পথের বাঁকে মিলিয়ে আসতে লাগল। এই শোভাযাত্রার পিছনে করুণ মুখে চলছিল আট-দশটি ক্লান্ত বৃদ্ধ ঝি-চাকর-বামুন। তাদের মাথায় বস্তা বস্তা আটা, চাল, চিনি, শাক-সবজি আর অন্যান্য খাবার জিনিস। প্রতি গৃহস্থই দিয়েছে তাদের সঞ্চয় ছেলেমেয়েদের জন্য। কত মা লুটিয়ে পড়লেন ধুলায় বাছার মুখে শেষ চুমো দিয়ে, কত বাবা বুকের মাণিককে সেই শোভা-যাত্রার সারে গেঁথে দিয়ে দু'হাতে বুক চেপে হাহাকার গোপন করলেন আর বৃদ্ধ দাদু-দিদিমারা দু'চোখ কাপড়ে মুছতে মুছতে ভগবান ভৈরবের কাছে নাতি-নাতনীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানাতে লাগলেন।

আড়াই দিনের পথশ্রান্ত শিশুর দল অবশেষে পাহাড়ী পথের অগুন্তি আঁকাবাঁকা পেরিয়ে পেরিয়ে ঘুরে ঘুরে এসে পৌঁছল ভৈরব-মন্দিরের পাদমূলে। বৃদ্ধ পূজারী আগেই খবর পেয়েছিলেন। মন্দির-সংলগ্ন বিরাট দালানটি দিলেন শিশু অতিথিদের জন্য ; বেলা পড়ে এসেছে দেখে দু'জন বৃদ্ধ বামুন রান্না চড়িয়ে দিল। পূজারী মন্দির-পরিচালককে দিয়ে আগেই মন্দির চত্বরের ওপাশে ছোট ছাউনী বেঁধে দুটি বড় বড় উনুন করিয়ে রেখেছিলেন। পাহাড়-চূড়ার ঘন অরণ্যে গোপন এই মন্দিরতলে নিভৃত পবিত্র পরিবেশে এসে শিশুর দল যেন সব ক্লান্তি ভুলে গেছে। ওদের যেন সীমাহীন ছুটির আনন্দে পেয়ে বসেছে। পাঠশালা নেই, বাড়ির শাসন নেই—এবার বাজিকরের খেলা যত খুশি দেখবে।

রান্না শেষ হওয়া পর্যন্ত ওদের জাগিয়ে রাখার জন্য চন্দ্রাবতী নিজের শ্রান্তি ভুলে তাড়াতাড়ি খেলার সরঞ্জাম খুলে ফেলল। তারপর শুরু হল নানারকম পোষাক পরে শিশুদের মন ভোলানোর পালা! কখনও বাঘের সাজ, কখনও ভাল্লুকের সাজ, আবার কখনও বা পাগড়ী পরে গোঁফ লাগিয়ে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে যোদ্ধার সাজ—এইসব সাজছে। কখনও আবার খুব সুন্দর ঝলমলে রাজকুমারীর বেশে সেজে ওদের গল্প বলছে। চন্দ্রাবতীকে কি সুন্দরই না দেখায় তখন। ছেলেমেয়েরাও ওর কাছটিতে ঘেঁষে এসে ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। ও হয়ত ঠাট্টা করে কোনও ছোট ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে বলে, 'এ কি খোকন! তুই অমন করে আমার পানে চেয়ে কি দেখছিস? আমায় বিয়ে করবি? বিয়ে করবি ত ঘোড়া কোথায়—তলোয়ার কোথায়, আর তোর গোঁফজোড়াটাই বা কোনখানে?' ছেলেটি লজ্জায় চন্দ্রাবতীর বুকে মুখ লুকোয় আর শিশুর দল হুল্লোড় করে হেসে ওঠে। এই আড়াই দিনের পথ-চলার সময়ে চন্দ্রাবতীর স্নেহ-মায়া ওদের মনে আরও গভীর জাল ফেলেছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে বেশ রাত হয়ে গেল। চন্দ্রাবতী চাকরদের সাহায্যে শিশুদের জন্য সাজানো-গোছানো সারি সারি শোবার জায়গা করে ফেলেছে। চন্দ্রাবতীর দুটি হাতে যেন দশভুজার আশীর্বাদ মূর্ত হয়ে উঠেছে। নক্ষত্রের মত চারিদিকে ঘুমেভরা শিশুমুখের রাশির মাঝে চাঁদের মতই বসে চন্দ্রাবতী কত বীর রাজপুত্রের কাহিনী বলে ওদের ঘুম পাড়ায়। জ্যোৎস্না-প্লাবিত অন্তহীন আকাশে হেলান দিয়ে ঘন অরণ্যে ঘেরা সুপ্রাচীন ভৈরব মন্দিরের মুকুটপরা গিরিশিখরও স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগল তার চোখে দেখা সেইসব কাহিনী।

অনিশ্চিত বিভীষিকার ত্রাসের মধ্যে গ্রামের দিনগুলো কাটতে লাগল অতি ধীরে। পুরুষদের অস্ত্রগুলো রোজই আরও ঝকমকে আর মেয়েদের জহরব্রতের আয়োজন নিখুঁত হতে লাগল। এর মধ্যে ভৈরব মন্দির হতে দু'বার চন্দ্রাবতী শিশুদের কুশলবার্তা পাঠিয়েছে তাদের বাপ-মার কাছে ; আর শিশুদের জন্য ভাল বিছানা, খাবার আর নানা রকম পোষাক আনিয়ে নিয়েছে। গ্রামের বড়লোকেরা তাঁদের সব কিছুই শিশুদের জন্য লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আহা! এই দারুণ বিপদে যদি শিশুগুলোও রক্ষা পায়—এই ত্রাস আর ক্লেশের যেন কিছুই না পায় তারা!

প্রতিদিন রাতে শিশুরা ঘুমিয়ে পড়লে চন্দ্রাবতী ঝি-চাকরের সাহায্যে নানা রকম পর্দা দিয়ে দালানটি এক একদিন এক এক রকম ভাবে সাজাত। বাঘ, ভাল্লুক, ময়ূর আর অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের নানা রকম ছবি দিয়ে আগেই ভালো করে সাজিয়ে ফেলেছিল চারদিক। এক একদিন বনের নানা রঙের ফুল আর মালায় দালানটি সাজিয়ে রেখে, ভোরে ঘুমভাঙা শিশুদের মধ্যে উৎসব জাগিয়ে দিত।

॥ ৪ ॥

সেদিন গ্রাম থেকে চাকরটি জিনিস আনার সঙ্গে খবর আনল শত্রুরা গ্রামের সীমানায় এসে পড়েছে ; দুই-এক দিনের মধ্যেই সব ছাই হয়ে যাবে গ্রামের। তারপর ভৈরব মন্দিরের আশ্রিতদের অদৃষ্টে কি আছে কে জানে!

খবর শুনে খানিক স্তব্ধ হয়ে থেকে চন্দ্রাবতী চলে গেল বনপথ দিয়ে। স্তূপাকার ফুলে বাজরা ভর্তি করে মাথায় করে নিয়ে ফিরে এল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

শিশুরা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে চন্দ্রাবতী দুই-তিনটি ঝি-চাকরের সাহায্যে সমস্ত দালানটি ফুলের সাজে অপরূপ ভাবে সাজাল। সব সাজানো-গোছানোর কাজ শেষ হলে চন্দ্রাবতী দেবমন্দিরের বৃদ্ধ দ্বারের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বললে, 'দয়াময় ভৈরোঠাকুর, এই শিশু-গুলোকে রক্ষা কর। ওরা ত কোন দোষই করেনি জীবনে। ওদের কেন কষ্ট দেবে? তোমার কোপ যেন সব পড়ে একা আমার ওপর। আমায় মেরো তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে, কিন্তু ওদের যেন রক্ষা হয় ঠাকুর।'

চোখের জলে চন্দ্রাবতীর কাজল ধুয়ে যায়। খানিক পরে

www.BanglaBook.org

চন্দ্রাবতী ফিরে এসে শিশুদের শিয়রে বসে গালে হাত দিয়ে কি ভাবে! হঠাৎ আয়না আর কাজল-লতা বার করে টেনে টেনে কাজল পরে। বৃদ্ধা ঝি শুয়ে শুয়ে চেয়ে থাকে আর বলে, 'চন্দ্রা, তুই যে এত সুন্দরী তা আগে কখনও বুঝতে পারিনি। রাত দুপুরে কার জন্য সাজছিস এত? কিছু খেলিও না রাতে। না খেলে চলবে কি করে? বাচ্চাগুলো তোর মুখ চেয়েই আছে—তোর মুখ শুকনো দেখলে ওদের মুখও শুকিয়ে যাবে যে!'

'আমার মুখ কখনই শুকনো দেখাবে না রে', হেসে বলে চন্দ্রাবতী; 'আমি যাদু জানি যে। এই সাজপোষাক সব ঠিক করে রাখছি, ভোরে উঠেই যে ওদের নতুন খেলা দেখাতে হবে।'

সত্যিই চন্দ্রাবতী নেচে হেসে গুনগুন করে গান গেয়ে সব সাজাতে গোছাতে লাগল। বাজিকর মন্দিরের চাতালের এক কোণে হেলান দিয়ে শুয়ে তামাক খাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে চন্দ্রার দিকে চেয়ে দেখছিল। চন্দ্রাবতী ছুটে তার কাছে গিয়ে বললে, 'মনে রেখো গো—তুমি কাল ভোরে উঠেই ভাল্লুকের সাজটা পরে নেবে, আর আমি ফুলের সাজ, ফুলের মুকুট পরে ফুলরাণী সাজব। তুমি নেচো আর আমি গাইব...'

'চন্দ্রা—আমি আর পারছি না'—বাধা দিয়ে বাজিকর বলে, 'ভাবছি ওদের শেষ পরিণতি কি, আর তোরই বা কি?'

"যাও, তোমার অত ভাবতে হবে না—' তেড়ে উঠে চন্দ্রাবতী বলে, 'মনে করে সকালে ভাল্লুকের সাজটা পোরো। যা ভাবার ভাববেন ভৈ'রো দেবতা। তুমি আমি কে? একদিন তো মরতে হবেই। যতদিন আছি, হেসেখেলে কচিমুখে হাসি ফুটিয়ে দিই।'

ভোরের অরুণ-আলোর আভাস পূর্ব আকাশে ফুটতে না ফুটতেই পাহাড়চূড়ায় ভৈরব মন্দিরের অঙ্গনে শিশুদের অফুরন্ত আনন্দের কাকলি জেগে উঠল। ছেলেমেয়েদের খাইয়ে-দাইয়ে ভালো ভালো পোষাক পরিয়ে চন্দ্রাবতী মন্দিরের চাতালে বসিয়ে দিল। তারপর শুরু হয় খেলা। বাজিকর সাজে ভাল্লুক আর চন্দ্রা ফুলরাণী। চন্দ্রাবতী একটার পর একটা গান গেয়ে ভাল্লুককে নাচায়। কখনও একতারা, কখনও খঞ্জনী, আবার কখনও ঢোলক বাজায়। কি সব মজার মজার গান! শিশু দর্শকদের কচি কচি মুখে হাসি ফুরায় না। কলরবের সঙ্গে পড়তে থাকে কচি হাতের তালি।

চন্দ্রাবতী ভাল্লুকের হাত ধরে টেনে এনে একটি টুলে বসায়, তারপর বলে, 'তোমার নাম কি?'

'ভোঁমা সিং।'

'কি খাও?'

'মধু আর চামচিকে।'

'সর্দি হলে কি করো?'

'দুষ্টু ছেলের একটা কান ছেঁড়ে ভেজে মধু দিয়ে খাই।'

'এখন দেখছি তোমার সর্দি হয়েছে—না ভাল্লুক?'

'হ্যাঁ, বড্ড সর্দি হয়েছে।' বলে ভাল্লুক বার কতক নানা ভংগি করে হাঁচে আর শিশুর দলে হুল্লোড় পড়ে যায়।

'বেশ! তাহলে তোমার ওষুধ খুঁজে নাও—কেমন?'

ভাল্লুক আস্তে আস্তে এগোয় আর ছেলেমেয়েদের মুখের কাছে মুখ এনে শোঁকে। ছেলেমেয়েরা পালায় আর ভাল্লুকও তাদের পিছু ধাওয়া করে। খুব একটা হৈ চৈ হাসির ধুম পড়ে যায়। শেষে একটা কানের মত জিনিস নিয়ে ভাল্লুক চন্দ্রার কাছে এসে দাঁড়ায়। অমনি ছেলেমেয়েরা যে যার জায়গায় চুপ করে বসে। ভাল্লুক কানটা উঁচু করে ধরে আর চন্দ্রা বলে, 'এইটা হল একটা দুষ্টু ছেলের কান! ভোঁমা সিং! এই কানটা কি বলছে—কান পেতে শুনে ঠিক ঠিক বলে যাও।'

চন্দ্রা কানকে প্রশ্ন করে, 'কি করতে তুমি?'

'পড়া করতুম না।'

'আর কি করতে?'

'মার কথা শুনতুম না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আর কি করতে?'

'পাখীর বাসায় ঢিল ছুঁড়তুম।'

'আর কি করতে?'

'দুপুরবেলায় ঘুমুতুম না।'

'আচ্ছা বেশ! এসব আর করবে?'

'কখনোই না।'

সংগে সংগে ছেলেমেয়েরাও বলে ওঠে, 'কখনোই না।'

তখন চন্দ্রা বা ফুলরাণী ভাল্লুক ভোঁমা সিংকে বলে, 'আচ্ছা ভোঁমা সিং, তুমি কানকে ছেড়ে দাও—আমি এক্ষুনি যাদুমন্তরে তোমার সর্দি সারিয়ে দিচ্ছি।' বলে ভাল্লুকের নাক ধরে ওপর দিকে একবার আর নিচের দিকে একবার টেনে ছেড়ে দিল।

ভোঁমা সিংও সেলাম করে বললে, 'হ্যাঁ ফুলরাণী, আমার সর্দি একেবারে সেরে গেছে।'

'বেশ। এবার তা'হলে কানটা দুষ্টু ছেলের কাটা জায়গায় গিয়ে জোড়া লেগে যাক।' বলেই ফুলরাণী কানটায় মন্তর পড়ে দিতেই সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল!

তখন ছেলের দলে দারুণ হুড়োহুড়ি আর হাসি! এ ওর কান টেনে বলে—'এই যে সেই কানটা।'

এমনি করে খেলার পর খেলা! নাচ, গান, গল্প দিয়ে চন্দ্রাবতী ওদের ভুলিয়ে রাখে—সারাক্ষণ শিশুর দল যেন মেতে থাকে। ক্রমে বেলা বাড়ে। রৌদ্র খর হয়। চন্দ্রা বলে, 'এবার নাওয়া-খাওয়া করবে চল তোমরা।'

'না না না। আর একটা—আর মাত্র একটা!' শিশুদের সমস্বরে কাকুতি ধ্বনিত হতে থাকে।

অগত্যা আর একটা নতুন খেলার জন্য চন্দ্রা তৈরী হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্দ্রা এবার সেজে এল এক অপরূপ সুন্দরী রাজকুমারীর বেশে। রাজকুমারী রূপবতী বনে ফুল তুলতে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছে—ঘন গহন বনে দুঃখের গান গেয়ে সে পথ খুঁজছে। হঠাৎ পাহাড়ের গুহা থেকে বার হয়ে এল এক বিরাট ভাল্লুক। রাজকুমারী ভয়ে শিউরে উঠতেই ভাল্লুক বললে, 'রাজকুমারী রূপবতী! ভয় পেয়ো না। যদি আমায় বিয়ে করো তো তোমাকে কিছু বলব না। আদর করে নিয়ে যাবো গুহায় আর টাটকা সোনার বরণ মধু দেবো খেতে।'

রাজকুমারী তখন আরও ভয় পেয়ে বললে, 'ও ভাল্লুক মশাই! আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দিন। দয়া করে যদি বন থেকে বার হবার পথ বলে দেন—আপনি আর যা চান তাই দেবো, কিন্তু বিয়ে আপনাকে করতে পারব না; কারণ আমার বিয়ে অনেক আগেই ঠিক হয়ে গেছে একজন পরম সুন্দর রাজকুমারের সংগে।'

'না, তা হবে না'—বলে মাথা নেড়ে, থাবা বাড়িয়ে ভাল্লুক যেই রাজকুমারী রূপবতীকে ধরতে গেছে, অমনি দূর পাহাড়ে পথের বাঁকে একসংগে ঘোড়ার খুরের শব্দ জেগে উঠল—যেন অনেক অশ্বারোহী একসংগে ভৈঁরো মন্দির লক্ষ করে ছুটে আসছে। এক নিমেষে এই মায়ার খেলা স্তব্ধ হয়ে যেতেই সহসা মন্দির-চাতালের পাশের ঘন লতার জাল সরিয়ে বার হয়ে এলেন মণিমাণিক্য-ঝলকানো অপূর্ব রাজবেশে এক পরম সুন্দর মুসলমান রাজকুমার। চন্দ্রার সামনে এগিয়ে এসে বাদশাজাদা বললেন, 'ভয় পেয়ো না—আমরা তোমাদের বন্ধু! ঐ যে অশ্বারোহীরা আসছে ওরা আমার অনুচর। আমিই এই সৈন্য বাহিনীর সেনাপতি। যখন আমার চরেরা খবর দিল যে, গ্রামের সকল শিশুকে নিয়ে এক যাদুকরী ও তার স্বামী পালিয়েছে ভৈঁরো মন্দিরে, তখন আমার আর কৌতূহলের অন্ত রইল না সেই যাদুকরীকে দেখার। দু'তিন দিন আগে তোমাদের গ্রামের এক বড়লোকের কাছ থেকে অনেক খাবার-দাবার ও পোষাক নিয়ে যে মূক-বধির ভৃত্যটি এসেছিল—সে আমিই। চন্দ্রাবতী, তোমার যাদুর খেলা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমারও দেশে ছোট ভাইবোন আছে। আমিও এক সময় শিশুই ছিলাম। যাদুকরেরা আমাকেও যাদু করত—পাঠশালা হতে পালাতুম। ইচ্ছা করে, এখানেই থেকে যাই তোমাদের এই নিত্য উৎসবের মাঝে। এত রস আমি জীবনে পাইনি—এত নির্মল আনন্দ যে পৃথিবীতে থাকতে পারে, তা আমার কল্পনায় ছিল না!...মন যা চায় তা ত হয় না—কঠিন কর্তব্যের ভার। হ্যাঁ, অভিযান আমাদের শেষ হয়েছে। এবার আমার মুসলমান বাহিনী ফিরবে। তোমাদের এ গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি কেবল চন্দ্রাবতীর যাদুর খেলায়। আমার সৈন্যরা ও গ্রামের মাটি ছোঁয়নি।...এবার এই শিশুদের তাদের বাপ-মার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

একটু থেমে সেনাপতি আবার বললেন, 'এবার আমার যাওয়ার সময় হয়েছে। অনুচরেরা এসে পড়ল। কেবল একটা প্রার্থনা আছে আমার—আমি এই যাদুকরীকে আমাদের বেগম-মহলে নিয়ে যেতে চাই।'

এতক্ষণ সকলে যেন পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে শুনছিল বাদশাজাদার কথা। চন্দ্রাকে নিয়ে যাবার কথায় রাজপুত রক্ত যেন সংবিৎ ফিরে পেল। কিন্তু কেউ কিছু বলবার আগেই চন্দ্রাবতী সেনাপতির সম্মুখে এসে হাত জোড় করে বললে, 'হুজুর, আমি পথে পথে এই বাচ্চাদের তামাসা দেখিয়ে বেড়াই। এ না করতে পারলে আমি একদিনও বাঁচব না। আপনার সুন্দরী বিদুষী বেগম মহলে আমার মত মূর্খ যাদুকরীকে কি মানায়?'

বাদশাজাদা হেসে বললেন, 'আমি এই জবাবই আশা করছিলাম চন্দ্রা! আমি ছদ্মবেশে এই দুই-তিন দিন সর্বদা তোমার কাছে কাছে থেকেছি—তোমার স্নেহ-মায়ায় মূক বধির ভৃত্যটিও বঞ্চিত হয়নি। গভীর রাতে তুমি যখন ভৈঁরো দেবতার রুদ্ধ দ্বারের সামনে লুটিয়ে কাঁদতে তখনই অনুভব করেছি যে, এই পবিত্র-আত্মা নারীকে কখনও হীরা-জহরত মান-মর্যাদার লোভ দেখিয়ে জয় করা যায় না।...হৃদয় আমার খুশিতে ভরে উঠেছে। দেশে আমারও মা-বোন আছে; তুমি আমার বোনই হলে চন্দ্রা।' তারপর হাত থেকে হীরার আংটি খুলে চন্দ্রার হাতে দিয়ে তিনি বললেন, 'এই নাও ভাইয়ের স্মৃতিচিহ্ন।'

চন্দ্রাবতী চাকতে তার সাচ্চা জরী ও রেশমের ওড়না হতে কিছু জরী ও রেশম নিয়ে নিপুণ হাতে একটি রাখী তৈরী করে সেনাপতির হাতে পরিয়ে দিয়ে বললে, 'এই নাও ভাই সাহেব, তোমার বোনের উপহার!'

ততক্ষণে পাঁচজন অশ্বারোহী সৈনিক সেনাপতির দুগ্ধধবল ঘোড়াটি নিয়ে এসে পৌঁছেছে। একটি শিশুর হাতে স্বর্ণমুদ্রায় ভরা একটি চামড়ার থলি দিয়ে বাদশাজাদা ভাল্লুকের দিকে ফিরে বললেন, 'ভাল্লুকভায়া! সর্দি সেরেছে? যাও এবার রূপবতী রাজকুমারীকে তার নিজের জায়গায় নিয়ে যাও।'

মুহূর্তের মধ্যে ঘোড়ার দ্রুতগতি ক্ষুরের ধ্বনি পাহাড়ে-পথের নীচের দিকে মিলিয়ে গেল আর চন্দ্রাবতী সেইখানেই দু'চোখভরা জল নিয়ে ভৈরব দেবতার উদ্দেশে হাত জোড় করে লুটিয়ে পড়ল মন্দিরে—অঙ্গনের ধূলায়। ১৩৮৩

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয় টিকটিকি

লীলা মজুমদার

ডুমাপুর থেকে ছোটমামা হঠাৎ গুপিকে তার করল, 'কাম সার্প'। আগেও গুপি একবার ডুমাপুর গেছিল, খুব ভালো লেগেছিল। পাহাড়ে জায়গা, চারিদিকে ঝাউগাছ আছ চা-বাগান। রাতে ঝোপেঝাড়ে হাজার হাজার জোনাকি। ঝিঁঝি পোকার ডাকে কান ঝালাপালা। মুরগি, মুরগির ডিম, ঝর্নাতলির মিষ্টি মাছ আর বুনো স্ট্রবেরি।

বড়মামুর বন্ধু অনন্ত মামার চা-বাগান। ঐ বাড়িতে কেউ বারোমাস থাকে না, মাঝেমধ্যে ছুটিছাটাতে যায়। বড় বড় ঘর, কাঠের মেঝেতে নারকেল ছোবড়ার গালচে পাতা, তাতে পিসু হয়। পিসু একরকম ছোট পোকা, চোখে দেখা যায় না, বেজায় কামড়ায়। চৌকিদার আছে, বেজায় ভালো রাঁধে, আর ফটকের পাশে আলুবখরার গাছটার তুলনা হয় না।

পুজোর ছুটি ; গুপির যেতে কোনো বাধা নেই। নিশ্চয় এর মধ্যে একটা কিছু ঘোরেল ব্যাপার আছে, নইলে 'কাম সার্প' কেন? গুপি মহাখুসি। সেই নেপোর ব্যাপারটা চুকে যাওয়া ইস্তক শুধু পড়া আর পড়া। এই দেড় বছরে ছোটমামা পর্যন্ত সত্যি সত্যি বি. এস্-সি পাস করে ফেলে, সমাদ্দার ইন্‌ভেস্টিগেশনসে দ্বিতীয় টিকটিকির চাকরি পেয়েছে। একটু হাত পাকলে বিনু তালুকদার ওকে পুলিস ঢুকিয়ে নেবে।

এ সময়ে ছোটমামার ডুমাপুরে থাকার কথা নয়। আপিসে সবচেয়ে কম মাইনে পেলে কি হয়, আসলে সে সমাদ্দার সাহেবের ডানহাত। যত ক্রুর তদন্ত সব ওদের দ্বিতীয় টিকটিকিকে দেওয়ার নিয়ম। কারণ প্রথম টিকটিকির মুখ চিনতে কোনো নিয়মভঙ্গকারীর আর বাকি নেই। এদিকে ছোটমামার নাম পর্যন্ত ওদের খাতায় লেখা নেই। এমন কি অন্য কর্মচারীদের মধ্যেও অনেকেরই ধারণা যে ছোটমামা সমাদ্দারের একজন মক্কেল। এইরকমই দরকার। দ্বিতীয় টিকটিকি আছে কি নেই কেউ জানবে না, আর মাঝখান থেকে সে-ই তদন্ত চালিয়ে সব ফাঁস করে দেবে। কিন্তু তখনও তার নাম গুহ্য রাখা হবে। সবাই সমাদ্দারের বুদ্ধির তারিফ করবে। এই নিয়ে ছোটমামা গুপির কাছে অনেক দুঃখও করেছে। এবারও নিশ্চয় কোনো বিপজ্জনক কাজ নিয়েই ওখানে গেছে। বাড়ির লোকে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানে না, কারণ সমাদ্দারের আপিস বর্ধমানে। সেখানে একজন ভালো-ভালো-হাত-আয়না-ও-লজেঞ্চুস-ওয়ালার সঙ্গে ছোটমামা থাকে। ওর নামটি পর্যন্ত কেউ জানে না। সবাই ওকে ম্যালেরিয়াবাবু বলে ডাকে। তাদের বিশ্বাস ছোটমামা কোনো খবরের কাগজের মফঃস্বল রিপোর্টার। চেহারা দেখেই ম্যালেরিয়া রুগী বোঝা যায়।

ছোটমামার এ-সব বিষয়ে কোনো দুঃখ নেই। ভালো টিকটিকিদের এই রকমই হতে হয়। ভিড়ের মধ্যে তাদের আলাদা করে চেনা যাবে না। চোরদের গা ঘেঁষে দাঁড়ালেও কিছু মালুম দেবে না। রোগা লিকলিকে চেহারা, তার উপর ভীতুর একশেষ ; বেড়াল দেখে লোম খাড়া হয়, আরশুলার গন্ধ পেলে ভির্মি যায়, একবার শিষ্য-গুরু প্যাঁচার ডাকে পা এলিয়ে গেছল। দ্বিতীয় টিকটিকি সাহস বা গায়ের জোর দেখিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কেন? তার কাজ আড়ালে, অজ্ঞাত থেকে, ছোঁক ছোঁক করে অন্যায়কারীদের হাঁড়ির খবর বের করে আনা। কাঁচা কাঁচা প্রমাণ জোগানো।

এইজন্যেই নিশ্চয় ডুমাপুর যাওয়া। কোনো জটিল তদন্ত ছাড়া আর কিছু নয়। যদিও বাড়ির লোকদের ধারণা অন্যরকম। মা বললেন, 'যাক্, তবু যে অনন্তবাবুদের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর জায়গায় গেছে, তাও ভালো।' দাদু বললেন, 'ভালো জায়গায় সৎসঙ্গে থাকা এখন সহ্য হলে হয়।'

এদিকে গুপি ভালো করেই জানত যে অনন্তবাবুরা বড় মামাদের সঙ্গে রামেশ্বর গেছেন। তবে বড়দের কথার মধ্যে থাকার কি দরকার, এই ভেবে চুপ করে রইল। তাছাড়া কিছু বললেই হয়ে গেল। ছোটমামা বেচারি একলা অকুস্থলে ম্যানেজ করতে পারছে না, একজন বিশ্বস্ত সহকারী দরকার, তাই না 'কাম সার্প'। এহেন অবস্থায় তাকে তো আর হতাশ করা যায় না। শেষ পর্যন্ত বাবার তুষটাকে ছোট সুটকেসে ভরে ডুমাপুর রওনা।

ছোটমামা সেই পুরনো দাড়িটা পরে ছোট গাড়ির স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। ভাগ্যিস সেই নেপোর ব্যাপারের সময় দাড়িটা চেনা হয়ে গেছিল, নইলে ছোটমামাকে চেনা গুপির সাধ্য ছিল না। বলল এ-সব ছদ্মবেশ খুবই সহজ, স্রেফ দু'গালে দুটো আস্ত সুপুরি আর সামনের চুল ছোট, পেছনের চুল লম্বা। ব্যস্, কোনো গুণ্ডা টিকটিকিও চিনতে পারবে না। দ্বিতীয় টিকটিকির আসল রূপ যত কম লোকে দেখে ওর উন্নতির পক্ষে ততই ভালো।

হেঁটেই আসছিল ওরা, ওখানে গাড়ি কোথায় পাওয়া যাবে। ঘোড়া অবিশ্যি ছিল, কিন্তু ছোটমামার 'হে ফিভার' কি না, ঘোড়া দেখলেই হাঁচি আসে। তবে বেশি দূরও নয়, আর গুপির লম্বা লম্বা হাঁটা দেওয়া অভ্যাস। পাহাড়ের গা কেটে বাজারের মাঠ। তার পাশেই খেলার মাঠ। সেখানে মস্ত একটা তাঁবু পড়েছে দেখা গেল। দূর থেকে দেখেই গুপির মহা উৎসাহ। '—ও কি, ছোটমামা, সার্কাস নাকি? দেখবে ত?'

ছোটমামা গুপির কাঁধে খোঁচা দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, 'স্-স্-স্, এক্ষুনি সব ফাঁস করে দিচ্ছিল! ওটাই অকুস্থল

www.BanglaBook.org

তদন্তের ক্ষেত্র। এখন চুপ কর্ দিকি, কে কোথায় শুনবে। বাড়ি গিয়ে সব বলব।'

কে কোথায় শুনবে শুনে গুপি অবাক। কোথাও তো জন-মানুষের সাড়া নেই। অথচ সবে বিকেল পাঁচটা হবে। আরেকবার ভালো করে দেখতে গিয়ে গুপির হাত-পা ঠান্ডা। দুটো গুন্ডা চেহারার লোক ওদের পাছু নিয়েছে!—'ও ছোটমামা, গুন্ডায় পাছু নিয়েছে যে।'

ছোটমামা চটে গেল। 'আহা, আবার গুন্ডা কোথায় দেখলি। ও ত ছুট আর পালক। আমার বডিগার্ডই বলিস্ বা ফলোয়ার-ই বলিস্। ওরা সর্বদা সঙ্গে থাকে। নইলে দ্বিতীয় টিকটিকি গুমখুন হলেই হয়েছে। তদন্ত বন্ধ। তাছাড়া রাফ কাজ করার জন্যে লোক চাই। একলা হিংস্র—ঐ যাঃ বলেই ফেলেছিলাম আর একটু হলেই। আমার আবার লোমের গন্ধে হাঁফ ধরে।'

গুপি বিরক্ত হয়ে চুপ করে রইল। কিন্তু শিরার মধ্যে রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। আঃ, বিপদ কী ভালো জিনিস! প্রাণ হাতে করে পাহাড়ের পথে পথে ঘুরে বেড়ানো। পিছনে ছুট আর পালক। এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে?

বাড়ির কাছাকাছি পেঁছতেই ছুট আর পালক পা চালিয়ে ওদের ধরে ফেলল। দুজনেই একসঙ্গে বলল, 'চাঁদুবাবু, আজ আমি মাংস পরিবেশন করব!' ছোটমামা কোনো উত্তর না দিয়ে, গেটের পাশের ছোট্ট চোরা ফটক দিয়ে ঢুকে পড়ল।

চৌকিদার বসবার ঘরে দুটো বড় বড় তেলের বাতি জেবলে দিয়ে বলল, 'বড় সায়েব, আমার ভয় করছে। আমাকে দু'দিনের ছুটি দিন। দিদিমা বড় বেমারি।' সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আর পালকও বলল, 'আমাদেরও খরচা দিন। শেষটা কি বেঘোরে প্রাণ দেব ঐ বিকটভাবে?'

ছোটমামা শুধু বলল, 'আগে খাওয়া-দাওয়া হোক। তোদের অত ভয় কিসের রে? কালই সব চুকেবুকে যাবে।'

কিছুই বুঝতে না পেরে গুপি চারিদিকে চেয়ে দেখল। জানলার কাচ দিয়ে দেখা গেল বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেছে। পাহাড়ের ছায়ায় ঘেরা এসব জায়গায় সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে ঝপ করে অন্ধকার হয়। বুকটা একটু ঢিপঢিপ করতে লাগল। থমথমে চুপচাপ। পাশের ঘরে চৌকিদার বাসনপত্র নাড়ছে, তার যা একটু শব্দ। হঠাৎ তারি মধ্যে দিয়ে ঘড়র-ঘড়র করে করাত দিয়ে কাঠ চেরার মত আওয়াজ হল। অমনি চৌকিদার মাংসের হাঁড়ি ফেলে ছুটে এসে ছোটমামাকে জাপটিয়ে ধরল আর ছুট ও পালক গুপির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঐ শুনুন খাঁচার শিকে নখে শান দিচ্ছে। তাকাতে ভয় করে! রেল ভাড়াটা দিয়ে দিন।'

ছোটমামা বলল, 'ছালটা ছাড়িয়ে ফ্যাল, হাত পা বেঁধে দে, ব্যস্ তোদের ছুটি। এই রকম সাহস নিয়ে তোরা সমাদ্দারের টিকটিকি হতে চাস?'

তখন গুপি বলল, 'ছোটমামা, সব ব্যাপার যদি খুলে না বল ত এই আমি চললাম। আমার রিটার্ন টিকিট আছে।'

ছোটমামা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, 'আগে খাওয়া যাক। তারপর বলব। ও ছুট, ও পালক, তোমরা তিনপোয়া মাংস নাও, আমাদের এক পোয়াতেই হবে।'

গুপি বলল, 'না, মোটেই হবে না।'

ছোটমামা প্রায় কেঁদেই ফেলে আর কি! 'আর বাড়াসনি রে গুপে। সব খুলে বলব, তখন তুই আর তোর মামাকে একা ফেলে পালাতে পারবিনে।'

চৌকিদার বললে, 'একা কেন হবে, বড় সায়েব?' ওনারা ত আছেন!' ছোটমামা তাই শুনে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

কোনো রকম খাওয়া চুকল, অথচ একশোবার বলতে হবে খাসা রান্না।

মুখ হাত ধুয়েই ছোটমামা বলল, 'দেখবে চল, তবে। পালক, আলো নিয়ে চল।'

চৌকিদার বলল, 'আমি বাসনপত্র ধুচ্ছি। আপনারা যান। এই ছুটটা ভারি ভীতু।'

বড় আস্তাবলের এক কোনে বড় একটা খাঁচা। তাতে ঢাকা লাগানো। লণ্ঠনের আলোয় গুপি দেখল, ভিতরে একটা ভালুক। শিক ধরে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। চোখে পলক পড়ছে না। ঠোঁটের কোনা দিয়ে নাল গড়াচ্ছে। মনে হল বিড় বিড় করে কি বলছে। গুপি এক হাত পেছিয়ে গেল।

নিজে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গুপিকে ঠেলে দিয়ে, ছোটমামা বলল, 'ঐ দেখ, আগে থাকতেই ভয়ে আধমরা। বলছি ওটা সত্যিকার ভালুক নয়। কুখ্যাত জালিয়াৎ নুটবিহারী, গোয়েন্দার হাত এড়াবার জন্য ভালুকের ছাল পরে সার্কাসের জানোয়ার-দের মধ্যে লুকিয়ে আছে। কি আর বলব রে, রোজ ঐ ভালুকের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খেল দেখতে শহর সুদ্ধ ছেলেবুড়ো ভেঙে পড়ছে। আর কেন নুটুবাবু, এবার খেল শেষ হয়েছে। ভালোমানুষের মত ছাল ছেড়ে বেরিয়ে এসো। আমাদের সমাদ্দার সায়েব গবরমেণ্টকে বলে-কয়ে তোমাকে মাপ করিয়ে দেবে। ঐ খাঁচায় ত আর জীবন কাটাতে পারবে না।'

ভালুক চুপ করে রইল। শুধু মিটমিটে আলোয় মনে হল চোখ দুটো একবার চক্‌চক্‌ করে উঠল।

ছোটমামা গুপিকে আবার ঠেলে দিয়ে বলল, 'যা না, এ ত কিছুই না, ঘাবড়াচ্ছিস কেন? সব ঠিক করে রেখেছি। তুই বললেই এই দড়ি ধরে টানব, খাঁচার দরজা উপরে উঠে যাবে। ব্যস, আর কিছু নয়, তুই দৌড়ে গিয়ে এক হাতে ওকে জাপ্টে ধরে, অন্য হাতে চোয়ালটা ধরে এক টান দিবি। অমনি খট্‌ করে মুণ্ডু খুলে যাবে আর নুটবিহারী—সপ্রকাশ!'

গুপি বলল, 'তুমি গিয়ে জাপ্টে ধর না, আমি চোয়াল টানব।'

ছোটমামা বেজায় চটে গেল, 'বলছি ত আমার হে ফিভার আছে, ভালুক দেখলে হেঁচকি আসে, হিঁচ!'

গুপি বলল, 'ছুট? পালক?'

ছুট ও পালক দরজার বাইরে থেকে বলল, 'সাত দিন ধরে বড় সায়েবের কথায় আমরা চাকর সেজে সার্কাসে নাম লিখিয়ে ভালুকের খাঁচা ধুয়েছি, ভালুকের গোবর সাফ করেছি। কাল রাতে সবাই ঘুমোলে প্রাণ হাতে করে খাঁচা ঠেলে এখানে এনেছি। সত্যি ভালুক না হতে পারে, কিন্তু নুটুবাবুর নখগুলো ত কিছু কম যায় না।' এই বলে ওদের গায়ে হাতে আঁচড় কামড়ের দাগ দেখাল। নুটুবাবু একটু মুচকি হেসেই আবার গম্ভীর হল।

পালক আরো বলল, 'নিজেরা তফাতে থাকবেন আর আমাদের নুটুবাবুর সামনে ফেলে দেবেন। ওর ঐ ভালুকছালের পকেটে বোমা নেই কে বলেছে? নিজেদের যদি এতটুকু সাহস থাকত—'

ছোটমামা বলল, 'না, আর অপমান সহ্য হয় না,—গুপে, যা বলছি। তোকে দূরবীণটা দিয়ে দেব।'

এবার আর বলতে হল না, গুপি এক দৌড়ে খাঁচার কাছে গেল, ছোটমামা দরজা টেনে তুলল আর অমনি নুটুবাবু বেরিয়ে এসে গুপিকে জাপটিয়ে ধরে, শূন্যে মুখ তুলে সে কি মড়াকান্না জুড়ে দিল। সকলের গায়ের রক্ত জল। ছোটমামা দু-একবার 'ও কি হচ্ছে, নুটুবাবু, ওকে ছেড়ে দিন বলছি, ইয়ার্কি হচ্ছে নাকি?'

নুটুবাবু গুপির কানের কাছে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগলেন। আর তাই দেখে চৌকিদার, ছুট, পালক সে যে কি হল্লা লাগাল —'ভালুকে ধরল রে, ভালুকে খেল রে, ওরে বাবারে!'

আশেপাশে ধুপধাপ শব্দ! হুড়মুড় করে সার্কাসের একদল লোক এসে উপস্থিত। তারা ভালুকের খোঁজে বেরিয়েছিল। তাদের দেখেই ভালুক গুপিকে ছেড়ে দিয়ে, ওদের একজনের গলা জড়িয়ে সে কি হাউমাউ! সেও ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'আরে চুন্নি রে, তোকে না দেখে আমারো খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠেছিল রে। কিছু মনে করবেন না স্যার, দশ বছর ধরে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করেছি ওকে। ও আমার মেয়ের মত!'

শুনে গুপিও লাফিয়ে উঠল, 'অ্যাঁ! মেয়ে নাকি? তবে যে ছোটমামা বলল নুটবিহারী?' সবাই শুনে অবাক! ছোটমামাও আমতা-আমতা করে বলল, 'ইয়ে—কি বলে—আমার কোনো দোষ নেই। সমাদ্দার সাহেবের কাছে বেনামা চিঠি এসেছিল, নুটুবাবু ভালুক সেজে এই সার্কাসে ঢুকেছে!'

তাই শুনে চৌকিদার কপাল চাপড়ে লাফিয়ে উঠে বলল, 'আরি বাবা, কি তাজ্জবের ব্যাপার। এই তারটা দুপুরে এসেছিল, দিতেই ভুলে গেছি।'

সমাদ্দারের তার, 'বেনামা চিঠি হোক্স্‌ নুটুবাবু কমাল ধরা পড়েছে।'

এতক্ষণ পরে ছোটমামার সব ব্যাপারটা মালুম হল। অমনি, 'তবে কি ঘরের মধ্যে সত্যি ভালুক ঢুকিয়েছিলাম নাকি রে! ওরে আমাকে ধর!' এই বলে হাত-পা এলিয়ে স্রেফ ভির্মি। তারপর দশদিন বিছানায়। সেই দশ দিন গুপির যে কি আনন্দে কেটেছিল! রোজ সকালে সার্কাসের জানোয়ারদের খাওয়া দেখতে যেত, বিকেলে খেলা দেখত। ভালুক সরানোর জন্য মালিক এতটুকু রাগ করেননি। বরং উলটে বলেছিলেন, এরকম দক্ষ টিকটিকির বাড়িতে রোজ রাতে মুরগি খেতে পাওয়াও সৌভাগ্য। তাছাড়া যখন ছুট আর পালক, যারা আসল চোর, তারাই ফেরারি, তখন পুলিশ ডাকার কোনো মানেই হয় না। আজও মুরগির দো-পেঁয়াজী হবে নাকি?

গুপি ভাবছে দ্বিতীয় টিকটিকি ত বাড়িতে একজন আছেই, আবার তৃতীয় টিকটিকি না হয়ে সার্কাসে ভালুকের খেলা দেখালে কেমন হয়? কিন্তু ছোটমামা নাকি টেলিস্কোপটা খুঁজে পাচ্ছে না, এই যা দুঃখ।

www.BanglaBook.org

ছড়া

জসীমউদ্দীন

কুতুর কুতুর ময়না,
কাল দেব তোর গয়না।
কাঁসার নূপুর দুই পায়ে,
নেচে বেড়াস সব গাঁয়ে।
ঝুমকো কানে ঝুলবে,
নাকে নোলক দুলবে।

সবই দেব কাল তোরে,
আজকে কাছে আয় তো রে।
তাগ ধিনা ধিন তাগ ধিনা
সুরে সামাল পাচ্ছি না।
একটুখানি গেয়ে গান,
জুড়িয়ে যা রে আমার প্রাণ।

১৩৬৯

প্রদীপের তলাটাই অন্ধকার কেন

সৈয়দ মুজতবা আলী

পিলসুজ 'পরে হেরো জ্বলে দীপশিখা,
চতুর্দিকে যে আঁধার ছিল পূর্বে লিখা
মুহূর্তেই মুছে ফেলে।
কিন্তু অতি অবহেলে
'মাভৈঃ' বলিয়া তারে ছেড়ে দেয় স্থান
যে আঁধার পায়ে ধরে মাগে পরিত্রাণ॥

১৩৬৯

খেলা দেখে যান

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

মাথার ওপর খাটানো নীল
বিনিপয়সার তাঁবু
নীচে সবুজ গালচে পাতা
খেলা দেখে যান, বাবু।

ঢোলক বাজে ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্
ভর সন্ধ্যেবেলা
হাজার ঢেউয়ের হাততালিতে
জমে উঠেছে খেলা।

বাঃ বাহবা! বাহবা বাঃ।
সাবাস বলিহারি—
হাঁড়ির মধ্যে মাটি আছে, না
মাটির মধ্যে হাঁড়ি!

এই ছিল না এই তো আছে
এই আছে এই ফক্কা
বুকের মধ্যে রঙের তাস
হরতনের টেক্কা।

জোনাক জ্বালে ঝাড়লণ্ঠন
কেই বা জানে কী ঠিক
গোঁফটা ঢেকে পুপের বেড়াল
চাইছে হাফটিকিট।

মাথার ওপর টাঙানো নীল
বিনিপয়সার তাঁবু
খেলা দেখে যান, দেখে যান
খেলা দেখে যান, বাবু।

১৩৭০

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পর্যটন

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মাথায় মস্ত পাগড়ি এঁটে,
গজিয়ে দাড়ি, গুম্ফ ছেঁটে
কেষ্টবাবু, কোথায় যান?
বাদকশান্, বাদকশান্!

কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে
সিংহসম লম্ফ দিয়ে
বিষ্টুবাবু, যান কোথায়?
মোম্বাসায়, মোম্বাসায়!

উড়িয়ে ধুলো মহেশ দাস
ভরদুপুরে কোথায় যাস?
হঠাৎ কোথায় চললি রে?
সাণ্টা ফে, সাণ্টা ফে!

সবাই এখন ছাড়ছে ঘর,
কেষ্ট বিষ্টু মহেশ্বর।
ব্যাপার দেখে হচ্ছে শখ
আমিও হব পর্যটক!

কিন্তু আমি কোথায় যাই,
একটি বিনে টঙ্কা নাই।
তাই নিয়ে যাই কোথায় আর?
শ্যামবাজার, শ্যামবাজার।

১৩৮৭

মিতব্যয়ী

অমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী

ঘুমোন খাটে দয়াল কয়াল,
উঠছে নাসায় শব্দ ভয়াল;
গিন্নী ডাকেন—'ওঠো!
পাশেই তোমার কাকার বাড়ি
লাগলো আগুন; তাড়াতাড়ি
নেভাতে তা ছোটো!
ছুটচে লোকে ঐ দ্যাখো সব!
গোরু-বাছুর তুলেছে রব,
ওড়ে পাখীর দল!
সারা আকাশ টকটকে লাল—
জ্বলচে যেন লক্ষ মশাল,
এসেচে দমকল!'

দয়ালবাবু ধড়মড়িয়ে
উঠে, দেখেই জ্বালো দিয়ে,
গিন্নীরে কন হেঁকে—
'হাঁ ক'রে আর বোকার মত
বাইরে চেয়ে থাকবে কত?
লাভ কি এত দেখে?
এখন যত শীঘ্র পারো
তোমার আমার ভাতটা বাড়ো,
একটু ক'রে গরজ;
রাতের খাওয়া এই আলোতেই
সারবো দুজন ভালমতেই,
বাঁচবে তেলের খরচ!'

১৩৮৩

www.BanglaBook.org

আজগুবি মামা

হাসিরাশি দেবী

বাতাস-বাড়ির মামা
সেদিন রাতে
বাড়ির ছাতে
নামলো দিয়ে হামা
সটান আকাশ থেকে,
ব'ললে ডেকে হেঁকে—
'ভাগ্‌নে শোন,—এলাম তোমার কাছে
একে একে বলবো তোমায়,—অনেক কথা আছে।'

তাই না শুনে ভড়কে গিয়ে ভূতো
ভয়ে কেঁপে বললে—
'ও সব ছুতো!
মামার প্রমাণ কোথায় তোমার?
মাথা ভরাই টাক ছিল যার
পাঞ্জাবী যাঁর থাকত গায়েই—
পরনে পাৎলুন,
তোমার তো কই দেখছি না তার
একটা কোনও গুণ!'

এই না শুনে বাতাস-বাড়ির মামা,
পকেট থেকে রাখলে গুণে
মেঠাই কয়েক ধামা।
ব'ললে সে সব ভূতোর সামনে রেখে
চোখ পাকিয়ে—হাত গুটিয়ে রেগে,
'ক'দিন ছিলাম বাইরে ব'লে
বড্ড গেছ পেকে!
নইলে—আমার ওপর কথা!
কোথায় রে তোর সঙ্গী-সাথী
ক্যাবলা এবং গদা,
সকলকে আন্‌ ডেকে;
তারপরে যা প্রশ্ন করিস জবাব দেব তার
তবে কিনা এই হল শেষ! বলবো নাকো আর—
ক্ষীরের পায়েস, দুধের ছানা, মুড়কী মেঠাই খেতে,
অনেক ঘুরে এসেছিলাম তোদের নিয়ে যেতে—
সেই যে বাতাস-বাড়ি—,
ক'যুগ আগে মিলিয়েছিল হাওয়ায়
—তাড়াতাড়ি
মিস্তিরীটার ভুলে,
ইলেক্‌ট্রিকের সুইচটাকে যেই নিয়েছে খুলে
অমনি হাওয়াবাড়িই হল একটা ছোট ফানুষ;
মাঝখানে তার আমরা ক'টি মানুষ
উড়ে উড়েই চলছি কেবল
স্পুটনিকদের সাথে,
তাই ত কাছাকাছি হতেই এলাম তোদের ছাতে।'

এই না শুনে চমকে ভূতো যেই না ফিরে চায়,—
অমনি দেখে কোথায় মামা?
মিশেছে হাওয়ায়।

কাক-তাড়ুয়া

মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু

কাক-তাড়ুয়া দাঁড়িয়ে থাকে
দত্তবাড়ির চত্বরে।
কাক-পক্ষী আসলে কাছে
ভাবটা দেখায় 'ধরতো রে'।
পক্ষীপুরের রক্ষী ছিল
চুলবুলে এক বুলবুলি।
সাহস করে দেখতে এল
মিথ্যে ভয়ের ভুলগুলি।
কাক-তাড়ুয়ার মাথায় বসে
বললে 'মাথায় খড় তো রে
হাঁড়ির ভেতর তৈরি করা
বিরাট দুটো গর্তরে।
হাত-পাগুলো তৈরি বাঁশের
ভেতরেতে ঘুণ খালি'
তখন থেকেই কাক-তাড়ুয়ার
পড়লো মুখে চুন-কালি!

www.BanglaBook.org

কপি ও কড়া

করুণাময় বসু

নতুন খুড়ো বলেন সেদিন, 'শোনরে পুপু মন দিয়ে,
পরশু যখন পেরিয়ে আসি গভীর কালো বন দিয়ে,
রাস্তা ধারে ক্ষেতের কপি তুলছে সবাই বস্তায়,
দাঁড়িয়ে গেলাম, ভাবছি মনে দেয় যদি কেউ সস্তায়।
হঠাৎ দেখি চমকে গিয়ে দেড় বিঘে এক মাঠ জুড়ে
একটা বিরাট বিশাল কপি,—দেখেই মাথা যায় ঘুরে।'

মুচকি হেসে বললে পুপু, 'যাচ্ছি সেদিন রাঁচি,
যাবার পথে মামার বাড়ি থামলাম তোপচাঁচি।
সেজমামার কারখানাতে হচ্ছে জিনিস গড়া,
দেড় মাইল এক জায়গা জুড়ে পেল্লায় এক কড়া।
নতুন খুড়ো বলেন হেসে, 'এসবই কল্পনা।'
'সত্যি বলছি', বললে পুপু, 'কক্ষনো গল্প না।
দেখই ভেবে', বললে পুপু একটু যেন ব্যঙ্গ ভরে,
'ঐ কড়াটা নইলে কপি সিদ্ধ হবে কেমন করে?'

১৩৮৩

খুকী রাঁধুনী

বেণু গঙ্গোপাধ্যায়

খুকু রাঁধে
ইঁটকুচি জলেতে
ওষুধের খলেতে
কি মজার রান্না!

যদি কেউ
নিন্দেটি করেছ
একেবারে মরেছ
শোন বসে কান্না।

সারাদিন
কুটো বাটা করে ও
জলে ঘট ভরে ও
যেন পাকা গিন্নি।

বসে বসে
হাত নাড়ে ঘুরিয়ে
কত কিছু ফুরিয়ে
গোলে কাঁচা সিন্নি।

দেখ তার
ভাত রাঁধা ধুলোতে
বিনা চালে চুলোতে
কাঁকরের মিষ্টি।

খেয়ে যায়
পুতুলেরা সদলে
মানুষের বদলে
মেয়ে অনাছিষ্টি।

১৩৮১

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

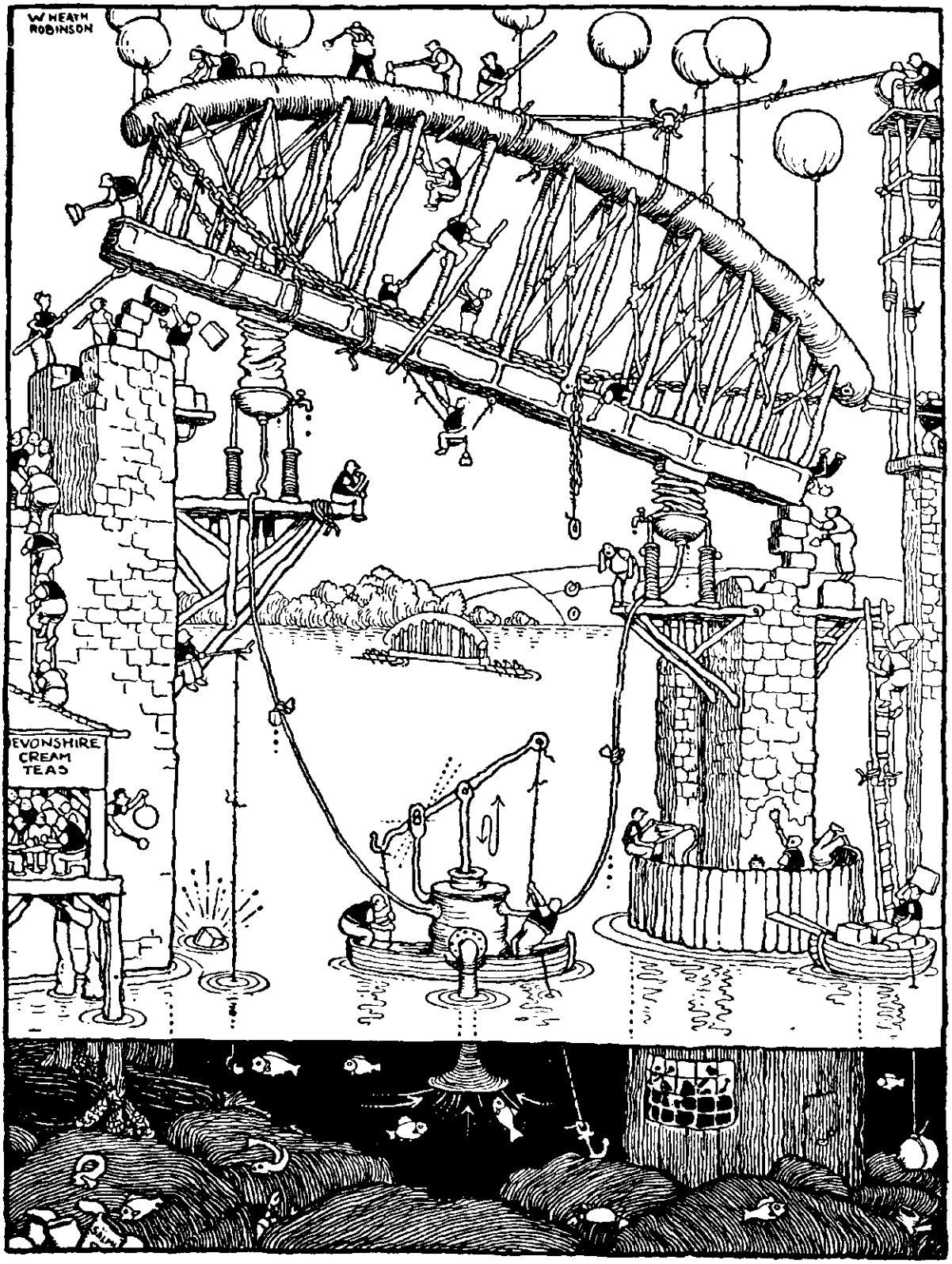

নদীর ওপর পুল বানানো সহজ তা নয় মোটে,
তোয়ের হলেই দেখবে পুলে রেলের গাড়ি ছোটে!

www.BanglaBook.org

হরিশপুরের রসিকতা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পৃথিবীর সব লোককে বিশ্বাস করতে পার। কিন্তু হরিশপুরের লোককে কখনো বিশ্বাস করো না। ভুলেও নয়।

না—চুরি-জোচ্চুরির ভেতরে তারা নেই। তারা কাউকে ঠকায় না। এই কলকাতা শহরে একজন পকেটমারও হরিশপুরের লোক নয়—এ কথাও আমি হলফ করে বলতে পারি। তারা কেউ বদমেজাজী নয়—গায়ে পড়ে কখনও ঝগড়া করে না। তাদের মিঠাইয়ের দোকানে তিনদিনের পচা সিঙাড়াকে কখনো হাতে-গরম বলে চালিয়ে দেয় না। আসল কথা হল—

কথাটা আর কিছু নয়। হরিশপুরের মানুষ একটু রসিক। খানিকটা বেশি মাত্রাতেই রসিক।

কী বলছ? রসিক মানুষকে ত ভাল লাগে? হুঁ, আমারও লাগত এক সময়। কিন্তু সেবার সেই বরযাত্রী যাওয়ার পর—আচ্ছা খুলেই বলছি তা হলে।

আমরা চারজন একই অফিসে চাকরি করি। আমি, নিতাই, নেপাল আর বিষ্টুপদ। দারুন বন্ধুত্ব আমাদের ভেতরে। এক-সঙ্গে পাকৌড়ি কিনে খাই, সিনেমার টিকিট কিনি, মোহন-বাগানের খেলা দেখতে যাই, মোহনবাগান জিতলে চারজনের ছাতা জুতো হারিয়ে যায় আর মোহনবাগান গোল খেলে গলা জড়াজড়ি করে কাঁদতে বসি।

আমাদের সেই বিষ্টুপদর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল হরিশপুরে।

তখন হরিশপুরের মহিমা কে জানত? আমরা তিন বন্ধুই খুশি হয়ে উঠলুম।

বিষ্টুপদ বললে, আমার বিয়েতে তোরা যাবি ত?

আমি, নিতাই আর নেপাল একসঙ্গে বললুম, নিশ্চয় নিশ্চয়! আমরা বরযাত্রী না গেলে তোর ত ভাল করে বিয়েই হবে না!

কিন্তু বিয়ের দিন বিষ্টুপদর সঙ্গে বেরুনো গেল না। সরকারী অফিস—তায় অসম্ভব কাজের চাপ পড়েছে। বন্ধুর বিয়ের জন্যে ছুটি চাইতে গেলে পুরো একটা দিনের মাইনেই কেটে নেবে। তাই বরকে নিয়ে আসল দলটা দুপুরের দিকে রওনা হয়ে গেল—আমরা ঠিক করলুম অফিস ছুটি হলে সওয়া পাঁচটার ট্রেনেই বেরিয়ে পড়ব।

অবিশ্যি তাতে কোনো অসুবিধে ছিল না। হরিশপুর কলকাতা থেকে দূরে নয়। ছোট লাইনের যেসব গাড়ি ঝিমুতে ঝিমুতে টিকিস টিকিস করে চলে তারাও ঘণ্টা দেড়েকের ভেতরেই হরিশপুরে পৌঁছে যায়। আমরা হিসেব করে দেখে-ছিলুম, বিকেলের গাড়িতে গেলেও সন্ধ্যে সাতটার ভেতরে—বিয়ে শুরু হওয়ার আগেই—হরিশপুরে হাজির হতে পারব।

চারটে বাজতে না বাজতেই আমরা অফিস থেকে ছিটকে বেরুলুম। বন্ধুর বিয়ের বরযাত্রী যাচ্ছি, একটু সাজগোজ না হলেই বা চলে কী করে। আমি প্রাণপণে একটা সাদা জুতো রং করলুম, নেপাল তার খাড়া-খাড়া চুলগুলো আধঘণ্টা ধরে বাগাতে চেষ্টা করলে আর নিতাই নিজের পুরনো সিল্কের পাঞ্জাবিতে প্রায় এক শিশি সেন্ট ঢালল।

তারপর হাওড়ায় এসে ট্রেন ধরা।

প্রথমদিকে খুব ভিড় ছিল গাড়িতে। কে-একজন আমার সাদা জুতোটাকে মাড়িয়ে দিলে, নিতাইয়ের সিল্কের পাঞ্জাবি-টার ভাঁজ-টাঁজ নষ্ট হয়ে গেল, একজন আবার নেপালকে ঠাট্টা করে বললে, দাদা যেন গন্ধমাদন হয়ে চলেছেন! যাই হোক, হরিশপুরের গোটা তিনটে স্টেশন আগে গাড়িটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল, তখন আমরা তিনজনে ভাল করে বসতে পেলুম।

নিতাই বললে, এতক্ষণে একটু ভাল করে বসা গেল—বাব্বাঃ!

আমি বললুম, কতটুকুই বা বসা—এক্ষুনি তো নামতে হবে।

নিতাই একটা হাত তুলে পাঞ্জাবিটা একবার শুঁকে নিলে। তারপর খুশি হয়ে বললে, নামলেই বাঁচি। যা খিদে পেয়েছে ভাই—কী বলব!

নেপাল নিজের খাড়া-খাড়া চুলে হাত বুলিয়ে নিয়ে বললে, খিদে ত আমারও পেয়েছে। আমি যেন এখান থেকেই লুচি-ভাজার গন্ধ পাচ্ছি।

আমি বললুম, আমার নাকে মাংসের কালিয়ার গন্ধ আসছে।

নিতাই ভাবুক হয়ে উঠল। বেশ উদাস-উদাস চোখ করে বলে চলল, আর আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি রাশি রাশি চপ ভাজা হচ্ছে—বড় বড় থালায় সাজিয়ে রাখা হচ্ছে ভেটকির ফ্রাই—

আমি আর নেপাল বললুম, আহা-আহা! আর বলিসনি।

আমাদের তোমরা পেটুক ভাবছ নিশ্চয়। কিন্তু আমরা কী করব বলো? তিনজনেই মেসে থাকি। বিউলির ডাল, পুঁই চচ্চড়ি আর একেলো পোনা মাছের টুকরো খেতে খেতে পেটে প্রায় চড়া পড়ে গেছে। তাই কিঞ্চিৎ খ্যাঁটের আশায় আমরা বেশ খানিকটা উত্তেজনা বোধ করছিলুম।

ঠিক সেই সময় বুড়ো ভদ্রলোকটি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাবেন আপনারা?

কামরাতে আমরা তিনজন ছাড়া এই ভদ্রলোক হলেন চার নম্বরের যাত্রী। বেশ পাকা আমটির মত ফরসা গোলগাল চেহারা, মুখে একজোড়া মানানসই কাঁচা-পাকা গোঁফ, মাথায় চকচকে টাক, দেখলেই ভক্তি আসে। সঙ্গে দুটি বিরাট সাইজের মুখবাঁধা হাঁড়ি।

এতক্ষণ এক কোনায় বসে আমাদের লক্ষ করছিলেন। এই-

www.BanglaBook.org

বারে প্রশ্ন জুড়লেন।

—কোথায় যাবেন?

আমরা এক সঙ্গেই বললুম, হরিশপুর।

—বরযাত্রী বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বেশ, বেশ। হরিশপুর কদমতলায় জগদীশ চক্কোত্তির মেয়ের বিয়েয় যাচ্ছেন—তাই না?

আমরা অবাক হলুম একটু। নিতাই জিজ্ঞেস করলে, কী করে জানলেন?

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, আমরা এ তল্লাটের লোক—সব রকম খবরই রাখি। ছেলেটির নাম বিষ্ণুপদ গোস্বামী—নয় কি?

নেপাল চোখ কপালে তুলে বললে, তা-ও জানেন দেখছি!

ভদ্রলোক গোঁফজোড়ায় বেশ একবার তা দিয়ে নিলেন। তারপর তেমনি শান্ত হাসি হেসে বললেন, বললুম যে আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক—সব খবরই রাখতে হয়। এ ত আর কী বলে আপনাদের কলকাতার ব্যাপার নয় যে দোতলায় বিয়ে হলে একতলার লোককে নেমন্তন্ন করে না!

ট্রেন তখন আর-একটা স্টেশন পার হয়েছে। এর পরেই হরিশপুর। ভদ্রলোক বেশ করে এক টিপ নস্যি নিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, তা নামবেন কোন স্টেশনে? খরিশপুরেই ত?

আমি বললুম, খরিশপুরে কেন? আমরা ত হরিশপুরে যাব।

—জানি-জানি। হরিশপুর কদমতলায়। সে ত খরিশপুর থেকেই কাছে হয়।

—বলেন কী! হরিশপুরের কদমতলা খরিশপুরে যেতে যাবে কেন?

হাতের নস্যি ঝাড়তে ঝাড়তে ভদ্রলোক বললেন, হুঁ, এদিকে নতুন লোক কেউ এলে ওই ভুলটাই করে। নামে হরিশপুর কদমতলা হলে কী হয়—হরিশপুর স্টেশন থেকে পাকা দু' মাইল হাঁটতে হয়। আর খরিশপুর থেকে আধমাইলও হবে না। মিথ্যে হরিশপুরে নেমে কষ্ট পাবেন কেন?

নিতাই আপত্তি করল—কই, আমাদের ত কেউ সে কথা বলে দেয়নি।

—বললুম ত, বাইরের লোক সবাই-ই ভুল করে। তা ইচ্ছে হলে আপনারা হরিশপুরেই নামতে পারেন—আমার তাতে কী বলবার আছে বলুন।

নেপাল বললে, তা হলে বরং খরিশপুরেই নামব আমরা। যা খিদে পেয়েছে—এখন দু' মাইল হাঁটতে গেলে পেটের নাড়িভুঁড়ি সব হজম হয়ে যাবে! কিন্তু খরিশপুর আবার কোথায়?

—বেশি দূর নয়—হরিশপুরের পরের স্টেশন। ভদ্রলোক হাসলেন—চলুন আমিও খরিশপুরেই যাচ্ছি। রাস্তাটা দেখিয়ে দেব আপনাদের।

—বেশ ত, বেশ ত!—আমরা দারুণ খুশি হলুম।

ট্রেন হরিশপুরে এল, দু'মিনিট পরে ছেড়েও গেল। ট্রেন স্টেশন ছেড়ে একটু এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল বাঁ দিকে একটা বাড়ির সামনে মস্ত চাঁদোয়া খাটানো, পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে, বিস্তর লোক আনাগোনা করছে সেখানে।

নেপাল ছটফট করে উঠল।

—ওই ত একটা বিয়েবাড়ি ওখানে।

ভদ্রলোক আর-এক টিপ নস্যি নিলেন। হেসে বললেন, ও অন্য বিয়ে। এখন ত মরশুম মশাই—চারদিকেই বিয়ে হচ্ছে।

—তা বটে, তা বটে!—নিতাই দীর্ঘশ্বাস ফেলল—যা খিদে পাচ্ছে, ওখানে গিয়ে পাতা নিয়ে বসে পড়লেও হত।

ভদ্রলোক বললেন, তা মন্দ নয়। আমিও একবার ভুল করে আর-এক বিয়েবাড়িতে চলে গিয়েছিলুম। সে যা কাণ্ড!—বলে বেশ একটা মজার গল্প জুড়ে দিলেন। দেখলুম, লোকটি ভারী রসিক।

আমরা প্রাণ খুলে হাসছি, এমন সময় ঘটাং ঘটাং করে গাড়ি খরিশপুরে পৌঁছে গেল। হাঁড়ি দুটো তুলে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, নামুন—নামুন! গাড়ি এখানে এক মিনিটের বেশি দাঁড়ায় না।

আমরা চটপট নেমে পড়লুম।

ছোট্ট স্টেশন। ঘন হয়ে অন্ধকার নেমেছে—ঝিঁঝি ডাকছে ঝাঁ-ঝাঁ করে। দূরে কাছে কয়েকটা মিটমিটে আলো—স্টেশনের পাশেই গোটা দুই দোকান দেখা যাচ্ছে। ভদ্রলোক বললেন, স্টেশন থেকে বেরিয়েই দুটো পিপুলগাছের তলা দিয়ে যে রাস্তা বাঁ দিকে গেছে—তাই ধরে এগোবেন। খানিক দূর গেলেই একটু জংলা মনে হবে পথটা—তাতে ঘাবড়ে যাবেন না। তারপরেই একটা ছোট্ট নালা—বাঁশের পুল রয়েছে—সেটা পেরুলেই—

স্টেশনমাস্টার টিকিটের জন্যে এগিয়ে এলেন। তারপর ভদ্রলোককে দেখে একগাল হেসে অভ্যর্থনা করলেন।

—মুখুজ্জেমশাই আজ এখানে যে?

—হুঁ, একটু কাজে আসতে হল। শুনুন, এঁরা তিনজন কলকাতা থেকে আসছেন, খরিশপুরের বদলে ভুলে হরিশপুরের টিকিট কেটেছেন। বাড়তি কিছু দিতে হবে নাকি?

ঠিক আছে—ঠিক আছে—বলে স্টেশনমাস্টার আমাদের টিকেট নিয়ে চলে গেলেন। আমরা মুখুজ্জেমশায়ের ওপর আরো খানিকটা কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলুম।

নিতাই জিজ্ঞেস করলে, আপনি কোথায় যাবেন?

—আমি? আমিও যাব ওই দিকটাতেই। তবে একটু দেরি হবে আমার। দশ-বারো মিনিটের ভেতরেই উলটো দিকের একটা গাড়ি আসছে। তাতে আমার এক বন্ধুর আসবার কথা। সেও এদিকে নতুন লোক, একেবারে তাকে সঙ্গে নিয়েই যাব। কিন্তু আপনারা আর দেরি করবেন না—এগোন।

—না, দেরি করা চলবে না, পেটে আগুন জ্বলছে—নেপাল আগেভাগেই পা বাড়াল। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ আর নমস্কার জানিয়ে আমরা দুজনেই নেপালের পেছনে চলতে শুরু করে দিলুম।

ভদ্রলোক ডেকে বললেন, কিছু অসুবিধা হবে না—এগিয়ে যান—

—আচ্ছা—আচ্ছা—

পিপুলগাছটার তলা দিয়ে বাঁয়ের রাস্তায় আমরা চলতে শুরু করলুম। দু'ধারে কয়েকটা ছোটবড় বাড়ি চোখে পড়ল বটে, কিন্তু কোনোটাকেই বিয়েবাড়ি বলে মনে হল না। খিদের তাড়ায় হনহন করে আমরা হাঁটতে লাগলুম। কাঁচা মাটির পথ—অন্ধকারে একটু অসুবিধেও হচ্ছিল, কিন্তু আধ মাইলের ত ঝামেলা—দেখতে দেখতে পেরিয়ে যাব!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু কোথায় সেই আধ মাইল!

একটু পরেই দু'পাশে শুরু হয়ে গেল ঘন জঙ্গল। এত অন্ধকার যে চোখ আর চলতে চায় না। চারপাশে খালি অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে আর মাথার ওপর ঘনিয়ে এসেছে নিবিড় কালো মেঘ। আমি একবার পা পিছলে পড়তে পড়তে সামলে নিলুম—নিতাই একটা হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এই ন্যাপ্‌লা—ব্যাপারটা কী বল ত? এ কি রকম বিয়ে-বাড়ির রাস্তা?

নেপাল মোটা মানুষ হলে কী হয়—খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সে চিরকালই অত্যন্ত উৎসাহিত আর দারুণ রকম তৎপর।

নেপাল বললে, দাঁড়াসনি, চল—চল। মোটে ত আধ মাইল যেতে হবে।

—আধ মাইল! আধ মাইল কাকে বলে আমি জানিনে?—নিতাই চটে গেল: সেই তখন থেকে হাঁটছি—বাড়ি নেই, ঘর নেই—কেবল শাঁ-শাঁ করছে অন্ধকার জঙ্গল—যেন আফ্রিকার বনের ভেতর দিয়ে চলেছি। নিশ্চয় রাস্তা ভুল হয়েছে।

নেপাল বললে, রাস্তা ভুল হবে কেন? ভদ্রলোক যেভাবে বলে দিয়েছেন—সেই ডিরেকশনেই ত চলেছি। আর কোনো রাস্তা ত এদিকে দেখিনি।

নিতাই গোঁ-গোঁ করে বললে, দুত্তোর, ডিরেকশন! যা জঙ্গল চারিদিকে—বিয়েবাড়িতে ভোজ খাওয়ার আগে বাঘেই আমাদের ভোজ লাগাবে মনে হচ্ছে।

আমি বললুম, পাড়াগাঁয়ের রাস্তা একটু জংলা হয়ই। আর একটু এগিয়ে দেখা যাক-না।

কিন্তু বেশি দূর এগোতে হল না। হঠাৎ রাস্তাটা শেষ হয়ে গেল। তারপরেই দেখা গেল ঢালু পাড়ির নিচে খানিকটা জলের রেখা। আর একধারে ভুতুড়ে চেহারা নিয়ে একটা বাঁশের পুল দাঁড়িয়ে।

নেপাল খুশি হয়ে বললে, ব্যস—এই ত এসে গেছি। এই সেই নালা, আর এই পুলটা পেরোলেই—

নিতাই বললে, নালা? এ ত দস্তুরমত নদী দেখছি।

—আরে এসব দেশে নদীকেই নালা বলে! পাড়াগেঁয়ে লোক ত! চল্‌ চল্‌ খিদেয় দাঁড়াতে পারছি না।

নেপাল বাঁশের পুলটার দিকে পা বাড়াল।

আর ঠিক তক্ষুনি চারদিক ঝলসে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকাল—কড়কড় করে ডেকে উঠল মেঘ। সেই বিদ্যুতের আলোয় সব স্পষ্ট দেখতে পেলুম আমরা। নিচে ছোট একটা নদীই বটে। বাঁশের পুলটা তার আধখানা পর্যন্ত গিয়ে ভেঙে পড়েছে। অন্তত পাঁচ বছরের ভেতরে তার উপর দিয়ে কেউ পার হয়নি। আমরা সেই পুলে উঠে একটু এগোলেই সোজা নদীতে গিয়ে পড়তুম। ওপারে অথৈ জঙ্গল—যেটুকু দেখতে পেলুম তাতে মনে হল শুধু বাঘ কেন, ওখানে হাতি-গণ্ডার ভালুক-অজগর সব-কিছু থাকা সম্ভব।

আবার বিদ্যুতের চমক আর মেঘের ডাক। আর নদীর ওপারে এবার যা আমরা দেখতে পেলুম, তাতে আমাদের চোখ সোজা কপালে উঠে গেল। ভাঙা কলসী, কয়লা, ছাই, আর কয়েকটা আধপোড়া বাঁশ। একটা দড়ির খাটিয়া তাদের মাঝখানে আকাশে চার পা তুলে উলটে পড়ে আছে।

আমি বললুম, শ্মশান।

ওপারের নিবিড় জঙ্গল থেকে হু-উ-উ করে একটা শেয়াল ডাক তুলল। আর সঙ্গে সঙ্গে এপারে ওপারে—ডাইনে বাঁয়ে—আন্দাজ শ' খানেক শেয়াল একসঙ্গে সাড়া তুলল—হুয়া—হুয়া—কেইসে হুয়া?

যেন আমাদের ঠাট্টা করছে!

—ওরে বাবা রে—

যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথ দিয়েই নিতাই প্রাণপণে ছুট লাগাল—আমরাও পেছনে পেছনে। আর চারদিক থেকে শেয়ালরা সকলে বলতে লাগল: মজা হুয়া—আচ্ছা হুয়া—হুয়া-হুয়া—

এর মধ্যে আবার ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল।

গর্তে পা পড়ে নিতাই ধপাত করে একটা আছাড় খেল, তার ওপর উবুর হয়ে পড়ল নেপাল এবং সেই সঙ্গে আমাকেও টেনে নামাল। পাঁচ মিনিট জলকাদায় জড়াজড়ি করে যখন উঠে দাঁড়ালুম, তখন নিতাইয়ের সিল্কের পাঞ্জাবির আধখানা আমার হাতে আর আমার সাদা জুতোটার একটা পাটি কোথাও খুঁজে পেলুম না।

কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েই নিতাই আবার বসে পড়ল।

—কী হল রে?

—পা মচকে গেছে—হাঁটতে পারছি না আর। ওফ্‌!

বৃষ্টিটা যেমন হঠাৎ এসেছিল—তেমনি ছেড়ে গেল। মাঝখান থেকে আমাদের দুঃখের বোঝাটা বাড়িয়ে গেল খানিকটা। আর আমরা সেই জঙ্গলের ভেতরে, জলকাদায় বসে পনেরো মিনিট ধরে নিতাইয়ের পা দলাই-মলাই করতে লাগলুম।

নিতাই শেষ পর্যন্ত আমাদের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে পড়ল। তারপর হাঁটতে লাগল নেংচে-নেংচে।

—এই ন্যাপলাটার বুদ্ধিতে পড়েই—

নেপাল ফোঁস করে উঠল: আমি কী করব? সেই ভদ্রলোক যেমন বলেছিলেন—

—ভদ্রলোক!—নিতাই বিকট রকম মুখ ভ্যাংচাল: একটা মিথ্যেবাদী—লায়ার—জোচ্চোর—

আরো কী সব গাল দিতে চাচ্ছিল, হঠাৎ কোত্থেকে তিন-চারটে টর্চের আলো পড়ল আমাদের গায়ে। দেখি আট-দশ জন লোক—হাতে তাদের লাঠি আর বল্লম।

কী সর্বনাশ—ডাকাত নাকি?

—কারা আপনারা?—কড়া গলায় কে জানতে চাইল।

—আমরা—আমরা—বিদেশী লোক!—আমি হাউমাউ করে বললুম: আমরা বরযাত্রী—কলকাতা থেকে আসছি—হরিশপুর কদমতলায় যাব! আমাদের—

—বরযাত্রী! হরিশপুর কদমতলা!—লোকগুলো একসঙ্গে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল: তা বেশ—গল্পটা শুনতে ভালোই। চলুন, আপনাদের অভ্যর্থনা করতেই আমরা এসেছি। বিয়ে-বাড়িতেই নিয়ে যাব।

—তার মানে?—অভ্যর্থনাটা ঠিক সুবিধামত মনে হল না।

—আমরা গ্রামের ডিফেন্স পার্টি। তিনজন বিদেশী লোক এই দুর্যোগের রাতে শ্মশানের জঙ্গলে কেন ঘুরছিলেন তার একটা ভালো কৈফিয়ত দিতে হবে। থানায় চলুন—

—থানা!—নেপাল হাহাকার করে উঠল: বরযাত্রীকে থানায় নেবেন মানে?

—কারণ, থানাই তাদের জায়গা। আর একটাও কথা নয়, চলুন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অগত্যা থানাতেই টেনে নিয়ে গেল।

খরিশপুরের দারোগা আমাদের কাহিনী শুনে হেসেই অস্থির।

—আহা, হরিশপুর কদমতলার বরযাত্রী না হলে পাঁচ মাইল উজিয়ে খরিশপুরে কেন আসবে? হরিশপুর স্টেশনের পাশেই কদমতলা—সেসব ফেলে খরিশপুরের শ্মশানে না গেলে বরযাত্রী কিসের?—তারপর চোখ কটমট করে বললেন, ছোরা-বোমা-সিঁদকাঠি এসব কোথায়?

—খবরদার, ভদ্রলোককে অপমান করবেন না।—আমরা প্রতিবাদ করলুম।

—ভদ্রলোক!—দারোগা নাকটা শিকেয় তুললেন: এরকম ক'জন ভদ্রলোককে তিন মাসেই আমরা চালান করেছি। তাদের জেল হয়ে গেছে। তোমরাও থাকো আজ হাজতে। কাল সকালে তোমাদের ওস্তাদি আমি দেখে নেব!

—দয়া করে যদি হরিশপুরে জগদীশ চক্রবর্তীর বাড়িতে একটা খবর পাঠান—

—দেখা যাবে কাল—বলে দারোগা সোজা আমাদের হাজতে চালান করলেন।

সারা রাত ভিজে কাপড়-জামায়, ক্ষিদেয়, লজ্জায় আর ভয়ে আমাদের কি ভাবে যে কাটল, তা বোধ হয় না বললেও চলে। নিতাই একটা কুটকুটে কম্বল মুড়ি দিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকল, নেপাল দু' হাতে মুখ ঢেকে কুঁইকুঁই করে একটানা কেঁদে চলল আর আমি সারা রাত ধরে হাজারখানেক মশা মারলুম।

সকালে উঠে তিনজনে জড়াজড়ি করে বসে আছি আর ভাবছি এর পরে কপালে কী আছে—এমন সময়—হাজতের দরজা খুলে দারোগা, বিষ্টুপদ আর—

আর সেই ভদ্রলোক! সেই মুখুজ্জেমশাই—সেই গোলগাল লোকটি, পাকা আমের মত চেহারা, কাঁচা-পাকা গোঁফ—যিনি আমাদের হরিশপুর কদমতলার সোজা রাস্তাটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

আমরা তিনজনে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম: এই যে জোচ্চোর—মিথ্যাবাদী—পাষণ্ড—ভণ্ড—

বিষ্টুপদ বললে, আরে আরে, কাকে কী বলছিস! উনি যে আমার খুড়শ্বশুর হন সম্পর্কে! সকালে চৌকিদার গিয়ে খবর দিতে উনিই ত আমাকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এলেন! আর চেহারার বর্ণনা দিয়ে বললেন, এই রকম তিনজন লোক কাল সন্ধ্যের ট্রেনে বলাবলি করছিল তারা হরিশপুর বরযাত্রী যাচ্ছে। আর তাতেই ত আঁচ করলুম, তোরা ভুল করে—

আমরা আবার চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম—ভদ্রলোক একগাল হাসলেন। একেবারে নির্লিপ্ত অহিংস হাসি।

—বরযাত্রীদের নিয়ে একটু রসিকতা করেছিলুম মশাই, তারপর উলটো ট্রেনটায় হরিশপুরে চলে এসেছিলুম। ভেবেছিলুম, একটু বাদে আপনারাও এসে যাবেন। কিন্তু এ ভাবে হাজতবাস করতে হবে সেটা ভাবিনি। এখন দয়া করে হরিশপুরে চলুন, চা-জলখাবার—গরম পোলাও-মাংস সব তৈরী।

কিন্তু সে মাংস-পোলাওয়ের আকর্ষণে আমরা আর হরিশপুরে যাইনি। সোজা কলকাতায় ফিরে এসেছিলুম। আর হরিশপুরে বিয়ে করার জন্যে বিষ্টুপদর সঙ্গে আমাদের চিরকালের মত বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। ওকেও কি বিশ্বাস আছে আর? সেই কালান্তক শ্বশুরবাড়ি থেকে কোন্ মারাত্মক রসিকতা আমদানি করে আমাদের একদম ফাঁসিয়ে দেবে—কে জানে!

১৩৬৮

www.BanglaBook.org

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পত্তি সমর্পণ

নাট্যীকরণ। ক্ষিতীশ রায়

প্রথম দৃশ্য

[পল্লীগ্রামের দুপুরবেলা। দূরের মাঠে ঘুঘু ডাকছে ঘু-ঘু। আমবাগানে হৈ-হল্লা করে ছেলের দল ডাংগুলি খেলছে। পাঠশালার হারু পণ্ডিত মধ্যাহ্নভোজনের পর দাওয়ায় বসে তামাক-সেবনে রত। ভশ্চাজ্জিমশাই ভিনগাঁ থেকে যজমানির উদ্দেশ্যে এ গাঁয়ে এসেছেন। প্রাতে গ্রামপরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন। আহারাদি সেরে এসেছেন পণ্ডিতের বাড়ি আড্ডা দিতে। গুড়ুক গুড়ুক শব্দ, মধ্যে মধ্যে কথোপকথন।]

হারু। আসতে আজ্ঞা হোক ভশ্চাজ্জিমশাই। একটু তামাক ইচ্ছে করুন। তারপর? একবার সব ঘুরে দেখে এসেছেন তো? কেমন লাগল আমাদের গাঁ?

ভশ্চাজ্জি। তা মন্দ কী, পণ্ডিতমশাই। বর্ধিষ্ণু গ্রাম। দু-চারটে কোঠাবাড়িও নজরে পড়ল। সব চেয়ে বড় বাড়িটার দেখলাম ভারি জীর্ণদশা। পাশের শিবমন্দিরের চুড়োর ফাটল থেকে অশত্থ গাছ বেরিয়েছে। অথচ উঠনে দেখলাম আট-দশটা ধানের মড়াই।

হারু। বুঝেছি, সে হল আমাদের যজ্ঞনাশ কুণ্ডুর বাড়ি। ধানের গোলা তো সামান্য ব্যাপার। গঞ্জে ওর প্রকাণ্ড পাটের আড়ত।

ভশ্চাজ্জি। যজ্ঞনাশ? ভারি অদ্ভুত নাম তো?

হারু। মানুষটাও অদ্ভুত। আসলে ওর নাম যজ্ঞনাথ কুণ্ডু। বংশানুক্রমে ওদের পাটের ব্যবসা। ওর ঠাকুর্দা প্রাণকেষ্ট কুণ্ডুর আমলের ওই মন্দির ও দালান। অত বিষয়সম্পত্তি, কিন্তু যজ্ঞনাথ গত হলে ওর বংশে বাতি দেবার আর কেউ থাকবে না।

ভশ্চাজ্জি। কারণ?

হারু। তবে শুনুন বলি। সে আজ প্রায় বছর আষ্টেক আগের কথা। যজ্ঞনাথের ছেলে বিন্দেবন বাপের ওপর রাগ করে সেই যে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেছে, তার আর কোনো উদ্দেশ নেই। মা-মরা একটা ছেলে ছিল বছর দুত্তিনের—তাকে সুদ্ধু নিয়ে গেছে।

ভশ্চাজ্জি। খুব আশ্চর্য ব্যাপার বলতে হবে। অমন বাড়ি, এত বিষয়-আশয়—সব ছেড়ে চলে গেল?

হারু। গেল কি আর সাধে, ভশ্চাজ্জিমশাই, জ্বালায় জ্বালাতন হয়ে বাধ্য হয়ে বাড়ি ছাড়তে হল। কুণ্ডু মানুষটা হাড়কঞ্জুষ—হাত দিয়ে জল গলে না, পয়সা তো দূরের কথা। বিন্দেবনের স্ত্রীর হয়েছিল গুরুতর ব্যামো। কোবরেজ দিয়েছিল স্বর্ণসিন্দুর মকরধ্বজের ব্যবস্থা। যজ্ঞনাথ পত্রপাঠ কোবরেজকে বিদেয় করে দিয়ে বললে লোকটা নাকি আনাড়ী।

ভশ্চাজ্জি। তারপর?

হারু। তারপর বিন্দেবন হাতে পায়ে ধরল, রাগারাগি করল, কিন্তু কোনো ফল হল না। বৌ মরে গেলে পর বাপকে স্ত্রীহত্যাকারী বলে গালাগাল দিল। যজ্ঞনাথের অকাট্য যুক্তি; বললে, "কেন, ওষুধ খেয়ে কেউ মরে না? দামী ওষুধ খেয়ে যদি বাঁচত তবে রাজাবাদশারা মরে কোন্ দুঃখে? যেমন করে তোর মা মরেছে, তোর স্ত্রী কি তার চেয়ে বেশি ধুম করে মরবে?"

ভশ্চাজ্জি। কী হল তারপর?

হারু। বিন্দেবন তো মহা রেগে বাপকে বলল, "আমি এখনি চললুম।" যজ্ঞনাথ ততোধিক রেগে ছেলেকে গালমন্দ করে বলল, "বেটা অকৃতজ্ঞ, ছেলেবেলা থেকে তোকে খাওয়াতে পরাতে যে খরচ হয়েছে তা শোধ দেবার নাম নেই, আবার তেজ দেখ-না?"

ভশ্চাজ্জি। তো গাঁয়ের লোক চুপ করে রইল? বাপছেলের এই ঝগড়া মিটিয়ে দিতে কেউ এগিয়ে এল না?

হারু। যায়নি আবার? গাঁয়ের মাথামুরুব্বি যাঁরা ছিলেন, সবাই সেখানে হাজির। মথুর সা বলল, "সামান্য একটা বৌয়ের জন্যে বাপের সঙ্গে ঝগড়া—কেবল একালেই সম্ভব। বৌ গেলে আজ হোক কাল হোক আর একটা বৌ যোগাড় করা চলে কিন্তু বাপ গেলে তো দোসরা বাপ মাথামুড় খুঁড়লেও মিলবে না!"

ভশ্চাজ্জি। পাকা যুক্তি। তা বৃন্দবন কী বলল?

হারু। সে কি আর বাগ মানে? রক্ত গরম, জোয়ান বয়স!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে এল। বাপ বলল বৃন্দাবনকে যদি এক পয়সা দেয় সে যেন গোরক্তপাতের তুল্য হয়। ছেলেও গাঁয়ের লোকের সামনে বলে দিল বাপের টাকা নিলে সে যেন মাতৃরক্তপাতের পাতক হয়। ব্যস, বাপেতে ছেলেতে সেই থেকে ছাড়াছাড়ি।

ভশ্চাজ্জি। কোথায় গেল বৃন্দাবন?

হারু। কে আর সে খবর রাখে। সে তো আর আজকের ব্যাপার নয়। আট বছর আগেকার কথা।

ভশ্চাজ্জি। ওই প্রকাণ্ড বাড়ি, এত বিষয়সম্পত্তি! বুড়ো একা একা থাকে কী করে?

হারু। যক্ষের ধন আগলে বসে আছে। মনে মনে এখনও আশা, ছেলে না আসুক, নাতি একদিন হয়ত ফিরে আসবে। গোলোককে বুড়ো ভারি ভালবাসত। অবশ্য কু-লোকে বলে ছেলেমানুষ—খাওয়াপরার খরচটা কম হত বলেই গোলোকের প্রতি মায়া।

ভশ্চাজ্জি। লোকটার সময় কাটে কী করে? সাতকুলে কেউ নেই, টাকা নিয়ে কী হবে ওর?

হারু। সময় কি আর কাটে ভশ্চাজ্জিমশাই? এই দেখুন না—আহার সেরে আমরা দিব্যি বসে বসে গল্প করছি, আর ওই দেখুন—বুড়ো আমবাগানের দিকে চলেছে। ওকে দেখলেই ছেলেরা খেলা ছেড়ে পালায়, নানারকম ঠাট্টাতামাশা করে; তবু ছেলেদের খেলার জায়গায় ওর যেন না গেলে নয়।

[যজ্ঞনাথ চটি পায়ে চলেছে। পেছনে ছেলের দল উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাচ্ছে:]

যজ্ঞনাথের যজ্ঞনাশ
চামচিকের সর্বনাশ।

ভশ্চাজ্জি। যেন লক্ষ্মীপেঁচার পেছনে কাক লেগেছে। এবার চলি পণ্ডিতমশাই। আমার আবার দিবানিদ্রার অভ্যেস।

হারু। আজ্ঞে নিতান্তই উঠবেন। আমিও উঠি (হাই তুলে তুড়ি দিয়ে) আমারও যেন কিঞ্চিৎ নিচাকর্ষণ হচ্ছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ছেলেদের চেঁচামেচি যেন এগিয়ে এল:]

যজ্ঞনাথের যজ্ঞনাশ
চামচিকের সর্বনাশ।

যজ্ঞনাথ। হতভাগার দল। পালিয়ে গিয়ে ভারি বীরত্ব করা হচ্ছে। হাতের কাছে পেলে দেখিয়ে দিতাম মজা।

ছেলের দল। ও নেতাই, পালিয়ে আয় রে। বুড়ো খেপে গেলে রক্ষে নেই। ধরে ছাতাপেটা করে দেবে।

যজ্ঞনাথ। নেতাইটা আবার কেডা? এ গাঁয়ে তো নেতাই বলে

কেউ নেই। ওরে, ও ছিদেম, নেতাই কে রে? চোখে আবার ছাই ভালো দেখতেও পাইনে।

ছিদাম। (দূর থেকে) নেতাই আমাদের নতুন খেলুড়ে। ও-পারের কোন্ গাঁয়ে ওদের বাড়ি। ঝগড়া করে পালিয়ে এসেছে।

যজ্ঞনাথ। হুঁঃ। বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো ছেলে। আসুক একবার আমার কাছে, ছাতা-পেটা করে শেষ করে দেব।

ছেলের দল। ও নেতাই, যাসনে, পালিয়ে আয়।

নিতাই। কোথাকার চামচিকে, তার ভয়ে পালাব। দেখ-না কী মজা করি। পেছন থেকে গিয়ে ওর কাঁধের গামছাটা তুলে আনব।

ছেলের দল। পারবি তুই?

নিতাই। দেখে নিস। তোরা আচ্ছা করে চেঁচা।—বুড়োকে দেখিয়ে দে। আমি পেছন থেকে গিয়ে টুপ্ করে গামছাটা তুলে নেব।

ছেলের দল। যজ্ঞনাথের যজ্ঞনাশ
চামচিকের সর্বনাশ।

যজ্ঞনাথ। তবে রে হতভাগার দল। ধরতে পারি তো আস্ত রাখব না।

[নিতাই বুড়োর কাঁধ থেকে গামছাটা তুলে নিল।]

ছেলের দল। কার কী হারিয়েচে
মদনমোহন পালিয়েচে।

[ক্লান্ত ঘর্মাক্ত যজ্ঞনাথ আমগাছের তলায় বসে পড়েছে। ঘাম মুছতে গিয়ে দেখে কাঁধের গামছা অদৃশ্য।]

যজ্ঞনাথ। আমার গামছাটা কে নিল রে।

ছেলের দল। গামছা কোথায়, ও তো ছেঁড়া কানি।

যজ্ঞনাথ। ছেঁড়া কানি? ঠাট্টা পেয়েছ? এই সেদিন কিনেছি নতুন গামছা গঞ্জের হাট থেকে। নগদ সাড়ে পাঁচ আনা দাম। ফিরিয়ে দে বলছি। নয়তো এক্ষুনি তোদের পাঠশালার পণ্ডিতকে বলে দেব। সবাইকে নাড়ুগোপাল বানিয়ে দেবে।

ছেলের দল। ও নেতাই, দিয়েই দে-না বাপু। বুড়ো বিদেয় হলে আমরা গুপ্তধন খেলব।

যজ্ঞনাথ। (স্বগত) সর্বনাশ! ছোঁড়াগুলো আবার গুপ্তধনের সন্ধান পেল নাকি? তবে তো উঠতে হচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

(প্রকাশ্যে হ্যাঁ রে, গামছাটা দিবি, না যাব হারু পণ্ডিতের কাছে?

ছিদাম। ওই তো নেতাই তোমার গামছা দিয়ে পগ্‌গ বেঁধেছে। দিয়ে দে-না নেতাই?

ছেলের দল। ও নেতাই, বুড়োর কাছে যাস না। পালিয়ে আয়।

নিতাই। হ্যাঁ, খেয়েদেয়ে কাজ নেই। চামচিকের ভয়ে পালাব। এই নাও তোমার কানি।

যজ্ঞনাথ। কী বললি হতভাগা ছেলে? সাধে বাপ-মা বের করে দিয়েছে ঘর থেকে? দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা!

নিতাই। এই দাঁড়ালুম। দেখাও তোমার মজা।

যজ্ঞনাথ। এ যে দেখি কেউটের বাচ্চা! একরত্তি ছেলে, দেখ-না ওর বুকের পাটা। কে বটে হে তুমি ছোকরা, কোত্থেকে আসা হচ্ছে।

ছিদাম। সকালবেলা আজ এই আমতলায় ঘুরঘুর করছিল। মুখখানা শুকনো আর আদুল গা দেখে, পিসি ওকে বাড়ি নিয়ে এল। চানটান করে আমাদের বাড়িতেই একপেট খেয়ে নিল। বাব্বাঃ, সে কী খাওয়া! একেবারে গোগ্রাসে গেলা যাকে বলে।

নিতাই ভারি দুমুঠো খেতে দিয়েছিস তাই নিয়ে আবার বড়াই করা। তোদের বাড়ি খেতে আমার বয়ে গেছে।

ছিদাম। বাঃ, আমি কি তাই বলেছি!

ছেলেরা। ছিদেমদের বাড়ি যেতে হবে না তোকে, তুই আমাদের বাড়ি চ' নেতাই...।

যজ্ঞনাথ। অ, নেতাই দেখছি তোমাদের সবার পরম বন্ধু। কোথাকার হাভাতে ছেলে, এক দিনে তোদের সবাইকে তুক করে নিয়েছে।

ছিদাম। জান না তো, ডাংগুলিতে কেমন ওস্তাদ। আর এমনি হাতের টিপ, হোই মগডালে বসে ছিল একটা ঘুঘু পাখি; যেই না গুলতি ছোঁড়া, বাস, টুক করে মাটিতে পড়ে গেল।

ছেলেরা। ও আমাদের ওস্তাদ খেলুড়ে। ওকে না হলে জমবে না খেলা।

যজ্ঞনাথ। লেখাপড়ার নামে নিশ্চয় লবডঙ্কা। দাঁড়া, দিচ্ছি বলে তোদের পণ্ডিতকে। এই ছোঁড়া, তোর নাম কী রে?

নিতাই। আমার নাম শ্রীনিতাইচরণ পাল। খবরদার, ছোঁড়া-টোঁড়া বোলো না বলে দিচ্ছি।

যজ্ঞনাথ। হয়েছে। বিলক্ষণ, আমায় এসেছে কথা কওয়া শেখাতে। দেখাচ্ছি চালাকি। বাড়ি কোথায় তোর?

নিতাই। বলব না।

যজ্ঞনাথ। বাপের নাম?

নিতাই। বলব না।

যজ্ঞনাথ। বলবিনে কেন?

নিতাই। আমি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছি।

যজ্ঞনাথ। কেন পালিয়ে এসেছিস?

নিতাই। বাবা আমায় পাঠশালায় দিতে চায়।

যজ্ঞনাথ। মা নেই তোর?

নিতাই। আছে—সৎমা।

যজ্ঞনাথ। তোর বাপের দেখছি মতিভ্রম হয়েছে। নইলে এমন ডাংগুলির ওস্তাদকে পাঠশালাতে দিতে চায়। তা, এই গাঁয়ের ছোকরাগুলোর মাথা খেয়ে কী হবে। আজকের দিনটা থাকতে চাস তো আমার বাড়ি চ'। যাঃ, যাঃ, তোরা হাঁ করে কী শুনছিস হতভাগারা? তোদের যেতে বলছি না।

ছিদাম। নেতাইয়ের ওপর দেখি চামচিকের বড্ড মায়া।

ছেলেরা। যাসনে নেতাই, বুড়ো তোকে পেটভরে খেতেই দেবে না।

যজ্ঞনাথ। কত আমার প্রাণের বন্ধু রে! বুড়ো খেতে দেবে না! খেতে দেবে তুমি? এই বুড়োর কাছ থেকে ধার নিয়ে আন্ধেক গাঁয়ের সংসার চলছে। দেখ নিতাই, যাবি যদি চ' তাহলে।

নিতাই। পেট ভরে খেতে দেবে তো?

যজ্ঞনাথ। কী খেতে চাস তুই?

নিতাই। গরম গরম লুচি আর পটোল ভাজা আর খেজুর গুড়।

যজ্ঞনাথ। সে আর এমন কী? তাই খাবি'খন।

নিতাই। সন্ধে লাগতেই আমি কিন্তু ভিনগাঁয়ে চলে যাব। আমার পেছনে বাবা লোক লাগিয়েছে। পাঠশালায় আমি কিছুতে যাব না।

যজ্ঞনাথ। বেশ তো, তোর না পোষায় তুই থাকিসনে।

নিতাই। বেশ চলো।

ছিদাম। হল কী রে, বুড়োর এত মায়া। ভালমন্দ একটা কিছু ঘটবে না তো?

ছেলেরা। দেখিস, বুড়ো ওকেই হয়ত ওর সব সম্পত্তি দিয়ে যাবে। চল্ চল্। চামচিকে এসে আমাদের খেলা মাটি করে দিল।

তৃতীয় দৃশ্য

[নিতাই ভোজনরত]

যজ্ঞনাথ। দেখ নিতাই, কোথায় যাবি যাবি। রাত্তিরটা এখানেই থাক। আর কিছু খেতে চাস তো বল আনিয়ে দিই।

নেতাই। উহুঃ! যেতে হচ্ছে না। এখানে আমি বোকার মত বসে থাকি, আর বাবা এসে ধরে নিয়ে যাক আর কি!

যজ্ঞনাথ। আচ্ছা, ঘরে যেতে তোর এত অনিচ্ছা কেন রে নেতাই? কেউ মারধোর করে?

নিতাই। হ্যাঁ।

যজ্ঞনাথ। তোর বাবা?

নিতাই। বাবা তো কেবল পাঠশালা পাঠাতে চায়।

যজ্ঞনাথ। ও, তোর সৎমা তোকে বুঝি দেখতে পারে না? তোর নিজের মাকে মনে পড়ে রে?

নিতাই। নাঃ। আমি তো তখন খুব ছোট্ট।

যজ্ঞনাথ। ভাইবোন নেই?

নিতাই। নিজের ভাইবোন? না। বছরখানেক হল একটা ভাই হয়েছে। আমায় কোলে নিতে দেয় না। বাবার পকেট থেকে পয়সা নিয়ে লেবেনচুষ কিনে ভাইকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খেতে দিয়েছিলাম। চুষতে গিয়ে গলায় গেল আটকে। মা আমায় চেলাকাঠ দিয়ে মারল। বাবা এলে পর বলে দিল। বাবা বলল, পাঠশালায় দিলে ব্যাটা জব্দ থাকবে। তাই তো পালালাম।

যজ্ঞনাথ। বাপের নাম বলবিনি? কোন্ গাঁয়ে তোদের বাড়ি তাও বলবিনি?

নিতাই। উঁহুঃ। তুমি ধরিয়ে দাও আর কি! অত বোকা পাওনি। নাঃ, এবার আমি যাই...দেরি হয়ে যাচ্ছে...

যজ্ঞনাথ। আর যাবি কোথায়? দেখ নিতাই, এখানেই থেকে যা তুই। তোকে আমি এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখব, তোর বাপ কেন, কাকপক্ষীও জানতে পারবে না। তা ছাড়া বুঝলি নেতাই, আমার তো তিনকুলে কেউ নেই। আমার সমস্ত বিষয়-আশয় তোকেই দিয়ে যাব।

নিতাই। কোথায় লুকিয়ে রাখবে দেখিয়ে দাও তাহলে।

যজ্ঞনাথ। বোকা ছেলে, এখন দেখাতে গেলে লোকজানাজানি হয়ে যাবে। সন্ধ্যেটা লাগুক তারপর নিয়ে যাব। নে, তুই এখন একটু ঘুমো, আমি বরঞ্চ বাইরে থেকে ছেকলটা তুলে দিই।

নিতাই। বেশি দেরি কোরো না যেন। ওরা যেন ধরতে না পায়।

যজ্ঞনাথ। তুই নিশ্চিন্দি থাক। কেউ তোর খোঁজ পাবে না।

চতুর্থ দৃশ্য

[হাতপাখার শব্দ]

নিতাই। চলো।

যজ্ঞনাথ। সবুর কর। এখনো রাত হয়নি।

নিতাই। রাত তো হয়েছে।

যজ্ঞনাথ। পাড়ার লোক এখনও ঘুমোয়নি।

[নেপথ্যে পাহারাওয়ালার দূরাগত হাঁক।]

নিতাই। ঘুমিয়েছে তো—এখন চলো। আমারও ঘুম পাচ্ছে।

যজ্ঞনাথ। দাঁড়া একটু—এই এখনি বেরুব। হ্যাঁ রে নেতাই?

নিতাই। কী?

যজ্ঞনাথ। আমায় দাদা বলে ডাকবি? জানিস, আমার এক নাতি ছিল। বেঁচে যদি থেকে থাকে তো তোরই বয়সী হবে।

নিতাই। কোথায় গেল তোমার নাতি?

যজ্ঞনাথ। তুই যেমন তোর বাপকে ছেড়ে পালিয়ে এসেছিস আমার ছেলেটাও তেমনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করে পালিয়ে গেছে। সে অনেক বছর হল। সঙ্গে আমার নাতিটাকেও নিয়ে গেছে। আর বোধ হয় দেখা হবে না। সেই জন্যেই তো বিষয়-আশয় সব তোকেই দিয়ে দেব। আমার আর ক'দিন।

[শেয়ালের ডাক। কুকুরের ঘেউ ঘেউ।]

নিতাই। দাদা, আমার কেমন যেন ভয়-ভয় করছে।

যজ্ঞনাথ। ভয় কিসের রে। এই তো রয়েছি আমি তোর সঙ্গে। আচ্ছা, নে চল এবার। বেশি দূর নয়। পাশেই শিবমন্দির...

[চলার শব্দ]

নিতাই। ওঃ, এই তোমার লুকোবার জায়গা? বাড়ি থেকে পালিয়ে এরকম পোড়ো মন্দিরে আমি অনেক রাত কাটিয়েছি!...একটু খুঁজলেই তো ধরা পড়ে যাব।

যজ্ঞনাথ। (একখণ্ড পাথর তোলার শব্দ) চুপ চুপ, অত চেঁচাসনে। দেখ, তোকে লুকিয়ে রাখার জন্যে কী রকম মোক্ষম জায়গা বের করেছি।

নিতাই। (বিস্মিত ভাবে) ও দাদা, এ একেবারে ডাকাতি-গল্পের মত। সুড়ং দিয়ে মই নেবে গেছে—মাটির তলায় ঘর—তাতে আবার পিদিম জ্বলছে।

যজ্ঞনাথ। চুপ চুপ, চেঁচাসনে। আমার পেছন পেছন আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেবে আয়। নে, লণ্ঠনটা দে দেখি।

[যজ্ঞনাথের দ্রুত নিশ্বাস পড়ার শব্দ।
সিঁড়ি দিয়ে দুজনার নেবে যাবার শব্দ।]

নিতাই। পেতলের কলসিগুলো কিসের? আমার জন্যে নাড়ু রেখেছ নাকি ওতে?

যজ্ঞনাথ। (কণ্ঠহাসি) নাড়ু! হ্যাঁ, নাড়ুই বটে। যা একবার দেখে আয়—ঘড়ার মধ্যে কী রয়েছে।

নিতাই। (আঁজলা ভরতি টাকা ও মোহর ঝনঝন করে বেজে উঠল) ও দাদা, এ যে দেখি কেবল টাকা—রুপোর টাকা আর সোনার টাকা।

যজ্ঞনাথ। সোনার টাকা আবার কী রে? সোনার টাকাকেই বলে মোহর।

নিতাই। আচ্ছা, এই পিদিমের কাছে আসন পাতা কেন? সিঁদুর, চন্দন, ফুলের মালা...?

যজ্ঞনাথ। নিতাই, বলেছিলাম আমার সমস্ত টাকা তোর হাতে দেব। এই যে ঘড়াগুলো দেখছিস, এরই মধ্যে আমার সমস্ত বিষয়-আশয়। আজ থেকে সবই তোর।

নিতাই। সমস্ত? এর থেকে একটি টাকাও নেবে না তুমি?

যজ্ঞনাথ। যদি নিই তবে আমার হাতে যেন কুষ্ঠ হয়। তবে একটা কথা আছে, যদি কখনো আমার নিরুদ্দেশ নাতি গোকুলচন্দ্র, কিম্বা তার ছেলে কিম্বা নাতি কিম্বা তার বংশের কেউ যদি কখনও আসে তাহলে সমস্ত টাকা তাদের হাতে গুনে গুনে দিয়ে দিতে হবে।

নিতাই। কবে তোমার নাতি আসবে, আমি বুঝি তদ্দিন বসে বসে পাহারা দেব? দিতে চাও তো দাও, না চাও তো দিও না।

যজ্ঞনাথ। আহা চটছিস কেন তুই। তোকে দেবার জন্যেই তো এতশত আয়োজন। নে, এখন চুপটি করে এই আসনে বোস।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিতাই। কেন?

যজ্ঞনাথ। তোর পুজো হবে।

নিতাই। আমার পুজো আবার কেন?

যজ্ঞনাথ। এই রকম নিয়ম। বোস আসনে।

[যজ্ঞনাথ বিড়বিড় মন্ত্র পড়ছে—]

ওঁ কর্ত্তব্যোঽস্মিন শুভ সম্পত্তিমর্পণকর্মণি সিদ্ধির্ভবতু।
ওঁ অদ্য সৌরভাদ্রস্য কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ
রাত্রি সার্ধ একদণ্ডসময়ে প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ডবর্মণঃ
পৌত্রপরমানন্দ কুণ্ডবর্মণঃ পুত্রোঽহং যজ্ঞনাথ
কুণ্ডবর্মণ অত্র সর্বসুলক্ষণযুক্তঃ শ্রীমান্ নিতাইচরণ পাল
নাম্না অয়ং বালকং সম্পত্তিসংরক্ষণায় যক্ষত্ব বৃণামি॥

নিতাই। দাদা, আমার কিন্তু ভয় করছে।

[যজ্ঞনাথ নিরুত্তর—মন্ত্র পড়ে যেতে লাগল। একটা ঘড়া বহুকষ্টে টেনেহিঁচড়ে নিতাই-এর সামনে রাখল। উৎসর্গ করে তাকে দিয়ে বলিয়ে নিল:]

"যুধিষ্ঠির কুণ্ডের পুত্র গদাধর কুণ্ড তস্য পুত্র প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ড তস্য পুত্র পরমানন্দ কুণ্ড তস্য পুত্র যজ্ঞনাথ কুণ্ড তস্য পুত্র বৃন্দাবন কুণ্ড তস্য পুত্র গোকুলচন্দ্র কুণ্ডকে কিম্বা তাহার পুত্র অথবা পৌত্র অথবা প্রপৌত্রকে কিম্বা তাহার বংশের ন্যায্য উত্তরাধিকারীকে এই সমস্ত টাকা গণিয়া দিব।"

[বার বার তিনবার আবৃত্তি করার ফলে নিতাই হতবুদ্ধির মত হয়ে গেল, জিভ এল জড়িয়ে। সারাদিনের ক্লান্তিতে ঘুমও আসছে।]

নিতাই। দাদা, আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। আর আমায় মন্ত্র পড়তে বোলো না...

যজ্ঞনাথ। আর তোকে মন্ত্র পড়তে হবে না। আমি পিদিমটা নিবিয়ে দিই, তুই ওই আসনের ওপর শুয়ে পড়...।

[অন্ধকারে মনে হল যজ্ঞনাথ মই বেয়ে উঠছে।]

নিতাই। দাদা, যাও কোথায়? অন্ধকারে ভয় করছে।

যজ্ঞনাথ। আমি চললাম। তুই এখানে থাক। তোকে আর কেউ খুঁজে পাবে না। কিন্তু মনে রাখিস, যজ্ঞনাথের ছেলে বৃন্দাবন, আর বৃন্দাবনের ছেলে গোকুল।

[মই তুলে নেবার শব্দ।]

নিতাই। দাদা, আমার ভয় করছে। আমি বাবার কাছে যাব। দাদা, নিয়ে যাও আমায়। অন্ধকারে ভয় করছে। দাদা—দাদা...তুমি যে মই তুলে নিলে...

[পাথরচাপার শব্দ—রুদ্ধকণ্ঠে শোনা গেল—বাবার কাছে যাব—বাবা গো...। মেঝের ওপরে কোদালের শব্দ। বুড়ো পাথরের ফাঁকগুলো ভরবার জন্যে মাটি চাপাচ্ছে।]

যজ্ঞনাথ। ওই আবার ডাকছে নিতাই। চুপ কর—বাবা বাবা বলে আর ডাকতে হবে না রে।...বাবার ভয়ে পালিয়েছিস বাড়ি ছেড়ে, আবার বাবাকে ডাকা কেন? তোর খোঁজে এলে শুনতে পাবে—ধরে নিয়ে যাবে। ঘুম পাচ্ছে, ঘুমো না রে বাপু...

[কোদাল দিয়ে মাটি চাপা দেবার শব্দ।]

যজ্ঞনাথের ছেলে বিন্দেবন, বিন্দেবনের ছেলে গোকুল—মনে রাখিস নেতাই...। আর ডাকিসনে বাবা বাবা বলে।...

পঞ্চম দৃশ্য

[কড়া নাড়ার শব্দ। দু-একটা ভোরের পাখি ডাকছে।]

বৃন্দাবন। কড়া নেড়ে কী দরকার হারুদা, দেখছ-না সদর দরজা হাট করে খোলা।

হারু। তাই তো, তোর রাত্তিরে ঠাহর করতে পারিনি। রাত থাকতে কুন্ডু খুড়ো গেল কোথায়! তুই একটু দাঁড়া, আমি বরং দেখে আসি।

বৃন্দাবন। তাই ভাল। আমি এ-বাড়ির চৌকাঠ মাড়াচ্ছিনে। খুড়োকে বলো নিতাই পালের বাবা এসেছে—দামোদর পাল, ছেলে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

হারু। বিন্দে! এই এদ্দিন পর এলি। বাপের সঙ্গে একবার দেখা করবিনি!

বৃন্দাবন। ওসব কথা বাদ দাও, হারুদা। গ্রাম ছেড়ে যেদিন গেছি সেদিন থেকে বাপ আমার নেই। হুঃ বাবা...

যজ্ঞনাথ। (ভেতর থেকে ভয়-ধরা গলায়) ও কে? কে ও? কে যেন বাবা বলে ডাকল।

হারু। (তাড়াতাড়ি চলার শব্দ) কেউ না কুন্ডু খুড়ো, আমি হারু—এ কী, আপনি বৈঠকখানা ঘরে শুয়ে রয়েছেন যে। সদর দরজা খোলা, এক-পা কাদা—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শরীর খারাপ হয়নি তো?

যজ্ঞনাথ। নাঃ। এমনি। শরীর খারাপ হতে যাবে কেন? তা এই সকালে...অসময়ে...?

হারু। আর বলেন কেন? ঘুমোতে আর দিলে কোথায়? ভোর রাত্তিরে দরজায় ধাক্কা। ছিদেমকে বললুম দেখ তো রে ছিদাম। ও বললে ভয় লাগছে। দরজা খুলে দেখি নেতাইয়ের বাপ—আমাদের বিন্দেবন... এই যাঃ, জিব ফসকে বেরিয়ে পড়ল!

যজ্ঞনাথ। বিন্দেবন? নেতাইয়ের বাবা...? এ-সব কী বকছ হারু পণ্ডিত? ও যে বললে ওর নাম নিতাইচরণ পাল!

হারু। তা দেখুন কুণ্ডু খুড়ো, বামুনের ছেলে ভোরবেলা বাসিমুখে কি আর মিথ্যে কথা বের হয়! ঠিকই বলেছি—নেতাই বিন্দেরই ছেলে। বিন্দে ঘর ছেড়ে গিয়ে নতুন নাম নিয়েছে। এখন ওর নাম দামোদর পাল। ছিদেম বললে নিতাই নাকি তোমার সঙ্গে চলে এসেছে, সেই আমতলা থেকে। বিন্দের আর সবুর সইল না, বলল বুড়োর ওখান থেকে ছেলে-টাকে উদ্ধার করে এনে দাও। শুনুন একবার কথা! ভাগ্যগতিকে গোকুল যদি তার ঠাকুন্দার কাছে এসেই পড়ে থাকে—তা নিয়ে এত হামলা করা কেন বাপু! পথে বসে তো নেই...

যজ্ঞনাথ। ও ছেলে গোকুল হতে যাবে কেন। ও তো নেতাই। কিছুতেই থাকতে চাইল না—সন্ধে লাগতে না-লাগতে চলে গেল।

বৃন্দাবন। (বাইরে থেকে) হারুদা, বলে দাও, গোকুলেরই এখনকার নাম নিতাই; আমার নাম যেমন দামোদর পাল। কাছাকাছি দশ-বিশটে গাঁয়ে বাপের নামের যা সুখ্যাতি, ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েই নাম বদলে নিয়েছি। নইলে কেউ আমাদের নাম উচ্চারণ করত না।...জিগেস করে দেখো তো নিতাই কোনদিক পানে গেল?

যজ্ঞনাথ। বিন্দে, নেতাই সত্যি গোকুল তাহলে.....

[অচেতন হয়ে পড়ে যাবার শব্দ।]

হারু। হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কি বিন্দে! কুণ্ডু খুড়ো অজ্ঞান হয়ে গেছেন। যা, শীগগির এক বালতি জল নিয়ে আয়।

[চোখেমুখে জল ছিটিয়ে দেবার শব্দ। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এল।]

হারু। বিন্দেবন, নাড়ী খুব দুর্বল। এ যাত্রা টিকবে কিনা সন্দেহ। আচমকা ছেলেকে দেখে ভিরমি লেগেছে।

যজ্ঞনাথ। যজ্ঞনাথ কুণ্ডু, তস্য পুত্র বৃন্দাবন কুণ্ডু, তস্য পুত্র গোকুলচন্দ্র কুণ্ডু।...নেতাই...নেতাই। আর বাবা বলে চেঁচাসনি, শুনতে পেলে ধরে নিয়ে যাবে।...বিন্দেবন...

বৃন্দাবন। বাবা!

যজ্ঞনাথ। কান্না শুনতে পাচ্ছিস?

বৃন্দাবন। কার কান্না? নাঃ—কই...

যজ্ঞনাথ। কান পেতে শোন দেখি, কেউ 'বাবা' বলে ডাকছে কিনা...?

হারু। ভুল বকছে। আর দেখছি...

বৃন্দাবন। ডাকতে যাব কোবরেজ-কে?

হারু। মিথ্যে ডাকা...সময় কই?

যজ্ঞনাথ। (বিকারের বেগে হঠাৎ উঠে বসল) পিদিম নিবে গেল যে—অন্ধকারে ভয় করছে...আমার মইটা কে উঠিয়ে নিলো...নেতাই...নেতাই...

[ধুপ্ করে শব্দ হল। দৃশ্য শেষ।]

১৩৬৮

www.BanglaBook.org

সদানন্দ স্বদেশলাল

সুবিমল রায়

১২ বছরের ছেলে স্বদেশলাল সেন তার গ্রামের স্কুল ছেড়ে কলকাতার এক স্কুলে এসে ভর্তি হল। কয়েকদিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে তার বেশ বুদ্ধি আছে আর স্বভাবও বেশ সরল, তবে চাল-চলন একটু অদ্ভুত ধরনের। সে স্কুলে নতুন নতুন রকমের টিফিন সঙ্গে নিয়ে আসত। পুদিনার আচার দিয়ে সিঙাড়া খেতে ভালোবাসত। একদিন হয়ত চিঁড়েভাজা আর মানকচুর বড়া দিয়েই টিফিন হল, আবার মধ্যে মধ্যে টিফিনে চন্দ্রপুলি দিয়ে পাঁউরুটি খেত। কয়েকদিন পাঁপরভাজা দিয়ে ছানার ডালনা বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেতে দেখা গিয়েছিল। যেদিন আমসত্ত্ব দিয়ে ধোঁকা খেত, সেদিন তার বেশ ফুর্তি দেখা যেত।

পড়াশোনায় সে ভালোই ছিল। গায়ে বেশ জোর, রং ফরসা, কপাল চওড়া, চোখে-মুখে একটা অস্পষ্ট হাসি-হাসি ভাব। খেলাধুলোয় স্বদেশলালের উৎসাহ ছিল।

একদিন স্কুল ছুটি হয়ে গেলে ভয়ানক বৃষ্টি পড়তে লাগল। কেউ বাড়ি যেতে পারছে না। তখন একজন মাস্টারমশাই ছেলে-দের বললেন, 'তোমরা কেউ একটা গল্প বলো ; সকলে শুনুক।'

অন্য ছেলেরা যখন গল্প ভাবছে তখন স্বদেশলাল বলে উঠল, 'আমার মামা একবার একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই গল্প শোনাব ?'

সকলেই শুনতে চাইল। স্বদেশ তখন বলে যেতে লাগল, 'আমার মামা একবার স্বপ্ন দেখলেন যে কলকাতায় একদল তেজী-তেজী খেলোয়াড় এসেছে, তাদের সঙ্গে মোহনবাগান দলের ফুটবল ম্যাচ হবে। সেদিন ট্রাম বন্ধ ছিল, তাই বাস-গুলোতে এত লোক হয়েছিল যে মামা কিছুতেই বাস ধরতে পারলেন না। ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ি, রিকশা, সব ভাড়া হয়ে গিয়েছিল। মামা মুশকিলে পড়লেন। মামার এক বন্ধু পালকি ভাড়া করে গড়ের মাঠে ম্যাচ দেখতে চললেন, কিন্তু মামার সেটা পছন্দ হল না।

'মামার বাড়ির একটু দূরেই গঙ্গা। তাঁর শখ হল যে তিনি নৌকোয় উঠে গড়ের মাঠের কাছাকাছি একটা ঘাটে নামবেন, আর সেখান থেকে হেঁটে মাঠে খেলা দেখতে যাবেন।

'তিনি গঙ্গার ঘাটে গিয়ে এক ভয়ানক অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পেলেন। দেখলেন, একটা বাচ্চা তিমি সেখানে সাঁতার কাটছে আর মধ্যে মধ্যে তীরে নাক ঠেকাচ্ছে। কোথা থেকে কেমন করে সেটা এল তা কেউ জানে না। সকলে হাঁ করে দেখছে। ছোট্ট তিমিটার চেহারা বড়ই শান্ত আর আহ্লাদে, দেখলেই আদর করতে ইচ্ছা করে। মামাকে দেখে সেটা এত খুশী হল যে মামা ছুটে গিয়ে সামনের দোকান থেকে পাঁউরুটি কিনে আনলেন আর তিমির বাচ্চাকে রুটির টুকরো খাওয়াতে লাগলেন। তীরে মুখ উঠিয়ে সেটা খেতে লাগল।

'স্বপ্নের মধ্যে মামার একটা দারুণ বুদ্ধি এসে গেল। তিনি ঠিক করলেন যে ঐ তিমির পিঠে উঠে গঙ্গা বেয়ে গড়ের মাঠের কাছাকাছি একটা জায়গায় তীরে নেমে, হেঁটে খেলার মাঠে যাবেন। তিনি একটা বাঁশের ডগায় একটা পাঁউরুটি বাঁধলেন আর জলের ধারে কিছু খাবার ছড়িয়ে দিলেন। তিমির বাচ্চাটা যখন তীরে মাথা উঠিয়ে সেই খাবার খাচ্ছে, মামা তখন বাঁশটা হাতে নিয়ে সাবধানে তিমির পিঠে উঠে বসলেন আর বাঁশের ডগার রুটিটা তিমির নাকের সামনে এগিয়ে রেখে বাঁশটাকে আস্তে আস্তে দক্ষিণ দিকে ফিরিয়ে ধরে রাখলেন, যেদিকে গেলে গড়ের মাঠের কাছাকাছি যাওয়া যাবে। তিমিটা সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ দিকে ফিরে রুটি ধরবার জন্য এগিয়ে যেতে লাগল, কিন্তু রুটিও সঙ্গে সঙ্গে তিমিটার সামনে সামনে ছুটে চলেছে। গড়ের মাঠের কাছে এসে মামা বাঁশের ডগার রুটিটা আস্তে আস্তে তীরের দিকে ফেরালেন, আর তিমিও রুটির পিছনে ছুটে ছুটে তীরে পৌঁছে গেল। ডাঙায় তখন কী ভিড়, কী ভিড়, কী ভিড়! মামার সেদিকে খেয়াল নেই! তিনি তীরে নেমেই গড়ের মাঠের দিকে ছুটলেন।

'মাঠে গিয়েই তিনি একটা গাছের তলায় একটা উঁচু ঢিপির উপরে দাঁড়ালেন। খেলা আরম্ভ হল। একদল লম্বা-লম্বা তেজী-তেজী মানুষ মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছে আর খেলতে খেলতে ঝটপটাপট বল বাজিয়ে শুন্যে এয়া উঁচু-উঁচু লাফ দিচ্ছে। তা দেখে সকলের ত চক্ষুস্থির! পনেরো মিনিটের মধ্যেই সেই আলখাল্লা লোকেরা মোহনবাগানকে তিনটা গোল খাওয়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু তিনবারই ফুটবলটা গোলপোস্টের অনেক উপর দিয়ে উড়ে গেল আর অনেক দূরে গিয়ে পড়ল। সেই আখাম্বা লম্বা খেলোয়াড়দের লম্ফঝম্ফ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, তাদের সাতরঙা পোশাক রোদে ঝলমল করছে।

এর মধ্যে এক অদ্ভুত কাণ্ড হল। নতুন দলের লোকগুলো যখন মহাতেজে হাই জাম্প দিতে দিতে এগিয়ে আসছে তখন মোহনবাগানের একটি বেঁটে লোক তাদের তলা দিয়ে পাঁই পাঁই করে এগিয়ে গিয়ে একটা গোল দিয়ে দিল। তখন চারদিকে যা হাততালি! "গোল" "গোল" বলে যা চিৎকার!

'মামা হতভম্ব হয়ে সব দেখছেন। হঠাৎ তাঁর পাশের গাছ থেকে এক বুড়ো-গোছের মানুষ তাঁর কাঁধের উপরে নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে মামা "আরে, আরে, আরে, আরে ধ্যাত্তারি" বলে ঢিপির উপরে বসে পড়লেন। বুড়োমানুষটি খুব বিনয়ের সঙ্গে ক্ষমা চেয়ে বলতে লাগল, "বাবুমশাই, আমি কলকাতার একজন

www.BanglaBook.org

খুব নামজাদা বাঁদরওয়ালা, বাঁদর নাচিয়ে বেড়াই। খেলা দেখতে এসেছিলাম। ওধারের গাছটায় বাংলাদেশের একজন মন্ত্রীমশাই উঠেছেন, তাই ওটাতে উঠিনি, আপনার পাশের গাছেই উঠেছিলাম। বুড়োমানুষ, বেশীক্ষণ গাছে বসে থাকতে পারি না, তাই আমার বাঁদরটাকে সঙ্গে এনেছিলাম। ওটা পিছন থেকে আমার জামা টেনে ধরে রেখেছিল, যাতে হঠাৎ আছাড় না খাই। সকলকে হাততালি দিতে দেখে বাঁদরটা আমার জামা ছেড়ে দিয়ে তালি দিতে লেগেছে, তাই শরীরটাকে সামলাতে না পেরে গাছের ডালে ঝুলতে ঝুলতে আপনার কাঁধে নেমে পড়েছিলাম।" মামা উঠে দাঁড়ালেন।

'বাঁদরওয়ালা জিজ্ঞাসা করল, "বাবুমশাই, ঐ ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা লোকেরা কারা?" মামা বললেন, "ওদের বলা হয় বিক্রমাদিত্য ক্লাবের দল; জঙ্গীপাড়ার কাছে ধোলাইগঞ্জে থাকে। ওদের জংলী জংলী চেহারা বটে, কিন্তু ওরা বড় সোজা আর আমুদে মানুষ। দেখতেই পাচ্ছ, মোহনবাগানের কাছে গোল খেয়েও ওরা কেমন ঝটপটাপট ঝটপটাপট ঝটপটাপট বগল বাজাচ্ছে!" তিনবার চেঁচিয়ে "ঝটপটাপট" বলার ধাক্কায় মামার এমন স্বপ্নটা একেবারে ভেঙে গেল।'

ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। স্বদেশলালের মামার স্বপ্নটার কথা ভাবতে ভাবতে ছাত্রেরা মহানন্দে ঝটপটাপট বগল বাজাতে বাজাতে বাড়ির দিকে রওনা হল।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, স্বদেশের বুদ্ধি বাড়তে থাকে আর শরীর লম্বা হতে থাকে, কিন্তু তার জলযোগ আগে যেমন অদ্ভুত ধরনের ছিল তেমনি রয়ে গেল। সে একটু গম্ভীর হয়ে এল, গল্পটল্প কমিয়ে দিল। শোনা যেত, সে কয়েক রকম জিনিস নিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত পরীক্ষা চালিয়ে দেখছে।

একদিন তার এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করল, 'তুই আজকাল ক্রমেই চুপচাপ হয়ে আসছিস কেন?' স্বদেশ উত্তর দিল, 'স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়ে স্কুল ছেড়ে যাবার আগে আমি তোদের এমন একটা অদ্ভুত ম্যাজিক বা এমন একটা সুন্দর আবিষ্কার দেখিয়ে যাব যে তোরা আমাকে চিরদিন মনে রাখবি।'

স্বদেশ তার আত্মীয়স্বজনদের বাড়ির আর পাড়ার বেড়ালগুলোর সঙ্গে খুব ভাব পাতিয়ে নিল। অনেক পরীক্ষা চালিয়ে চালিয়ে জেনে নিল যে তার চেনা বেড়ালগুলোর মধ্যে কার গলার স্বর কতখানি মোটা আর কার কতখানি মিহি। হারমোনিয়মে সা রে গা মা পা ধা নি সা বাজিয়ে, বেড়ালগুলোর গলার স্বরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিল যে কোন্ কোন্ বেড়ালের গলার স্বর হারমোনিয়মের কোন্ কোন্ পর্দার সুরের সঙ্গে মিলে যায়। পরে গান শেখাবার জন্য মোটা স্বরের আর মাঝারি স্বরের আর মিহি স্বরের বেড়ালগুলোকে পাশে পাশে এমনভাবে সাজিয়ে বসিয়ে দিত যাতে এক এক করে তাদের ল্যাজে চাপ দিলে বেড়ালগুলো চিৎকার করার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা-র মতন 'ম্যাও-ম্যাও-ম্যাও-ম্যাও-ম্যাও-ম্যাও-ম্যাও-ম্যাও' সুর শুনতে পাওয়া যায়। স্কুলের বন্ধুদের সে কিছু জানতে দিত না। নিজেই বেড়ালদের গান শেখাত।

স্বদেশলাল বেড়ালের হারমোনিয়ম বানাবার মতলব করেছে, তাই বেড়াল নিয়ে তার এত পরিশ্রম আর পরীক্ষা। এর জন্য সে কত কষ্টই না সহ্য করেছে! তাকে অনেকবার বেড়ালের আঁচড় আর কামড় খেতে হয়েছে। শেষে বেড়ালগুলো আর আঁচড় বা কামড় দিত না। সে মধ্যে মধ্যে তামাশা করে বলত, 'আমি শেষটায় বেড়ালতপস্বী হয়ে দাঁড়ালাম, আর বেড়ালগুলোও তপস্বী হয়ে উঠেছে।'

সে কারিগরদের দিয়ে কতকটা হারমোনিয়মের মতন দেখতে একটা যন্ত্র বানিয়ে নিল। যন্ত্রের উপরে হারমোনিয়মের পর্দার মতন চৌ-কোনা চৌ-কোনা কাঠের টুকরো লাগিয়ে দিয়ে প্রত্যেকটা টুকরোর সঙ্গে একটা-একটা ছোট্ট ডান্ডা এঁটে দেওয়া হল। প্রত্যেকটা ডান্ডার নীচ দিয়ে একটা-একটা খাঁজ বা সুড়ঙ্গ গিয়েছে। যন্ত্রের সামনে বেড়ালগুলোকে পিছন ফিরিয়ে বসিয়ে দিয়ে তাদের ল্যাজগুলোকে যন্ত্রের খাঁজগুলোর মধ্যে ঠেসে গুঁজে দিয়ে, সেই সুন্দর হারমোনিয়মের কলগুলো টিপে টিপে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট ডান্ডাগুলো নেমে নেমে বেড়ালগুলোর ল্যাজে ঘা দিতে থাকবে আর বেড়ালগুলো মোটা মিহি নানা সুরে ডাকতে থাকবে। স্বদেশ বেড়ালগুলোকে সা-রে-গা-মা ভাঁজিয়ে ভাঁজিয়ে ওস্তাদ বানিয়ে দিল।

কাজের মানুষের দিনগুলো তাড়াতাড়ি কেটে যায়, তাই স্বদেশের সময়ও বেশ তাড়াতাড়ি কেটে গেল। দেখতে দেখতে স্কুলের শেষ পরীক্ষা এসে গেল। পরীক্ষার পরে ছেলেরা স্বদেশকে পাকড়িয়ে বলল, 'তোমার সেই নতুন ম্যাজিক বা আবিষ্কারটা আমাদের দেখাবে না?' স্বদেশ উত্তর দিল, 'আমি তো প্রস্তুত হয়েই আছি, তোমরা একটা সভার আয়োজন করো।'

সামনের শনিবারেই সভার আয়োজন করা হল। ছাত্রেরা এসেছে, মাস্টারমশাইরা এসেছেন, হেডমাস্টারমশাইও উপস্থিত। স্বদেশলাল বেড়ালগুলোকে সঙ্গে নিয়ে আর হারমোনিয়মের মতন যন্ত্রটা হাতে নিয়ে সভায় ঢুকতেই সভাময় একটা সাড়া পড়ে গেল। হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'স্বদেশের কাণ্ডটা দেখেছ? ও আজ সকলের পিলে চমকিয়ে দিতে চায়।' মাস্টারমশাইরা বললেন, 'ছেলেদের খুব বিশ্বাস যে স্বদেশ আজ একটা কিছু দারুণ রকমের ভেলকি-টেলকি দেখাবে।' ছাত্রেরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

স্বদেশ সকলকে নমস্কার করে বলল, 'পূজনীয় শিক্ষকমহাশয়গণ আর আমার প্রিয় ছাত্রভাইবোনেরা, আজ আমি সকলকে বেড়ালের হারমোনিয়ম বাজিয়ে শোনাতে এসেছি। এই নতুন রকমের হারমোনিয়ম সৃষ্টি করতে গিয়ে আমি অনেকদিন বেড়ালগুলোকে অনেক জ্বালাতন করেছি, বেড়ালগুলোও আমাকে অনেক জ্বালিয়েছে। প্রথম প্রথম ওরা রেগে যেত, ছটফট করত, আঁচড়-কামড় দিত। ক্রমে অভ্যাস হয়ে যাওয়ার পরে বেশ ভদ্র হয়ে গিয়েছে। আমি হারমোনিয়মের কল টিপে টিপে বাজিয়ে যাই, আর বেড়ালগুলো ল্যাজে চাপ খেতে খেতে নানারকম ম্যাও ম্যাও স্বরে সা-রে-গা-মা ভাঁজতে থাকে, রাগ-টাগ করে না।'

বেড়ালগুলোকে ঠিকভাবে বসিয়ে দিয়ে, তাদের ল্যাজগুলো হারমোনিয়মের খাঁজে খাঁজে ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়ে স্বদেশ বাজাতে শুরু করল। তখন ঘরটা যেন স্বর্গ হয়ে গেল। সা-রে-গা-মার সুরে ম্যাও ম্যাও শব্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে, সকলে আনন্দে বুঁদ হয়ে বেড়ালের হারমোনিয়ম শুনছে আর দেখছে। ছাত্রেরা হাততালি দিতেও ভুলে গিয়েছে। হেডমাস্টারমশাই মনের আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে চিৎকার করে উঠলেন, 'স্বদেশ! তোমার নাম সারা জগতে ছড়িয়ে পড়বে!' মাস্টারমশাইরা বললেন, 'বাস্তবিক, আজ একটা দিন বটে!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

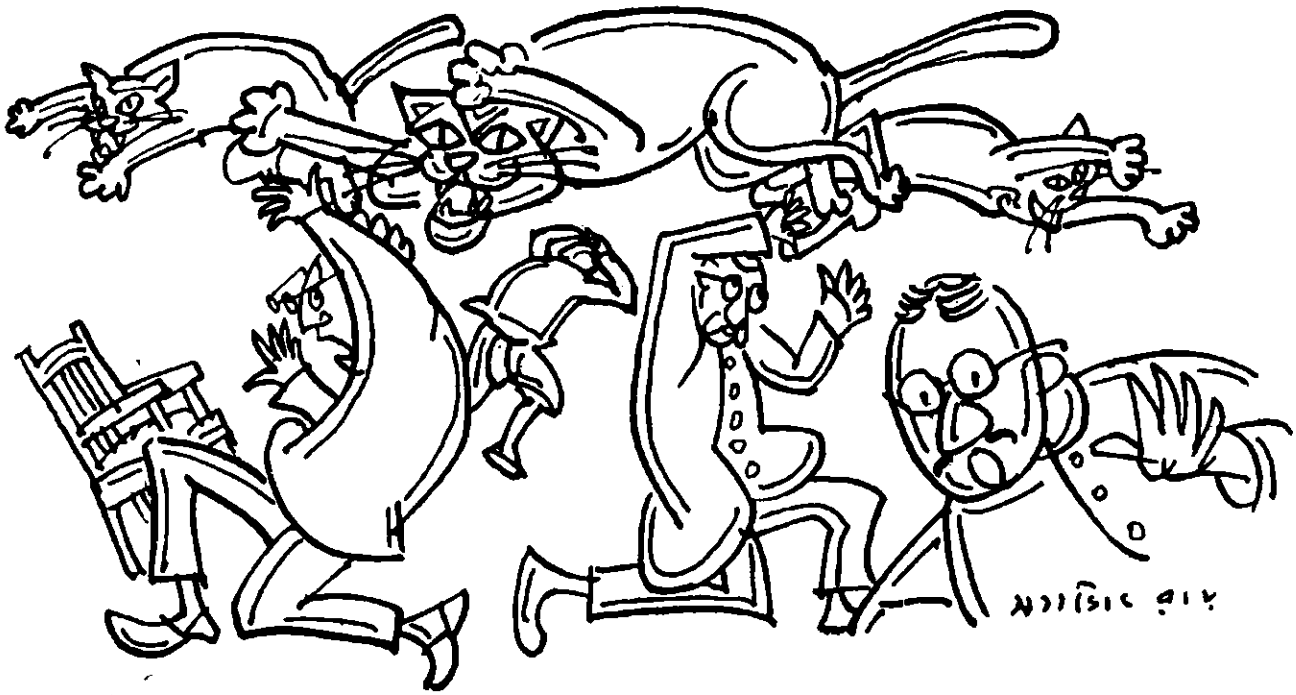

স্বদেশলালের উৎসাহ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালদের তেজ বেড়ে যাচ্ছে। ম্যাও ম্যাও শব্দের স্রোতে সকলে যেন হাবুডুবু খাচ্ছে। বেড়াল-কণ্ঠের ঝংকার ক্রমেই উঁচুতে উঠছে ; গানের খোঁচা কানে এসে বিঁধছে, দেয়ালে গিয়ে ফুটছে, কড়ি-বর্গায় গিয়ে লাগছে। একজন ছাত্র আর স্থির থাকতে না পেরে বলে উঠল, 'স্বদেশদাদা, ব্যাপার যে শেষে গুরুচরণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে!'

আধ ঘণ্টার মধ্যে সকলেই বেড়ালের হারমোনিয়মের গুঁতো হাড়ে হাড়ে টের পেতে লাগল। এতক্ষণে বেড়ালদের চেহারাতেও একটা উৎকট রাগের ভাব আর দারুণ বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। সা-রে-গা-মা ভাঁজতে ভাঁজতে ওরা হঠাৎ হঠাৎ ভীষণ ফ্যাঁস-ফ্যাঁস শব্দ করছে আর অস্বাভাবিক গর্জন ছাড়ছে। ওদের গা ফুলছে, চোখ জ্বলজ্বল করছে, নখ আর দাঁত চকচক করছে। তারপর? তারপর যা হল তা শুনলে আক্কেলবুদ্ধি গুড়ুম হয়ে যায়! বিষম রাগের চোটে বেড়ালদের গা দিয়ে বুনো-বুনো বাঘের গন্ধ বেরোতে লাগল!

হেডমাস্টারমশাই চিৎকার করে বললেন, 'স্বদেশ, আজ বুঝি একটা কিছু প্রলয়কাণ্ড ঘটে! একজন বড় শিকারীর কাছে শুনেছি যে বেড়ালরা যখন রাগের ঠেলায় বাঘের গন্ধ ছাড়তে থাকে তখন ওরা সব-রকমের পাপ করতে পারে—মানুষের মাথায় টাক পড়িয়ে দিতে পারে, জুতো ফেড়ে দিতে আর গোঁফ কেড়ে নিতে পারে, টনসিল চিরে দিতে পারে, নাক আর কান খেয়ে ফেলতে পারে, ভুঁড়ি ফাঁসিয়েও দিতে পারে। সাবধান।'

স্বদেশকে সাবধান করে দেবার দরকার ছিল না। হেডমাস্টার-মশাইয়ের কথা শেষ হতে না হতেই বেড়ালগুলোর নাক-মুখ দিয়ে একটা দুর্গন্ধ কটকটে বাষ্পের মতন জিনিস বেরিয়ে এসে স্বদেশের নাকের মধ্যে ঢুকে গেল। সে এক নিমেষেই দশ হাত দূরে পালিয়ে গেল আর মাটিতেই শুয়ে পড়ল। বেড়ালগুলো ভীমপরাক্রমে হেডমাস্টারমশাইকে টপকিয়ে, মাস্টারমশাইদের ডিঙিয়ে, ছাত্রদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে ইস্কুলের সেই নরককুণ্ড ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

স্বদেশকে সকলে ধরাধরি করে ওঠাল। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে সে সুস্থ হল। হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'স্বদেশ, তুমি প্রতিজ্ঞা করো যে ভবিষ্যতে এমন কাণ্ড আর করবে না। তোমার হারমোনিয়মটা স্বর্গের খেলনা, কিন্তু শেষে নরকে নিয়ে যায়।' স্বদেশ বলল, 'আমি নাকে খত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, আমার সাধের আবিষ্কারের কাছে আমি চিরবিদায় গ্রহণ করলাম। আমার বেড়াল-শিষ্যেরা আমাকে ক্ষমা করুক, আর শান্তিতে থাকুক।' সকলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বাড়ি ফিরে গেল।

স্কুলের শেষ পরীক্ষা পাস করে স্বদেশলাল কলেজে ভর্তি হল। বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে তার দুটি অমূল্য সম্পত্তি লাভ হল ; সে দুটি হচ্ছে তার সুদীর্ঘ সুশ্রী গোঁফ আর সুন্দর সুবিশাল দাড়ি। গোঁফজোড়ার ডগা দুই কানে পেঁচিয়ে রেখে সে বলত, 'এ হচ্ছে আমার কানপাট্টা গোঁফ।' লম্বা দাড়ির ডগাটা সে পকেটে রুমালের মতন গুঁজে রেখে দিত। খাওয়া-দাওয়ার পরে মুখ ধুয়ে রুমালের বদলে দাড়ি দিয়েই মুখ মুছে আবার পকেটের মধ্যে দাড়ির ডগা গুঁজে রেখে দিত।

ওইরকম গোঁফদাড়ি নিয়ে ক্লাসে বসবার অনুমতি পেতে তাকে বেশ চেষ্টা করতে হয়েছিল। কলেজের অধ্যক্ষমহাশয় জানতেন যে সংসারের লোকদের সঙ্গে স্বদেশের তুলনা করা চলে না, তাই তিনি অনেক ভেবে শেষটায় অনুমতি দিলেন।

একদিন বিকালে স্বদেশলাল কলকাতার দক্ষিণে টালিগঞ্জে বেড়াতে বেড়াতে এক গাছতলায় একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর দেখা পেল। দেখা হওয়ামাত্রই দুইজনেই একেবারে অবাক্! স্বদেশ মুগ্ধ হয়ে সন্ন্যাসীর সাদা দাড়ি আর সাদা জটা দেখছে, আর সন্ন্যাসী গভীর স্নেহের সঙ্গে স্বদেশের অপরূপ গোঁফদাড়ি

www.BanglaBook.org

দেখছেন। কারো মুখে কথা নেই! দশ মিনিট এইভাবেই কেটে গেল। সেদিন স্বদেশ কাছে যেতে সাহস পেল না ; সন্ন্যাসীর কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে এল।

পরদিন কলেজে গিয়ে বন্ধুদের বলল, 'এক যা সন্ন্যাসী দেখে এলাম, একেবারে সেরা সাধু! শিবের মতন জ্ঞানী, সমুদ্রের মতন গম্ভীর, নারদঋষির মতন সাদা দাড়ি আর সাদা জটা, চাঁদের মতন স্নিগ্ধ চোখ! আজ আবার দেখতে যাব। শুনেছি, রোজ গাছতলায় এসে বসেন। কাল তাঁকে প্রণাম করা হয়নি। দশ মিনিট শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম, আর তিনিও ততক্ষণ সমানে আমার উপরে কৃপাদৃষ্টি রেখেছিলেন।'

পরদিন বিকালে স্বদেশের বন্ধুরা খেলার মাঠে গেল, আর সে একা সেই সাধুর কাছে গেল। তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি স্বদেশের দাড়িতে হাত বুলিয়ে একটু আদর করলেন আর বললেন, 'একা এসেছ ভালোই করেছ। আজ তোমাকে বিনা মূল্যে এমন একটি আশ্চর্য জিনিস দেব যা পৃথিবীতে আর কারো কাছে নেই। তোমাকে দেখেই বুঝেছি যে একমাত্র তুমিই এই জিনিসটাকে কাজে লাগাতে পারবে। আজকাল পৃথিবীতে এই ধরনের জিনিস একমাত্র এটিই আছে।'

সন্ন্যাসীঠাকুর খুব জোরে জোরে তাঁর সাদা সাদা দাড়ি ঝাড়তে লাগলেন। একটু পরেই দাড়ি থেকে একটা কৌটো বেরিয়ে এল, আর কৌটোটা খুলতেই রজনের মতন দেখতে এক টুকরো জিনিস বেরিয়ে এল। সাধু বললেন, 'এই জিনিসটা তোমার দাড়িতে রোজ একঘণ্টা ঘষবে। দুইমাস এইরকম করলেই তোমার দাড়িতে এক চমৎকার শক্তির খেলা দেখতে পাবে। তখন বাঁ হাতে দাড়িটাকে টান করে ধরবে আর ডান হাতে দাড়ির উপর দিয়ে বেহালার ছড়ি চালাতে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গেই নানা-রকম নতুন নতুন অচেনা সুর শুনতে পাবে।'

স্বদেশের হাতে কৌটোসমেত জিনিসটা দিয়ে সন্ন্যাসীঠাকুর বললেন, 'যাকে তাকে আর যেখানে সেখানে দাড়ির বাজনা শোনাবে না ; এই বাজনার একটা গৌরব আছে, পবিত্রতা আছে। নারদমুনি চোখ বুজে অনেকদিন তপস্যা করেছিলেন, আর সেই সুযোগে তাঁর দাড়িতে কুমুরে পোকা বাসা বানিয়েছিল। তপস্যা শেষ হলে তাঁর দাড়ির দিকে খেয়াল গেল আর পোকা পালিয়ে গেল। তখন নারদমুনি কুমুরে পোকার বাসার সঙ্গে একটা বনৌষধির রস মিশিয়ে এই গুটিকা প্রস্তুত করলেন। গত চার হাজার বছরের মধ্যে মাত্র পাঁচ জন অতি পুণ্যবান্ আর সৌভাগ্য-বান্ লোক এই জিনিসটি ব্যবহার করবার অধিকার পেয়েছে। এটির নাম নারদকৃপা গুটিকা। এর সামান্য একটু বাকী রয়েছে ; —সেটুকু তোমাকে দিলাম।'

স্বদেশ গড় হয়ে সাধুকে প্রণাম করল। সাধু আবার বললেন, 'একবার দাড়িতে শক্তি এসে গেলে প্রতিদিন গুটিকা ঘষবার দরকার থাকবে না ; শুধু দাড়িতে বেহালার ছড়ি চালিয়ে দিলেই সুর বেরোবে। কয়েক মাস পরে যখন দাড়ির তেজ মিইয়ে আসবে আর সুর ঢিমিয়ে আসবে, তখন শুধু এক সপ্তাহ গুটিকা ঘষলেই দাড়ি আবার জ্যান্ত হয়ে উঠবে। একটা কথা মনে রাখবে—দাড়িতে যেন কিছুতেই চামচিকা না বসে। একবার চামচিকার খপ্পড়ে পড়লে কিন্তু দাড়ি একেবারে ভোঁস্তিয়ে যাবে, তুমি পস্তাতে থাকবে।'

সাধু আর এদিকে আসবেন না, তাই স্বদেশ তাঁকে খুব ভালো করে প্রণাম করল। বাড়ি ফিরেই স্বদেশ দাড়িতে সেই গুটিকা ঘষতে লাগল। একঘণ্টা পরে ঘুমোতে গেল, কিন্তু আনন্দের ঠেলায় সেদিন ঘুম আর এলই না। রোজ একঘণ্টা খুব উৎসাহের সঙ্গে দাড়িতে গুটিকা ঘষে। তার চেহারায় কিছু দিনের মধ্যেই একটা তেজের ভাব আর এক আনন্দের চিহ্ন দেখা দিল। ক্লাসে বন্ধুরা আর অধ্যাপক মহাশয়েরা মধ্যে মধ্যে বলতেন, 'স্বদেশ, তোমাকে এক নতুন মানুষ মনে হচ্ছে! উন্নতি করছ? বেশ বেশ, উন্নতিই করো।'

দুইমাস পরে স্বদেশের মনে হল যেন তার দাড়িতে কেউ আশীর্বাদ ঢেলে দিল, একটা প্রাণের লক্ষণ এসে গেল—কেমন একটা জ্যান্ত জ্যান্ত ভাব। সে ছুটে গিয়ে বেহালার ছড়িটা হাতে নিল আর দাড়ির উপরে সেটা চালাতে লাগল। প্রথমে কতকটা ঝিঁঝিপোকার ডাকের মতন একটা শব্দ শোনা গেল, কিন্তু অনেক বেশী মিষ্টি। পরে অস্পষ্ট হাসির মতন সুন্দর শব্দ—হা হা হা হা, হো হো হো হো, হি হি হি হি, হে হে হে হে। শেষে নানা অচেনা বাজনার নতুন নতুন সুর! স্বদেশ বাঁ হাতে দাড়িটাকে বেশ জোরে টেনে ধরে ডান হাতে সমানে ছড়ি বুলিয়ে যেতে লাগল। সন্ন্যাসী বলেছিলেন, 'এই বাজনা শুনে শুনে তোমার অশেষ উন্নতি হবে। হিংস্র জানো-য়ারেরা এই বাজনা শুনে ঘুমিয়েই পড়বে, সিংহ বাঘেরা পর্যন্ত গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়বে।' বাজাতে বাজাতে সাধুর কথায় স্বদেশের বিশ্বাস বেড়ে যেতে লাগল। রোজ অভ্যাস চলতে লাগল।

একদিন স্বদেশ খবরের কাগজে সিদ্ধিগড়ের রাজার একটা বিজ্ঞাপন দেখতে পেল। রাজা জানাচ্ছেন যে তিনি একটা ভয়ানক হিংস্র বাঘিনীকে ধরে খাঁচায় রেখেছেন ; যে কেউ ওই খাঁচায় ঢুকে বাঘিনীর পায়ে আলতা পরিয়ে আসতে পারবে তাকে তিনি সোনার মেডেল উপহার দেবেন।

স্বদেশলাল বন্ধুদের কিছু না জানিয়ে, শুধু নিজের বাড়ির লোকদের একটু জানিয়ে রেখে সিদ্ধিগড়ের দিকে রওনা হল। রেলগাড়িতে সাতাশি মাইল, বাস ধরে কয়েক মাইল, আর হেঁটে তিন মাইল যেতেই সে সিদ্ধিগড়ে এসে গেল। মনে তার যেমনি উৎসাহ তেমনি সাহস ; একেবারে রাজসভায় গিয়ে হাজির। তার চেহারা দেখে রাজা অবাক্! সভার লোকেরা অবাক্!

স্বদেশলাল বাঘিনীর খাঁচায় ঢুকবার মতলবের কথা জানাতেই রাজা বললেন, 'তুমি ছেলেমানুষ, তুমি এ কাজ পারবে কেন? শেষে একটা বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়বে। তোমাকে দেখে আমাদের বড় মায়া হচ্ছে।'

স্বদেশ উত্তর দিল, 'আপনারা আমার বিদ্যাটা দেখবেন। আমি যদি বাঘিনীকে ভোলাতে পারি তবেই আপনাদের অনুমতি নিয়ে খাঁচায় ঢুকব।' রাজা আর আপত্তি করলেন না। স্বদেশকে নিয়ে সকলে বাঘিনীর খাঁচার ধারে গেল। ওঃ! সেটা একটা বাঘিনী বটে! একেবারে বাঘের রাজ্যের রানী! সারা শরীরে তেজ খেলে যাচ্ছে, চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক, পান খেয়ে ঠোঁট লাল।

স্বদেশ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বাঘিনী পান খায়?' রাজা বললেন, 'আগে খেত না। একবার এক শিকারী পানের খিলি সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে গিয়েছিল। বাঘিনী শিকারীকে মেরে তার মাংস খেয়ে পানটা পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিল। সেদিন বাঘিনীর খুব ভালো হজম হয়েছিল। পানের গুণ জানতে পেরে

www.BanglaBook.org

বাঘিনী কয়েকদিন মানুষ মেরে পানের খোঁজ করেছিল, কিন্তু তাদের সঙ্গে পান ছিল না। এক দিন মহিষের মাংস খেয়ে পেট ভার হওয়াতে বাঘিনীটা একটা পানের দোকান লুট করে ভালো ভালো সাজা পান খেয়ে সুস্থ হয়। এইসব কথা শুনেছিলাম, তাই রোজ ওর খাওয়া হলে ওকে পান সেজে দেওয়া হয়।'

স্বদেশ বলল, 'এবার আমি আমার কাজ আরম্ভ করি।' দাড়িটাকে বজ্রমুষ্টিতে ধরে জোরসে টেনে বাগিয়ে রেখে, দাড়িতে ছড়ি চালাতে চালাতে সে এমন সব সুর শোনাতে লাগল যা অন্যের কানে আগে কোনদিন ঢোকেনি। দাড়ির এমন দিব্যশক্তি দেখে রাজা, মন্ত্রী, কোটোয়াল, সকলেই একটা আনন্দের নেশায় বিভোর হয়ে গেল। বাঘিনীর চেহারা অনেকটা মোলায়েম হয়ে এল, মুখে একটা হাসি-হাসি ভাব দেখা দিল, চোখ একটু একটু ছলছল করতে লাগল। ক্রমে তার চোখ আরামে বুজে আসতে লাগল, সে একটু একটু ঢুলতে লাগল, ঘর্‌ঘর্‌ করে একটা আরামের ডাক ডাকতে লাগল। শেষে ঘুমের ঘোরে শুয়ে পড়ে গাঁক গাঁক করে নাক ডাকাতে লাগল। তাই দেখে রাজা, মন্ত্রী, কোটোয়াল, এদের ধিঙ্গি-ধিঙ্গি ধিঙ্গি-ধিঙ্গি করে কী নাচ! কী নাচ! কী নাচ! আবার নাচ দেখে রানীর খিল-খিল খিল-খিল করে কী হাসি! কী হাসি! কী হাসি!

স্বদেশ ব্যস্ত হয়ে বললে, 'আপনারা থামুন, থামুন! বাঘিনীর ঘুম ভেঙে যাবে।' শুনেই সকলে শান্ত হয়ে গেল। খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে স্বদেশ একটা কাঠি দিয়ে বাঘিনীর মাথায় জোরে জোরে টোকা মেরে দেখতে পেল যে বাঘিনী আর নড়ে-চড়ে না; একেবারে কুম্ভকর্ণের দিদিমার মতন ঘুমোচ্ছে। তখন সে খাঁচায় ঢুকে খুব যত্নের সঙ্গে বাঘিনীর পায়ে আলতা মাখিয়ে দিয়ে, ঘুমন্ত বাঘিনীকে প্রণাম করে বিজয়ী বীরের মতন খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল। সকলে মিলে তখন কী আনন্দ!

স্বদেশকে নিয়ে সিদ্ধিগড়ে একসপ্তাহ খুব উৎসাহ করা হল। পরে রাজা তাকে সোনার মেডেল দিলেন। ফিরে আসবার আগের দিন রাজার বাগানে স্বদেশ একটা নতুন রকমের গাছ দেখতে পেল। সে গাছের কাছে এগিয়ে যেতেই একটা চামচিকা নেমে এসে তার দাড়িতে ঢুকে গিয়ে লটকিয়ে রইল। স্বদেশ যতই দাড়ি ঝাড়ে, চামচিকা ততই জোরে দাড়ি আঁকড়িয়ে ধরে আর ফড়র্‌ ফড়র্‌ করে। সে এক বিদ্‌ঘুটে অবস্থা!

গাছটার কাছেই রাজার দারোয়ানের রান্নাঘরে রান্না চড়েছে। স্বদেশলাল ছুটে সেখানে গিয়ে দারোয়ানের কাছে সাহায্য চাইল। দারোয়ানজী স্বদেশের দাড়ি কেটে দেবার জন্য একটা কাঁচি আনতে গেল। এদিকে উনুনের মধ্যে একটা লঙ্কা পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেদিকে কারো খেয়াল যায়নি। দারোয়ান ফিরতে না ফিরতেই লঙ্কার কড়া ধোঁয়া বেরিয়ে চামচিকাটাকে এমন অস্থির করে দিল যে সেটা ডাকাতের মতন খানিকটা দাড়ি ছিঁড়ে নিয়েই পালিয়ে গেল!

স্বদেশ সেই মুহূর্তেই টের পেল যে তার দাড়িতে আর জ্যান্ত-জ্যান্ত ভাব নেই! ছড়ি চালিয়ে দেখতে পেল যে দাড়িতে আর সাড়া পাওয়া যায় না, সুর আর বেরোয় না। সে বিমর্ষ হয়ে আয়নার সামনে গিয়েই দেখতে পেল যে তার দাড়ির খানিকটা খুবলে যাওয়াতে অতি বিটকেল চেহারা হয়েছে!

সকলের পরামর্শে স্বদেশ তখন দাড়ি কামিয়ে নিল আর গোঁফ ছাঁটিয়ে নিল। তার চেহারা তখন অনেক বেশী ভালো দেখাতে লাগল। তাই দেখে রাজা, মন্ত্রী, কোটোয়াল, এদের ধিঙ্গি-ধিঙ্গি-ধিঙ্গি-ধিঙ্গি করে কী নাচ! কী নাচ! কী নাচ! আর তাই দেখে রানীর খিলখিল খিলখিল করে কী হাসি! এবারে স্বদেশ তাদের মানা করতে পারছে না; এখন তো বাঘিনী জেগে যাবার ভয় নেই!

সিদ্ধিগড়ের রাজার আর রাজ্যের সব লোকের কাছে অনেক স্নেহযত্ন পেয়ে, সোনার মেডেল আর বাঘিনীর স্মৃতি নিয়ে স্বদেশ কলকাতায় ফিরে এল। তার আত্মীয়স্বজন, তার কলেজের বন্ধুরা, তার অধ্যাপকমহাশয়রা তার সুশ্রী চেহারা দেখে খুব খুশী! সে আর দাড়ি রাখলই না দেখে আরো খুশী। দাড়ি হারাবার কারণটা সে একটু একটু করে সকলকে জানিয়ে দিয়েছিল। সহজ সরল মানুষ!

১৩৭০

www.BanglaBook.org

ছোট্ট যাদুকর

ননীগোপাল মজুমদার

ছোট্ট ছেলে যাদুকর, নাম তার রাখাল। না ছিল তার বাড়ি না ছিল তার ঘর। তার মা যে কখন গেছে তা তার মনেই পড়ে না, তখন সে খুবই ছোট ; আর বাবা গেছে যখন তার বয়স দশ।

তার বাবা—তার বাবা ছিল যাদুকরের রাজা যাদুকর। উঃ, কত খেলাই না তার বাপ জানত। গাছ উড়িয়ে দিচ্ছে, মানুষ উড়িয়ে দিচ্ছে, উড়িয়ে দিচ্ছে গরু ছাগল ভেড়া! বাবা তার পুঁতে দিত আম গাছের আঁঠি, গজাত তাতে গাছ, ফলত তাতে ফল, গাছে থাকতে থাকতেই তারা পাকত, উড়ে এসে বসত পাখি, গাইত গান। বাবা হাত দিয়ে করত 'হুস'। সব কোথায় চলে যেত কোন তেপান্তরের মাঠে।

আঃ সে ছিল মজার জীবন।

দুজনে মিলে চলে যেতে যেতে দেশ থেকে দেশান্তরের পথে পথে খুলে দিত তাদের খেলার মেলা ; বাবা তার সুর করে বলত ঃ

আ যাও আ যাও ভাই
আমার কাছে ;
আছে মজার খেলা।
মানুষ ওড়াই হাতি ওড়াই
খুলি চাঁদের মেলা।
টাকার পরে টাকা গড়ি
দেখবে এসো ভায়া।
কত কিছু ভাঙ্গি গড়ি
সবই কিন্তু মায়া
ও ভাই সবই কিন্তু মায়া!
ও হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ!

উঃ, তার বাবার "ও হোঃ হোঃ" শুনতে কী মজাই না লাগত। তার বুকের ভিতরটা কেমন যেন গুড় গুড় করে উঠত। আর—

আর চারিদিক থেকে পড়ত টাকা পয়সা আনি দুয়ানি সিকি ; ভরে যেত তাদের ভুঁয়ে বিছানো চাদর। আর তা দিয়ে বাবা দোকান থেকে কিনে আনত—লুচি পুরী তরকারী মাংস —আর সে কী খাওয়া!

এক একদিন ডাক পড়ত জমিদার বাড়িতে, হয়ত বা বাবুর মেয়ের বিয়ে, ছেলের পৈতে, নয়ত অন্নপ্রাশন ; তখন ত কত টাকাই বকশিশ পেত ওর বাবা ; আর নেমন্তন্ন খাওয়া—কত রকম খাবারই না সে খেয়েছে—কত খাবারের নামও সে জানে না।

আর আজ?

তার বাবা আর বেঁচে নেই। না, তার আর কেউই নেই ;—বড় একলা লাগে তার। মধ্যে মধ্যে ত ভয়ই এসে দানা বাঁধে বুকে তবু—তবু তাকে চলতে হয় পথে পথে, দেখাতে হয় খেলা—

মাথা নিচু করে পা উঁচু করার খেলা,
চাকার মত ঘুরে যাবার খেলা ;
দু'বলের খেলা, তিনবলের খেলা,
লাঠির খেলা, কাগজের খেলা।

সে হোটেলে হোটেলে ঢুকে খেলা দেখায়, খাবার পায় কিছু। পায় কিছু পয়সা। ছোট্ট বাজিকর দেখে সবারই বেশ মজা লাগে, বাঃরে ছোট্ট যাদুকর।—ভরে ওঠে তার পকেট।

কিন্তু তার বাড়ি নেই, নেই তার মাথা গোঁজবার জায়গা। গাছতলায় শুয়ে সে রাত্রি কাটিয়ে দেয়।

এমনি করে কেটে গেল গ্রীষ্ম, কেটে গেল বর্ষা, কেটে গেল শরৎ, গেল হেমন্ত ;—শুরু হল শীত।—আর শুরু হল তার কষ্ট—কে আর শীতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার খেলা দেখবে!

একদিন শীতে তার হাঁড়ে কাঁপুনি ধরে গেছে ; তবুও ত তার থামবার উপায় নেই। সে আপন মনে পথের ধারে রুমাল পেতে খেলা দেখিয়ে চলেছে। শরীর তাতে একটু গরম হচ্ছে বইকি।—তবু গায়ে তার গরম কাপড় নেই ; শীত মানবে কেন?

সেদিন তার খেলা আর কেউ দেখছে না, একজন ছাড়া। —তিনি হচ্ছেন আমাদের বিরাট মন্দিরের পুরুত ঠাকুর।—কি আর দেবেন পুরুত ঠাকুর—বামুন কত্তা!

খেলা দেখিয়ে দেখিয়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ; কিন্তু যেই না থামা অমনি কাঁপতে লাগল ঠক্ ঠক্ করে। বামুন কত্তা শুধালেন, ওরে ছেলে তোর বাড়ি কোথা?

বাড়ি?

বাড়ির কথা ত তার মনেই পড়ে না—পথেই তার বাড়ি, পথই তার ঘর। ভগবান ত তাকে দিয়েছেন দিগন্ত জোড়া পথ। সে বলল, ঠাকুরমশাই, বাড়ি ত আমার নেই। পথই আমার বাড়ি।

পুরুত ঠাকুর বললেন—সে কি রে? এ শীতে পথে থাকলে যে মরে যাবি। চল আমার সঙ্গে, চল আমাদের রান্নাঘরের আগুনে একটু গরম হতে পারবি।

চোখ বড় বড় করে ছোট্ট যাদুকর বলল, আমাকে—আমাকে জায়গা দেবেন ঐ মন্দিরে?—ঐ বড় মন্দিরে?

হ্যাঁগো—হ্যাঁ, বললেন বামুনকত্তা, গোবিন্দর কাছে যে সব সমান। আয় তুই আমার সঙ্গে, গোবিন্দর মন্দিরের সিঁড়ি ধুয়ে দিবি তুই ;—আর করবি তাঁর সেবা।

হ্যাঁ—মন্দিরের সিঁড়ি সে ধুয়ে দিতে পারবে।

কিন্তু সেবা?—সে ত জানে না কি করে করতে হয় গোবিন্দর সেবা।

কিন্তু বামুনকত্তা ছাড়লে না তাকে। আহা, অনাথ ছেলে গোবিন্দর দুয়ারে শীতে না খেতে পেয়ে মরবে!

www.BanglaBook.org

তাহলে কি আর গোবিন্দ তাকে কখনও ক্ষমা করবেন?

হাত ধরে তাকে নিয়ে চললেন বামুন কত্তা। বললেন, ওরে ভয় নাই, ওরে ভয় নাই। গোবিন্দর পায়ে নিজেকে সঁপে দে। তোর ভয়-ভাবনা তাঁর পায়েই দিয়ে দে।

মন্দিরের ভেতর ঢুকে ছোট্ট যাদুকর দেখল—সে কত লোক-জন, কত হৈ চৈ। তার দিকে কেউ ফিরেও তাকাল না।

দিন যায়—রাখালের জুটল খাওয়ার জায়গা, থাকবার ঘর তার মিলল। পেল সে পরনের কাপড়, গায়ের জামা ;—গোবিন্দর কৃপায় তার অভাব কিছু থাকল না।

রোজ সে মন্দিরের সিঁড়ি ধুয়ে যায়—যত্ন করে। পরিপাটি করে।

কিন্তু সুখ?—মনে যে তার সুখ নেই, একি হল?

যে গোবিন্দর কৃপায় তার সব হয়েছে, ঠাকুরমশাইরা কত ভাবেই না তাঁর পূজা করেন, কত অংবং মন্ত্র পড়েন, আরতি করেন, কত গান হয়, কত ভজন হয়, কিন্তু হায়—রাখাল ত জানে না ভজন—জানে না পূজন। নিজের মনের আকুতি সে কি করে জানাবে?

গোবিন্দর মূর্তির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রাখালের চোখে দু'ধারা নামে। কিন্তু তার মনে শান্তি আসে না। সে দু'হাত জোড় করে বলে—ঠাকুর আমায় শিখিয়ে দাও কি করে তোমার পূজা করতে হয়, কি করে জানাতে পারি আমি কত ভালোবাসি তোমায়!

আর সে ভাবে, হায় হায় কি হতভাগ্য আমি! এখানে আমি ছাড়া আর সবাই গোবিন্দর পূজা করছে। আর আমি?—আমি তাঁর ভোগ খাচ্ছি আর মোটা হচ্ছি।—হায় হায় কেমন করে যে গোবিন্দকে ডাকতে হয় তাও ত আমি শিখিনি।

দিন যায়। রাত্রি আসে। দিনের পর দিন। মাসের পর মাস কেটে যায়, দেখতে দেখতে এসে গেল উৎসবের দিন। বছরের ঐ দিনগুলিতে কি ধুমধাম করেই না পূজা হয় ঐ মন্দিরে।

মন্দিরে যখন কেউ নেই, তখন রাখাল গিয়ে গোবিন্দর কাছে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বলল, গোবিন্দ, বলে দাও কি করে করতে পারি তোমার সেবা!

গোবিন্দ তার দিকে চেয়ে যেন একটু হাসলেন কিন্তু কিছুই বললেন না। হঠাৎ তার মনের কোণে কে যেন বলে গেল একটা কথা—

সে হাত জোড় করে বলল, গোবিন্দ ভগবান, তুমি রাগ করো না। আমি পূজা করব তোমায়, আমার মতে। আমায় তুমি যা শিখিয়েছ ঠাকুর, তাই আমি দেব তোমায় উপহার।

তারপর সে শুরু করে দিল:

হ্যাঁই যন্তর মন্তর
এই ফুস মন্তর।

টাকা ওড়াল, জামা ওড়াল, নিজে নেচে কুঁদে, ডিগবাজি খেয়ে—তার যত খেলা সব দেখাতে লাগল গোবিন্দকে। আর কি আনন্দ! আর কি আনন্দ! আনন্দে তার দু'চোখ বেয়ে নামল জলের ধারা আর গোবিন্দর মুখে যেন আবার উঠল ফুটে হাসি।

দিনের পর দিন ছোট্ট যাদুকর রাখাল গোবিন্দর সেবা করে নিজের মতে—গোবিন্দর দেওয়া দানে—গঙ্গাজলে করে গঙ্গা পূজা, মন তার ভরে ওঠে।

এখন মন্দিরে ছিল এক বিটলে বামুন, সে দেখে রাখাল কোথায় যেন রোজ পালিয়ে যায়। এমনিতেই ত বামুনকর্তার ভীমরতি ধরেছে। তা না হলে, একটা ছোঁড়া—যার জাতজন্মের ঠিক নেই, তাকে ধরে এনে দিয়েছে মন্দিরে জায়গা। তারপর রোজ রোজ পালায় সে কোথা?—মন্দিরের কোন জিনিসপত্র সরায়-টরায় না ত?

সে তক্কে তক্কে থাকে—একদিন দেখে মন্দিরে যখন কেউ নেই, তখন আস্তে আস্তে মন্দিরে ঢুকছে ছোট্ট যাদুকর—রাখাল।

তাহলে ত ঠিকই ধরেছে—নিশ্চয়ই ওর মতলব ভালো নয়। —ঠাকুরের পিছনে লুকিয়ে সে দেখতে লাগল রাখালের কাণ্ড-কারখানা।

ওমা, এ করছে কি! মন্দিরে ঢুকে গায়ের জামা সে খুলে ফেলল। তারপর গোবিন্দর সামনে শুরু হল তার খেলা—বলের খেলা, লাঠির খেলা, নাচন কোঁদন, ডিগবাজি খাওয়া ;—আরও কত কি! খেলতে খেলতে তার সারা গা বেয়ে ঝরতে লাগল ঘাম।—সে পরিশ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল গোবিন্দর পায়ের কাছে। একটু পরে উঠে সে তার জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে এল মন্দির থেকে।

বিটলের চোখ ত ছানাবড়া। পাপ! পাপ! কি ভীষণ পাপ মন্দিরে ঢুকে গেল। এ কি তামাসার জায়গা! ঠাকুর-দেবতা নিয়ে চালাকি! ঠাকুর-দেবতার সামনে খেলা। উঃ কত কষ্ট করে, পণ্ডিত মশাইয়ের কত তোয়াজ করে, কত সেবা করে, কত মন্তর-তন্তর তাকে শিখতে হয়েছে—কোনোটা পূর্ব দিকে ফিরে বলতে হবে, আর কোনোটা পশ্চিম দিকে! আর এই ছোঁড়া—

হায় হায় এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাদের সবাইকে করতে হবে। হায় হায় গোবিন্দ কি তাদের মাপ করবে!

সে রাগে কাঁপতে কাঁপতে গেল বামুনকর্তার কাছে।

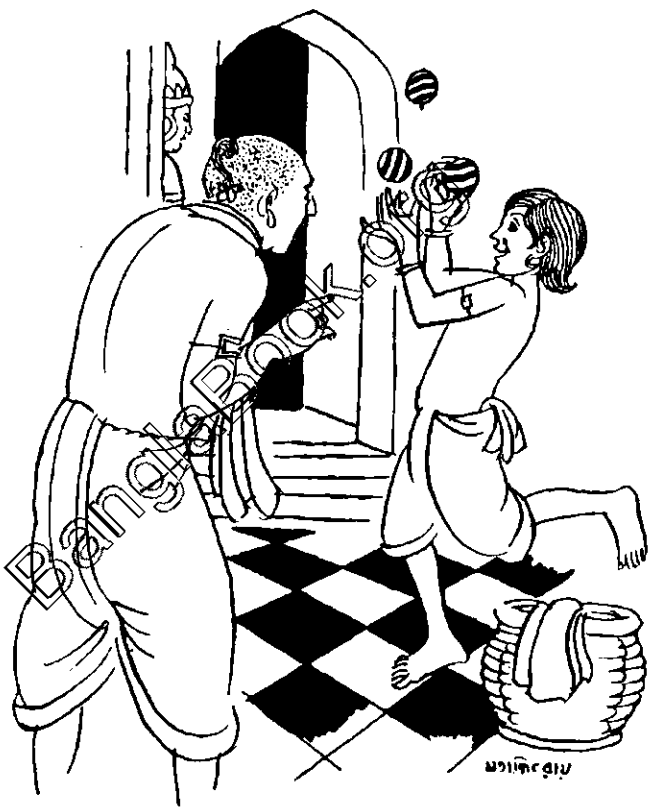

www.BanglaBook.org

বামুনকর্তা সব শুনে বললেন, সাবধান, কাক-পক্ষীও যেন একথা জানতে না পারে। এর পরের বার আমিও যাব তোমার সঙ্গে ; দেখব কি ব্যাপারখানা।

পরের দিন—ঠাকুরের পুজোর দিন। গাঁয়ের জমিদার কত ফল ফুল নিয়ে এসেছেন, কত নানান রকম কাপড় গহনা। সবাই গোবিন্দকে সাজাচ্ছে, পুজো দিচ্ছে, দিচ্ছে উপহার। ঘর ভর্তি হয়ে উঠল। মন্দিরের তোষাখানা হয়ে উঠল ভরপুর।

আর মন্দিরের এক কোণে দাঁড়িয়ে রাখাল ভাবে, হায়, আমার যে কিছুই নেই, কি দেব গোবিন্দকে ?

গভীর রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। চারিদিক নিশুতি হয়ে গেছে। মন্দির ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করেছে রাখাল ;—চলে গেছে সেবাইতরা। চারিদিক ভালো করে দেখে নিয়ে ভেতরে ঢুকল ছোট্ট যাদুকর। হাত জোড় করে গোবিন্দকে বলল, ভগবান, আমার যে কিছুই নেই। সবাইকে কত জিনিস দিয়েছ, তারা তোমাকে কত দেয়। কিন্তু আমি—কিন্তু আমি—আমার যে কিছুই নেই ঠাকুর। তার দু'চোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগল।

তারপর শুরু হল তার খেলা। সে ঠাকুরকে খেলার পর খেলা দেখাতে লাগল। সেদিন যেন তার আর খেলা দেখিয়ে তৃপ্তি হয় না। যত খেলা সে জানত একে একে সব দেখিয়ে, ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল গোবিন্দর পায়ের কাছে।

এদিকে বামুনকর্তা আর বিট্‌লে বামুন আড়াল থেকে সব দেখছেন। ওমা ! এ কি হল ? ঠাকুরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক জীবন্ত গোবিন্দ। এসে একখানা পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন তাঁর ছোট্ট ভক্তকে। আস্তে আস্তে হাত তুলে আশীর্বাদ করে আবার গোবিন্দ মিলিয়ে গেলেন পাথরের মূর্তির ভেতর।

বিট্‌লে বলে উঠল, কর্তা, কি ভুল আমি করেছি ! এ যে ভক্তশ্রেষ্ঠ। আহা ! এ যে গোবিন্দর খেলার সাথী—ব্রজের রাখাল। ওর সেবায় গোবিন্দ খুসি ; ওর জন্যে গোবিন্দকে দেখতে পেলাম। হায় হায় আমি তাকে চিনতে পারিনি কত্তা।

রাখাল এর কিছুই জানে না। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখে যে সে মন্দিরে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় পরে মন্দির থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন বামুনকর্তা ডেকে পাঠালেন রাখালকে নিজের ঘরে। সর্বনাশ !

তার সব জারিজুরি কি তাহলে ধরা পড়ে গেছে ? কি করবে সে ? কি বলবে সে ? সে সাধন ভজন না করে করেছে মন্দিরে খেলা।

হায় ! এবার বুঝি তাকে মন্দির থেকে দেবেন এ'রা তাড়িয়ে।

বামুনকর্তার ঘরে এসে হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে সে বসল ; ছল ছল চোখে সে জিজ্ঞেস করল, আমায় কি বের করে দেবেন কত্তা ? গোবিন্দকে কি আমি আর দেখতে পাব না ?

বামুনকর্তা বললেন, সত্যি কথা বল দেখি। এই যে এতদিন তুমি এখানে আছ, গোবিন্দর ভোগ পাচ্ছ, কি ভাবে তুমি গোবিন্দর সেবা করেছ ?

রাখাল বলল, ঠিকই বলেছেন কত্তা। আমি ত গোবিন্দর কোন সেবাই করিনি। আমি ত সাধন ভজন জানি না। আমি খেলা জানি, আমি ঠাকুরকে খেলাই দেখিয়েছি। আমার ত গোবিন্দর ভোগে কোনই দাবী নেই। আমার যাওয়াই ভাল।

বামুনকর্তা দু'হাত দিয়ে তাকে তুললেন, জড়িয়ে ধরলেন, বললেন, রাখাল, গোবিন্দর যে সেবা তুমি করছ, চিরকাল তুমি সে সেবাই যেন করতে পারো। মন্দির থেকে তোমাকে যেতে কেউ বলতে পারে ? ধন্য তুমি, ছোট্ট ভাইটি আমার, ধন্য !

সেদিন থেকে ছোট্ট যাদুকর রাখাল ব্রজের রাখালকে খেলা দেখিয়ে চলেছে নিজেকে উজাড় করে।

[ফরাসী গল্প থেকে]

১৩৭৭

পাত্র-পাত্রী

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কীকটপুরের বিকট রাজার বয়স হল ষাট ;
রাজকুমারে বুঝিয়ে দিয়ে এবার রাজ্যপাট
যাবেন তিনি বাণপ্রস্থে স্থির করিলেন মনে,
সাধন-ভজন নিয়ে রবেন মুনির তপোবনে।
রাজার ছেলে অরুণকুমার বয়স তাহার কুড়ি,
রূপে গুণে খেলাধুলায় নেইকো তাহার জুড়ি।
জিন-লাগামের ধার ধারে না—পাগলা ঘোড়ায় চড়ে,
একলা ঢুকে গহন বনে সিংহ শিকার করে,
বনের জলে ময়ূরপঙ্খী নৌকোতে বায় দাঁড় ;
রাজ্যশাসন শিখতে কেবল নেইকো তাহার চাড়।
বটের ছায়ায় বাজায় বাঁশি রাখাল-ছেলের সাথে,
চাঁদের মায়ায় পাগল হয়ে ঘুমোয় নাকো রাতে ;
ছন্দ গেঁথে পদ্য লেখে—চলছে কানাঘুষো ;
খামখেয়ালির শেষ মেলে না ; একটি ত নয় দু'শ।

www.BanglaBook.org

বনের পশুপাখী মোহিত শুনে তাহার বীণা।
রাজার চিন্তা রাজ্যেতে তার মন বাঁধা যায় কিনা।
পাত্রমিত্র নিয়ে রাজা মস্ত সভা করে
যৌবরাজ্য দিলেন তাকে নেহাৎ বেঁধে ধরে।
অনেক হল ধুমধাড়াক্কা—অনেক খাওয়া-দাওয়া ;
পণ্ডিতে যেই পড়তে ডাকেন অমনি কুমার হাওয়া।
কোথায় শিখে রাজনীতিটা রাজ্য নেবে বুঝে
তা নয়, সে রয় গাছের ডালে—পায়নাকো কেউ খুঁজে।
সন্ধ্যেবেলায় সেদিন রাজা বলেন তারে ডেকে,
'বীণা তোমার আমার কাছে রইল সে আজ থেকে।
রাজার ছেলে—উচিত তোমার এই কথাটা বোঝা—
তোমার মুখে তাকিয়ে আছে লক্ষ হাজার প্রজা।
সিংহাসনের দায়িত্বটা নিতেই যখন হবে—
মিথ্যে কেন করছ দেরি ? পালিয়ে ক'দিন রবে ?
বাইরে যাওয়া বন্ধ তোমার, রইল সেপাই দুটি
দোরে খাড়া, কাজ বুঝিয়ে তোমায় আমার ছুটি।
তর্কচঞ্চু যে পাঠ দেবেন শুনবে ভালো মনে,
একবেলা রোজ সভায় গিয়ে বসবে আমার সনে।'
'যথা আজ্ঞা' বলে কুমার বাপের কথা মতো
পড়ে লেখে, রাজ্য দেখে ; দুই মাসে অন্ততঃ
ওজন তাহার সের-পনেরো কমল বে-ওজর ;
মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। 'খাইবে নাকো জোর',
মন্ত্রী বলেন, 'আমার হাতে দিতেন যদি ফেলে—
একেবারে তৈরি করে ছেড়ে দিতাম ছেলে।
এই বয়সে তরলমতি সবাই অমন হয়,
বিয়ে দিলেই ঠাণ্ডা হবে, ও-সব কিছু নয়।'
অনেক করে তর্কাতর্কি—বুদ্ধিতে মন্ত্রীর
রাজকুমারের বিয়ে দেওয়াই শেষটা হল স্থির।
'অঙ্গরাজের মেয়ে আছে বিয়ের যোগ্য, তবে
চুপি-চুপি সঠিক খবর আনতে আগে হবে।
ব্রাহ্মণেরাই পারবে একাজ। রাজার আদেশ পেয়ে
জন-তিরিশেক বামুন সেদিন দেখতে গেলেন মেয়ে।
কেউ বা ছেড়ে চতুষ্পাঠী—কেউ বা ছেড়ে হাঁড়ি—
কেউ বা গেলেন খেউরি হয়ে কেউ বা লম্বা দাড়ি।
ব্রহ্মা-অগ্নি উদরে আর সরস্বতী জিভে ;
ট্যাঁকে গুঁজে নিলেন তাঁরা নস্যি তিরিশ ডিবে।
অঙ্গরাজের চতুষ্পাঠী অন্নসত্র যত
সকল ঘুরে খবর দিলেন, 'পাত্রী মনের মতো।
অযুত গোলা ব্রীহি রাজার পাঁচশ গোয়াল গবী,
মেয়ের বিয়ের যৌতুকেতে দেবেন তিনি সবই।
পুজোর দালান রান্নাবাড়ি সদর বাড়ির পাশে,
রাজার বাড়ির সিং দরজায় হিং-এর গন্ধ আসে।
নিত্য বলি একশ পাঁঠা গৃহদেবের বাঁধা,
বামুনভোজন হাজার পাঁচেক দক্ষিণা আর ছাঁদা।
কন্যা করেন ব্রতোপবাস ; পৈতে গলায় দিয়ে
দাঁড়ালে কেউ করেন প্রণাম পায়ের ধুলো নিয়ে।
অন্তঃপুরে থাকেন তিনি, ধর্মে বিশেষ মতি,
পক্ষপাত যা আছে কিছু কুলগুরুর প্রতি।
যা খুশি তার তাই সে করে, যাকে যা দেয় তাই,
গুণিজনের মান থাকে না, বিচার কিছু নাই।
সে যাই হোক্‌গে মোটের উপর পাত্রী মনের মতো।'
রাজা শুধান, 'দেখতে কেমন ? বয়স হবে কত ?
বিদ্যাবুদ্ধি ধরনধারণ বুঝে এলেন কিছু !'
প্রশ্ন শুনে জনপঁচিশেক নয়ন করেন নীচু।
'বুদ্ধি বিশেষ প্রখর মেয়ের', বলেন শিরোমণি।
গ্রহাচার্য বলেন, 'মেয়ের রাশিচক্র গুণি
বয়স কিছু বেশিই দেখি, দোষ যা দুষ্ট হয়
কোষ্ঠীতে সে সামলে নেব, তেমন কিছু নয়।'
কাব্যতীর্থ বলেন, 'মেয়ের হাঁটুর নীচে চুল ;
স্নান করে রোজ আপন হাতে তোলেন পুজোর ফুল,'
ঘটোৎসর্গ বলেন তখন—রাজার বিদূষক,
'রাজপ্রাসাদের ভিতর কন্যা খুলিয়েছে এক চক।
সেই বাজারে মেয়েই মণ্ডা নিত্য ছড়াছড়ি
বামুন দেখে দোকানদারে নেয় না কানাকড়ি।
পাকা আমের বরণ মেয়ে, জামের বরণ কেশ,
যুবরাজের যোগ্যা পাত্রী হবেন তিনি বেশ।'
কথার শেষে বলেন রাজা, 'তোমরা ভারী লোভী।
ভুলে গেছ আহার দেখে এবং দেখে গবী।'
হুকুম মতো সেপাই তাঁদের গোয়াল ঘরে নিয়ে
চর্ব্যচুষ্য খাদ্যশুদ্ধ রাখল কুলুপ দিয়ে।
মন্ত্রীসনে যুক্তি করে রাজা অতঃপর
পাঠিয়ে দিলেন অঙ্গরাজ্যে একশ গুপ্তচর।
কেউ বা এল কৃপাণ নিয়ে কেউ বা নিয়ে কাঁটা,
কারও গায়ে নামাবলী, কেউ বা বর্ম আঁটা,
উটের মতন ঢ্যাঙা এবং ব্যাঙের মতন বেঁটে
ছুটল যত রাজার পাইক হাজার ফন্দি এঁটে।

www.BanglaBook.org

অঙ্গরাজ্যের নাছদরজায় হস্তাখানেক ঘুরি।
কেউ আনিল খবর, 'কন্যা পাখ্‌নাকাটা 'হুরী'।'
কেউ বলিল, 'কেয়ার বরণ রাজকুমারীর দেহ।'
চাঁপার বরণ বলল বা কেউ 'কমলবরণ' কেহ।
মোটের উপর রূপেতে তার 'বিজুরি' যায় খেলে
অমন মেয়ে এই রাজ্যের অনেক ভাগ্যে মেলে।
সেপাইসান্ত্রী বলে, মেয়ের কোমল বড়ো মন।
'অন্নপূর্ণা' বলেন তারে অতিথি ব্রাহ্মণ।
অঙ্গরাজ্যে আঁদাড় পাঁদাড় হস্তাখানেক খুঁজি
কেউ আনিল খবর, 'মেয়ে খেঁদী এবং কুঁজী।
মেথরানী কয় 'নাক ছোটো তাই দেয় না বেসর নাকে।'
ঘেসড়ানী কয় 'চুল বাঁধে না,—এলিয়ে সে পিঠ ঢাকে।'
আসল কথা অন্তঃপুরে ঢুকতে নাহি পেয়ে,
সবাই এল গুজব শুনে—কেউ দেখেনি মেয়ে।
ব্যাপার বুঝে বলেন রাজা, 'যেমন তোরা গাধা
ঘোড়াশালার পিছন দিকে খোঁয়াড়ে থাক বাঁধা।'
এবার এল আদেশ পেয়ে পাঁচশ দাসী তাঁর—
কেউ রূপসী যুবতী—কেউ বৃদ্ধা কদাকার ;
ঢিপসী মোটা—চিমসে রোগা—নানান ছদ্মবেশে
অন্দরেতে খবর নিতে চলল অঙ্গদেশে।
মাসেক পরে ঘুরে ফিরে করল প্রণাম আসি—
কেউ বা ঈষৎ মলিন মুখে—কেউ বা ঈষৎ হাসি।
কেউ বা কাসে, কেউ বা কাঁপে, দাঁড়িয়ে বা কেউ চুপ
'ভয়ে না নির্ভয়ে ক'ব ? অভয় দিলেন ভূপ।
নানান দাসীর প্রতিবেদন তখন হল শুরু,
খবর শুনে কপালেতে উঠল রাজার ভুরু।
কারও সঙ্গে মিলল নাকো বর্ণনা আর কারো,
মেয়ের বয়স সাত না সাতাশ, বেয়াল্লিশ না বারো—
স্থির হল না—রঙটা কেমন—ময়লা, ফরসা, মেটে ;
একহারা না তিন হারা সে,—তালঢ্যাঙা না বেঁটে।
'কন্যা ভারী বেহায়া তার লজ্জাশরম নেই'
ছোটোরানী বলেন নাকি শুনেছে কেউ সেই।
মন্ত্রীগিন্নী বলেন, 'মেয়ের রূপের গুমোর আছে।
রূপ তো কত ! দাঁড়াক দেখি তাঁর মেয়েদের কাছে।'
কোটালগিন্নী বলেন, 'মেয়ের ছুঁচোর মতো নাক।'
পণ্ডিতানী বলেন, 'বাছা কষতে নারে আঁক।'
আচার্যিদের মেয়ে বলে, 'বেজায় লম্বা চুল,
এ কন্যে যার ঘরে যাবে থাকবে না তার কুল।'
সেনাপতির গিন্নী বলেন, 'নাক সদা রয় তুলে।'
বামনী বলেন, 'পরমান্নে গুড় দিতে যায় ভুলে।'
রাজা তখন চটেমটে চেঁচিয়ে বলেন জোরে,
'ভালো কে কি দেখতে পেলি, আগে তা বল্ মোরে।'
রাণীর দাসী মালতী সে মিষ্টি হেসে কয়,
'মোটের উপর রাজকুমারী মন্দ মোটেই নয়।
ধবধবে রঙ, কুচকুচে চুল, বচন মধুমাখা ;
পদ্মপলাশ চোখের ভুরু তুলির টানে আঁকা।
সখীরা কয় 'এমন লক্ষ্মী হাজারে নেই দুটি'
সেবাদাসী বলে 'আমার সারাবেলাই ছুটি।'
রাজা বলেন, 'মেয়ের আমার নেইকো কথা ঠোঁটে।'
কবি বলেন, 'গলা মেয়ের সপ্তমেতেও ওঠে।'
শিল্পী বলেন, 'রাজকুমারী ছবি আঁকেন ভালো।'
বড়োরানী বলেন, 'মেয়ে ঘর করে রয় আলো।'
তাই বলে কি নিন্দে বাড়ির কেউ করে না তাকে ?
দোষেগুণে অমন ধারা সবাই হয়ে থাকে।
পুরুতগিন্নী বলেন, 'মেয়ের দরাজ বড়ো হাত।'
কবিরাজের গিন্নী বলেন, 'অম্লশূলের ধাত।'
মালিনী কয়, 'নজর আছে, ফুলের কদর জানে।'
স্যাকরানী কয়, 'কৃপণ ভারী, শখ মোটে নেই প্রাণে।'
মন্ত্রিকন্যা বলেন, 'মেয়ের চলনটি নয় সোজা।'
নানান জনের নানান কথা, যায় না কিছুই বোঝা।
কেউ বলে, 'চোখ পটোল চেরা' কেউ বলে 'ড্যাবডেবে।'
কেউ বলে, 'চোখ খারাপ আছে, সদাই থাকে নেবে।'
রাজা তখন রেগে বলেন, 'সবাই সমান তোরা।
পরের নিন্দে করতে তোদের নেইকো কোথাও জোড়া।'
হুকুম পেয়ে রাজার পাইক অন্তঃপুরে নিয়ে
মুখে কাপড় বেঁধে তাদের রাখল কুলুপ দিয়ে।

* * *

কীর্তিপুরের বিকট রাজা সকল সমাচার—
ভালোমন্দ বিচার করে গড় কষিলেন তার :
অঙ্গদেশের রাজকুমারীর বয়স অষ্টাদশ,
রূপে গুণে অরুণকে সে করতে পারে বশ ;
সহায় হবেন অঙ্গপতি নূতন বৈবাহিক,
মরলে তিনি মেয়ে-জামাই রাজা পাবে ঠিক।
অঙ্গরাজের অপছন্দ হবে না তাঁর ছেলে
ভরসা আছে, বর্তে যাবেন এমন জামাই পেলে ;
মন্ত্রীকে তাই বরাত দিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ সনে
বিয়ের কথা স্থির করিতে পাঠান হৃষ্ট মনে।
ওদিকেতে অঙ্গরাজের ঘুম নাহিকো চোখে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বয়স্থা তাঁর মেয়ের তরে ; বিধি সুপাত্রকে
দিলেন যখন জুটিয়ে হঠাৎ, এক কথাতেই রাজী
হলেন তিনি ; গ্রহাচার্য বলেন খুলে পাঁজি,
'দেন যদি তো বিয়ে মেয়ের পরশু দেওয়া চাই ;
দশ বছরে এমন শুভলগ্নটি পাই নাই।'
কীকটপুরে ঊর্ধ্বশ্বাসে খবর দিল দূত,
'আজ বাদে কাল বিয়ের লগ্ন, সমস্ত প্রস্তুত।
এ বৎসরে এমন লগ্ন দ্বিতীয় আর নাই
শেষ রাতে কাল যা-করে-হোক বিয়ে দেওয়াই চাই।
রাজা যেন অদ্য রাত্রে বেরোন পত্রপাঠ
সঙ্গে নিয়ে বাজনাবাদ্যি পুরুত নাপিত ভাট।
সাদাহাতীর পিঠে কুমার সোনার বীণা হাতে
অঙ্গরাজ্যের সিংহদ্বারে পৌঁছনো চাই প্রাতে।
ছেলের গায়ে ছুঁইয়ে হলুদ গাত্র হরিদ্রার
মেয়ের বাড়ি এই মুহূর্তে পাঠান ঘোড়-সওয়ার।'

* * *

অঙ্গরাজ্যে বাধল হোথায় বিষম হুলুস্থুল,
রাজকন্যার আজ বাদে কাল ফুটবে বিয়ের ফুল।
চুলোয় গেল ব্রতোপবাস—চুলোয় গেল খেলা ;
রাজকুমারীর চতুর্দিকে সঙ্গিনীদের মেলা।
কেউ বলে 'বর বাহাত্তুরে—বিকটমূর্তি বুড়ো,'
কেউ বলে তার বাপ দেখেছে, কেউ বলে তার খুড়ো।
কেউ বা বলে, তরুণ বয়স, চাঁদের মতো বর।
এই নিয়ে খুব তর্কাতর্কি বাধল অতঃপর
ক'টি যে তাঁর পুত্রকন্যা—ক'টি যে তাঁর রাণী
সে সম্বন্ধে নানা গুজব,—আসেনি কেউ জানি।
ভোরের বেলায় সিংহদ্বারে সাদাহাতীর পিঠে
দেখলে পরেই চক্ষুকর্ণে বিবাদ যাবে মিটে।
আপাততঃ স্থির করে তাই, মাথা-ধরার ছলে
কন্যা কেঁদে বন্ধ ঘরে পড়েন শয্যাতলে।
অনেক করে ডাকাডাকি কণ্ঠ গেল চিরে—
হার মেনে শেষ বড়োরাণী ঘরে গেলেন ফিরে।
গায়ের হলুদ গায়ে শুকোয় চোখের জলে বান ;
কনকমালা মনে প্রাণে ডাকেন ভগবান।

* * *

রাজার ছেলে খবর পেলে নানা জনের কাছে,
অঙ্গদেশের রাজকুমারীর অনেক গুণই আছে!
যেমন বোকা, তেমনি কৃপণ, তেমনি অহঙ্কারী ;
এমন মেয়ে করলে বিয়ে বিপদ হবে ভারী!
কুঁজী হবার সম্ভাবনা, ট্যারা এবং খাঁদা ;
কুষ্ঠীতে তার আজ বাদে কাল পতিবিয়োগ বাঁধা।
বাপের হুকুম—কি করা যায়? মুখটি করে ভার
অরুণকুমার বসল চেপে গদিতে হাওদার।
মনের কথা মনে চেপে হেসে কাষ্ঠ হাসি
বললে মাকে, 'মাগো, তোমার আনতে যাচ্ছি দাসী।'
অনেকদিনের পরে এল সোনার বীণা হাতে।
রাজকুমারের আজ যেন আর সুর বাজে না তাতে।
বাজল ভেরী, বাজল তুরি, ডঙ্কা নিশান নিয়ে
মশাল জেবলে চলল সেপাই, যুবরাজের বিয়ে।
রাজ্য ভেঙে দেখতে এল পুরুষ নারীর দল।
কীকটপুরে আকাশ জুড়ে উঠল কোলাহল।
রাতদুপুরে পল্লী নগর ছাড়িয়ে শত শত
রাজার সেনা বনের পথে চলল ক্রমাগত।
সামনে বসে ঘুমোন রাজা মাহুত ঝিমোয় আগে,
সেপাইশান্ত্রী সবার চোখেই ঘুমের নেশা লাগে।
এই তো সুযোগ মশাল আলো পড়ছে বনের গাছে,
হাওদাটিতে রাতের আঁধার জমাট হয়ে আছে।
চাদর দিয়ে বীণাখানি পিঠের সঙ্গে বেঁধে
অরুণকুমার হাত বাড়ালেন অনেক যুক্তি ফেঁদে ;
পথের ধারে গাছের ডালে রয়ে গেলেন ঝুলে।
রাজার সৈন্য চলে গেল, দেখল না চোখ তুলে।

* * *

রাত না যেতে অন্ধকারে চাদরমুড়ি দিয়ে
রাজার মেয়ে নগরদ্বারে হাজির হলেন গিয়ে।
ক্রমে পথে শুরু হল লোকের চলাচল।
কীকটরাজের সৈন্য আসে উঠল কোলাহল।
খুলে গেল লৌহতোরণ ; বৈবাহিক আর বরে
বরণ করে নেবেন বলে পরম সমাদরে
এগিয়ে গেলেন অঙ্গপতি পাত্র মিত্র সাথে।
ফুলের গন্ধে, ধূপের ধোঁয়ায়, নেতের পতাকাতে
শুভ নগর ; বাদ্যে গীতে মুখর রাজপথ।
দু'পাশে তার সৌধ হতে বৃষ্টিধারাবৎ
পুরনারী খই ছড়িয়ে জানায় আমন্ত্রণ
অতিথিদের। শোভন বেশে আনন্দিত মন
নগরবাসী দাঁড়িয়ে পথে জয়ধ্বনি করে।
রাজার মেয়ের নজর কেবল সাদা হাতীর 'পরে।
সাদা হাতীর পিঠে বুড়ো মাথায় দিয়ে হাত।
কনকমালার শিরে যেন পড়ল বজ্রাঘাত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুহূর্তকাল প্রণাম করে উদ্দেশে বাপমা'র
রাজার মেয়ে ভিড়ের ভিতর শহর হলেন পার।
জানল না কেউ, দেখল না কেউ—সারা শহরময় ;
ভাবল না কেউ—বিয়ের দিনে বিবাগী লোক হয়।

* * *

দুপুরবেলা নদীর তীরে বিজনবনের ধারে
পাত্রপাত্রী মুখোমুখি দাঁড়াল একবারে।
দুজনেরি দেহে পুলক, চোখে ঘনায় ঘোর ?
কনক ভাবেন, 'কোথায় ছিল মনের মানুষ মোর ?'
অরুণ ভাবেন, 'কোথায় ছিল সোনার প্রতিমা এ ?
দুঃখ পেয়ে ছেড়েছে ঘর সন্দেহ নেই তাহে।
আত্মহত্যা করার বোধ হয় ইচ্ছা মনে আছে,
ঘটতে সেটি দিচ্ছি নাকো থাকতে আমি কাছে।'
কন্যা বলেন, 'রাস্তা ছাড়ো, মরব আমি ডুবে।
অরুণ বলেন, 'দাঁড়াও, আগে সূর্য ডুবুক পুবে।'
কনক বলেন, 'দেখছি তুমি আস্ত বোকার ধাড়ী'
অরুণ বলেন, 'বুদ্ধিমতী, কোথায় তোমার বাড়ি ?'
কন্যা বলেন, 'সে সব খোঁজে তোমার কিবা কাজ ?'
কুমার বলেন, 'নেমন্তন্ন খেতে যেতাম আজ।'
কন্যা শুধান, 'কি কাজ করো ?' অরুণ বলেন 'চুরি'।
'সোনার বীণা কোথায় পেলে ?' 'কীকট রাজার পুরী।'
কন্যা বলেন, 'কে করালে এমন সঙের বেশ ?'
অরুণ বলেন, 'কুঁজ ঢেকে যায় পড়ে মাথার কেশ।'
কন্যা শুধান, 'এমন মেয়ের খবর পেলে কোথা ?'
অরুণ বলেন, 'গেছল ঘটক অঙ্গরাজের হোথা।'
কনক তখন দাঁড়ান ফিরে চোখের অশ্রু মুছি।
অরুণ বলেন, 'রাগ কোরো না প্রশ্ন দুটো পুছি।
গয়না কোথায় পেলে এত ? কাজ করিতে কি ?'
কনক বলেন, 'আমি ছিলাম অঙ্গরাজের ঝি।'
অরুণ বলেন, 'কন্যা, তোমায় কে ছাড়াল ঘর ?'
কনক বলেন, 'হাতীর পিঠে বিকট বুড়ো বর।'
অরুণ বলেন, 'অঙ্গবালার বুদ্ধি এ-কোন্ দেশী ?'
কনক বলেন, 'কীকটপুরী, তোমার চেয়ে বেশি।
রাস্তা ছাড়ো, মরলে আমি তোমার কি যায় আসে ?
পারো যদি দিও খবর অঙ্গরাজের পাশে।
মরার আগে যাচ্ছি দিয়ে গজমোতির হার।'
অরুণ বলে, 'আমার ওতে প্রয়োজন কি আর ?
পড়লে ধরা চোর বলে ঠিক আজই দেবে শূলে।
গজমোতির হার কি তোমার স্বর্গে খাব গুলে ?
তার চেয়ে মোর কথা শোনো, আংটি দেব দান ;
আমার খবর দাওগো গিয়ে কীকট রাজার স্থান।
রাজার রাণী দেবতা-হেন,—দরাজ বড়ো বুক ;
তাঁহার কাছে চাকরী পেলে ঘুচবে তোমার দুখ।'
এমনি অনেক তর্কাতর্কি দণ্ড দুয়েক ধরে
চলল, শেষে সন্ধি হল দাসী এবং চোরে।
অনুতাপের রইল না শেষ বুঝে যে যার ভুল,
হেসে কেঁদে রাজার মেয়ে বাঁধেন তুলে চুল।
অরুণ কুমার বাজান বীণা ; শীতল নদীর বারি
আকণ্ঠ পান করে দুজন তৃপ্তি পেলেন ভারী।
কনকমালা দিলেন মালা, আংটি দিলেন বর।
অরুণ কুমার কিনতে ঘোড়া গেলেন অতঃপর।

* * *

উভয় রাজ্যে হাহাধ্বনি, সবার মাথায় হাত।
বিয়ের দিনে পাত্রপাত্রী উধাও অকস্মাৎ।
কীকটপুরীর রাজপ্রাসাদে বড়োরাণীর ক্রোড়ে
মুখ লুকিয়ে কনকমালা কাঁদেন অঝোর-ঝোরে।
হাত বুলিয়ে মাথাতে তার রানী বলেন, 'হেন
পাগলী ছাড়া পাগল ছেলের বউ মানাবে কেন ?
ভয় করো না, ছেলের ওপর রাজা আছেন চটে
তোমরা গিয়ে করলে প্রণাম থাকবে না রাগ মোটে।
আসতে বলে বাপকে তোমার শ্বশুর দেবেন চিঠি।
এই বাড়িতেই মিলবে দু'হাত, আপদ যাবে মিটি।
রাজা এলেন বাড়ি ফিরে মুখটি করে কালো
সন্ধ্যেবেলায়, দেখবে যা হোক,—মানুষ খুবই ভালো।
শেষ রাতে আজ লগ্ন আছে শুনেছি তাঁর মুখে ;
সে লগ্নেতেই হবে বিয়ে, থাকবে দু'জন সুখে।
সংক্ষেপেতে সারতে হলেও বাকী অনেক কাজ।
এখন চলো, দেখি কোথায় কীকট মহারাজ।
বিধু তুই যা পুরুত বাড়ি, সদু নাপিত ডাক।
বরণডালা সাজা তোরা বাজা সবাই শাঁখ।
অনেক ভাগ্যে আজকে আমার লক্ষ্মী ঘরে এল
আনন্দগান ধর রে সবাই, হুলুধ্বনি দে লো।'
টকোর নৌকো ডাঙায় চলে ; শেষ না হতে রাত
হোমের আগুন সাক্ষী করে মিলল চারি হাত।

* * *

অঙ্গরাজে খবর দিতে ছুটল সওয়ার বেগে।
বাজনা বাদ্যি শুনে উঠল নগরশুদ্ধ জেগে।
দুপুর রাতে লক্ষ প্রজা জুটল রাজার বাড়ি ;
তার পরে মাস খানেক কারও চড়ল নাকো হাঁড়ি।
লক্ষ লক্ষ পাতা পড়ে রাজপ্রাসাদের মাঠে
হাজার চাকর অবিশ্রান্ত পুরি-পোলাও বাঁটে ;
গয়ার পেড়া, কাশীর মালাই, বরফি, কালাকাঁদ—
গরিব দুঃখী দেদার খে'ল পুরিয়ে মনের সাধ।
পাত্রপাত্রী দেখে সবাই আনন্দে মশগুল।
কনকমালা নিত্য তোলেন রাজার পাকা চুল,
সামনে বসে খাওয়ান দিয়ে ময়ূরপাখার হাওয়া।
কীকটরাজের বানপ্রস্থে হল না আর যাওয়া।

১৩৮২

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুটিমারীর বেয়াড়া বাঘ

রণজিৎ রায়

॥ ১ ॥

এর আগে এই পত্রিকায় কয়েকটি হাতি শিকারের ঘটনা নিয়ে লিখেছিলাম—শুনেছি সেগুলি পাঠকদের ভাল লেগেছিল। এইবারে একটি বাঘ শিকারের কাহিনী বলব, আশা করি এটিও পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে পারবে।

বাঘ শিকারের কথা শুনেই হয়ত কোন কোন পাঠকের মনে হতে পারে, বাঘ শিকার করা ত বেশ কিছুদিন আগেই নিষিদ্ধ হয়েছে এবং এখন ত বাঘের সংখ্যা বাড়াবার জন্যেই নানারকম ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে. সুতরাং সে শিকারের গল্প আমি আজ বলতে যাচ্ছি তা কেমন করে সম্ভব হল। তাদের মনের এই সংশয় দূর করবার জন্যে আগেভাগেই বলে রাখছি—এই ঘটনা বিশ বছরেরও বেশী আগের কথা, তখন পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল। বর্তমানে বাঘ এবং অন্যান্য অধিকাংশ বন্য প্রাণীকে রক্ষা করা সত্যিই খুব জরুরী প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্বিচারে এবং বেআইনীভাবে, অসাধু ব্যবসায়ীদের প্ররোচনায়, শুধু টাকার লোভেই অনেক বন্য প্রাণীকে লুকিয়ে-চুরিয়ে হত্যা করা হচ্ছে আজকাল. কারণ এই ব্যবসায়ে লাভ প্রচুর। সম্প্রতি খবরের কাগজে দেখেছি, এখন একটি ভাল বাঘের চামড়া কলকাতার বাজারেই বিক্রি করে দশ থেকে পনের হাজার টাকা পর্যন্ত পাওয়া যায়—এবং সেই চামড়া বিদেশে চোরা চালান দিতে পারলে সেখানে পঞ্চাশ হাজার টাকা বা তারও বেশী দামে সৌখীন বড় লোকদের ঘর সাজাবার জন্যে বিক্রি হয়।

আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন এরকম অবস্থা কল্পনাও করা যেত না। তখন পর্যন্ত অধিকাংশ স্থানেই বাঘ শিকার শুধু অপেশাদার ভদ্র শিকারীরাই করতেন, নিজেদের শিকারের শখ মেটাতে, চামড়া বিক্রি করে অর্থোপার্জনের জন্যে নয়। এ দেশের সব সরকারী সংরক্ষিত বনেই বন বিভাগের নির্দিষ্ট আইনকানুন মেনে শিকার করতে হত—তার জন্যে বৈধভাবে অনুমতিপত্রও নিতে হত, এবং সাধারণতঃ কোন শিকারীকে কোন একটি সংরক্ষিত বনে বছরে একটির বেশী বাঘ মারবার অনুমতি দেওয়া হত না। তবে মানুষখেকো বা বিশেষ অত্যাচারী হলে সেরকম বাঘ সম্বন্ধে এই নিয়ম শিথিল করা হত। তেমন জন্তুকে মারবার জন্যে কর্তৃপক্ষই নিজেরা উদ্যোগী হয়ে বিশিষ্ট শিকারীদের অনুরোধ জানাতেন।

আমি আজ যে বাঘটির কথা বলব সেটি ১৯৫৭ সালের শেষ দিকে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার মোরাঘাট রিজার্ভ ফরেস্টের খুটিমারী ব্লকে বেশ উৎপাত শুরু করেছিল। এই জায়গাটি জলপাইগুড়ি সহর থেকে মাইল কুড়ি দূরে গয়েরকাটা নামে একটি বড় ব্যবসায় কেন্দ্রের কাছে। জলপাইগুড়ি থেকে যে জাতীয় সড়ক পূর্বদিকে তিস্তা নদী অতিক্রম করে কোচ-বিহার এবং আলিপুর দুয়ারের দিকে গিয়েছে সেই পথেই গয়েরকাটা পৌঁছানো যায়। গয়েরকাটাতেই মোরাঘাট ফরেস্টের 'রেঞ্জ' অফিস, তার অধীনস্থ খুটিমারী ব্লকের 'বীট্' অফিস, প্রায় চার মাইল দূরে রিজার্ভ ফরেস্টের ভেতরে। সেখানে একজন ফরেস্ট "বীট্ অফিসার" বা সংক্ষেপে "ফরেস্টার" মোতায়েন থেকে সেই ব্লকের কাজের তদারক করেন। এইসব বন বিভাগীয় অফিসারদের প্রধান কাজ, রিজার্ভ ফরেস্টের গাছপালার সংরক্ষণ এবং নিয়মিতভাবে বাছাই করে বড় গাছ-গুলি কাটিয়ে সেগুলি কাঠের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা,—সেই সঙ্গে কাটা গাছগুলির স্থান পূরণের জন্য নতুন গাছের চারা লাগানোও তাঁদের কর্মসূচির অঙ্গ ছিল। খুটিমারী বনে শালগাছের সংখ্যাই বেশী ছিল এবং বাজারে তার চাহিদাও ছিল যথেষ্ট। বন থেকে গাছ কেটে বাইরে নেবার সুবিধার জন্যে গয়ের-কাটা থেকে খুটিমারী ফরেস্ট অফিস ঘেঁষে ঐ বনের অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বেশ চওড়া একটি রাস্তা বনবিভাগ থেকেই তৈরী করা হয়েছিল ; সেই পথে মোষের গাড়ি এবং মোটর ট্রাকে করে কাটা গাছ সহজেই গয়েরকাটার বাজারে নিয়ে যাওয়া যেত। ঐ পথটি দিয়ে বনের ওধারের চা-বাগানগুলিতে যাবার সোজা রাস্তা ছিল বলে ঐ বনপথে সাধারণ মোটর গাড়িরও যথেষ্ট যাতায়াত ছিল।

আমাদের গল্পের নায়ক বাঘটি ১৯৫৭ সালের শীতের মরসুম শুরু হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খুটিমারী ফরেস্ট অফিসের প্রায় চার মাইল পশ্চিমে, এই বনের রাস্তাটির ওপরেই, তার ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। কোন গাড়ি বা ট্রাক ঐ পথ দিয়ে যাবার সময় সে তর্জন গর্জন করে তাদের দিকে তেড়ে আসত,—তার সেই হিংস্র মূর্তি দেখে গাড়ির চালকেরা আর এগোতে সাহস পেত না। ফলে বনবিভাগের কাঠ চালান দেবার কাজ বন্ধ হয়ে যাবার মতন হয়েছিল। বাঘের এরকম ব্যবহার ঐ অঞ্চলে একেবারেই নতুন, কারণ বাঘ সাধারণতঃ মানুষের সান্নিধ্য মেটেই পছন্দ করে না। বাঘের স্বভাব খুব সতর্ক এবং তার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি দুই-ই অত্যন্ত প্রখর হওয়ায় সে দূর থেকে মানুষের সাড়া পেলেই প্রায় নিঃশব্দে বনের মধ্যে গা ঢাকা দেয়। সেইজন্যে বনের মধ্যে চেষ্টা করলেও হঠাৎ বাঘের দেখা মেলা কদাচিৎ ঘটে থাকে। কি কারণে এই বাঘটির আচরণে এই অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম ঘটেছিল তা অনেক পরে জানা গিয়েছিল—যথাসময়ে সে বিষয়ে বলা যাবে।

গাড়ি চলাচলে এইরকম বাধা দেওয়া ছাড়াও এই বাঘটি অনেক রকম উৎপাতও এই সঙ্গেই শুরু করেছিল। বাঘের

www.BanglaBook.org

স্বাভাবিক খাদ্য অন্যান্য বনের প্রাণী, কিন্তু এই বাঘটি তার সেই স্বাভাবিক খাদ্য—প্রধানতঃ হরিণ এবং বুনো শুয়োর ছেড়ে দিয়ে অন্য আহার্যের দিকে ঝুঁকল। ঐ বনাঞ্চলে কাজের লোক পাবার সুবিধার জন্যে বনবিভাগ থেকেই সুবিধামতন জায়গা বেছে নিয়ে রাভা, মেচ, হাজং প্রভৃতি স্থানীয় উপজাতীয় লোকেদের জন্যে বসতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তারা বনের ভেতরেই চাষবাস করবার জন্যে কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে এবং সেখানেই নিজেদের বাসস্থান তৈরী করে তাদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় বেশ আরামেই বসবাস করত। চাষবাসের কাজ এবং দুধের জন্যে তারা গরু বাছুরও পুষত,—বনের ভেতরে এইসব পোষা জন্তুর খোরাকের জন্য ঘাস এবং গাছের পাতার কোন অভাব হত না।

আমাদের গল্পের বাঘটি এই সময়ে বনে প্রাণী শিকার করা ছেড়ে দিয়ে বনের বস্তির এইসব পোষা গরু বাছুর প্রভৃতি দিয়েই নিজের আহার্য সংস্থানের ব্যবস্থা করে নিল। প্রতিদিন বিকেল বেলায় সন্ধ্যা হবার কিছু আগে থেকেই সে ঐ বনপথের এমন একটা জায়গায় ঘাঁটি নিয়ে বসে থাকত, যেখান দিয়ে সারাদিন বনে চরবার পর পোষা গরু-বাছুরের দলগুলিকে রাত হবার আগেই বস্তিতে ফিরতে হত। সেই সুযোগ নিয়ে বাঘও অনায়াসে নিজের প্রয়োজন এবং পছন্দ মতন একটি জন্তুকে মেরে তার দু'তিন দিনের মতন খাবার ব্যবস্থা করে নিত। আমি যখন এইসব খবর প্রথম জানতে পাই ততদিন সে ছয় সপ্তাহে ষোলটি গরু মেরেছে বলে শুনলাম। বাঘের স্বভাবের এই পরিবর্তনের কারণও পরে জেনেছিলাম, সে কথাও যথাসময়ে বলব।

বাঘটার এইসব বেয়াড়া কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমাকে প্রথমে কেউ সরাসরি জানায়নি, যেভাবে তার কথা জানতে পারলাম সেই কথা এখন বলছি। সেই সময়ে আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি-সংস্কার সংস্থার অধিকর্তা, (বা ল্যান্ড রিফর্মস কমিশনার) ছিলাম। আমার প্রধান দপ্তর কলকাতায় 'রাইটার্স বিল্ডিংস্'এ ছিল, কিন্তু সংক্রান্ত কাজের তদারকী করবার জন্যে আমাকে সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই নিয়মিত সফরে যেতে হত, বিশেষতঃ শীতকালে অনেক সময়ে মাসে ১৫।১৬ দিনও এইজন্যে 'টুরে' থাকতে হত। জলপাইগুড়ি আমার পরিচিত এবং প্রিয় জায়গা, কারণ ঐ জেলায় আমি ১৯৪৬-৪৭ সালে প্রায় দু'বছর 'ডেপুটি কমিশনার' বা জেলা শাসক ছিলাম। এই গল্পের ঘটনার সময়ে জলপাইগুড়িতে যিনি ভূমিরাজস্ব এবং ভূমি সংস্কার কাজের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন তিনি একজন তরুণ দক্ষিণ ভারতীয়। তাঁকে আমি তাঁর নিজের অনুরোধেই জলপাইগুড়িতে বদলি করেছিলাম, কারণ তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে বন্য প্রাণিদের বিষয়ে তাঁর খুব জানবার আগ্রহ আছে,—জলপাইগুড়িতে থাকলে সেখানকার বনে জঙ্গলে তাদের দেখা পাওয়ার সুযোগ হবে এবং তাদের স্বভাব এবং গতিবিধি সম্বন্ধে তিনি অনেক কিছু জানতে পারবেন।

এই কাহিনীর জন্যে সেই অফিসারটির নাম মনে করা যাক রাজন। (এটা অবিশ্যি তাঁর প্রকৃত নাম নয়, কিন্তু একটা নাম ব্যবহার করতে না পারলে গল্পটা সহজে এগোবে না।) সরকারী চাকরীতে যোগদান করবার আগে ইনি নিয়মিতভাবে সংবাদপত্রে লেখা পাঠাতেন, সেই সূত্রে কলকাতার 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর বেশ জানাশোনা ছিল। ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি ঐ পত্রিকায় একদিন তাঁর একটি বেশ বড় লেখা প্রকাশিত হল, "জলপাইগুড়ির বাঘেদের অদ্ভুত আচরণ" সম্বন্ধে। সেই লেখাটির সারাংশ মোটামুটি এই রকমঃ—একদিন বিকেলে রাজন তাঁর স্ত্রীর ছোটভাইকে সঙ্গে নিয়ে খুটিমারী ফরেস্টের যে রাস্তায় এই কাহিনীর বাঘটি তার ঘাঁটি বসিয়েছিল সেই পথে জীপে করে কোথাও যাচ্ছিলেন। ফরেস্ট বংলো থেকে যখন মাইল চারেক পশ্চিমে চার নম্বর ফরেস্ট গেটের কাছে পৌঁছলেন তখন তাঁরা সহসা দেখতে পেলেন তাঁদের সামনে ঠিক পথের মাঝখানেই একটি হৃষ্টপুষ্ট ডোরাদার বাঘ মাটির ওপরে চেপে বসে আছে, সোজাসুজি তাঁদের জীপের দিকেই তাকিয়ে। জীপটি আরেকটু এগোতেই বাঘটা উঠে দাঁড়াল, এবং সাধারণ বাঘের মতন ত্রস্তভাবে বনের ভেতরে সরে গিয়ে আত্মগোপন না করে, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে এক হুঙ্কার ছাড়ল। বাঘের সেই বিরূপ ভাব এবং ভীতিপ্রদ চেহারা দেখে জীপের ড্রাইভার আর এগোতে সাহস করল না, তাড়াতাড়ি জীপটা ডান দিকে ঘুরিয়ে সেখানকার ফরেস্ট গেটের ভিতর দিয়ে যে সরু পথটি বনের ভেতরে চলে গিয়েছিল সেই পথে ঢুকিয়ে দিল। সিন্তু এই পথটি বনের ভেতরে ঢোকবার জন্যেই তৈরী এবং বনের মাঝখানেই বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং সেই পথ ধরে বনের অন্য প্রান্ত থেকে বেরোনো বা ফরেস্ট বাংলোয় ফেরা সম্ভব ছিল না। তখন অগত্যা সেই অপরিসর পথের মধ্যেই জীপটা কোনরকমে ঘুরিয়ে ফেরার উদ্যোগ করতেই তাঁরা দেখলেন যে বাঘ ততক্ষণে ঐ দুই রাস্তার সংযোগস্থলের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছে—তার মুখ তখন জীপের দিকেই ফেরানো এবং চেহারায় পুরোপুরি 'রণং দেহি' ভাব।

এই অভাবিত সংকটে পড়ে জীপের আরোহী প্রত্যেকেরই তখন মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। তখন ড্রাইভারকে বলা হল জোরে জীপের হর্ন বাজাতে, কিন্তু সেই শব্দে বাঘ একটুও ভড়কাল না এবং তার চেয়েও বেশী গলা চড়িয়ে গর্জন করতে লাগল। ততক্ষণে দিনের আলো ফুরিয়ে গিয়ে বনের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে, বাঘেরও নড়বার লক্ষণ নেই। তখন মরিয়া হয়ে রাজন ড্রাইভারকে বললেন, পুরো 'হেড লাইট' জ্বালিয়ে এবং সেই সঙ্গে 'হর্ন' যত চড়া আওয়াজে বাজানো যায় তাই করে জীপটাকে যত জোরে সম্ভব চালিয়ে বাঘের দিকে এগিয়ে যেতে—যাতে ঐভাবে কাছে গেলে বাঘ যদি একটুক্ষণের জন্যেও ভড়কে গিয়ে সরে দাঁড়ায় তাহলে তাঁরা তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারবেন।

ড্রাইভার সেইভাবে জীপ চালিয়ে বাঘের কাছে পৌঁছতেই, বোধ হয় জীপের তীব্র আলো এবং কান ফাটানো হর্নের আওয়াজে একটু হতচকিত হয়ে এবং জীপের ধাক্কা এড়াবার জন্যেই, বাঘটি এক মুহূর্তের জন্যে একটু সরে দাঁড়াল, এবং সেই সুযোগে ড্রাইভার ঝড়ের বেগে তাকে পার হয়ে গিয়ে ফরেস্ট বাংলোর পথ ধরল। রাজন আরো লিখেছিলেন যে জীপটি পাশ কাটিয়ে যাবার পরেই নাকি বাঘ ফিরে পেছনে ধাওয়া করে জীপের ওপরে লাফ দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার নাগাল পায়নি, এবং তাই দেখে তাঁর সঙ্গী আতঙ্কে কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়েছিলেন।

বলা বাহুল্য, খবরের কাগজের এই বিবরণ পড়ে এই বাঘটি

www.BanglaBook.org

সম্বন্ধে আরও তথ্য জানবার জন্যে কৌতূহল জেগেছিল আমার মনে, কারণ বাঘের পক্ষে এরকম আচরণ খুবই অস্বাভাবিক। বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের কোনো বাঘই তখন মানুষখেকো ছিল না, যতদূর নিজের অভিজ্ঞতায় জেনেছি তারা বেশ শান্ত প্রকৃতির এবং মানুষের সঙ্গে এরকম অভদ্র আচরণ করতে কখনও শুনিনি। সেইজন্যে সরেজমিনে ব্যাপারটা ভাল করে জানবার জন্যে ডিসেম্বরের প্রথম দিকেই জলপাইগুড়ি জেলায় একটা "টুরে" বেরিয়ে পড়লাম।

জলপাইগুড়িতে পৌঁছে রাজনের সঙ্গে দেখা হতেই খবরের কাগজের ঐ ঘটনাটি সম্বন্ধে কথাবার্তা হল। আমি মন্তব্য করলাম যে কোনো সাধারণ বাঘের পক্ষেই এইরকম আচরণ স্বাভাবিক নয়,—খুব সম্ভবতঃ তাঁরা যখন বাঘটির কাছে গিয়ে পড়েছিলেন সেই সময়ে সে সদ্য শিকার-করা কোন জন্তুকে আগলে বসেছিল—হঠাৎ তাঁদের এগিয়ে আসতে দেখে তার বোধ হয় ধারণা হয়েছিল যে, সেই শিকার থেকে তাঁরা ওকে বেদখল করবেন। এই আশঙ্কাতেই সে ভয় দেখিয়ে তাঁদের দূরে রাখতে চেয়েছিল, তার চেয়ে বেশী কিছু অনিষ্ট করবার জন্যে নয়। রাজন তখন খুব জোর দিয়েই বললেন যে তা নয়, পরিস্থিতি সত্যিই অন্য রকম। ঐ ঘটনার পর তিনি খুটিমারীর ফরেস্টার এবং অন্যান্য স্থানীয় লোকদের কাছে শুনেছেন যে বাঘটি বেশ কিছুদিন হল প্রতিদিন বনের ঐ রাস্তার ওপরে সন্ধ্যা হবার আগেই এসে বসে থাকে,—তখন ঐ পথে কেউ যাতায়াত করতে গেলেই ঐভাবে তাকে তাড়া করে আছে এবং ঐ জায়গায় বসেই দু'তিন দিন অন্তর স্থানীয় বস্তির লোকেদের পোষা গরু-মহিষ একটিকে খাবার জন্যে মেরে থাকে। এইভাবেই বাঘটির ঐ সময়ের অস্বাভাবিক কার্যকলাপের বিস্তারিত বিবরণ শুনতে পেলাম, যা এই গল্পের গোড়াতেই বলেছি।

রাজনের সঙ্গে কথা বলবার পর আমি ঐ বাঘটির সম্বন্ধে আরও শুনলাম স্থানীয় জেলাশাসক শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র মুখার্জী এবং 'তিস্তা-তুরসা গেম অ্যাসোসিয়েশনে'র সেক্রেটারী প্রফুল বসুর কাছ থেকে। তাঁরা দুজনেই রাজনের কথা সমর্থন করে আমাকে জানালেন যে ঐ বাঘের উৎপাতে স্থানীয় লোকেদের যথেষ্ট অসুবিধা এবং ক্ষতি হচ্ছে, এবং খুটিমারী থেকে কাঠের চালান বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রমে বনবিভাগ এবং কাঠের ব্যবসায়ীদের বিস্তর লোকসান হচ্ছে। এঁরা দুজনই আমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলেন আমি যেন এই বাঘটিকে মেরে এই সংকট অবস্থার অবসান ঘটাই। আমি তাঁদের কথা দিলাম যে এবিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তার পরদিন রাজনের সঙ্গে আলোচনা করে সেইদিনই দুপুরের খাওয়া সেরে আমরা একসঙ্গে বেরিয়ে পড়া ঠিক করলাম। গয়েরকাটা ছাড়িয়ে মাদারীহাট নামে একটি জায়গায় আমার কিছু স্থানীয় পরিদর্শনের কাজ আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, কিন্তু রাজন প্রস্তাব করলেন আমি যেন গয়েরকাটা থেকে চার মাইল দূরে খুটিমারী ফরেস্ট বাংলোতেই সেদিনটা থেকে যাই, এবং সেইদিন বিকেলেই বাঘটির খোঁজে একবার বেরোই। আমিও এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম।

রাজন সেদিন দুপুরে তাঁর বাড়িতে আমাকে খাবার নিমন্ত্রণ

www.BanglaBook.org

জানালেন, সুতরাং আমি তৈরী হয়ে আমার লোকজন এবং জিনিসপত্র নিয়ে একটা জীপে করে বেলা বারোটা নাগাদ সেখানে গেলাম। খাবার টেবিলে বসে আমাদের আলাপ-আলোচনা ঐ ব্যাঘ্র অভিযান সম্বন্ধেই বেশী হয়েছিল, দেখলাম ঐ বাঘকে শিকার করা সম্বন্ধে রাজনের প্রচণ্ড আগ্রহ। আমার প্রথমে মনে হয়েছিল যে আগে কখনো বাঘ শিকার দেখবার সুযোগ হয়নি বলেই তাঁর অত উৎসাহ এবং উত্তেজনা, কিন্তু পরে বুঝলাম শুধু তাই নয়,—ঐ বাঘটা সম্বন্ধে একটা ব্যক্তিগত বিরোধের ভাবও তাঁর মনে রয়েছে। কারণ প্রসঙ্গে তিনি বললেন "আই হ্যাভ্ এ স্কোর অফ্ অনার টু সেটল্ উইথ্ দ্যাট্ টাইগার"—অর্থাৎ এই বাঘটির সঙ্গে আমার সম্মানঘটিত একটি লড়াইয়ের ফয়সালা হবার আছে। শুনে আমার বেশ একটু কৌতুক অনুভব হয়েছিল, কিন্তু কোন মন্তব্য করিনি, কারণ বুঝলাম সে বাঘটি ওঁকে ঐভাবে বন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তাঁর মানহানির অপরাধ করেছে।

এইখানে বোধহয় বলা প্রাসঙ্গিক হবে যে আমি কলকাতার বাইরে সফরে গেলে সব সময়েই সঙ্গে বন্দুক ('শট্গান্') এবং বড় শিকারের সম্ভাবনা থাকলে রাইফেলও নিয়ে যেতাম, কারণ মফস্বলের অনেক জায়গাতেই তখনকার দিনে অল্পবিস্তর ছোট এবং বড় শিকার পাবার সুযোগ মিলত। রাজনের কোন আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না, কিন্তু তাঁর বাড়িতে একটি খুব সুন্দর ক্যামেরা দেখে আমি তাঁকে সেটি সঙ্গে নিতে বললাম, যাতে সুযোগ পেলে ছবি তোলা যায়—আমার নিজের কোন ক্যামেরা ছিল না।

খাওয়া শেষ করে বেলা দুটো নাগাদ আমরা রওনা হলাম। রাজন আর আমি একই জীপে চড়লাম, অন্য জীপটি লোকজনদের নিয়ে আমাদের অনুসরণ করল। জলপাইগুড়ি ছেড়ে তিস্তা নদী পার হয়ে কিছুক্ষণ পরে যখন আমরা গয়েরকাটার কাছাকাছি পৌঁছেচি তখন রাজনকে যেন একটু উন্মনা দেখলাম, মনে হল যেন কোন ভাবনা তাঁর মনকে অধিকার করে বসেছে আর সেই-সঙ্গে তাঁর কথাবার্তাও ক্রমেই কমে আসছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর তিনি হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন, 'মিঃ রায়, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। আমরা যারা শিকারী নই, তারা কি মাত্র একজন শিকারীর রাইফেলের ওপরে নির্ভর করে এই রকম শিকারে নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে ভরসা রাখতে পারি?' প্রশ্নটি শুনে আমি একটু অবাক হয়েছিলাম, উত্তরে বললাম, 'এতে দুর্ভাবনার কি আছে? এখানকার বাঘেরা ত অকারণে মানুষকে অতর্কিতভাবে আক্রমণই করে না, বরং বনে জঙ্গলে তাদের খুঁজে বার করাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। তাছাড়া আহত না হলে তারা কখনই আক্রমণ করে না, এমনকি অনেক সময় আহত হয়েও তা করে না। যদি গুলি করার সুযোগ পাই তাহলে বোধহয় তার পক্ষে আর পাল্টা আক্রমণই করা সম্ভব হবে না। তুমি ত বলেছো জিম্ করবেটের সব বই তোমার ভাল করে পড়া আছে—বাঘেদের স্বভাব সম্বন্ধে তিনি ত স্পষ্ট করেই সব কিছু লিখে গেছেন।' রাজন বোধ হয় আমার কথায় একটু অপ্রস্তুত হয়েছিলেন, একটু ভেবে উত্তর দিলেন, 'জিম করবেট ত লিখেছেন, কিন্তু বাঘেরা যে সব সময়েই সেইরকম ব্যবহার করবে তা কে বলতে পারে?—বাঘেরা ত করবেটের বই পড়েনি!' রাজনের এই মন্তব্য শুনে আমি হেসে ফেললাম এবং তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম যে তাঁর বিপদের কোন কারণ ঘটবে না, কারণ আমার রাইফেলটি খুব শক্তিশালী এবং নিশানায়ও নিখুঁত, আর আমি লক্ষ্য অব্যর্থ হবে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই গুলি চালাই,—সুতরাং যদি বাঘের দেখা পাবার সৌভাগ্য আমাদের হয় এবং আমি গুলি চালাবার সুযোগ পাই তাহলে তারপর বাঘের আর বিপদ ঘটাবার সামর্থ্য থাকবে না।

আমরা গয়েরকাটা পার হয়ে খুটিমারী ফরেস্ট বাংলোয় পৌঁছলাম বেলা চারটে নাগাদ। সেখানে ফরেস্টারের (ফরেস্ট 'বিট' অফিসার) দেখা পেলাম না, বাংলোর চৌকিদারের কাছে শুনলাম তিনি বাঘের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে তাকে মারবার জন্যে শিকারীর খোঁজে গয়েরকাটার দিকে গিয়েছেন, যদি কোন স্থানীয় বন্দুকধারীকে ঐ বাঘের মোকাবিলা করবার জন্যে রাজী করাতে পারেন সেই আশায়। বলা বাহুল্য আমরাও যে সে-দিন সেই উদ্দেশ্যেই সেখানে যাব এ খবর তাঁর জানা ছিল না।

আমরা জীপ থেকে মালপত্র নামিয়ে চৌকিদারকে চায়ের জল গরম করতে বললাম এবং তাড়াতাড়ি চা খাওয়া সেরে আমি শিকারের পোশাক পরে রাইফেল পরিষ্কার করে তাতে গুলি ভরে নিয়ে আবার জীপে চড়লাম। রাজনের শিকারের পোশাক ছিল না, কিন্তু তিনিও সঙ্গে যেতে চাইলেন বাঘের ঘাঁটিটি আমাকে দেখিয়ে দেবার জন্যে—তাঁর মনে সাহস আনবার জন্যে আমার দোনলা বন্দুকটি গুলি ভরে তাঁর হাতে দিলাম। জীপের চালক আমার পূর্বপরিচিত যুক্ত প্রদেশের একজন শক্ত সমর্থ এবং বেশ সাহসী লোক, তাকে নিয়ে আমি একাধিকবার জল-পাইগুড়ি এবং কোচবিহার সফর করেছি। জীপে আমরা তিন-জনেই সামনের সীটে বসলাম, আমি একেবারে ডাইনে, যাতে সহজে ওঠানামা করতে পারি, ড্রাইভার তার নিজস্ব বাঁ-ধারের জায়গায় এবং রাজন আমাদের দু'জনের মাঝখানে, কারণ তাঁর ভূমিকা কেবলমাত্র দর্শকের এবং পথপ্রদর্শকের। জীপে ওঠবার সময়ে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম সময় ঠিক ৪-৩০ মিনিট। সেদিনটি ছিল ১২ই ডিসেম্বর (১৯৫৭ সাল)—শীতের বেলা পড়ে এসেছে, বনের ভেতরে সন্ধ্যার অন্ধকার তখনই অল্প অল্প জমতে শুরু করেছে, তবে আমাদের যাবার পথটি বেশ চওড়া এবং সোজা পশ্চিমমুখী হওয়াতে তাঁর ওপরে অস্তগামী সূর্যের আলোর আভা তখনও বেশ উজ্জ্বল। রাজন জানালেন, যেখানে বাঘের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা সেখানে পৌঁছোতে দশ বারো মিনিটের বেশী লাগবে না—সুতরাং আশা ছিল যে তখন যদি পথের ওপরেই বাঘের দেখা মেলে তাহলে তাকে স্পষ্ট দেখতে কোন অসুবিধা হবে না। তাছাড়া আমার রাইফেলে একটি খুব ঝকঝকে সাদা এনামেলের 'ফোরসাইট' লাগানো ছিল, তার সাহায্যে আলো একটু কম থাকলেও তাড়াতাড়ি নিখুঁত নিশানা নেওয়া সম্ভব হয়।

আমি ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলাম, জীপটি যেন ঘণ্টায় ২০।২৫ মাইলের বেশী বেগে না চালায় এবং বাঘের দেখা পেলে যেন হঠাৎ ব্রেক কষে গাড়ি না থামায়, কারণ তাহলে সেই শব্দে চমকে গিয়ে বাঘ তৎক্ষণাৎ পাশে সরে গিয়ে বনের মধ্যে গা-ঢাকা দিতে পারে। ঐ সময়ে আমার সঙ্কেত পাবামাত্রই সে যেন 'ক্লাচ' চেপে জীপটিকে আস্তে এগিয়ে থামতে দেয়, যাতে ব্রেকের শব্দ একেবারেই না হয়—এই জরুরী কাজটা তাকে খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিলাম। চলতে শুরু করে আমি আরও নির্দেশ দিলাম, ড্রাইভার যেন পথের বাঁদিকে ভাল করে নজর

www.BanglaBook.org

রাখে রাস্তার কিনার ঘেঁষে কোনও জানোয়ার দাঁড়িয়ে আছে কিনা ; আমি নিজে পথের ডানদিকটা দেখবার ভার নিলাম এবং রাজনকে বললাম সোজাসুজি সামনের দিকে রাস্তার ওপরে যতদূর দৃষ্টি যায় খুব ভাল করে নজর রাখতে।

এইভাবে চলে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই চার নম্বর গেটের চৌরাস্তার কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। সে পর্যন্ত সারা পথে মাত্র একটি সম্বর হরিণকে রাস্তার ডানধারে বনের মধ্যে এক ঝলক দেখা ছাড়া অন্য কোন জন্তু আমাদের নজরে আসেনি। চৌরাস্তায় যখন প্রায় পৌঁছে গিয়েছি তখন আমি বেশ নিরাশ হয়েই বললাম, 'বাঘ বোধ হয় আজ আর দেখা হল না,'—আমার দৃষ্টি তখন রাস্তার ডান ধারের বনের দিকেই বেশী ফেরানো ছিল। ঠিক তার পরমুহূর্তেই রাজনের চাপা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনলাম—'দেয়ার হী ইজ্ !' চোখ সামনে ফিরিয়েই দেখলাম, প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে পথের ঠিক মাঝখানেই একটি বাঘ মাটির ওপরে চেপে বসে আছে, আমাদের জীপের দিকে সোজ তাকিয়ে। আমার সংকেত পেয়ে ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ জীপটিকে ঠিক যেভাবে বলেছিলাম তেমনিভাবে আস্তে থামিয়ে দিল—গাড়িটি গজ কুড়ি এগিয়ে গিয়ে বাঘের থেকে ত্রিশ গজ মতন দূরে থামল। বাঘটি ততক্ষণে দাঁড়িয়ে উঠে হালকা পায়ে তিন চার কদম একটু কোনাকুনিভাবে এগিয়ে এসে আমাদের রাস্তার বাঁ ধারে ঘেঁষে দাঁড়াল। সেই সময়ে তার শরীরের ঝকঝকে সোনালী হলুদ রংয়ের ওপর উজ্জ্বল কালো ডোরার নক্সা পড়ন্ত সূর্যের আলোয় যে কি এক অপরূপ ছবি এঁকেছিল তা কোনদিন ভোলবার নয়। কিন্তু তারপরেই তার চেহারার অন্য আর এক রূপ দেখলাম ; সে মাথাটা কাঁধের থেকে নিচে নামিয়ে এনে স্থির দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে তার মুখ-ব্যাদান করে এমন একটি দাঁতখিঁচুনি দিল যে তার মনের ভাব বুঝতে আমাদের একটু দেরী হল না—বুঝলাম সে আমাদের সাবধান করে দিচ্ছে, তাকে যেন না ঘাঁটাই।

॥ ২ ॥

এইটুকু সময়ের মধ্যেই আমাকেও একটি জরুরী প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে নিতে হয়েছিল। সে বিষয়ে একটু বিশদভাবে বলা দরকার, যদিও তাতে বোধহয় গল্পের গতি একটুক্ষণের জন্যে কতকটা মন্থর হয়ে পড়বে।

বাঘকে দেখামাত্রই আমাকে নিশ্চিতভাবে স্থির করতে হয়েছিল, তাকে কিভাবে অর্থাৎ শরীরের কোন জায়গায় গুলি করলে, প্রথম গুলিতেই তাকে মেরে ফেলা যাবে, কিম্বা এমনভাবে জখম করা যাবে যাতে সে আক্রমণ করতে বা পালিয়ে যেতে না পারে। বাঘকে ঠিক সোজাসুজি সামনে থেকে মাথায় গুলি করা নিরাপদ নয়, কারণ বাঘের মাথার খুলির গড়ন এরকম যে রাইফেলের গুলি চোখের একটুও ওপরে লাগলে ভেতরে ঢুকে মগজে না পৌঁছিয়ে অনেক সময়েই পিছলে পাশের দিকে বেরিয়ে যায়। যদি সোজা একটি চোখের ভিতর দিকের কোনায় গুলি লাগানো যায় তাহলেই শুধু গুলি ঐভাবে দিক্‌ভ্রষ্ট না হয়ে তার মগজ ভেদ করতে পারে, কিন্তু এই বাঘটি তার মাথা এমনভাবে নিচু করে রেখেছিল যে তার চোখ আমি স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছিলাম না, কারণ সূর্যের আলো তার পেছন দিক থেকে আসায় তার মুখে গাঢ় ছায়া পড়েছিল—আর সেই আলো সোজা আমার চোখে পড়ায় আমার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতাও একটু কমে গিয়েছিল। মগজের পরে দ্বিতীয় মর্মস্থল মাথার এবং শরীরের মাঝখানে ঘাড়ের অংশ, কিন্তু সামনে থেকে গুলি চালিয়ে সেই জায়গাটিতে গুলি লাগানো যায় না। সামনে থেকে গলার ঠিক নিচে গুলি করলে হৃৎপিণ্ডের ওপরের বড় রক্তবাহী ধমনীগুলি ছিঁড়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটায়, কিন্তু এক্ষেত্রে তাও সম্ভব ছিল না, কারণ বাঘ মুখ নিচু করে থাকায় গলার সেই জায়গাটি ঢাকা পড়েছিল, তা ছাড়া সে তার বাঁ পা অনেকটা সামনে বাড়িয়ে দাঁড়ানোতে বুকেরও অনেকটা অংশ আড়াল হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং আমি স্থির করলাম তার বাঁ পা এবং কাঁধের অস্থিসংযোগের জায়গাটি ভেদ করে গুলি চালাব,—ঐ জায়গায় গুলির আঘাত লাগলে সমস্ত শরীরের স্নায়ুমণ্ডলীতে এমন প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয় যে তাতে আহত জন্তু তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে ; তাছাড়া কাঁধের হাড় ভাঙলে সেদিকের পা-টাও অকেজো হয়ে যায়, আক্রমণের কাজে আর তাকে ব্যবহার করা যায় না।

পরিস্থিতি বোঝাতে আমার যতটা সময় লাগল, নিজে সে বিষয়টি উপলব্ধি করতে আমার কিন্তু তা মোটেই লাগেনি,—এক মুহূর্তের মধ্যেই করণীয় সিদ্ধান্ত ঠিক করা হয়ে গিয়েছিল। এই রকম সময়ে মানুষের মন যে কি রকম তড়িৎগতিতে কাজ করে সে কথা আমি আগের কোন কোন শিকার-কাহিনীতেও বলেছি।

জীপ থামবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি মনের দিক দিয়ে এইভাবে প্রস্তুত হয়ে, রাইফেলের 'সেফ্‌টি-ক্যাচ' খুলে জীপ থেকে নামবার জন্যে পা বাড়ালাম। ঠিক তখনই এমন একটি ব্যাপার ঘটল যার জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমার ডান পা মাটিতে ঠেকাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার ঘাড়ের পেছনে জার্কিনের কলারে প্রচণ্ড টান অনুভব করলাম, সঙ্গে সঙ্গে রাজনের প্রায় রুদ্ধকণ্ঠের আর্তনাদ—'আমাকে ছেড়ে যাবেন না !'

এরকম সঙ্গীন অবস্থায় আমি খুবই কম পড়েছি, কারণ বাঘ তখন আমাকে স্পষ্ট করে দেখতে পেয়ে তার দাঁতখিঁচুনি আরো বিকট করে তুলেছে। ঠিক ঐ সময়ে যদি সে আক্রমণ করত তাহলে ঐ রকম বিজড়িত অবস্থায় আমি রাইফেল চালিয়ে তাকে রুখবার কোন সুযোগই পেতাম না। এক মুহূর্তও বাঘের চোখ থেকে চোখ ফেরানো বিপজ্জনক ; আমার ডান হাতে রাইফেলের মুঠি ধরা ছিল, তাই বাঁ হাতে ঘাড়ের পেছনে চালিয়ে বেশ জোরেই এক ঝাঁচড় দিয়ে রাজনের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমি জীপের সামনে বনেটের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপরে সন্তর্পণে রাইফেল কাঁধে ওঠালাম—হঠাৎ তা করলে বাঘ হয়ত চমকে গিয়ে লাফ মেরে বনের মধ্যে অদৃশ্য হত, অথবা তাকে আক্রমণ করা হচ্ছে মনে করে 'চার্জ' করে বসত। সেই সময়ে আমার মনের একমাত্র প্রার্থনা ছিল,—বাঘ যেন অন্ততঃ আরো এক সেকেণ্ড সময় না নড়ে স্থির হয়ে থাকে।

রাইফেলের সাদা 'ফোরসাইট্' বাঘের কাঁধের সঙ্গে এক লাইন হাওয়া মাত্রই 'ট্রিগার' টিপলাম,—গুলি বেরোবার চড়া আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই এক মুহূর্তের জন্যে মনে হল আমার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে, কারণ বাঘের অতবড় সোনালীর ওপরে কালো ডোরা-কাটা উজ্জ্বল শরীরটা যেন হঠাৎ আমার চোখের সামনেই অদৃশ্য হয়ে মিলিয়ে গেল। তারপরেই দেখলাম, বনের রাস্তার কিনারা ধরে প্রায় এক হাত উঁচু যে ঘাস গজিয়েছিল

www.BanglaBook.org

তার মধ্যে বাঘের চারটি পা অসহায়ভাবে একবার আকাশের দিকে উঁচু হয়ে উঠে যেন কোন কিছুকে আঁকড়ে ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা করল,—তার পরমুহূর্তে তাও মিলিয়ে গেল. বুঝলাম বাঘের দেহটি রাস্তার কিনারা থেকে গড়িয়ে পাশের জঙ্গলের ভেতরে পড়ে গিয়েছে।

বাঘ পড়েছিল রাস্তার বাঁ-ধারে। সেখানকার জমি রাস্তার চেয়ে প্রায় তিনফুট নিচু, সুতরাং যেখানে দাঁড়িয়ে আমি গুলি করেছিলাম সেখান থেকে আর তাকে দেখা যাচ্ছিল না। তখন আমি গজ পনের এগিয়ে গিয়ে রাস্তার বাঁ ধারে দাঁড়িয়ে তাকে দেখবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তখন শাল গাছের ফাঁকে ফাঁকে যে হালকা ঝোপঝাড় ছিল তার ভেতরে সন্ধ্যার অন্ধকার জমতে শুরু করেছে, সেই আবছা আলোয় আমি বাঘকে দেখতে পেলাম না, শুধু একটু ক্ষীণ ঝটাপটির আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন ড্রাইভারকে বললাম জীপটা একটু এগিয়ে এনে তার হেডলাইটের আলো ঐ জায়গাটার ওপরে ফেলতে কিন্তু তাতেও দেখবার কোন সুবিধা হল না, কারণ সেই আলো সারি-বাঁধা শাল গাছের গুঁড়িতে প্রতিফলিত হ'য়ে ফিরে এল—গাছের তলার ঝোপ-ঝাড়ের ভেতরে কি ঘটছে তা স্পষ্ট নজরে এল না।

একটু অনিশ্চিতভাবে কি করা যায় ভাবছি, এমন সময়ে দুটি শাল গাছের গুঁড়ির মাঝখানের ফাঁকে এক মুহূর্তের জন্যে একটা উজ্জ্বল সবুজ রংয়ের আলোর ঝলকানি দেখলাম, বুঝলাম বাঘের মুখ আমাদের দিকেই ফেরানো রয়েছে এবং তার চোখের ওপর জীপের আলো পড়েই অমন উজ্জ্বল সবুজ রংয়ের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। আমার গুলি সম্ভবতঃ তার কাঁধ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে ফুসফুস ফুটো করেছে, সেই জন্যে সে কোন আওয়াজ করতে পারছে না এবং শ্বাস নেবার প্রবল চেষ্টায় তার মুখ ওপর দিকে তুলছে—এই অনুমান করে আমি যে জায়গাটিতে বাঘের চোখ জ্বলে উঠেছিল ঠিক সেইখানে রাইফেল নিশানা করে রইলাম। কয়েক সেকেন্ড পরেই আবার বাঘের চোখের সবুজ আলো জ্বলে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমি সেই আলোর বিন্দুর ঠিক নিচে তাক করে গুলি চালালাম। রাইফেলের আওয়াজের পরমুহূর্তেই ধপাস্ করে একটা শব্দ হল, ঠিক যেন একটা ভারী বস্তা মাটিতে ফেলা হয়েছে। তারপর সব চুপচাপ—সবুজ আলোও সেই সঙ্গে নিভে গেল।

আমি তখন আরো কাছে গিয়ে ভাল করে বাঘটিকে দেখবার জন্যে পা বাড়ালাম, কিন্তু সেই সঙ্গেই আমার পেছনের জীপ্ থেকে রাজনের ভয়ার্ত চিৎকার শুনলাম, 'আমাকে শিগগির এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও, আমার হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়ে যাচ্ছে!' তার ঐ রকম ব্যাকুল ডাক শুনে আমি তাড়াতাড়ি জীপের কাছে গিয়ে তাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে বললাম, 'কি হয়েছে তোমার? বাঘ ত মরেই গিয়েছে।' কিন্তু সে আমার হাত চেপে ধরে, তখনি জীপটিকে সরিয়ে দূরে নিয়ে যাবার জন্যে এমন ব্যাকুল ভাবে অনুরোধ করল যে আমি তা অগ্রাহ্য করতে পারলাম না—জীপে উঠে বসে ড্রাইভারকে বললাম গাড়িটা একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে। গজ পঞ্চাশেক গিয়ে জীপ্ থামিয়ে আমি নেমে পড়ে, ড্রাইভারকে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে রেখে সেই-খানেই অপেক্ষা করতে বলে, আবার বাঘ যেখানে পড়েছিল সেই জায়গায় ফিরে গেলাম। সেই সময়ে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম সময় ৪-৪৫ মিনিট,—দিনের আলো তখন প্রায় শেষ, অন্ধকার গাঢ় হবার আগেই বাঘের দেহটি উদ্ধার করাই তখন আমার একমাত্র চিন্তা। বাঘ যেখানে পড়ে রয়েছে মনে হল তার কাছাকাছি গিয়ে রাস্তা থেকে নেমে নিচু হয়ে উঁকি মেরে সামনেই হালকা ঝোপের মধ্যে বাঘটা লম্বা হয়ে পড়ে রয়েছে দেখা গেল। একটা ব্যাপার দেখে একটু বিস্ময় লেগেছিল যে বাঘের শরীরটি তখন একেবারে ঘুরে গিয়ে তার মাথাটা তখন পশ্চিমমুখো হয়ে গিয়েছে। আমার ·৩৭৫ ম্যাগ্নাম রাইফেলের ৩০০ গ্রেণ 'সিলভার-টিপ্' গুলি নলের মুখ থেকে সেকেন্ডে ২৫০০ ফুটেরও বেশী গতিতে বেরিয়ে প্রায় ৪৩০০ 'ফুট্-পাউন্ড' শক্তির আঘাত হানতে পারে, কিন্তু তাতে যে একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘকে মাটি থেকে তুলে, উলটোমুখো করে ফেলে দিতে পারে সে ধারণা আমার ছিল না। সে যাক, আমি যদিও নিঃসন্দেহ ছিলাম বাঘের প্রাণ আর নেই, তবু ঐ রকম শক্তিশালী জন্তু মরবার পরেও তার কাছে এগোবার সময়ে সাবধানতায় কোন অবহেলা করিনি। সন্তর্পণে বাঘের পিঠের দিকে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে তার মাথার পেছনে বসে ভালভাবে লক্ষ করলাম তার নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা, কারণ অজ্ঞান হয়েও প্রাণ থাকলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চলতেই থাকে। সেই সময়ে আমার রাইফেলের নলের মুখ তার ঘাড়ের ঠিক পেছনে প্রায় ছোঁয়ানো ছিল, আর ট্রিগারেও আঙ্গুল লাগানো ছিল—যাতে দরকার হলে তৎক্ষণাৎ গুলি চালাতে পারি। মিনিট খানেক এই-ভাবে থেকে যখন শ্বাস নেবার কোন চিহ্ন দেখলাম না, তখন রাইফেলের নলের মুখ বাঘের মাথায় পেছনে লাগিয়ে দুয়েকবার জোরে ঠেললাম, তাতেও প্রাণের কোন সাড়া না পেয়ে ঐ নল দিয়েই তার মাথায় একবার বেশ জোরে মারলাম—যদিও এই পরীক্ষার আর কোনও দরকার ছিল না। তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে খুশি মনে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ওপরে উঠে ড্রাইভারকে ডাকলাম, জীপ্ কাছে নিয়ে আসবার জন্যে।

জীপ্ কাছে এসে দাঁড়ালে রাজন তার ভেতর থেকেই সভয়ে প্রশ্ন করলেন বাঘ সত্যিই মরেছে কিনা। তাঁকে আশ্বস্ত করে, ড্রাইভারকে বললাম বাঘটিকে জঙ্গলের বাইরে টেনে আনবার জন্যে আমাকে সাহায্য করতে। কিন্তু আমরা দুজনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও বাঘকে একটুও নড়াতে পারলাম না, কারণ খুব বড় না হলেও তার ওজন অন্ততঃ ৪৫০ পাউন্ড ছিল। তখন আমি রাজনকেও আমাদের সঙ্গে হাত লাগাতে বললাম। তাঁর তখনও ভয় কাটেনি বুঝলাম, কারণ তিনি জানতে চাইলেন বাঘটির শরীরে তখনও কোন স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া হয়ে সে হঠাৎ একটা চড়চাপড় মেরে বসতে পারে কিনা। আমি তাঁকে জানালাম যে একেবারে মরে যাবার পর সেরকম কোন কিছু ঘটবার সম্ভাবনা নেই।

তবুও তিনি এগোলেন না দেখে আমি একটু অধৈর্য প্রকাশ করতে তিনি একটু আমতা আমতা করে বললেন, 'মিস্টার রায়, আপনি বোধ হয় আমার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন বাঘটাকে ছুঁতে আমার এই অপ্রবৃত্তি কেন স্বাভাবিক, কারণ আমি নিরামিষাশী।'

তাঁর এই তাত্ত্বিক যুক্তি শুনে আমার প্রায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটে-ছিল, কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'কিন্তু রাজন, তোমাকে তো আমি বাঘটা খেতে বলছি না, শুধু একটু হাত লাগিয়ে এটাকে টেনে বাইরে নিয়ে যেতে সাহায্য করো।' তখন প্রায় মরিয়ার মতন মুখচোখের ভাব করে রাজন হাত লাগালেন, এবং আমরা তিনজনে মিলে কোন রকমে বাঘের দেহটা জঙ্গলের

www.BanglaBook.org

বাইরে রাস্তার ধারে নিয়ে গেলাম। কিন্তু তারপর বাঘকে রাস্তার ওপরে টেনে তুলতে গিয়ে মনে হল সে কাজ আমাদের অসাধ্য হবে। যা হোক, শেষ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টায় তা করা সম্ভব হল—তখন আমরা বেদম হাঁপাচ্ছি এবং শীতের সময়েও সর্বাঙ্গে ঘামে ভিজে গিয়েছে। আরো বুঝলাম যে ঐ বাঘকে জীপে ওঠানো আমাদের তিনজনের শক্তিতে সম্ভব হবে না। তখন ড্রাইভারকে ফরেস্ট বাংলোয় ফিরে গিয়ে আরো লোকজন এবং বাঘকে জীপের বনেটের ওপরে বাঁধবার জন্যে একটা মজবুত দড়ি নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে বললাম। সেইসঙ্গে এক বোতল খাবার জলও আনতে বললাম, কারণ ততক্ষণে তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গিয়েছে। আমি নিজে বাঘকে সেইখানে ছেড়ে বাংলোয় ফিরে গেলাম না, কারণ মনে ভয় ছিল যদি আমরা চলে গেলে শেয়াল বা অন্য কোন জন্তু মরা বাঘটির মাংস খাবার চেষ্টায় তার সুন্দর চামড়াটির ক্ষতি করে। রাজন আমাকে ছেড়ে একা ঐ জঙ্গলের পথে বাংলোয় ফিরতে চাইলেন না, কারণ ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার বনের মধ্যে বেশ গাঢ় হয়ে জমেছে। সুতরাং তিনিও আমার সঙ্গে রয়ে গেলেন। আমার যে বন্দুকটি জঙ্গলে ঢোকবার সময়ে তাঁর হাতে দিয়েছিলাম, খোঁজ করে দেখলাম সেটি সীটের পেছনে জীপের মেঝেতে পড়ে রয়েছে—বাঘ দেখামাত্রই তিনি সেটি পেছনে ফেলে দিয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। ভাগ্যক্রমে ঐভাবে ফেলে দেওয়ার সময়ে ঝাঁকি লেগে বন্দুকে-ভরা গুলির আওয়াজ হয়ে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি, এবং আরো সুখের কথা যে বন্দুকটি ঐভাবে পড়ে গিয়েও তাঁর গায়ে কোন চোট লাগেনি। বন্দুকটি তুলে নিয়ে আবার তাঁর হাতে দিয়ে সেটিকে ঠিক মতন নাড়াচাড়া করবার জন্যে তাঁকে একটু উপদেশও না দিয়ে পারলাম না—কারণ ঐ বন্দুকটি আমার শিকারী জীবনের প্রথম অস্ত্র এবং সবচেয়ে প্রিয়—১৯৩২ সালে কেনা ওয়েস্টলী-রিচার্ডের তৈরী এই বন্দুকটি দিয়ে আমি সবচেয়ে বেশি শিকার করেছি। এত বছর পরেও এটি এখনও সমান কার্যক্ষম এবং নিখুঁত রয়েছে।

জীপ চলে গেলে আমরা দুজনে চৌমাথার ধারে চার নম্বর গেটের মোটা রেলিংয়ের ওপর বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ক্রমে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে লাগল, কিন্তু আমাদের সঙ্গে জোরালো ইলেক্‌ট্রিক 'টর্চ' ছিল, তা দিয়ে মাঝে মাঝে আশপাশের জঙ্গল এবং বনের রাস্তার সব দিক দেখতে কোন অসুবিধা হয়নি। ঐভাবে অন্ধকারে বসে থাকতে রাজনের অস্বস্তি হচ্ছে, মনে হল ; তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঐ সময়ে মৃত বাঘের কোন সঙ্গিনী হঠাৎ এসে আমাদের আক্রমণ করতে পারে কিনা। আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম যে সেরকম হবার কোন সম্ভাবনাই নেই, কারণ ঐ বাঘের যে কোন সঙ্গিনী আছে এমন খবর এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, এবং শিকারের সময়েও তেমন কাউকে ধারেকাছে দেখা যায়নি। তাছাড়া যদি অন্য কোন বাঘ সেই সময় কাছাকাছি থাকত তাহলেও দু'বার রাইফেল আওয়াজ হবার পর সে আর এ তল্লাটে থাকত না। কিন্তু আমার কথায় যে রাজন পুরোপুরি আশ্বস্ত হয়েছিলেন তা মনে হল না ; তিনি ক্রমাগতই চারধারে টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগলেন।

প্রায় চল্লিশ মিনিট এইভাবে কাটবার পর জীপ ফিরে এল, ড্রাইভার আমাদের চাপরাসীদের এবং ফরেস্ট বাংলোর চৌকিদার সমেত চার-পাঁচজন লোককে সঙ্গে আনায় বাঘকে জীপের বনেটের ওপর ওঠাতে কোন অসুবিধা হল না,—সেখানে তাকে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে আমরা বেশ হৈ চৈ এবং উদ্দীপনার মধ্যে ফরেস্ট বাংলোয় ফিরে গেলাম। শুধু জলের বোতলটাই সেই সময়ের উত্তেজনার মধ্যে কারুরই আনতে খেয়াল হয়নি—সুতরাং বাংলোয় ফেরবার আগে আর আমাদের তেষ্ট মেটেনি। সে রাতে আর বাঘের চামড়া ছাড়াবার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না, বাঘের দেহটি বাংলোর গ্যারাজের মধ্যে তুলে রেখে আমরা সেদিনের কাজ শেষ করলাম।

তার পরদিন সকালে ফরেস্ট বীট অফিসারকে অনুরোধ জানালাম চামড়া ছাড়াবার কাজে সাহায্য করবার জন্যে উপযুক্ত দুয়েকজন লোক জোগাড় করে দিতে। তিনি কাছের আদিবাসী বস্তিতে খবর পাঠাতেই বেশ কয়েকজন লোক উপস্থিত হল, তারা সবাই ঐ বাঘ মরেছে শুনে মহা খুসি, কারণ প্রায় দেড় মাস ধরে বাঘটি ক্রমাগত তাদের গরুবাছুর মেরে খাচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন আমাকে জানাল যে ঐ বাঘ তার আটটি গরু এবং বলদের সব কটিকেই শেষ করে দিয়েছে। শেষ দুধেল যে গাইটি সেদিন খেয়েছিল ধরে, তখন ঐ লোকটি রাগে দুঃখে জ্ঞানহারা হয়ে বাঘকে তাড়াবার জন্যে চিৎকার করে তার দিকে তেড়ে গিয়েছিল। ট্রায়াসের বাঘেরা সাধারণতঃ ঐ ভাবে তাড়া খেয়ে শিকার ছেড়ে সরে যায়, কিন্তু এই বাঘটি ততদিনে এমন বদমেজাজী হয়ে উঠেছিল যে, সে ওরকম হাঁকডাকে ভ্রূক্ষেপ করত না, বরং উলটে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে এবং গর্জন করে গরুর রাখালদের ভয় দেখাত। সেদিন ঐ লোকটি কাছে যাওয়া মাত্রই বাঘ শিকার ছেড়ে তাকেই ধরবার জন্যে তাড়া করে এসেছিল,—সে কোন রকমে একটি গাছে চড়ে রক্ষা পায়। এই ঘটনার পর থেকেই কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা হয়েছিল যে যদি বাঘটি এরপরে দু'একজন লোককে মারতে পারে তাহলে সে অবিলম্বে মানুষখেকো হয়ে দাঁড়াবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঐ লোকটির কথা শুনে আমি তাকেই বাঘের চামড়া ছাড়াবার কাজের ভার দিলাম, মনে হল তাতে তার মনের আক্রোশ কিছুটা মিটবে—তার সঙ্গে আরও জন দুই লোক সাহায্য করতে এগিয়ে এল।

চামড়া ছাড়াবার আগে বাঘের একটি ছবি ক্যামেরায় তুলে রাখবার ইচ্ছা আমার ছিল, সেইজন্যে আমি রাজনকে তাঁর ক্যামেরা আনতে বললাম। তিনি তখন একটু বিব্রত ভাবেই আমাকে জানালেন যে সেটা সঙ্গে আনেননি। এ কথা শুনে আমি বেশ নিরাশ হয়েছিলাম, কারণ—ঐ রকম একটি ছবি আমার এই শিকারের একটি সুন্দর স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকত। এই নিয়ে মনে একটু খটকাও লেগেছিল, কারণ জলপাইগুড়ি ছাড়বার আগে রাজন নিজেই ঐ ক্যামেরাটি ছবি তোলবার জন্যে নেবেন বলে আমাকে জানিয়েছিলেন। পরে এই বিষয়ে রাজনকে একটু খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে জানতে পেরেছিলাম যে জলপাইগুড়ি থেকে রওনা হবার ঠিক আগে তাঁর মনে এই বাঘ শিকারে একটা কোনও বিপদ ঘটবেই এই রকম একটা ভয় খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল, এবং সেই সঙ্গেই তাঁর আরও একটা অকারণ ধারণা হয়েছিল যে, ছবি তোলবার জন্যে ক্যামেরা সঙ্গে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই বাঘের মুখোমুখি পড়ে যাবেন। সেই বিপজ্জনক পরিস্থিতি যাতে না ঘটে সেই জন্যেই তিনি ইচ্ছা করেই ক্যামেরাটি রেখে এসেছিলেন। এই শিকারের উপলক্ষে তিনি যে এরকম অন্তর্দ্বন্দ্ব কষ্ট পাবেন তা আমি আগে থেকে ভাবতেই পারিনি—পরে তা জানতে পেরে আমার তাঁর জন্যে দুঃখ হয়েছিল।

চামড়া ছাড়াবার আগে বাঘের শরীরটি ভাল করে পরীক্ষা করেছিলাম, তাতে কোনও পুরোনো আঘাতের চিহ্ন আছে কিনা তা জানবার জন্যে। এর কারণ, আমার মনে হয়েছিল যে সম্ভবতঃ তেমন কোন আঘাত লেগেই তার এমন কোন শারীরিক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়েছে যার জন্যে তার নিজের স্বাভাবিক খাদ্য—অর্থাৎ বনের হরিণ, শুয়োর প্রভৃতি জন্তুকে—ধরবার ক্ষমতা কমে গিয়েছে, এবং সেই জন্যেই অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য পোষা গরু বাছুর মারতে শুরু করেছে। পরীক্ষা করে দেখলাম আমার অনুমান ঠিক—বাঘের কাঁধে এবং শরীরের অন্যান্য জায়গায় কয়েকটি হরিণ মারবার বড় ছর্‌রা (বাক্‌-শট্‌) গভীরভাবে বিঁধে রয়েছে দেখা গেল। নিঃসন্দেহে ঐ জখমগুলির জন্যে বাঘটির স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা অনেকটাই কমে গিয়েছিল, যে জন্যে দ্রুতগামী এবং সতর্ক বনের জন্তুদের শিকার করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। আরও অনুমান করলাম যে কোন ভীরু এবং অনভিজ্ঞ বন্দুকধারী (যাকে আমি 'শিকারী' নামের সম্মান দিতে রাজী নই) খুব সম্ভব রাত্রে মোটরে করে ঐ বনের পথে যাবার সময় বাঘটিকে দেখতে পেয়ে দূর থেকে 'বাক্‌-শট্‌' চালিয়ে জখম করেছিল—যে কাজ বনবিভাগের শিকারের নিয়মে নিষিদ্ধ, এবং ভদ্র শিকারীদেরও আচরণ-বিরুদ্ধ। বোধহয় মোটর গাড়ি থেকে গুলির চোট খেয়ে ঐ ভাবে আহত হবার জন্যেই বাঘটি তারপর থেকে সব মোটর গাড়িকেই তার সম্ভাব্য শত্রু বলে মনে করেছিল—এবং আক্রমণই আত্মরক্ষার সবচেয়ে কার্যকরী উপায় ঠিক করে যে কোন গাড়ি আসতে দেখলেই তাকে আক্রমণ করতে প্রস্তুত হত। ১৩৮৫

ছেমেশিজফধা বা তিব্বতী জাদু

নলিনী দাশ

বাবুয়ার জন্মদিনে সে তার কয়েকটি ভাই ও বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছিল। খাবার আগে গল্পগুজব, খেলাধুলা হচ্ছে, তার মধ্যে হঠাৎ বাবুয়া বলল, 'জানিস, আমার মাসতুতো ভাই রাজার একটু যৌগিক ক্ষমতা আছে!'

সবাই অবাক হয়ে তাকাল। তমাল বলল, 'বাজে কথা!' জ্যোতিপ্রিয় বলল, 'গুল মারিস না!' হীরক দীপক জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি? সত্যি নাকি রে?' বিনয় সহকারে রাজা বলল, 'সেরকম কিছু নয়, সামান্য একটু—' তার দাদা রতন বুঝিয়ে দিল, 'আমাদের এক জ্যাঠামশাই তিব্বতী-বাবার ভক্ত, তাঁর কাছেই দু-একটা মন্ত্র শিখেছে।' বাবুয়া বলল, 'রাজা ঘরের বাইরে চলে যাবে, তোরা যে-কোন একটা তাস ভাববি আর রাজা ফিরে এসে ঠিক বলে দেবে।'

'তাই নাকি? তাহলে প্রমাণ দেখা!' চ্যালেঞ্জ করল তপন। রাজা বলল, 'বাবুয়া প্রত্যেকবার আমাকে একটা কথা বলবে—অবশ্য তাসের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। কথাটা শুনেই মন্ত্রের সাহায্যে আমি বুঝে নেব বাবুয়া কোন তাসটা ভেবেছে।'

রাজা ঘরের বাইরে গেলে বাবুয়া চটপট করে ছ'ভাগে ছ'-টা ছ'-টা করে বত্রিশটা তাস সাজিয়ে ফেলল।

রাজা বলল, 'আচ্ছা আমি এই চিড়েতনের ছক্কাটা ভাবলাম—এটা দ্বিতীয় সারির প্রথম তাসটা। এবার রাজা ঘরে আসতে পারে।'

রাজা ঘরে ফিরে এসে মনোযোগ দিয়ে তাসগুলো দেখতে লাগল। নির্লিপ্তভাবে বাবুয়া বলল, 'পুলিশে রোজ কত ষাঁড় ধরছে জানিস?' রাজা পকেট থেকে একটা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস বার করে ভালো করে দেখে বলল, 'এই তো চিড়েতনের ছয়টা ভেবেছে'—

'কি করে বুঝলি?' সুধীরের প্রশ্ন।

হীরকের ছোট ভাই তিলক বলল, 'নিশ্চয় বাবুয়াদা চোখে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোখে ইশারা করে বলেছে।'

বাবুয়া বলল, 'বেশ, এর পরের বার আমি রাজার দিকে তাকাবই না!'

এবার রাজা বাইরে যেতেই সুমন্ত হরতনের গোলাম ভাবল—তৃতীয় লাইনের চতুর্থ তাস।

রাজা ফিরে এসে তাসগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। বাবুয়া অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'কলা খেলেই বাবার সাংঘাতিক হাঁচি হয়।'

রাজ তাসগুলো একবার শুঁকে নিল, তারপর বলল, 'হরতনের গোলাম।' সবাই একেবারে অবাক!

ধীমান বলল, 'ও বুঝেছি—ওরা প্রত্যেকটি তাসের জন্য একটা আলাদা বাক্য ঠিক করে মুখস্থ করে রেখেছে।'

গাগা বলল, 'না না—প্রথম, দ্বিতীয়, এইভাবে মুখস্থ করেছে'—দেখ্ না কেমন কায়দা করে সাজিয়েছে তাস।'

রতন বলল, 'ভাগ্, অত কথা কি কেউ মুখস্থ রাখতে পারে?'

তিলক চোখ গোল করে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, বাবুয়াদাদা রাজাদাদা পারে, ওদের সা-ং-ঘা-তি-ক স্মরণশক্তি!'

তমাল আর জ্যোতি বলল, 'দাঁড়াও, ওদের চালাকি বার করছি। তুই একটা তাস ঠিক কর তিলক।'

'আমি ভাবলাম এই চিড়েতনের গোলামটা—দ্বিতীয় সারির শেষ তাসটা।'

এবার রাজা ঘরে আসতেই বাবুয়া হৈ চৈ করে উঠল, 'তিলকের হাতে ব্লেড কেন? হাত কেটে যাবে যে!'

'কোথায়? আমার হাতে ত কিছু নেই!' তিলক অবাক।

রাজা কিন্তু ঠিক বুঝেছে, বলল, 'ঐ চিড়েতনের গোলামটা ভেবেছে।'

আবার রাজা ঘরের বাইরে গেলে হীরক আর দীপক বলল, 'আমরা আবার ঐ চিড়েতনের গোলামটাই ভাবলাম—দেখি আবার তিলকের হাত কাটে কিনা।'

কিন্তু বাবুয়া সে পথ দিয়েও গেল না, রাজা ঘরে আসতে সে বলল, 'জাপানী বাচ্চারা রুপোর ঝুমঝুমি ভালবাসে তা জানিস?'

রাজা চোখ বুজে কিছুক্ষণ তাসের উপর হাত বুলোল, তারপর বলল, 'আ—রে! আবার দেখছি ঐ চিড়েতনের গোলামটাই!'

তপন বলল, 'চালিয়ে যা, খেলা চালিয়ে যা, নিশ্চয় তোদের চালাকি ধরে ফেলব!'

গাগা ঠিক করল হরতনের নহলা—দ্বিতীয় সারির পঞ্চম তাসটা। রাজা আসতে বাবুয়া বলল, 'মা আমের আইসক্রীম বানিয়েছেন।' রাজা ঠিক তাসটা বার করল।

এইভাবে খেলা চলতে লাগল।

'একতলার কুকুরটা একটা ব্যাঙ মেরেছে'।—ইস্কাপনের পাঞ্জা, চতুর্থ সারির প্রথম তাস।

বাবুয়া বলল, **'The pot calls the kettle black'**—রাজা ঠিক ধরে ফেলল—রুহিতনের ছক্কা, চতুর্থ সারির শেষ তাসটা।

প্রত্যেকবারই রাজা ঠিকমতন তাস খুঁজে বের করল।

ছেলেরা সত্যিই খুব অবাক হয়ে গেল। কিছুতেই তারা বাবুয়া অথবা রাজাকে বেকায়দায় ফেলতে পারল না।

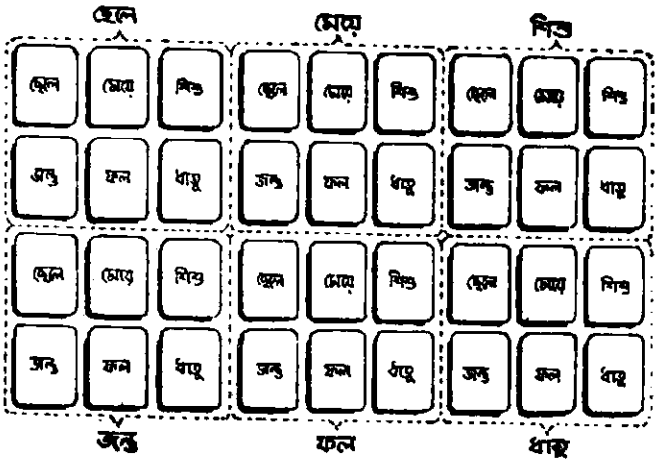

সুধীর বলল, 'তোমাদের যৌগিক ক্ষমতা আর তিব্বতী জাদু অবশ্য গাঁজা, ওসব আমরা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু খেলাটা দারুণ, আমাদের শিখিয়ে দিতেই হবে।'

'বলে দেব? তোরা ধরতে পারলি না ত?'

সুমন্ত, ধীমান ও রাণা বলে উঠল, 'না, না, পারলাম না। তাড়াতাড়ি আমাদের শিখিয়ে দে।'

'তবে শোন', বাবুয়া বলে চলল, 'এই ম্যাজিকের নাম হল ছেমেশিজফধা—মানে ছেলে-মেয়ে-শিশু-জন্তু-ফল-ধাতু। লক্ষ করে দেখ, তাসগুলি ছ'টা ছ'টা করে ছয় ভাগে সাজানো হয়েছে। ছয়টা ভাগের নাম যথাক্রমে ছেলে, মেয়ে, শিশু, জন্তু, ফল, ধাতু; আবার প্রত্যেক ভাগের ছ'টা তাসের নামও সেই হিসাবে। বুঝতেই পারছিস, এই ম্যাজিক দেখাতে দু'জন লাগে। একজন বাইরে যাবে, কোন বিশেষ তাসের কথা ভাবা হলে, আবার ফিরে আসবে। যেমন রাজা করছিল। অন্যজন, আমার মতন, একটা কথা বলবে। সেই কথায় ছেলে-মেয়ে-শিশু-জন্তু-ফল বা ধাতুর উল্লেখ মাত্র দু'বার থাকবে। প্রথমটা বোঝাবে ভাগের নাম, দ্বিতীয়টা সেই ভাগে তাসের নাম। উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন, প্রথমেই গাগা দ্বিতীয় সারির প্রথম তাসটা ভেবেছিল, মানে 'ছেলে'র ভাগের 'জন্তু'। তাই আমি বললাম যে, পুলিশে ষাঁড় ধরছে। আর শেষবারে তোরা ভাবলি ৩৬ নম্বরের শেষ তাসটা, মানে 'ধাতু'র ভাগের 'ধাতু'। তাই বললাম 'কেটলি' আর 'পট'-এর কথা, যেহেতু দুটোই ধাতুর তৈরি। মা আমের আইসক্রীম বানালে হবে 'মেয়ে' ভাগের 'ফল' আর কলা খেয়ে বাবা হাঁচলে হবে 'ফলের' ভাগের 'ছেলে'।

সবাই মন দিয়ে ম্যাজিক শিখছে, হঠাৎ তিলক বলে উঠল, 'বারে, আমার হাতে ব্লেড থাকলে শিশুর ভাগের ধাতু হবে কেন? আমি কি শিশু?' সবাই হেসে উঠল।

কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বাবুয়া বলল, 'তাই ত, মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে, ছেলের ভাগের ধাতু বলা উচিত ছিল!' তিলক খুশি হয়ে গেল।

বাবুয়া আবার বলল, 'এইরকম গোলযোগ যাতে না হতে পারে, তাই যাদের মাঝামাঝি বয়স, মানে যারা এখনও শিশু, নাকি ছেলে বা মেয়ে, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে, তাদের নাম না করাই ভাল। আবার যে জিনিস ধাতুর তৈরি কিনা তাতে সন্দেহ হতে পারে, তাও বাদ দেওয়া উচিত। ইচ্ছা করলে জন্তুর মধ্যে পাখি, মাছ ও পোকা এবং ফলের মধ্যে মূল, ফুল বা পাতাও ঢোকানো যায়। তবে, এই বিষয়ে দুই ম্যাজিশিয়ানের মধ্যে আগে থেকে ভালো রকম বোঝাপড়া থাকা দরকার।'

১৩৬৯

www.BanglaBook.org

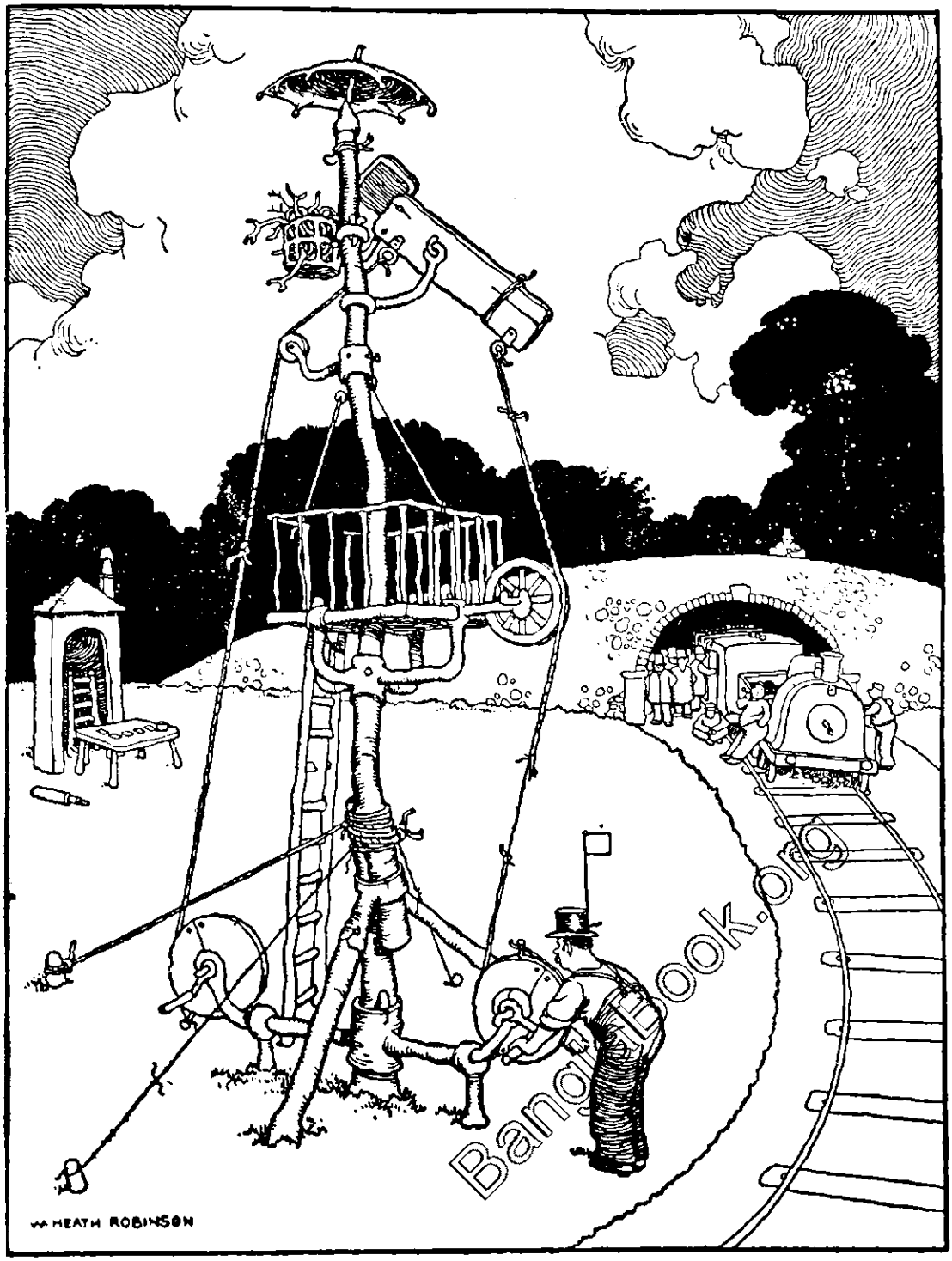

রেলকোম্পানি এক কল করেছেন
সিগন্যাল নাম তার কী জানি কী দাম তার
ওঠানামা করে বলে থামে চলে ট্রেন।

www.BanglaBook.org

বীরে ডাকাত ও ছিরে ডাকাত

মহাশ্বেতা দেবী

॥ ১ ॥

কথায় বলে—

মাসিপিসি বনগাঁ-বাসী
বনের মধ্যে ঘর
কখন মাসি বললে না গো
খই মোয়াটা ধর।

তা বলে খেতার মাসি তেমন না। পউষের হিমহিম ভোরে খেতা কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। মাসি ওকে ডেকে দিল। বলল, 'অ খেতা, উঠবিনি আজ? দেখ গা যেয়ে ফাঁদ পেতে এসেছিনু, তাতে কি পড়েছে।'

'কি পড়েছে?'

'সজারু এট্টা। কেমন মোটা রে! বেন্নুন হবে।'

'কখন?'

'আতে।'

'এখন করবি না?'

'ধুর বোকাটা। আতে আজ তোর মেসো আসবে, বলাই, কানাই আসবে তা জানু?'

'মোর তরে কি আনবে?'

'সে দেখিস খ'ন। এখন যা বাবা, পলোটা চাপা আছে, চাট্টি মাছ পড়ল কিনা দেখ গা। আর শিম ক'টা পেড়ে দে বা। বামুন-বাড়ি যেতে হবে।'

খেতা মুখ ধুল, কড়কড়ে ভাত খেল। মাসির পুকুরের নিচে চার চারটে কুয়ো আছে। চৈত্র-বৈশাখেও পুকুরের জল দেখ গে কানায় কানায়। পুকুরের ওপাশে জঙ্গল। জঙ্গলের ওপাশে রাস্তা। অনেক আগে, খেতার বাবা যখন সবে ধুতি পরতে শুরু করেছে তখন নাকি দেশে বর্গীরা এসেছিল।

তখন দেশে খুব যুদ্ধ হত। যুদ্ধ দেখতে দেখতে খেতার বাবা জোয়ান ছেলে হয়ে গেল। ন' দশ বছর ধরে শুধু যুদ্ধ হয়েছিল।

সেই সময়ে এইসব রাস্তা তৈরি হয়। রাস্তা দিয়ে নবাব হাতি, ঘোড়া, সেপাই, লস্কর নিয়ে যুদ্ধ করতে যেতেন।

খেতার বাবা যুদ্ধে যায়নি। তবে খেতার জ্যাঠা, জ্যাঠার শালা, ছোট ঠাকুর্দা, সবাই যুদ্ধে গিয়েছিল।

খেতার যে মাসি, তার শ্বশুরও নাকি যুদ্ধে গিয়েছিল। যুদ্ধে গিয়েছিল, যুদ্ধ করেছিল আর নবাবের দপ্তর থেকে সর্দার খেতাব নিয়ে ফিরে এসেছিল।

তখন এই ইন্দ্রাইল, নাড়াজোল, কান্দী, চাকুলে সব জায়গায় লোকেরা লড়াই করত।

সড়কি চালাত, বর্শা চালাত, বল্লম ছুঁড়ত। কেউ বা তীর-ধনুকে ওস্তাদ হত। কেউ লাঠি চালাত বন বন বন। লাঠির মাথাটা লোহার বাঁধানো, তাতে কাঁটা বসানো।

কেউ বাঁশের লাঠি চালিয়েই অবাক করে দিত।

তখন দেশের অবস্থা অন্য রকম ছিল। সেই যে যুদ্ধ হয়েছিল সে সময়ে নবাব ছিলেন আলিবর্দী খাঁ।

নবাবের রাজত্ব ছিল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা জুড়ে। নবাবের রাজত্বে অনেক জমিদার, ভুঁইঞা রাজা ছিলেন।

খেতার বাপ-ঠাকুর্দার মত মানুষেরা সেই সব জমিদারের কাছ থেকে জমি পেত আর চাষ করত।

তার বদলে তারা কি করত?

জমিদারের দরকারে অদরকারে লাঠি, বর্শা, তীর হাতে লড়তে যেত।

বর্গীদের সঙ্গে যখন সেই কবে যেন যুদ্ধটা হয় তখনো নবাবের হাজার সৈন্য। তার মধ্যে রাঢ় আর দক্ষিণ দেশের বাঙালী যে কত তার লেখাজোখা নেই।

নবাবের নিজের সৈন্যরা লড়েছিল, তা ছাড়া বর্গীরা যখন বছরের পর বছর আসতেই থাকল, তখন জমিদাররা যে যার জায়গায় যে যার সৈন্য নিয়ে লড়তে লাগলেন।

খেতাদের সবাই হল গিয়ে বুনো-বিষ্টুপুরের রায়রাজাদের প্রজা।

যারা যুদ্ধ করেছিল তাদের মধ্যে খেতার মাসির শ্বশুর এখনো যুদ্ধের গল্পটল্প বলে।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে খেতা পলো তুলে দেখল ক'টা ল্যাটা, গজার আর এক কৌটা নয়া মাছ।

খেতার মাসি পুকুরের ঘাটের কাছে ভাত ছড়িয়ে দেয়। ঘাটের কাছে খানিকটা জল বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘেরা। কঞ্চি-গুলো খুব ঠাসাঠাসি করে পোঁতা। শুধু একটা জায়গা ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়ে মাছ ঢুকে পড়ে।

মাসি সন্ধেবেলা যখন হাঁসগুলোকে ঘরে তোলে তখন জলে পলো চাপা দিয়ে চলে আসে। মাসির নিজের হাতে বোনা পলো। খুব চওড়া।

সকালে গিয়ে পলো তোল, দেখবে দু'তিনটে বেন্নেন মাছ ঠিক পেয়ে গেছ। খেতা রোজ ভাবে মাছগুলো কি বোকা। রোজ দেখে, যে মাছগুলো ঘেরের মধ্যে ঢোকে সেগুলো ধরা পড়ে, তবুও শিক্ষা হয় না একটু।

মাছ ধরে খেতা ফিরে এল। মাছগুলো দাওয়ায় রাখল। তারপর মাচা থেকে একটা বড়সড় লাউ কাটল। গোটাকয় শিম ছিঁড়ল। মাসি বলল, 'থাকো কোথা গেল রে?'

থাকোমণি মাসির মেয়ে, খেতার দিদি। গত বছর মন্বন্তরের

www.BanglaBook.org

পর থাকোর শাশুড়ি থাকোকে মাসির কাছে রেখে গেছে। বলে গেছে 'চাষবাস ভাল হক, নে যাব।'

থাকো গাছে উঠে কাঁঠাল পাতা ভাঙছিল। বুনো বাগদীর মেয়ে, গাছে চড়া, সাঁতার কাটা, মাছ ধরা ওর খুব অভ্যেস আছে। থাকো বলল, 'কেন চেঁচাতেছ ? পাতা ভাঙতেছি জান না ?'

'কেন, পাতা কি হবে !'

'ছাগল খাবে।'

'গাছ থে' নাম তুই, তা বাদে তোর পিঠে একখানা চেলা ভাঙতেছি।'

'তবে নামব না, যা।'

থাকো গাছের ওপর পা ঝুলিয়ে জুত করে বসল। মাসি বলল, 'ভাত আঁধবি। মাছের বেন্নুন করবি। তোর কত্তাদাদা জানিস মাছের টক না আঁধলে খাবেনি। গাছে থে বেগুন তুলে নিস কটা। আর শোন। বামুনরা ডাল দিয়েছিল, ভাতে দিস।'

'কেন ? তিন তিনটে বেন্নন কেন ?'

'হরিচরণ আসতেছে। ঘর নিকোবি, ছাগলটা জানি পালায় না। নিজে পস্কের হয়ে থাকবি, জানলি ?'

মাসি তরকারির ধামাটা কাঁধে নিল। গাঁয়ে বামুন বলতে বামুন ওই শিরোমণি বাড়ি। ওদের বাড়ি মানুষ অনেক, তবে ডাঙা জমিতে বাড়ি তাই গাছগাছালি ভাল হয় না। ও বাড়িতে শাক বল, বেগুন বল, কচু, লংকা, কুমড়ো, লাউ, করলা, ঝিঙে, শসা, বারোমাস এই খেতার মাসি জোগান দেয়।

'খেতা যেয়ে বাছুরটা খোঁজ গা যা। সাতসকালে যেয়ে কত্তা-দাদার কতা শুনতে বসবি না।'

মাসি বেরোতে না বেরোতে হরিচরণ এসে পড়ল।

হরিচরণ থাকোর বর। হরিচরণের বছর চোদ্দ বয়স, থাকোর এই দশ। হরিচরণ কোঁচড় ভরে মুড়ি এনেছিল, আর শসা। থাকো বলল, 'কেন, নারকেল আনতে পারলে না এট্টা ?'

'মা দিচ্ছে তোকে নারকেল !'

'কেন, দেবে না কেন ?'

'সাহেব আসতেছে যে। সাহেব এসে ডাকাত ধরবে যত। তা জমিদার বাড়ি যে কি বলব—প্যায়দার সে হ্যাঁকুর কি ! নারকেল, চাল, বাতাসা, কুমড়ো, ঘি, তেল ভারে ভারে নে যাচ্ছে।'

'কেন ?'

'দিতে হবে না ? সায়েবের সাথে লোকলস্কর আছে তারা খাবে যি।'

'হুঁঃ, ডাকাত ধরবে। বীরে ছিরের গায়ে হাত দেয় সাহেবের সাধ্যি আছে ?'

তেমন সায়েব লয় রে থাকো। বলে কি ! আমাদের কালী মন্দিরে পুজো দেবে। বলে ডাকাতেরা যদি ওনাকে পুজে ত্যাত শক্তি ধরে তবে আমি বা না পুজব কেন ?'

'সায়েব দেখতে যাব না ?'

'তাই বলতেই ত এনু। মা আসতেছে, পিসি আসতেছে, শাউড়ি বামুনবাড়ি থে আসতেছে, তাড়াতাড়ি নেয়ে-খেয়ে চ, যেয়ে সায়েব কেমন কালীপুজো করে তা দেখব।'

থাকো বলল, 'তবে তুমি যেয়ে ঝপ করে দু' কলসী জল নে দাও দেখি, কাজ সেরে নি।'

খেতা শিকে থেকে বড় তিজেলটা পেড়ে দিল। এই এত বড় তিজেলের এক তিজেল ভত খেতা, হরিচরণ, থাকো, মাসি, কত্তাদাদা পাঁচজন খাবে। রাতে যখন মেসো আর দুই দাদা আসবে তখন দুই তিজেল ভাত হবে, কচু মুলোর ঝাল আর লংকা গরগরে সজারুর মাংস।

খেতাই খায় সবচেয়ে বেশি। অথচ শরীরটা ওর একরকম থাকে।

থাকো বলে, 'পেট ফেটে মরবি।'

'থাক। ভাতের কষ্ট বড় কষ্ট। এত বড় মন্বন্তরটা যে গেল তা তোদের জানতে দিইনি। ওদের গেরামকে গেরাম কি হয়েছিল জানিস ?'

'কি ?'

'শোঁসান !'

মাসি নিশ্বাস টেনে টেনে বলে। মাসির শরীরটা কালো পাহাড়ের মত। রুক্ষ চুলগুলো শুন্যে ঝুঁটি বাঁধা। হাতে মাটির লাল কড়। এমন কড় কুমোরবাড়িতে শাকটা বেগুনটা দিয়ে মাসি গোছা গোছা আনে। মাসির কাঠের কাঁকইটা তেলের ভাঁড়ে ডোবানো থাকে। ওরা মাথায় সর্ষের তেল মাখে, সর্ষের তেলে রাঁধে। পিদিম জ্বালে কড়ুয়া তেলে। মাসি মাসে দু-তিনদিন মাথা আঁচড়ায় আর ক্ষার কাচে।

খেতার মেসো আর কানাই, বলাই একজন খুব বড়মানুষের কাছারিতে কাজ করে। মেসোর গলাটা খুব সরু। যখন মেসো ঘরে আসে তখন বলে, 'পস্কের রইতে পার না ? মাথায় তেল দিতে পার না ? জান, আমার সংগীসাথীরা সব তা বড় তা বড় লোক। তারা দেখলে পরে কি ভাববে ?'

মেসো যে কত বড়লোকের খবর রাখে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

মেসোর মান রাখতে মাসিকে মাসে দু' তিনবার ক্ষার কাচতে হয়। নইলে দেখ আটহাতি গড়ে কাপড় পরে, খেতার মাসি হয় খেত কুপোচ্ছে, নয় বন থেকে শিমুল ফল এনে ফাটিয়ে তুলো বের করছে, নয় ত বন ঘুরে ঘুরে কোথায় বনডুমুর, কোথায় মাদার ফল, কোথায় নোনাফল, কোথায় ধুঁধল তাই দেখছে। নদীর চরে কাছিমের বাসা। বুনো পাড়ার ছেলেগুলো যা পারে না, ও তা পারে। ও ঠিক কাছিমের ডিম, কাছিম নিয়ে আসে।

মাসির শ্বশুর বলে, 'বউটা যদি পুরুষ ছেলা হত তবে অ্যাতদিনে ওটোনের চারদিকে যে চারচালা ঘর উঠত চারখানা। আমার একখানা আটচালা আখড়া হত।'

খুব, খুব ভক্তি কর্তাদাদার। গেরস্তঘরের মাঝে বেড়া দিয়ে ওপাশে ও থাকে। মাচার ওপর ঘুমোয়। মাচার নিচে ছাগল বাঁধা থাকে। রাতে সবাই ঘুমোয়, ও ঠিক প্রহর গুনে গুনে তিন প্রহরে তিনবার 'রাম, ও সাবধান' বলে চেঁচাবে। তারপর ভোরেই তারা দখদপ করতে দেখে তবে চোখটা বুজবে।

ঘরের সামনে ও নিচু করে মাচা বেঁধে রেখেছে। সেখানে ও সন্ধেবেলা নিত্যি বসে। বুনো পাড়ার মানুষরা, জমিদারের পাইক-পেয়াদা, সায়েব কুঠির লস্কর, সারে সারে মানুষ ওর কীর্তন শুনতে আসে।

'এ হরিনাম ভবে রইতে পারের ভাবনা ভাবিস কি রে'—গানটা কর্তাদাদার সংগে খেতাও গায়। খেতা রাতে ওর কাছেই ঘুমোয়।

কর্তাদাদা মাংস খায় বটে, কিন্তু বলে, 'বউমা ! এত বুদ্ধি তোমার, কিন্তু জীবকে বড় হিংসে কর।'

কর্তাদাদার কথা শুনলে খেতার মাসি খুব ভয় পায়। বলে, 'কেন গো ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এই ধরগা, সজারুটা, খরাটা (খরগোস), হরিণটা, কাছিমটা, এ তুমি মারবে, তবে মা! টেঁটা দে মের না। আমরা হলাম যেয়ে বোষ্টুম। তুমি বেশ খন্দ করে মাটি খুঁড়ে ফাঁদ পাত গা! ফাঁস দাও গা! ফাঁসে বেঁধে অমনি বেটা হরিচরণে চলে যাবে। বোষ্টুম-ঘরে জীবরক্ত পড়াটা কি ভাল?'

কর্তাদাদা বেজায় গুণী, বেজায় জ্ঞানী। খেতারা রক্ত পড়লে বলে, 'ওঃ কত লোক ছুটছে দেখ?'

কর্তাদাদা বলে, 'রক্ত পড়ছে দেখ?'

তাই মাসি সজারু, খরা, হরিণ ফাঁদেই ধরতে চেষ্টা করে কিন্তু কাছিমের বেলায় তা হয় না।

কর্তাদাদা মশাটা মারলেও একবার 'হরিবোল!' মুখে বলে।

॥ ২ ॥

মন্বন্তরটা বাংলা ছিয়াত্তর সালেই হল। কিন্তু অজন্মা হল পঁচাত্তর সালে। সেই যে অনাবৃষ্টি শুরু হল তাতেই বাংলার হাজার হাজার মাইল জোড়া ধানখেত জ্বলে গেল।

মানুষ যতদিন পারল গাঁয়ে রইল। তারপর যে যার মত চলে গেল। কত গ্রাম যে আস্তে আস্তে জঙ্গল হয়ে গেল তার কি বলি।

এগারো শ' ছিয়াত্তরের বাংলায় একজন নবাব ছিলেন বটে, তবে তিনি নামেই নবাব। আসলে দেশের কর্তা তখন ইংরেজরা।

ছিয়াত্তর সালের এই ভীষণ মন্বন্তরের সময়ে দেশের এক-ভাগ মানুষ মরে যায়। দু'ভাগ বেঁচে থাকে।

তবু সায়েবরা খাজনা নিতে ছাড়েনি। খেতাদের জমিদার রায়রাজার বাড়িতে কোম্পানীর লোক এল। সকলের ডাক পড়ল।

খেতার বাবা বলল, 'খাজনা দিতে পারব না।'

'পারবি না বললে হল?'

খেতার বাবা চিরকাল বেপরোয়া, গোঁয়ার আর একরোখা। খেতার বাবা বলল, 'কার হুকুম?'

'কোম্পানীর হুকুম।'

'কোম্পানী জানে মোদের ভিটেয় বাঘ ঘুরতেছে, ধান খেত জ্বলে গেছে!'

'কোম্পানী কি দেখতে গেছে?'

'কোম্পানীকে বল গা চাষবাস করে ধান তুলে খাজনা আদায় করতে।'

রায়রাজার রাজশ্রী এখন আর নেই। তবু তিনি গাঁয়ের মানুষের কাছে রাজা ত বটেন! তিনি খেতার বাবার কথায় চটে গিয়ে বললেন, 'চেটাং মেটাং বলিস না বাঁকারাম। যা! তোদের আমি জরিমানা করে দিলাম।'

পরদিন দেখা গেল বাঁকারাম ওর মত মানুষদের নিয়ে গাঁ ছেড়ে পালিয়েছে। গরু ছাগল যা ছিল সে ত আগেই মরে গিয়েছিল, সংসার বলতে একটা মাটির হাঁড়ি আর পেতে শোবার মাদুর।

অমন মাদুর ওরা নিজেই বোনে। মাদুর চাটাই বুনে নেয়। বাঁশের চাটাইয়ের ওপর বেতের বাঁধনি দিয়ে ধান চাল রাখবার ডোল তৈরি করে। ঘর পড়ে গেলে বাঁশ দিয়ে, তালপাতা দিয়ে ঘর বেঁধে নেয়।

কোম্পানীর লোক বলল, 'তোমার প্রজারা পালাল?'

'বেটারা অতি পাজি বলে রায়রাজা চুপ করে রইলেন।

সেই সময়েই খেতাকে মাসির বাড়ি রেখে গেল বাবা। বাবা, মা, তিন দাদা কোথায় যে গেল কে জানে। বলে গেল, 'লুকে লুকে থাকি গা। সময় হলে ফিরব।'

সেই থেকে এই সাতাত্তর সাল অব্দি ওদের খোঁজ নেই। মাসির গাঁয়ে তেমন অভাব নেই। চারপাশে বন আর বন। বন থাকলে বৃষ্টি হবে, খনার বচন। এদিকে বৃষ্টি হয়েছিল, ধানও মন্দ হয়নি।

তা ছাড়া খেতার মেসো আর দুই দাদা যে কি ভালো লোকের কাছারিতে কাজ করে তা বলা যায় না। এই এমন মন্বন্তরেও ওরা রাতের আঁধারে চাল এনেছে, ধান এনেছে, খেতার মাসি ডোল ভরে ভরে ঘরে তুলেছে।

খেতা ওর মাসির কাছে চিরকালই ভালো থাকে, তবে মনটা ওর মাঝেমধ্যে পোড়ে বই কি। মনে হয় গ্রামে ফিরে যাই। মাসি বলে গ্রামে নাকি এখনো ঘরকে ঘর শূন্যি হয়ে আছে।

খেতা আজ সায়েবের কালীপুজো দেখতে যাবে বলে খুব ব্যস্ত। ও তাড়াতাড়ি বাছুর খুঁজতে গেল। বাছুর যদি ওই অজগর জঙ্গলে ঢোকে তবে নির্ঘাত বাঘের পেটে যাবে।

ডাকাতের ভয়টাও কম নয়। কে জানে বীরে ডাকাত কে, আর ছিরে ডাকাত কে। তবে কোম্পানী যেদিন থেকে খাজনা তুলছে তার আগে থেকেই ডাকাতে ডাকাতে দেশ যেন ছেয়ে গেছে।

কর্তাদাদা ত সেই জন্যেই বলে দেশটা পাপে ভরে গেছে! কর্তাদাদা যে রোজ নামকীর্তন করে—তাতে নাকি পাপ কমে যায়।

বনে ঢুকতে প্রথমটা খেতার ভয় করেনি। পউষের শীতে আর যাই বল সাপের ভয় থাকে না। সাপগুলো সব পাতালে, গাছের কোটরে, গর্তে, ইঁদুরের পাঁজায় সেঁধিয়ে গিয়ে ঘুমোয়।

এ সময় ভয় থাকে তিনি চিতাবাঘ। বড় বাঘ সদাসর্বদা বনে ঘেঁষে না। বড় বাঘ ঘোরে-ফেরে বড় জঙ্গলে। সেই যে বড় গাঙ, যার নাম পদ্মা, তার কাছাকাছি কি বড় বড় জঙ্গল। সেখানে হরিণ খেয়ে বড় বাঘ সুখে থাকে।

চিতাবাঘের মত পাজি আর কে আছে বল। গাছে উঠবে, ঘরের চালে উঠবে, সাঁঝপিদিম জ্বলতে না জ্বলতে গেরস্ত বাড়ির কানাচে সেঁধোবে। তারপর ছাগলটা, হাঁসটা, নিদেনপক্ষে কুকুরটা নেবে। গাঁয়ে কুকুর অমন অনেক থাকে। গেরস্ত যা দু মুঠো দেয় তাই খেয়ে গ্রাম পাহারা দেয়।

চিতাবাঘের ওই কুকুর বেজায় পছন্দ। তাই ত, মাসি বলে, সায়েবরা কাশিমবাজারের, বানঝাটিয়ার কুঠিতে যে কুকুরগুলো রেখেছে তাদের গলায় পেতলের পাত পরানো। চিতাবাঘ যে ঝপ করে দাঁত বসাবে আর ঝপ করে তুলে নেবে সে উপায় নেই।

www.BanglaBook.org

এ বাছুরটা এখনো ছোট আছে। মাসির গোয়ালে যখন একেকটা নতুন বাছুর বা ছাগল আনা হয়, মাসি সেগুলো খেতা বা থাকোর হেফাজতে দিয়ে দেয়। খাওয়ানো, নাওয়ানো, চরানো, গোয়ালে তোলা, সব ওদের কাজ।

বনের ভেতর গজাড়, শাল, পাকুড়, তেঁতুল, শ্যাওড়া কত রকম যে গাছ। খেতারা কোনদিন উনোন ধরাবার কাঠের অভাব জানে না। বনে শুকনো ডালপালা পড়েই থাকে। যত পার কুড়িয়ে নাও।

'মদন রে! মদন রে!'

খেতা ডাকতে ডাকতে চলল। মদন, পবন, বদন—খেতা গরু-বাছুরের নাম দেয় বেশ। অনেক দূরে যেন পাতা ছেঁড়ার শব্দ। বাছুরটা কি পাতা ছিঁড়ছে আর খাচ্ছে?

'মদন রে!'

খেতা ডাকল। আর এমন সময় কে যেন বলল, 'কে রে ডাকাডাকি করে?'

খেতা বেজায় অবাক হল। এ পাশে চায় ও পাশে চায়, হঠাৎ দেখল চারচৌকো ইঁটের ঘরের দাওয়ায় একটা লোক বসে আছে। যেমন লম্বা, তেমনি সিঁড়িঙ্গে রোগা। মাথার চুল কাঁধ অব্দি। গায়ে একটা সত্যিকারের পিরান। খেতারা যেমন বুকের ওপর গামছাখানা আড় করে বেঁধে পিরান পরে সায়েব সাজে, তেমন নয়।

বোতাম আঁটা সত্যিকারের পিরান। তাছাড়া কানে দুটো রুপোর বউলি, মাথায় পাগড়ি, পায়ে জুতো। একহাতে একটা লাঠি, তার মাথাটা লোহা দিয়ে বাঁধানো। দেখে খেতা যেন ধড়ে প্রাণ পেল। লাঠির মাথায় লোহা আছে। তবে এ মানুষ, অপদেবতা নয়।

কে না জানে অপদেবতারা লোহা দেখলে ভয় পায়! লোকটা কলকেতে টান দিচ্ছিল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সে বলল, 'আমায় ডাকছিস কেন?'

খেতারা সচরাচর কারুকে 'আপনি' বলে না কিন্তু কর্তাদাদার শিক্ষাদীক্ষা অন্যরকম। খেতা বলল, 'আমি বাছুরটা খুঁজছি। আপনি হেথা বসে আছ তা কি আমি জানি, না আপনার নাম জানি?'

'বাছুরের নাম মদন?'

'আজ্ঞা।'

'ভাল ভাল। তা তুই কাদের ছেলা?'

'আমাদের নিবাস বুনোবিষ্ণুপুরে আজ্ঞা, হোই ওধারে।'

'কার ছেলে তুই?'

খেতা বাবার নাম বলল। লোকটা এখন হাসল। বলল, 'তাই বল্। তা তোর মেসোর বাড়িতে আমি অতিথি হব আজ।'

'অতিথ হবে আপনি?'

'হ্যাঁ। তোর কত্তাদাদা আমার গুরু হয় যি। যা, বল্‌গা যেয়ে মদন ঢালী আজ আপনার চরণ ধরতে আসবে।'

'এখনি?'

'না না, সাঁঝ হক, আঁধার হক, তা বাদে যাব। মাসি জানি ভাত রেঁধে রাখে।'

'সায়েব আজ কালীপুজো করবে আপনি যাবে না দেখতে?'

'না না। সায়েব দেখলে আমি বড় ডরাই। আর দেখ, যা বলবি শুধু কত্তাদাদা আর মাসির কানে। কেও যেন জানে না।'

খেতা অবাক হয়ে ঘাড় নাড়ল। লোকটা বলল, 'আমি বলে বসে আছি ডাকাত ধরব বলে, জানলি? আমি হলাম যেয়ে কোম্পানীর পেয়াদা।'

'তবে সায়েব দেখে ডরাও কেন?'

'সে তুই কি জানবি? সি দিনের ছোঁড়া? যা যা, ঘর যা!'

খেতা বাছুরটা খুঁজে নিয়ে বাড়ি চলে এল। কর্তাদাদা ত ওর কথা শুনে মহাখুসি। বলল, 'মাসিকে বল্ গা ভাত বেন্নন রেঁধে থুয়ে জানি বেলা থাকতে চলে যায়।'

'আপনি কি পওরা দেবে?'

'দেখি কে পওরা দেয়!'

কর্তাদাদা হাসল। কর্তাদাদা সামান্য লোক নয়। সবই ত বলে কর্তাদাদা মন্ত্র জানে। গাছ চালাতে পারে। বান মেরে পুকুরের মাছ মেরে দিতে পারে। পিদিম মন্ত্র পড়ে চেলে দিতে পারে। সে পিদিম ভেসে ভেসে দূর গ্রামে গিয়ে শত্রুর ঘরদোর জ্বালিয়ে দিতে পারে।

হয়ত একটা ভূতপ্রেতকেই কর্তাদাদা মন্তর পড়ে রেখে দেবে। ভূতটা এসে মাসির হেঁসেল পাহারা দেবে।

খেতার হঠাৎ কি মনে হল। বলল, 'ও কত্তাদাদা! আমার বাবা এলে আমি চলে যাব যি, তা আপনি আমায় মন্তরটা দেখাবে না? আমি তোমার পায়ে নিত্য তেল মালিশ করি, তোমার মাজা টিপি!'

'কোন মন্তরটা?'

'সেই ডাকাত ধরার মন্তরটা!'

'মন্তর শিখে কি করবি?'

'বীরে ডাকাত, ছিরে ডাকাত দুবেটাকে ধরে গামছা বেঁধে নে যাব।'

'দেব দেব, তোকেই মন্তর দেব।'

'থাকোটাকে দিও না।'

'ধুর, ওটা মেয়েমানুষ, ভাত রাঁধবে, বাসন মাজবে। ওকে কখন মন্তর দিই?'

॥ ৩ ॥

মাসি যেমন হুসহাস করে গিয়েছিল তেমনি হুসহাস করে বামুনবাড়ি থেকে ফিরে এল। সঙ্গে হরিচরণের মা আর পিসি। শাশুড়ি আসছে বলে থাকো তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিল। হরিচরণ দাওয়ায় সভ্যভব্য হয়ে বসল।

মাসির ধামায় মুগকলাই একটা বড় লাউ। লাভটা হরিচরণের মা বেয়ানের জন্যে এসেছে। মাসি বাড়ি ঢুকতেই খেতা বলল, 'ইদিকে শোন মাসি।'

'দাঁড়া বাছা, ধুকুনি জিরিয়ে নিই।'

'জিরোবি পরে, এখন শোন।'

খেতা মদন ঢালির কথা বলল। মাসি তখন খেতাকে অবাক করে বলল, 'পুকুর ধারে চল্ বাছা, তোর ব্যাগ্যোতা করি।'

মাসি কারো ব্যাগ্যোতা করে না কি? খেতার ত মনে পড়ে না।

পুকুর ধারে গিয়ে মাসি চুপে চুপে আঁচল খুলে খেতাকে হাতে একটা জিনিস দিল।

লোহা আর তামা মেশানো ঢ্যাক পয়সা। একটা জলজ্যান্ত গোটা পয়সা।

'মোকে দিচ্ছ?'

'নয় ত কি থাকোটাকে দেব?'

www.BanglaBook.org

একটা পয়সা আবার খেতারা কবে হাতে পায়! এখনো ওরা শাকটা মুলোটা, লঙ্কা, লাউটা বাড়িতে 'আরজায়'; বনজঙ্গল থেকে জ্বালানী আনে। পুকুর—নদী—বিল থেকে মাছ কাঁকড়া গুগলি কচ্ছপ ধরে। পাখি সজারু খরা শিকার করে।

বাকি রইল তেলটুকু, নুনটুকু, পরনের কাপড়টা গামছাটা।

খেতার অবশ্য মেসো আছে। যাদের মেসো নেই তারা গ্রামের মুনিব বাড়ি, বামুন পাড়া, কায়েত পাড়া, সব জায়গায় যায়। জমি চষে, ধান পায়। ধান ভানে, চাল করে। জমি তাদের নয়, তাই আকালে বানে খরায় উপোস করে।

ওরা জঙ্গল কাটে, মাটি কোপায়, নালা কেটে জল বইয়ে দেয়, পুকুর খোঁড়ে, বর্ষা গেলেই বাড়ি বাড়ি দাওয়া বাঁধে, ঘর ছায়।

পয়সা পায় না, কড়ি পায়। এই রাঙা রাঙা তেলতেলে কড়ি!

কাপড় পায়, গামছা পায়। যখন পায় না তখন কড়ি দিয়ে কলুবাড়ি থেকে তেল কেনে। জোলাপাড়া থেকে কাপড় গামছা আনে।

পয়সা আবার কে কবে হাতে পায়? কর্তাদাদা ত বলে পয়সা ছিল সেই কবে, সেই সত্য যুগে, যখন দেশে অন্য রকম নবাব ছিল।

একটা পয়সা! আহা, এমন একটা পয়সা দিলে বুঝি গিরি-কাকা ছোট একটা রথ বানিয়ে দেয় খেতাকে। রথের দিনে রথ টানতে মজা কত।

'পয়সাটা তোরে দিছি খেতা, শোন, মদন ঢালী মানুষ সামান্য লয়। উনি যখন রইবে, তোর কর্তাদাদার সঙ্গে কথা কইবে, তাতক্ষণ তুই যেয়ে চালে উঠবি গা!'

'চালে?'

'হ্যাঁ। লুক্কে থাকবি। শুনবি কি বলে ওরা। তা বাদে যত-ক্ষণ দেখবি মেসো আসতেছে, ততক্ষণ লুক্কে রইবি। মেসো কি বলে, উনি কি বলে, কত্তাদাদা কি বলে সব শুনবি। শুধু মোকে বলবি, আর কারেও লয়। যদি পারিস তবে তোকে এট্টা সামিগ্রী দেব।'

'কি দেবে!'

মাসি বিরসবদনে বলল, 'যাতে পরাণ দিয়ে এখেছ সেই সামিগ্রী—তোমার বাপের সেই সড়কি গাছা! না দিলে কামার-শালে যেয়ে ধন্না দেবে ত?'

খেতার বুকটা ধুক্‌ধুক্ করতে লাগল। মাসি কেমন করে জানল কামারশালায় ধন্না দেয় খেতা? নিশ্চয় কামার জেঠার ছেলে ফেলারাম বলে দিয়েছে।

'তোর কত্তাদাদার বুদ্ধি আর ভাল হবে না,' বলে মাসি চলে গেল।

দেখ কান্ড! কর্তাদাদাই যে খেতাকে বুদ্ধিটা দিয়েছিল, বলেছিল নিজের হাতে সড়কি একটা না থাকলে খুব ভাল হয়।

কর্তাদাদা জানে। কর্তাদাদা ত সেই কবে যেন বর্গীদের সঙ্গে লড়েছিল। সে যুদ্ধ হয়েছিল ন' দশ বছর ধরে। যে ছেলে-গুলো ছোট ছিল যুদ্ধ করতে করতে তাদের গোঁফ গজিয়ে গিয়েছিল।

সেই সময়কার মানুষ কর্তাদাদা। এখনো যদি যুদ্ধের গল্প করে তাহলে খেতার বুকের ঠিক ভেতরটা চমকে ওঠে।

কর্তাদাদা বলে, 'সি কি যুদ্ধ, কি যুদ্ধ! বালুচরের হোথা সে ধানখেতে পাকা ধানের গন্ধ ম ম করতেছে। বর্গীরা শুধু বলে 'হর হর মহাদেও' আর ধান খেতে ঘোড়া ঢুকিয়ে দেয়; তখন তোর বাপের কাকা, উই ছিচরণ দাদা বললে—হা রে! তোরা ধানের চালে ভাত খাস নি? মোরা বললাম—নিচ্চয়। তিনি বললে—হাতে সড়কি নি? মোরা বললাম—নিচ্চয়! তখন উনি মাথায় ফেটা বেঁধে নিলে আর বললে—সড়কি হাতে চেপে ধরে চল যেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি।'

'তারপর?'

'আমি জানি ডর খেলাম। শুধালাম—ছিচরণ দাদা, ওরা যে অগণন! দাদা বললে—মোরা যে বীরবংশী? চল্, মোরা যেয়ে বানের জলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ি। এ কথা বলে, গায়ে মাথায় ধুলো মেখে উনি যখন হাঁকুড় পাড়লে, কুড়ুল—বুনোবিষ্টপুর—মাথলা—সাভাস গেরামের নামে তোরা চল্ রে! তখন আমার বুকের ভেতর জানি কেঁপে গেল।'

'তা বাদে? ও কত্তাদাদা, তা বাদে?'

'তা বাদে মোরা যেয়ে বানের জলের মত ঝাঁপ দিলাম।'

'তা বাদে?'

'মোরা গেলাম ভাগীরথীর বানের মত, ওরা এল সমুদ্দুরে বানের মত। মোদের রক্তে ওদের রক্তে বাতচরের মাটি আঙিয়ে দিয়ে এলাম সিদিন। ওই দিনের যুদ্ধে মোদের গেরাম তোদের গেরামের কতজন যে মরেছিল তার লেখাজোখা নি খেতা! নবাব য্যাখন মোকে খেতাব দেলে ত্যাখন আমি তাঁর দেওয়া পাগড়ি নিই, মোর আঙুল বেঁকে যেতে থাকল। ছিচরণদাদা, করালী ঢালী, মোহনকালি সাঁতরা যদি থাকত তবে নবাব তাদেরকে সোনার তাজ দেত। আমি তাদের পায়ের নখটা বটি! তাই যেমুছেমু শির্‌পা নে চলে এলাম।'

কর্তাদাদা এখন শুধু কীর্তন গায় আর হরিনাম করে। তবু কর্তাদাদা একে প্রায়ই বলে, 'মাসির থে তোর বাপের সড়কিটা যদি চে নিয়ে পারিস খেতা, বেশ হয়।'

মাসি বললে সড়কিটা দেবে।

কিন্তু মদন ঢালী কর্তাদাদাকে কি বলে তাও শুনতে হবে।

খেতা সাত-পাঁচ ভেবে বাড়ির ভেতরে গেল। ভেতরে গিয়ে ওর হাসি পেল। থাকোর শাশুড়ি থাকোর চুলে তেলজল দিয়ে থাবড়ে থাবড়ে একটা এতবড় খোঁপা বেঁধেছে। তেলজলে গামছা ভিজিয়ে থাকোর মুখ মুছে একটা এতবড় টিপ পরিয়ে দিয়েছে। থাকো বলল, 'পায়ে মল পরব না?'

শাশুড়ি বলল, 'তা আর পরবে না? দেশজোড়া আকাল, তুমি পেতলের মল বাজাতে বাজাতে যাবে না? তা বাদে ডাকাত এসে পড়ুক।'

থাকোর শাশুড়ির ডাকাতের ভয় খুব।

খেতা স্নান করল। মাসি অনেকদিন বাদে তেল মেখে, সরষের

www.BanglaBook.org

খোল দিয়ে গা মেজে স্নান করল। কর্তাদাদার ভাত বেড়ে থাকো দাওয়ায় দিল।

ওরা সবাই পউষের রোদে পিঠ দিয়ে উঠোনে বসে ভাত খেল। থাকোটা শুধু ঘোমটা কেড়ে পিছন ফিরে খেতে বসল। হরিচরণ আছে, শাশুড়ি আছে, লজ্জা করতে হয়।

ল্যাটামাছ, গজার মাছ, বেগুন লঙ্কা দিয়ে ঝাল হয়েছে, ময়ামাছের টক। মটর ডাল ন্যাকড়া বেঁধে ভাতে দেওয়া হয়েছিল, মাসি সেটা শুকনো লঙ্কা পোড়া আর তেল দিয়ে মেখেছে। হরিচরণের পিসি কলাপাতা মুড়ে একটা নতুন জিনিস এনেছে।

খরার মাংস তেঁতুল লঙ্কায় মজিয়ে শুকনো করে রেঁধেছে। মাসি বলল, 'কেমন করে মজালি?'

পিসি কথাই বলল না। থাকো বলে পিসি কখনো কেমন করে বেগুন রাঁধল, কোথা থেকে ফল পাকুড়টা পেল তা বলতে চায় না।

খেয়েদেয়ে সবাই হাতে হাতে বাসন মাজল। মাসি জল তুলে জালা ভরে রাখল। আজ মেসো আসবে, কানাই বলাই আসবে। কালী পুজো দেখতে এখন এক ক্রোশ যাবে, এক ক্রোশ আসবে মাসি।

তারপর রাঁধতে বসবে। মেসো এলে বড় ভাল লাগে খেতার। মেসো যখন আসে তখনি রাতে রান্নাবান্না হয়। নইলে মাসি দুবেলা রাঁধতে চায় না।

হাঁস, ছাগল, গরু-বাছুর সব ঘরে তুলল মাসি, খেতা আর থাকো। মাসির ঘরখানা খুব বড়। চারচালা ঘর, মেসো আর খেতার বাবা বেঁধেছিল। ঘরের মাঝামাঝি থেকে দেওয়াল পর্যন্ত বাঁশের বেড়া দেওয়া। ঘরখানা দু'ভাগ করা, দু' দিকেই বাঁশের মাচা।

ওই মাচা ওদের খাট-পালঙ্ক। মাচার ওপর চেটাই পাতা। আর তার ওপর মোটা গড়ান বেছানো। গড়ানের নিচে খড় পুরু করে পাতা।

পউস মাসের শীতে খড়ের গরমে খুব আরাম। পিঠের নিচে খড়। গায়ে পুরু কাঁথা। মাসি যে মাচায় শোয় তার নিচে মাটিতে একটা সিন্দুক বসানো আছে। সিন্দুকে কি থাকে খেতা তা জানে না। মাসি বলে, 'এই চালটা ডালটা, আর কি রইবে বল্?'

মাসির ঘরে মাসি কুলুপ আঁটল। মাসি কুলুপ বলে না, বলে কুলুশ।

তারপর বলল, 'খেতা, ঘর মুনে রইবি, জানিস?'

'বলেছি ত রইব।'

খেতার এখন কান্না পেল। কেন ওরা সবাই যাচ্ছে? কেন খেতা একা থাকবে? কিন্তু মাসি ওর দিকে কটমট করে তাকাল। মাসির পরনে ক্ষার দিয়ে কাচা কাপড়, হাতে মাটির কটকটে শক্ত রাঙা কড়। মাথায় মোটা সিঁদুর।

থাকোর শাশুড়ি বলল, 'নক্কি ছেলে খেতা। তু কাঁদিস না খেতা। তোরে আমি এট্টা নারকেল আর ছাতুর লাড়ু দে যাব। এবার আনতাম বাপ, তা সায়েবের সাথে দেখ গা অগণন পাক-প্যায়দা-লস্কর। তারা কানাত ফেলেছে কত বড় দেখে এলাম যি। তারা থাকে বলে সামিগ্রী জোগাতে যেয়ে বড় হয়রান হয়েছি বাপ।'

ওরা চলে গেল।

তারপর একসময় চারদিক ছায়া ছায়া করে সন্ধে নামল। শীতের সন্ধে তাড়াতাড়িই নামে। সন্ধে হতে না হতে মেসো আর কানাই বলাই এসে পড়ল। বলল, 'মাসি কোথা খেতা?'

'সায়েব কালীপুজো করছে তাই দেখতে গেছে।'

'তুই গেলি না?'

'ঘর মুনতে বলে গেছে।'

'তা ভাল, তা ভাল। তা মাসি ভাত রাঁধবে না?'

'এসে রাঁধবে।'

'তা আমি ত এসে গেছি। তুই যাবি না কি? যাবি ত যা!'

'না। মাসি মারবে।'

'তা ভাল, তা ভাল। এই নে।'

মেসো গামছার বাঁধন খুলে খেতাকে দুখানা বড় বড় ক্ষীরের ছাঁচ দিল। বলল, 'খেয়ে ঘুমো গে যা।'

খেতা বলল, 'আমি মাসির কাছে শোব আজ। তা দেখ, রান্না হলে মোকে জাগিয়ে দিও।'

'দেব রে দেব।'

ওরা চিঁড়ে আর ক্ষীরের ছাঁচ খেল, জল খেল। তারপর কর্তাদাদার ঘরে গেল। যাবার আগে কানাই উঠোনে একটা বড় মশাল পুঁতে জেলে দিয়ে গেল।

কাঁঠালের আঠা, গন্ধক, এই সব দিয়ে মাসি বছর ভোর মশাল তৈরি করে রেখে দেয়। আগুন হেঁসেলে সর্বদা থাকে। শুধু ঝড় এলে আগুনে জল ঢালে মাসি। ঝড় এলে জ্বলন্ত কাঠকয়লার ফুলকি উড়ে পড়লে ঘর জ্বলে যায়।

নয়ত মাসির উনোনের গর্তে সবসময় কাঠকয়লার গনগনে আগুন ছাইচাপা থাকে। চকমকি পাথর ত সব সময় হাতের কাছে থাকে না যে ঠুকে ঠুকে আগুন জ্বালবে মাসি?

মশালটা জেলে দিয়ে গেল কানাই। খুব আলো হয় মাসির তৈরি মশালে। চারদিক রোশনাই হয়। এমন আলো দেখলে শেয়াল বল, হুড়ার বল, এমনকি চিতাবাঘও কাছে ঘেঁষে না।

ওরা চলে গেল আর খেতা উঠে পড়ল। হাতে হাতে পাওয়া একটা পয়সা এখনো ওর ট্যাঁকে। গায়ে বেশ করে দোলাইটা জড়িয়ে নিল; তারপর ঘরের দোর ভেজাল।

গোয়াল ঘরের পেছনে বাঁশের খুঁটি। খেতা খুঁটি ধরে ওপরে উঠল। তারপর খড়ের চালে মুখ ডুবিয়ে আস্তে আস্তে খড় ফাঁক করতে লাগল।

॥ ৪ ॥

কর্তাদাদা মাচার ওপর বসে আছে। কর্তাদাদার পাশে সেই লোকটা, মদন ঢালী। মেসো, কানাইদাদা, বলাইদাদা আর ফেলার বাবা গিরি জমায়েত। কর্তাদাদা বলছে, 'আর সায়েব ত সবাই। তা বেটাদের গায়ে পিরেন আর পায়ে জুতো দেখলেই বলবি সায়েব।'

'পান্তাসায়েবের চেলা লয় কো!'

ওয়ারেন হেস্টিংস নাকি একবার প্রাণের ভয়ে না নবাবের ভয়ে মুদির দোকানে লুকিয়েছিল। মুদি হেস্টিংসকে পান্তা-ভাত আর কাঁচালঙ্কা খাইয়ে প্রাণ বাঁচায়। সেই থেকে খেতারা হেস্টিংসকে পান্তাসায়েব বলে।

'কেমন করে জানলি পান্তাসায়েবের চেলা লয়?'

'আরে, খবর না লিয়ে কি আসা করেছি?' মেসো একটু বিরক্ত হয়ে কর্তাদাদাকে বলল।

মদন ঢালী একটু হাসল। বলল, 'আমার খবর আরেক

www.BanglaBook.org

রকম।'

'কি রকম হে মদন?'

মদন ঢালী আঙুল গুনে গুনে বলল, 'এট্টা খবর সায়েব এয়েছে খবর নিতে। শিরোমণি কত্তার বড়ছেলা খবর রাখতেছে কারে কারে ডাকাত বলে সন্দ করে।'

কর্তাদাদা চোখ বুজে বলল, 'বড় ছেলেটা? তা তাঁরে একবার গোলোক দেখ্যে দিলে হয়? হরি বল মন।'

খেতার চোখ গোল গোল হয়ে গেল। হাত-পা বেঁধে চার প্রহর উপোসী রাখার নাম গোলোক দেখানো।

'আর খবর, এই সায়েব এ মৌজা হতে তিন হাজার টাকা খাজনা তুলেছে। আর খবর হল কালীপুজো ছলা মাত্র। সায়েব কাল খাজনা নে কলকেতা ফিরবে। সঙ্গে পাইক পেয়াদা বরকন্দাজ রইবে তিরিশজন।'

'তিরিশজন!'

'আজ্ঞা তিরিশজনের মধ্যে বিশজন আপোনারই আপনজন।'

মদন ঢালী হাতজোড় করে বলল, 'এ অধীনের চাকরি এই কম্ম যি! সায়েবরা এখন দেশের দেওয়ান। কোমপানী দেওয়ানী নিলে যতক্ষণ, ততক্ষণ পাইক প্যায়দা চাই। যেমন তেমন হলি চলে না। লড়ুয়ে পাইক প্যায়দা চাই। তা মদন ঢালী কোমপানীর কাছারিতে প্যায়দা পাইক নে আসে।'

'হরি বল মন!'

'এই দেখেন গা খেতা নামে যি ছেলাটা, ওর বাপ, ভাই, কাকা, জেঠা, সব প্যায়দা হয়ে এয়েছে। আরো সব প্যায়দা সব গে কেঁতুলে, নিবুলে, আঁবুই, সরাসে, এই চারখানা গেরামে আপোনার যত জ্ঞাত গুষ্টি আছে তারা সবাই।'

'সবার হাতে সড়কি আছে?'

'আজ্ঞা লাঠি সড়কি বিনে কি প্যায়দা চলতে আছে? এক বেটার কাঁধে আবার বন্দুক একখানা।'

'হরি বল মন! তা কাল তা'লে যাত্রা কখন?'

'ভোরে।'

'তবে এট্টা সংকীর্তনের দল চাই যে?'

'সংকীর্তনের দল?'

'ইদিক হতে ওনারা যাচ্ছে, সাথে সাথে দলটা যাবে। মানকড়ার কাছে এক গেরামে কীর্তনের বায়না হয়েছে। তা দিনকাল বড় মন্দ ত? পথে ডাকাতের ভয়। সায়েবের প্যায়দা সঙ্গে রইলে ভয়ডরটা কম থাকে মনে। এট্টা পাল্‌কি।'

'পাল্‌কি কি হবে?'

কর্তাদাদা মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'নন্দ কামার আমার চে কর পত্তরের ছোট—মোরা কি হেঁটে যাব?'

'আপনি যাবে?'

'কুটুম বাড়ি যাব না?'

খেতার মেসো এই সময় গলা খাঁখারি দিয়ে বলল, 'এট্টু গান ভাঁজলে হত না? খেতার মাসি এসে পড়লে পরে...'

ওরা সবাই গাইতে লাগল 'আরে হরি বল মন রসনা আহা হরিনাম কেমন জান না।'

খেতা চুপিসাড়ে নেমে এল। খেতার মাসি বাড়ি এসে সকলকে খেতে দিল। তারপর রাতে বিছানায় শুয়ে খেতা যখন সব কথা বলল তখন কি হল জান? পিদিমটা নিভিয়ে দিয়ে খেতার মাসি খিক খিক করে হাসতে লাগল। বলল, 'কাল ওরা তোকে সাথে নেবেনিকো। তুই জিদ করে চলে যাসনি খেতা। কাল ঘরে থাকিস।'

খেতা কোন কথাই বলল না। খেতার বাপ, ভাই, জেঠা সকলে দেখতে পাবে তবু খেতা যাবে না? তা কখনো হয়?

॥ ৫ ॥

তারপর সে কি কাণ্ড, সে কি কাণ্ড!

সায়েব তো থলি বোঝাই রুপোর টাকা ঘোড়ার জিনপোশের নিচে বেঁধে রওনা হয়েছে। রাস্তাটা বেশ চওড়া। তাই পাশে পাশে কীর্তনের দল চলেছে বলে কোন অসুবিধেই হয়নি।

দুই বুড়ো পাল্‌কি চড়ে চলেছে। তাদের ঝগড়া শুনতে শুনতেই সময় কেটে যাচ্ছে। যত চেঁচায় খেতার কর্তাদাদা তত চেঁচায় নন্দ কামার।

'নন্দকামার রাজার বাড়ি দুর্গোচ্ছব করিছিল, যতজনা মানুষ তত গণ্ডা চিনির সাঁচ, মুড়কি আর দই দিয়েছিল।'

'ইঃ! তাই যদি দেবে তবে তুই পরের বছর দুর্গোচ্ছবে গেলি না কেন?'

'গেলাম না কেন? পায়ে ফোঁড়া হয়েছিল কার?'

'তোর ফোঁড়া হল যদি তবে তিনকোশ পথ হেঁটে মাছ চুরি করতে গিয়েছিল কে?'

সায়েবের পাশে পাশে চলেছে মদন ঢালী। পথটা মন্দ নয়। কখনো ধানখেতের পাশ দিয়ে, কখনো বা বাবলা বনের ভেতর দিয়ে চলেছে। ক্রমে ওরা জঙ্গলের কাছে এল। জঙ্গলের ওপারে মনকড়া আর মানকড়ার কাছের একটা গ্রামে কীর্তনের বায়না হয়েছে।

সায়েব বলল, 'বেলা বাড়ছে। বড় গরম। ছায়ায় ছায়ায় গেলে হত।'

মদন ঢালী বলল, 'জঙ্গলে নাকি ডাকাতের ভয়?'

'এত লোক থাকতে ডাকাত আসে কখনো?'

'আসে না?'

'কেমন করে আসবে?'

মদন চেঁচিয়ে বলল, 'অ কর্তাদাদা, সায়েব বলতেছে ত্যাত লোক রইলে ডাকাত আসে কেমন করে?'

বুড়োকর্তা পাল্‌কি থেকে মুখ বের করে বলল, 'কি বলতেছে?'

'ডাকাত আসে কেমন করে?'

'কেন, এমনি করে?'

এই না বলে কর্তাদাদা পাল্‌কি থেকে নেমে পড়ল। নন্দ কামারও বলল, 'সায়েবটা ত মহা জ্বালালে দেখছি।'

নন্দ কামারও নেমে পড়ল। খেতার বুক ঢিপঢিপ করছিল, ও ছুটে গাছের আড়ালে গেল। তখন কর্তাদাদা আর নন্দ কামার দুই খুনখুনে বুড়ো কি করল জান? মেয়েরা যেমন করে উলু দেয় ঠিক তেমনি করে মুখের ভেতর আঙুল নেড়ে জিভ ঘুরিয়ে হা রে রে রে বলে চেঁচিয়ে উঠল।

কর্তাদাদা বলল, 'বীরে ডাকাত ছিরে ডাকাতের নাম জান না? মোরা মন্বন্তরে পোকামাকড়ের মত মরে আছি আর তোমরা দেওয়ান হয়ে সম্বন্ধ নিয়ে যাবা? মোরা কি কীটের মত মরে থাকব?'

সায়েবের কাজ হল খাজনার টাকা নিয়ে যাওয়া। সে কি সহজে খাজনার টাকা ছেড়ে দেয়? সায়েব বলল, 'আমার হাতে বন্দুক আছে, তা ছাড়া তিরিশজন পেয়াদা। খাজনা আমি ছেড়ে

www.BanglaBook.org

দেব না।'

তিরিশ জনের মধ্যে কুড়িজনই যখন কর্তাদাদার পাশে গিয়ে দাঁড়াল তখন সায়েব আর কি করে?

খেতার মেসেমশাই ঘোড়াগুলোর লাগাম কেড়ে নিয়ে বনে ছেড়ে দিল। মিহি গলায় বলল, 'সায়েব, এবার তুমি হেঁটে হেঁটে যাও! আমরা এবার গান গাইতে গাইতে চলে যাই!'

পাল্‌কিতে আবার দু' বুড়ো চড়ে বসল। মাঝে টাকার তোড়াগুলো রইল। আট-দশজন পেয়াদা হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল পাল্‌কি নিয়ে ওরা ধানখেতের আল ধরে চলে যাচ্ছে। যারা এতক্ষণ গলার দুদিকে গামছা ঝুলিয়ে কোঁচা দুলিয়ে বাবড়ি চুল নাচিয়ে 'হরি বল হরি বল' গাইছিল তাদের চেহারা এখন অন্যরকম।

কোমরে গামছা বেঁধে, সড়কি আর লাঠি আকাশে নাচিয়ে ওরা কেমন নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে চলে যাচ্ছে। ওরা গাইছে—

'বেপদে পড়িলে সবে ছিরের চরণ ধোর রে!
বীরের চরণ ধোর রে!'

সবচেয়ে পেছনে একটা রোগা হ্যাংলা পেটমোটা ছেলে চলেছে। সে-ই নাচছে সবচেয়ে জোরে জোরে লাফ মেরে।

সায়েব বলল, 'বুড়ো দুটো বীর ডাকাত, ছিরে ডাকাত?'

পাইকরা বলল, 'আজ্ঞা, কলকেতা যেয়ে ভাল পাইক নে এসে ওদেরকে ধরা করাব।'

সায়েব বলল, 'চোপরাও! কি বলবে? দুটো বুড়ো আমাকে বোকা বানিয়ে দিয়ে চলে গেল? তাই বলবে?'

বলতে বলতে কি হল জান? পাইকরা হতভম্ব হয়ে দেখল সায়েব হো হো করে হাসছে আর হাসছে।

১৩৭৯

ঘেণ্টুলালের চটি

সুনির্মল বসু

হাসির কথা বলতে হবে? আচ্ছা শোন তাই
এখন বলি ঘেণ্টুলালের মজার ঘটনাই।
টাকের নীচে বিরাট টিকি—তাইতে বেঁধে ফুল
ঘেণ্টুভায়া চলেন পথে, দুলছে দোদুল দুল
লম্বা টিকি চলার তালে। তখন গরমকাল,
সামনে পড়ে পথের মাঝে একটা ছোট খাল।
বাঁশের সাঁকো, তাইতে তিনি যেমন হবেন পার
একটি চটি চট করে হায় পড়ল খসে তাঁর।
হায় হায় হায় খসল চটি খালের মাঝে ঠিক
ঘেণ্টুভায়া ব্যস্ত হয়ে খোঁজেন চারিদিক।
কিন্তু কোথায় চটিটি তাঁর, ওদিকে চটে তাই
অপর পাটি পাকড়ে তিনি ছোঁড়েন সহসাই—
খালের ধারে বেজায় জোরে, আপদ চুকে যাক
চটিবিহীন চরণ দুটি সঙ্গে তাঁহার থাক।
চাই না জুতো, চামড়া পরে দামড়া যত লোক
ঘেণ্টুলালের সাজে কি আর জুতোর তরে শোক।
অপর পাটি পায়ের জোরে মারেন ছুঁড়ে তাই,
খালের জলে সাঁতার কাটে বৃন্দাবনের ভাই—
শাঁই করে সে শক্ত চটি চটাং করে জোর
অন্ধকারে গালের উপর লাগল এসে ওর।
বৃন্দাবনের নাম শোননি? মস্ত সে জোয়ান
ভাইটিও তাঁর মন্দ ভারি, চোস্ত পালোয়ান।
গালের উপর পড়তে চটি, অমনি রেগে কাঁই—
ঘেণ্টুলালের দিকে আবার ছুঁড়ল চটিটাই।
ঘেণ্টুভায়া পার হয়ে পোল হনহনিয়ে যান
টাকের উপর ধপাস করে পড়ল চটিখান।

www.BanglaBook.org

টাক জ্বলে যায় চটির ঠেলায়, তেড়ে পুনর্বার
ঘুরে দু'বার ছুঁড়ে মারেন শূন্যে চটি তাঁর।
মাঠের পথে যায় চাষী এক মাথায় ঝোলাগুড়—
পড়ল চটি গুড়ের ভাঁড়ে, ভাঁড় পড়ে হুড়মুড়।
গুড় মাখানো চটিটা যেই পড়ল ভাঁড়ের সাথ
হ্যাংলা কুকুর কোথায় ছিল, আসল অকস্মাৎ—
কামড়ে দাঁতে মিষ্টি চটি দৌড়ে চলে যায়;
গুড়ের শোকে কাঁদছে চাষা, হায় হায় হায়—হায়।
চটি মুখে চলছে কুকুর, ছোঁ মারে তায় চিল,
তাই না দেখে গুলতি দিয়ে ছুঁড়ল জগা ঢিল।
চিল উড়ে যায় শূন্য পানে, ঢিলটি লাগে গায়
ঠোঁটের থেকে খসল চটি ফ্যালার আঙিনায়।
ফ্যালার মাসী দিচ্ছে বড়ি থালের পরে থাল—
চটাস করে পড়ল চটি, হায় এ কী জঞ্জাল!
থেবড়ে গেল ডালের বড়ি, ঘাবড়ে মাসী যায়—
সামনে ফ্যালা দাঁড়িয়ে ছিল, দেখতে সেটা পায়।
ভীষণ চটে ছুঁড়ল চটি গায়ের জোরে তার
কোথায় গিয়ে পড়ল চটি খোঁজ রাখে না আর।
গয়লা নরু দোহায় গোরু পাশের গোয়ালটায়
ঝপাস করে পড়ল চটি শিঙের উপর ঠায়—
দুইটি শিঙের মাঝখানে তা আটকে গেল জোর,
চমকে গোরু ভড়কে গিয়ে ছিঁড়ল গলার ডোর,
চার পা তুলে ছুট লাগাল, একটি চাঁটের ঘায়
দুধের কেঁড়ে উলটে গেল, নরুও উলটায়।
ছুটল গোরু, ছুটল নরু ধরতে তারে আজ—
কী যে হল, করতে নারে একটুও আন্দাজ।
অনেক ছোটাছুটি করে, নিতান্ত হয়রান—
ঘেণ্টুলালের বাড়ির কাছে পেল সে সন্ধান।
এবার নরু ধরল গোরু, শিঙের থেকে তার
অনেক করে গায়ের জোরে করল চটি বার।
তারপরে সে 'হেঁইয়ো' বলে ছুঁড়ল চটিখান,
ঘেণ্টুলালের জানলা পানে করল সে প্রস্থান।

ঘেণ্টুভায়া ফেরেন বাড়ি, ঝরছে গায়ে ঘাম
হাত পা ধুয়ে যান এবারে করিতে বিশ্রাম।
ঘরে ঢুকেই চক্ষু তাঁহার ছানাবড়া প্রায়
গুড় মাখানো চটি জুতো তাঁহার বিছানায়।
চটি দেখে ঘেণ্টুভায়া বেজায় চটিতং—
নাহি বোঝেন ব্যাপারখানা ক্যাম্‌নে ঘটিতং!!

১৩৭০

www.BanglaBook.org

ছোট্টদের জন্য

ছোট্ট ছোট্ট গল্প

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

ভীতু নিতু

রাতদুপুরে নিতুর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলেই, জানালা দিয়ে ঝলমলে চাঁদ দেখতে পেল।

ওরে বাবা! জানালার কোনে ওটা কি? ঐ যে গোল, কালো, কিসের মাথা—চোর নাকি? না, ওর দাদা ত বলেছে চোর ওখানে উঠতেই পারে না। তবে? তবে কি ভূত?

ভয়ে নিতু চিৎকার করতে গেল—গলা দিয়ে বিশ্রী একটা আওয়াজ বেরোল। দাদা সতু পাশেই শুয়েছিল, চমকে উঠে বলল, 'কি হল রে?' বাবা-মা ছুটে এলেন, 'কি হল নিতু?'

নিতু মাকে জড়িয়ে ধরে জানালার দিকে আঙুল দেখিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'ভূ-ভূ-ভূ-ত।' সতু লাঠি নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে বলল, 'দেখি কেমন ভূত?'

ভূতটা মিহিসুরে বলল 'মিউ!' তারপর লাফিয়ে নেমেই, লেজ তুলে দে-ছুট!

ভূত নয়, চোর নয়, কারো মাথা নয়, পাশের বাড়ির সেই কালো বেড়ালটা গুটিসুটি জানালায় বসেছিল!

তখন সকলের কি হাসির ধুম! বেচারা নিতু লজ্জায় লেপের তলায় লুকিয়ে রইল।

আমচোর

বাগানের গাছে অনেক আম হয়েছে।

একটা বাঁদর গুটি-গুটি সেই দিকে চলেছে দেখেই দুই কুকুর "রাজা" আর "রাণী" তেড়ে গেল। বাঁদরটা সুট করে আমগাছে উঠে গেল; কুকুর ত গাছে চড়তে পারে না, ওরা গাছতলায় দাঁড়িয়ে রইল।

নিচে থেকে দুই কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে, উপর থেকে বাঁদরটা আম খেয়ে খোসা আর আঁটিগুলো ওদের গায়ে ছুঁড়ে মারছে!

ভীষণ রেগে ওরা পাগলের মত ছুটোছুটি চেঁচামেচি করছে।

সারাদিন এমনি চলল। বাঁদরটা কুকুরের ভয়ে নামতে পারছে না, ডালে বসে কিচিরমিচির বকছে আর ভেংচি কাটছে।

কুকুররাও ভাবছে, 'যাবে কোথায় বাছাধন? এক সময় ত নামতেই হবে?' তারা গাছতলা থেকে নড়ছে না।

রোজ রাজা আর রাণী এক সাথে এক পাতে খায়; আজ রাজা এসে আগে খেয়ে গেল, রাণী বসে পাহারা দিল; তারপর রাজা গিয়ে পাহারায় বসল, তখন রাণী খেয়ে এল।

রাত হয়ে গেল, তখন রাজা আর রাণীকে ধরে এনে বেঁধে দেওয়া হল। সেই সুযোগে বাঁদরটা নেমে তিড়িং তিড়িং করে পালিয়ে গেল!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেই লোকটা

সেই লোকটাকে দেখলেই খোকনের ভয় হয়—বেঁটে, মোটা, কালো, ঝাঁকড়া-মাথা, পিঠে মস্ত একটা থলে। আয়া বলেছে, 'লোকটা ছেলেধরা। একলা বাইরে গেলেই, ধরে ঝুলিতে পুরবে!' তাই ত খোকন কখনো একলা রাস্তায় বেরোয় না।

একদিন সে ভুলে বাঁদর-নাচওয়ালার পিছনে অনেক দূর চলে গেল। বাড়ি ফিরতে গিয়ে আর পথ চিনতে পারে না! ভ্যাঁ—করে সে কেঁদে ফেলল।

হেঁড়ে গলায় কে বলল, 'কি হল খোকাবাবু?' চেয়ে দেখে, ওরে বাবা! সেই লোকটা! 'মা—মা' বলে খোকন ছুটল, লোকটা খপ করে তাকে ধরে কাঁধে তুলে বলল, 'ভয় কি? এখনি মার কাছে যাবে, কোথায় বাড়ি তোমার?' কোথায়, তা জানে না বলেই খোকন কাঁদছে!

ঘুরতে ঘুরতে, হঠাৎ তারা বাড়ির সামনে এসে পড়ল। বাড়িতে তখন সবাই ব্যস্ত হয়ে খোকনকে খুঁজছে।

বাবা বকশিশ দিতেই, লোকটা একগাল হেসে সেলাম করল, তারপর আবার থলি কাঁধে চলল—'শি-শি বো-ত-ল্!'

খোকন চুপি চুপি মাকে বলল, 'মা, তবে যে আয়া বলেছিল, লোকটা ছেলেধরা?'

'না বাবা, লোকটি খুব ভাল। কিন্তু, যদি সত্যিই ছেলেধরা হত, তাহলে আজ কি হত, বলো ত খোকন?'

কোকো, পিংকা আর—

দুই কুকুর, কোকো আর পিংকা। কোকোর ঝাঁকড়া লোম, রং মেটে আর সাদা। পিংকার রং হলদে, মুখটা কালো। সে ভারি পেটুক, চুরি করে খায়, তাই সবাই তাকে বলে 'হাঁড়িখাকি'।

একদিন পিংকা কোথা থেকে একটা মাছ চুরি করে নিয়ে এল। কোকো তার গা ঘেঁষে, লেজ নেড়ে, কুঁইকুঁই করে বলল, 'সবটাই একলাই খাবে ভাই? কাউকে কি একটুও দিতে নাই?'

পিংকা ঘেউ ঘেউ করে বলল, 'ইস্! কায়দা করে নিয়ে এলাম আমি, আরাম করে ভাগ বসাবে তুমি? সেটি হবে না বাপু।'

'হবে কি না হবে, দেখবি এবার তবে?' বলে কোকো কপ্ করে মাছের মুড়োতে এক কামড় বসাল। পিংকা ভীষণ রেগে খপ্ করে তার টুঁটি চেপে ধরল। তখন লেগে গেল দুই কুকুরে ঝুটোপুটি মারামারি।

শেষে কোকো হার মেনে পালাল—পিংকা তার পিছনে তাড়া করল।

জানালায় বসে পুসি সব দেখছিল, যেই না কোকো আর পিংকা বাইরে গেল, অমনি সে একলাফে নেমে এসে ডাকল, 'আয় লালি। আয় কালি! ভোজ খাবি আয়!' দুই ছানা লালি আর কালি তখনি মিউ মিউ করে ছুটে এল।

কোকোকে বাগানে তাড়িয়ে দিয়ে পিংকা ভাবল—এবার মজা করে বসে মাছটা খাই গিয়ে। এসে দেখে, ও মা, মাছ ত নাই! কোথায় গেল? কোথায় গেল? উপর দিকে তাকিয়ে দেখে, জানালার তাকে বসে পুসি জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে আর আড়চোখে চেয়ে আছে।

১৩৭৪/৭৫/৭৬

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানুষখেকোর অন্তিম অনুরোধ

সৌরেন্দ্র কুমার পাল

চল্লিশ বছর আগের ঘটনা!

ডাক্তার ব্যানার্জি তখন উত্তর বিহারের নেপালের সীমানার কাছাকাছি একটা সরকারী চিকিৎসাকেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার। হাসপাতালের রুগী ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে গিয়ে তাঁকে রুগী দেখতে হত। এই কারণে ওই পাহাড়ী-জংলা অঞ্চলে তিনি মোটর সাইকেলে যাতায়াত করতেন। ওষুধের সরঞ্জাম ও স্টেথোস্কোপের সঙ্গে রাইফেল বা বন্দুক নিতে ভুলতেন না। কারণ তিনি একাধারে ডাক্তার ও শিকারী। যাবার সময় হতেন ডাক্তার, আর ফিরবার সময় শিকারী।

বেতিয়া এবং ভয়সালোটন্ জঙ্গল বড় জন্তুর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তরাই-এর জঙ্গলে সম্বর, চিতল ও কোটরা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের হরিণ, নীল গাই, বরাহ ও আরও অনেক ছোট-বড় জানোয়ারের প্রাচুর্য ছিল তখন। বাঘ এবং চিতাদের এইসব স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব ছিল না কোনদিন, তাই মানুষের উপর লোলুপ দৃষ্টি তারা কোনদিন দেয়নি।

তবুও, একদিন ডাক্তারখানায় অপ্রত্যাশিত খবর এল, বাঘ একটা লোককে গুরুতরভাবে জখম করেছে। খবরটা যখন ডাক্তারবাবুর কাছে এল, প্রায় তিরিশ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তখনকার দিনে বনাঞ্চলে টেলিফোন ছিল না। বিজলী বাতি সেখানকার অন্ধকারকে স্পর্শ করতে পারেনি। ডাকহরকরা বা অন্য মানুষ প্রেরিত সংবাদ সরবরাহের একমাত্র উপায় ছিল। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই বনাঞ্চলে নেমে আসত একটা বিরাট স্তব্ধ আঁধার। সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে নিশাচর প্রাণীর ভাঁটার মত জ্বলজ্বল চোখ ও জোনাকিদের উড্ডীয়মান আলো ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হত না।

যাই হোক, ডাক্তারবাবু ঘটনার বিবরণ শুনে বুঝলেন, লোকটা গুরুতরভাবে আহত হবার দরুন এতক্ষণে হয়ত মারা গেছে, আর বেঁচে থাকলেও অবশ্য সে তখন চিকিৎসার বাইরে। কারণ, তার ক্ষতস্থানে ততক্ষণে সেপ্টিক হয়ে নিশ্চয়ই গ্যাংরিন হয়েছে।

এ ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় হত্যার খবর এল। চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে মাত্র পাঁচ-ছয় মাইল দূরে। কয়েকজন বনপথে চলছিল অন্য কোন এক গ্রামের উদ্দেশ্যে। হঠাৎ শেষের লোকটিকে বাঘ আচম্বিতে আক্রমণ করে এবং সঙ্গীদের সমক্ষেই তাকে মুখে নিয়ে জঙ্গলে গা ঢাকা দেয়। সাক্ষাৎ যমের মুখে ধৃত লোকটি সাহায্যের জন্য করুণ আর্তনাদ করতে থাকে এবং কয়েক সেকেন্ড পরেই তার আর্তনাদ স্তব্ধ হয়ে যায়। বিহ্বল সঙ্গীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জনে তারা সংবিৎ ফিরে পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালায়। গ্রামে গিয়ে তারা খবর দিতে কয়েকজন সাহসী লোক ও বাঘের কবলে ধৃত লোকটির ক্রন্দনরতা স্ত্রী ঘটনাস্থলে লাঠি সড়কি নিয়ে চলে আসে। বেলা তখন গড়িয়ে এলেও সূর্যাস্তের যথেষ্ট দেরী ছিল।

অকুস্থলে তারা পৌঁছে সাহস হারিয়ে ফেলল এবং সদ্য অনুসন্ধানে বিপদ আছে মনে করে স্ত্রীলোকটিকে প্রবোধ বাক্যে বলল যে, কাল সকালে খুঁজে দেখা যাবে। সে কিন্তু অত সহজে হাল ছাড়বার পাত্রী নয়। মেয়েলোকটি ইতস্ততঃ জঙ্গলের আশেপাশে খুঁজতে লাগল। নিকটস্থ একটা ঝোপে এক টুকরো রক্তলাগা ছেঁড়া কাপড় তার চোখে পড়ল। কয়েক হাত দূরে যে লোকটি ছিল, মেয়েলোকটি তার দৃষ্টি সেই ছেঁড়া কাপড়ের দিকে আকর্ষণ করায় সে কি মনে করে একটা চেলা তুলে সেই ঝোপের দিকে সজোরে ছুঁড়ল। বাঘটা সেই ঝোপেই লুকিয়েছিল, ওদের কেউ তা অনুমান করেনি। বিকট হুঙ্কার দিয়ে বাঘ উত্তর দিল। রণে ভঙ্গ দিল সবাই, এমনকি সেই বীরাঙ্গনা স্বামীর সহগামী হতে সাহস পেল না। সহমরণের রীতি প্রচলিত থাকলে সে কি করত তা অবশ্য বলা কঠিন। পরদিন অধিকতর ভারী দল এসে মৃতের মুণ্ডু এবং একটা পায়ের হাঁটুর দিকটা ছাড়া আর কিছুই জোগাড় করতে পারেনি। অগত্যা ওই অবশিষ্ট দিয়েই মৃতের যথারীতি সৎকার হল।

পর পর দুটো মানুষ বাঘ দ্বারা নিহত হওয়ায় ওই অঞ্চলে বেশ একটা আতঙ্কের ছায়া নেমে এল। তবুও মানুষকে বেরুতে হয় ঘরের বাইরে চাষ করতে, হাটে যেতে, যেতে হয় ডাক্তারখানায় অসুখের ইলাজ (চিকিৎসা) করাতে, দাওয়াই আনতে। এমনিধারা জীবনের আরও কত কি কাজে।

আরও কয়েক সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। মানুষ তখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে চলাফেরা করছে পথে, ঘাটে, মাঠে। কাঠ কুড়োতে মেয়েরাও বনাঞ্চলে ক্রমশঃ পা-পা করে এগিয়ে এসেছে। ফলে মানুষ সাবধানতায় শিথিলতা আনল। মানুষখেকোকে প্রায় ভুলে গেল।

জঙ্গলে দেখা যায়, শুকনো কাঠ-পাতা কুড়োতে মেয়েরা দল বেঁধে হাতে কাস্তে বা কুড়ুল হাতে। সঙ্গে যাদের কোলের ছেলে বুলে আছে তারাও থাকে কাপড়ে বাঁধা পিঠের উপর। পাঁচ-সাত বছরের শিশুরাও যায় মাকে সাহায্য করতে।

সন্ধ্যার তখনও অনেক দেরী। পার্বত্য অঞ্চলে সূর্যের ম্লান আলো উঁচু গাছের পাতায় পাতায় সেদিনের মত শেষ স্পর্শ বুঝি দিয়ে যাচ্ছে। বনের পাখিরা তখন কেউ কেউ আপন নীড়ের দিকে ফিরছে। বাতাস সূর্যের তাপ হরণ করে নিয়েছে কার্তিকের হিমেল পরশে। দিন বিদায়ের সবকটি লক্ষণ পরিস্ফুট হতে

www.BanglaBook.org

কাঠকুড়ুনির দল গ্রামে ফেরার পথ ধরল। কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে কেউ আবার কচি শিশুকে পিঠঝোলায় বেঁধেছে। সবাই বনপথ দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল।

পথে একটা ঘন ঝোপঝাড়ে আবৃত নালা পার হতে হয়। সেটা প্রায় সবাই পার হয়েছে। শেষে আসছিল একটা আট-নয় বছরের মেয়ে। মাথায় সে নিয়েছে একটা বোঝা, তার মার অতিরিক্ত কাঠকুটোর ভার। মা নালা পার হয়ে উপরে উঠে গেছে। পিছনে ঝপ করে একটা শব্দ হল। মা ভাবল, হয়ত বোঝা নিয়ে পার হতে গিয়ে দৈবাৎ মেয়েটি পড়ে গেছে। তাই ধমকের সুরে মৃদু গালাগালি বর্ষণ করে এগিয়ে যেতে যেতে বলল শীগগির বোঝাটা তুলে নিয়ে আসতে। কাঠকুটোর বোঝা আর তোলা হয়নি, বরং তাকেই তুলে নিয়ে গেল করাল মৃত্যু।

এ খবরও এল ডাক্তারবাবুর কাছে। ডাক্তারবাবু এবারে খুব উদ্বিগ্ন হলেন। সরকারী মহলে খবর পাঠালে অবিলম্বে বিশেষ কিছু ফল হবে না তিনি জানতেন। তাই নিজে যথেষ্ট সাবধান হলেন। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষখেকোর মুখোমুখি হতে হবে, তা তিনি কোনদিন কল্পনাও করেননি।

চতুর্থ ঘটনা ঘটল প্রায় এরও মাসখানেক পরে। এবারে লোকটি মারা যায়নি বটে, তবে গুরুতরভাবে জখম হয়েছে। তাই ডাক্তারবাবুর কাছে আরজি এসেছে ইলাজের ভার নিতে। তাকে খাটুলীতে (খাটিয়ার স্ট্রেচার) আনা সম্ভব নয়, কারণ তার কাঁধের ডান দিকটা একেবারে ভেঙে গেছে এবং ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে।

চিকিৎসার সাজসরঞ্জামের সঙ্গে 'রসের' ২৮০ বোরের মাঝারি হালকা রাইফেলটা নিয়ে রওনা হলেন ছয় মাইল দূরবর্তী গ্রামের পথে। পথের অধিকাংশই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এবং সেটা মানুষখেকোর অধ্যুষিত অঞ্চল। গঞ্জগ্রামে গিয়ে লোকটির যথাযথ চিকিৎসা করলেন। যতক্ষণ তিনি আহতের সেবা করছিলেন, হতভাগা লোকটি মাঝে মাঝে চোখ খুলে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ডাক্তারবাবুকে দেখছিল। ভয়ে তার বাক্যরোধ হয়ে গিয়েছিল এবং অত্যধিক রক্তপাতের ফলে প্রায় অসাড় হয়ে পড়েছিল। ফলে উপস্থিত অন্য লোকদের মুখে ঘটনার বিবরণ শুনলেন। সবাই মিনতি করল বাঘটাকে মেরে তাদের বিপদমুক্ত করতে।

বেলা পড়ে আসছে দেখে ডাক্তারবাবু উঠলেন। মোটর সাইকেলে বসে ডঃ ব্যানার্জি রাইফেলটা একবার পরীক্ষা করে দেখলেন। ম্যাগাজিনে গুলি ভর্তি এবং চেম্বারেও একটা আছে। সেফটি ক্যাচ নামিয়ে রেখে দিলেন। সবার সশ্রদ্ধ প্রণামের মাঝে যখন তিনি রওনা হলেন, তখন অস্তগামী সূর্যের রক্তাভ আলোয় বনাঞ্চলে একটা অপূর্ব সৌন্দর্য ফুটে উঠেছিল। প্রকৃতির স্তব্ধতার মাঝে শুধু একটানা মোটর সাইকেলের ফট-ফট শব্দ একটা তরঙ্গ সৃষ্টি করছিল। ডাক্তার ফিরছেন উদ্বিগ্ন চিত্তে।

প্রায় অর্ধেক পথ আসার পর রাস্তাটা যেখানে তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে, তার কোলে একটা মস্তবড় পাথর পাহাড়ী জমির ওপরে আটকে আছে প্রায় পথের উপর। কিছুটা তফাতে এসে ডাক্তার ব্যানার্জি থামলেন। পথরটার দিকে ভালভাবে দেখলেন। তাঁর মেরুদণ্ডে হঠাৎ যেন একটি তড়িৎশিখা প্রবাহিত হয়ে গেল। তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে সচেতন করে দিল। বিপদ বুঝি পাথরের আড়ালে অপেক্ষা করছে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য। নিমেষে মন স্থির করে ফেললেন। ইঞ্জিনকে বন্ধ না করে সাইকেলটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে রাইফেলটা হাতে নিলেন। সেফটি ক্যাচটা তুলে দিলেন। প্রখর দৃষ্টিতে প্রায় সন্ধ্যার স্তিমিত আলোতে দেখলেন বাঘের পায়ের একজোড়া থাবাটুকু মাত্র। তাঁর অনুমান হল ওটা মানুষখেকো। কারণ, মানুষের চলার পথে এমন সময়ে সাধারণ বাঘ ওত পেতে বসে থাকবে না। এ সুযোগ তিনি নষ্ট করতে চাইলেন না।

খুব সন্তর্পণে রাস্তার বাঁদিকে নালায় নেমে পড়লেন। মাটিতে প্রায় শুয়ে বুকে ভর দিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে গেলেন ঝোপের আড়ালে আড়ালে। ওদিকে মোটর সাইকেলের একটানা ফট্ ফট্ আওয়াজ হয়ে চলায় বাঘের সন্দেহ হয়নি যে, আরোহী নেমে উল্টে তারই সঙ্গে মোকাবিলা করতে চুপিসাড়ে এগিয়ে আসছে।

ডাক্তারবাবু একটু এগিয়ে সাবধানে মুখ তুলে দেখলেন। না, আরও কয়েক গজ সামনে যেতে হবে। অবশেষে যখন আন্দাজ মত মাথা তুলে হাঁটু গেড়ে বসলেন, বাঘও সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে উঠেছে। মস্তিষ্ক বা হৃদপিণ্ডে মারার মত সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন ডাক্তারবাবু এবং যেই বাঘ একটু ঘুরে মোটর সাইকেলের দিকে ফিরেছে, অমনি সুযোগ বুঝে তার ডান কাঁধের একটু নিচে লক্ষ করে গুলি করলেন তিনি অচঞ্চল হাতে। নিশানার এতটুকু এদিক ওদিক হল না। বিকট হুংকার দিয়ে বাঘ শূন্যে লাফিয়ে পাথরের নিচে পড়ল। দ্বিতীয় গুলির জন্য ডাক্তারবাবু তৈরি ছিলেন। ঘর ঘর শব্দে গোঙানির সঙ্গে ঝলকে ঝলকে রক্ত বাঘের মুখ থেকে বেরতে লাগল। দ্বিতীয় গুলির আর প্রয়োজন হয়নি।

মৃত্যু-যাতনাকাতর গোঙানি শুনতে শুনতে ডাক্তার ব্যানার্জির মনে হল তিনি যেন বাঘের ভাষা বুঝলেন। সে যেন তার জীবনের কাহিনী ও তার অন্তিম অনুরোধ জানাচ্ছে—

'আমি মানুষখেকো, তাই সেই অপরাধে বুঝি আমায় মারলে? কিন্তু কেন মানুষখেকো হলাম তা কি কেউ তোমরা ভেবেছ? আমার এই মানুষখেকো অপবাদের জন্য তোমরাই দায়ী। তোমার হাতে মৃত্যু আমার সব অপমান, অপবাদ ও দৈহিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিল। তুমি শুধু প্রকৃত শিকারী নও, প্রকৃত দরদী।

'এক বছরও হয়নি! একদিন রাতে আমারই মেরে রাখা গরুর পাশে বসে সবে খেতে যাব, এমন সময় একটা অঘটন ঘটল। সে কথা আজও আমি ভুলিনি। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারকে ভেদ করে একটা তীর আমায় এসে পড়ল আমার দিকে। আর তার ঠিক পরেই একটা গরম কি বস্তু আমার উরুতে এসে ঢুকল। জঙ্গলের সমস্ত স্তব্ধতা খণ্ড বিখণ্ড করে একটা গুড়ুম শব্দ চারদিকে প্রতিধ্বনিত হল। প্রায় একই সঙ্গে দারুণ যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলুম। তখুনি বুঝলাম এ কার কাজ। মানুষের প্রতি রাগে এবং জিঘাংসায় আমার শরীরে রক্ত তপ্ত টগবগ করে ফুটছে। সে গাছে বসেছিল। তাই চুপিসারে সরে গিয়ে অদূরে প্রতিশোধ নেবার জন্য ঝোপের আড়ালে সারারাত ওর অপেক্ষায় বসে রইলুম। কিন্তু ও নামল না দেখে ভোর হবার আগে সরে পড়লুম। যন্ত্রণা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। আশ্রয় নিলুম এক খাদের জঙ্গলে। কদিন অনাহারে পড়ে রইলুম সেইখানে। শেষে খিদের তাড়নায় অতি কষ্টে উঠে খাবারের সন্ধানে বেরলুম। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে কষ্ট হতে লাগল। দৌড়তে গেলে উরুর ক্ষতস্থানে লাগে। এ অবস্থায় বড় হরিণ আর ধরতে পারি না। ওদের বাচ্চাদের ধরে খেতে লাগলুম।

www.BanglaBook.org

উপায় কি! ক্রমশঃ মানুষের গরু বাছুর ধরে খেতে লাগলুম। নাঃ, তাতেও স্বস্তি পেলুম না। মেরে নিয়ে জঙ্গলে বসে যে খাব, তার উপায় নেই। প্রায়ই সেখানে মানুষ তাড়া করে আসে আমায় মারতে। আমাকে ওরা পাগল করে তুলল। ভীষণ রাগ হল মানুষদের ওপর। ঠিক করলুম ওদের জব্দ করতে হবে।'

তার কণ্ঠ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছিল! তবুও যেন সে বলে চলল তার মর্মন্তুদ কাহিনী!

'ঘটনাচক্রে প্রথমে যে মানুষটাকে আক্রমণ করি, তাকে খাইনি, কিন্তু অভিজ্ঞতা অর্জন করলুম যে, মানুষকে ধরা খুব সোজা। পরে খিদের তাড়নায় অনন্যোপায় হয়ে মানুষ মেরে খেয়ে দেখলুম যে নরমাংস বেশ খাওয়া চলে, যদিও ওটা আমার স্বাভাবিক খাদ্য নয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে মানুষ মেরে খেয়েছি, সে কি অপরাধ?'

ডাক্তারবাবু উদ্যত রাইফেল এক মুহূর্তের জন্য নামিয়ে নেননি। মানুষখেকোকে বিশ্বাস কি! তার দেহের স্পন্দন কমে এসেছে, একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আরও অনেকটা রক্ত মুখ থেকে বেরিয়ে এল। বাঘ বলে চলেছে তবু—

'আমার অন্তিম অনুরোধ, তোমার স্বজাতীয়রা, বিশেষ করে যারা অনভিজ্ঞ শিকারী, যারা আমাদের হিংস্র বন্যলোলুপ প্রভৃতি আখ্যা দেয়, তারা যেন আমাদের বিষয় একটু জানতে চেষ্টা করে। বাঘ তার দৈহিক সৌন্দর্যে ও অসীম ক্ষমতার অধিকারবলে বনরাজ্যে প্রকৃতির নিয়মে রাজসম্মানে অধিষ্ঠিত। সে স্বভাবতঃ নির্মম নিষ্ঠুর নয়, বরং ভদ্র এবং গভীর চেতনা ও বোধ সম্পন্ন। মানুষকে আমরা এড়িয়ে চলতে চাই, কারণ মানুষ আমাদের স্বাভাবিক খাদ্য নয় এবং শত্রুও নয়। কিন্তু, আমার মত কষ্টকর অবস্থা বনে জঙ্গলে কত জানোয়ারের হচ্ছে নিয়ত। এর জন্য দায়ী মানুষ। শিকারে এসে নিজেদের অক্ষমতা ও অযোগ্যতার জন্য আমাদের আহত করে রেখে গেলে সেই কাপুরুষের দল ভাবে না, আহত জানোয়ারের কি পরিণাম হল। এটা কি উচিত?'

উত্তেজনায় বাঘের শরীরটা একটা মোচড় খেল গলা থেকে ঘর ঘর শব্দের সঙ্গে সে যেন বলল—

'মা-র-বে ত একেবারে মার, যেমন তুমি...তুমি আমার হৃদ্‌পিণ্ডটাকে...ছেঁদা...করে দিয়েছ।'

কোন শব্দ নেই, নেই কোন স্পন্দন সামনে পড়ে থাকা মানুষখেকোর দেহে, যে তার জবানবন্দী এতক্ষণ দিয়ে গেল দক্ষ শিকারী ডাক্তার ব্যানার্জির কাছে।

নিকটস্থ গ্রামের লোকজন ডেকে এনে সেই রাতেই তিনি বাঘের দেহ আনিয়েছিলেন। চামড়াটা ছাড়াবার সময় তার ক্ষতস্থানটা গভীর ভাবে কেটে গাদা বন্দুকের ছিটে গুলি বার করলেন। এই ক্ষতের জন্য দুর্বল হয়ে পড়ায় বাঘটা মানুষখেকো হয়েছিল।

অভিজ্ঞ ও প্রকৃত শিকারীর মত তাঁরও অভিমত হচ্ছে—শিকারের নামে নিছক আহত করে কোন জানোয়ারকে চলে যেতে দেওয়া শুধু অন্যায় নয়, বিবেচনাশূন্য, বে-আইনী ও নীতি-গর্হিত। সে যে-কোনো জানোয়ারই হোক, আহত করলে প্রত্যেক শিকারীর নৈতিক কর্তব্য হচ্ছে, সেই আহত জানোয়ারের পিছু নিয়ে অবশ্যই তাকে খুঁজে বার করে শেষ করা, বিশেষ করে বাঘ জাতীয় জানোয়ারের ক্ষেত্রে ত অবশ্যই, কারণ, তাইতে যে কেবল তাকে আঘাতপ্রাপ্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়াই হবে তা নয়, দুর্দান্ত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ নরঘাতক হতে না দেওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই মনোবলই প্রকৃত শিকারীর পরিচয়। নতুবা, সে ভীরু এবং শিকারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অযোগ্য।

১৩৭৭

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভেটো আর রাগীদাদাবাবু

আশাপূর্ণা দেবী

পিসে যখন তার হাত ধরে এ বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে বলে গেল, 'দেখ ভেটো, কী বাড়িতে রেখে যাচ্ছি তোকে! পরে বলবি হ্যাঁ, বলেছিল পিসে—'

তখন ভেটোর বুক উথলে ডুকরে কান্না এসে গিয়েছিল...ওরে বাবারে, এই পেরকান্ড রাজবাড়ির মতন বাড়িতে থাকতে হবে ভেটোকে? শুধুই কি পেরকান্ড? কী জেল্লা, কী বাহার! বাড়ির মেজেগুলো দেখলে চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। ঠিক যেন দিদিমণিদের পরনের ভাল ভাল কাপড়ের মতন চিত্তির-বিচিত্তির করা! একো জায়গায় একো রকম।...ঘরের চেয়ার বেঞ্চিগুলোরই বা কী শোভা, ঠিক সিংহাসনেরই মত। হায় হায়, এই ভয়ংকরী বাড়িতে পিসে তাকে রেখে গেল?

পিসে যেখানে কাজ করে, তারা নাকি এদের কুটুম, এরা সেখানে বেড়াতে গিয়ে পিসেকে বলেছিল একটা লোক দিতে। কাজ কিছু না, শুধু একটা ছোট্ট ছেলেকে আগলানো, খেলা দেওয়া। তার জন্যে বাচ্চা ছেলেরই দরকার।

শুনেই পিসে চটপট বাটিরায় গিয়ে ভেটোর মার কাছে হাতমুখ নেড়ে কী সব বলে, পরদিনই ভেটোকে নিয়ে চলে এল!

তখন ভেটোর 'বাসে চড়ে কলকাতায় যাচ্ছি' ভেবে বেশ মজাই লাগছিল, এখন পিসে চোখছাড়া হতেই ভেটোর চোখে বান ডাকল।

ডুকরে ডুকরে কান্নাই পাচ্ছিল ভেটোর, কে যেন কোথা থেকে বলল, 'আহা ছেলেমানুষ, মা ছেড়ে এসেছে, ওকে ওর জায়গাটা দেখিয়ে দে, একটু বিশ্রাম করুক। আর ঠাকুর, তুমি ওকে—।'

তুমি ওকে কি—তা শুনতে পেল না ভেটো। মানুষটাকেও দেখতে পেল না, তবে গলার স্বরটা শুনে প্রাণ জুড়লো, কী মিষ্টি! ঠিক যেন মা দুগ্‌গার মতন।...কান্নাটা থেমে গেল।

একজন ঝি মত কে ভেটোকে নীচের তলায় রান্নাঘরের পাশে সরু একটা ঘরে এনে বলল, 'এই এখেনে থাকবি তুই। ওই চৌকীটায় বামুন ঠাকুর শোয়, তুই এদিকে মাদুর বিছিয়ে শুবি।'

নিজের থাকবার ঘরটা দেখে তবু শান্তি হল। মন জুড়িয়েই গেল ভেটোর। এ ঘরটা ভাল, মেজেটা অমন ছক্‌নক্‌ কাটা নয়, বেশ বিলিতি মাটির। জানলা দরজাগুলোও কেমন ছোট ছোট, দেয়ালের কাছে চারটি ভাঙা পুরনো বাক্স-প্যাঁটরা জড় করা আছে, দেখে খাশা ঘর বলে মনে হচ্ছে।...দেয়ালে দড়ি টাঙানো, তাতে একটা গামছা আর গেঞ্জি ঝুলছে, বোধহয় সেই বামুন ঠাকুরের। যাক, তবু ভাল যে একা থাকতে হবে না ভেটোকে। কেমন দেখতে সেই ঠাকুর কে জানে!

একটু পরেই এল 'সে'।

একটা কাঁচের গ্লাশে এক গ্লাশ চা, আর কাগজে মোড়া দু'চাকলা পাঁউরুটি নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, 'কী রে খোকা, চা খাস?'

খাস! জিগ্যেস! শুনে ভেটো হাসবে না কাঁদবে? কে চা দিচ্ছে ভেটোকে? তাই খাওয়া না খাওয়ার প্রশ্ন! দেশে থাকতে একবার 'বাস গ্যারেজের' কাছে চায়ের দোকানে কাজ করেছিল ভেটো কিছুদিন, তখন চা খেয়েছিল! আহা যেন সগ্‌গের সেই অমৃত না কি তাই।...তা চাকরীটা ভেটোর টিকল না, একদিন এক ট্রে চায়ের বাসন হাত থেকে ফেলে ভেঙে ফেলার অপরাধে চাকরীটা গেল।

এখনও যেন কান পাতলেই ভেটো সেই বাসন পড়ার ঝনঝন শব্দ, আর তার সঙ্গে একটা বাজ পড়ার গনগন শব্দ পায়। ওই বাজটা চায়ের দোকানের মালিকের গলার আওয়াজ। যে আওয়াজের ধাক্কায় ছিটকে চলে এসেছিল ভেটো। আহা ভেটো যদি বাসন না ভাঙত, তাহলে মায়ের কাছে থেকেই রোজগার-পাতি করতে পেত!

ঠাকুর বলল, 'আরে, ছোঁড়া যে কথাই বলে না! নে খা। আজ আর তোকে কিছু করতে হবে না, মা বলে দিয়েছে। কাল সকাল থেকে লেগে যেতে হবে।'

বলে, কেন কে জানে ঠাকুর একটু হাসল।

ভেটো এখন কথা বলল।

বলল, 'মা খুব ভাল, না?'

ভেটোর মনে হচ্ছে সেই মা দুগ্‌গার মতন গলার স্বরটা মারই।

ঠাকুর বলল, 'হুঁ! মা খুব ভাল। কিন্তু মায়ের যে একটি ছাঁ আছে না? দেখবি তোকে, কী চিজ!'

ভেটো তাড়াতাড়ি বলল, 'খুব কাঁদে বুঝি? তা আমি ভোলাতে পারব। আমি বেড়াল ডাক, কুকুর ডাক, মোরগ ডাক, গাধার ডাক, সব জানি। আমার দিদির ছেলেকে না—।'

ঠাকুর তার কথার মাঝখানেই হেসে সারা। ঠাকুরের দাঁত-গুলো কী বিশ্রী, লাল, খুব বোধ হয় পান খায়।

ঠাকুর সেই লাল লাল দাঁত বের করে বলল, 'আরে বাবা, গাধার ডাক ডেকে ত ভোলাবি তুই ছোটমার ছেলেকে। সেও বিচ্ছু ছেলে। তবে আমি বলছি বড়মার ছেলের কথা! তোর মতনই বয়েস হবে, দেখিস সে কী মাল! এখনো ইস্কুল থেকে ফেরেনি, তাই বাড়ি ঠাণ্ডা!'

ভেটো ভয়ে ভয়ে বলে, 'মারে বুঝি?'

ঠাকুর তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, 'মারে না। তবে তার কথাতেই লাঠিসোঁটা! তা, তোকে—সত্যি মারও মারতে পারে। সমবয়সী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

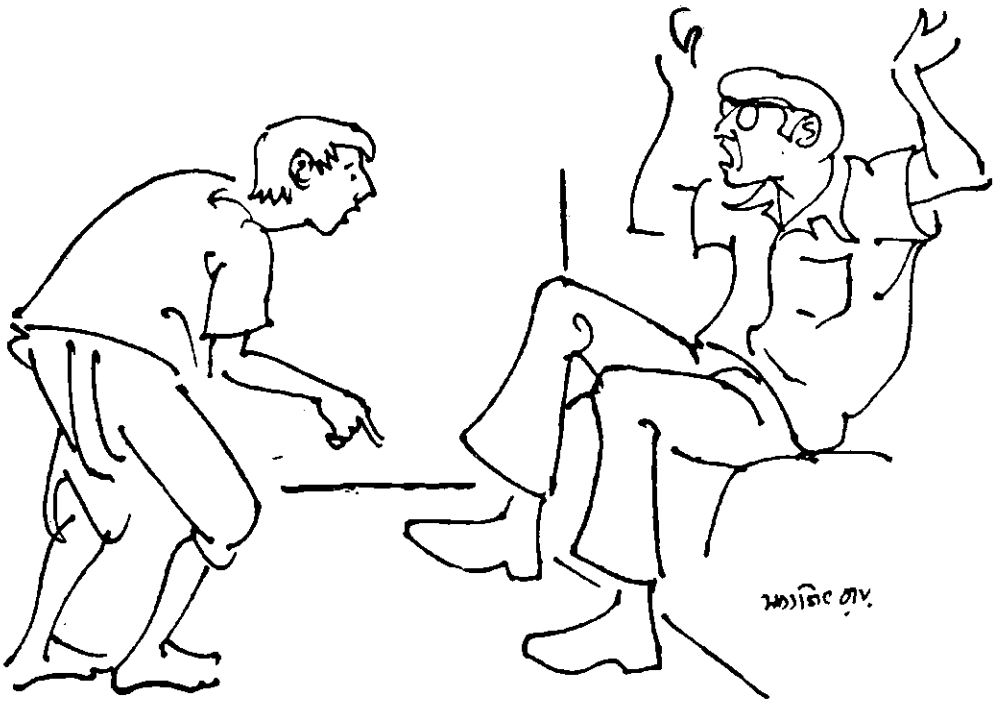

পাবে ত! হাতের সুখ করে নেবে।'

ভেটোর চা ঠান্ডা হয়ে গেল, তার সঙ্গে ভেটোর হাত-পাও। সেই চা-ওলার ভাইপোটার মতন মারে যদি!

তবু সেই দাদাবাবুটাকে দেখবার জন্যেও প্রাণ ছটফট করতে লাগল ভেটোর। হলেও বা রাগী, ভেটোর সমবয়সী ত! ভেটো যদি তার সব আগ্যে পালন করে? পা টিপে দেয়, মাথা বুলিয়ে দেয়? তাহলে আর মারতে আসবে কেন?

বুকে বল করে ভেটো জিগ্যেস করল, 'কখন আসবে সে দাদাবাবু?'

'এই ত এল বলে। যতক্ষণ না আসে ততক্ষণই শান্তি।' বলে ঠাকুর চৌকীতে বসে বিড়ি ধরাল।

এই গন্ধটা যে কী বিচ্ছিরি!

কেনই বা মানুষ এই বিচ্ছিরি জিনিসটা খায়!...গন্ধ আর ধোঁয়ায় মাথা কেমন করে ওঠে। ভেটো গুটি গুটি এই সরু ঘরটা থেকে বেরিয়ে দালানে গিয়ে দাঁড়াল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পায় দাদাবাবুটি ঢুকছে বইয়ের ব্যাগ হাতে।

বাঃ কী চেহারা! হ্যাঁ এই বাড়ির যুগ্যি বটে! রাজবাড়ির ছেলে রাজপুত্তুর! ভেটো হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু ওকি, দাদাবাবু নিজে নিজে জুতো খুলছে! আর ভেটো সঙের কার্তিকের মতন সামনে দাঁড়িয়ে!

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ভেটো জুতো খুলে দিতে যায়।

হায়, কেন মরতেই যে যায়!

ঠিক ইম্পিরিঙের পুতুলের মত ছিটকে উঠে দাদাবাবুটি রামচেঁচানি চেঁচিয়ে বলে, 'এ কী! তুই আবার কে? জুতো খুলতে এসেছিস মানে? নাড়ুগোপাল পেয়েছিস আমায়?... মা! মা!'

মা দুগ্‌গার গলা আর মা দুগ্‌গার চেহারা নিয়ে মা এসে দাঁড়ান, 'এসেই লাফালাফি? কী হল?'

'এটা কে? এটা কোথা থেকে এল?'

মা বললেন, 'এল কোথাও থেকে। তা চেঁচাচ্ছিস কেন?'

'ও আমার জুতো খুলে দিতে আসে কেন? কী ভেবেছে আমায়? ক্ষীরের পুতুল? তুলোর খোকা?'

মা হেসে ফেলে বলেন, 'অন্য কিছুই ভাবেনি বাপু, ভেবেছে এসব বোধ হয় ওর ডিউটি! অনেক বাড়িতে ত জুতোমুতো খোলায়। ওরে খোকা কী যেন নাম তোর? তুই বাবা এই দাদাবাবুর কিছু করতে আসিসনি।'

'আসবে না-ই ত!'

জুতোমোজা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ায় দাদাবাবু। আর এরপরই হঠাৎ হি হি করে হেসে ওঠে। হেসে ঘুরেফিরে ভেটোকে যাকে বলে নিরীক্ষণ করে বলে, 'বাঃ! বাঃ! কী ফাইন চেহারা রে তোর? একজিবিশানে দেবার মতন। মা, এই কাঠির ওপর আলুর দমটাকে কোথায় জোগাড় করলে? হাত-পাগুলো ত অট্ মট্ ভেঙে ফেলা যায়।' ভাঙার ভঙ্গী করে সে হাতে!

মা নরম গলায় বললেন, 'আহা কাটুম রে, দেশে ঘরে ওদের অভাবের সংসার ভাল করে কি খেতেটেতে পায়? এখানে দু'দিন থাকলেই দেখিস—'

'ও সব আমি জানি না,' দাদাবাবু জামা খুলতে খুলতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়, যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলে যায়, 'ও যেন আমার সামনে না আসে! ওকে দেখে আমার বিচ্ছিরি লাগছে—'

মা দুগ্‌গাও চলে যান, যাবার সময় আস্তে বলেন, 'কিছু মনে করিসনে বাবা, দাদাবাবু অমনি পাগলা! বেশী আসিসনে ওর দিকে, ছোটমার খোকাকে নিয়ে তিনতলাতেই থাকিস!'

ভেটো অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে!

কী মায়ের কী ছেলে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বামুন ঠাকুর ঠিকই বলেছে!...নামটা কী অদ্ভুত। কাটুম! কাটুম আবার কী নাম! এমন ভাল বাড়িতে ত ভাল ভালই নাম হয়! কাট্ কাট্ কথা বলে বলেই কি কাটুম?...কিন্তু যখন নাম হয়, তখন কি কেউ কথা বলতে শেখে?

নিজের নামটার জন্যে ভেটোর বড় দুঃখু ছিল, এখন যেন কমে গেল একটু! কাটুম! পেরায় ভেটোরই মতন।

কিন্তু নামের দুঃখু ঘুচলে কী হবে, কপালের দুঃখু যাবে কোথায়? মা ত বলেছে তিন তলাতেই থাকিস, দাদাবাবুর সামনে বেরোসনে। কিন্তু দাদাবাবু নিজে তিনতলায় উঠে এলে?

ছোটমার ছেলেটাকে কোনমতে বাগিয়ে ধরে ভেটো তাকে কোলে নিয়ে তিনতলার বারান্দায় বেড়াচ্ছে, দুমদাম করে উঠে আসে দাদাবাবু। আর পড়বি ত পড় তারই সামনে। তাড়াতাড়ি পালাতে যাচ্ছিল, হল না।

কাটুম তার কাটা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কাকিমা! কাকিমা!'

বেরিয়ে এলেন ছোটমা, বললেন, 'কী ব্যাপার?'

কাটুম চেঁচিয়ে বলে, 'বুবুনের মাথা ফেটে গেলে তোমার বুঝি খুব আহ্লাদ হবে?'

ছোটমা ভুরু তুলে বলেন, 'তার মানে?'

কাটুম দুমদাম পা ফেলে হেঁটে বলে, 'মানে দেখতে পাচ্ছ না? ওই দেশলাইকাঠির মত হাতওলা ছেলেটা, তোমার তাকিয়ার মত খোকাকে কোলে নিয়ে বেড়াতে পারে? ঠিক ফেলে দেবে।'

ছোটমা বেজার মুখে বললেন, 'ফেলেই বা দেবে কেন? ওই জন্যেই ত ওকে রাখা হয়েছে।'

কাটুম চড়া গলায় বলে, 'রাখা হয়েছে বলেই কি ওর হাত-পা ভীমের গদার মত হয়ে গেছে?...এই ভেটো না ফেটো, তুই খবরদার বুবুনকে কোলে নিবি না! কোল থেকে ফেলে মাথা ফাটালে পুলিশে যেতে হবে তা জানিস? মোটেই নিবি না, কেউ বললেও শুনবি না।...দে আমার কাছে দে।'

বলে বুবুনকে নিয়ে নেয় দাদাবাবু। আর হাসতে থাকে, 'বুবুনবাবু! বুবুনবাবু হি হি।'

বেচারী ভেটো হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। ওইটুকুন ত ছেলে, ভেটোর মতনই বয়েস, তার কী সাহস! সকলের মুখের ওপর কথা বলে!

আশ্চর্য হয় ভেটো, ভয় করে দাদাবাবুকে, তবু ওই রাজপুত্তুরের মত দাদাবাবুর প্রতি কী দারুণ আকর্ষণ ভেটোর! ভেটো জানলার ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে!

তা একদিন পড়ে গেল ধরা!

পড়ছিল কাটুম, জানলার বাইরে থেকে দেখছে ভেটো, হঠাৎ নজরে পড়ে গেল। ব্যস উঠে এল। কড়া গলায় বলল, 'কী দেখছিস রে?'

ভেটো চুপ!

'বল কী দেখছিলি? বল!'

ভেটো ভয়ে ভয়ে বলে, 'আপনাকে।'

'আমাকে? আমাকে দেখছিলি?' কাটুম চোখ গোল করে বলে, 'তার মানে?'

ভেটো বোঝে সত্যি কথা না বললে বিপদ আরো বেশী! তাই মাথা নীচু করে বলেই ফেলে, 'দেখছিলাম আপনি কী সুন্দর! ঠিক যাত্রাদলের সোনার গৌরাঙ্গের মতন।'

'বটে? আমায় ঠাট্টা?' কাটুম ধমকে বলে, 'মারব এক থাপ্পড়! যা পালা। চলে যা এখান থেকে!'

ভেটো অবাক হয়ে তাকাতে তাকাতে আস্তে সরে যায়। দাদাবাবুর হাসিটা কত মিষ্টি, অথচ—আমার আর চাকরীটা থাকল না।

ভেটোর কান্না পায়। ভেটোর মনে হয়, চাকরী খুইয়ে আবার মার কাছে ফিরে গেলে মা আবার সেই সব ভাত কটা ভেটোকে দিয়ে নিজে শুধু জল খেয়ে থাকবে।...

খুব লুকিয়ে লুকিয়ে থাকে ভেটো, দাদাবাবু যাতে না দেখতে পায়।

কিন্তু দাদাবাবুর যে সর্বত্র গতি। রান্নাঘরের কোনে বসে ভেটো তার সকালের জলখাবার গুড়-রুটি খাচ্ছে, দাদাবাবু ঝড়ের মত এসে হাজির। ভিজে গা—তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে হাঁক পাড়ে, 'ঠাকুর ভাত দাও।'

বেচারী ভেটো দেয়ালের সঙ্গে প্রায় সেঁটে বসেছিল, তবু দাদাবাবুর চোখে পড়ে গেল, ব্যস! চেঁচিয়ে না উঠে ছাড়বে দাদাবাবু?

বলে ওঠে, 'এই, তোর জ্বর হয়েছে?'

ভেটো অবাক হয়ে বলে, 'না ত!'

'তা হলে ভাত না খেয়ে রুটি খাচ্ছিস যে?'

ঠাকুর তাকিয়ে দেখে তাড়াতাড়ি বলে, 'ও তো জলখাবার।'

'জলখাবার খাচ্ছিস তুই? এখন?' দাদাবাবু কড়া গলায় বলে, 'কেন? এতক্ষণ কী করছিলি? আমরা যখন খাই, খেতে পারিস না? দুমদাম করে বেরিয়ে যায়, চেঁচিয়ে ডাকে, 'মা!'

মার গলা শোনা যায়, 'কী হল?'

ভেটো কাঁটা হয়ে দেয়ালে মিশে থেকেও শুনতে পায় দাদাবাবু চড়া গলায় বলছে, 'ভেটো কেন এখন বিচ্ছিরি করে চোয়াল ফুলিয়ে ফুলিয়ে গুড়-রুটি জলখাবার খাচ্ছে? দেখে তোমাদের রাগ হয় না! এমন বিশ্রী দেখাচ্ছে মুখটা! সকাল বেলা চা টোস্ট খেতে পারে না?'

মা গম্ভীর ভাবে বলেন, 'চা ত খায় সকালে।'

'তাহলে? তখন জলখাবার খেতে সময় হয় না বাবুর? এই ভেটো! ভেটো!'

ভেটোর সাধ্য কী এ ডাকে সাড়া না দিয়ে ঘরে বসে থাকে? পা কাঁপলেও চলে আসতে হয়।

কাটুম খাবারের টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বলে, 'কাল থেকে খবরদার আর ওরকম বিচ্ছিরি মুখ করে গুড়-রুটি খাবি না। চায়ের সঙ্গে টোস্ট খাবি। মনে থাকবে?'

ভেটো সাহসে ভর করে বলে ফেলে, 'আমার দাঁতে পোকা ত, খেতে গিয়ে বেদনা লাগে, তাই মুখ বিচ্ছিরি দেখায়।'

'পোকা ত ওষুধ দিতে পারিস না, বুনো গাঁইয়া ভূত। মার কাছে ওষুধ চেয়ে নিবি।'

বলে কাটুম মায়ের দিকে তাকায়, 'মা, তুমি যে বলেছিলে দুদিন এখানে থাকলে ওই কাঠির ওপর আলুর দমটায় হাত-পা মোটা হবে—'

মা হেসে ফেলে বলেন, 'দু' দিন মানে কি সত্যি দু'দিন? হবে আস্তে আস্তে।'

কাটুম জলের গ্লাস মুখে তুলতে তুলতে বলে, 'তা আমাকে গাদা গাদা দুধ না দিয়ে ওকে দিতে পার না? দুধ ছানা ফল যত সব রাবিস জিনিস আমায় ঘাড়ে চাপানো! দিয়ে দিও ওকে।'

মা হেসে বলেন, 'আচ্ছা তাই দেব।'

কাটুম খাওয়া থামিয়ে চোখ তুলে বলে, 'হেসে হেসে বলছ

www.BanglaBook.org

কেন ?'

মা বলে ওঠেন, 'তবে কি কেঁদে কেঁদে বলব ? কী জ্বালা গো। ভেটো তুই পালা ত এখান থেকে। দেখছিস ত তোকে দেখলেই দাদাবাবু খাপ্পা হয়।'

ভেটো সরে গিয়ে চোখ মোছে।

এই দাদাবাবুর হাতেই তার চাকরীটা যাবে। কোথায় সে লুকিয়ে থাকবে ?

বড় দুঃখে দিন যাচ্ছে ভেটোর। কত লুকোবে ?

কেন যে এত নিষ্ঠুর দাদাবাবু ! ভগবান ভেটোকে বিচ্ছিরি চেহারা দিয়ে পাঠিয়েছে, সে কি ভেটোর দোষ ? হে ভগবান, তোমার দোষেই ভেটোর চাকরীটা যাবে। চাকরী তো ছেলে নেওয়া, তাও ত নেবার হুকুম নেই।

তবু ভেটো আবার একদিন সাহসে ভর করে তিন তলায় গিয়ে বুবুনকে চায়। কিন্তু ছোটমা ভারী মুখে বলেন, 'থাক ! তোমাকে আর আমার তাকিয়ার মতন ছেলেকে নিতে হবে না, তোমার ননীর শরীর গলে যাবে। যাও তুমি দুধ খাওগে।'

এমনি দুঃখের কপাল ভেটোর যে সেদিন থেকে রোজ সকালে এক কাপ করে দুধ খেতেই হবে ভেটোকে। মা বামুন ঠাকুরকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন, 'ঠাকুর, সকালে যখন দুধ জ্বাল দাও ভেটোকে এককাপ দুধ দিও, নইলে দাদাবাবু আস্ত রাখবে না।'

দেয় ঠাকুর, কিন্তু রোজই দেবার সময় রেগে রেগে বলে, 'এসো গো বাড়ির কুটুম, দুধ খেয়ে যাও। মামার বাড়ি বেড়াতে এসেছ, দুধ খাও পাঁউরুটি খাও, মাছের ঝোল ভাত খাও, আর গায়ে বাতাস লাগিয়ে বেড়াও। আমিও এ বাড়িতে এ্যাতটুকুন বেলায় এসেছিলাম, কেউ বলতে আসেনি দুধ খা।'

ভেটোর মনে হয় এই দুধ খাওয়ানোটাও দাদাবাবুর একটা নিষ্ঠুরতা, শাস্তি দেওয়া।

ছোটমার কথায় চোখে জল আসে ভেটোর ; আস্তে আস্তে সে নীচে নেমে যায়। চাকরী যখন যাবেই, দাদাবাবু যখন তাকে টিকতে দেবেই না তখন ভেটো নিজেই চলে যাবে।

সিঁড়ি থেকে দালানে, দালান থেকে নীচেকার বসবার ঘরে, এইখানের দরজা দিয়ে টুক করে বেরিয়ে যাবে ভেটো, কেউ দেখতে পাবে না।

আস্তে আস্তে কার্পেট বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এগিয়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলছে ভেটো অনেক কষ্টে বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে, হঠাৎ পিছন থেকে দাদাবাবুর গলা, 'এ দরজা খুলছিস যে ভেটো ?'

ভেটোর মাথা ঘুরে গেল, ভেটো চোখে অন্ধকার দেখল, ভেটোর পা কেঁপে উঠল—আর নিজেকে সামলাতে গিয়ে ঘরের কোনে বসানো লম্বা উঁচু টুলের মত টেবিলটা চেপে ধরল ভেটো।...কিন্তু টুলের মত টেবিলটা কী শুধু শুধুই বসানো ছিল ? তার উপর একটা অতি চমৎকার চীনেমাটির ফুলদানী বসানো ছিল না ?

ভেটোর হাত-পা যতই কাঠির মত হোক, মাথাটা ত ফুট-বলের মত ? সেই মাথার ভারে টাল সামলাতে পারল না ভেটো। ফুলদানী সমেত টেবিলটা পড়ে গেল।

ভগবান ! ভেটো কেন পড়ে গেল না। ভেটোর এই হাড়-কুচ্ছিৎ মাথাটা ওই ফুলদানীটার মতন টুকরো টুকরো হয়ে গেল না কেন ? কিন্তু ভগবান কবে ভেটোর প্রতি সদয় ? ভেটো ঠায় খাড়া রইল।

তাহলে কি বাজ পড়বে না ?

বাজ পড়ল। দাদাবাবুর গলা ফাটানো গলা শোনা গেল, 'কাঁচের জিনিসপত্র কে এমন পায়ের কাছে রাখে ? দরজার কাছে ফুলদানী, লোকে যেন দরজা খুলবে না !...'

কোথায় যেন ছোটকাকার গলা শোনা গেল, 'কোথায় কী ভাঙল মনে হল ! কে কোথায় কী ভাঙল ?'

সঙ্গে সঙ্গে চটির শব্দ।

কাটুমের গলা আবার সপ্তমে ওঠে, 'কী আবার ভাঙল, তোমার সাধের জাপানী ফুলদানী ! যেমন রাখা ! দরজা খুলতে গেলাম, ব্যস !'

বলেই অদ্ভুত একটা কাজ করে দাদাবাবু, দরজাটা খটাস করে খুলে ভেটোকে ঠেলে দরজার বাইরে বার করে দিয়ে চাপা গলায় বলে ওঠে, 'পাশের দিক দিয়ে সোজা বেরিয়ে যা। একঘণ্টা পরে ফিরবি। খবরদার বলবি না কে ভেঙেছে। যা শীগগির যা।'

হতভম্ব ভেটো হাঁ করে তাকায়।

বোধহয় ভাবতে চেষ্টা করে, ভগবান আর কেমনতর দেখতে !

কিন্তু ভগবান তখন খিঁচোনো মুখে বলছেন, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে ? ছোটকাকার চটির শব্দ শুনতে পাচ্ছিস না বুঝি ? তোর ওই হেডুচন্দ্রের মত মাথাটাকে নিয়ে ডাংগুলি খেলাতে চাস ? পালা বলছি। কাউকে যদি বলবি কে ভেঙেছে হাড় ভেঙে দেব।'

ভেটোকে ঠেলে বার করে দিয়ে মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে দেয় কাটুম দাদাবাবু।

ভেটো একটুখানি দূরে গিয়ে একটা বাড়ির রোয়াকে বসে পড়ে। বেশীদূর যাবার ক্ষমতা হয় না, বুকটা ধড়ফড় করছে।

একটুক্ষণ বসে থেকে ভেটো যেন সব ঘটনাটা ভেবে নেয়। তারপরই ভেটো আগে একটা হাতে নাকটা মুলে নিয়ে পরে দু'হাত তুলে দুই কান মলে। আর তারপর চোখ দুটো মুলতে পারা যায় না বলেই বোধহয় শার্টের কোন তুলে ঘষে ঘষে মুছতে থাকে।

এই দাদাবাবুর বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছিল ভেটো ? ভূত না বাদর সে ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চামচিকিৎসা

আদিনাথ নাগ

অম্লশূলে তিনটি দিবস
খান্‌নি কিছু সিংহিনী,
সিংহাসনে সিংহরাজা
বসছে না তাই তিন দিনই।
বদ্যি-কবিরাজ তো কত
এলেন গেলেন তিন দিনে,
রুগ্ন রাণী হলেন আরও
পাত্‌লা রোগা ফিনফিনে।
রাগ করে তাই বনের রাজা
নোটিশ ছাড়ে আট পাতা,—
বদ্যি-কবিরাজ বেটাদের
ঘ্যাচ্‌ করে সব কাট মাথা।
দিক্‌বিদিকে ছুটল সিপাই
ক্রুদ্ধ রাজার ফরমাশে,
শঙ্কাতে সব বন্য-প্রাণীর
কম্প দিয়ে জ্বর আসে।

*

সাজপোষাকে তক্‌মা এঁটে
আওয়াজ করে টাক্‌রাতে
বাস্ত অতি ব্যাঘ্র-কোটাল
আয়ুর্বেদী পাকড়াতে।
বরুণা-ধারে নাকবরাবর
ছোট্ট কুটির একখানা,
জনলাতে তার ব্যাঘ্র মশাই
ঢুকিয়ে দিলেন নাকখানা।
হাঁকলো—'আছিস্‌ কোন বেটা তুই?
দরজাটা খোল্‌, নামটা বল্‌।'
যুক্তকরে বাইরে এল
চুট্‌কি-দাড়ি রামছাগল।
ছাগল দেখে বাঘ-মশাই-এর
জিভটা থেকে জল করে,—
মুণ্ডু বেটার কাটতে হবেই
একটা কিছু ছল করে;
নাইবা হলো বদ্যি, তবু
মিথ্যা দোষের মামলাতে
দণ্ড দিতে পারবে আমার
দক্ষ দুটো আমলাতে।—
এই না ভেবে কোটাল মশাই
লক্‌লকে জিভ বার করে
বললো—'পাঁঠা! তোর মাথাটা
থাকবে না আর তোর ধড়ে।
সস্তা পাঁচন সওদা করে
রাজরাণীকে বঞ্চনা!
বুঝবি এবার ডাক্তারীটা
নাটক করার মঞ্চ না।'
তত্ত্ব শুনে ছাগ বেচারী
কাঁপতে থাকে ভয় পেয়ে
সাহস করে বলতে নারে—
'খুঁজছো যারে নয় সে এ।'
একটা ছোট জন্তু ছিল
থাকত মাচার এককোণে।
ঘাপ্‌টি মেরে চুপটি করে
শুনছিল সে একমনে।
রামছাগলের কাণ্ডে এবার
ফেললো হেসে ফিক্‌ করে।
'হাসলো কে রে?'—বললো কোটাল—
'খোঁজ নেবে সিপাই ঠিক করে;
পাকড়ে ধরে খরচা-খাতায়
রাখবি বেটার নাম লিখে।'
ঠিক তখনই পাখ্‌না মেলে
নামলো নীচে চাম্‌চিকে।
চম্‌কে উঠে ব্যাঘ্রমশাই
জলদি দু'-পা 'ব্যাক' করে;
রকম দেখে চাম্‌চিকেটা
হাসলো আবার ফ্যাক করে।
বাঘবাবাজীর খটকা মনে,
ভাবছে—এ কোন জন্তু রে!
চামচিকেটা বললো—'আমি
রামছাগলের বন্ধু রে।'
সাহস পেয়ে বাঘ সাথীদের
হুকুম দিল সংকেতে—
বন্দী যেন হয় এ বেটা
রামছাগলের সঙ্গেতে।
হাঁকলো কোটাল—'বন্দী নিয়ে
আসবি সোজা এজলাসে।'
চললো ফুর্‌ রাজবাড়িতে
আগ্‌ বাড়িয়ে একলা সে।
এমন আজব জন্তু দেখে
তুষ্ট হয়ে সিংহরাজ
সম্মানীটা দেবেন জবর,
ভাগ্য খোলার দিন তো আজ।
এই না ভেবে বাঘ-বাহাদুর
হর্ষিত-মুখ, সেইক্ষণে
রাজ-আদেশের মূল কথাটা
ফুর্তিতে আর নেই মনে।

*

সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টি হলো
সিংহ রাণীর যন্ত্রণা,
রাজবাড়িতে সর্বজনে
করলো শুরু মন্ত্রণা।
সরেজমিনে হাজির রাজা
রাণীর পরিচর্যাতে,
এমনি সময় ব্যাঘ্র এসে

www.BanglaBook.org

বন্দনা গায় দরজাতে।
বললো কোটাল—'আজগবী এক
সৃষ্টিছাড়া বজ্জাতে
পাকড়েছি আজ, সিপাইগুলো
আনছে বেঁধে পশ্চাতে।'
ক্লান্ত রাজা ছিলেন বসে
রুগ্ন রাণীর কক্ষেতে,
প্রশ্ন ফুটে উঠলো তাহার
কৌতূহলী চক্ষেতে।
ব্যাঘ্র বলে—"শুনুন প্রভু,
বলবো যাহা সত্য এ,
হয়তো শুনে লাগবে আঘাত
চিরাচরিত প্রত্যয়ে।
ভৃত্য তব মূর্খ অতি,
মাপ যেন হয় গোস্তাকি
দর্শেছি যা' চর্ম চোখে
বর্ণনে তার দোষটা কী?
জন্ম থেকে কতই আমি
দেশ-বিদেশে ঢুঁড়ছি তো,
বনবাদাড়ে একনাগাড়ে
চরকি ঘোরা ঘুরছি তো;
তিন কালই তো পার হল মোর,
ঠেকলো শেষে এককালে,
জ্ঞানের তবু বহুৎ বাকী,—
সমঝেছি আজ সক্কালে।
পাখ-পাখালীর পাখনা থাকে
পালক-ঢাকা—তাই জানি,
লম্বা মতন চঞ্চু থাকে
পক্ষী বলে তাই মানি।
আজগবী যে প্রাণীর কথা
বলতে হাজির এইখানে
বিহঙ্গ নয়, নয় জানোয়ার,
মুস্কিলটা সেইখানে।
চঞ্চুবিহীন জন্তু ওটা,
উড়তে পারে পাখনাতে,
সম্মুখে দুই চরণ আছে
চামড়া-ডানার ঢাকনাতে
নেকড়েসম দন্ত আছে,
নেইকো পালক পক্ষতে,
পক্ষীসম পুচ্ছ কিছু
পড়লো না মোর লক্ষ্যতে।
কেমন করে ঢুকলো ওটা
শাহেনশাহের জঙ্গলে!
মিশ্রে শেষে প্রভুর প্রজা
পাখপাখালীর দঙ্গলে।
একটা কথা বলতে পারি
ভরসা করে আন্দাজে—
অলক্ষুণে জন্তু ওটা,
দুর্ঘটনের পান্ডা সে।'
হঠাৎ রেগে বললো রাজা—
'মেজাজ আমার নেই ভাল,
ফালতু কথা ত্যাগ করে বাঘ
কাজের কথাটাই বল।'
কোটাল পুনঃ করলো শুরু
রাজায় করে বন্দনা,—
'বুদ্ধি আমার কম আছে ঠিক,
চক্ষে আমি অন্ধ না।
সন্দেহ মোর রাক্ষুসে ওই
জীবটা খাঁটি হাড়-পাজি,
রাজমহিষীর শক্ত অসুখ
ওই বেটারই কারসাজি।'
বার্তা শুনে আর্ত মনে
আঁতকে উঠে রাজরাণী
ভাবলো—বিরাট কোন প্রাণী আজ
হচ্ছে হাজির না জানি!
সিংহ রাজার রাজ্য মাঝে
হঠাৎ হলো মূর্তিমান
সর্বনাশা কোন জানোয়ার?
হয়ত বিশাল শক্তিমান।
ঠক্‌ঠকাঠক্ কাঁপছে রাণী,
সশঙ্কিত অন্যরা,
এমনি সময় ঢুকলো সেথায়
বাঘমশাই-এর সৈন্যরা,
করলো হাজির সেলাম ঠুকে
দুই আসামী সামনেতে;
ব্যাঘ্র তাকায় রাজার পানে
আকাঙ্ক্ষিত মান পেতে।
লজ্জা ছেড়ে শয্যা থেকে
শুধায় রাণী—'কই সেটা?
মস্ত ভয়াল আজব প্রাণী
অলক্ষুণে ওই বেটা?'
কোটাল তখন যষ্টি তুলে
নির্দেশিল বামদিকে,
সেথায় বসে মুচকি হাসে
পুচকে মতন চামচিকে।
তাই না দেখে দমকা হাসি
উঠলো পেটে সিংহিনীর,
হাসির গুঁতোয় হচ্ছে বাহির
সিংহরাণীর চক্ষে নীর।
খিঁচতে থাকে মাংসপেশী
অট্টহাসির হুংকারে,
রুগ্ন দেহ বাঁকতে থাকে
যেমন ধনুষ্টংকারে।
উদ্বেগে তাই বনের রাজা
হুকুম দিলেন তৎক্ষণাৎ—
'তোমরা সবাই বন্দী সাথে
সামনে থেকে যাও তফাৎ।'
চামচিকে আর ছাগল সাথে
হাজির ছিল বীর যত,
আজ্ঞা শিরোধার্য করে
সবাই হলো বিগত।
চামচিকেটা হটলে পরে
কমলো হাসির দমকাটা,
অল্পকালের জন্য রাণীর
লুপ্ত হলো সংজ্ঞাটা।
ফিরল আবার জ্ঞানটা যখন
কাটল মাথার ঝিনঝিনি
ভর্তাকে তার ডাকলো কাছে
বিস্মিতমুখ সিংহিনী,
বললো—'একি! বেশ মজা তো,
হাসির গুঁতোয় রোগ সারে?
বলছি রাজা সত্যি কথা,
সুস্থ আমি একবারে।
তিনটি দিবস অষ্টপ্রহর
দারুণ ব্যথায় ভুগছি তো,
এখন আমি দিব্যি আছি,
আরোগ্য মোর নিশ্চিত।'
হৃষ্টচিতে সিংহরাজা
আজ্ঞা দিলেন—'ডঙ্কা মার,
রাজ্ঞী ব্যাধিমুক্ত এখন,
নাইকো কোন শঙ্কা আর।'

*

দিবস পরে সকাল বেলা
জমকালো খুব রাজসভা,
রামছাগল আর চামচিকেটার
খতম হবে আজ দফা।
চতুর্দিকে দৃষ্টি করে
রামছাগলের বাম কানে
দিচ্ছিলো কি মন্ত্রণা সব
চামচিকেটা সাবধানে।
ঠিক তখনই বিচার সভায়
সিংহ রাজার দর্শনে
জয়ধ্বনি উঠলো বিরাট
আকাশ-ভাঙ্গা গর্জনে।
বসলো রাজা সিংহাসনে
স্বস্তি বাচন শেষ করে,
ব্যাঘ্র-কোটাল অগ্রসরি
আরজিখানা পেশ করে।
কম্পিত পায় সামনে এসে
যুক্ত করে কর দুটি
রাজ সমীপে বললো ছাগল—
'মাপ করে দেন মোর ত্রুটি।
রাজরাণীমার অসুখ শুনে
ঘুমাইনি আজ তিন রাতে,
গবেষণার বস্তু নিয়ে
অষ্টপ্রহর চিন্তাতে।
অন্বেষণের বিষয় ছিল
ওষুধ কিছু বার করা,
রাজমহিষীর অম্লশূলের
আরোগ্য হয় যার দ্বারা।
খুব গোপনে কাজ করেছি
গুপ্ত রেখে নামটিকে
ফলটি প্রকাশ কাল করেছি
ওষুধটা ওই চামচিকে।
রাজরাণীমার অসুলি দাওয়াই
পেটের পেশী কোঁচকানো,
শরীরটাকে বক্রভাবে
এদিক-ওদিক মচকানো।
চামচিকেটার প্রদর্শনে
হঠাৎ হাসির উদ্রেকে
প্রত্যাশা মোর সিদ্ধ হলো,
গেল ব্যাধির ভূত ভেগে।
বিচার করুন দয়াল প্রভু
দোষটা আমার কোনখানে:
রাজার প্রিয় কাজ সতত

www.BanglaBook.org

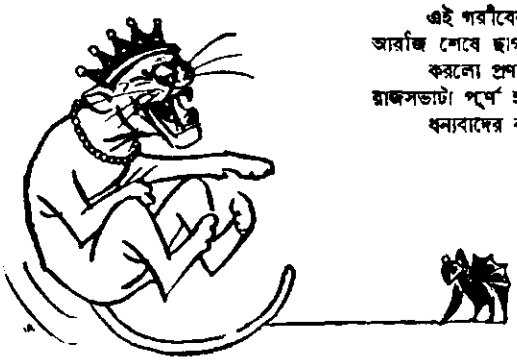

এই গরীবের মন টানে।'
আরজি শেষে ছাগমহাশয়
করলো প্রণাম রাজপদে,
রাজসভাটা পূর্ণ হলো
ধন্যবাদের বাষ্পতে।

*

তুষ্ট সকল রাজপারিষদ
ছাগমশাই-এর কীর্তিতে,
বাঘমশাই-এর সাধ্য কি আর
রামছাগলের শির নিতে!

১৩৮১

জোড়া সাপ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সেবার আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম কাশীতে, আমার ছোট মাসীর বাড়িতে। আমার ছোট মেসোর বদলির চাকরি, সেইজন্য আমার খুব মজা হয়েছিল। ছোট মেসো এক একটা নতুন জায়গায় বদলি হয়ে যান, আর আমি অমনি সেখানে বেড়াতে যাই। এইভাবে আমার মুসৌরী, দেরাদুন, পুনা, তেজপুর, বিশাখাপত্তন—এই সব ভালো ভালো জায়গা দেখা হয়ে গিয়েছিল।

আমার ছোট মেসোকে আসলে বলা উচিত বিরাট মেসো। কারণ তাঁর চেহারাটা ঠিক ভীমের মতন। তেমনি বাজখাঁই তাঁর গলার আওয়াজ, আর সাহসও সাংঘাতিক। কেউ ভয়ে তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয়বার শেকহ্যান্ড করে না। তিনি এমন বজ্রমুষ্টিতে হাত চেপে ধরেন যে তারপর তিন দিন ব্যথা থাকে। আমার ছোট মাসী আবার তেমনি ভীতু। টিকটিকি, আরশোলা কিংবা মাকড়সা দেখলেই ছোট মাসী প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অবশ্য আমার সেই বিরাট মেসোও যে পৃথিবীতে একটা জিনিসকে খুব ভয় পান, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম সেবার কাশীতে।

ছোট মাসীরা বাড়ি নিয়েছিলেন বেনারস স্টেশনের উল্টো দিকে একটা নতুন পাড়ায়। পাড়াটা সবে তৈরি হচ্ছে। মাঠের মধ্যে মধ্যে উঠছে নতুন বাড়ি। মাঠগুলো ঝোপ-ঝাড়ে ভরা, খুব বড় বড় ইঁদুর আছে সেইসব মাঠে। এক একটা ইঁদুরের অন্তত দু'কিলো তিন কিলো ওজন হবে।

কাশীতে বড্ড ফেরিওয়ালার উৎপাত। সারা দিনে কতরকম ফেরিওয়ালা যে আসে, তার ঠিক নেই। কাঁচের চুড়ি, ছাগলের দুধ, লুধিয়ানার কম্বল, পুরোনো ঘি, কাঠের পুতুল, আচার এসব নানারকম জিনিস বিক্রি করতে ফেরিওয়ালা আসে। এ ছাড়া বাঁদরের নাচ, ভালুকের নাচ দেখাবার লোক আছে।

একদিন এল একটি মেয়ে সাপুড়ে। এর আগে আমি কখনো মেয়ে সাপুড়ে দেখিনি। বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারার মাঝ বয়সী একজন মেয়ে, সঙ্গে গেরুয়া রঙের কাপড়ে মোড়া তিনটে সাপ ভর্তি ঝোলা, আর সেই মাঝখানকার বেলুনের মতন ফোলানো বাঁশী। সেই বাঁশী সে অনেকক্ষণ ধরে বাজালো আমাদের বাড়ির সামনে। তারপর বললো, 'সাপ খেলা দেখবে গো! এ বাঙালী মাইজী!'

আমরা যে বাঙালী, সে কথা কী করে বুঝলো কে জানে। বোধ হয় চিংড়ি মাছ রান্নার গন্ধ পেয়েছিল!

ছোট মাসী বারান্দায় বেরিয়ে এসে মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, না দেখবো না! পরশুই ত একজন সাপুড়ে এসে খেলা দেখিয়ে গেল! আমরা কি রোজ রোজ বাঁদরের নাচ, ভালুকের নাচ আর সাপের নাচ দেখবো নাকি!'

মেয়ে সাপুড়েটি অনেক কাকুতি মিনতি করলো, কিন্তু মন গললো না ছোট মাসীর।

www.BanglaBook.org

তখন সাপুড়েনী বললো, 'বড় তিয়াস লেগেছে, এক বর্তন পানি দেবে মাইজী?'

কেউ জল চাইলে না বলা যায় না! ছোট মাসী জল আনতে গেলেন আর সাপুড়েনীটি তার ঝাঁপিগুলো নামিয়ে আমাদের বারান্দায় এসে বসলো!

ছোট মাসী এক জগ জল এনে দিলেন। সাপুড়েনী জগটা মুখের কাছে উঁচু করে ধরে ঢক ঢক করে প্রায় আধেকটা জল খেয়ে নিল। তারপর ঝাঁপিগুলোর মুখ খুলে সাপগুলোর গায়ে ছিটিয়ে দিল খানিকটা। অমনি একটা হলদে কালো ডোরাকাটা সরু সাপ সুরুৎ করে বেরিয়ে এসে মেঝের ওপর কিলবিল করতে লাগলো! ছোট মাসী ভয় পেয়ে দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে চ্যাঁচাতে লাগলেন, 'শিগগির ওটাকে তুলে নিতে বল। শিগগির ওকে বিদায় কর।'

সত্যি কথা বলতে কি, অত কাছে একটা সাপ দেখে আমারও একটু একটু ভয় করছিল, একমাত্র ভয় পেলো না ছোট মাসীর দেড় বছরের ছেলে বাবলু। সে খল্‌খল্‌ করে হেসে বলতে লাগলো, 'সাপ ধরবো! সাপ ধরবো!'

বাজারের মাছওয়ালারা যেমনভাবে সিঙ্গিমাছ ধরে, সাপুড়েনী সেই রকম অবহেলার সঙ্গে সাপটার মাথা চেপে ধরে সেটাকে আবার ঝাঁপিতে পুরে দিল। তারপর উটেরা যেমন ভাবে গন্ধ শোঁকে সেই রকম ভাবে ঠোঁট আর নাক কুঁচকে রেখে বললো, 'মাইজী তুম্‌হার কোঠীর পাশে মাঠে সাঁপ আছে, পাঁচঠো রুপিয়া দো, সাঁপ ধরে দেবো।'

ছোট মাসী খিল খিল করে হেসে উঠলেন। আমিও হাসলাম। এ বাড়ির চাকর শুকদেও-ও হাসলো। কারণ, ঠিক দু'দিন আগেই আমাদের উল্টোদিকের বাড়িতে সাপ খেলা দেখাতে এসে একজন সাপুড়ে ঠিক এই কথা বলেছিল। আর মাত্র দু'টাকা চেয়ে সে বাড়ির সিঁড়ির তলা থেকে দুটো সাপ ধরে দিয়েছিল। ঐ সব সাপুড়েরা মনুমেন্টের মাথা থেকেও যখন তখন সাপ ধরে দিতে পারে। উল্টোদিকের বারান্দা থেকে আমরা স্পষ্ট দেখেছিলাম, সাপুড়েটার আলখাল্লার নীচে কোমরে জড়ানো ছিল দুটো সাপ ; সেই দুটোই খুব কায়দা করে বার করলে, ম্যাজিশিয়ানরা যেভাবে টুপীর ভেতর থেকে খরগোশ বার করে।

আমাদের সকলের এক সঙ্গে হাসি শুনে সাপুড়েনীটি একটু ঘাবড়ে গেল বোধহয়। আর বেশী উচ্চবাচ্য করলো না। ঝাঁপিগুলো তুলে নিয়ে চলে গেল। ছোট মাসী বারান্দাটা ফিনাইল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেললেন।

খানিকটা দূরে বেশ কিছুক্ষণ পেট-ফোলানো বাঁশীটার আওয়াজ শোনা গেল ; বোধহয় সাপুড়েনী আর কোনো বাড়িতে খেলা দেখাবার সুযোগ পেয়েছে।

পরের রবিবারে ছোট মেসো আমাদের সারনাথ ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন। ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। তারপর ছোট মাসীর শোবার ঘরে বসে আমরা চা খাচ্ছি, রেকর্ড প্লেয়ারে ওস্তাদ গুলাম আলী খাঁর গান বাজছে এমন সময় হঠাৎ আলো নিভে গেল আর গুলাম আলীর গলাটা বিশ্রী মোটা হয়ে থেমে গেল।

আমরা কলকাতার ছেলেরা যখন তখন আলো নিভে গেলে আর অবাক হই না। ছোট মাসী বললেন, 'দূর ছাই'! ছোট মেসো বললেন, 'এই শুরু হলো জ্বালাতন!'

কারুরই অবশ্য মোমবাতি খোঁজবার উৎসাহ হল না! সেদিন পাতলা পাতলা জ্যোৎস্না ছিল। জানালা দিয়ে তার একটু আলো এসে পড়েছে। আমরা সেই আবছা অন্ধকারেই বসে বসে চা খেতে লাগলাম। অন্ধকারে আর যাই অসুবিধে হোক, খাবার খেতে কোন অসুবিধে হয় না। হাতের বিস্কুটটা ঠিক মুখেই চলে আসে, সেটা আমরা ভুল করে কানে গুঁজে দিই না।

তিনজনে মিলে নানা রকম গল্প করছিলাম। এক সময় আমার চোখে পড়লো মেঝেতে কী যেন চকচক করছে। মনে হল খানিকটা জল পড়ে আছে, তার ওপর এসে পড়েছে চাঁদের আলো। এখানে জল এল কি করে? তারপর মনে হল, জলটা যেন নড়ছে। তারপর আর কিছুই মনে হল না, আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, 'সাপ!'

আমি ছোট মাসীকে ভয় দেখাবার জন্য অনেক সময় মিছিমিছি বলি, 'ছোট মাসী, তোমার পায়ের কাছে একটা আরশোলা!' ছোট মাসী সেইরকমই কিছু একটা ভেবে চেয়ারেই বসে রইলেন। ছোট মেসো স্প্রিংয়ের মতন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সাপ? কোথায়?'

'ঐ যে সামনেই।'

একথা বলেই আমি ছোট মাসীর হাত ধরে ঝট্‌কা টান মেরে ছুটলাম। আমি আর ছোট মাসী চলে এলাম বসবার ঘরে। আর শোবার ঘরের পেছনে একটা ছোট ঘরে গিয়ে ঢুকলেন ছোট মেসো। দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন দরজা। ততক্ষণে আমরা সাপটার দু'বার ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।

দারুণ ভয় পেয়ে ছোট মাসী ধপাস করে সোফার ওপর বসে পড়তে যাচ্ছিলেন, বোধহয় অজ্ঞান হয়েই যেতেন, কিন্তু তক্ষুনি আবার উঠে চিৎকার করে বললেন, 'বাবলু! বাবলু রয়েছে যে ঘরের মধ্যে!'

সত্যিই ত! সারনাথ থেকে ফেরবার পথেই বাবলু ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে কোলে করে এনে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল খাটে। বাবলু ত সেখানেই ঘুমিয়ে রয়েছে!

এরপর দেখলাম, ছোট মাসী আর ছোট মেসোর একদম উল্টো ব্যবহার। দারুণ সাহসী ছোট মেসো ঘরের দরজা আর খুললেনই না, সেখান থেকে চেঁচিয়ে বললেন, 'কী হল? সাপটা গেছে? কত বড় সাপ?'

আর যে ছোট মাসী আরশোলা দেখলেই মূর্ছা যান, তিনি তক্ষুনি ছুটে আবার সেই সাপের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। আমি ছোট মাসীর হাত চেপে ধরলাম। বিছানার ওপর ঘুমিয়ে থাকা বাবলুকে হয়ত সাপটা না কামড়াতেও পারে, কিন্তু ছোট মাসী ঘরের মধ্যে ঢুকলে নির্ঘাৎ কামড়াবে।

আমাদের চ্যাঁচামেচি শুনে শুকদেও ছুটে এল আর সে চট করে একটা টর্চ জোগাড় করে ফেলল। টর্চের আলোটা যাতে সে সাপটার মুখের ওপর না ফেলে তাই আমি টর্চটা হাত থেকে নিয়ে নিলাম। যতদূর জানি সাপ কানে শুনতে পায় না—তাই আমাদের চিৎকার সে গ্রাহ্য করতে নাও পারে, কিন্তু চোখে আলো ফেললে নিশ্চয়ই রেগে যাবে। আলোটা একটু তেরছা ভাবে ফেলে দেখলাম, সাপটা একটা বিরাট ফণা তুলে লেজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে আর এদিক ওদিক মুখ ঘোরাচ্ছে। সাপটা অন্তত চার হাত লম্বা, মাঝে মাঝে জিভ বার করছে চিরিক চিরিক করে। দেখলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।

ছোট মাসী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সুনীল, শিগগির সাপটাকে মার।'

www.BanglaBook.org

কিন্তু বললেই কি আর অতবড় সাপটাকে মারা যায়? কাছে এগোলেই যদি লাফিয়ে এসে কামড়ায়? সত্যি কথা বলতে কি, ভয়ে আমার বুক কাঁপছিল। আমি বাঘ, ভাল্লুক, ভূতের চেয়ে সাপকে বেশী ভয় পাই। তবু ঘরের মধ্যে বাবলু রয়েছে, একটা কিছু করতেই হবে।

আমি বললাম, 'শুকদেও, লাঠি কোথায়, লাঠি?'

শুকদেও দৌড়ে গিয়ে একটা ডাণ্ডা নিয়ে এল।

সাপটা কী করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে জানি না। কিন্তু এখন সে বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে মনে হয়। সাপেরা সিমেন্টের মেঝে পছন্দ করে না। ফণা তোলা অবস্থায় একটু-খানি চলতে গিয়েই চটাং চটাং করে পড়ে যাচ্ছে। তাতে রেগে উঠে আরও বড় ফণা তুলছে।

সাপটাকে তক্ষুনি মারবার বদলে, ওটা যদি কোনো রকমে ঘর থেকে বেরিয়ে যেত, তাহলে আমরা বাঁচতুম। কিন্তু সাপটা একটা উল্টো কাজ করলো। সেটা আমাদের দিকেই খানিকটা এসে একটা দরজার পাশে লুকিয়ে পড়লো। চৌকাঠের সঙ্গে লেগে থাকা তার খানিকটা লেজ আমরা তখনো দেখতে পাচ্ছি। সর্বনাশ, এবার ত আমরা ঘরেও ঢুকতে পারবো না। বাবলু যদি ঘুম ভেঙে হঠাৎ খাট থেকে নেমে আসে!

ওপাশের বন্ধ ঘর থেকে ছোট মেসো আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল, সাপটা গেছে?'

ছোট মাসী বললেন, 'না! তুমি বেরিয়ো না একদম।'

ছোট মাসী তারপর আরও সব অসীম সাহসিক কাজ করতে লাগলেন। রান্নাঘর থেকে কেরোসিনের টিনটা এনে প্রায় দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত এগিয়ে অনেকখানি কেরোসিন ছিটিয়ে দিলেন ঘরের মধ্যে। তারপর একগাদা খবরের কাগজ পাকিয়ে তাতে কেরোসিন ঢেলে রান্নাঘরের উনুনে ছুঁইয়ে আগুন জেলে আনলেন। তারপর সেই খবরের কাগজের মশালটা ছুঁড়ে দিলেন সাপটার গায়ে। গায়ে আগুন লাগতেই সাপটা দরজার পাশ থেকে বেরিয়ে আবার ফণা তুললো আর সেই আগুনে ঘরের মধ্যের কেরোসিনও জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে।

ছোট মাসীর উপস্থিত বুদ্ধি সাঙ্ঘাতিক বলতে হবে। ঘরের মধ্যে আগুন জ্বলছে বলে সাপটা আর ঘরের মধ্যে গেল না, চৌকাঠের সামনে কিলবিল করতে লাগলো।

এই সময় এই হট্টগোলে বাবলু জেগে উঠলো। ডেকে উঠলো, 'মা—'

ছোট মাসী প্রায় পাগলের মতন হয়ে গিয়ে কেঁদে চিৎকার করে বললেন, 'বাবলু, বাবলু খাট থেকে নামিস না—'

সেই সময় শুকদেও সাপটার গায়ে একটা ডাণ্ডা কষালো।

কিন্তু লাঠি দিয়ে সাপ মারা খুব সোজা কথা নয়। মারটা খেয়ে সাপটার বিশেষ কিছু হল না, সে চৌকাঠ ছাড়িয়ে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। সাপ দারুণ জোরে ছুটতে পারে এক এক সময়, কিংবা লাফাতেও পারে। সেই মুহূর্তে সাপটা আমাদের একজনকে ছোবল মারতে পারতো। কিন্তু শুকদেও তক্ষুনি তার ডাণ্ডা দিয়ে সাপটাকে মেঝের সঙ্গে চেপে ধরলো।

তখন দেখলাম শুকদেওর কী দারুণ সাহস আর গায়ের জোর। সিমেন্টের মেঝেতে একটা সাপকে চেপে ধরে থাকা কি সোজা কথা? সাপের গাটাই ত তেলতেলে!

আমি এক লাফে তিন পা পিছিয়ে গিয়েছিলাম। আবার এগিয়ে এলাম। সাপটা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য ভীষণভাবে ছটফট করছে। শুকদেও চেপে ধরে আছে ঘাড়ের কাছটা। আর সাপটার লেজটা একটা চাবুকের মতন ছটাস ছটাস করে পড়ছে মেঝেতে। এক একবার চেষ্টা করছে লাঠিটাকে পাকিয়ে ধরবার জন্য।

শুকদেও চেঁচিয়ে উঠলো, 'দাদাবাবু আভি উসকো মারিয়ে!'

দেখলাম শুকদেও'র মুখে ঘাম জমে গেছে, দাঁতে দাঁত চেপে আছে। সাপটার নিশ্চয়ই খুব গায়ের জোর। শুকদেও বেশী-ক্ষণ ধরে রাখতে পারবে না। ছোট মাসী সবটা কেরোসিন ছড়িয়ে দিলেন মেঝেতে, আবার কাগজ জেলে ছুঁড়ে দিলেন সেখানে। এখন সাপটার সর্বাঙ্গেই আগুন তবু কিন্তু পুড়ছে না সহজে,

www.BanglaBook.org

ছটফট করে যাচ্ছে সমানে!

আমি কী দিয়ে সাপটাকে মারবো? হাতের কাছে কোনো জিনিস নেই। একটা চেয়ার ছুঁড়ে মারলে কি কোন লাভ হবে? কিছুই ঠিক করতে পারছি না। যদি শুকদেও'র হাত পিছলে যায়, যদি সাপটা আগুন পেরিয়ে আসে...

ছোট মাসী বললেন, 'সুনীল, রান্নাঘর থেকে শিল-নোড়া—নোড়াটা নিয়ে আয়—'

কিন্তু তার আগেই সাপটা শুকদেও'র লাঠির তলা থেকে পিছলে বেরিয়ে এল। তারপর আগুনের শিখা ছাড়িয়ে ফণাটা তুলে আমাদের দিকে তাকালো। শুকদেও সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের গতিতে ডান্ডাটা দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে মারলো সেই ফণাটার ওপর। তাতেই ফণাটা ছাতু হয়ে গেল, সাপটা নেতিয়ে পড়লো আগুনের ওপর। শুকদেও তখনও দমাদম করে পেটাতে লাগলো এক জায়গায়। সাপটা আর নড়লো না।

ছোট মাসী আগুন ডিঙিয়ে বাবলুকে কোলে তুলে নিলেন।

আমি আর শুকদেও ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম মাটিতে। সারা ঘরে সাপ পোড়ার বিশ্রী গন্ধ। বমি এসে যাচ্ছে প্রায়। শুকদেও আবার আগুন থেকে লাঠি দিয়ে বার করে আনলো সাপটাকে। জায়গায় জায়গায় আগুনে ঝলসে সাপটা যেন হঠাৎ মোটা হয়ে গেছে।

এতক্ষণ পরে বেরুলেন ছোট মেসো। তিনি সাপটাকে দেখে বললেন, 'বাবা, এত বড় সাপ? সাপকে বিশ্বাস নেই, ওরা অনেক সময় মটকা মেরে থাকে!'

তিনি শুকদেও'র হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে সেই মরা সাপকেই মারলেন কয়েক ঘা।

ছোট মাসী বললেন, 'হয়েছে, হয়েছে! এবার ওটাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসো।'

ছোট মেসো বললেন, 'রাস্তায় ফেলবে কি? বৃষ্টির জল লাগলে সাপ আবার বেঁচে যায়।'

সে আর কি করা যাবে! শুকদেও আর আমি গিয়ে অনেকটা দূরে সাপটাকে ফেলে দিলাম মাঠের মধ্যে। নিশ্চিহ্ন হবার জন্য দুটো থান ইট দিয়ে আরও কয়েকবার ঠুকে দিলাম ওর মাথা। নাঃ, সাপটা মরে গেছে নিশ্চিত। সাপেরা ত আর অমর হতে পারে না।

সেদিন আর সারারাত প্রায় ঘুমই হল না বলতে গেলে। ছোট মাসীর ধারণা হল সাপটার বিষ নিশ্চয়ই ঘরের মধ্যে পড়েছে। দুটো ঘরে একবার ফিনাইল একবার ডেটল ছড়িয়ে খুব করে ধোওয়ামোছা হল। তারপর বহুক্ষণ জেগে আমরা অনবরত ঐ ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। সত্যি খুব জোর একটা ফাঁড়া গেছে। ছোট মাসী বারবার ছোট মেসোকে ঠাট্টা করে বলতে লাগলেন, 'তুমি কি দরের বীরপুরুষ বোঝা গেছে! আমরা তিনজন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সাপটা মারলাম। আর তুমি দরজা বন্ধ করে বসে রইলে?'

ছোট মেসো বললেন, 'আহা, তোমরাই ত আমাকে বেরুতে বারণ করলে।'

ছোট মাসী বললেন, 'থাক্ থাক্! সব বোঝা গেছে। তোমার তখন গলা কাঁপছিল। এ বাড়িতে আর থাকবো না। তুমি অন্য বাড়ি খোঁজ।'

সাপটা মারার ব্যাপারে আমি যদিও বিশেষ কিছুই করিনি, তবু ছোট মাসী যে আমাকে কৃতিত্বের খানিকটা ভাগ দিলেন, তাতে আমি খুশিই হলাম।

পরদিন সকালে উঠে দেখে এলাম যে মাঠের মধ্যে মরা সাপটা একই জায়গায় পড়ে আছে। বেঁচে উঠে পালায়নি।

ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ হল না। আমাদের সাপ মারার কাহিনীটা পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। অনেকে এ পাড়ায় সাপের কথা শুনে দারুণ অবাক হল। অনেকে আমাদের সাহসের প্রশংসা করলো, আর অনেকে আমাদের ভয়ও দেখালো খুব। প্রত্যেক সাপেরই একটা করে জুটি থাকে। একটাকে মারলে অন্যটা এসে প্রতিশোধ নেয়।

এরকম একটা কথা আমরা শুনে আসছি বটে, কিন্তু ঠিক বিশ্বাস হয় না। আমরা ত মরা সাপটা ফেলে এসেছি বেশ খানিকটা দূরে, মাঠের মধ্যে। ঐ সাপটার যদি একটা জুটি থাকেও তবু সে এই বাড়ি খুঁজে খুঁজে আসতে পারবে? সাপের কি এত বুদ্ধি থাকে? সাপের বুদ্ধির ত তেমন গল্প শুনিনি। বরং সাপ সম্পর্কে এমন অনেক কিছু শোনা যায়, যেগুলি আসলে বাজে কথা। যেমন লোকে বলে, দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা! কিন্তু সাপ আসলে দুধও খায় না, কলাও খায় না।

তবু উল্টো দিকের বাড়ির দারোয়ান বললো, 'খুব সাবধান বাবুজী! আমাদের গাঁওতে এই জন্য কেউ সাপ মারে না। একটা সাপকে মারলেই অন্য সাপ এসে বদলা নিয়ে যায়। আমার এক চাচাতো ভাইকে সাপে কেটেছিল...'

আমরা তার কথা অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিলাম। তবু ভেতরে ভেতরে একটু ভয় রয়ে গেল। ভয় জিনিসটা একবার মনের মধ্যে ঢুকলে আর সহজে যায় না। আমরা কথা বলতে বলতে প্রায় খাটের তলা কিংবা ঘরের কোণগুলো খুঁজে দেখি ভালো করে। সন্ধের পর সব জানালা বন্ধ থাকে।

এদিকে ছোট মাসী পরদিন সবজীমন্ডী থেকে ঘুরে এসে চোখ বড় বড় করে বললেন, 'ত্রিবেদীজীর বউ কী বললেন জানিস? আমার মুখে সাপ মারার কথা শুনে বললেন, মরা সাপের লেজ দিয়ে নাকি একরকম তীব্র গন্ধ বেরয়। অন্য সাপটা সেই গন্ধ শুঁকে বোঝে কোন জায়গায় ঐ সাপটাকে মারা হয়েছিল, সেই গন্ধ শুঁকে শুঁকে আসে।'

আমি বললাম, 'কোনো বইতে ত এরকম কথা লেখা নেই!'

ছোট মাসী ঝংকার দিয়ে বললেন, 'যারা বই লেখে, তারা বুঝি সব জানে? মানুষের থেকে জন্তুজানোয়াররা অনেক কিছু বেশী বোঝে। তুই বলতে পারিস, কোথাও ভূমিকম্প হবার দু'দিন আগেই সেখানকার মুর্গীগুলো বেশী ছটফট করে কেন?'

আমি বললাম, 'তা বলে বেনারস সহরে কি সাপ কিলবিল করছে নাকি?'

ছোট মাসী বললেন, 'সেদিন দেখলি ত অতবড় সাপটা! একটা থাকলে দুটো থাকতে পারে না? যাই হোক বাবা, এ বাড়িতে আর আমি থাকছি না। যদি পারি, কাল-পরশুর মধ্যেই উঠে যাবো।'

ছোট মাসী খুব তাড়া দিতে লাগলেন ছোট মেসোকে বাড়ি খোঁজার জন্য। একতলা বাড়ি নয়, তিনি অন্তত তিনতলার ফ্ল্যাট চান।

ঠিক চারদিনের দিন সত্যিই এল দ্বিতীয় সাপটা। একদম দিনের বেলা!

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর ছোট মাসী আর আমি বসে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গল্প করছি। খাটের ওপর খেলা করতে করতে একটু আগে ঘুমিয়ে পড়েছে বাবলু। একটু বাদেই ছোট মাসীর চোখে ঘুম চলে আসবে, তখন আমি আমার ঘরে চলে যাবো বই পড়তে, তার আগেই দেখতে পেলাম সাপটাকে। ঘরের বাইরের দেয়ালের পাশে যে হাসনাহানা গাছটা রয়েছে, সেটা থেকে একটা সাপ জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে মুখ বাড়ালো। একদম আমাদের চোখের সামনে!

ছোট মাসী আর আমি এত অবাক হয়ে গেছি যে প্রথমে একটাও কথা বলতে পারলাম না। সাপটা জানালার শিকে লেজ পাকিয়ে দু' এক মুহূর্ত ঘরের মধ্যে চেয়ে রইলো, তারপর দেয়াল বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে পারলো না, ছপাৎ করে পড়ে গেল ঘরের মধ্যে।

'ওরে বাবা,' বলেই ছোট মাসী আর আমি এক দৌড়ে পালালাম। তারপরই আবার দুজনে ফিরে এলাম দরজার কাছে। ঠিক আগের দিনের মতন অবস্থা। ঘরের মধ্যে সাপ, খাটের ওপর ঘুমিয়ে আছে বাবলু! সাপটাও ঠিক একরকম, হাত চারেক লম্বা, মাথার ওপরে একটা পায়ের ছাপের মতন।

আজ ছোট মেসো বাড়িতে নেই, শুকদেও-ও একটু আগে বেরিয়ে গেছে। খাওয়াদাওয়ার পর সে একটু ঘুরে আসতে যায় রোজ।

একই রকম বিপদ থেকে কি পর পর দু'বার বাঁচা যায়! ছোট মাসী সেদিনকার মতন আর সাহস দেখাতে পারলেন না, একেবারে যে ভেঙে পড়লেন। 'ওরে বাবা গো! ওরে বাবা গো!' হাঁপাতে হাঁপাতে আর কাঁদতে কাঁদতে এই কথাই বলতে লাগলেন বারবার! আমি ছোট মাসীকে শক্ত করে ধরে আছি—হঠাৎ ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেই সাংঘাতিক কান্ড হবে।

সাপটা খাটের একটা পায়ার সঙ্গে লেজ জড়িয়ে মাথাটা ঘোরাচ্ছে এদিক ওদিক। মাঝে মাঝে ফণাটা সামান্য উঁচু করে আমাদের দেখছে। ওকে দেখেই আমার গা যে কাঁপছে। শুনেছিলাম মানুষ যেমন সাপকে ভয় পায়, তেমনি সাপও ভয় পায় মানুষকে। সহজে মানুষের কাছে আসে না। কিন্তু এই সাপটার একটুও ভয় পাবার লক্ষণ নেই! ঠিক যেন খেলা করছে।

মেল ট্রেনের চেয়েও তাড়াতাড়ি চিন্তা করে যাচ্ছি, কি করে সাপটাকে মারবো। সেদিনকার মতন কেরোসিন ছড়িয়ে পুড়িয়ে মারার উপায় নেই। সাপটা ইচ্ছে করলেই খাটের নীচে লুকোতে পারে। শুকদেও'র মতন ডান্ডা হাতে নিয়ে ওর কাছে যেতেও সাহস পাচ্ছি না। যদি একবার ফসকায়? তারই মধ্যে একবার ভেবে নিলাম, সাপটা যখন প্রতিশোধ নিতে এসেছে তখন কাকে কামড়াবে? ছোট মাসীকে না শুকদেও-কে? আমাকে কামড়ানো উচিত নয়। কারণ আমি ত আগের সাপটাকে ঠিক মারিনি। পরের মুহূর্তেই ভাবলুম, 'ছিঃ, আমি কি স্বার্থপর!'

ছোট মাসীর চিৎকারে বাবলু জেগে গিয়ে খাটের ওপর উঠে বসলো। আমরা দুজনেই এক সঙ্গে বললাম, 'বাবলু, নামিসনি। সাপ! সাপ! নামিসনি!'

বাবলু বললো, 'কোথায় সাপ?'

'—খাটের নীচে! নড়িস না, একটুও নড়িস না।'

বাবলু খাটের পাশে এসে ঝুঁকে সাপটাকে দেখলো। সাপটাও দেখলো বাবলুকে। সাপটা এত বড় যে অনায়াসেই অতটা ফণা উঁচু করে ছোবল মারতে পারতো বাবলুকে। আমরা শিউরে উঠে বললাম, 'সরে যা বাবলু, সরে যা!'

বাবলু ঐটুকুন ছোট ছেলে, সে চ্যাঁচানিতে ঘাবড়ে গেল। প্রথমে সে কেঁদে উঠলো 'অ্যাঁ-অ্যাঁ' করে! তারপর হঠাৎ পা ঝুলিয়ে খাট থেকে নেমে পড়তে গেল।

চরম বিপদের সময় মানুষের মাথায় ঠিক একটা বুদ্ধি এসে যায়; আমি এতক্ষণ যা ভাবিনি তাই করে ফেললাম। ছোট মাসীকে পেছন দিকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে এলাম, একটানে আমার গা থেকে জামাটা খুলে ফেলে ছুঁড়ে দিলাম সাপটার দিকে। সাপটা রাগ করে জামাটার ওপরে ছোবল মারতে গিয়ে তার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে গেল। তার রাগী ফোঁস ফোঁস শব্দ শোনা যেতে লাগলো শুধু। আমি এক হাতে বাবলুকে ধরে ফেলে চেঁচিয়ে বললাম, 'ছোট মাসী লাঠি আনো! শিগগির, লাঠিটা—'

কিন্তু লাঠি আনতে হল না। তক্ষুনি রাস্তায় শুনতে পেলাম প্যাঁ প্যাঁ বাঁশীর আওয়াজ—সাপ-খেলানো বাঁশী। আমি এবার আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম, 'ছোট মাসী'—তার আগেই ছোট মাসী ছুটে গেলেন রাস্তার দিকে।

সেই মেয়ে সাপুড়েটি আসছিল। ছোট মাসী গিয়ে তার হাত ধরে ব্যাকুল ভাবে বলতে লাগলেন, 'শিগগির আও, আমার কামরামে একঠো সাপ...তুম পাকড়ো, তুমকো দশ টাকা...বিশ টাকা দেগা'...

কাঁধের ঝাঁপি নামিয়ে ছুটে এল সাপুড়েনী। জামাটার কাছে গিয়ে বসে পড়ে বাজাতে লাগলো তার বাঁশীটা। একটু বাদেই জামার ভেতর থেকে ফস করে সাপটা ফণা উঁচু করলো, অমনি সাপুড়েনীটি দারুণ রেগে গিয়ে বললো, 'আরে কালুয়া!'

সাপুড়েনীটি বাঁশীটা ডান দিকে বাঁ দিকে নাড়তে লাগলো আর সাপটাও মাথা দোলাতে লাগলো সেই সঙ্গে। তারপর সে এক ফাঁকে কপ করে ধরে ফেললো সাপটার মাথা। বকুনি দিয়ে বললো, 'আরে কালুয়া। বদমাসকা বাচ্চা!'

আমরা অবাক।

সাপুড়েনীটি সাপটাকে ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'কালসে হামি ঢুঁড়ছি এই সাপটাকে। বদমাসটা যে কখন ভেগে গেল!'

ছোট মাসী বললেন, 'অ্যাঁ?'

বাবলুও কান্না থামিয়ে চোখ গোল করে তাকালো।

সাপুড়েনী একগাল হেসে বললো, 'হ্যাঁ মাইজী, কাল এই রাস্তার উধারে এক কোঠিতে খেলা দেখালাম, তার মধ্যে কখন এই বদমাসটা ভেগে গেল।'

সাপুড়েনীটি এই মাত্র যে উপকার করলো সেটা ভুলে গিয়ে দারুণ রেগে গেলেন ছোট মাসী, চোখ পাকিয়ে বললেন, 'অ্যাঁ? তুই সাপ ছেড়ে দিয়েছিস এ পাড়ায়? আর একটু হলে আমার ছেলেকে কামড়াতো! তোকে আমি পুলিশে দেবো!'

সাপুড়েনীটি বললো, 'ইসকো তো বিষ নেই আছে! এই দেখিয়ে না?'

সে একটা হাত মুঠো পাকিয়ে সাপটার মুখে মারতে লাগলো বারবার। সাপটা কামড়ালো না, মুখটা ফিরিয়ে নিতে লাগলো। শুধুই তাই নয়, বাইরে এসে সাপুড়েনী সাপটাকে মাটিতে ছেড়ে দিতেই সে সরসরিয়ে ঢুকে গেল একটা ঝাঁপির মধ্যে, তখন আর সন্দেহ রইলো না যে সেটা সত্যি সত্যিই পোষা সাপ।

ছোট মাসী তবু বললেন, 'তোকে এক পয়সাও বকশিশ দেবো না! তোর সাপ কেন আমার ঘরে ঢুকবে? আর একটু

www.BanglaBook.org

হলে আমি হার্ট ফেল করেছিলাম। উঃ? এখনো বুক ধড়াস ধড়াস করছে।'

কিন্তু আমার একটা খটকা লাগলো। একই রকম সাপ কয়েক দিনের মধ্যে ঐ একই ঘরে ঢুকে পড়লো? দ্বিতীয়টা তাহলে প্রতিশোধ নিতে আসেনি? আমি সাপুড়েনীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার ক'টা সাপ পালিয়ে গিয়েছিল?'

সে অবাক হয়ে বললো, 'কাঁহে বাবু? এই একঠো!'

আমি বললাম, 'তোমার দুটো সাপ হারায়নি? ঠিক বলছো! তাহলে কয়েকদিন আগে আমাদের বাড়িতে আর একটা সাপ এসেছিল কি করে? ঠিক এক রকম সাপ।'

সাপুড়েনী চোখ কপালে তুলে বললো যে সে কথা ত সে জানে না! সে কসম খেয়ে বলছে, তার এই একটা মাত্র সাপই হারিয়েছিল। তাও কাল সন্ধেবেলা। চারদিন আগে ত সে বেনারসে ছিলই না, সে চলে গিয়েছিল রামনগর। তা ছাড়া এরকম আর একটা সাপ আসবে কি করে—এ ত পাহাড়ী জাতের সাপ, এ ত এখানে পাওয়া যাবে না। তাকে যতই বলি যে ঠিক ঐ রকম একটা সাপ আমরা সত্যিই মেরেছি, সে অবিশ্বাসের সঙ্গে মাথা দোলায়। রাগ ধরে গেল। এর মধ্যে শুকদেও এসে পড়েছে। আমি বললাম, 'শুকদেও, মাঠের মধ্যে ওকে সেই মরা সাপটা দেখিয়ে দাও ত!'

শুকদেও সাপুড়েনীকে নিয়ে গেল মাঠের মধ্যে! সাপটা সেখানে নেই। না থাকতেই পারে, চারদিন কেটে গেছে, এর মধ্যে কাক চিল শকুনি খেয়ে ফেলেছে নিশ্চয়ই। সাপুড়েনীটি হেসে হেসে মাথা দোলাতে লাগলো। আমরা তাকে মাত্র পাঁচ টাকা বকশিশ দিয়ে বিদায় করে দিলাম।

ব্যাপারটা একটু রহস্যময় রয়ে গেল।

সন্ধেবেলা ছোট মেসো বাড়ি ফেরার পর সবিস্তারে সব বলা হল তাঁকে। তিনি প্রথমে বিশ্বাস করতে চান না। পর পর দুটো সাপ একই ঘরে? যাক, তিনি নতুন বাড়ি দেখে এসেছেন, সামনের রবিবারই সেখানে চলে যাওয়া হবে।

ছোট মাসী বললেন, 'দুপুরে তখন আর কেউ ছিল না। তবু ভাগ্যিস সুনীলটা ছিল, ওই ত সাহস করে জামাটা ছুঁড়ে দিয়েছিল, নইলে কী যে হত? আমার ত মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল একেবারে।'

ছোট মেসো হেসে বললেন, 'হুঁ, একে ত পোষা সাপ, তার ওপর বিষ নেই—তার সামনে যাওয়া আর এমন কি? আমি থাকলে ওটাকে খপ করে ধরে ফেলতাম।'

ছোট মাসী বললেন, 'আহা! তখন কি আমরা জানতাম যে ওটার বিষ নেই কিংবা পোষা।'

ছোট মেসো বললেন, 'ও দেখলেই বোঝা যায়। তোমরা ত সাপ চেনো না, আমি চিনি। জীবনে কত সাপ দেখেছি!'

কিছু না বুঝে বাবলুও হাসতে লাগলো! ১৩৮৪

চাঁদনি

গৌরী ধর্মপাল

এক ভা—রী রূপসী মেয়ে।

চুলটি ঝামুর ঝুমুর
চলাটি নূপুর-নূপুর।
কথা ত না ডাকছে পাখি—
রূপের বলো আর কী বাকি?

এত রূপ কোথায় রাখি? কোথায় আর? এক নিরিবিলি পাড়াগাঁয়ের খোড়ো কুঁড়েয়, এক সাদাসিধে শান্তদান্ত বাপ-মায়ের কোল জুড়ে।

সেই রূপসী মেয়ের নাম হল গিয়ে চাঁদনি। চাঁদনির রূপ দেখে মানুষ ত দূরের কথা, পশুপক্ষী পর্যন্ত থমকে দাঁড়ায়, পৃথিবী আর আকাশ চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে, রুক্ষ মাটির বুকে শিউরে শিউরে বেজে ওঠে ঘাস, কাশ আর বাঁশের বাঁশি। চাঁদনির ছোঁয়া লাগলে জলের বুক ঠাণ্ডা হয়ে যায়, আলোর উজলানি বাড়ে, হাওয়া হয় চন্দনধূপের ধোঁয়া, মাছি হয়ে যায় প্রজাপতি, ধুলো হয়ে যায় কেয়াফুলের রেণু। পোড়া কাঠে ফুল ফোটে, মরা গাঙে বান ডাকে, সাপের খোলস আপনি খসে, ঘুমন্তরা উঠে বসে। চাঁদনির সাড়া পেলে গোমড়ারা হাসে, কুঁদুলেরা বোবা হয়, বুড়ির মাথার পাকা চুল ঢাকা পড়ে কালো-ঝিকমিক কালো-ঝিকমিক করে।

মা দুগ্‌গা প্রত্যেক বছর পৃথিবীতে এসে চারদিন-পাঁচদিন, ভাসান দিতে দেরি হলে ছ'দিন-সাতদিন ধরে তিন চোখ মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন চাঁদনির রূপ আর মনে মনে বলেন, ফিরে গিয়ে এ মেয়ের কথা কাউকে বলা নয়। যা দেব-দত্যির নিত্যি ঝগড়া, তাতেই রক্ষে নেই, তার ওপর এ মেয়ের কথা কানে গেলে ত সর্বনাশ! না-না বাপু, শিবকেও না।

শিব-দেউলে দেবার্চনার ঘণ্টা যখন বাজে, বেলা সেই এক-পহরে চাঁদনির বাবা যায় কাজে, মা যায় কাজে। ফিরতে কোনদিন সন্ধে, কোনদিন রাত। চাঁদনি সারাদিন ছোট্ট ভাইটিকে নিয়ে দাওয়ায় বসে খেলায়-ধোলায়, নাওয়ায়-খাওয়ায়, চুলে এলে বালিশে মাথাখানি, গায়ে কাঁথাখানি দিয়ে ঢেকেঢুকে চাপুড়-চুপুড়ে ঘুম পাড়ায়।

একদিন—সন্দে হব কি হব না।

পূর্ণিমার চাঁদ উঠছে আকাশ বেয়ে একটু একটু করে। সেই চাঁদ দেখাতে দেখাতে চাঁদনি তার ছোট্ট ভাইটিকে খাইয়ে দিচ্ছে। খানিকক্ষণ খাওয়ার পর ভাই বলছে, আর খাব না, আর খাব না। চাঁদনি তখন গল্প বলছে, ছড়া বলছে আর ছোট্ট ছোট্ট গরাস করে ভাইটির মুখে পুরে দিচ্ছে। মা বলে গেছে, দেখিস, দেখিস রে চাঁদনি, টাটকা মাছের মুড়োটুকু যেন খায়, আর বলক

www.BanglaBook.org

জ্বালের দুধটুকু। তা ভাই বলছে—

মুড়োয় কাঁটা, চাল্লি দিদি,
দুধে কেমন গন্ধ,
আর খাব না আর খাব না,
মুখ করেছি বন্ধ।

সেধে সেধে বলে বলে যখন কিছুতেই পারলে না, তখন চাঁদনি এক ধমক দিলে। ভাইটি ভাঁ করে কেঁদে ফেললে। ওরে চুপ কর্ রে চুপ কর্, বাবা আসবে এখনি রে, মা আসবে এক্ষুনি, তোর ভাঁ-চ্যাঁচানি শুনতে পেলে মার লাগাবে তক্ষুনি। আর চুপ কর্, ভাই কেঁদেই চলল! তখন চাঁদনি ভাইকে কোলে নিয়ে আদর করে আকাশের চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে বলতে লাগল—

আয় আয় চাঁদমামা টি দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা।
মাছ কুটলে মুড়ো দেব,
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব,
কালো গরুর দুধ দেব,
দুধ খাবার বাটি দেব,
সোনার থালে ভাত দেব,
রাজার মেয়ে বিয়ে দেব,
চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা।

এমন ত রোজই বলে, কিন্তু আজ কী যে হল! যেই না বলা শেষ হয়েছে, অমনি চাঁদনি দেখে কি, আকাশখানা যেন দপ করে নিভে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল একরাশ তারা। তাদের ঝকমকঝকমকানির মাঝখানে চাঁদের খোলসটি ফ্যাকফ্যাক করতে লাগল, আর চাঁদটি খোলসের ভেতর থেকে বেরিয়ে একটি সোনার পিদিম হয়ে জ্বলতে জ্বলতে, দুলতে দুলতে, ঢেউ-ঢেউ হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে তাদের তুলসী-তলায় এসে নামল। দিদির কোল থেকে নেমে যেই না ভাইটি ধরতে গেছে পিদিমটা, অমনি ওমা, কোথায় পিদিম কোথায় কি, একটি ছোট্ট সোনার টিপ হয়ে মিটিমিটি হাসতে হাসতে চাঁদ এসে বসল খোকার কপালে দুই ভুরুর মাঝখানটিতে, আয় জরির মত সরু সরু দুটি হাত বের করে খোকার পাতের মুড়ো-টুকু কুড়মুড়িয়ে খেয়ে দুধের বাটিটায় চুমুক দিয়েই থেমে গিয়ে বললে, কালো গরুর ত?

চাঁদনি থতমত খেয়ে বললে, কালো, সাদা, রাঙা, ঢ্যাঙা, মুলতানী, গুলতানি, স—ব।

চাঁদ বললে, এই খেলে যা। তার মানে ইঁদুরের লোম, বেড়ালের গোঁপ, ব্যাঙের ঠ্যাং, টিকটিকির ল্যাজ, বোতলের কাঁচ, কোঁদালের প্যাঁচ—সব ঐ দুধের মধ্যে থিকথিক করছে, এই ত? দরকার নেই বাবা। এক রোগে ত সেই আদ্যিকাল থেকে খরগোস কোলে করে বসে আছি। এবার কি হাতি কোলে করব নাকি?... কুঁড়ো আছে? ধান-টান ভান? না কি বললে, ঢেঁকি নেই, একি সেই আদ্যিকাল নাকি?

চাঁদনি বললে, ঢেঁকি ঢেঁকিকেল ত দূরের কথা—

ধানই নেই তাই ভানি না,
পারলে চালও আনি না।
বালামও না দাদখানি না,
কী যে চাল তা-ও জানি না,
হায় চাল কিনা তা-ই জানি না।

তবে কুঁড়ো আছে কাঁড়ি কাঁড়ি
যত চাও আনতে পারি।

চাঁদ বললে, নিয়েস। যাবার সময় ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যাব'খন। আমার ওখানে ত খেত-খামার রেশন-বাজার চোর-চামার কিসসু নেই। অবশ্য শীগগিরি সব হবে শুনছি। তা সে যখন হবে তখন হবে। এখন তুমি ঐ বাকি দুটোর যোগাড় দেখ। সোনার থালে ভাত খেয়ে, রাজার মেয়ে বিয়ে করে, কুঁড়োর পুঁটলি কাঁখে, সাঁঝ নিশুতির বাঁকে বাড়ি যাই। বড্ড একা-একা লাগে গো। ভাবো ত, চারিধারে হাজার হাজার যোজন জুড়ে জন-মনিষ্যি নেই, হা হা করছে আকাশখান।

চাঁদনি বললে, আ—হা। কিন্তু—

সোনা আছে কোন খনিতে,
কোন রাজার রাজধানীতে,
কে রাখে সে খোঁজ-খবর?
তুমি লোক দেখছি জবর!
বাবার আপন হাতের ঢালাই
ঘরে আছে কাঁসার থালাই।
মাখা ছিল ঝোলে তেলে,
মেজেছি ছাই-তেঁতুলে
ঝকঝক করছে যেন
সোনাতে সোনা মাখানো—
সেই থালাতে খাবে?

চাঁদ চুপ। সোনার বদলে কাঁসা। বললেই হয়! যখন ছড়া-চ্ছিলে, মনে ছিল না?

তখন চাঁদনি বললে—

রূপে দিক্ বিদিক্ আলা
তুমিই ত সোনার থালা।
তোমাতেই ভাত বেড়ে দি,
কত পারো খাও ত দেখি?

চাঁদ বললে, সে কি? পুড়ে যাব যে?

চাঁদনি বললে, না না না, পুড়বে কেন?

ঘরে তাল- পাতার পাখা
তোলা আছে একটি ঝাঁকা।
তাই দিয়ে কষ্ট হাওয়া,
দেখো তখন ঘাম কি যায় না খাওয়া,
পোড়ে কি গা পোড়ে না,
উঁহু, অত হাত নেড়ো না—

এতই যদি তোমার ভয় তাহলে না হয় কলাপাতাতেই খাও। দিনকাল বুঝে চলতে হবে ত?

চাঁদ বললে, বেশ, তোমার কথাই মানলুম। কিন্তু হাঁড়িতে ভাত আছে ত, না কি তাও বাড়ন্ত?

এবার চাঁদনি সত্যি লজ্জা পেলে।

কাপড়খানি আঁটসাঁট করে পরে উনুনে কাঠ দিয়ে চাঁদনি চাঁদের জন্যে ভাত রান্না করতে বসল, আর চাঁদ খোকার কপাল থেকে বেরিয়ে এসে খোকার হাতে একটি সোনার বল হয়ে খেলা করতে লাগল।

চাঁদনি ভাত রাঁধছে আর ভাবছে—

চাঁদের যুগ্যি রাজার মেয়ে কোথায় পাই?
রাজার মেয়ে খুঁজতে এখন কোথায় যাই?
কোথায় যাই!—

www.BanglaBook.org

কেননা গাঁয়ের দুষ্টু ছেলেরা ছড়া বলাবলি করে, সেদেশের রাজার মেয়ের রূপ নাকি এইরকম—

আমাদের যিনি রাজা,
মেয়ে তাঁর দেখতে না যা,'
সে কী আর বলব তোকে?
দেখে আয় নিজের চোখে।
মানে হার ভূত-পেতনী,
হুতুমের নাতি-নাতনি।
রাক্কুসী বলবে, বাবা,
এ'র কাছে আমি ডোবা।
ইনি দেখছি রূপের সাগর,
রূপের কুমীর রূপের হাঙর,
রূপসী টেক্কা বিবি
এ'র কাছে কে দাঁড়াবি?

চাঁদনি ভাবচে আর ভাত রাঁধচে আর কুটনো কুটচে। আর খোকার হাতের সোনার বল হয়ে উনুনের কাছে গড়িয়ে এসে খেলা ভুলে দুটি গোল গোল চোখ মেলে চাঁদ অবাক হয়ে চাঁদনিকে দেখচে—

ওপর থেকে দেখে ভাবতুম, ভুবন-মার একরাশ চুলে বুঝি একটি আলোর উকুন নড়চে-চড়চে। এখন দেখচি, না ত, এ যে—

রূপের রাশি রূপের বাঁশি
রূপের বনে রূপকাপাসী
রূপের চুবড়ি রূপের তুবড়ি রূপের বুলবুল
রূপনীলিমায় ভাসন্ত এক রূপের শালুক ফুল—

রাজার মেয়ে কি এর চেয়েও ভাল? মনে ত হয় না। আচ্ছা, দেখি ত আর একটু ভাল করে—বলে চাঁদ একেবারে চাঁদনির বঁটির কাছে গড়িয়ে এসেচে, আর চাঁদনিও রাজার মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক ভাবে হাত ফসকে বেগুন নিতে গিয়ে চাঁদকেই তুলে নিয়ে বঁটিতে কেটে ফেলেচে। অমনি সোনার বলের এদিকে আধখানা ওদিকে আধখানা যেন দুই সোনার পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে এসেচে একরত্তি সদ্যোজাতের অসল চাঁদনি। চাঁদনি থতমত খেয়ে বঁটি ফেলে দাঁড়িয়ে উঠেচে।

আহা, কি চাঁদের রূপ। রূপ তাকে দেখলে—লজ্জা পায়। রং—মুখ লুকোয়! মুখে একটি হাসি—যা কিছুতেই মোছে না। হাতে একটি বাঁশি—হাত বাজে কি বাজে না। চোখ দুটি যেন বিশ্বভুবন দেখার জানালাকাটা কোণ-জানলা, হাত দুখানি যেন পরশমাণিক, আর চাঁদভুবনের আশ্চর্য কুঠরীর গুপ্তধন বুকখানি চাঁদনির নিঃশ্বাসের ছোঁয়ায় উঠচে আর পড়চে। চোখে পলক পড়ে না, মাঝে নিঃশ্বাস সরে না, চাঁদনি দেখতে লাগল চাঁদকে, আর চাঁদ দেখতে লাগল চাঁদনিকে। চাঁদ চাঁদনিকে দেখার জন্যে একটু করে উঁচু হয়, অর চাঁদনি চাঁদকে দেখার জন্য একটু করে নিচু হয়, এমনি করতে করতে চাঁদ-চাঁদনি সমান-সমান হল, অমনি চাঁদ চাঁদনির হাত ধরে বললে, তুমিই আমার রাজকন্যে। আমায় বিয়ে করবে ত?

ঠিক সেই সময় 'চাঁদনি-কাঁদনি কই রে' বলতে বলতে ঘরে এসে ঢুকল চাঁদনির মা-বাবা। এসে দেখে কি—

কাঁদনি মেজের ওপর ঘুমিয়ে কাদা।
উনুনের পাশে বঁটি ছাই কুটনোর খোসা একগাদা।

www.BanglaBook.org

উনুনে ভাত ধরব-ধরব করচে।

চাঁদনি মাথা নিচু করে ওই ও দিকটায় কি যেন খুঁজচে। আর ঘরের মোন্দিখানে দাঁড়িয়ে—আহা, কে গো?

কিছু আর বলতে হল না। একবার চাঁদের একবার চাঁদনির মুখের দিকে তাকিয়েই মা-বাবা সব বুঝতে পারলে। মা বললে, আমার চাঁদনির জন্যে চাঁদের মত জামাই চেয়েছিলুম মনে মনে, তা স্বয়ং চাঁদই যে এসে হাজির হবে, কে জানে?

বাবা বললে—

শাঁখা সিঁদুর দিয়ে,

আজ এই পুন্নিমের রাতে এখনই দেব আমার সোনার চাঁদনির বিয়ে।—পেঁটরাটা খোলো ত।

পেঁটরাটা খুলে বেরোল আগুন রঙের শাড়ি, জাঁতি, কাজললতা, আলতা, সিঁদুর, শাঁখা, রুলি, লজ্জাবস্তোর, লাল-গামছা, সুপুরি, হলুদ, কড়ি, বরণডালা, পিদ্দিম—আরো কত কি।

চারিদিকে লক্ষ্মীপুজোর শাঁখ বাজচে, ঘরে ঘরে আলপনায় হাসচে-ভাসচে উঠোন-আঙিনা, সদর-অন্দর, তারি মাঝখানে চাঁদ-চাঁদনির বিয়ে হল। গাঁয়ে আনন্দের বান ডাকল, সেই বানের টানে আকাশ থেকে দেবতারা সব নেমে এলেন। কনে দেখে প্রত্যেকেই মনে মনে ভাবলেন, আরে, আগে জানলে ত—? চাঁদটা ত ভারি...? অবিশ্যি, মানিয়েছে ভালোই, তা মানতেই হবে।

দেবতাদের বৌ-দেবীরা নিজেদের গা থেকে একটু একটু করে সোনা দিয়ে একখানি মস্ত বড় সোনার থালা উপহার দিলেন চাঁদ-চাঁদনিকে। সেই থালায় চাঁদনির রান্না করা ভাত-ব্যান্নোন খেয়েটয়ে কুঁড়োর পুঁটলি বেঁধে-ছেদে চাঁদ বললে, চাঁদনি, এবার চলো যাই।

চাঁদনির মা-বাবা বললে, সে কি?

গাঁয়ের লোক বললে, তাও কি কখনো হয়?

চাঁদনি কাঁদতে কাঁদতে বললে, না, না, না।

চাঁদ বললে, আমার দেশে গাছ নেই, পাখি নেই, ফুল নেই, ফল নেই, এমন কি একটু হাওয়া পর্যন্ত নেই। কষ্টেসৃষ্টে একটা বৌ যোগাড় করলুম, তাও তোমরা দেবে না? ঠিক আছে, তোমাদের চাঁদনি তোমাদের থাক, আমি চললুম।

সব্বাই বললে, সে কি? আমরা কি তাই বলেছি? না না। তুমি যেও না। তুমিও থাক।

চাঁদ বললে, বা রে, তাহলে আমার দেশের কী হবে?

বলতেই একটা দারুণ শব্দে সবাই চমকে তাকিয়ে দেখলে আকাশ দিয়ে শাঁ শাঁ করে চাঁদের খোলসটার দিকে উড়ে চলেছে যন্ত্রপাতি, মানুষ-বোঝাই একটা ছুঁচলো আকাশ-গাড়ি। দেখতে দেখতে গাড়িটা আর দেখা গেল না, শুধু একটা রক্তের মত লাল চোখ যেন অনেকক্ষণ ধরে চাঁদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল।

চাঁদের আর চাঁদে ফেরা হল না। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লে।

ওদিকে চাঁদের খোলসের বুকে যন্তর-নল বসিয়ে সেই মানুষেরা আওয়াজ-টাওয়াজ কিছু শুনতে না পেয়ে বললে—দূর দূর, বাজে, মরা, ঠাণ্ডা। আর আসল চাঁদটি এদিকে চাঁদনির ঘরে কলায় কলায় বাড়তে-কমতে কমতে-বাড়তে লাগল।

শুধু এক একদিন পুন্নিমার রাতে চাঁদের সাধ যায় চাঁদনিকে নিয়ে পাড়ি দেয় সেই চাঁদ-দূরে দুটি রুপোলী মাছের মত নীল জোছনার সায়রে ভাসতে ভাসতে। ভুবন-মা বলেন, যাস নে রে যাস নে। চাঁদ তবু যায়। অমনি মায়ের বুক টনটন করে ওঠে, শিরায় শিরায় টান ধরে, বুকের সাগর উথাল-পাথাল করে। বট শিমুল দেবদারুর মাথা পর্যন্ত গিয়ে আটকে যায় চাঁদ। ভুবন-মা বাড়িয়ে ধরেন তাঁর অলখ-রশির মই। তাই বেয়ে বেয়ে তারা নেমে আসে। একজোড়া চাঁদ। চাঁদ আর চাঁদনি। ১৩৮৩

ভেলকি

পরিমল গোস্বামী

ছোটবেলায় পাড়াগাঁয়ে বাস করতাম। সে অনেক দিনের কথা। সেটা বোমার যুগ, বিলিতি কাপড় বর্জনের যুগ, রাখী বন্ধনের যুগ, এক কথায় স্বদেশী যুগ। এই সময় সেই দূর পাড়াগাঁয়ে দু-তিনটি জিনিস দেখে আমি সত্যি অবাক হয়েছি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে বেদেনীদের ভেল্‌কির খেলা। এখন যাকে তোমরা ম্যাজিক বল, তাই। আর একটি বহুরূপীর মজা। এ ছাড়া কলের গান, বাইসিকেল, ফটোগ্রাফ তোলা—এ সব ত আছেই। সব তখন নতুন, আর অল্প বয়সের দৃষ্টিও নতুন, তাই সবই অদ্ভুত মনে হত।

বেদেনীদের সম্বল ছিল মাত্র একটি থলে। সে থলে বহু রকম টুকরো জিনিসে বোঝাই! একখানা মানুষের হাড় বার করত থলে থেকে, তাই দিয়ে আঘাত না করলে ম্যাজিক হত না। হাতের মুঠোয় ছোট বল, হাড় দিয়ে আঘাত করে বলত, 'লাগ ভেলকি', অমনি বল উধাও। থলে থেকে একটি ছোট্ট কাঠের বাটি বেরুল। সেটাকে উপুড় করে রাখল। তার উপরে বোতামের মত একটি গুলি লাগানো। ডান হাতের দুটো আঙুল তার দু'পাশে ঠেলে দিয়ে চেপে বাটিটি তুলে দেখাল কিছু নেই। তারপর সেই হাড়—চণ্ডালের হাড়, একটু ঠুকে দিতেই বাটির নিচে তিনটি বল এসে হাজির। তারপর থলে থেকে একটি কাঠের ব্যাঙ বার করে রাখল সবার সামনে। বেদেনী দুখানা হাত পেতে ব্যাঙকে ডাকল, তখুনি ব্যাঙ লাফ দিয়ে উঠে এল তার হাতে।

এই রকম সব খেলা। দেখে খুব উত্তেজনা! তার ঐ হাড়ের উপর খুব সে ভক্তি হয়েছিল তা নয়। এবং একবার হাতের মুঠোয় কৌশলে রাখা কাপড়ে তৈরি বল, উপুড় করা বাটির একটি ধার উঁচু করতেই তার নিচে চলে গেল, তাও চকিতে দেখেছিলাম। কিন্তু খেলা দেখানোর ওস্তাদিটাই মনকে ভরে রাখলে। ওসব তুচ্ছ হয়ে গেল আমার কাছে। সমস্ত সহানুভূতি এবং আকর্ষণ তখন বেদেনীর দিকে! প্রথম ম্যাজিক দেখার সে

www.BanglaBook.org

আনন্দ আজও মনে আছে।

তারপর বহুরূপী। প্রথম দিন সে সবাইকে ঠকিয়েছিল। ভোর বেলা সূর্যোদয়ের আগে এক সাহেব এসে গটগট করে কি সব অর্থহীন কথা সাহেবী ধরনে উচ্চারণ করে চলে গেল। কিছু পরে শোনা গেল সে বহুরূপী, এবং অনেকের বাড়িতেই এইভাবে হানা দিয়েছিল। আসলে সে সাহেব নয়। তারপর সে এমন এক খেলা দেখাল যা দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। সে সাহেব সেজে একটি শক্ত আসনে পা ঝুলিয়ে বসে আছে, এবং একটি ছেলে সেই আসনটাকে মাথায় করে সাহেবটাকে বয়ে নিয়ে চলেছে। চৌকো আসন, চারদিকে কাপড় দিয়ে ঘেরা। সাহেব মাঝে মাঝে ছেলেটাকে ধমকাচ্ছে, বলছে জোরে চল। ছেলেটির দুর্দশা দেখে কষ্ট হচ্ছিল বেশ, কিন্তু দৃশ্যটাও অভিনব, তাই সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছোট ছেলের দল অনেকটা ঘুরেছিলাম।

আসলে কিন্তু নিচে কোনো ছেলেই ছিল না। সাহেব নিজেই চলছিল নিজের পায়ে। কিন্তু সে তার কোমরের চারদিকে এমন একটি চৌকো হাল্কা ফ্রেম এঁটে নিয়েছিল যে সেটাকেই আসন মনে হচ্ছিল। ফ্রেমের মাঝখান দিয়ে সাহেবের কোমর থেকে পা নেমে গেছে, কিন্তু তার চারদিকে কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকাতে তা বোঝা যাচ্ছে না। সাহেবের যে দুখানা প্যান্ট-মোজা-জুতো-পরা পা বাইরে ঝুলছিল, তা খড়ের তৈরী। অথচ সেই দুখানা পাকেই আসল পা মনে হচ্ছিল। কোনো ছেলের মাথায় রাখা কাঠের আসনে পা ঝুলিয়ে বসলে যেমন দেখায় ঠিক তেমনি। আমার মত কথায় কথায় অবাক হওয়া ছেলের মাথায় এই খেলা তখন ভীষণভাবে নাচছে।

সেই দিনই রাত্রে যখন আমার এক দাদা ঠিক ঐ জিনিস তৈরি করে সাহেব সেজে সবটা কৌশল দেখিয়ে দিলেন, তখন ঐ বহুরূপী লোকটার উপর ভক্তি আরও বেড়েই গেল।

এর প্রায় দশ বছর পরে দেখলাম আসল ম্যাজিক। যাদুকর, বিখ্যাত গণপতি চক্রবর্তী। সে বয়সে সে ম্যাজিক দেখা মানে এক অসম্ভব জগতে বাস করার সামিল। জানা নিয়মকে চোখের সামনে উলটিয়ে দিয়ে মনকে পাগল করে তোলা। তাঁর সেই হাত-পা বেঁধে ব্যাগে পুরে ব্যাগ বেঁধে বাক্সে ঢোকানো, এবং বাক্স চারদিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে তাতে তালা লাগিয়ে দেওয়া এবং একখানা পরদা দিয়ে ঢেকে দিতে না দিতে তাঁর বাইরে বেরিয়ে আসা, স্বপ্নের মত মনে হয়েছিল। তারপর পর্দার আড়ালে যাব মাত্র সব খুলে যখন দেখা গেল, তিনি তেমনি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ব্যাগ-বন্দী হয়ে আছেন, তখন তা যে কেমন করে সম্ভব হল ভেবে পেলাম না।

ঠিক সেই সময়ে কলেজে বিজ্ঞান পড়তে গিয়ে দেখি সে আর এক ভেল্‌কি। দুনিয়ার সমস্ত জিনিস মাত্র শ'খানেক ভিন্ন ওজনের পরমাণু দিয়ে গড়া! তারপর থেকে সৃষ্টির অনেক ভেল্‌কিই আমরা জেনে ফেলেছি, কিন্তু তবু ত আরও সব ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। এই যে কয়েকটা পরমাণু ওলটপালট সাজিয়ে এত জিনিস গড়া হচ্ছে, এই রকম অনেক জিনিস ত আমরাও গড়ছি। কিন্তু তা কি আমরা কখনো ভাল করে ভেবে দেখেছি? এই যে আমি এত কথা লিখছি, সে ত কয়েকটি মাত্র অক্ষর ওলটপালট করে যে সব শব্দ তৈরি হয়েছে, ফের সেগুলো নানা ভাবে সাজিয়ে সাজিয়ে! বড় বড় অভিধান খুলে দেখব, হাজার হাজার শব্দ, আর সে সবই মাত্র বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগের কয়েকটি অক্ষর ওলটপালট করে তৈরি। আবার যে সব শব্দ তৈরি করা হল, তারই কয়েকটা ওলটপালট করেই ত এই রচনা লিখছি। সব শব্দই অভিধানে আছে, অথচ যা লিখছি তা কিন্তু অভিধান নয়। আমার মনের কথা তোমাদের মনে চালান করে দিচ্ছি—শব্দগুলো অভিধান থেকে নিয়ে।

ধর, এক যাদুকর খেলা দেখাচ্ছেন। তিনি তাঁর ঝোলা থেকে এলোমেলো ভাবে কয়েকটি শব্দ বার করে দর্শকদের সামনে সাজিয়ে ধরলেন এই ভাবে—

তার ভাই মুখে কহে না কো, মোর কী
সাহস। হাউই তোরি গায়ে লাগে। কবি
কহিল, কিছু ছাই দিয়ে আসি, আমি
তারকার ছাই। পিছু পিছু সে ফিরিয়া
আসে।

যাদুকর বললেন, তোমরা এর অর্থ বল। কিন্তু স্পষ্ট অর্থ কেউ বলতে পারল না। তখন যাদুকর ঐ শব্দগুলো ঝোলায় ভরে খানিকটা নাড়াচাড়া করলেন; এবং ঐ শব্দগুলিই একে একে বার করে আর এক রকম সাজাতে লাগলেন। তখন তার চেহারা হল এই রকম—

হাউই কহিল মোর কী সাহস ভাই,
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই।
কবি কহে, তার গায়ে লাগে না ত কিছু,
সে ছাই ফিরিয়া আসে তোরি পিছু পিছু।

তখন তা দেখে দর্শকেরা খুশিতে হাততালি দিতে লাগল। যাদুকরও খুশি হলেন। এ যাদুকরের নাম রবি ঠাকুর!

এটা অবশ্য পুরনো দিনের লেখা। আধুনিক কাব্যের ভেল্‌কি একটু উল্টো রকমের। এখন এ খেলা দেখাতে হলে পরের ঐ কবিতাটিই ঝোলায় নাড়া দিয়ে আগের কথাগুলো বার করতে হত। তখন তা দেখে দর্শকেরা হর্ষধ্বনি করত। যাদুকর বলতেন, বুঝতে পারছ? দর্শক বলত, বুঝতে পারছি না, কিন্তু খুব ভাল লাগছে।

এ সবই আশ্চর্য কাণ্ড! সব একা। রেঁধেনীর ভেল্‌কি, বহুরূপীর ভেল্‌কি, গণপতি চক্রবর্তীর ভেল্‌কি, বিধাতার ভেল্‌কি এবং রবি ঠাকুরের ভেল্‌কি, সব—এক। শুধু সাজানোর কৌশল। জানা জিনিস দিয়ে অজানা জিনিস তৈরি করা, আবার কখনো বা অজানা জিনিস দিয়ে জানা জিনিস তৈরি করা। চিত্র-শিল্পীও ঠিক এইভাবে রঙ ও রেখার ভেল্‌কি দেখান। চোখের ভুল, সবই অথচ সবই সত্যি!

কিন্তু আর এক জাতের ভেল্‌কির কথা এখনো বলিনি।

ধর, গুদামে বোঝাই চাল দেখলাম। গুদামের দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দেওয়া হল। লাগ ভেল্‌কি লাগ, ওয়ান টু থ্রী। দুপ্রটো! দরজা খুলে দেখা গেল এক বস্তা চালও নেই। শুধু চাল নয়, অনেক জিনিসই এমন হয়। যেন তালা-বন্ধ বাক্স থেকে গণপতি চক্রবর্তী উধাও!

এখন (মানে এই আগস্ট মাস, যখন এটা লিখছি)—এখন দেখছি মাছের ভেল্‌কি! বাজারে একটি মাছও নেই!

১৩৭৩

www.BanglaBook.org

মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প

সত্যজিৎ রায়

মোল্লা নাসীরুদ্দীনের নামে অনেক গল্প প্রায় হাজার বছর ধরে পৃথিবীর নানা দেশে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকের মতে এইসব গল্পের জন্ম তুরস্কদেশে, কারণ সেখানে এখনো প্রতি বছর নাসীরুদ্দীনের জন্মোৎসব পালন করা হয়।

মোল্লা নাসীরুদ্দীন যে ঠিক কেমন লোক ছিলেন সেটা তাঁর গল্প পড়ে বোঝা মুশকিল। এক এক সময় তাকে মনে হয় বোকা, আবার এক এক সময় মনে হয় ভারী বিজ্ঞ। তোমাদের কী মনে হয় সেটা তোমরাই বুঝে নিও।

নাসীরুদ্দীন তার বাড়ির বাইরে বাগানে কী যেন খুঁজছে। তাই দেখে একজন জিগ্যেস করল, 'ও মোল্লাসাহেব, কী হারালে গো?'

'আমার চাবিটা', বললে নাসীরুদ্দীন।

তাই শুনে লোকটিও বাগানে এসে চাবি খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ খোঁজার পর সে জিগ্যেস করল, 'ঠিক কোনখানটায় ফেলেছিলে চাবিটা মনে পড়ছে?'

'আমার ঘরে।'

'সে কি! তাহলে এখানে খুঁজছ কেন?'

'ঘরটা অন্ধকার', বললে নাসীরুদ্দীন। 'যেখানে খোঁজার সুবিধে সেইখেনেই ত খুঁজব।'

*

নাসীরুদ্দীনের বন্ধুরা একদিন তাকে বলল, 'চলো আজ রাত্রে আমরা তোমার বাড়িতে খাব।'

'বেশ, এস আমার সঙ্গে,' বলল নাসীরুদ্দীন।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে সে বলল, 'তোমরা একটু সবুর কর, আমি আগে গিন্নীকে বলে আসি ব্যবস্থা করতে।'

গিন্নী ত ব্যাপার শুনে এই মারে ত সেই মারে। বললেন, 'চালাকি পেয়েছ? এত লোকের রান্না কি চাট্টিখানি কথা? যাও বলে এস ওসব হবে-টবে না।'

নাসীরুদ্দিন মাথায় হাত দিয়ে বলল, 'দোহাই গিন্নী, ও আমি বলতে পারব না। ওতে আমার ইজ্জত থাকবে না।'

'তবে তুমি ওপরে গিয়ে ঘরে বসে থাক। ওরা এলে যা বলার আমি বলব।'

এদিকে নাসীরুদ্দিনের বন্ধুরা প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে শেষটায় তার বাড়ির সামনে এসে হাঁক দিল, 'ওহে নাসীরুদ্দীন, আমরা এসেছি, দরজা খোল।'

দরজা ফাঁক হল, আর ভিতর থেকে শোনা গেল গিন্নীর গলা।

'ও বেরিয়ে গেছে।'

বন্ধুরা অবাক। 'কিন্তু আমরা ত ওকে ভিতরে ঢুকতে দেখলাম। আর সেই থেকে ত আমরা দরজার দিকেই চেয়ে আছি। ওকে ত বেরোতে দেখিনি।'

গিন্নী চুপ। বন্ধুরা উত্তরের অপেক্ষা করছে। নাসীরুদ্দীন দোতলার ঘর থেকে শুনে আর থাকতে না পেরে বলল, 'তোমরা ত সদর দরজায় চোখ রেখেছ, সে বুঝি খিড়কি দিয়ে বেরোতে পারে না?'

নাসীরুদ্দীন বাজার থেকে মাংস কিনে এনে তার গিন্নীকে দিয়ে বললে, 'আজ কাবাব খাব, বেশ ভালো করে রাঁধ দিকি।'

গিন্নী রান্নাচান্না করে লোভে পড়ে নিজেই সব মাংস খেয়ে ফেলল। কর্তাকে ত আর সে কথা বলা যায় না, বলল, 'বেড়ালে খেয়ে ফেলেছে।'

'এক সের মাংস সবটা খেয়ে ফেলল?'

'সবটা।'

বেড়ালটা কাছেই ছিল। নাসীরুদ্দীন সেটাকে দাঁড়িপাল্লায় চড়িয়ে দেখল ওজন ঠিক এক সের।

'এটাই যদি সেই বেড়াল হয়', বললে নাসীরুদ্দীন, 'তাহলে মাংস কোথায়? আর এটাই যদি সেই মাংস হয়, তাহলে বেড়াল কোথায়?'

www.BanglaBook.org

নাসীরুদ্দীনের পোষা পাঁঠাটার উপর পড়শীদের ভারী লোভ, কিন্তু নানান ফিকির করেও তারা সেটাকে হাত করতে পারে না। শেষটায় একদিন তারা নাসীরুদ্দীনকে বললে, 'ও মোল্লা-সাহেব, বড় দুঃসংবাদ। কাল নাকি প্রলয় হবে। এই দুনিয়ার সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'তাহলে পাঁঠাটাকেও ধ্বংস করা হোক,' বললে নাসীরুদ্দীন।

সন্ধেবেলা পড়শীরা দলেবলে এসে দিব্যি ফুর্তিতে পাঁঠার ঝোল খেয়ে গায়ের জামা খুলে নাসীরুদ্দীনের বৈঠকখানায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে তারা দেখে তাদের জামা উধাও।

'প্রলয়ই যদি হবে,' বললে নাসীরুদ্দীন, 'তাহলে জামাগুলো আর কোন কাজে লাগবে ভাই? তাই আমি সেগুলোকে আগুনে ধ্বংস করে ফেলেছি।'

শিকারে বেরিয়ে পথে প্রথমেই নাসীরুদ্দীনের সামনে পড়ে রাজামশাই ক্ষেপে উঠলেন। 'লোকটা অপয়া। আজ আমার শিকার পণ্ড। ওকে চাবকে হটিয়ে দাও।'

রাজার হুকুম তামিল হল।

কিন্তু শিকার হল জবরদস্ত।

রাজা নাসীরুদ্দীনকে ডেকে পাঠালেন।

'কসুর হয়ে গেছে নাসীরুদ্দীন। আমি ভেবেছিলাম তুমি অপয়া। এখন দেখছি তা নয়।'

নাসীরুদ্দীন তিন হাত লাফিয়ে উঠল।

'আপনি ভেবেছিলেন আমি অপয়া? আমায় দেখে আপনি ছাব্বিশটা হরিণ মারলেন, আর আপনাকে দেখে আমি বিশ ঘা চাবুক খেলাম। অপয়া যে কে সেটা বুঝতে পারলেন না?'

*

নাসীরুদ্দীনের যখন বয়স খুব কম তখন একদিন তার বাপ তাকে বললেন, 'ওরে নসু, এবার থেকে খুব ভোরে উঠিস।'

'কেন বাবা?'

'অভ্যেসটা ভালো', বললেন নসুর বাপ। 'আমি সেদিন ভোরে উঠে বেড়াতে গিয়ে রাস্তার মধ্যিখানে পড়ে থাকা এক থলে মোহর পেয়েছি।'

'সে থলে ত আগের দিন রাত্রেও পড়ে থাকতে পারে, বাবা?'

'সেটা কথা নয়। আর তাছাড়া আগের দিন রাত্রেও ওই পথ দিয়ে হাঁটছিলুম আমি, তখন কোনো মোহরের থলে ছিল না।'

'তাহলে ভোরে উঠে লাভ কি বাবা?' বললে নাসীরুদ্দীন। 'যে লোক মোহরের থলি হারিয়েছিল সে নিশ্চয় তোমার চেয়েও বেশি ভোরে উঠেছিল।'

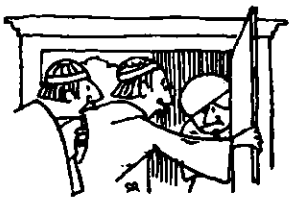

একদিন বাড়িতে দুজন লোকের পায়ের শব্দ পেয়ে নাসীরুদ্দীন ভয়ে একটা আলমারিতে ঢুকে লুকিয়ে রইল।

লোক দুটো ছিল চোর। তারা বাক্স-প্যাঁটরা সবই খুলেছে, সেই সঙ্গে আলমারিটাও খুলে দেখে তাতে মোল্লাসাহেব ঘাপটি মেরে আছেন।

'কী হল মোল্লাসাহেব, লুকিয়ে কেন?'

'লজ্জায়', বললে নাসীরুদ্দীন। 'আমার বাড়িতে তোমাদের নেবার মত কিছুই নেই তাই লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি না ভাই।'

*

নাসীরুদ্দীন একটা মণিহারি দোকানে গিয়ে জিগ্যেস করলে, 'এখানে পেরেক পাওয়া যায়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বললে দোকানদার।

'আর চামড়া?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, যায়।'

'আর সুতো?'

'যায়, আজ্ঞে।'

'আর রঙ?'

'তাও যায়।'

'তাহলে তুমি বসে না থেকে একটা জুতো তৈরী করে ফেল না বাপু!'

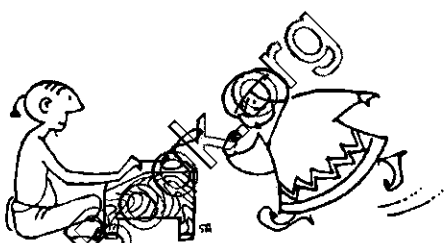

তর্কবাগীশ মশাই নাসীরুদ্দীনের সঙ্গে তর্ক করবেন বলে দিন-ক্ষণ ঠিক করে তার বাড়িতে এসে দেখেন মোল্লাসাহেব বেরিয়ে গেছেন। মহা বিরক্ত হয়ে তিনি মোল্লার সদর দরজায় খড়ি দিয়ে লিখে গেলেন 'মূর্খ'।

নাসীরুদ্দীন বাড়ি ফিরে এসে কাণ্ড দেখে এক হাত জিভ কেটে এক দৌড়ে তর্কবাগীশ মশাইয়ের বাড়ি গিয়ে তাকে বলল, 'ঘাট হয়েছে পণ্ডিতমশাই, আমি বেমালুম ভুলে গেসলুম আপনি আসবেন। শেষটায় বাড়ি ফিরে দরজায় আপনার নামটা লিখে গেছেন দেখে মনে পড়ল।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গাঁয়ের লোকে একদিন ঠিক করল নাসীরুদ্দীনকে নিয়ে একটু মশকরা করবে। তারা তার কাছে গিয়ে সেলাম ঠুকে বলল, 'মোল্লাসাহেব, আপনার এত জ্ঞান, একদিন মসজিদে এসে আমাদের তত্ত্বকথা শোনান না!' নাসীরুদ্দীন এক কথায় রাজী।

দিন ঠিক করে ঘড়ি ধরে মসজিদে হাজির হয়ে নাসীরুদ্দীন উপস্থিত সবাইকে সেলাম জানিয়ে বললে, 'ভাই সকল, বল ত দেখি আমি এখন তোমাদের কী বিষয় বলতে যাচ্ছি?'

সবাই বলে উঠল, 'আজ্ঞে সে ত আমরা জানি না।'

মোল্লা বলল, 'এটাও যদি না জান তাহলে আর আমি কী বলব। যাদের বলব তারা এত অজ্ঞ হলে চলে কি করে?'

এই বলে নাসীরুদ্দীন রাগে গজগজ করতে করতে মসজিদ ছেড়ে সোজা বাড়ি চলে এল।

গাঁয়ের লোক নাছোড়বান্দা। তারা আবার তার বাড়িতে গিয়ে হাজির।

'আজ্ঞে, আসছে শুক্রবার আপনাকে আর একটিবার আসতেই হবে মসজিদে।'

নাসীরুদ্দীন গেলেন, আর আবার সেই প্রথম দিনের প্রশ্ন দিয়েই শুরু করলেন। এবার সব লোক একসঙ্গে বলে উঠল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি।'

'সবাই জেনে ফেলেছ? তাহলে ত আর আমার কিছু বলার নেই'—এই বলে নাসীরুদ্দীন আবার বাড়ি ফিরে গেলেন। গাঁয়ের লোক তবুও ছাড়ে না। পরের শুক্রবার নাসীরুদ্দীন আবার মসজিদে হাজির হয়ে তাঁর সেই বাঁধা প্রশ্ন করলেন। এবার আর মোল্লাকে রেহাই দেবে না গাঁয়ের লোক, তাই অর্ধেক বলল 'জানি', অর্ধেক বলল, 'জানি না।'

'বেশ, তাহলে যারা জানো তারা বলো, আর যারা জানো না তারা শোন'—এই বলে নাসীরুদ্দীন আবার ঘরমুখো হলেন।

*

এক ধনী লোকের বাড়িতে ভোজ হবে খবর পেয়ে নাসীরুদ্দীন সেখানে গিয়ে হাজির।

ঘরের মাঝখানে বিশাল টেবিলের উপর লোভনীয় সব খাবার সাজানো রয়েছে রুপোর পাত্রে। টেবিল ঘিরে কুরসি পাতা, তাতে বসেছেন হোমরা-চোমরা সব খাইয়েরা। নাসীরুদ্দীন সেদিকে এগোতেই কর্মকর্তা তার মামুলি পোষাক দেখে তাকে ঘরের এক কোণায় ঠেলে দিলেন। নাসীরুদ্দীন বুঝল সেখানে খাবার পৌঁছতে হবে যাবে রাত কাবার। সে আর সময় নষ্ট না করে সোজা বাড়ি ফিরে গিয়ে তোরঙ্গ থেকে তার ঠাকুরদাদার আমলের একটা ঝলমলে আলখাল্লা আর একটা মণি-মুক্তো বসানো আলিশান বার করে সেগুলো পরে আবার নেমন্তন্ন বাড়িতে ফিরে গেল।

এবার কর্মকর্তা তাকে একেবারে খাস টেবিলে বসিয়ে দিলেন, আর বসামাত্র নাসীরুদ্দীনের সামনে এসে হাজির হল ভুরভুরে খুশবুওয়ালা পোলাওয়ের পাত্র। নাসীরুদ্দীন প্রথমেই পাত্র থেকে খানিকটা পোলাও তুলে নিয়ে তার আলখাল্লায় আর পাগড়িতে মাখিয়ে দিল। পাশে বসেছিলেন এক আমীর। তিনি ভারী অবাক হয়ে বললেন, 'জনাব, আপনি খাদ্যদ্রব্য যেভাবে ব্যবহার করছেন তা দেখে আমার কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অর্থ জানতে পারলে আমি বিশেষ বাধিত হব।'

'অর্থ খুবই সোজা', বললে নাসীরুদ্দীন। 'এই আলখাল্লা আর এই পাগড়ির দৌলতেই আমার সামনে এই ভোজের পাত্র। এদের ভাগ না দিয়ে আমি একা খাব, সে কি হয়?'

*

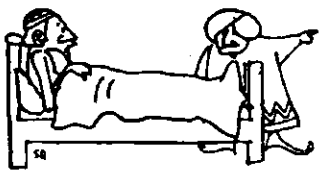

নাসীরুদ্দীন এক বাড়িতে চাকরের কাজ করছে। মনিব তাকে একদিন ডেকে বললেন, 'তুমি অযথা সময় নষ্ট কর কেন হে বাপু? তিনটে ডিম আনতে কেউ তিনবার বাজার যায়? এবার থেকে একবারে সব কাজ সেরে আসবে।'

একদিন মনিবের অসুখ করেছে, তিনি নাসীরুদ্দীনকে ডেকে বললেন, 'হাকিম ডাক।'

নাসীরুদ্দীন গেল, কিন্তু ফিরল অনেক দেরিতে, আর সঙ্গে একগুষ্টি লোক নিয়ে।

মনিব বললেন, 'হাকিম কই?'

'তিনি আছেন, আর সঙ্গে আরো আছেন,' বললে নাসীরুদ্দীন।

'আরো কেন?'

'আজ্ঞে হাকিম যদি বলেন পুলটিশ দিতে, তার জন্য লোক চাই। জল গরম করতে কয়লা লাগবে, কয়লাওয়ালা চাই। আপনার শ্বাস উঠলে পর কোরান পড়ার লোক চাই। আর আপনি মরলে পরে লাশ বইবার লোক চাই।'

*

নাসীরুদ্দীন সরাইখানায় ঢুকে গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলে, 'সূর্যের চেয়ে চাঁদের উপকারিত অনেক বেশি।'

'কেন মোল্লাসাহেব?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে সবাই।

'চাঁদ আলো দেয় রাত্তিরে,' বললে নাসীরুদ্দীন, 'দিনে আলোর দরকারটা কি শুনি?'

*

নাসীরুদ্দীন তার এক বন্ধুকে নিয়ে সরাইখানায় ঢুকেছে দুধ খাবে বলে। পয়সার অভাব, তাই এক গেলাস দুধ দুজন আধা-আধি করে খাবে।

বন্ধু বললে, 'তুমি আগে খেয়ে নাও তোমার অর্ধেক। বাকিটা আমি পরে চিনি দিয়ে খাব।'

'চিনিটা আগেই দাও না ভাই,' বললে নাসীরুদ্দীন, 'তাহলে দুজনেরই দুধ মিষ্টি হবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বন্ধু মাথা নাড়ল। 'আধ গেলাসের মত চিনি আছে আমার সঙ্গে, আর নেই।'

নাসীরুদ্দীন সরাইখানার মালিকের সঙ্গে দেখা করে খানিকটা নুন নিয়ে এল। 'ঠিক আছে,' সে বললে বন্ধুকে, 'এই নুন ঢাললাম দুধে। আমি অর্ধেক নোনতা খাব, বাকি অর্ধেক মিষ্টি খেও তুমি।'

*

এক পড়শী মোল্লাসাহেবের কাছে একগাছ দড়ি ধার চাইতে এসেছে।

'পাবে না,' বললে নাসীরুদ্দীন।

'কেন মোল্লাসাহেব?'

'দড়ি কাজে লাগছে।'

'ওটা ত মাটিতে পড়ে আছে আজ ক'দিন থেকে মোল্লা-সাহেব।'

'ওটাই কাজ।'

পড়শী তবু আশা ছাড়ে না। বললে, 'ক'দিন চলবে কাজ মোল্লাসাহেব?'

'যদ্দিন না ওটা ধার দেওয়া দরকার বলে মনে করি,' বললে নাসীরুদ্দীন।

*

নাসীরুদ্দীন হামামে গেছে গোসল করতে। পরিচারক তার ছেঁড়া পোষাক দেখে আধখানা সাবান আর একটা ময়লা তোয়ালে ছুঁড়ে দিল তার দিকে।

নাসীরুদ্দীন কিন্তু যাবার সময় তাকে ভালোরকম বকশিশ দিয়ে গেল। পরিচারক ভাবলে, 'এ কেমন হল, খাতির না করেই যদি এত পাওয়া যায় তাহলে খাতির করলে না জানি কত মিলবে।'

সামনের সপ্তাহে নাসীরুদ্দীন আবার গেছে হামামে। এবার তাকে দেখেই পরিচারক একেবারে বাদশার হালে তার তোশা-মোদ করেছে। আচ্ছা রকম দলাই-মলাই করে, গায়ে আতর ছিটিয়ে দিয়ে, কাজের শেষে হাত পাততেই নাসীরুদ্দীন তাকে একটি তামার পয়সা দিয়ে বললে, 'গতবারের জন্য এই বকশিশ। এবারেরটা ত আগেই দেওয়া আছে।'

*

রাজামশাই একদিন নাসীরুদ্দীনকে ডেকে বললেন, 'বনে গিয়ে ভাল্লুক মেরে আনো।'

ভাল্লুক শিকার চাট্টিখানি কথা নয়, নাসীরুদ্দীন ভয়ে তটস্থ, তবু রাজার আদেশ অমান্য করে কী করে? অগত্যা তাকে যেতই হল।

বন থেকে ফেরার পর একজন তাকে জিগ্যেস করল, 'কেমন হল শিকার, মোল্লাসাহেব?'

'চমৎকার', বললে নাসীরুদ্দীন।

'ক'টা ভাল্লুক মারলেন?'

'একটিও না।'

'বটে? ক'টাকে ধাওয়া করলেন?'

'একটিও না।'

'সে কী! ক'টা দেখলেন?'

'একটিও না।'

'তাহলে চমৎকারটা হল কী করে?'

'ভাল্লুক শিকার করতে গিয়ে সে-জানোয়ারের দেখা না পাওয়ার চেয়ে চমৎকার আর কী হতে পারে?'

*

রাজদরবারে নাসীরুদ্দীনের খুব খাতির।

একদিন খুব খিদের মুখে বেগুন ভাজা খেয়ে ভারী খুশি হয়ে রাজা নাসীরুদ্দীনকে বললেন, 'বেগুনের মত এমন সুস্বাদু আর আছে কি?'

'বেগুনের জবাব নেই,' বললে নাসীরুদ্দীন।

রাজা হুকুম দিলেন, 'এবার থেকে রোজ বেগুন খাব।'

তারপর পাঁচদিন দু'বেলা বেগুন খেয়ে ছ'দিনের দিন রাজা হঠাৎ বেঁকে বসলেন। খানসামাকে ডেকে বললেন, 'দূর করে দে আমার সামনে থেকে এই বেগুন ভাজা।'

'বেগুন অখাদ্য,' সায় দিয়ে বললে নাসীরুদ্দীন।

রাজা একথা শুনে ভারি অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি মোল্লাসাহেব, তুমি যে সেই দিনই বললে বেগুনের জবাব নেই!'

'আমি ত আপনার মোসাহেব, জাঁহাপনা,' বললে নাসীরুদ্দীন, 'বেগুনের ত নই।'

*

এক বেকুবের শখ হয়েছে সে পণ্ডিত হবে। সে মনে মনে ভাবল মোল্লা নাসীরুদ্দীনের ত নামডাক আছে পণ্ডিত হিসেবে, তার কাছেই যাওয়া যাক, যদি কিছু শেখা যায়।

অনেকখানি পথ পাহাড় ভেঙে উঠে সে খুঁজে পেল নাসীরুদ্দীনের বাসস্থান। ঢোকবার আগে জানালা দিয়ে দেখল মোল্লাসাহেব ঘরের এক কোনে ধুনুচির সামনে বসে নিজের দু'হাতের তেলো মুখের সামনে ধরে তাতে ফুঁ দিচ্ছে।

ঘরে ঢুকে বেকুব প্রথমেই হাতে ফুঁ দেওয়ার কারণ জিগ্যেস করল। 'ফুঁ দিয়ে হাত গরম করছিলাম', বলে নাসীরুদ্দীন চুপ করল। বেকুব ভাবল, একটা জিনিস ত জানা গেল, আর কিছু জানা যাবে কি?

কিছুক্ষণ পরে নাসীরুদ্দীনের গিন্নী দু'বাটি গরম দুধ এনে কর্তা আর অতিথির সামনে রাখলেন। নাসীরুদ্দীন তক্ষুনি দুধে ফুঁ দিতে শুরু করল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এবার বেকুব সম্ভ্রমের সঙ্গে শুধোলো, 'হে গুরু, এবারে ফুঁ দেবার কারণটা কী?'

'দুধ ঠান্ডা করা', বললে নাসীরুদ্দীন।

বেকুব বিদায় নিলেন। যে লোক বলে ফুঁ দিয়ে জিনিস গরমও হয়, আবার ঠান্ডাও হয়, তার কাছ থেকে জ্ঞানলাভের কোনো আশা আছে কি?

*

নাসীরুদ্দীনের গানবাজনা শেখার শখ হয়েছে। এক ধুরন্ধর সংগীত শিক্ষকের কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলে, 'আপনি বাদ্যযন্ত্র শেখাতে কত নেন?'

'প্রথম মাসে তিন রৌপ্যমুদ্রা, তারপর থেকে প্রতিমাসে এক রৌপ্যমুদ্রা।'

'বেশ, তাহলে দ্বিতীয় মাস থেকেই শুরু করব আমি,' বললে নাসীরুদ্দীন।

*

মোল্লা এখন কাজী, সে আদালতে বসে। একদিন এক বুড়ী তার কাছে এসে বলল, 'আমি বড়ই গরীব। আমার ছেলেকে নিয়ে বড় ফ্যাসাদে পড়েছি কাজীসাহেব। সে মুঠো মুঠো চিনি খায়, তাকে আর চিনি জুগিয়ে কুল পাচ্ছি না। আপনি হুকুম দিয়ে তার চিনি খাওয়া বন্ধ করুন। সে আমার কথা শোনে না।'

মোল্লা একটু ভেবে বললে, 'ব্যাপারটা অত সহজ নয়। এক হপ্তা পরে এসো, আমি একটু বিবেচনা করে তারপর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবো।'

বুড়ী হুকুমমত এক হপ্তা পরে আবার এসে হাজির!

মোল্লা তাকে দেখে মাথা নাড়লেন—'এ বড় জটিল মামলা। আরো এক হপ্তা সময় দিতে হবে আমাকে।'

আরো সাত দিন পরেও সেই একই কথা। অবশেষে ঠিক এক মাস পরে মোল্লা বুড়ীকে বললে, 'কই, ডাকো তোমার ছেলেকে।'

ছেলেটি আসতেই মোল্লা তাকে হুঙ্কার দিয়ে বললে, 'দিনে আধ ছটাকের বেশি চিনি খাওয়া চলবে না। যাও।'

বুড়ী মোল্লাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'একটা কথা জিগ্যেস করার ছিল, কাজীসাহেব।'

'বলো।'

'এই নিয়ে চারবার ডাকলেন কেন আমাকে? এর অনেক আগেই ত আপনি এ হুকুম দিতে পারতেন।'

'তোমার ছেলেকে হুকুম দেবার আগে আমার নিজের চিনি খাওয়ার অভ্যেসটা কমাতে হবে ত!' বললে নাসীরুদ্দীন।

*

রাস্তার কয়েকটি ছোকরা ফন্দি করেছে তারা মোল্লাসাহেবের চটি জোড়া হাত করবে। একটা লম্বা গাছের দিকে দেখিয়ে তারা মোল্লাসাহেবকে বললে, 'ওই যে গাছ দেখছেন, ওটা চড়ার সাধ্যি কারুর নেই।'

'আমার আছে', বলে মোল্লাসাহেব চটিজোড়া পা থেকে খুলে নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজে গাছটায় চড়তে শুরু করলেন।

বেগতিক দেখে ছেলেরা চেঁচিয়ে বলল, 'ও মোল্লাসাহেব, ওই গাছে আপনার চটিজোড়া কোনো কাজে লাগবে কি?'

মোল্লাসাহেব গাছের উপর থেকে জবাব দিলেন, 'গাছের মাথায় যে রাস্তা নেই তা কে বলতে পারে ভাই?'

*

এক পড়শী এসেছে নাসীরুদ্দীনের কাছে এক আর্জি নিয়ে।

'মোল্লাসাহেব, আপনার গাধাটা যদি কিছুদিনের জন্য ধার দেন ত বড় উপকার হয়।'

'মাপ করবেন', বললে নাসীরুদ্দীন, 'ওটা আরেকজনকে ধার দিয়েছি।'

কথাটা বলামাত্র বাড়ির পিছন থেকে গাধা ডেকে উঠে তার অস্তিত্ব জানান দিয়ে দিল।

'সে কি মোল্লাসাহেব, ওটা আপনারই গাধার ডাক শুনলাম না?'

নাসীরুদ্দীন মহারাগে লোকটার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিতে দিতে বললে, 'আমার কথার চেয়ে আমার গাধার ডাককে যে বেশি বিশ্বাস করে, তাকে কোনোমতেই গাধা ধার দেওয়া চলে না।'

*

নাসীরুদ্দীন বাজারে গিয়ে এক নিলামদারের হাতে তার গাধাটিকে তুলে দিল। সেটাকে দিয়ে আর কাজ চলে না, তাই একটা নতুন গাধা কেনা দরকার।

আর পাঁচ রকম জিনিস পাচার হয়ে যাবার পর গাধা যখন নিলামে উঠল, নাসীরুদ্দীন তখন কাছাকাছির মধ্যেই রয়েছে। নিলামদার হাঁক দিল, 'এবার দেখুন এই অসামান্য, অতুলনীয় গাধা। পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা কে দেবেন এর জন্য? মাত্র পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা!'

এক চাষা হাত তুলল। দর এত কম দেখে মোল্লাসাহেব নিজেই হেঁকে বললেন, 'ছয় স্বর্ণমুদ্রা।'

ওদিকে অন্য লোকেও ডাকতে শুরু করেছে, আর নিলামদারও গাধার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দর যত বাড়ে ততই বাড়ে দামের ফিরিস্তি।

চাষা ও মোল্লাসাহেবের মধ্যে ডাকাডাকিতে গাধার দাম চড়ে চল্লিশ স্বর্ণমুদ্রায় পৌঁছে শেষটায় মোল্লাসাহেবেরই জিত হল। গাধার আসল দাম ছিল বিশ স্বর্ণমুদ্রা, অর্থাৎ লোকসান হল দ্বিগুণ।

কিন্তু তাতে আপশোষের কী? 'যে গাধার এত গুণ', বললে মোল্লাসাহেব, 'তার জন্য চল্লিশ স্বর্ণমুদ্রা ত জলের দর!'

*

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাসীরুদ্দীন মওকা বুঝে একজনের সবজির বাগানে গিয়ে হাতের সামনে যা পায় থলেতে ভরতে শুরু করেছে।

এদিকে মালিক এসে পড়েছেন। কাণ্ড দেখে তিনি হন্তদন্ত নাসীরুদ্দীনের দিকে ছুটে এসে বললেন, 'ব্যাপারটা কী?'

নাসীরুদ্দীন বললে, 'ঝড়ে উড়িয়ে এনে ফেলেছে আমায় এখানে।'

'আর ক্ষেতের সবজিগুলোকে উপড়ে ফেলল কে?'

'ওড়ার পথে ওগুলোকে খামচে ধরে তবে ত রক্ষা পেলাম।'

'আর সবজিগুলো থলের মধ্যে গেল কী করে?'

'সেই প্রশ্নই ত আমাকেও চিন্তায় ফেলেছিল, এমন সময় আপনি এসে পড়লেন।'

*

মোল্লাগিন্নী মাঝরাত্তিরে নাসীরুদ্দীনের ঘুম ভাঙিয়ে বললেন, ব্যাপার কী? চশমা পরে ঘুমোচ্ছ কেন?'

মোল্লা নতুন চশমা নিয়েছে। খাপ্পা হয়ে বললে, 'চোখে চালশে পড়েছে, চশমা ছাড়া স্বপ্ন দেখবো কী করে?'

*

থলেতে এক ঝুড়ি ডিম লুকিয়ে নিয়ে নাসীরুদ্দীন চলেছে ভিনদেশে। সীমানায় পৌঁছতে শুল্ক বিভাগের লোক তাকে ধরল। নাসীরুদ্দীন জানে ডিম চালান নিষিদ্ধ।

'মিথ্যে বললে মৃত্যুদণ্ড', বলল শুল্ক বিভাগের লোক। 'তোমার থলিতে কী আছে বল।'

'প্রথম অবস্থার কিছু মুরগী,' বললে মোল্লাসাহেব।

'হুম্—সমস্যার কথা। মুরগী চালান নিষিদ্ধ কিনা খোঁজ নিতে হবে, তারপর ব্যাপারটার মীমাংসা হবে। ততদিন এ থলি রইল আমাদের জিম্মায়। ভয় নেই, তোমার মুরগীকে উপোশ রাখব না আমরা।'

'কিন্তু আমার মুরগীর জাত যে একটু আলাদা', বললে নাসীরুদ্দীন।

'কিরকম?'

'আপনারা ত শুনেছেন অবহেলার দরুন মুরগীর অকাল বার্ধক্য আসে।'

'তা শুনেছি বটে।'

'আমার মুরগীকে ফেলে রাখলে সেগুলো অকালে শিশু হয়ে যায়!'

'শিশু মানে?'

'একেবারে শিশু', বললে নাসীরুদ্দীন, 'যাকে বলে ডিম।'

*

মোল্লা মসজিদে গিয়ে বসেছে, তার জোব্বাটা কিঞ্চিৎ খাটো দেখে তার পিছনের লোক সেটাকে টেনে খানিকটা নামিয়ে দিল। মোল্লাও তৎক্ষণাৎ তার সামনের লোকের জোব্বাটা ধরে নিচের দিকে দিলেন এক টান। তাতে লোকটি পিছন ফিরে চোখ রাঙিয়ে বললে, 'এটা কী হচ্ছে?'

মোল্লা বললে, 'এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে আমার পিছনের লোক।'

*

কারো মৃত্যু হলে শোক জানানোর জন্য কালো পোষাক পরে মোল্লার দেশের লোকেরা। মোল্লাকে সেই পোষাকে হাঁটতে দেখে একজন জিগ্যেস করল, 'কেউ মরল নাকি, মোল্লাসাহেব?'

'সাবধানের মার নেই', বললে মোল্লাসাহেব, 'কোথায় কখন কে মরছে তা কি কেউ বলতে পারে?'

*

নাসীরুদ্দীন একবার ভারতবর্ষে এসে এক সাধুর দেখা পেয়ে ভাবল, আমার মত জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তির পক্ষে সাধুর সাক্ষাৎ পাওয়া পরম সৌভাগ্য। এঁর সঙ্গে আলাপ না করলেই নয়।'

তাঁকে জিজ্ঞেস করতে সাধু বললেন তিনি একজন যোগী। 'ঈশ্বরের সৃষ্ট যত প্রাণী আছে সকলের সেবাই তাঁর ধর্ম।

নাসীরুদ্দীন বলল, 'ঈশ্বরের সৃষ্ট একটি মৎস্য একবার আমাকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছিল।'

একথা শুনে যোগী আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন, 'আমি এত দীর্ঘকাল প্রাণীর সেবা করেও তাদের এত অন্তরঙ্গ হতে পারিনি। একটি মৎস্য আপনার প্রাণরক্ষা করেছে শুনে এই দেখুন আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন না ত কে থাকবে?'

নাসীরুদ্দীন যোগীর সঙ্গে থেকে তাঁর কাছ থেকে যোগের নানারকম কসরৎ শিক্ষা করল। শেষে একদিন যোগী বললেন, 'আর ধৈর্য রাখা সম্ভব নয়। অনুগ্রহ করে যদি সেই মৎসের উপাখ্যানটি শোনান!'

'একান্তই শুনবেন?'

'হে গুরু।' বললেন যোগী, 'শোনার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।'

'তবে শুনুন', বললে নাসীরুদ্দীন, 'একবার খাদ্যাভাবে প্রাণ যায় যায় অবস্থায় আমার বাড়ীতে একটি মাছ ওঠে। আমি সেটা ভেজে খাই।

*

নাসীরুদ্দীন লেখাপড়া বেশি জানত না ঠিকই, কিন্তু তাঁর গাঁয়ে এমন অনেক লোক ছিল যাদের বিদ্যে তার চেয়েও অনেক কম। তাদেরই একজন নাসীরুদ্দীনকে দিয়ে নিজের ভাইকে একটা চিঠি লেখাল। লেখা শেষ হলে পর সে বলল, 'মোল্লা-সাহেব কী লিখলেন একবারটি পড়ে দেন, যদি কিছু বাদটাদ পড়ে গিয়ে থাকে।'

নাসীরুদ্দীন 'প্রিয় ভাই আমার' পর্যন্ত পড়ে ঠেকে গিয়ে বলল, 'পরের কথাটা 'বাক্স' না 'সরম' না 'ছাগল' সেটা ঠিক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বোঝা যাচ্ছে না।

'সে কি মোল্লাসাহেব, আপনার লেখা চিঠি আপনিই পড়তে পারেন না ত অপরে পড়বে কী করে?'

'সেটা আমি কী জানি? বললে নাসীরুদ্দীন। 'আমায় লিখতে বললে আমি লিখলাম। পড়াটাও কি আমার কাজ নাকি?'

লোকটা কিছুক্ষণ ভেবে মাথা নেড়ে বলল, 'তা ঠিকই বললেন বটে। তাছাড়া, এ চিঠি ত আর আপনাকে লেখা নয়। কাজেই আপনি পড়তে না পারলে আর ক্ষতি কী?'

'হক্ কথা, বললে নাসীরুদ্দীন।

*

নাসীরুদ্দীন বাড়ির ছাতে কাজ করছে, এমন সময় এক ভিখিরি রাস্তা থেকে হাঁক দিল, 'মোল্লাসাহেব, একবারটি নিচে আসবেন!'

নাসীরুদ্দীন ছাত থেকে রাস্তায় নেমে এলেন। ভিখিরি বলল, 'দুটি ভিক্ষে দেবেন মোল্লাসাহেব?'

'তুমি এই কথাটা বলার জন্য আমার ছাত থেকে নামালে?'

ভিখিরি কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'মাপ করবেন মোল্লাসাহেব, —গলা ছেড়ে ভিক্ষে চাইতে শরম লাগে।'

'হুঁ...তা তুমি ছাতে এসো আমার সঙ্গে।'

ভিখিরি তিনতলার সিঁড়ি ভেঙে ছাতে ওঠার পর নাসীরুদ্দীন বললে, 'তুমি এসো হে, ভিক্ষেটিক্ষে হবে না।'

*

মোল্লা এক ছোকরাকে মাটির কলসী দিয়ে পাঠালে কুয়ো থেকে জল তুলে আনতে। 'দেখিস্, কলসীটা ভাঙিসনি যেন', বলে একটা থাপ্পড় মারলে ছোকরার গালে।

এক পথচারী ব্যাপারটা দেখে বললে, 'কলসী না ভাঙতেই চড়টা মারলেন কেন মোল্লাসাহেব?'

'তোমার যা বুদ্ধি,' বললে নাসীরুদ্দীন, 'ভাঙার পরে চড় মারলে কি আর কলসী জোড়া লেগে যাবে?'

*

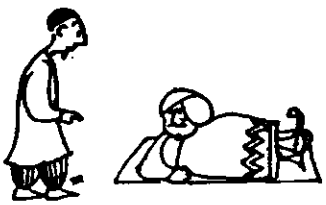

এক চোর নাসীরুদ্দীনের বাড়িতে ঢুকে তার প্রায় সর্বস্ব চুরি করে রওনা দিল নিজের বাড়ির দিকে।

নাসীরুদ্দীন রাস্তা থেকে সব দেখে একটি কম্বল কাঁধে নিয়ে চোরের পিছু ধাওয়া করে তার বাড়িতে ঢুকে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল মেঝেতে।

'কে হে তুমি?' চোর জিগ্যেস করলে, 'আমার বাড়িতে কেন?'

'আমার জিনিস যখন সবই এখানে,' বললে নাসীরুদ্দীন, 'এখন থেকে এটাই আমার বাড়ি নয় কি?'

*

নাসীরুদ্দীন রাজাকে একটা সুখবর দেবে। তাই অনেক কসরৎ করে রাজসভায় গিয়ে হাজির হয়েছে। রাজা খবর শুনে খুশি হয়ে বললেন, 'কী বকশিশ চাও বল।'

'পঞ্চাশ ঘা চাবুক', বলল নাসীরুদ্দীন।

রাজা অবাক, তবে নাসীরুদ্দীন যে মসকরা করছে না সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা যায়। হুকুম হল পঞ্চাশ ঘা চাবুকের।

পঁচিশ ঘায়ের পর নাসীরুদ্দীন বললে, 'থামো!'

চাবুক থামল। 'বাকি পঁচিশ ঘা পাবে আমার অংশীদার।' বললে নাসীরুদ্দীন। 'রাজপেয়াদা আমার সঙ্গে কড়ার করেছিল সুখবর পেয়ে রাজা বকশিশ দিলে তার অর্ধেক তাকে দিতে হবে।'

*

নাসীরুদ্দীন এক আমীরের বাড়ি গেছে দুর্ভিক্ষের চাঁদা তুলতে। দারোয়ানকে বললে, 'তোমার মনিবকে গিয়ে বল মোল্লাসাহেব চাঁদা নিতে এসেছেন।'

দারোয়ান ভিতরে গিয়ে মিনিট খানেক পরে ফিরে এসে বললে, 'আজ্ঞে, মনিব একটু বাইরে গেছেন।'

'তাহলে তোমায় একটা কথা বলে যাই,' বললে নাসীরুদ্দীন, 'তোমার মনিব এলে তাঁকে বোল যে বেরোবার সময় তাঁর মুণ্ডুটা যেন জানালার ধারে রেখে না যান। কখন চোর আসে বলা কি যায়!'

*

সুসংবাদ দিলে বকশিশ পায় জেনে একজন লোক নাসীরুদ্দীনকে গিয়ে বললে, 'তোমার জন্য খুব ভালো খবর আছে, মোল্লাসাহেব।'

'কী খবর?'

'তোমার পাশের বাড়িতে পোলাও রান্না হচ্ছে।'

'তাতে আমার কী?'

'তোমাকে সে পোলাওয়ের ভাগ দেবে বলছে।'

'তাতে তোমার কী?'

*

নাসীরুদ্দীন বার তার গিন্নী একদিন বাড়ি ফিরে এসে দেখে চোর এসে বাড়ি তছনছ করে দিয়ে গেছে। গিন্নী ত রেগে আগুন। বললে, 'এ তোমার দোষ। সদর দরজায় তালা দাওনি তাই এই দশা।'

পড়শীরাও সেই একই সুর ধরলে। একজন বললে, 'জানলাগুলোও ত ভালো করে বন্ধ করনি দেখছি।'

আরেকজন বললে, 'চোর আসতে পারে সেটা আগেই বোঝা উচিত ছিল।'

আরেকজন বললে, 'দরজার তালাগুলোও পরীক্ষা করে দেখা উচিত ছিল।'

www.BanglaBook.org

'কী আপদ!' বললে নাসীরুদ্দীন, 'তোমরা দেখছি শুধু আমার পেছনেই লাগতে শুরু করলে।'

'দোষ ত তোমারই মোল্লাসাহেব,' পড়শীরা বললে।

'বটে?' বললে নাসীরুদ্দীন, 'আর চোরের বুঝি দোষ নেই?'

*

নাসীরুদ্দীনের ভারী শখ একটা নতুন জোব্বা বানাবে, তাই পয়সা জমিয়ে দরজির দোকানে গেল ফরমাস দিতে। দরজি মাপ নিয়ে বললেন, 'আল্লা করেন ত এক হপ্তায় আপনি জোব্বা পেয়ে যাবেন।'

নাসীরুদ্দীন এক সপ্তাহ কোনরকমে ধৈর্য ধরে তারপর আবার গেল দরজির দোকানে।

'একটু অসুবিধা ছিল মোল্লাসাহেব,' বললে দরজি, 'আল্লা করেন ত কাল আপনি অবশ্যই জোব্বা পেয়ে যাবেন।'

পরদিন গিয়েও হতাশ। 'মাপ করবেন মোল্লাসাহেব,' বললে দরজি, 'আর একটি দিন আমাকে সময় দিন। আল্লা করেন ত কাল সকালে নিশ্চয় রেডি পাবেন আপনার জোব্বা।'

নাসীরুদ্দীন এবার ভারী বিরক্ত হয়ে বলল, 'আল্লা না করে তুমি করলে জোব্বাটা কবে পাব সেটা জানতে পারি কি?'

*

এক প্রবীণ দার্শনিক সরাইখানায় বসে বিলাপ করছেন, 'বিচিত্র জীব এই মানুষ। কোনো কিছুতেই তৃপ্তি নেই। শীতকালে বলে ঠাণ্ডায় ম'লাম, গ্রীষ্মে বলে গরমে প্রাণ আইঢাই।'

সবাই তার কথায় সায় দিয়ে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

'বসন্তের বিরুদ্ধে যার নালিশ আছে সে হাত তোল,' বললে নাসীরুদ্দীন।

*

এক চাষা নাসীরুদ্দীনের কাছে এসে বলল, 'বাড়িতে চিঠি দিতে হবে মোল্লাসাহেব। মেহেরবানি করে আপনি যদি লিখে দেন।'

নাসীরুদ্দীন মাথা নাড়ল। 'সে হবে না।'

'কেন মোল্লাসাহেব?'

'আমার পায়ে জখম।'

'তাতে কী হল মোল্লাসাহেব?' চাষা অবাক হয়ে বলল। 'পায়ের সঙ্গে চিঠির কী?'

নাসীরুদ্দীন বললে, 'আমার হাতের লেখা কেউ পড়তে পারে না। তাই চিঠির সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে সে চিঠি পড়ে দিতে। জখম পায়ে সেটা হবে কি করে শুনি?'

*

নাসীরুদ্দীন এক পড়শীর কাছে গিয়ে হাত পাতলে—'এক গরীব তার দেনা শোধ করতে পারছে না। তার সাহায্যে যদি কিছু দ্যান।'

পড়শীর মনটা দরাজ, সে খুশি হয়ে তার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বললে, 'আহা, বেচারী! এই ঋণগ্রস্ত অভাগাটি কে, মোল্লাসাহেব?'

'আমি', বলে নাসীরুদ্দীন হাওয়া।

কিছুদিন পরে নাসীরুদ্দীন আবার সেই পড়শীর কাছে এসে হাত পেতেছে। পড়শী একবার ঠকে সেয়ানা হয়ে গেছে। বললে, 'বুঝেছি। দেনাদারটি এবারও তুমিই ত?'

'আজ্ঞে না। বিশ্বাস করুন। এবার সত্যিই আমি না।'

পড়শীর আবার মন ভিজল। নাসীরুদ্দীনের হাতে টাকা দিয়ে বললে, 'এবার কার দুঃখ দূর করতে যাচ্ছ মোল্লাসাহেব?'

'আজ্ঞে, আমার।'

'কিরকম?'

'আজ্ঞে এই অধম এবার পাওনাদার।'

*

সরাইখানায় ক'জন সৈনিকের আগমন হয়েছে। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের বীরত্বের বড়াই করছে।

একজন বললে, 'খোলা তলোয়ার হাতে এমন তেজের সঙ্গে ছুটলাম আমি দুষমনদের দিকে যে তারা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমায় রোখে কার সাধ্য!'

সবাই একথা শুনে সমস্বরে বাহবা দিলে। নাসীরুদ্দীনও এককালে যুদ্ধ করেছে। সে বললে, 'তোমার কথা শুনে আমার নিজের একটা যুদ্ধের ঘটনা মনে পড়ছে। এক শত্রুর পা কেটে ফেলেছিলাম তলোয়ারের এক কোপে।'

তাই শুনে এক প্রবীণ যোদ্ধা বললে, 'তুমি ভুল করলে কেন—কাটা উচিত ছিল মুণ্ডুটা।'

'মুণ্ডু না থাকলে আর মুণ্ডু কাটব কোত্থেকে?' বললে নাসীরুদ্দীন।

*

নাসীরুদ্দীন নদীর ধারে বসে আছে, এমন সময় দেখে ন'জন অন্ধ নদী পেরোবার তোড়জোড় করছে।

নাসীরুদ্দীন তাদের কাছে প্রস্তাব করলে যে জনপিছু এক পয়সা করে নিয়ে সে ন'জনকে পর পর কাঁধে করে পার করে দেবে। অন্ধরা রাজী হয়ে গেল।

নাসীরুদ্দীন আটজনকে ঘাড়ে করে ন' নম্বরের বেলায় মাঝ-নদীতে হোঁচট খেতে পিঠের অন্ধ জলে তলিয়ে গেল।

বাকি আটজন দেরি দেখে আঁচ করলে কোনো অঘটন ঘটেছে। 'কী হল মোল্লাসাহেব?' তারা ওপার থেকে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলে।

'এক পয়সা বাঁচল তোমাদের,' বললে নাসীরুদ্দীন।

*

১৩৮৪/৮৫

www.BanglaBook.org

দ্বিজেন্দ্রলাল

রবীন্দ্রলাল রায়

কী ভীষণ মারামারি! একদিকে এক আঠারো-উনিশ বছরের বাঙালী যুবক আর একদিকে একদল ফিরিঙ্গি যুবক। প্রায় আশি বছর আগেকার কথা বলছি যখন সাহেবের নামে মানুষ কাঁপত, সে খাস বিলাতি সাহেবই হোক আর ফিরিঙ্গিই হোক। ব্যাপারটা খুলে বলি। গড়ের মাঠ, মিউজিয়মের প্রাসাদ, আর তার আশপাশের জমি ঘিরে মস্ত এক প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। এ-দেশের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহিলা এসেছেন ওই প্রদর্শনী দেখতে ; সঙ্গে কোনো পুরুষ অভিভাবক নেই। কয়েকজন অভদ্র ফিরিঙ্গি যুবক তাঁদের পিছনে লেগেছে, নানারকম কুৎসিত ঠাট্টাবিদ্রূপ করছে। মহিলারা কিছু বলতে পারছেন না, ভয়ে আর লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে পড়েছেন। প্রদর্শনীতে উপস্থিত অনেকে এ ব্যাপার লক্ষ করছেন, কিন্তু সাহেবদের ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারছেন না। হঠাৎ একটি বাঙালী যুবক খেপে উঠে ফিরিঙ্গিদের প্রহারে উদ্যত হলেন। ফিরিঙ্গিরা তাকে গালাগালি দিতে লাগল আর প্রস্তুত হল মারামারির জন্য। বাঙালী যুবকটিকে শাসিয়ে তারা বাইরে আসতে বলল।

যুবকটি মহিলা কজনকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে প্রদর্শনীর বাইরে এসে দেখেন ফিরিঙ্গিরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। দলে তারা তখন আরো ভারী। সাত-আটজন ফিরিঙ্গির সঙ্গে যুবক একাই শুরু করলেন লড়াই। তাঁর প্রথম ঘুষিতে ওদের দলপতি ঘায়েল হল—নাক দিয়ে তার দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল। ওরা সকলে মিলে শুরু করল ঐ যুবটিকে প্রহার করতে। যুবক প্রাণপণে লড়তে লাগলেন—সমস্ত শরীর তাঁর রক্তাক্ত, সমস্ত কাপড়জামা গেছে ছিঁড়ে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। যুবকের অসীম সাহস দেখে বহু বাঙালী যুবক সাহস পেয়ে ফিরিঙ্গিদের আক্রমণ করলে। ফিরিঙ্গিরা তখন রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল। যুবকটি যখন আধমরা অবস্থায় বাড়ি ফিরছিলেন তখন দেখলেন সেই ফিরিঙ্গির দল দূরে দাঁড়িয়ে, তাদের দলপতি তাঁকে ইশারা করে ডাকছে। মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও যুবকটি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে এগিয়ে গেলেন। ওরা কিন্তু এবার লড়াই করল না। নিজেদের ব্যবহারের জন্য লজ্জা প্রকাশ করে ক্ষমা চাইল এবং যুবকের সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রস্থান করল।

এই অসামান্য সাহসী যুবক হলেন বাংলার অমর কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যিনি লড়াই করে গেছেন পরাধীনতার বিরুদ্ধে।

কবি ছিলেন তিনি, ছিলেন সংগীতরচয়িতা, ছিলেন নাট্যকার। তাঁর কলমের মুখে কখনো বার হয়েছে আগুন, কখনো দেশের দুঃখে ঝরে পড়েছে অশ্রু। দেশ যাতে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়, দেশ যাতে বড় হয়, দেশের মানুষ যাতে সত্যিকার মানুষ নামের যোগ্য হয়—তারই সাধনা তিনি করেছেন যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন। আমাদের দেশ আজ স্বাধীন। সারা ভারতবর্ষ প্রাণপণ করেছে এই মুক্তিযুদ্ধে। কিন্তু এ কথা কে না জানে যে সেই মুক্তিসংগ্রামের দিনে সকলের পুরোভাগে ছিল আমাদের এই বাংলা দেশ। এদেশের কত সন্তান আত্মাহুতি দিয়েছে সে সংগ্রামে! যাঁরা তাদের উদ্দীপনা জুগিয়েছেন—যারা দেশকে জাগিয়েছেন—দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদেরই একজন। সে একদিন—সমস্ত দেশ তখন দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানে উদ্‌বুদ্ধ—'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা', 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ', 'ভারত আমার ভারত আমার', 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ', 'আবার তোরা মানুষ হ' প্রভৃতি স্বদেশী গানে দেশবাসীর বুকে দেশপ্রেমের জোয়ার বইয়ে দিচ্ছে। আবার ওদিকে রঙ্গমঞ্চে তাঁর 'মেবার পতন', 'রাণা প্রতাপ সিংহ' প্রভৃতি দেশাত্মবোধক নাটকে দেশের সমস্ত সন্তানের মনকে আলোড়িত করে তুলেছে—স্বাধীনতার আস্বাদ পাওয়ার জন্য সকলে একান্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। আজকের স্বাধীন ভারতের অধিবাসী হিসাবে সেদিনগুলি নিশ্চয়ই আমরা ভুলব না।

যে সব বাবা-মা তাঁদের সন্তানের সত্যিকারের ভালো চান তাঁরা তাঁদের সন্তানের ত্রুটি অন্যায় সংশোধন করবার জন্য তাকে ভর্ৎসনা করেন—তাকে প্রাণ ভরে ভালবাসা সত্ত্বেও! দ্বিজেন্দ্রলালও তাই যেখানে অন্যায় বা ত্রুটি দেখেছেন নিজের দেশের সন্তানের মাঝে, সেখানে তিনি তাঁর কলমের মুখে ভর্ৎসনা করেছেন—নানাভাবে, কখনও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, কখনও কঠিন বাক্য প্রয়োগ করে গানে, তাঁর নাটকে। দ্বিজেন্দ্রলালকে অনেকে হাসির গানের কবি বলে প্রাধান্য দেন। এ কথা সত্যি, হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রলালের জুড়ি নেই এদেশে। হাসির গানে কখনো তিনি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছেন দেশের সন্তানদের—সে তাঁরা বিলেতফেরত সাহেব-ভাবাপন্ন বাঙালীই হোন, কিংবা এদেশের গোঁড়া হিন্দুই হোন। কিংবা দুটোর মাঝামাঝি খিচুড়ি—'রিফর্মড' হিন্দুই হোন। ভণ্ডামি ন্যাকামি সহ্য করেননি কখনো।

শুধু হাসির গান—নিছক হাসির গান, যেমন 'বুড়োবুড়ি দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকত', অনেক লিখেছেন, যেগুলি পড়ে লোকে হাসিতে ফেটে পড়েছে। তবে এসব তার প্রথম দিকের লেখা। পরে লিখেছেন কাব্য, নাট্যকাব্য, নাটক, বহু প্রকারের সঙ্গীত, প্রবন্ধ। দেশকে তিনি ভালবাসতেন সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে—দেশের মানুষকেও ; কিন্তু তার চেয়েও তিনি ভালবাসতেন মানুষের মনুষ্যত্বকে। তাই শেষ জীবনে গেয়েছেন—'আবার তোরা মানুষ হ'। এই মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন তিনি সারা

www.BanglaBook.org

জীবন যাতে বিশ্বের সমস্ত ভাইয়ে ভাইয়ে একদিন এক হয়ে যেতে পারে।

দ্বিজেন্দ্রলালের যেমন সাহস, দৃঢ়তা আর তেজের অন্ত ছিল না তেমনি অন্ত ছিল না তাঁর হৃদয়ে বন্ধুপ্রীতি, সন্তান-স্নেহ, শিশুপ্রীতি। তাঁর বাড়ির সামনে যে প্রকাণ্ড জমি পড়ে ছিল তা কেনবার জন্য বহু লোক এসে অনুরোধ করেছে। অর্থ-লাভের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তিনি তা বিক্রি করেননি শুধু এই কারণে যে পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েরা ঐ খোলা জমিটুকুতে এসে বিকেলে খেলা করত।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা, স্বদেশপ্রীতি, সংগীত, দক্ষতা সব-কিছুর প্রেরণা পান তাঁর পিতৃদেব স্বনামধন্য নদীয়া-মহারাজের দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কাছ থেকে। দেওয়ানজি ছিলেন সচ্চরিত্র, তেজস্বী, সত্যপ্রাণ, সুরসিক, সুকণ্ঠ, দেশ-প্রেমিক। তাছাড়া বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, ভূদেবচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, সঞ্জীবচন্দ্র প্রভৃতি ছিলেন তাঁর পিতার বন্ধু-স্থানীয়। তাঁরা প্রায়ই আসতেন ওঁদের বাড়ি। তাঁদের দ্বারাও দ্বিজেন্দ্রলাল কম প্রভাবান্বিত হননি।

একটা গল্প শোনা যায়। একদিন আকাশে খুব মেঘ করে এসেছে—ঝড়জল আসন্ন। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন বালকমাত্র। তিনি বাড়ির সমস্ত চাকরদের ডেকে এনে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে, তাদের সামনে অতি ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে চলেছেনঃ 'আকাশে মেঘ করিয়াছে, এখনি ঝড় উঠিবে, বৃষ্টি আসিবে—তোমরা সাবধান হও'—ইত্যাদি। বিদ্যাসাগর মশাই তখন দেওয়ান-জির কাছে আসছিলেন, তিনি এই বক্তৃতা শুনে এসে দেওয়ান-জিকে নাকি বলেছিলেন, 'দেওয়ানজি, আপনার এ ছেলে ভবিষ্যতে মস্ত বড় মানুষ হবে।' তাঁর কথা সত্য হয়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগর শহরে আর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে তারিখে। মাত্র কয়েকটি বৎসর রইলেন তিনি এ সংসারে। তারপর সমস্ত দেশবাসীকে কাঁদিয়ে, প্রাণপ্রিয় দুটি পুত্রকন্যা দিলীপকুমার আর মায়াময়ীকে রেখে চলে গেলেন জীবনের পরপারে। এই ক' বছরের জীবনও কম ঘটনাবহুল ছিল না—দুঃখ পেয়েছেন, কষ্ট পেয়েছেন হয়ত অনেক, কিন্তু দেশ পেয়েছে তাঁর কাছে অমৃতের ধারা।

এম. এ. পাশ করে বিলাত গিয়েছেন কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য, সফলতা অর্জন করে ফিরে আসা সত্ত্বেও কৃষি বিভাগে বড় চাকরি মিলল না তখনকার গভর্নমেন্টের কর্তাদের সঙ্গে তেজস্বী ভাষায় কথা বলার জন্য। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি দেওয়া হল তাঁকে। চাকরি করার সময় সত্যনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ দ্বিজেন্দ্রের পদে পদে বিরোধ বাধতে লাগল। একবার তিনি দেশের চাষীদের খাজনাসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে স্বয়ং তৎকালীন লেফটান্যান্ট গভর্নরের সঙ্গে বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত আপীলে জজ তাঁর রায়ই বহাল রাখেন। লেফটান্যান্ট গভর্নর পরাজিত হয়ে তাঁর ক্ষতিসাধন করবার চেষ্টা করেন অন্যদিক দিয়ে, কিন্তু চাষীরা তাঁকে ডি. এল. রায়ের বদলে 'দয়াল রায়' নাম দেয়। গভর্নমেন্ট তাঁর তেজস্বিতা, দেশপ্রেম ভালো চোখে দেখতেন না বলে তাঁকে সমানে বদলি করে করে নাস্তানাবুদ করেছেন—দ্বিজেন্দ্রলাল কিছুতেই দমেননি।

বিলাতে থাকার সময় তাঁর পরমারাধ্য বাপ-মাকে হারিয়েছেন, তাঁর প্রিয়তমা পত্নী সুরবালাকেও হারিয়েছেন নিতান্ত অকালে। দেশ তাঁকে কম আঘাত দেয়নি—বিলাত থেকে ফিরে আসার পর তাঁকে জাতিচ্যুত করে 'একঘরে' করে। কিন্তু সব বেদনা, ব্যথা, দুঃখ, জ্বালা তাঁর গভীরে প্রবেশ করেনি। দেশকে তিনি দিয়ে গেছেন স্বাধীনতার মন্ত্র, বুকভরা ভালবাসা, আর নিজের বুক শেষ জীবনে ভরিয়ে তুলেছেন ঈশ্বরপ্রীতি দিয়ে—মায়ের নামে গেয়ে গেছেন কত গান। ভালবেসেছেন প্রকৃতিকে আর দেশকে, দেশের মানুষকে—আত্মীয়-পর সবাইকে—ভাল-বেসেছেন সবার উপরে ঈশ্বরকে। তিনি কবি—তাই তাঁর মন সব দুঃখ-ব্যথা-বেদনার ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছে। নাটক তাঁর বহু—সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, মেবার পতন, প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, নূর-জাহান ইত্যাদি ; কাব্যগ্রন্থ—আর্যগাথা, আলেখ্য, মন্দ্র প্রভৃতি। তাছাড়া কত নাট্যকাব্য, প্রহসন, প্রবন্ধ—যার থেকে ভবিষ্যতের বংশধরেরা হয়ত তাঁর কিছুটা পরিচয় পাবে।

এ বছর তাঁর জন্মশতবার্ষিকী—তাঁকে আমাদের সমস্ত অন্তরের ভক্তি নিবেদন করে প্রণাম জানাই। ১৩৭০

দুগ্যো-সদ্দার

শিবশঙ্কর মিত্র

'সদ্দার! বনটা যেন বড্ড "গরম" লাগছে!'

'রাখো তোমার "গরম"! কাটব ত ঝরার পাশের গোল-পাতা। চিলতে-পানা গোল ঝাড়, তাছাড়া লাও কোলের কাছেই! অত নরম-গরমের হিসেব কিসে!'

সদ্দারের চোটপাটি কথায় লজ্জা পেয়ে হোক বা বনের মাঝে বাক-বিতণ্ডার অনিচ্ছায় হোক, সবাই কাজে মন দেয়।

গল্প আর প্রত্যক্ষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুন্দরবনের বন-চাষীরা বনের গভীরে এলেই তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন সজাগ হয়ে ওঠে। চারিদিকে জীবনের সহজ স্পন্দন পেলেই ওদের মনও সায় দেয়,—না, তেমনি কিছু অঘটন ঘটবার আশঙ্কা নেই। বনের পাতার ছাতার নিচে ঝিরঝিরে বাতাসে বিচ্ছিন্ন পাতা ও ডগা একটু-আধটু দুলবে। হরিণের কিছু না কিছু সাড়া পাওয়া যাবে দূর থেকে। নতুন নতুন দু-একটা পাখির ডাকও শোনা যাবে। এক-আধটা সাপও দেখা যাবে এখানে ওখানে। এক-আধটা গোসাপও ওঠানামা করবে ছোট খালে ও ঝরায়। আর সর্বোপরি বানরের লাফালাফি ও কিচির-মিচির শান্ত বনের মূর্ত প্রতীক বলা যেতে পারে। এমনিধারা সুন্দরবনের সহজ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবহাওয়া ব্যাহত হলেই বনচারী আবাদী মানুষের মন সুতীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। অনুভূতি আসে—বন গরম। কেননা, সুন্দরবনের রাজার একবার আগমন হলে বনের সে অঞ্চলে যেন সব কিছু স্তব্ধ হয়ে যায়। নিঃশব্দ পদচারণে চুপিসারে এলেও তার আগমন বার্তা যেন কানে কানে পৌঁছে যায় সমস্ত জীব, পাখি ও গাছ-গাছড়ার কাছে। তা না হলে এমন হবে কেন!

তবু দুর্গা সর্দার কিছুই তোয়াক্কা করতে চায় না। দীর্ঘকায় সবল দেহ। নাম দুর্গা সর্দার! পেলব পলিমাটির মানুষ অমন দুর্দান্ত নামকে সহজ করে নিয়ে ডাকে 'দুগ্যো সন্দার'। কৃষ্ণ-বর্ণের মাংসপিণ্ডগুলি যেন ফুলে ফুলে উঠেছে তার দেহে। দেখলেই মনে হবে অসীম শক্তিধর। অমন বিশাল এবং তাগড়া দেহের মানুষেরা সাধারণত স্থবির হয়। কিন্তু সন্দার তার বিপরীত। কেমন করে সে যে অত চটপট হয়েছে, তা ভাবাই দায়।

তাহলেও সে কিন্তু দলের নেতা নয়। দলের নেতা কালি-পদ। দল বলতে তিনজন। তৃতীয় জন সবের আলি। এমনি ধরনের ছোট ছোট পঁচিশ ত্রিশটি দল এক একটি বড় ডিঙি নিয়ে একত্রে বহর বানিয়ে এসেছে সুন্দরবনের পশ্চিমাঞ্চলে হরি-ভূষণ-বনে। সবাই এসেছে গোল পাতা কাটতে। বনের কোনো কোনো নিচু ও নরম 'চাতারে', কখনও বা ঝরার পাড় ঘেঁষে গোলগাছের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। কোন কাণ্ড নেই বললেই চলে; সোজা মাটি থেকে ঝাঁক বেঁধে নারকোল গাছের মত সুদীর্ঘ পাতা ঊর্ধ্বে উঠে চারিদিকে নুইয়ে মাথা নিচু করে দেয় খানিকটা ফোটা ফুলের পাপড়ির মত। নারকোল গাছের পাতার মত দেখতে হলেও গোল পাতা কিন্তু তেমন করকরে নয়। পাতা, কাঠি ও ডগাও খুবই নরম পেলব ও মসৃণ। অমন কমনীয় হলে কি হবে, অত্যন্ত তেজী—আর কোনও গাছ ও গাছড়াকে ওর 'চাতারের' ত্রিসীমানায় হতে দেবে না কিছুতেই। একটানা বিস্তীর্ণ গোল ঝাড়ে ঘন সন্নিবিষ্ট সবুজের ওপর ঈষৎ লালাভ বিনম্র পাতাগুলি ঝিরঝির হাওয়ায় যখন দুলতে থাকে, তখন সুন্দরবনের সৌন্দর্য যেন ফেটে পড়ে।

সৌন্দর্য ফেটে পড়ে বটে, কিন্তু গোল-ঝাড় সুন্দরবনের বিভীষিকা। শিকারের জন্য নরখাদক গোল-ঝাড়ের আড়ালে ওত পাততে আসে না। আসে নিশ্চিন্তে বিশ্রামের জন্য। মাটি স্পর্শ না করে নরম ডগাগুলি চেপে তার ওপরে শুতে ওরা ভালোই বাসে। তার চেয়েও বড় কথা, এই ধরনের ঝাড়ে কারও পক্ষে বিনাশব্দে অনুপ্রবেশ করা দায়। ঝাড়ের গভীরে নিশ্চিন্তে যখন নরখাদক ঘুমোয় তখন দক্ষ শিকারীর পক্ষেও নিঃসাড়ে এগিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করা দুরূহ। দুরূহতর করবার জন্যই বোধহয় নরখাদক বিশ্রামের জন্য বিস্তৃত গোল-ঝাড়ই বেছে নেয়। একথা জানা ছিল বলেই দুগ্যো সন্দার চিলতে-পানা ঝাড় দেখে অমন বেপরোয়া কথাবার্তা বলছিল।

ভোর সকাল থেকেই তিনজনে কাজে লেগেছে। হু হু করে পাতা কেটে চলেছে। ভারি পুরুষ্টু ঝাড়! ভালো দাম পাবার আনন্দে ওরা মাতোয়ারা। এত লম্বা যে একটা করে পাতার চাপান দিলে বুঝি চাষী-বা ড়ির কুঁড়েঘরের ঘর ও বারান্দার ছাউনি একই সঙ্গে হয়ে যাবে।

গোলপাতা আহরণে জনের হিসাবে কমপক্ষে তিনজন লাগে। একজনে উবু হয়ে এক-একটা পাতার ডগা ধরে মাটির কাছা-কাছি কোপ মেরে কাটতে থাকে। তার হাত থেকে প্রায় লুফে নিয়ে দ্বিতীয়জন সঙ্গে সঙ্গে দা-এর সুতীক্ষ্ণ মাথাটা আল-গোছে ডগার মাঝে বসিয়ে একটানে গোটা ডগাটা দ্বিখণ্ডিত করে চিরে ফেলে। দ্বিখণ্ডিত হতে না হতে তৃতীয়জন পাশা-পাশি দুটি পাইলে দুটি খণ্ডকে সাজাতে থাকে।

তালে তালে যেন কাজ এগিয়ে চলেছে। তিনজনের হাতে তিনখানি পাতা-কাটা দা—মাথা বাঁকা ক্ষুরধার কাটারি। এমন ধার যে গোলের ডগা ছুঁতে না ছুঁতেই দ্বি-খণ্ড হয়ে যায়। এই মাথা-ভারি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র যখন হাতের মুঠোয় আঠার মত লেগে থাকে তখন বনচারীদের মনে হয়, এ যেন কোন অস্ত্র নয়, তাদের অঙ্গেরই অঙ্গ বুঝি। দুগ্যো সন্দারের ত কথাই নেই; তার দীর্ঘায়ত আঙুলের বজ্র বেষ্টনীতে পিষ্ট ওই অস্ত্রের হাতলে তার দেহের সর্বশক্তি চালনা করতে এতটুকুও আয়াস করতে হয় না। বন্দুক মনের জোর বাড়ায় বটে, কিন্তু তার অনেক হুজ্জুত—তাকে কাঁধে তুলতে হবে, তার ঘোড়া চাপতে হবে, নিরিখ করতে হবে, ট্রিগার টিপতে হবে—তবেই তার মারণ-অস্ত্র নির্গত হবে। কিন্তু গোলপাতা কাটার দা যখন হাতের মুঠোয় জমে থাকে, তখন মানুষের হাত যেমন আত্মরক্ষায় সহসা উদ্যত হয়, তেমনি এই অস্ত্রও হানবার জন্য অস্ত্রধারীর কোন চিন্তা-ভাবনার আবশ্যক হয় না।

দুগ্যো সন্দার পাতা-কাটার কাজে দ্বিতীয় জনের দায়িত্ব পালন করছে। বিরাট দেহখানা প্রায় সোজা রেখেই দাঁড়িয়ে পাতার ডগা বিদীর্ণ করে চলেছে তড়িৎ গতিতে ও একমনে। প্রথম জনের কাজের দায়িত্বে নেতা কালিপদ উবু হয়ে ঝাড়ের মধ্যে ডুবে গিয়ে পাতা কাটছে। দলের নেতারাই এই কাজের দায়িত্ব নেয়। এদেরই সবচেয়ে বিপদ। পেছনটা থাকে উঁচু হয়ে আর মাথা থাকে ঝোপের মধ্যে নামানো। এমন সুযোগ ছাড়বে কেন নরখাদক! ঝাপিয়ে পড়ে কোমরে দাঁত বসিয়ে সোজা মুখ তুলে একটানে নিয়ে চলে যায়। তৃতীয় জনের দায়িত্ব সবের আলির—একটু দূরে সে খণ্ডিত পাতাগুলি দু'-ভাগে পাইল করছে। ঠিকমত থাকে থাকে রাখবার জন্য ডগা-গুলি উঁচু নিচু করে নাড়াচাড়া করতেই হচ্ছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে, সে তার চারপাশে যেন অনবরত লাঠি ঘোরাচ্ছে।

যতই না একমনে কাজ করুক, শঙ্কা যে ওদের মনে ছিল না তা নয়। কিন্তু তা নিবিদ্ধ ছিল গোলঝাড়কে নিয়ে। ফাঁকেফুকে ওরা সেদিকেই নজর রাখে। দেখে, দূরে ঝাড়ের কোন পাতা অস্বাভাবিক ভাবে কেঁপে ওঠে কি না!

ঝাড় আজ ওদের বিপদ আনে না। দুগ্যো সন্দারের পেছনে ছিল একটু ফাঁকা 'চাতার'। সেই পথেই এল বিপদ।

এল দানবীয় হুঙ্কারে। নরখাদক উদ্যত থাবা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সন্দারের কাঁধ লক্ষ করে। দুর্দান্ত শক্তিধর থাবার আঘাতে আর তীক্ষ্ণ নখের দংশনে ধরাশায়ী করতে চায় তার শিকারকে।

সচকিত হয়ে দুগ্যো সন্দারের ঘাড় ফিরিয়ে দেখবার অব-কাশ হয় না। তার চোখের কোনে এক ঝলকে প্রতিবিম্বিত হয় শুধু বিস্ফারিত থাবার শ্বেতাভ বক্র নখগুলি আর রক্তাভ গহ্বরের সামনে হিংস্রতায় উজ্জ্বল দুটি বিশাল দাঁত। উড্ডীন নরখাদকের আর কোন কিছুই তার চোখে প্রতিবিম্বিত হয় না—না তার আক্রোশে উদ্বেলিত স্ফীতকায় দেহ, না তার উগ্রতায় অগ্নিসম চোখ, বা তার ঊর্ধ্বমুখী কম্পিত লেজ।

www.BanglaBook.org

দুগ্যো সন্দার আর দুগ্যো সন্দার নেই—নেহাতই হিংস্রতম জীবের লব্ধ শিকার। মৃত্যুর মুখগহ্বর থেকে বাঁচবার তাগিদেই মাথাটা ডান পাশে হেলিয়ে বাঁ হাতের কনুই উঁচু করেছে। গোলপাতা ধরে রাখতে হাতখানা ভাঁজ করা ছিল। ভাঁজ খুলে সটান হাতে শত্রুর রোখকে রুখবার অবকাশ হয়নি। বিপদকে আড়াল দিতে ভাঁজ করা কনুই উঁচু হয়েছে যেন আপনা থেকেই।

নরখাদকের থাবা পড়েছে বাঁ হাতের বাহুর ওপর। দৃঢ় মাংসপেশিগুলিতে যেন অতি সহজে বসে গেল থাবার বিস্ফারিত নখগুলি। তবু দাঁড়িয়েই ছিল শক্তিমান দুগ্যো সন্দার, বাঘকেও তেমনি দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে দু-পায়ের ভরে।

ঝাঁপিয়ে পড়ার বেগ স্তব্ধ হতেই নরখাদক তার বিস্ফারিত মুখ-ব্যাদানকে আরও বিস্ফারিত করে সন্দারের মাথাটাকে এক-কামড়ে ধরবার জন্যে গলা বাড়িয়েছে।

দুগ্যো সন্দার বুঝি আবার দুগ্যো সন্দার হয়ে ওঠে। ডান হাতের মুঠোতে ছিল পাতা-কাটা দা। অমন কাত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাতে সজোরে দা-এর আঘাত হানা দুরূহ ছিল, মুহূর্তের অবকাশও বোধ হয় তার জন্য ছিল না। আগুয়ান করাল মুখ-গহ্বরে দা-খানা ঢুকিয়ে দিয়েছে। আত্মরক্ষার সর্বশক্তি জড়ো করে সজোরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। লব্ধ শিকারের হাতখানাকে মুখের মধ্যে পেয়েছে ভেবে নরখাদক করকর করে কামড়ে গুঁড়িয়ে দিতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে দুগ্যো সন্দার প্রাণপণে দা-খানাকে মোচড় দিয়ে 'ঘুলিয়ে' দেয়। ক্ষত-বিক্ষত মুখগহ্বর। দিশাহারা হয়ে বাঘ আরও সজোরে কামড়ে ধরে ; সন্দারও তার শেষ অস্ত্র হাতছাড়া হবার ভয়ে প্রাণপণে হাতের মুঠোয় হাতল চেপে ধরেছে। যন্ত্রণা নিশ্চয় এবার অসহ্য। রক্তধারাও গাল বেয়ে ঝরতে আরম্ভ করেছে। বিদ্ধ নখাগ্রে সন্দারের বাহুর মাংস ছিঁড়ে নিয়ে যন্ত্রণাকাতর নরখাদক মাটিতে নেমে পড়ল আর সেই সঙ্গে বুঝি গোলপাতার ডগার চেয়েও নরম মাংসে বিদ্ধ দা-এর অগ্রভাগ গোটা জিঘাংসু জিহ্বা চিরে বেরিয়ে এল।

মাটিতে থাবা নামিয়েই নরখাদক মুখ নিচু করে মাটিতে প্রায় ঘষতে-ঘষতেই ছুটে গেল অনেকখানি। এমনভাবে সুন্দর-বনের হিংস্রতম জীবকে সরে পড়তে কেউই কখনও দেখেনি। তবু টানা ছুটে পালায় না। কিছুদূর এগিয়ে দুগ্যো সন্দারের দিকে তাকায় আর বারবার থাবাখানা মুখের ধারে এনেও স্পর্শ করতে যেন সাহস পায় না। সেও বুঝি কিংকর্তব্যবিমূঢ়!

দলের অন্য দুজন হকচকিয়ে এতক্ষণ জায়গায় দাঁড়িয়ে দা-এর আস্ফালন করে প্রাণপণে চিৎকার করছিল। চিৎকারে আশপাশের অন্যান্য দলগুলি একত্রে হৈ চৈ করে ছুটে এসেছে। দুগ্যো সন্দার রোখের মাথায় রক্তাক্ত দা-খানি উদ্যত করে তখনও দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ-হাতের নখ-দংশন থেকে তারও গা বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে।

বাঘ দূরে বসে হুঙ্কার দেবার চেষ্টা করছিল কিনা বোঝা যায় না। বিদীর্ণ জিহ্বায় সে-ক্ষমতা বোধ হয় লুপ্ত। ছিন্ন-মস্তার মত নিজের রক্ত নিজেই পান করতে করতে অবশেষে ছুটে পালাল।

* * *

দুগ্যো সন্দার আজও এই অভিজ্ঞতার কথা গল্প করে রাঙিয়ে রসিয়ে। কিন্তু প্রতিবারই গল্পের শেষে তার পাটাতনের মত বুকে হাত বোলাতে বোলাতে ভক্তের মত বলে,—'জানো! শেষমেশ বাঘ অমন জব্দ হল কেন? মা বনবিবি ওকে নিশ্চয় সেদিন ও তল্লাট ছেড়ে যেতে বলেছিলেন। মা-র কথা মানেনি, অমান্য করেছে। তাই ত অমন হল!'

ভক্তের মত দুগ্যো সন্দার অমন কথা বলে বটে, কিন্তু তার বনে যাবার বিরাম নেই। কত কাজে আর কত বার যে সে তারপর বনে এসেছে, তার ইয়ত্তা নেই—কখনও মাছ ধরতে, কখনও বা গোলপাতা কাটতে, কখনও বা মধু কাটতে। আর প্রতিবারই সে তার সযত্নে রক্ষিত সেই দা-খানা সঙ্গে নিতে ভুল করে না, কখনও না।

১৩৮০

www.BanglaBook.org

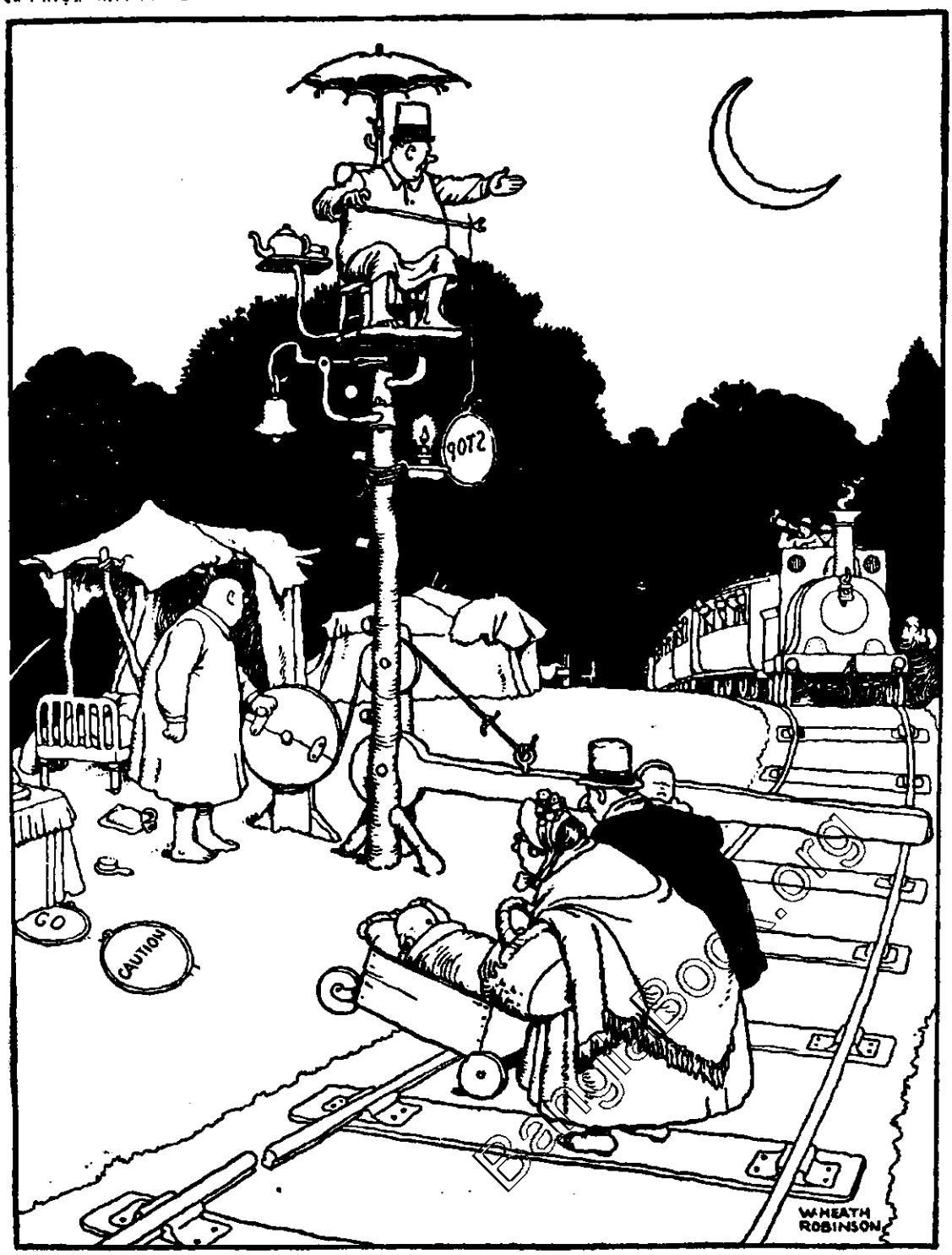

সিগন্যাল নেমে আসে. ট্রেন যায় থেমে,
রেল লাইন পার হন সাহেব আর মেমে।

www.BanglaBook.org

কাক

সুলতা সেনগুপ্ত

হুস্-হুস্-হুস্—এল কাক
ভোর না হতে ঝাঁকে ঝাঁক
নিল রুটি, ছুঁল চা
পালা পালা, যা যা—
সকাল থেকে কাক তাড়িয়ে মানুষরা হিমশিম্
কাক নিয়ে যায় বেগুনভাজা, ইলিশমাছের ডিম।
ওই ছড়াল চালে খুদ
করলো এঁটো খুকুর দুধ
কাক ঢুকেছে, জলের ঘড়া, তালের বড়া ঢাক
কাক—কাক—কাক
খোকনটাকে ডাক!
কাক ঠেঙাতে ছুটল খোকন পুরীর লাঠি হাতে
কাকের ভারী বয়েই গেল, ভয় কি পাবে তাতে?
'কক্ কক্—কা—কা'
খিদের সময় যা নিয়েছিস ঘরে গিয়ে খা,
নিস কেন তুই ঝাঁটার কাটি?
ছিঁড়িস কেন মাদুর পাটি?
ঢুকিস কেন ঘরের ভেতর জানলা পেলে ফাঁক?
ঠাগ্‌মা বলে, 'চোরের রাজা, অসৈরণ কাক'
গাছের ডালে বাঁধবে বাসা
মতলবটা বেজায় খাসা
চোরাই মালে ঘর বানানো, তারই এত জাঁক?
উৎপাত যায় যতই সওয়া
নেইকো কিছু বলা কওয়া
তেল মাখছেন জামাইবাবু—ঠুকরে দিল টাক
হুস্-হুস্-হুস্—কাক
সাবানখানা রাখ
সাবান ত আর যায় না খাওয়া, নিস্ কেন রে হাঁদা
কাক বোললে, 'সাবান মেখে সাহেব হবে দাদা,
দাদা আমার বেজায় কালো, সুখ নেই তার মনে
সাবান মেখে রং ফর্সা হয় বলে মানুষজনে।'
কাক আর কাকী
উঃ কি ডাকাতি পাখি!

১৩৭৯

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছড়াছড়ি

বিমল দত্ত

॥ ১ ॥

বাবু বললেন, 'পাঁড়ে,
এঁকে চড়িয়ে এসো ট্রেনে।'
পাঁড়ে এসে প্ল্যাটফর্মে
লাগাল চড় টেনে।
ভাষার কারিকুরি দেখে
মনটা গেছে দমে
দরজী এবার গলা কাটবে
দেখছি যে কালক্রমে॥

॥ ২ ॥

বিসর্গ সে দুঃখে থাকে উহুঃ ওহোঃ করে
বিদ্যাসাগর মশায়কে সে হাতে পায়ে ধরে।
বানানটাকে বদলে দিতে করে কান্নাকাটি
বলে ঠাকুর কপালদোষে জীবন হল মাটি।
ঈশ্বরচন্দ্র বলেন, মূর্খ, সংস্কৃত পড়্‌গে,
তোরই ফোঁটার ছড়াছড়ি দেবভাষাতে স্বর্গে।

১৩৬৮

ছোট্ট ছড়া

চুণী দাশ

উই চেয়ে আকাশে
পেল দুটি পাখা সে।
পাখা পেয়ে ভাবে উই
সেও হবে তারা-জুঁই।
মেঘ হয়ে উড়বে।
দুনিয়াটা ঘুরবে।
পাখি-টাখি কিছু না
সেও কারো নিচু না!

১৩৭৯

চলুন চাঁদে

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

চাই কি জমি? চাঁদেই আছে এক বিঘে দাম তিন টাকা
করলে দেরী ঠকতে হবে—চট করে ভাই দিন টাকা!
পৃথিবীতে ভিড় বেড়েছে কালিম্পং টু ক্যালকাটা
বেতোড় থেকে বিহার শরীফ যেথাই কেন দিন হাঁটা!
ভিড়ের চাপে মরেন কেন? চাঁদেই এখন যান চলে
জলের দরে দিচ্ছি জমি, এই পৃথিবীর সোরগোলে।
যেতে আসতে রকেট ভাড়া? এই বেশী নয়—লাখ
দু' লাখ—
শুনেই বুঝি ভড়কে গেলেন পকেট বুঝি চিচিং
ফাঁক?

১৩৮০

www.BanglaBook.org

নেকী

সুধীন্দ্র সরকার

থানায় গিয়ে বললে খাঁদো
চোখ দুটো তার কাঁদো কাঁদো,
'পুলিশবাবু খোঁজেন দেখি
হারিয়ে গেছে আমার 'নেকি'।
রাত্তিরে কাল খায়নি বাছা
সঙ্গী ছাড়া যায় না বাঁচা।'
'দেখতে কেমন বল আমাকে',
পুলিশবাবু বললে তাকে।
'লম্বাটে না বেঁটে মোটা?
ধরতে পারে লাঠি-সোটা?
গায়ে কি তার রঙীন জামা?
ছুট্‌তে পারে? দেয় কি হামা?
টাক মাথা না লম্বা চুল?
কথায় কথায় দেয় কি গুল?'
খাঁদো হঠাৎ ক'কিয়ে উঠে
বললে তখন পায়ে লুটে,
'বাছা আমার মানুষ নাকি
তাহ'লে আর বলছিটা কি?
দুধেল গরু ভাগলপুরী
দাম নিয়েছে প'চিশ কুড়ি!'
পুলিশবাবু অমনি রেগে
বললে কথার কামান দেগে,
'এতক্ষণে মোদ্দা কথা
বুঝতে হ'ল মাথায় ব্যথা।
সময় নষ্ট করিস নারে
খোঁজ গিয়ে যা বন-বাদাড়ে।
হাম্বা হাম্বা ডাকবি তাকে
ফিরবে গরু যেথায় থাকে।
গরুর সঙ্গী গরুই বটে
বুদ্ধি তো নেই একটু ঘটে!'
খাঁদোর বুলি মিহি সরু,
'মুই গরু না তুই গরু!'

১৩৮৫

টিকটিকি

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

টিকটিকি তিনবার হে'চে দিলে 'টিক্‌-টিক্‌'
শুনি নাকি, সব কিছু ফলে যায় ঠিক-ঠিক।
তাই ভাই খেটেখুটে সম্মান বাঁচাতে
ছ'-হাজার টিকটিকি পুষে রাখি খাঁচাতে।
সারাদিন বসি বসে, 'রাজা হই, রাজা হই'
হতভাগা পাজীগুলো 'টিক্‌-টিক্‌' করে কই!
'লটারীতে লেগে যাক্‌ টাকা দশ লাক্ষ'
চে'চিয়ে-চে'চিয়ে হায় টাটালো যে বক্ষ?
মুখ দিয়ে ফেনা ওঠে মিছে হই জব্দ
শয়তানগুলো মুখে করে না টুঁ-শব্দ।
এইভাবে তিনমাস মিছে করে চেষ্টা
রেগেমেগে খুব জোরে বলে ফেলি শেষটা,
'তোদের জ্বালাতে দড়ি দেবো গলাতেই ঠিক'
ছ' হাজার টিকটিকি বলে দিলো, 'টিক্‌-টিক্‌'!

১৩৮৫

www.BanglaBook.org

পুজো-স্পেশাল

রেবন্ত গোস্বামী

বেড়িয়ে আসুন দাদা 'ভূভারত' স্পেশালে
ঘুরবেন সারা দেশ পাঁচ টাকা খসালে।
সহর নগর গ্রাম সমুদ্র পর্বত
দেখে নিন খেতে খেতে লেবু দেয়া সরবৎ।
এবারেতে নিয়ে যাব ইলোরা অজন্তা
এ টাকায় সে সুযোগ—পাবেন ক'জন তা?
দু'টাকার টিকিটেতে দেখি তো শুধুই যান
রানাঘাট কোলাঘাট উলুবেড়ে বাগনান।
এবারে আসুন ঘুরে সমস্ত দেশটা—
রসিদটা লিখে দে রে—কোথা গেলি কেষ্টা?
সকালেতে জলযোগ—সরবৎ ও চা, বোঁদে—
একশোটা টাকা দিন সে খরচ বাবদে।
শ' পাঁচেক লাগবে যে দু'বেলার আহারে—
কোথাও দেবে না খেতে সামান্য এ হারে।
মশলা, জর্দাপান, বিকেলের চা-খাবার,
করুন তো এ বাবদে আরো দুশো টাকা বার।
বিছানা মশারি ভাড়া নেব নামে মাত্তর
বারো টাকা দিনে হলে ছ'দিনে বাহাত্তর।
খাটাতে হবে যে তাঁবু থাকতে ও ক'রাতে—
ষাট টাকা দিন শুধু ত্রিপলের ভাড়াতে।
জলব্যয় কিছু হবে স্নানাদির জন্য
পঞ্চাশ টাকা ধরি—নেহাৎই নগণ্য।
খবরের কাগজটা দেওয়া হবে প্রতিদিন
তার তরে সামান্য গোটা কুড়ি টাকা দিন।
বাক্সও আছে বুঝি? তবে কিছু লাগে যে—
লাগবে বারোটা টাকা আপনার এ লাগেজে।
গাড়ি ভাড়া ছ'শো দিন—এ তো খুবই সস্তা।
দেখবেন, করে দেব শোবারও ব্যবস্থা।

এ খরচ আপনারই নেহাৎই নিজস্ব,
আমরা ছোঁব না কিছু এই ছাই ভস্ম,
নেব শুধু পাঁচ টাকা—এবারেতে সেটা দিন,
ভাবুন তো, এ টাকাতে ঘোরা যায় ছ'টা দিন!

১৩৮৬

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাই-বোন

সামসুল হক

গগন ছিল নাম,
আমি কি জানতাম!
আর জানি না আকাশ নামে ছিল তার এক ভাই,
নীলিমা যে তাদেরই বোন জানতো কি সব্বাই?
গগন বলে—আমার ঘোড়ার নাম রেখেছি সূর্য্যি,
তার মত কি দুষ্টু ছেলে
রাজ্যি খুঁজে কোথাও মেলে?
মেঘের বনে কোথায় গেল—সকাল থেকে খুঁজছি।
আকাশ ছিল বেজায় খুশি, সেদিন চতুর্দশী—
পোষ-মানানো খরগোশ তার
গলায় দোলে ঝলমলে হার,
সারা উঠোন লাফিয়ে বেড়ায়—নাম দিয়েছে শশী।
মায়ের আঁচল শূন্য রেখে
অভিমানে চক্ষু ঢেকে
পালিয়ে গেছে যারা,
ঐ নীলিমার কোলের 'পরে
লুকোচুরি টক্কা-টরে
খেলছে হয়ে লক্ষ কোটি তারা।

১৩৭৭

মশা

সরল দে

এত সাহস, চললো মশা
বাঘের পিঠে চাপতে!
হালুম্ হুলুম্ ডাকলে যে বাঘ
আমরা থাকি কাঁপতে।

বাঘের পিঠে চেপেই মশা
হুল ফোটালো আস্তে—
তারপরে কী? উড়লো মশা
হাসতে হাসতে হাসতে।

মশা মশা ছোট্ট মশা
এইটুকু একফোঁটা,
খুকুর ঠোঁটে কামড়েছিল
ফুলেও ছিল ঠোঁটটা।

মশার ভারি বুকের পাটা,
ভয় করে না কাউকে,
কামড়ে দিল ভীম পালোয়ান
শম্ভুচরণ স্কাউকে।

১৩৮৩

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পটকান যখন পটকালো

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পটকান পালোয়ান ছিল শেরপুরের গর্ব। সে চেহারা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ষট ইঞ্চি বুক, আশি ইঞ্চি পেট, গরিলার মত হাত-পা। শরীরটার কোথাও কোন ভেজাল নেই। ভুঁড়িখানা ঢালের মত শক্ত। পটকান পালোয়ান ভুঁড়ি দিয়ে বিস্তর কুস্তি-গীরকে চেপে দমসম করে দিয়েছে।

তিন কুলে পটকান পালোয়ানের কেউ ছিল না। খুব অল্প-বয়স থেকে ভীষণ খাই-খাই ছিল বলে খিটখিটে বাপ তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। সেই থেকে পটকান বিবাগী। অবশ্য সে বাপ এখন নেই, মাও গত হয়েছেন। পটকান তাই একা আনন্দে থাকে। সকালে দঙ্গলে গিয়ে তেল মাটি মাখে, কসরৎ করে, মুগুর ভাঁজে। অসংখ্য ডন-বৈঠক দেয়। একসের ছোলা দিয়ে সকালে জল খায়। বেলা পড়লে রুটির পাহাড় মাংসের পর্বত দিয়ে শেষ করে। বিকেলে একপুকুর দুধ আর এক গামলা বাদাম বাটা খায়, রাতে ফের ঘিয়ের পরোটার বংশ লোপ করে চারটে মুরগী দিয়ে। এর ফাঁকে ফাঁকে এন্তার ডিম, সব্জী, মিছরি, সরবৎ চালান হয়ে যায় তার অজান্তে। এ সব ছোটোখাটো খাবার-গুলো সে খাওয়ার মধ্যে ধরে না।

পটকানের সঙ্গে সেবার লড়তে এল পাঞ্জাবের ভীম সিং, তারও বিশাল চেহারা। খাওয়াদাওয়াও প্রায় পটকানের সমান। জমিদারের কাছারি বাড়িতে লোক ভেঙে পড়ল কুস্তি দেখতে। পটকান ভীম সিংকে তিন মিনিটে চিত করে হাত ঝেড়ে বলল—ছোঃ। জমিদারের দিকে চেয়ে হাতজোড় করে বলল—হুজুর, বেয়াদপি মাপ করবেন। কিন্তু এসব চ্যাংড়া-প্যাংড়ার সঙ্গে লড়ার জন্য আমাকে ডাকা কেন?

সবাই ভাবে, ঠিক কথা, কিন্তু মুশকিল হল পটকান লড়বেই বা কার সঙ্গে? দেশ-বিদেশ থেকে যারাই লড়তে আসে, সে যত বড় ওস্তাদই হোক, পটকান তিন মিনিটের বেশী সময় নেয় না। লড়াইয়ের শেষে আবার বলে—ছোঃ। জমিদারের দিকে চেয়ে অভিমানের সঙ্গে বলে—আনাড়িদের সঙ্গেই কি আমাকে বরাবর লড়তে হবে হুজুর?

জমিদারমশাই মহা সমস্যায় পড়ে বললেন—তা বাপু, তোমার যোগ্য কুস্তিগীর পাই কোথায়? এ'রা যারা আসছেন লড়তে তাঁরাও সব নামডাকের লোক, কিন্তু তোমার কাছে কেউই ধোপে টেকে না দেখি—

—তার চেয়ে হুজুর বন্দোবস্ত করুন, ওরা দুজন করে আসুক লড়তে, আমি একা।

তাই হল। লড়তে এল বচন পাণ্ডে আর হরি দোসাদ। দুজনকে দু'বগলে নিয়ে হা হা করে হেসে ওঠে পটকান। তার-পর তাদের মাটিতে ফেলে দিয়ে বলে—ছোঃ ছোঃ। বলে জমি-দারবাবুর দিকে তাকায়—হুজুর, দেশে কি আর মানুষ পাওয়া গেল না!

জমিদারমশাই মিইয়ে গিয়ে বললেন—তাই ত! এরা ত দেখছি তেমন কিছু নয়। অথচ শুনেছিলাম এরা কিলিয়ে পাথর ভাঙে, পাঁচমন ওজন তোলে এক এক হাতে, হাতি বুকে নেয়। সে সব ত গল্পকথা নয় বাপু, নিজের চোখে দেখেই এনেছি। আচ্ছা দেখি তোমার উপযুক্ত যদি কাউকে পাই।

এরপর তিন পালোয়ান লড়তে এল একসঙ্গে। ভীষণ ভীষণ তাদের চেহারা। গোল্লা গোল্লা করে চায় আর দাঁত কিড়মিড় করে। তা সেই তিনজন যখন লড়তে নামল তখন বেলুন চুপসে আমসত্ত্ব হয়ে গেল ফের। তিনটেকে নিয়ে খানিক লোফালুফি খেলল পটকান, চেঁচিয়ে জমিদারমশাইকে বলল—হুজুর যখন বলবেন তখনই তিনজনকে মাটিতে ফেলব।

ফেললও তাই, তিনবার ছোঃ দিয়ে জমিদারমশাইয়ের দিকে তাকাতেই জমিদারমশাই বেজায় ভয়-পাওয়া মুখ করে মিন মিন করলেন—তাই ত বাপু, এ ত বড় মুশকিলে ফেললে তুমি।

খুব বড় একটা শ্বাস ফেলে পটকান বলল—এরকম চললে আমাকে সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে যেতে হবে দেখছি।

এই কথায় সবাই ভারী চিন্তিত হয়ে পড়ে। জমিদার-মশাইয়ের একেই হার্টের ব্যামো, বাঁ পায়ে বাতব্যাধি, রক্তচাপের রোগ, রাতে ভাল ঘুম হয় না, পেটটা ভুটভুট করে সব সময়ে। তার ওপর পটকানের এই কথা শুনে তিনি প্রায় অন্নজল ছাড়েন আর কি! শেরপুরের গর্ব পটকান পালোয়ান সাধু হয়ে হিমা-লয়ে চলে গেলে লজ্জার সীমা থাকবে না।

শেরপুরের লোকেরা ভারী বিমর্ষ। পটকানের সঙ্গে কেউ লড়ে পারে না সে ঠিক, কিন্তু তা বলে একটু লড়াই হবে ত, কিছুক্ষণ কোস্তাকুস্তি করে তবে চিত হবি। এ যেন সব হেরোর দল মাটি নেওয়ার জন্যই আসে। এইসব হেরোর দলকে শের-পুরের লোকেরা হারু বলে উল্লেখ করে। জেতে বলে পটকানের নাম তারা দিয়েছে জিতেন। সবাই বলাবলি করে—জিতেনের সঙ্গে এবার কোন্ হারু লড়তে আসছে রে?

তা এল এবার। সারা দেশে লোক পাঠিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে মানুষের চেহারার দশজন দানবকে ধরে আনা হল। তিন-দিনে তারা শেরপুরের সব খাবার খেয়ে ফেলল প্রায়। চারদিকে দুর্ভিক্ষের অবস্থা। দশ পালোয়ান বাঘের মত গর-র গর-র আওয়াজ ছাড়ে, মানুষের ভাষায় কথাই বলে না। দিনমানে তারা নিজেদের সামলাবার জন্য নিজেরাই নিজেদের শেকল দিয়ে বেঁধে রাখে। ভীষণ রাগী, কখন কার ঘাড় মটকে দিয়ে জেল হয়। তবু শেষরক্ষা হয় না বুঝি। তাদের যে ঘরে থাকতে দেওয়া

www.BanglaBook.org

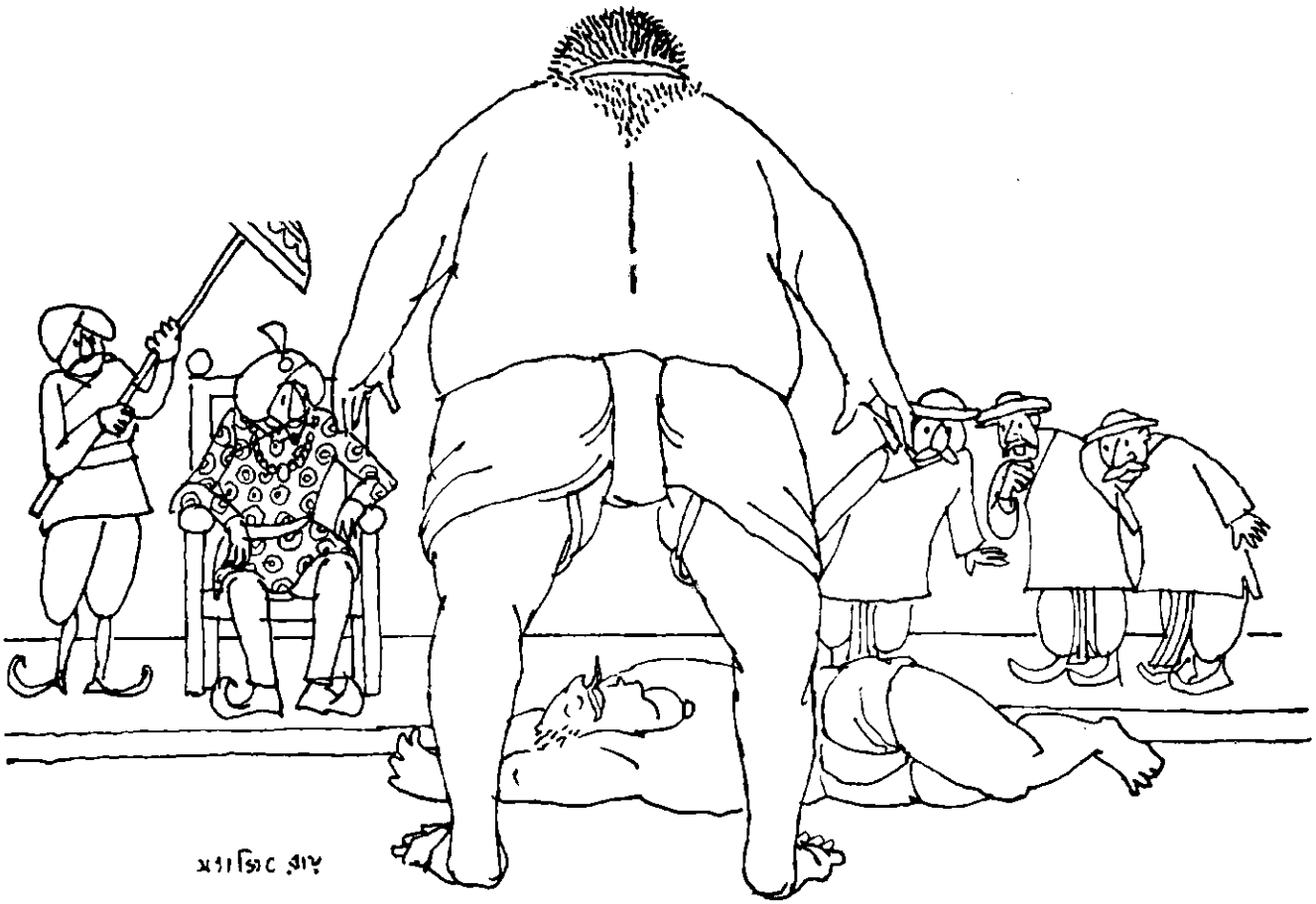

হয়েছিল তা মজবুত পাকা ঘর। তবু দশ পালোয়ানের নড়াচড়ায় মেঝে দেবে গেল, দেওয়াল ভেঙে গেল একধারের। হাঁকডাকে চারধারে ভূমিকম্প হল কয়েকবার।

লড়াইয়ের দিন চারটে রথযাত্রার ভীড় ভেঙে পড়ল কাছারি বাড়িতে। হুলুস্থুলে কান্ড। দশ দানব দঙ্গলের মাটি কাঁপিয়ে এসে ঢুকল একসঙ্গে। দশজনের সঙ্গে একা লড়বে পটকান।

চোখে দেখেও কারো বিশ্বাস হচ্ছিল না ব্যাপারটা। পটকান দঙ্গলে ঢুকে গুরু প্রণামটা সেরে নিল কেবল। তারপরই দেখা গেল সে এক একটা দানবকে ধরে পটাপট ভীড়ের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, ঠিক যেমন গদাই মালী বাগানের আগাছা তুলে ছুঁড়ে দেয় বেড়ার বাইরে। দু'মিনিটে দশ পালোয়ান সাবাড় করে ঠিক দশবার ছোঃ দিল পটকান। তারপর ভীষণ অভিমানের চোখে তাকাল জমিদারমশাইয়ের দিকে। বলল—হুজুর—

রোগা-ভোগা জমিদারমশাইয়ের চোখমুখ লাল হয়ে গেছে অপমানে। তিনি কয়েকবার গলা খাঁকারি দিলেন।

পটকান বলল, হুজুর, এরা সব কারা এসেছিল হুজুর? এসব রোগা দুব্‌লা লোক কোত্থেকে আনলেন?

হঠাৎ জমিদারমশাই চেঁচিয়ে উঠলেন—চোপরাও বেয়াদব! রোগা দুব্‌লা লোক? অ্যাঁ! রোগা দুব্‌লা লোক এরা সব!

বলতে বলতে রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে জমিদারমশাই বাতব্যাধির কথা ভুলে, হার্টের ব্যামোর কথা বিস্মরণ হয়ে, রক্তচাপকে পরোয়া না করে, পেটের ভুঁড়িভাটকে উপেক্ষা করে এক লাফে এগিয়ে এলেন দঙ্গলের মাটির ওপর।

কিছুতেই তোমরা শেষ হয় না, অ্যাঁ...বলতে বলতে জমিদারমশাই পটকানের ঘাড়টা ধরে এক ঝটকায় তুলে ফেললেন মাথার ওপরে। তারপর সে কি বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে লাগলেন, না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

পটকান প্রাণভয়ে চেঁচাচ্ছে তখন—বাবা গো! গেলাম গো! মেরে ফেললে গো! কে কোথায় আছো ছুটে এসো!

কে শোনে কার কথা! কয়েকবার আচ্ছাসে ঘুরিয়ে জমিদারমশাই পটকানকে এক বেদম আছাড় মারলেন। তারপর হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন—ছোঃ!

১৩৮৩

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিকচিক ও রাজহাঁসদাদু

নবনীতা দেব সেন

নভেম্বর মাস হতে না হতেই ওরা এসে পড়ে। সেই উলান-বাটোর থেকে উড়তে উড়তে উড়তে উড়তে আসে আলিপুর চিড়িয়াখানার এই পুকুরে। চিক্-চিক্ পুক্-পিক্ টুং-টুং লুং-পুং সব্বাই সব্বাই...তাদের বাবা-মা খুড়ো জেঠা মামামাসী মেসো-পিসে দাদুঠাকুন্দা সক্কলে মিলে...উড়ে যায়—তাদের যে শীত-কালে দক্ষিণে বাতাসে চেঞ্জে যাবার সময় হয়েছে। মঙ্গোলিয়া থেকে সাইবেরিয়ার বরফ পার হয়ে চীন—তারপর মাঞ্চুরিয়া পেরিয়ে, সোবিয়েৎ রুশিয়ার ওপর দিয়ে জর্জিয়া, তাজিকীস্তান, উজবেকিস্তান সমস্ত পেরিয়ে ওরা উড়ে আসে, কাবুলের মেওরা ক্ষেতের ওপর দিয়ে, তিব্বতের লামাদের মঠের ওপর দিয়ে, হিমালয় পাহাড় পেরিয়ে, এভারেস্ট চূড়োর ওপর দিয়ে, ওরা উড়ে আসে। এমন কি ওই যে একবছরী খুকু খুক্-খিক্, সেও এসেছে। চিক্-চিক্ও এসেছিল একবছর বয়সে। এখন তার দু'বছর। এর মধ্যেই সে তিনবার এভারেস্টের মাথার ওপর দিয়ে এপার-ওপার ডিঙিয়েছে। লক্ষ লক্ষ পাখির কলরবে আলিপুর চিড়িয়াখানার দীঘির বাতাসে যেন সেতার বাজছে। জলটল প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। ক্ষুদে ক্ষুদে বিদেশী পাখিতে পাখিতে দীঘির রুপোলী গাটা ভর্তি হয়ে গেছে, ঠিক যেন একটা হাজারবুটি শাদা টাঙ্গাইল শাড়ি। চিক্-চিক্দের পাড়াশুদ্ধু, গাঁশুদ্ধুই কেবল নয়, ওদের দেশশুদ্ধু—মানে উলান-বাটোরের উত্তরে যে জলাটায় ওরা থাকে, সেই জঙ্গলের সব ক'টা পাখি এখন এই দীঘিতে। অন্তত একশো বছর ধরেই ওরা উড়ে আসছে এই-খানে। একবারও পথ ভোলে না। যেমন আসে তেমনি আবার ফিরে যায় ঠিক—লক্ষ লক্ষ যোজন পথ পেরিয়ে, নিজেদের জলে, নিজেদের জঙ্গলে।

চিক্-চিক্ দেখলে একটা সুন্দর মতন পোকা তিড়িং করে জলের ওপর লাফালে, তারপরই জলের মধ্যে দিলে ডুব! চিক্-চিক্ও ডাইভ দিয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে—উ-হু-হু-হু-হু!! গেছি!! গেছি!! চিক্-চিকের মাথাটা কার মাথার সঙ্গে জানি ঠুকে গেল! অমনি চিক্-চিক্ শুনতে পেলে ভারী গলায় কে যেন বললেন—'আহা-হা! ষাট! ষাট! লাগলো বুঝি? আমি দেখতে পাইনি বাছা।'

চিক্-চিক্ মুখ তুলে চেয়ে দ্যাখে ইয়া লম্বা চওড়া বিশাল-বপু শালপ্রাংশু মহাগ্রীবা এক রাজহাঁস। রেশমের মত কুচকুচে কালো তাঁর গায়ের রং, টুকটুকে লাল তাঁর ঠোঁট। ঐ পোকাটার জন্য ডুব দিয়েছিলেন রাজহাঁসও।

রাজহাঁস বললেন—'তোমার মাথায় কি খুব বেশি লেগেছে?'

চিক্-চিক্ বললে—'না-না'।

রাজহাঁস তখন তাকে একটি রস টুসটুসে কচি পোকা খেতে দিলেন।—'না-না' বলতে বলতে চিক্-চিক্ সেটা খেয়ে ফেললে। এমনি করে দুজনে বেশ ভাব হয়ে গেল।

রাজহাঁস ওর ঘরবাড়ির কথা শুনতে চাইলেন,—ওর নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন।

চিক্-চিকের বয়েস মাত্র দু' বছর, এরই মধ্যে সে এত এত দেশ-বিদেশের নতুন নতুন আকাশ চষে বেড়িয়েছে, কত কী আশ্চর্য সব জিনিস দেখেছে, শুনতে শুনতে রাজহাঁসের চোখ উদাস হয়ে যায়। তিনি জিজ্ঞেস করেন—'আঙ্গুর ক্ষেতের ওপর দিয়ে কখনো তুমি উড়ে এসেছ?'

চিক্-চিক্ বলে—'হ্যাঁ...'।

'এভারেস্টের চূড়ো ডিঙিয়ে তোমরা উড়ে এসেছ!'

চিক্-চিক্ ঘাড় দুলিয়ে বললে—'হ্যাঁ'...।

'গঙ্গা নদীর উৎপত্তি যে গুহায়, সেই গুহার পাশ দিয়ে উড়ে এসেছ!'

চিক্-চিক্ আবার ঘাড় দোলায়—'হ্যাঁ'...।

এবার রাজহাঁস দাদুর চোখদুটো ছলছল করে উঠল। তিনি বললেন, 'জানো চিক্-চিক্, আমার বয়েস সাত অথচ আমি এই আলিপুর চিড়িয়াখানার দেওয়ালের বাইরে কিছু দেখিনি।'—'গঙ্গানদীও দ্যাখোনি?'—'নাঃ।'—'হাওড়ার ব্রীজও নয়?'

চিক্-চিক্ অবাক হয়ে যায়।—'সে কি? এসব ত ঠিক পাশেই, একদম কাছে। আমি তোমাকে এক্ষুনি দেখিয়ে আনতে পারি!'

রাজহাঁসদাদু বললেন—'কী করে দেখব? আমি জন্মেছি ত এইখানে, এই চিড়িয়াখানাতে। আমার বাবা-মা কিন্তু অন্য দেশ দেখেছেন। তাঁরা জন্মেছিলেন সাতসাগরের ওপারে জেনিভা বলে একটা শহরে, লাক লেমান বলে একটা মস্ত নীল হ্রদের মধ্যে। তার নীল কাচের মতন জলে চারপাশের শাদা শাদা বরফ-ঢাকা পাহাড়ের ছায়া কাঁপে—সে জল এরকম গরম নয়, বরফগলা নদীরা এসে তাকে ঠান্ডা করে রাখে। আর তার নিচে সবুজ সবুজ শ্যাওলার ঝোপঝাড়, দামের বন—তাতেও কত রং-বেরঙের ফুল ফোটে যেন মণিমুক্তোর গয়না! ঝলমল করে তোলে জলের নিচের রাজ্যটাকে। আমার মা-বাবা দাদু-দিদিমা সবাই মিলে সেই হ্রদে বাস করতেন। একবার সেই দেশের সরকার কলকাতার বাচ্চাদের জন্য উপহার পাঠালেন আমার বাবা আর মাকে। তোমাদের মত নিজের খুশিতে উড়ে উড়ে নয়, বাবা-মা এসে-ছিলেন খাঁচার মধ্যে, এরোপ্লেনে চড়ে। সেই থেকে আমাদের আর অন্য দেশ দেখা হয়নি।'

মন দিয়ে চিক্-চিক্ সব শুনছিলো। শুনেটুনে সে বললে—'লাক লেমান ত আমি চিনি না তবে তোমাকে ঠিক ওইরকম

www.BanglaBook.org

আরেকটা লেকে নিয়ে যেতে পারি। তার নাম মানস সরোবর। সেখানেও অনেক রাজহাঁসেদের বাস। আমি দেখেছি। তারও নীল জলে শাদা বরফে ঢাকা পাহাড়ের ছায়া পড়েছে, তারও গভীরে মণিমাণিক্যের মত দামের ফুল ফুটে জল আলো করে আছে। তুমি যাবে দাদু? আমি পথ চিনি। তোমাকে নিয়ে যাব।'

রাজহাঁসের চোখদুটো এবার ঝকঝক করে উঠলো, যেন হীরের কুচি থেকে আলো ঠিক্‌রে পড়ছে।—'নিয়ে যাবি ভাই? নিয়ে যাবি তোর সঙ্গে? আমি যাব।'

'বেশ ত, মার্চ মাসে আমরা যখন বাড়ি ফিরবো, তখন তোমাকে পেঁছে দিয়ে যাব। মানস সরোবর ত বেশি দূরে নয়। উলান বাটোরের মত নয়। তৈরি থেকো। তোমার ডানাটায় জং ধরে যায়নি ত? একটু ওড়াটা প্র্যাকটিস করে রেখো দাদু।'

মার্চ মাসে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অতিথ পাখির ঝাঁক ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আবার বাড়ির পথ ধরতে শুরু করলো। চিড়িয়াখানার দীঘির বুক যখন খালি হয়ে আসছে, বাতাসে পাখিদের রিনিঝিনি গান যখন ঝিমিয়ে আসছে তখন একদিন অবাক হয়ে চিড়িয়াখানার বাসিন্দা যত জন্তুরা আর বেড়াতে আসা সব মানুষরা দেখতে পেলো, ক্ষুদে ক্ষুদে পাখির ঝাঁকের সঙ্গে, দু'খানি বিশাল কালো ডানা মেলে আকাশে উড়ে গেলো একটা মস্ত কালো রাজহাঁস। রাজার মতনই সেই ওড়া—ব্ল্যাক সোয়ান না ত, ব্ল্যাক প্রিন্স যেন।

চিড়িয়াখানার কর্তাব্যক্তিরা হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন। এ কী অলক্ষুনে কাণ্ড? রাজহাঁস আবার মাইগ্রেটারি বার্ডদের সঙ্গে ওড়ে নাকি? একজাতের পাখিরা দলবেঁধে একসঙ্গে ওড়ে—প্রকৃতির এই নিয়ম। তারা জীবনেও বেজাতের পাখিদের দলে নেয় না। জীবজগতে ত অনিয়ম বলে কিছু নেই? এ তবে কী কাণ্ড? যাযাবর পাখিদের ডানায় কত জোর, তাদের বুকে কত সাহস, তাদের দেহ কত হালকা—তারা মেঘ ছাড়িয়ে উড়ে যায়, তারা একটানা লক্ষ লক্ষ যোজন পথ পার হয়ে দূর বিদেশের গন্তব্যে পেঁছতে পারে। আর রাজহাঁস? চিড়িয়াখানায় যার জন্ম, সে বড়জোর হাঁপুস হাঁপুস করে একটু-আধটু উড়তে পারে—তার পক্ষে কখনো সম্ভব অত উঁচুতে ওড়া? ও যে হাঁপ ধরলেই পড়ে যাবে? ওকে যে জন্তুজানোয়ারে কিংবা লোভী মানুষে ধরে খেয়ে ফেলবে। বোকা রাজহাঁসটা কি নিজেকে যাযাবর পাখি ভেবেছে? পাখিদেরও কি মাথার গোলমাল হয়? সবাই হায়-হায় করতে লাগলো—মাথা চাপড়াতে লাগলো।

রাজহাঁসদাদু এদিকে উড়তে উড়তে নিজেই বুঝতে পারলেন—এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওড়া তাঁর কম্মো নয়। তিনি বললেন, 'বাছা চিক্‌-চিক্‌, আমি ত বুড়ো হয়েছি, আমার শরীরও অনেক ভারী তোমাদের চেয়ে, তাছাড়া আমার অনেকদিন ওড়া অভ্যেস নেই, ডানায় জং ধরেছে, আমি বোধহয় পারলুম না ভাই! আমার বুক ধড়ফড় করছে, হার্টের কষ্ট হচ্ছে, ব্লাড প্রেশারটাও যেন বড্ড হাই হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে, আমি আর পারছিনে ভাই, এ-জন্মে আমার আর মানস সরোবরে যাওয়া হল না। আমি বরং ফিরে যাই, তোমার সঙ্গে সামনের বছরে দেখা হবে।'

চিক্‌-চিকের মনে খুব কষ্ট হল, কিন্তু সেও বুঝতে পারছিল যে এটা সম্ভব নয়। দাদুকে আলিপুরে ছেড়ে দিয়ে আসাই ভাল। ততক্ষণে নিচে, খিদিরপুরে সোনালী রঙের গঙ্গা নদী ঝলমল করে উঠেছে প্রথম সূর্যের আলোয়।

চিক্‌-চিক্‌ বললে—'দাদু, ওই দেখে নাও নিচেই গঙ্গা নদী—একটা তবু ত নতুন জিনিস দেখা হল তোমার?'

রাজহাঁস খুব খুশি হয়ে উঠলেন, 'বাঃ এই তবে গঙ্গা? আরেকটু উড়ে গেলেই সমুদ্দুর?'—কিন্তু না, ফেরাই ভাল।

একটু বাদে চিড়িয়াখানার লোকেরা দেখলে মস্ত ডানা ছড়িয়ে কালো রাজহাঁস আবার ফিরে আসছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে, ছোট্টো একটি যাযাবর পাখি, বড় জাহাজকে যেমন সমুদ্র থেকে পথ দেখিয়ে নদীতে নিয়ে আসে ক্ষুদে পাইলট নৌকো—গবর্নরের গাড়ীর সামনে যেমন যায় এডিসির ক্ষুদে মোটরবাইক।

রাজহাঁসদাদুকে দীঘির কাছে পেঁছে দিয়ে ডানা নেড়ে নেড়ে টা-টা বাই-বাই বলতে বলতে চিক্‌-চিক্‌ ফিরে গেল তার দলের কাছে।

আর রাজহাঁস? ক্লান্ত, অতি ক্লান্ত হয়ে জলের এক কোণে নেমে, ডানার মধ্যে ঘাড় গলা ঠোঁট গুঁজে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলেন—নীল জলের এক হ্রদ, তাতে শাদা ধবধবে পাহাড়ের ছায়া পড়েছে, জলের মধ্যে চুণীপান্নার তৈরী কমল ফুটে আছে, সেখানে ঝাঁক ঝাঁক কালো আর শাদা রাজহাঁস খেলা করছে।

পরের বছর নভেম্বর মাসে চিক্‌-চিক্‌রা আবার যখন আলিপুরে এল, চিক্‌-চিক্‌ রাজহাঁসদাদুকে খুঁজতে লাগলো, কিন্তু দীঘিতে কোথাও তাঁকে দেখা গেল না। অনেক বয়েস হয়েছিল, কি জানি, হয়ত বা স্বর্গেই গেছেন—ভেবে চিক্‌-চিকের মন খারাপ হয়ে গেল। এমন সময় দেখে হেলতে দুলতে হেলতে দুলতে ডাঙা দিয়ে হেঁটে হেঁটে রাজহাঁসদাদু আসছেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখে চিক্-চিকের প্রাণে বেজায় উল্লাস হল।—'কোথায় গেছলে দাদু, আমি যে তোমাকে খুঁজেই পাই না।' বলেই টুক্ করে একটা পেন্নাম করলে চিক্-চিক্।

দাদু বললেন, 'থাক-থাক! আমি গিয়েছিলুম ওদিকের পুকুরে আমার নাতিটাকে দেখতে!'

হৈ হৈ করে চিক্-চিক্ বললে, 'চল চল, তোমার নাতি দেখে আসি। সে কি উড়তে শিখেছে?'

রাজহাঁসদাদু বললেন, 'এই ত সবে ডানায় পালক গজিয়েছে, এবার শেখালেই শিখবে। তবে ওকে এখানে শেখাবে কে? ওর বাবা-মা ত উড়তে জানেই না—আমি তবু একটু একটু জানতুম।'

চিক্-চিক্ বললে, 'কুছ পরোয়া নেই দাদু, আমি ওকে উড়তে শেখাবো। এখন ত ছোটো আছে, এখন থেকে শিখলে ওর ঠিক আমার মতন ডানার জোর হবে। ওকে তুমি দেখো দাদু, আমি ঠিক মানস সরোবরে নিয়ে যাবো!'

চিক্-চিকের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ রাজহাঁসদাদুর চোখ থেকে টুপ করে একফোঁটা জল পড়লো দীঘির জলে।—'চিক্-চিক্, তুমি খুব ভালো ছেলে, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।' বলে তিনি ডানা তুলে আশীর্বাদ করলেন।

সেদিন থেকেই শুরু হল তালিম দেওয়া। চিক্-চিকের সঙ্গে রাজহাঁসদাদুর কালো কুচ্ছিত নাতিটা রোজ ওড়াউড়ি প্র্যাকটিস করে। রোজ একটু একটু করে ওপর দিকে ওড়ে। আস্তে আস্তে সে বড় হল,—সুন্দর, তেজী, গরগরে-চকচকে একটা রাজহংস হয়ে উঠল সেও। চিক্-চিকের চেয়ে তিনগুণ বড় বটে তার শরীর কিন্তু খুব মন দিয়ে সে চিক্-চিকের কাছে ওড়া শেখে। চিড়িয়াখানাতে যারা বেড়াতে আসে তারা অবাক হয়ে দ্যাখে একটা কচি রাজহাঁস আর একটা ক্ষুদে যাযাবর পাখিতে খুব ভাব—সবসময়ে তারা একসঙ্গে ওড়ে।

একদিন রাজহাঁসের নাতি মেঘ ছাড়িয়ে উড়ে গেল। রাজহাঁসদাদু জলে বসে বসে দেখতে পেলেন নাতিকে আর দেখা যাচ্ছে না। অনেক—অনেকক্ষণ পরে নাতি যখন সন্ধ্যেবেলা ফিরলো, দাদুর কাছে কত গল্প করলো। সে অনেক দূরে, পূবদেশে গিয়েছিলো—পদ্মানদীর চর দেখেছে, জয়ন্তীয়া পাহাড় দেখেছে, মণিপুরের সোনার বরণ আনারস বন দেখেছে। রাজহাঁসদাদুর মনে ফূর্তি আর ধরে না। তিনি চিক্-চিক্‌কে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন।—হবে, এবার হয়ত হবে। তাঁর যা হয়নি নাতিবাবুর তাই হবে।

সেবার মার্চ মাসে যাযাবর পাখিরা যখন উড়ে গেল—আবার একটা কালো রাজহাঁস বিশাল ডানা মেলে তাদের সঙ্গে আকাশে উড়লো। চিড়িয়াখানার কর্তারা এবারে আর উদ্বেগ করলেন না। ও আবার ঠিক ফিরে আসবে'খন। কত দূরেই বা যাবে? গতবারের মতন ফিরে আসবে এক্ষুনি।

উড়তে উড়তে যাযাবর পাখির ঝাঁক দূরে আকাশে মিলিয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটি কালো বিন্দু দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু সেটিও আর দেখা গেল না।—এবার কিন্তু কালো রাজহাঁসটি আর ফিরে এল না। চিড়িয়াখানার লোকেরা ভেবে ভেবে অস্থির। তারা ধরেই নিল রাজহাঁসটা কোথাও ঝুপ করে পড়ে গিয়েছে। কিন্তু রাজহাঁসদাদুর সে ভয় করল না। ঝুপ করে কখনো পড়বে না তাঁর নাতি। দু'দিন তিনদিন চারদিন রাজহাঁসদাদু দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করলেন। তারপর নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি মনে মনে জানলেন—চিক্-চিক্ তার কথা রেখেছে। তাঁর নাতি এখন মানস সরোবরের ঘন নীল জলে, মাণিকের ফুল, মুক্তোর পাতায় বরফ-ঢাকা চূড়োর আলো-ছায়াতে গা ভাসিয়ে নীলপদ্মের মধু খাচ্ছে।

১৩৮৫

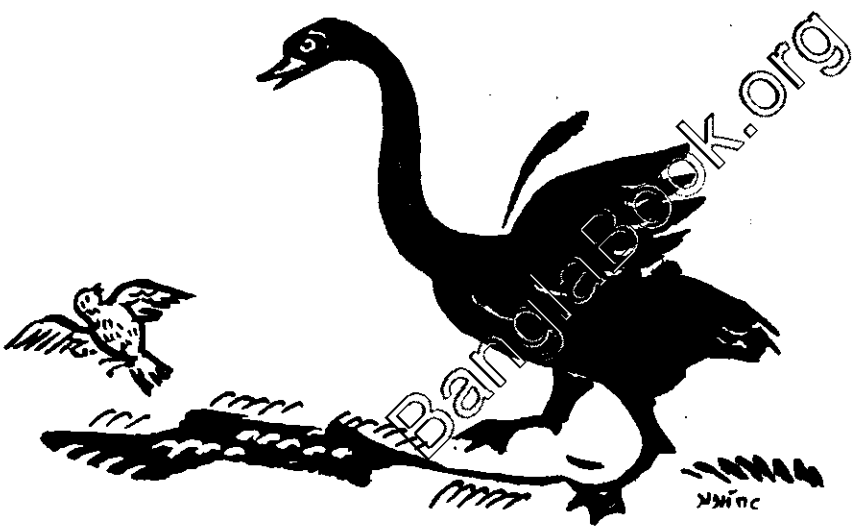

www.BanglaBook.org

বড়মামা ও নরনারায়ণ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বড়মামা খেতে খেতে বললেন, 'আমি একটা গাধা।'

সেজমামার বাঁ হাতে একটা বই, ডান হাতে ঝোলে ডোবান রুটির টুকরো। এইটাই তাঁর অভ্যাস। সামান্য সময়ও নষ্ট করা চলবে না। অগাধ জ্ঞান-সমুদ্র, আয়ু অল্প, বহু বিঘ্ন। সব সময় পড়ে যাও। সকালের কাগজ বাথরুমে বসে বসেই পড়েন। এখন যে বইটা খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে পড়ছেন, সেটা কাক সম্বন্ধে। কাকের স্বভাব, কাকের নিয়মনিষ্ঠা। পড়তে পড়তেই বললেন, 'কি করে বুঝলে! তোমার কান দুটো অবশ্য একটু বড়ই, ঝোলা ঝোলা, সাধারণ মানুষের কান অত বড় হয় না। প্রকৃতির ব্যাপার। বোঝা শক্ত। কে যে কি ভাবে জন্মায়! চীনে মেয়েদের শিং বেরোচ্ছে। কলকাতায় ছেলেদের ন্যাজ বেরোচ্ছে।'

রুটির টুকরোটা মুখে ঢোকালেন। কোলের ওপর এক ফোঁটা ঝোল পড়ল। আগেও দু-এক ফোঁটা পড়েছে। দুক্‌পাত নেই। জ্ঞানতপস্বী।

বড়মামা বললেন, 'আমি গাধা, তার প্রমাণ আমার গরু। আমার মত গাধা না হলে কেউ ওরকম তিনটে গরু পোষে না। তোরাই বল, ওই গরু তিনটে আজ পর্যন্ত ক'ছটাক দুধ দিয়েছে!'

মাসীমা যেন বেশ খুশিই হলেন, 'ঠিক বলেছ বড়দা! গরু দিয়েই প্রমাণ করা যায় তুমি একটা গাধা।'

মেজমামা সব সময় বাঁকা পথ ধরেন। প্রতিবাদ করার জন্যে মুখিয়ে আছেন। বড়মামা বলেন, প্রোটেস্টান্ট। মেজমামার উচিত ছিল চুপ করে শুনে যাওয়া। তা আর হল কই। হঠাৎ বলে বসলেন, 'কেন? ওয়ান্স আপন এ টাইম তোমার কালো গরুটা হঠাৎ দিন তিনেক দুধ দিয়ে ফেলেছিল। তুমি সেই দুধ দেখে কলকাতায় রবারের জুতো পায়ে দিয়ে নাচতে নাচতে পিছলে পড়ে গিয়েছিলে। একদিন গরুর অনারে সত্যনারায়ণ পুজো হয়েছিল। তুমি বলেছিলে সিন্নি খেয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে, দুধে এতই নাকি ফ্যাট। একদিন মেজারিং গ্লাসে করে প্রত্যেককে এক আউন্স করে দুধ খাইয়েছিলে। সেই খাঁটি দুধ খেয়ে আমাদের সব পেট খারাপ হয়ে গেল। গরুর ভাষা নেই। প্রতিবাদ করতে জানে না বলে যা খুশি তাই বলে যাবে?'

'হ্যাঁ দিয়েছিল ঠিকই। তারপর? তারপর আর দিয়েছে কি?'

'কেন দেয়নি?'

'তোর মত একগুঁয়ে স্বভাব বলে দেয়নি—দিতে পারি তবু দেবো না। কি করতে পার কর।'

মেজমামা এবার সশব্দে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়লেন, 'আমি আর তোমার ভুঁসো কালো গরু এক শ্রেণীতে পড়ল! অসম্ভব, আর সহ্য করা যায় না।' মেজমামা বিদ্যাসাগরী চটির ফটাস ফটাস শব্দ তুলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। খুব রেগে গেছেন! যাক্ বাবা, পুডিংটা শেষ করে গেছেন।

মাসীমা বললেন, 'তোমার বড়দা ভীষণ পেছনে লাগা স্বভাব!'

বড়মামা বললেন, 'গাধার ভাই গরুই হয়। আমাদের ভায়ে ভায়ে হচ্ছে, তুই এর মধ্যে নাক গলাতে আসিসনি।'

'ঠিক আছে।' মাসীমাও রাগ করে উঠে গেলেন।

বড়মামা আমাকে বললেন, 'এদের আজ কি হয়েছে বল ত! কথায় কথায় রেগে যাচ্ছে! সব ব্লাডপ্রেসারের রুগী! গরু তিনটেরও প্রেসার। আমার যেমন বরাত!'

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর আমার চোখ ঘুমে জুড়ে আসে। ধপাস করে শুয়ে পড়তে পারলে আর কিছুই চাই না। আজও সেই তালেই ছিলুম। পরিষ্কার বিছানা। নরম মাথার বালিস, কোল বালিস। মৃদু পাখার বাতাস। জানালার বাইরে সাদা ফুলে ফুটফুটে কামিনী গাছ। থমথম করেছে মিষ্টি গন্ধ। কোণের দিকে বড়মামার আরাম কেদারার কাছে তে-ঠ্যাঙা বড় টেবিল ল্যাম্পের মাথার ওপর হালকা সবুজ রঙের শেড স্বপ্নের মত আলো ছড়িয়ে রেখেছে। ঘুম আয়, ঘুম আয় বলতে হয় না, ঘুম যেন ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

বিছানায় পা দুটো তুলে সবে শুতে যাচ্ছি, বড়মামা 'হাঁ হাঁ' করে উঠলেন, 'এর মধ্যে শুবি কি রে! একটা ফিউচার প্ল্যান তৈরি করতে হবে না?'

'কিসের প্ল্যান?'

'গরু ছেড়ে দিলুম। আর একটা কিছু ধরতে হবে ত।'

'কেন? কুকুর রয়েছে গোটাছিয়েক, পাখি রয়েছে খাঁচায় খাঁচায়, দুটো বেড়াল।'

'ধ্যাৎ! ওদের কি গরব! বড় একটা কিছু ধরতে হবে। মহান, মহৎ, অসীম, অনন্ত।'

'সে আবার কী!'

'আমি একটা লঙ্গরখানা খুলব।'

'লঙ্গরখানা?'

'কিছুই জানিস না? রোজ হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি তৈরি করে দুপুর বেলা দরিদ্র মানুষদের খাওয়াব। রাজা রাজেন মল্লিকের মত। দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে ফ্রী চিকিৎসা চালাব। একটু একটু করে আমার এই সমাজসেবা এমন চেহারা নেবে—হেঁ হেঁ।'

'হেঁ হেঁ মানে?'

'হেঁ হেঁ মানে মাদার টেরেসা! তোর মেজোকে বলে আয় মনের জোর, ইচ্ছাশক্তি, তেজ আর ত্যাগ থাকলে নোবেল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুরস্কার পাওয়াটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। শুধু পুডিং খেলেই হয় না, পুডিং খাওয়াতে হয়। আমি-আমি করলে নিজের ভুঁড়িটাই বাড়ে! তুমি-তুমি করলে আমিটা পেল্লায় বড় হয়ে বিশ্ব-আমি হয়? বিশ্বামি ভাবে?'

'বিশ্বামি?'

'হ্যাঁ স্বরসন্ধি। অকারের পর আকার থাকিলে উভয় মিলিয়া দীর্ঘাকার হয়। এখুনি জিগ্যেস করবি দীর্ঘাকার কি? দীর্ঘ প্লাস আকার। এও স্বর সন্ধি!'

'মেজমামাকে এখুনি বলে আসব?'

'শিঅর! নাকের ডগায় রসেল নিয়ে বসে আছে, ব্যাট্‌ল্‌ড স্নান জানে না।'

যাক বাবা! বড়মামার হাত থেকে ছাড়া পাওয়া গেছে। মেজমামার ঘরে গিয়ে ঘুম লাগাই।

সকালবেলা বড়মামাকে ঘরে পেলাম না। অথচ এই সময়ে ঘরে থাকারই কথা। লাল টকটকে সিল্কের লুঙ্গি। খোলা গা। পিঠের ওপর ইয়া মোটা সাদা পইতে। তাতে আবার একটা আঙটি বাঁধা। হাতের আঙুলে জায়গা নেই। আঙটি কোমরের কাছে ঝুলছে। চেয়ারে বাবু হয়ে বসা। ছটা কুকুর ঘরময় হ্যা হ্যা করছে। এক একটা পালা করে লাফিয়ে উঠে বড়মামার হাত থেকে বিসকুট ছিনিয়ে নিচ্ছে। মনে মনে হিসেব করে এক একটা বদমাইশকে ধরে ফেলছেন, 'উঁহু উঁহু, তোর দুটো হয়ে গেছে, এইবার ওইটার পালা।' কে কার কথা শোনে, সবকটাই ঘাড়ে ঘাড়ে লাফাচ্ছে। মাঝে মাঝে পইতেতে পা আটকে যাচ্ছে। বড়মামা ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলছেন, 'এইবার সবকটাকে দূর করে দেব। ইনডিসিপ্লিনড্‌ জানোয়ার।' বলেই পইতের ঝোলা অংশ তুলে কপালে ঠেকাচ্ছেন।

কোথায় সেই পরিচিত দৃশ্য! ঘরময় কুকুরের ছড়াছড়ি! প্রভু বেপাত্তা।

দক্ষিণের জানালায় উঁকি মেরে দেখি বড়মামা বাগানের এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখের চেহারায় ভীষণ ভাবনা। কী হল কে জানে? হঠাৎ চোখাচোখি হতেই ইশারায় ডাকলেন। বাগানে নামতেই আমাকে বললেন, 'বুঝলি এইখানেই হবে।'

'কি হবে বড়মামা? নারকেল গাছ?'

'আরে না রে না। তোর কেবল খাবার চিন্তা?'

'তবে?'

'এইখানে হবে সেই লঙ্গরখানা। একপাশে বিশাল উনুন। আর একপাশে সারি সারি টেবিল আর ফোলডিং চেয়ার। এই কোণে কল আর জল। এইখানটায় একটা পেটা ঘড়ি। ঢ্যাং করে যেই একটা বাজবে, খাওয়া স্টার্ট। দুটোর মধ্যে যারা যারা আসবে তারাই খেতে পাবে। একটা থেকে দুটো। কড়া নিয়ম।'

'টেবিল, চেয়ার?'

'তবে না ত কি? দরিদ্র নারায়ণ সেবা। ভেজিটেবল খিচুড়ি আর যে কোনও একটা ভাজা। সপ্তাহে একদিন চাটনি। চল এইবার চট করে হিসেবটা করে ফেলি।'

বড়মামা ঘরে ঢুকতেই, কুকুরগুলো মুখিয়ে ছিল, সকালের বিসকুট পায়নি, চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরল। একটা পায়ের কাছে; একটা পেছনের দিকে পিঠের ওপর দুটো পা রেখে দাঁড়িয়ে উঠেছে; একটা সামনের দিকে ক্রমান্বয়ে লাফাচ্ছে। বড়মামা বললেন, 'উঃ পাওনাদারদের জ্বালায় জীবন গেল।'

বিসকুট পর্ব শেষ হতে না হতেই মাসীমা চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। সব কটা কুকুরকে এক জায়গায় দেখে বললেন, 'পয়সার কি জ্বালা! কত মানুষ না খেয়ে জীবন কাটাচ্ছে আর কারুর আধডজন কুকুর রোজ এক কেজি হরলিকস্‌ বিসকুট দিয়ে ব্রেকফাস্ট করছে। উৎপাতের ধন এই ভাবেই চিৎপাতে যায়।'

'ঠিক বলেছিস কুসী।'

বড়মামার সমর্থন শুনে মাসীমা ভীষণ অবাক হলেন, 'অ্যাঁ ভূতের মুখে রাম নাম।'

বড়মামা চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'একেবারে অন্য রাস্তায় যাত্রা। কমপ্লিট বিবেকানন্দ! জীবে দয়া করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর! প্রথমে পাঁচিশজন দিয়ে শুরু, ধীরে ধীরে একশো, দুশো, তিনশো, পাঁচশো, হাজার।'

মাসীমা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'হাজার কুকুর! অত কুকুর পাবে কোথায়?'

'গবেট! কুকুর নয়, কুকুর নয়, মানুষ। দরিদ্র নারায়ণ সেবা।'

'সে আবার কি? বারোয়ারী পুজো প্যান্ডেলে ফি বছর একদিন নারায়ণ সেবা হয়। তুমি তার প্রেসিডেন্ট হলে নাকি?'

'আজ্ঞে না স্যার। এ হবে সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের ফ্রী কিচেন, জাস্ট লাইক রাজা রাজেন মল্লিক অফ মার্বেল-প্যালেস। আজই নগেনকে ডেকে বাগানে একটা আটচালা তৈরির হুকুম দিচ্ছি। কালই খগেন এসে উনুন করে দেবে। পরশু আসবে চাল, ডাল, আলু, নুন, তেল, মশলা, তেজপাতা। তরশু বেলা একটা। দেখবি সে কি কাণ্ড? গরমাগরম খিচুড়ি খেয়ে লোক দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করতে করতে চলেছে—লং লিভ রাজা, সরি, ডাক্তার সুধাংশু মুকুজ্যে।'

'সর্বনাশ!'

'সর্বনাশ কি রে! বিবেকানন্দ বলে গেছেন, জন্মেছিস যখন দেয়ালের গায়ে একটা আঁচড় রেখে যা। তুই হবি এই নারায়ণ যজ্ঞের সুপারভাইজার। এক সেকেন্ড বস ত। তোর পরামর্শে হিসেবটা সেরে নি। ধর পাঁচিশজন।'

মাসীমা ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন।

'তুমি দেউলে হয়ে যাবে বড়দা! তুমি নিজে মরবে আমাদেরও মারবে।'

'আমি মরি মরব। জন্মিলে মরিতে হবে। তোরা মরবি কেন, বালাই ষাট। নে, বল, পাঁচিশজনে ডেলি কত চাল খেতে পারে? পেট ভরে খাবে, হাফভরা নয়, ফুলভরা।'

মাসীমা বললেন, 'পাঁচিশ কেজি!'

বড়মামা অবাক হয়ে বললেন, 'নার্ভাস করে দিচ্ছিস। বল, পাঁচিশ পো, মিনস্‌ ওই ছ' সের। মিনস্‌ র‍্যাকে কিনলে আঠার টাকা। এইবার ডাল। ছ' সের চালে কত ডাল লাগে রে? ফরমুলাটা কি?'

'চালের ডবল ডাল।'

'ভাগ্‌, ভাঙচি দিচ্ছিস, হাফ ডাল। হাফ মিনস্‌ তিন কেজি, পনের টাকা। আঠার প্লাস পনের ইজিকলটু তেত্রিশ। ইত্যাদি আরও সাত, মানে চল্লিশ। কয়লা, রান্না ইত্যাদি দশ। রোজ পঞ্চাশ টাকা, নাথিং, নাথিং। চল ভাগনে লেগে পড়ি।'

বড়মামার সে কি উৎসাহ! তড়াং করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। মাসীমা বললেন, 'ভাগনে কি ভাবে লেগে পড়বে?'

'যে ভাবে লাগাব সেই ভাবে লাগবে। ওর মত ছেলে লাখে

www.BanglaBook.org

একটা মেলে কিনা সন্দেহ।'

'সে ত বুঝলুম : কিন্তু তোমার এই রাজসূয় যজ্ঞে ও কি ঘোড়া ধরতে বেরোবে!'

'আমাদের এখন কত কাজ জানিস! আটচালা তৈরি। রাঁধবার লোক ঠিক করা। উনুন বসান। চাল-ডাল কেনা। তারপর প্রচার।'

প্রচার মানে?'

'প্রচার মানে?' বড়মামা রেগে গেলেন। 'প্রচার মানে প্রচার। লোকে জানবে কি করে? না জানতে পারলে লোক আসবে কি করে!'

'অ। তা সেটা কি ভাবে হবে! কাগজে বিজ্ঞাপন, বিবিধ ভারতী, দেয়ালে পোস্টার, মাইক নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরা, সিনেমায় স্লাইড! কোনটা!'

'ভ্যাক্। ওর কোনটাতেই কাজ হবে না। দুস্থ মানুষ যারা পড়তে জানে না, যাদের পয়সা নেই সিনেমা দেখে না, তাদের অন্যভাবে জানাতে হবে। ভোটের লিস্ট তৈরির মত পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে প্রকৃত গরিব মানুষ খুঁজে বের করে হাত জোড় করে সবিনয়ে বৈষ্ণবদের মত বলতে হবে, দয়া করে এই অধমের গরিবখানায় প্রসাদ গ্রহণ করবেন।'

মাসীমা বললেন, 'ডাক্তারি তা হলে মাথায় উঠল!'

'যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না, ইডিয়েট। যা আর এক কাপ চা করে আন। বেরিয়ে পড়ি। তোদের মত আলস্যযোগে জীবন ম্যাসাকার হতে দেব না। কর্মযোগ। কর্মযোগ! যোগ কর্মসু কৌশলম্। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিল। গীতা পড়েছিস গবেট!'

মাসীমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বড়মামা প্যান্ট জামা পরে তৈরি হবার জন্যে পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হলেন।

মাসীমা ঠক করে চায়ের কাপ টেবিলে রাখলেন। বড়মামা চমকে মুখ তুলে তাকালেন। কাগজে দক্ষিণ পাড়ার ম্যাপ আঁকছিলেন। যে যে রাস্তা ধরে আমরা যাব তারই পরিকল্পনা।

'খুব রেগে গেছিস মনে হচ্ছে!'

'রাগলে তোমার আর কি? তুমি কার পরোয়া কর? তবে তোমার এই সব ব্যাপার মেজদা জানে?'

'হু ইজ মেজদা! তার দর্শনে জীবে দয়া নেই, জিভে দয়া আছে। ভগবান একটা না দুটো, না শূন্য, ভগবান আমি না আমিই ভগবান, তিনি সাকার না নিরাকার, এই গোলকধাঁধাতেই বেচারা সারা জীবন বোকার মত ঘুরতে ঘুরতে ম্যাড হয়ে গেল। তুই যা তুই যা, আমাদের এখন অনেক কাজ। মেয়েদের সঙ্গে বকবক করার সময় নেই।'

মাসীমা বেশ বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন।

আমি বললুম, 'বড়মামা, হাওয়া খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

'রাখ রাখ, ঝোড়ো হাওয়াতেই আমাদের নিশান উড়বে পত পত করে।'

মটর-সাইকেলে উঠতে উঠতে বড়মামা বললেন, 'প্রথমে একবার চক্কর মেরে যাই। তুই শুধু চোখ-কান সজাগ রেখে দেখে যাবি। যেই মনে হবে এই লোক সেই লোক, সঙ্গে সঙ্গে আমার পিঠে খোঁচা। গাড়ি থামিয়ে তাকে যা বলার আমি বলব।'

বড়মামার মটর-সাইকেল—তার যেমন রঙ তেমন আওয়াজ। কানে তালা লেগে যাবার মত অবস্থা। শক্ত করে ধরে বসে আছি। পকেটে সেই ম্যাপ। বীরেন শাসমল রোড দিয়ে ঢুকে, রাম ঢ্যাং রোডে পড়ে, শরৎচন্দ্র স্ট্রীট হয়ে, কালু শেখ রোড ধরে বিরাট একটা চক্কর মারা হবে। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই বড়মামার অন্নসত্রে আসতে পারবে। বড় বড় হরফে দরমার গায়ে লেখা থাকবে, 'শক-হূন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।'

সবে সকাল হয়েছে। রাস্তায় বেশ লোক চলাচল। সকলেই যে যার কাজে চলেছেন। কেউ বাজারে। কেউ স্কুলে ছেলেমেয়ে পৌঁছাতে। কেউ অফিসে। চারপাশের দোকানপাট খুলে গেছে। জমজমাট ব্যাপার। সাইকেলের সামনে কাগজ ডাঁই করে হাঁকার চলেছেন বাড়ি বাড়ি কাগজ দিতে। চোখে এমন একজনও পড়ছে না যাকে মনে ধরে। বড়মামা বলে দিয়েছিলেন, 'দেখবি মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, জটপাকান চুল, গর্তে বসা চোখ, শির বার করা হাত, সামনে কুঁজো হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে, কিম্বা উদাস হয়ে রকে কি গাছতলায় বসে আছে, বিড় বিড় করে আপন মনে বকছে, দেখলেই বুঝবি এই সেই লোক, দি ম্যান।'

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর বড়মামা একটা বটগাছ তলায় গাড়ি থামিয়ে বললেন, 'দেশের কি রকম উন্নতি হয়েছে দেখছিস! গরিবী হাটাও ত সত্যিই গরিব হাটাও, সবাই ওয়েল-টু-ডু ম্যান। একটা লোকও চোখে পড়ল না!'

'বুধবার তা হলে পাল পাল ভিখিরি আসে কোথা থেকে?'

'আরে দূর। বুধবার এ তল্লাটের মিলফিল বন্ধ থাকে, পালে পালে বেরিয়ে পড়ে উপরি রোজগারের ধান্দায়। ওরা কেউ রিয়েল ভিখিরি নয়।'

'আমার কি মনে হয় জানেন?'

'কি?'

'আমরা যাদের খুঁজছি তারা কেউ উঠে হেঁটে আর বেড়াতে পারছে না। কোথাও না কোথাও ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে আছে।'

'হতে পারে। কিন্তু কোথায় শুয়ে আছে?'

'মনে হয় গঙ্গার ঘাটে, মোচ্ছব তলায়, শ্মশানে পাকুড়তলার বাঁধানো চাতালে।'

বড়মামা খুব তারিফ করলেন, 'মন্দ বলিসনি। উঠতেই যদি পারবে তা হলে ত খেটে খাবে। না খেতে পেয়ে সব লটকে পড়ে আছে। ঠিক বলেছিস। বড় হয়ে তুই ডিটেকটিভ হবি। চল তা হলে মোচ্ছব তলাতেই আগে যাই।'

বড়মামা নেচে নেচে মটর-সাইকেল স্টার্ট করলেন! ভু, ভটভট শব্দে আকাশ ফেটে গেল। গাছের ডালপালা থেকে পাখি উড়ে পালাল ভয়ে। গঙ্গার দিকে রাস্তাটা যতই এগোচ্ছে ততই ঢালু হচ্ছে। ইটের গোলা, খড়ের গোলা, বাঁশের গোলা, খড়কাটা কল চলছে ঘসঘস করে।

মোচ্ছব তলাতেই আমাদের প্রথম বউনি হল। একটি লোক উদাস মুখে বসে আছে। যেন জীবনের সব কাজ শেষ। হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে। মুখে অল্প অল্প কাঁচাপাকা দাড়ি। কোটরে বসা ঘোলাটে চোখ। শীর্ণ শীর্ণ হাত পা। ভাঙা গাল। বকের মত গলা।

'বড়মামা-আ।'

'দেখেছি।'

'সব মিলছে। তবে নাকে তিলক সেবা করেছে।'

'তা করুক। বৈষ্ণব, বুঝেছিস।' বড়মামা গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে নেমে পড়লেন। এইবার কথাটা পাড়বেন। লোকটির কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। কে ত কে! জগতে কোনও কিছুর পরোয়া করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না—এই রকম একটা ভাব। বড়মামা প্রথমে গঙ্গাদর্শন করলেন। তারপর মোচ্ছবতলায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। এইবার কি করেন দেখি।

লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নমস্কার হই।'

লোকটি বললে, 'জয় নেতাই।'

বড়মামা বললেন, 'জয় নিতাই।'

লোকটি বললে, 'দেশলাই আছে?'

'দেশলাই ত নেই।'

'সিগারেট আছে?'

'সিগারেট ত খাই না।' বড়মামা যেন খুব লজ্জা পেলেন।

'জয় নেতাই। পঞ্চাশটা পয়সা হবে?'

বড়মামার মুখের দিকে চেয়ে মনে হল আশার আলো ফুটেছে। এতক্ষণে লোকটি এমন একটা জিনিস চেয়েছে যা বড়-মামার কাছে আছে। পকেট থেকে একটা গোল টাকা বের করে লোকটির হাতে হাসি হাসি মুখে দিলেন।

'জয় নেতাই। পঞ্চাশটা পয়সা আবার ফেরত দিতে হবে না কি?'

'না না, পুরোটাই আপনার। এইবার একটা কথা বলব?'

'কি? কেউ মরেচে নাকি?'

বড়মামা চমকে উঠলেন, 'কেউ মরবে কেন?'

'আমার সঙ্গে লোকের কথা মানেই ত, কেউ মরেচে, দুঃখী বোস্টুম চল হে কেত্তন গাইতে হবে।'

'না না, ওসব নয়, ওসব নয়। অন্য কথা। আপনি খেতে পারবেন!'

'খেতে? কি খেতে? শ্রাদ্ধ!'

'না না, শ্রাদ্ধট্রাদ্ধ নয়। এমনি খাওয়া। রোজের খাওয়া। ভোগ আর কি?'

'কোন আশ্রম! আমি চরণদাস বাবাজীর চেলা। অন্য ঘরে নাম লেখাতে পারব না। ধম্মে সইবে না।'

'আশ্রম নয়। আমার বাড়িতে।'

'কার পাচিত্তির! কি অসুখ!'

'পাচিত্তির মানে? ও বুঝেছি। প্রায়শ্চিত্ত। না না, প্রায়শ্চিত্ত নয়। জাস্ট এমনি খাওয়া।'

'বদলে কি করে দিতে হবে? বেড়া বাঁধা, ঘুঁটে দেওয়া, চেলা কাঠ কাটা, খড় কাটা!'

'কিচ্ছু না কিচ্ছু না, ওসব কিচ্ছু না। রোজ একটা নাগাদ যাবেন, খাবেন-দাবেন, চলে আসবেন।'

'কি খাওয়া!'

'খিচুড়ি, ভাজাটাজা এই আর কি।'

'কি ডাল? মুসুর ডাল চলবে না। মুগ হওয়া চাই।'

'তাই হবে।'

'কি চাল? আলো না সেদ্ধ।'

'ধরুন সেদ্ধ।'

'হ্যাঁ সেদ্ধই ভাল। আলোতে পেট ছেড়ে দেবে। ও বেধবা-দেরই চলে। রেশনের কাঁইবিচি চাল না বাজারের চাল?'

'বাজারের, খোলা বাজারের ভাল চাল।'

'ঘি পড়বে, না খসখসে খেসকুটে? খিচুড়িতে ঘি না পড়লে টেস্ট হয় না।'

'হ্যাঁ তা পড়বে।'

'শালপাতায়, না কলাপাতায়, না চটা-ওঠা এনামেলের থালায়!'

'না না, ধরুন শালপাতায়।'

'হ্যাঁ, এনামেল হলে খাব না। তা শেষ পাতে একটু মিষ্টি না থাকলে জল খাব কি করে? বোস্টম মানুষ। একটু পায়েস হলেই ভাল হয়।'

'সপ্তাহে তিন দিন।'

'রোজ হলেই ভাল হয়। যাক মন্দের ভাল। হাঁ একটা কথা, বোস্টমীকে নিয়ে আমরা সাতটি প্রাণী। সপরিবারে না আমি একলা!'

বড়মামার মুখ দেখে মনে হল আকাশের চাঁদ পেয়ে গেছেন,

www.BanglaBook.org

'সাত জন? বলেন কি? এ যে দেখছি মেঘ না চাইতেই জল। না না, একা নয়, একা নয়। সপরিবারে।'

'জয় নেতাই। তা হলে কবে থেকে?'

'আজ হল গিয়ে রোববার। সোম, মঙ্গল, বুধ। হ্যাঁ, বুধ ভাল বার।

'প্রভুর নিবাস?'

বাব্বা, বড়মামা প্রভু হয়ে গেলেন। মেজমামা একবার শুনলে হয়। জ্বলে যাবেন। বড়মামা বাড়ির নির্দেশ দিতেই লোকটি বললে, 'অ, আমাদের কেদারবাবুর বড় ছেলে। সেই ছিটেল ডাক্তার!'

বড়মামার মুখটা কেমন হয়ে গেল, 'ছিটেল বললেন!'

'ছিটেলকে ছিটেল বলব না! সবাই জানে ডাক্তারটা খেয়ালী।'

'আমিই সেই ডাক্তার।'

'সে আগেই বুঝেছি। হক কথা বলব, ভয়টা কিসের! উকিল আর ডাক্তার শেষ জীবনে পারের কড়ি কুড়োতে চায় ধম্মকম্ম করে। সারা জীবনের অধম্মের পয়সা। একজন মারে মক্কেল, আর একজন মারে রুগী। দেখেন না, আজকাল মন্দিরে আশ্রমে কত ভীড়! সব ওই ভেজালদার কালোবাজারী, ডাক্তার, উকীল, এম এল এ, মন্ত্রী।'

ভেট্ ভেট্ করে মটর-বাইকে আসতে আসতে বড়মামা বললেন, 'কি রকম ট্যাঁকট্যাঁকে কথা শুনেছিস! ওই জন্যে লোকের ভাল করতে নেই। নেহাত সেদিন বইয়ে পড়লুম, লিভ, লাভ অ্যান্ড লাফ, তা না অ্যায়সা রাগ ধরছিল! যাক বরাতটা খুব ভাল। এই বাজারে সাত-সাতটা লোক পাওয়া! বাকি রইল আঠারটা।'

'ভাববেন না বড়মামা। ঠিক যোগাড় হয়ে যাবে। একবার খবরটা ছড়াতে দিন।'

আরও টহল মারা হল। এবার আর চারে মাছ পড়ল না, যাক সাতটা পড়েছে। ভাল ক্যাচ। বড়মামার বৃদ্ধ কম্পাউন্ডারের নাম সতুবাবু। ভার দেওয়া হল আরও আঠার জন সংগ্রহ করার। 'পারবেন ত!'

'হ্যাঃ', সতুবাবু অবজ্ঞার হাসি হাসলেন, 'আঠার কেন, আঠারশো ধরে এনে দিতে পারি।'

বেলা বারোটা নাগাদ লোকলস্কর নিয়ে বড়মামা নেপোলিয়নের মত মার্চ করে বাড়ি ঢুকলেন। একজন বাগানের আগাছা পরিষ্কার করবে, বাঁশ বাঁধবে। একজন উনুন পাতবে। একজন দরমা ঘিরবে। মাসীমা সেই পল্টন দেখে হাঁ হয়ে গেলেন। এখনি হুকুম হবে, চা দে কুসী, চাল নে, সব ভাত খাবে।

হই-হই ব্যাপার।

মেজমামা এক ফাঁকে খুব গম্ভীর মুখে আমাকে ডাকলেন, 'কি সব হচ্ছে হে! ভূতের নৃত্য!'

'খুব মজা মেজমামা। কত লোক আসবে। খাবে। দু'হাত তুলে খাবার সময় চিৎকার করে বলবে, 'জয় রাজা রাজেন মল্লিক।'

'রাজা রাজেন মল্লিক! তোমার বড়মামা কি নাম পালটে ফেললে নাকি! নাম ভাঁড়িয়ে শেষে এই অসৎ কাজে নেমে পড়ল?'

'আমি কি বলতে কি বলে ফেলেছি! আসলে বলবে, জয় রাজা সুধাংশু মুকুজ্যে।'

'রাজা! কোথাকার রাজা? কাম্পুচিয়ার! ওই টাইমটেবলটা আন ত।'

ড্রয়ারের ওপর থেকে টাইমটেবলটা এনে মেজমামার হাতে দিলুম। একটা পাতা খুলে বিড় বিড় করে পড়তে লাগলেন, 'আট নম্বর প্ল্যাটফর্ম, রাত নটা চল্লিশ।'

'কোথায় যাবেন মেজমামা!'

'যেদিকে দু'চোখ যায়।'

'সে কি?'

'হ্যাঁ তাই। পাগলামি অনেক সহ্য করেছি। আর নয়।'

'দরিদ্রসেবা পাগলামি? অসৎ কাজ?'

'পরে বুঝবে। এখন যেমন নাচছ নেচে যাও। সবুরে মেওয়া ফলবে। তখন মেও সামলাতে পুলিস ডাকতে হবে।'...

বড়মামা জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রফেসার কি বলছিল রে?'

'বলছিলেন, অসৎ কাজের ঠেলা পরে বুঝবে কাম্পুচিয়ার রাজা।'

'অসৎ কাজ!' বড়মামা হই হই করে হেসে উঠলেন, 'হিংসে, বুঝলি, হিংসে। সারাজীবন ছেলে ঠেঙিয়ে কিছুই করতে পারল না, আমি এক কথায় ফেমাস হয়ে গেলুম। এখন পরিচয় দিতে গেলে বলতে হবে, সুধাংশু মুকুজ্যের ভাই। কোন সুধাংশু? আরে সেই ডকটর সুধাংশু, গরিবের মা-বাপ।'

'মেজমামা ত রাত নটা চল্লিশের ট্রেনে যেদিকে দু-চোখ যায় সেই দিকে চলে যাচ্ছেন।'

'তাই না কি? হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী। ভজা, ভজা!'

বড়মামার পার্শ্বচর ভজা। 'যাই বড়বাবু।'

'চাল?'

'আ গিয়া।'

'ডাল?'

'ও ভি আ গিয়া।'

'বহুত আচ্ছা। চা বানাও।'

ভজা গান গাইতে গাইতে চলে গেল। গোয়ালে গরু তিনটে ফ্যাল ফ্যাল করে প্রায় খালি ডাবরের দিকে তাকিয়ে আছে। কালোটা হাম্বা করে ডেকে উঠল।—এবার দুধ দেবার চেষ্টা কর, নয়ত মালিক খুব ক্ষেপে গেছে। ন্যাজ মলে বিদায় করে দেবে।

মঙ্গলের ঊষা বুধে পা। সানাইটাই যা বাজল না। তা ছাড়া সবই হল। সকালে মন্ত্র পড়ে উনুন পুজো হল। বাঁশ থেকে ফুলের মালা ঝুলল ঝুলুর ঝুলুর করে। কাগজের রঙীন শিকলি চলে গেল এপাশ থেকে ওপাশে। শ্যাম জেঠা বেলতলায় বসে সকাল থেকে চণ্ডীপাঠ করলেন।

বড়মামা মাসীমাকে ডেকে বললেন, 'কুসী, সকালে আমি আর তোদের বাড়িতে খাব না। সকলের সাথে ভাগ করে নিতে হবে অন্নপান, অপ্পাত্তি হতে হবে তাহাদের সবার সমান। আমি হর্ষবর্ধন। সর্বস্ব দান করে নিজের পরনের কাপড়টা পর্যন্ত দান করে দেব...।'

'তারপর নেংটি পরে কুয়োতলায় ধেই ধেই করে নাচবে।' মাসীমা রেগে চলে গেলেন।

মেজমামা দোতলার বারান্দা থেকে মাসীমাকে চিৎকার করে বললেন, 'ভুলে যাসনি, আমার ট্রেন রাত নটা চল্লিশে।'

ওদিকে বেলতলায় শ্যাম জেঠার উদাত্ত গলা, 'রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি।' জোড়া উনুনে আগুন পড়েছে। গল গল করে ধোঁয়া উঠছে আকাশের দিকে গাছের ডালপালা ভেদ করে।

মেজমামা খুব উত্তেজিত হয়ে বারান্দায় পায়চারি করতে

www.BanglaBook.org

করতে বললেন, 'সেই সাতসকাল থেকে দেহি দেহি শুরু হয়েছে। যার অত দেহি দেহি সে হবে দাতা কর্ণ!'

ছ'টা কুকুর বাড়ি একেবারে মাথায় করে রেখেছে। যত অচেনা অচেনা লোক দেখছে ততই ঘেউ ঘেউ করছে। মাসীমা গ্লিসারিন তুলো ভিজিয়ে কানে গুঁজে রেখেছেন। কোন কথাই শুনতে পাচ্ছেন না। সে এক জ্বালা! জল চাইলে তেল এনে দিচ্ছেন।

পেয়ারা গাছের ডালে কাঁসার ঘড়ি বাঁধা হয়েছে। সাবেক কালের জিনিস। বেলা একটার সময় ঠং করে বাজিয়ে ঘোষণা করা হবে—শুরু হল। সবাই বসে পড়।

দেখতে দেখতে একটা বেজে গেল। ভজুয়া দাঁতমুখ খিঁচিয়ে, চোখ বন্ধ করে, দু'হাতে একটা লোহার রড ধরে ঘড়িতে ঘা মারল। সারা এলাকা কেঁপে উঠল ঠ্যাং শব্দে। আওয়াজ বটে। কানে তালা লেগে যাবার যোগাড়।

সবার আগে এল জয় নিতাইয়ের দল। সপরিবারে, হই হই করে। সকলেরই নাকে নিখুঁত রসকলি। বোষ্টুম, বোষ্টমী, গেঁড়ি গেঁড়ি ছেলেমেয়ে। এটা লাফায়, ওটা ছোটে। বড়টা ছোটটার মাথায় গাঁট্টা মারে। ছোটটা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। মা সবকটাকে ধরে পাইকারি পিটিয়ে দেয়। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, শ্যাম জেঠার আর্তনাদ।

'বসে পড় সব, বসে পড় সব।'

ফোলডিং চেয়ারে উলটে চার বছরের ছেলেটা মাটিতে চিৎপাত হল। বুকের ওপর চেয়ার। পায়ায় ঠাং জড়িয়ে গেছে।

'জয় নেতাই, পড়ে গেছে রে বাপ। খেঁচকে তোল আপদটাকে।'

'তুলসীগাছ কোন দিকে?'

'তুলসীগাছ কি হবে গো?' ভজুয়া জিজ্ঞেস করল।

'দূর বেটা খোট্টা। তুলসীপাতা ছাড়া ভোগ হয়!' বড়মামার তুলসীঝাড় ফাঁক।

পঁচিশ কোথায়? পিল পিল করে লোক আসছে।

বড়মামা আঁতকে উঠলেন, 'মরেছে, এ যে রাজসূয় যজ্ঞ রে? হাঁড়ি নয়, ড্রাম ড্রাম খিচুড়ি লাগবে। স্টপ দেম! অ্যানাউনস্ করে দে, পঁচিশ জনের বেশি নয়। গেটটা বন্ধ করে দে রাশকেল ভজুয়া।'

'গেট বন্ধ করে আটকান যাবে না ডাগদারবাবু? গেট টপকে চলে আসবে।'

'ধাক্কা মেরে বের করে দে।'

'মেরে শেষ করে দেবে বাবু।'

বড়মামা গলা চড়িয়ে বললেন, 'শুনুন, শুনুন, আমাদের এই আয়োজন মাত্র পঁচিশ জনের জন্যে।'

প্রত্যেকেই চিৎকার করে উঠল, 'আমি সেই পঁচিশ জনের একজন।'

'তা কি করে হয়! এখানে অনেককেই দেখছি যাঁরা টেরিকটের প্যান্টশার্ট পরে এসেছেন। বড় বড় চুল। দে আর নট গরিব।'

চিৎকার উঠল, 'আমরা মডার্ন গরিব। বেকার বসে আছি বছরের পর বছর।'

'আমি মডেল গরিব বেছে নেব।'

'বেছে নেব মানে? এটা কি স্টেট লটারি? কে বেছে নেবে?'

বড়মামা খুব অসহায়ের মত বললেন, 'সে কি রে বাবা, এরা যে দেখছি তেড়িয়া হয়ে উঠছে বেশ, জোর যার মুলুক তার। আপনারা পঁচিশজন বাকি সকলকে ঠেকিয়ে রাখুন। তাজিয়া কাজিয়া যা হয় নিজেরাই ফয়সালা করুন।'

মার, মার, হই, হই, রই, রই। হে রে রে রে করে লোক ঢুকছে। যেন দশ আনার টিকিটের সিনেমার কাউন্টার খোলা হয়েছে।

ভজুয়া পালাতে পালাতে বললে, 'আরও আসছে বাবু। নারায়ণকা জুলুস নিকলেছে আজ।'

শ্যাম জেঠা পালাতে পালাতে বললেন, 'সুধাংশু, প্রাণে যদি বাঁচতে চাও পেছনের দরজা দিয়ে পালাও।'

বড়মামা ভয়ে পেছতে পেছতে বললেন, 'য পলায়তি স জীবতি। ব্যাপারটা বুঝে লাঞ্চের মত হয়ে গেল। যে পারে সে নিয়ে থাক।'

চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়ে গেছে। বাঁশের খুঁটি উপড়ে ফেলেছে। একপাশের সামিয়ানা কেতরে গেছে। পেছনের দরজা দিয়ে রাস্তায় পড়ে বড়মামার লাল মটর-বাইক তীরবেগে পশ্চিমে ছুটছে।

মেজমামা কাঁপতে কাঁপতে টেলিফোন ডায়াল করছেন।

'হ্যালো থানা। নরনারায়ণে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে। বড় বড় থান ইট ছুঁড়ছে। ও সেভ আস, সেভ আস।'

ছ'টা কুকুর বাগানে নেমে পড়েছে খেপে গিয়ে। মাসীমার কানে অ্যায়সা তুলো ঢুকেছে কিছুতেই বের করতে পারছেন না। মাথার কাঁটা, দেয়াশলাই কাঠি যতই খোঁচাখুঁচি করছেন গ্লিসারিন-তুলো ততই ভেতরে চলে যাচ্ছে। কেবল বলছেন, 'এখনও চণ্ডীপাঠ হচ্ছে! শিবাবৃষ্টি হচ্ছে না কি রে!'

'আর দাঁড়াতে পারছি না। আমার পা কাঁপছে। প্যান্ডিমোনিয়াম! আরে দূর মশাই, হারমোনিয়াম নয়, প্যান্ডিমোনিয়াম।'

www.BanglaBook.org

তারিক আলি-দ্বারিক মালি

অশোক মুখোপাধ্যায়

তিন তারিখে এসেছিল আমার কাছে তারিক আলি,
সংগে তাহার যমজ ভ্রাতা দ্বারবংগের দ্বারিক মালি।
শুধাই তাকে, 'তারিক মিঞা, তোমরা দুজন ভাই কি ক'রে?
দ্বারিক থাকে দ্বারভাঙাতে, তোমার ডেরা সেই লাহোরে ;
তুমি পড় কোরাণ শরীফ, দ্বারিক তো গায় তুলসী গাথা,
তোমার ভোজন গোস্ত কাবাব, দ্বারিক কভু ছোঁবে না তা ;
তোমার আজান সন্ধ্যাবেলা, আল্লা তোমার মক্কাবাসী,
দ্বারিক ভজে হনুমানজী, তীর্থ তাহার গয়া কাশী ;
তোমার মুখে ফুরফুরে নূর, আতর তাহে গন্ধ খাসা,
দ্বারিক রাখে গালপাট্টা, মুখে তাহার খৈনি ঠাসা।
হিসাব কিছুই মিলছে না হে, কও তো বাপু সত্যি ক'রে
তারিক আলি দ্বারিক মালি ভাই হ'লে আজ কিসের জোরে?'
তারিক বলে, 'আর্জি শুনুন, একই বাপের আমরা ব্যাটা,
সাত-চালিশে ভাগ হয়েছি কেউ জানে না সেই কথাটা।
বাপের ছিল ফলের দোকান লাহোর সিটি ইস্টিশানে,
দ্বারভাঙাতে ফলের বাগান শহর ছেড়ে দেহাত পানে।
বাপের সাথী হ'তাম আমি পয়লা ছ'মাস খাস লাহোরে,
দ্বারিক তখন আম ফলাতো দ্বারভাঙাতে বাগান ক'রে ;
বাকি ছ'মাস দ্বারিক হ'ত বাপের সাথে লাহোরবাসী,
আমি তখন দ্বারভাঙাতে বাগান-করা পাকা চাষী।
ভালোই ছিলাম বাবুমশাই মিলে মিশে একটা দেশে,
ওলট-পালট করল সবই সাত-চালিশের ভাগটা এসে ;
বাপ আমাদের পড়ল কাটা দাঙ্গা লেগে সেই লাহোরে,
জানটা আমার বেঁচে গেল তারিক আলি নামের জোরে।
নিলাম তখন বাপের দোকান হ'য়ে গেলাম পাকিস্তানী,
দ্বারিক নিল বাগানখানা, করে এখন হিন্দুয়ানী।
এই আমাদের আসল কথা, শুনুন বাবু সাত ক'রে—
বুঝেছেন তো এখন ঠিকই ভাই আমরা কিসের জোরে!'
'খুব বুঝেছি তারিক মিঞা, কিন্তু আছে একটা কথা—
তুমি এখন পাকিস্তানী, দেশে তোমার জায়গা কোথা?'
দ্বারিক ছিল পাশেই বসে দিচ্ছিল তা গুম্ফে তারি—
প্রশ্ন শুনে হঠাৎ কেশে দ্বারিক নিল কণ্ঠ ঝাড়ি,
তারপরে সে বললে হেসে, 'তারিক এবার দ্বারিক হবে,
লাহোরবাসী আজ আমি, সবাই আমায় তারিক কবে ;
বদল হবে সকল কিছু—আহার, বিহার, জুলপি, দাড়ি ;
তারিক নেবে গালপাট্টা, আমি হব নূর-বাহারি।
খৈনি মুখে তারিক এখন এক নাগাড়ে হিন্দি ক'বে,
আমার মুখে উর্দু জবান—গুলাব আতর সংগে রবে—
এমনি ক'রে চলবে বাবু ভাঙা দেশের জোড়াতালি,
দ্বারিক যখন তারিক হবে, তারিক হবে দ্বারিক মালি।'

১৩৮৩

www.BanglaBook.org

সিগারেটের টুকরো

সত্যিকারের গোয়েন্দা কাহিনী

জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

সময়টা ভাদ্রমাস। কথায়ই বলে ভাদ্রমাসের ভ্যাপসা গরম, তায় আবার কলকাতা শহর, যেখানে পৌষ মাসেও অনেক রাতে বাড়িতে পাখা না খুলে ঘুমোতে পারে না।

এ বছর আবার গরমটা যেন আরও বেশি। কাল অনেক রাতে রোঁদ (round) থেকে ফিরে এসে পুলিশ ইন্‌সপেকটার ব্যানার্জি ওরফে জেকে বা জ্যাক্ ভোরের দিকে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বৃথা এ সাধনা, পাখা সত্ত্বেও অসহ্য গুমোট তাকে বারে বারে সজাগ করে তুলছিল।

বোধ হয় বিধিই বাম, অন্তত তার ঘুমের বেলায়—কারণ একটু পরে তার কোয়ার্টারের ফ্ল্যাটের দরজায় ক্রিং ক্রিং করে কলিং বেল বেজে উঠল।

থানা থেকে ভগ্নদূত বার্তাবাহক সেপাই বয়ে এনেছে এক দুঃসংবাদ। এলাকায় বিরাট এক চুরি হয়ে গেছে। বড় সাহেবের হুকুম, এখনই তাকে তদন্ত করতে যেতে হবে। বের করতে হবে অপরাধী ও বাম্যালের হদিস।

মুহূর্তে সারা মন-মেজাজ খিঁচড়ে উঠল ব্যানার্জির। কি কুক্ষণেই না সে পুলিসের উর্দি গায়ে চড়িয়েছিল। সারা চাকরি জীবনে একদিনের তরেও সে যদি শান্তি বা স্বস্তি পেয়েছে! প্রায়ই মনে হত যাক চুলোয় খাতির, পদোন্নতি, ভবিষ্যৎ। এক্ষুনি সে ইস্তফা-পত্র ঝেড়ে দেবে। এর চেয়ে মুটেগিরি করে খাওয়াও বোধ হয় ভাল।

কিন্তু কথায় বলে স্বভাব যায় না ম'লে। পরক্ষণেই তার গোয়েন্দাসুলভ কৌতূহল মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কী চুরি, কোথায় হয়েছে, কার বাড়ি, কত টাকার মাল, কোন দুঃসাহসী অপরাধীর কীর্তি এটা—এই সব চিন্তায় তাকে পেয়ে বসল। ফলে সে আর ঝামেলা না বাড়িয়ে গায়ে পুলিস ইন্‌সপেকটারের উর্দি চাপিয়ে, কোমরে রিভলবার ঝুলিয়ে হাতে টর্চ আর বেটনটা তুলে নিয়ে তৈরি হয়ে নিল। বগলে নিল কাগজপত্রের ফাইল। আর্দালী কনেস্টবল রতন নিয়ে চলল ইনভেস্টিগেশন কিট বা গোয়েন্দা সরঞ্জামের বাক্স।

পেয়ারের খাস দেশী কুকুর 'মুগুর' তার নিত্যকার অভ্যাসমত প্রভুর খাটের তলায় ঘুমোচ্ছিল। টের পেয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে মেঝেতে গোটা দুই ডন টেনে শরীর চাঙ্গা করে তুলল। ইচ্ছা—সেও যাবে প্রভুর সঙ্গে। জ্যাকের সঙ্গে সঙ্গে থেকে গোয়েন্দাগিরি ও চোর ডাকাত বদমাস ধরাতে যেন তারও নেশা লেগে গেছে। কিন্তু জ্যাক তাকে হাতের ইশারায় ও চোখের ধমকে নিষেধ করে নির্দেশ দিল ফের তার নিজের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়তে। তাকে এখন উপস্থিত জ্যাকের প্রয়োজন নেই। পরে দরকার হলে অবস্থা বুঝে বিবেচনা করা যাবে। নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও অপ্রসন্নচিত্তে 'মুগুর' ফিরে গেল নিজের আশ্রয়ে। এক বোধ হয় জেকে ছাড়া দুনিয়ার আর কাউকেই বা কোন কিছুতেই মুগুর ভয় পায় না।

জীপ তৈরিই ছিল। ফুল স্পীডে জীপ চালিয়ে থানায় পৌঁছাতে জ্যাকের দশ মিনিটের বেশি লাগল না। গিয়ে দেখে, অন্য সবাই সেখানে তার জন্যই উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে।

পুরো ঘটনাটা সে শুনতে পেল সহকর্মী সমরের মুখে।

চুরিটা হয়েছে মহাত্মা গান্ধী রোডের এক বিখ্যাত গহনার দোকানে। সবশুদ্ধ প্রায় হাজার চল্লিশেক টাকার মাল খোয়া গেছে। এত বড় চুরি এ তল্লাটে বহুদিন হয়নি।

আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই জ্যাক ও সমরসহ একদল তদন্তকারী পুলিস অফিসার ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেল। আগেই স্থানীয় ফাঁড়িতে ফোন করে ঘটনাস্থল ঘিরে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, যাতে তদন্তের জন্য দরকারী সূত্রাদি বা অপরাধীর কোন চিহ্ন বা নিশানা নষ্ট না হয়।

ওরা গিয়ে পৌঁছোতে সেখানকার প্রহরীদল জ্যাককে স্যালুট ঠুকে সসম্মানে পথ ছেড়ে দিল। মৃদু হেসে প্রত্যভিবাদন করে জ্যাক প্রহরী-প্রধানকে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিন্ত হল যে ঘটনাস্থল যেমন তেমনি আছে—কেউ জিনিসপত্র নাড়াচাড়া ঘাঁটাঘাঁটি করেনি।

এরপর প্রথমটা জেকে গয়নার দোকানের মালিককে ও দোকানের অন্য কর্মচারীদের জিজ্ঞেস করে যতটুকু পারল ঘটনার পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করে নিল। তারা অবশ্য অপরাধী সম্পর্কে কোনরকম সূত্র বা আভাসই দিতে পারল না। চুরি সম্পর্কে তাদের কাউকেই সন্দেহ নেই।

এরপর জ্যাক ও তার নির্দেশমত তার অন্য সহকর্মিগণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঘটনাস্থল তল্লাসী ও খুঁটিয়ে পরীক্ষা শুরু করে দিল। তারা দোকানঘরের মেঝের কেন্দ্রবিন্দু থেকে শুরু করে সাইকেলের চাকার স্পোক বা কাঁটার মত ঘটনাস্থলের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত বিভিন্ন জন বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তল্লাসী করতে করতে। এ পদ্ধতিতে খানাতল্লাসী শেষ হবার পর তারা আবার ঘটনাস্থলের কেন্দ্রবিন্দু আর একবার ঘড়ির কাঁটার উল্টোদিকে এগিয়ে ঘর ও ঘটনাস্থল তন্ন তন্ন করে তল্লাসী শেষ করল। কিন্তু এতেই তারা ক্ষান্ত হল না।

এরপর আবার ঘটনাস্থলকে কয়েকটি জ্যামিতিক ক্ষেত্রে বা 'মোরব্বায়' বিভক্ত করে এক এক জন তদন্তকারী অফিসার বা আই. ও. এক একটি মোরব্বার ভার নিল পূর্ণ তল্লাসীর জন্য।

www.BanglaBook.org

বেল বা ছাঁচি বা চালকুমড়োর মোরব্বা তোমরা ত নিশ্চয়ই খেয়েছ। ওগুলির মোরব্বা নাম কেন হয়েছে, নিশ্চয়ই তা এখন বুঝতে পারছো। জ্যামিতিক আকৃতির খণ্ডগুলোকেই বলে মোরব্বা। সার্থক তদন্তের অঙ্গ হিসাবে এইসব অভিনব তল্লাসী কৌশল জেকের শেখা সরকারী গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় থেকে।

জেকের নেতৃত্ব ও নির্দেশে এইসব কায়দা-কানুন ও কৌশল প্রয়োগ করেও ঘটনাস্থল থেকে তেমন কিছুই মূল্যবান সূত্র বা নিশানা পাওয়া গেল না যা থেকে অপরাধীর সম্ভাব্য হদিস মিলতে পারে এবং ঘটে যাওয়া অপরাধের সঙ্গে প্রকৃত অপরাধীর যোগসূত্র নির্ণয় করা যায়। মানে অপরাধী বলে যাকে সন্দেহ, বা যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই আসল অপরাধী কিনা—তাই স্থির করা অকাট্য সাক্ষ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে। এটাই ত গোয়েন্দা বা আই. ও.-র কাজ। জেকে তা ভাল করেই জানে।

এই সঙ্গে লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদও চলল অবিশ্রান্ত। বলা বাহুল্য এখানেও জ্যাক বা জেকেই দলনেতা। তারই পরামর্শ ও নির্দেশে সব কিছু হতে লাগল।

ঘটনাস্থলে প্রথমে পদার্পণ করেই এবং পরে সব কিছু দেখেশুনে জেকে একরকম স্থির নিশ্চিত হয়েছিল যে এটা পরিষ্কার একটা সিঁধেল চুরির ঘটনা—যাকে বলে বেড়ালসিঁধ বা ক্যাট্ বারগ্লারি। তার মানে এক্ষেত্রে অপরাধী বা অপরাধীরা বাইরে থেকে তালাবন্ধ দোকানঘরের ভেতর যেভাবে প্রবেশ করেছে তা সাধারণতঃ বেড়ালরাই করতে পারে। ওরা বাড়ির নর্দমা নল বা ড্রেনপাইপ বেয়ে ওঠে, তারপর ছাদের কাছে ভেনটিলেটারের গবাক্ষপথে ওপরে ঢোকে। বেড়ালই সচরাচর এভাবে গৃহস্থবাড়িতে ঢোকে মাছ, দুধ ও অন্য খাবার চুরি করে খাবার জন্য।

এরপর চোর বা চোরেদের পরবর্তী কাজ ছিল মনে হয় খুব সহজ। কোন বাড়ির সাধারণতঃ সব দরজাই বাইরে থেকে তালাবন্ধ থাকে না। ভেতরের দিকটা থাকে খিল বা ছিটকিনির দ্বারা আবদ্ধ। মাত্র সদর দরজায়ই সাধারণতঃ বাইরে থেকে তালা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও তাই। ড্রেনপাইপ বেয়ে ভেণ্টিলেটার দিয়ে ভেতরে ঢুকে চোরের প্রথম কাজ হল ভেতর থেকে খিল বা ছিটকিনি খুলে ফেলে দরজা দিয়ে পালাবার রাস্তা তৈরি করে রাখা। এরপর চোরেদের একজন বাইরে পাহারায় থাকে, সন্দেহজনক কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে দলের অন্যান্যদের সাবধান করে দেয়—বাকি লোক ঘরের মধ্যে টাকা-পয়সা বা দামী জিনিস হাতিয়ে সট্‌কান দেবার ফিকিরে থাকে!

তা এক্ষেত্রে চোর বা চোরেরা তাদের কাজ ভালভাবেই হাসিল করতে পেরেছে দেখা যাচ্ছে। চোরের কপাল জব্বরই বলতে হবে। মালকড়ি হাতিয়েছে বেশ মোটা হাতেই। এখন শেষরক্ষা করতে পারে কি না দেখা যাক।

জেকে রহস্য করে তার সহকর্মীকে বলল, 'তস্করদের এই অপারেশনকে মোটেই কোন হাতুড়ে ডাক্তারদের অপারেশন বলা যায় না—কি বল বাসু? সেন, তোমার কি মত? মাইনর ত নয়ই, মেজর অপারেশন, নয় কি? যাই বল, তস্কররাজের হাতের ওস্তাদির তারিফ না করে পারা যায় না, যেভাবে তারা কোন রকম ক্লু না রেখে অপকর্মটি সমাধা করে কেটে পড়েছে এবং আমার মত লোককেও ধাঁধিয়ে ফেলেছে, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একাজের পেছনে নিশ্চয়ই কোন পাকা মাথা গুরুদেব চোর রয়েছে। কোন ছিঁচকে চোর বা হেঁজিপেঁজির কম্ম এ হতেই পারে না।'

সেন ও বাসু দুজনেই সমস্বরে জবাব দিল, 'নিশ্চয়ই স্যর, আমাদেরও তাই মনে হচ্ছে। তবে আপনি যখন হাত দিয়েছেন তখন আমরা জানি আপনি ঠিকই রহস্যটার কিনারা করে ছাড়বেন। আজ অবধি কোন মামলায় ত আপনাকে বিফল হতে দেখলাম না। আপনি কোন মামলার তদন্তে হাত দিলে অপরাধী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। এবার নির্ঘাৎ তার কপাল ভেঙেছে, কারণ আপনার হাতে কোন অপরাধীরই নিষ্কৃতি নেই। এখন দেখা যাক স্যর আপনার হাতযশই ভরসা।'

জেকে জবাব দিল, 'অত বোলো না হে, সব ভাল যার শেষ ভাল। এ কেসটা খুব সহজ মনে হচ্ছে না। তবে তোমরা ত জানো, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ—এই আমার নীতি। দেখা যাক শেষ অবধি চেষ্টা করে কি হয়।'

জেকে ও তার নির্দেশে তার সহকর্মিগণ এবার তদন্ত সরঞ্জামের বাক্স বা ইনভেস্টিগেশন কিট বক্স খুলে দরকারমত কয়েকটি জিনিস বেছে নিল, যেমন, হাতে পরবার দস্তানা বা গ্লাভস্, আতস কাঁচ বা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস, কোন জিনিসের গায়ে হাতের আঙ্গুলের অদৃশ্য ছাপ আবিষ্কার ও উদ্ধারের জন্য ধূসর ও কালো মিহি গুঁড়ো ছড়াবার ছোট্ট হাত-পাম্প বা অটোমাইজার, উটপাখির পালকের সূক্ষ্ম লোমের ও উটের পশমের তৈরি ব্রাশ। আঙ্গুলছাপ খুঁজে বের করতে হলে কোন বস্তুর উপরে ছড়িয়ে দেওয়া হয় সূক্ষ্ম গুঁড়ো। ব্রাশ দিয়ে হাল্কাভাবে ঝেড়ে ফেললে তার ওপর পাওয়া যায় অপরাধীর অসতর্ক হাতের আঙ্গুলের ছাপ। এরপর ওরা সঙ্গে নিল পায়ের ছাপ তুলবার জন্য খড়ির গুঁড়োর মত প্লাস্টার অব প্যারিস ও কাদার তালের মত নরম প্লাস্টিসিন।

সবই একে একে প্রয়োগ করা হল, কিন্তু বৃথা। কোনই সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেল না কোনটির থেকে। অপরাধী যে তিমিরে সেই তিমিরে। তার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আলোকপাত হল না কোথাও থেকে।

দোকানের মালিক কর্মচারী আশেপাশের বাড়ির লোকজন—এমন কি সন্দেহজনক কয়েকটি স্থানীয় দাগী চোর, যাদের ইতিমধ্যেই আটক করা হয়েছিল জেকের নির্দেশে, তাদের একনাগাড়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোনো ফল পাওয়া গেল না। সন্দেহজনক কোন কিছুই আর আবিষ্কার হল না। এমন কোন সূত্র পাওয়া গেল না যা ধরে অপরাধী সম্পর্কে তদন্ত এগোতে পারে! জেকে চিন্তায় পড়ে গেল। সে কয়েকজন সহকর্মীকে নির্দেশ দিল স্থানীয় দাগী চোরদের ঘটনার রাত ও তার আগের ক'দিনের গতিবিধির হালহদ্দ সংগ্রহ করতে—তাতে বিশেষ কোনো লাভের আশু সম্ভাবনা নেই জেনেও।

জেকে মনে মনে আবার মামলাটি ঝালিয়ে নিল। ঘটনাটি ত একটি আসল সিঁধেল চুরির ঘটনা, যাকে বলে বেড়ালসিঁধ বা ক্যাট বারগ্লারি—তাই। সোনারপুরের এই বিরাট দোকানটি বড় রাস্তার একদম পাশে। ঘটনার সময় আনুমানিক মধ্যরাত্রির পরে। কারণ দোকানের মালিক ও তার কর্মচারী-কারিগরগণ দোকানের নগদ টাকাকড়ি গুনেগেঁথে হিসেবনিকেশ করে এবং দামী জিনিসের হিসাব মিলিয়ে সিন্দুকে ও আলমারীতে তুলে তালাচাবি দিয়ে দোকান বন্ধ করে বেরিয়েছে পৌনে একটা

www.BanglaBook.org

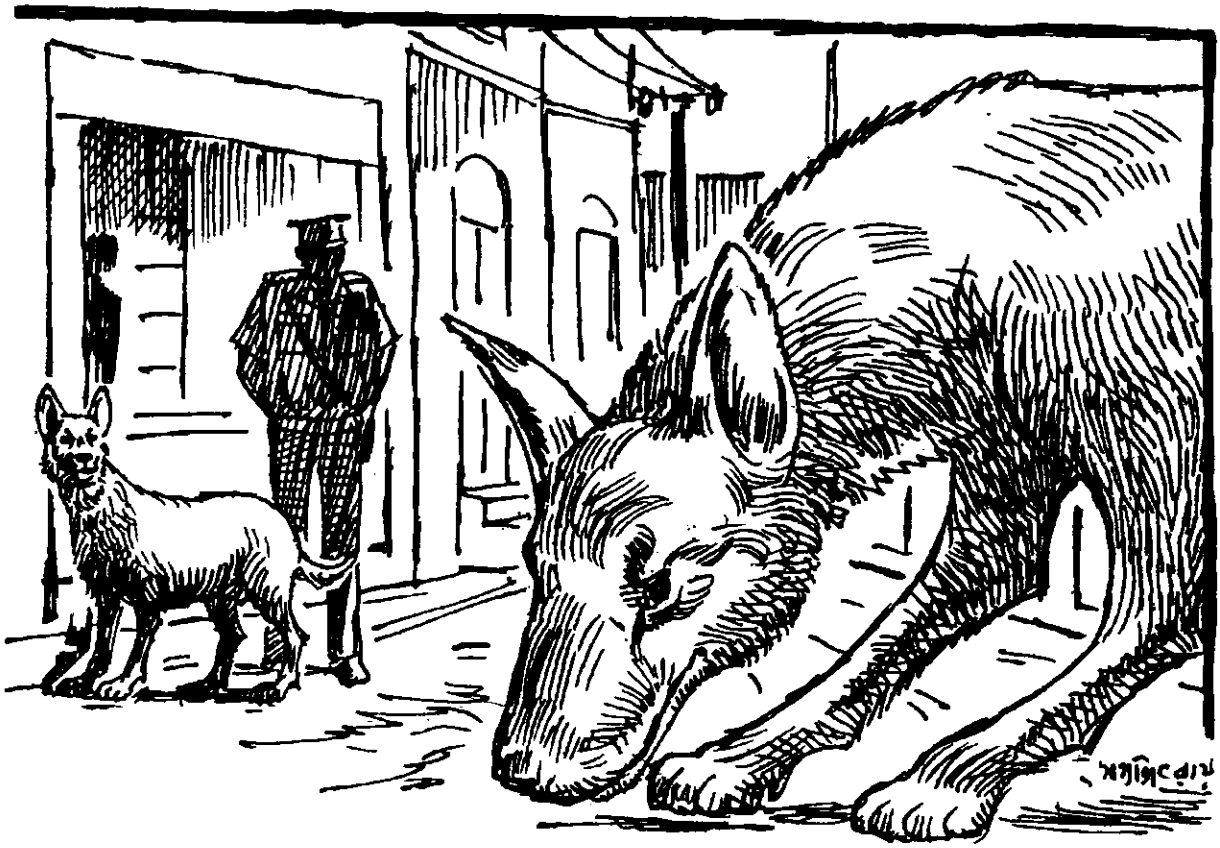

নাগাত।

যাই হোক, প্রাথমিক তদন্ত তল্লাসীতে যখন কোন আশানুরূপ ফল ফলল না, তখন জেকের নির্দেশে সাজসরঞ্জাম গুটিয়ে তদন্তকারীগণ যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। জেকে ভাবছিল একবার মুগুর বা অন্য কোন গোয়েন্দা কুকুরের সাহায্য নিলে কেমন হয়। যে কথা সেই কাজ। গোয়েন্দা কুকুর রাজাকেও সৌভাগ্যক্রমে কাছাকাছিই আনা হয়েছিল অন্য কি দরকারে। তাকে ঘটনাস্থলে চোরের ছোঁওয়া জিনিস শুঁকিয়ে দেওয়া হল। জেকের নিজস্ব কুকুর মুগুরকেও নিয়ে আসা হল। উভয় কুকুরই শোঁকাশুঁকি করে এধার-ওধার আনাচ-কানাচ অনেক ঘোরাঘুরি দৌড়োদৌড়ি করল। বড় রাস্তা অবধি খানিক এগিয়েও গেল ঘেউ ঘেউ করতে করতে। তারপর তারা দাঁড়িয়ে অসহায়ের মত ঘেউ ঘেউই শুধু করতে লাগল। জেকে বুঝতে পারল তার ভাগ্য এবার বাস্তবিকই মন্দ। এই প্রথমবার হয়ত তাকে পরাজয়ের গ্লানি বরণ করতে হবে।

বিমর্ষ চিত্তে সে অন্যমনস্ক ভাবে ঘটনাস্থলের কাছাকাছি পায়চারি করছিল। কি মনে হতে আর একবার সে দোকানে ঢুকবার প্রধান ফটকের কাছটা পরীক্ষা করতে শুরু করল। হঠাৎ তার মনোযোগ যেন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হল ফটকের কাছটায় রাস্তার একটা নর্দমার দিকে। বড় আতস কাঁচটা হাতে নিয়ে নিচু হয়ে সে নিবিষ্ট চিত্তে সেখানে কিছু পরীক্ষা করতে শুরু করল। সবাই তার দিকে তাকিয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। সহসা কিছু জিজ্ঞাসা করতেও ভরসা পাচ্ছিল না সহকর্মীদের কেউ, পাছে তার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে এই ভয়ে।

একটু একটু করে যেন জেকের মুখের ভাবের পরিবর্তন হতে লাগল। হতাশার মেঘ কেটে গিয়ে সেখানে যেন আশা ও আনন্দের খুশি খেলে গেল।

হঠাৎ সে বলে উঠল, 'ইউরেকা—পেয়েছি।' এতক্ষণে অন্য সবাই ছুটে গেল সেখানটায়। গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াল নর্দমার মুখটা। কি দেখে তাদের বস্ জেকে এত খুশি হয়ে উঠল? কোন্ মূল্যবান চমকপ্রদ সূত্র যা থেকে মিলতে পারে চুরি রহস্যের চাবিকাঠি অপরাধী ও অপহৃত দ্রব্যের হদিস? চোখে-মুখে সবারই ব্যগ্র জিজ্ঞাসা। জেকে কথা না বলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল নর্দমার কিনারায় পড়ে থাকা কয়েকটি তুচ্ছ বস্তুর উপর। কী—কী সে জিনিস? সবাই ঝুঁকে পড়ল দেখবার জন্য। ও হরি! এ কি? এ যে কয়েকটা আধপোড়া সিগারেটের টুকরো মাত্র! কী হবে ও দিয়ে? জেকের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল, তা নয়ত এ'টো সিগারেটের টুকরো কয়েকটা—তাও নর্দমায় পড়া—তাই নিয়ে সে এত ব্যস্ত ও উৎফুল্ল হয়ে পড়ে? নাঃ—জেকে দিনকে দিন যেন নিজেই এক মস্ত হেঁয়ালী হয়ে উঠছেন। কী আশার সম্ভাবনা তিনি দেখলেন এই তুচ্ছ কয়েকটা আধপোড়া সিগারেটের খড়ের মধ্যে? এ ত যে কোনো সময় যে কোনভাবে পড়ে থাকতে পারে। অপরাধীই যে এগুলি ফেলে গেছে তারই বা কী মানে আছে? দোকানের খদ্দের বা মালিকরা

www.BanglaBook.org

বা অন্য কেউ ত সিগারেট খেয়ে এখানে টুকরো ফেলে থাকতে পারে।

কিন্তু জেকের তদন্ত ধারাকে, যা এ যাবৎ ব্যর্থ হয়নি, সবাই সমীহ করে ; তাই তাকে, এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে বা মনের সন্দেহ তার কাছে প্রকাশ করতে ভরসা পাচ্ছে না কেউ।

জেকেও যেন সহকর্মীদের মনের ভাব জানতে পেরেই বলল, 'ভাবছ আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তাই এই তুচ্ছ নোংরা জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, তাই নয়?...ঠিক আছে, যথাসময়ই প্রমাণ দেব কী অমূল্য রতন লুকিয়ে আছে এই পোড়াছাই নর্দমার নোংরা সিগারেট টুকরোগুলোর মধ্যে।'

তার নির্দেশে পোড়া সিগারেটের খণ্ডগুলো সযত্নে সংগ্রহ করা হল নর্দমার মুখ থেকে। জেকে সেগুলিকে নিজ হেফাজতে নিল। কী করবে সেগুলি নিয়ে তা সেই জানে!

তখনকার মত ঘটনাস্থলে আরও কিছু প্রাথমিক তদন্তের কাজ সেরে সবাই কর্মান্তরে গেল।

যে সব সহকর্মীদের সে নির্দেশ দিয়েছিল স্থানীয় সন্দেহজনক দাগী চোরদের ঘটনার রাতের গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে তারাও কিন্তু তাকে কোন আশার আলো দিতে পারল না। স্থানীয় সন্দেহজনক অপরাধীদের সম্পর্কে যতটুকু জানা যাচ্ছে—তাতে তাদের কাউকেই এই চুরির ঘটনা সম্পর্কে তেমন সন্দেহ করা যাচ্ছে না। তবে এ কার কাজ? কোন দলের বা কোথাকার কোন পুরোনো অপরাধীর? এই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

নিজ ল্যাবটেরিতে সিগারেটের টুকরোগুলো নিয়ে ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে জেকে দেখতে পেল সবগুলিই একই কোম্পানীর এবং একই মার্কার সিগারেট। এ সস্তা ও কড়া সিগারেটটি আজকাল সর্বত্র খুব চালু। এটা সাধারণতঃ পুরোনো ও পাকা ধূমপায়ীরাই বেশি ব্যবহার করে থাকে। নাম জোড়াগির্জা।...যাক, এটা নিশ্চয়ই একটা মূল্যবান সূত্র ধূমপায়ী সম্পর্কে, যে খুব সম্ভব চৌর্যকর্মের আসল নায়ক।

জেকে তার তদন্তের পরবর্তী কাজ সঙ্গে সঙ্গে স্থির করে ফেলল। সেটা হচ্ছে 'মোডাস অপারেন্ডি বুরো' থেকে পুলিশের পুরোনো নথিপত্র খুঁজে এমন সব অপরাধীর ইতিবৃত্ত খুঁজে বের করতে হবে যারা চুরিতে—বিশেষ করে বিজ্ঞানের কায়দায় সিঁধেল চুরিতে—অভ্যস্ত, আর তাদের এইসব অভ্যাসগুলিও আছে, যেমন, এক—তারা পুরোনো ও পাকা ধূমপায়ী।

দুই—তারা অপরাধ করবার পূর্বে বা পরে অকুস্থলে ধূমপান করে এবং সেটা প্রবেশ বা প্রস্থান পথের কাছে।

তিন—তারা সিগারেট-সেবী হলে, ঘটনাস্থলে যে মার্কা সিগারেট পাওয়া গেছে সেই জোড়াগির্জা-মার্কা সিগারেট খায়।

চার—তারা ঘটনাস্থলে বিড়ি সিগারেট খেয়ে তার টুকরো ফেলে যায়।

লালবাজারের 'মোডাস অপারেন্ডি বুরো' হচ্ছে পুলিশের এমন এক দপ্তর যেখানে পুরোনো অপরাধীদের অভ্যাস, বৈচিত্র্য নথিভুক্ত করা থাকে, যার থেকে কর্মধারা বা অভ্যাস বিচার করে পুরোনো পাপীদের তল্লাসীর কাজে সুবিধা হয়। একথা অপরাধ-বিজ্ঞানী মাত্রই জানে যে, মানুষ যেমন, অপরাধীও তেমন—সাধারণতঃ অভ্যাসের দাস। তারা তাদের স্বভাব বা অভ্যাস চট করে পালটায় না। তাই স্বভাব ও অভ্যাস মিলিয়ে অপরাধী খুঁজে বের করবার পদ্ধতি চালু হয়েছে।

জেকে এরপর সংগৃহীত সিগারেট টুকরোগুলিকে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ও রক্ত বিশেষজ্ঞের কাছে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিল। তাদের অনুরোধ জানাল সিগারেট টুকরোগুলির বৈশিষ্ট্য বিচারের জন্য এবং সেগুলির না পোড়া অংশে যদি ধূমপায়ীর মুখের থুথু বা লালা লেগে থাকে তবে তা থেকে ধূমপায়ীর রক্তের শ্রেণী বিভাগ নির্ণয় করতে।

জেকের জানা ছিল, মানুষের শরীরের সবার রক্ত দেখতে এক হলেও প্রকৃতিতে প্রত্যেকের রক্ত ঠিক এক নয়। সেই হিসাবে রক্তের কয়েক রকম শ্রেণী বিভাগ আছে যার প্রত্যেকটির ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। যার রক্ত যে-শ্রেণীর তার রক্ত সেই শ্রেণী ছাড়া অন্য শ্রেণীর রক্তের সঙ্গে কখনই মিলবে না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রক্ত-শ্রেণী একই রকম থাকে। তাই রক্ত দিয়ে লোক চেনা বা সনাক্ত করা যায়।

মানুষের শরীরের নির্যাস, যেমন ঘাম থুথু এসব পরীক্ষা করেও তার রক্তের শ্রেণী জানা যায়। সেই সঙ্গে জানা যায় তার পরিচয়, অর্থাৎ সে কোন লোক, বা এক কথায়—তাকে সনাক্ত করা যায়। যেমন হাতের লেখা পায়ের ছাপ আঙ্গুলের ছাপ দাঁতের গঠন কানের গঠন এবং আজকাল ঠোঁটের গড়ন—এসব থেকে লোক চেনা বা সনাক্ত করা যায়, সেই রকম।

যাই হোক, জেকে ধারণা করল পোড়া সিগারেটের টুকরোর গায়ে লেগে থাকা লালা থেকে যদি অপরাধীর রক্তের শ্রেণীবিভাগ জানা যায় তবে তা দিয়ে আসল অপরাধী নির্ণয় অনেক সহজ হবে।

ল্যাবরেটরিতে গয়নার দোকানের কাছের রাস্তার নর্দমার মুখ থেকে সংগৃহীত সিগারেট টুকরোগুলি পরীক্ষা করে পাওয়া গেল ধূমপায়ীর রক্তের বৈশিষ্ট্য, জানা গেল তার শ্রেণীবিভাগ।

এরপর জেকের বাকি কাজ হচ্ছে মোডাস অপারেন্ডি (Modus operandi) বা (অপরাধ) ক্রিয়াপদ্ধতি দপ্তরের নথিপত্র ঘেঁটে সম্ভাব্য অপরাধীর জীবনের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ। সন্ধান চলল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, শুধু কলকাতায় নয়, বাইরের পুলিশ দপ্তরেও। কখনও জেকে নিজে, কখনও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা এই তল্লাসী চালিয়ে গেল। কাজটা খুবই একঘেয়ে ও বিরক্তিকর। তাছাড়া শ্রমসাধ্য আর যন্ত্রণাদায়কও বটে।

কিন্তু কোন ব্যাপারে হার মেনে ক্ষান্ত হওয়া জেকের হাতে নেই। সহকর্মীদেরও সে উৎসাহিত করে চলল। তার প্রবল আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী জয়ে অবশেষে তার পুরস্কার মিলল। সে যে লোকটির খোঁজ করছিল তার নামধাম ও বিশদ বিবরণ খুঁজে পেল নথিপত্রে।

লোকটির নাম ওস্তাদ রমজান। নামকরা সিঁধেল চোর। ইতিপূর্বে সাধারণ চুরি, সিঁধেল চুরি প্রভৃতি অপরাধে তার অন্তত বার দশেক সাজাও হয়ে গেছে ভারতের বিভিন্ন আদালত থেকে। এর আর একটা বৈশিষ্ট্য—এ অনবরত ধূমপান করে। সিগারেট বেশি খায়—কড়া সিগারেট। এমন কি অপরাধকালীন অকুস্থলেও সে ধূমপান না করে পারে না। এর বাড়ি গয়া জেলায়।

চোরের সন্ধান ত মিলল। এর পরের কাজ হচ্ছে অপরাধীর হদিশ বের করা। এই লোকটির বর্তমান ডেরা খুঁজে বের করতে

www.BanglaBook.org

ডিটেকটিভ ইনস্পেকটর জেকে ও তার দলবলকে অনবরত অতর্কিতে হানা দিয়ে যেতে হল ভারতের নানা স্থানে। কখনও একসঙ্গে, কখনও হঠাৎ হঠাৎ, এখানে-সেখানে, আনাচে-কানাচে, অলিতে-গলিতে, গোপন চরের দেওয়া খবরের ভিত্তিতে। জেকের এমন গোপন চর বহু আছে।

অবশেষে ভাগ্যদেবী মুখ তুলে চাইলেন। অপরাধীটির সন্ধান পাওয়া গেল, শহরেরই উত্তরাঞ্চলে এক নোংরা এঁদো পল্লীতে। তার ডেরা ও আস্তাগুলি খানাতল্লাসী করা হল। ফলে সে ধরা পড়ে গেল এক জায়গায়।

এইভাবে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে অতর্কিতে ধরা পড়ে গিয়ে এই ওস্তাদ চোর একেবারে মনোবল হারিয়ে ফেলল। সে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল। তার ধারণা হয়েছিল তার অপরাধটা হয়েছিল নিখুঁত—সেটা সে সমাধা করতে পেরেছিল কোন রকম খুঁত না রেখে, ধরা পড়ার সব রাস্তা বন্ধ করে। কিন্তু এ কি সবজান্তা গোয়েন্দা রে বাবা! এ যে জাদু জানে! না খোদ খনার শিষ্য?

তার বিরুদ্ধে সংগৃহীত সিগারেট টুকরো ও অন্য অকাট্য প্রমাণাদি দেখে সে ভাল করেই বুঝতে পারল যে তার খেল্ খতম হয়েছে। আর যুঝে লাভ নেই।

তাই সে সব কিছু খুলে বলল ইনস্পেকটার জেকের কাছে। পূর্ণ স্বীকারোক্তি করল এর আগের কৃত অপরাধেরও। ফলে বহু চোরাই মাল নানা জায়গা থেকে উদ্ধার হল। গয়নার দোকানের চুরি যাওয়া চব্বিশ হাজার টাকা দামের জিনিসের বেশির ভাগই উদ্ধার হল নানা জায়গা থেকে।

অপরাধী এবং তার দলের লোকের কপালে জুটল যোগ্য সাজা। ১৩৮৩

হাওর

প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

তোমরা কি 'হাওর'-এর নাম শুনেছ কখনো? সিলেট ও মৈমনসিং জেলায় অনেক হাওর আছে। দুটো জেলাই এখন 'বাংলা দেশে' পড়েছে। ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেন, সারা বাংলার প্রায় সবখানিই এক সময় সমুদ্রের তলায় ছিল। তারপর বহু বছর ধরে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও নানা নদনদীর শাখা-প্রশাখার পলি মাটির স্তর জমে জমে জেগে উঠতে লাগল ডাঙা। কত হাজার হাজার বছর ধরে চলছিল এই কাজ কে জানে? এইভাবে আস্তে আস্তে সমুদ্রকে দক্ষিণ দিকে হটিয়ে দিয়ে গড়ে উঠল বঙ্গদেশ। সমুদ্র সরে গেল বটে, কিন্তু তার কয়েকটি টুকরো হয়ত বাংলাদেশের মাটির বেড়জালে আটকা পড়ে গিয়েছিল, সেগুলোই হল 'হাওর'। সাগর শব্দ ভেঙে চল্‌তি কথায় দাঁড়াল সায়র, আবার সায়র হয়ে গেল আঞ্চলিক ভাষায় 'হাওর'।

ছেলেবেলায় থাকতাম সিলেটের সুনামগঞ্জ শহরে। পুজোর সময় আত্মীয়স্বজন অনেকে মিলে দল বেঁধে রওনা হতাম দেশের বাড়িতে। যেতে হত নৌকো করে, পাক্কা দু'রাত একদিনের পাড়ি। ছোট-বড় মিলিয়ে সবসুদ্ধ সাত-আটখানা নৌকো ভাড়া করা হত। সে যেন সপ্তডিঙার এক বিরাট অভিযান। মহা ফুর্তি আর হৈ-হল্লাতে নেচে উঠত আমাদের মন। কখনো মাঝিদের সঙ্গে দাঁড় বাইতাম, কখনো হাল ধরার চেষ্টা করতাম, এমন কি, নদীর পাড়ে নেমে বড়দের নিষেধের তোয়াক্কা না করে গুলও টেনেছি কত। নৌকোতে খাওয়াদাওয়া, গল্পগুজব, খেলাধুলা, গানবাজনার মরসুম লেগেই থাকত। ইস্কুলে যাওয়ার তাড়া নেই, পড়াশোনার বালাই নেই, এমন কি, বড়দের শাসনের রাশও যেন আলগা হয়ে যেত। নৌকোতে চড়ে বসলেই যেন আমরা 'সব পেয়েছির দেশে' পৌঁছে যেতাম, তখন খালি মজা আর আনন্দ।

পথে কত খাল, বিল, নদী ও হাওর পড়ত। সুনামগঞ্জ শহর ছাড়িয়ে খানিক দূর এলেই পাওয়া যেত 'দেখার হাওর'। এই হাওরের কথাই বলব তোমাদের।

সকালে নটা দশটার সময় কোন নদীতে পড়লে সেখানে বাঁধা হত সব নৌকো। সকলে ডাঙায় নেমে আড়মোড়া ভেঙে চানটান সেরে নেবেন, দুপুরের রান্নাটাও হয়ে যাবে নদীর পাড়ে। মাঝিমাল্লারা খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেওয়ার সময় পেত। রান্নাবান্নার পাট চুকলেই নৌকো ছেড়ে দেওয়া হত, খাওয়া-দাওয়া হত নৌকোতে বসে। তাতে সময় বাঁচত অনেকটা। নদীর জলে ঝাঁপাঝাঁপি করে, ডুব দিয়ে, সাঁতার কেটে আমাদের শখ মিটত না। আমরা কবে যে সাঁতার শিখেছি আর কবে যে জান-তাম না, তা মনেই পড়ে না। নদীর পাড়ে দৌড়াদৌড়ি করে, লোকের ক্ষেত থেকে শসা, ক্ষিরাই, আখ, মটর ও কড়াইশুঁটি ইত্যাদি চুরি করে খেতাম, তাকে চুরি বলে মনেও হত না। চাষীদের নজরে পড়লে তারা হয়ত একটু-আধটু ধমক দেওয়ার ভান করত, আবার কেউ কেউ নিজেরাই খুশিমনে ক্ষেতের জিনিস তুলে এনে আমাদের খেতে দিত। পথে পথে মাছ, তরিতরকারি, ফলমূল সব সময়ই কেনাকাটা করা হত।

'দেখার হাওর' দেখতে যেমন অপূর্ব, তেমনি আবার এক ভয়ঙ্করী মূর্তিও সে পুষে রাখত তার বুকের মধ্যে। এগিয়ে যেতে যেতে হাওরের মাঝ বরাবর এলে তখন সেখানে অথৈ গভীর জল, বড় বড় লগি দিয়েও ঠাঁই পাওয়া যায় না, দাঁড় টানাই তখন একমাত্র ভরসা। চারদিকে তাকালে তখন নজরে পড়ে শুধু জল, রাশি রাশি জল ছড়িয়ে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, তার হদিস পাওয়া যায় না। আমাদের গাছগাছালির সবুজ ধরণী ধুয়ে মুছে কোথায় যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কোনোদিকে মাটির কূলকিনারাও চোখে পড়ে না, যেন অকূল দরিয়ায় ভাসছি আমরা। হুবহু সাগরেরই সেই মূর্তি। আবার, দৈবাৎ যদি আকাশে মেঘ জমে, ঝড় ওঠে, তবে তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়ে যায় হাওরের বুকে। প্রশান্ত স্থির জল তখন খলখলিয়ে ওঠে উত্তাল ঢেউয়ে, কালনাগিনীর মত সহস্র ফণায় যেন তার ক্রুদ্ধ আক্রোশ ফুঁসে ফুঁসে ওঠে। বড় বড় ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের

www.BanglaBook.org

আছাড়ি-পিছাড়িতে আমাদের নৌকাগুলোর তখন হাবুডুবু খাওয়ার মত অবস্থা হত। যেন, কতকগুলো মোচার খোলার মত ছোটদের খেলার নৌকো, যে কোনো মুহূর্তে ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো হয়ে তলিয়ে যেতে পারে। সামাল দিতে মাঝিদের হত গলদ্‌ঘর্ম অবস্থা, প্রাণপণ শক্তিতে তারা যেন এক দুর্ধর্ষ লড়াইয়ে নামত। বড়দের গম্ভীর মুখে কালো ছায়া ঘনিয়ে আসত! কি হয়, কি হয়, এই ভাব। আমাদের বুকে ধুক্‌পুকুনি লেগে যেত। বিপদ কেটে গেলে স্বস্তির নিশ্বাস পড়ত সকলের। নিশ্চিন্ত হওয়ার পরে তখন কিন্তু আবার সেই অচেনা ভয়ের দুরদুরুনির স্বাদকে ফিরে পেতে ইচ্ছে করত আমাদের—ভয়ঙ্করের দিকে কিশোর মনের বোধ হয় একটা চুম্বকের আকর্ষণ থাকে।

'দেখার হাওরে' অন্য রকম বিপদের আশঙ্কাও ছিল, সে হল ডাকাতের ভয়। শিকারের সন্ধানে ডাকাতেরা টহল দিয়ে বেড়াত হাওরে। সুযোগ পেলেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ত অসহায় যাত্রীদের নৌকোয়। তাদের সর্বস্ব ত লুঠ করতই, দায়ে পড়লে খুন-খারাপি করতেও তারা পেছপা হত না! জলপুলিসের নজর এড়িয়ে রাহাজানি করতে তারা ছিল ওস্তাদ। এই ধরনের কত ডাকাতির গল্পই শুনেছি মাঝিমাল্লা ও বড়দের মুখে। শুনে আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত, কিন্তু সেই ভয়ের রোমাঞ্চকর আস্বাদ পেতে ফরমাস করে করে বার বার সে-সব গল্প শুনে আমাদের আগ্রহ মিটত না। শুনতাম, ডাকাতদের একটা কৌশল ছিল। তারা নিরীহ ভালোমানুষের মত যাত্রীদের নৌকোর কাছে নিজেদের নৌকো ভিড়িয়ে বলত, 'মাঝি ভাই, এক ছিলিম তামাক খাওয়াতে পার?' ডাকাতদের এই অছিলার কথা যারা জানত, তারা ত শুনলেই আঁতকে উঠত, প্রাণপণে এড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করত। কিন্তু পালাবে কোথায়? জনমানিষ্যির চিহ্ন কোথাও নেই, চারিদিকে ধু ধু করছে অথৈ জল, সাঁতরে পার হওয়া দুরাশা, হাঁকডাক করে সাহায্য পাওয়ার কোন জো নেই। অসহায় যাত্রীদের উপরে হামলা করার ত পোয়া বারো সুযোগ এইসব বিশাল হাওরে। ডাকাতরা নির্ভয়ে নিরঙ্কুশভাবে তাদের দৌরাত্ম্য চালিয়ে যেত। আমাদের কিন্তু ডাকাতের অতটা ভয় থাকত না। একসঙ্গে এতগুলো নৌকো দল বেঁধে চলেছে দেখলে ডাকাতরা কাছেও ঘেঁষত না। বুঝত, এখানে সুবিধা হবে না। আমাদের সঙ্গে বন্দুকও থাকত দু-একটা। একলা নৌকোয় পাড়ি দেওয়াই ছিল ভয়ের ব্যাপার।

'দেখার হাওরের' বিস্তার দশ মাইলের কম ছিল না। সব জড়িয়ে 'দেখার হাওর' সত্যি ছিল দেখার মত হাওর। করিমগঞ্জের 'হাকালুকি হাওর' ছিল এর চেয়েও বড় ভয়ঙ্কর। সেই হাওরও একবার পাড়ি দিয়েছি, অন্য কোনো বড় হাওর দেখার সুযোগ হয়নি।

মনে আছে, একবার শেষরাতে ঘুম ভাঙতে দেখি হাওরের একটা বিলের কিনারায় নৌকোগুলো থেমে আছে, লগি পুঁতে তার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে সব নৌকো। দেখলাম, বাবারা কেউ কেউ ছইয়ের বাইরে বসে আছেন আর সকলেই নিবিষ্টভাবে তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে। বাবাকে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, 'ঐ দ্যাখো আলেয়ার আলো।' বাইরে বেরিয়ে দেখি, বিলের ওপারে দপ্‌ করে জ্বলে উঠছে আলো, নিবে যাচ্ছে তখুনি, আবার দেখা দিচ্ছে অন্য জায়গায়। কখনো একটা আলো, কখনো দুটো-তিনটে, জ্বলছে, নিবছে আবার জ্বলছে। আকাশে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, বিশাল বিলের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত জলও যেন মিশ-কালো, তাকাকেই ভয় লাগে। কোথাও টুঁ শব্দটি নেই। দূরে চলেছে অজগুবি আলোর নাচানাচি। গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। আলেয়া দেখার অভিজ্ঞতা সেই আমার প্রথম।

মাঝি বলল, 'বাবু, ওগুলো আসলে হচ্ছে ভূতের আলো। অন্ধকারে একবার যদি আমাদের দিক্‌ভ্রম হয়, তবে লোকজনের দেখা পাওয়ার আশায় ভূতের আলোকে নিশানা করে আমরা নৌকা চালিয়ে যাই সেইদিকে। খানিক দূরে যেতে না যেতেই নিশানার আলো নিবে যায়, জ্বলে ওঠে অন্যদিকে আলো। তখন ধাওয়া করি সেদিকে, তারপর আবার অন্যদিকে। এইভাবে মায়াবী আলোর ইসারা দেখিয়ে ভূত আমাদের সারারাত একই বিলের চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হয়রান করে দেয়। কিন্তু নাজেহাল করে একবার যদি সে কোন মাঝির মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে পারে, তবেই ভূতের মতলব হাসিল হয়। মাঝি তখন জ্ঞান হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে নৌকোর উপরে, মুখ দিয়ে তার ফেনা বেরুবে গাঁজলা গাঁজলা। প্রাণ ফিরে পাওয়াই তখন শক্ত। আর যদি মূর্ছা গিয়ে ধপাস্‌ করে পড়ে যায় জলে, তবে ত তার হয়েই গেল। ভূতের আলোর পাল্লায় পড়ে কত মাঝি যে বেঘোরে জান দিয়েছে, সে আমরাই জানি। হাওরে, বিলে গহীন রাতে নৌকো চালানো চারটিখানি কথা নয়। দিক্‌ভ্রান্ত হতেই পারে বাবু, মতিভ্রম হলেই আর তার নিস্তার নেই।'

নিজেদের দৃঢ় অন্ধ বিশ্বাস থেকেই মাঝি বলেছিল এইসব কথা। শুনে অজানা ভয়ে কেঁপে উঠেছিল বুক। তবে বড়রা রয়েছেন সঙ্গে, এই ছিল ভরসা। তখন কি জানি যে আলেয়ার পিছনে রয়েছে জলার গ্যাসের কারসাজি।

বড় হয়ে যখন সমুদ্র দেখার সুযোগ হয়েছে, তখন মনে মনে ভেবেছি, একটা নৌকো ছেড়ে দূর সমুদ্রে গিয়ে পড়লে যে অবস্থা হবে, সে হবে অবিকল ঝোড়ো হাওরের বুকে পড়ার অভিজ্ঞতারই সামিল। হাওরগুলো যে পিছনে ফেলে-আসা সাগরের বড় বড় টুকরো, তাতে সন্দেহ করার কিছু নেই। মাটির ঘেরে বন্দী হয়েও সমুদ্রের মেজাজমর্জি ও হালচাল হাওর-গুলো পুরোপুরি বজায় রেখেছে।

১৩৮২

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুখুটি স্পেশাল

অজেয় রায়

গন্ধর্ব-অপেরা। চন্দ্র মুখুটি। নাম শুনেই শিহরণ লাগে নতুন গ্রামের মানুষের বুকে। এমন নামকরা পার্টি, নামকরা এক্টর। এমন অভিনয় দেখার সুযোগ যে নতুন গ্রামের ভাগ্যে অভাবনীয়।

প্রতি বছর দুর্গাপুজোর সময় নতুন গাঁয়ের বারোয়ারী ক্লাবের উদ্যোগে যাত্রা হয়। তবে সে নেহাত মামুলী ব্যাপার। গ্রামের ছেলে বুড়ো এক্টিং করে। বড়জোর কাছাকাছি কোনো গ্রামের দল আসে। কিন্তু খাস কলকাতার কোন নামজাদা যাত্রা পার্টিকে ডাকার কথা তারা কোনদিন ভাবতে পারেনি। সাধ কি আর হয় না? কিন্তু সাধ্য কৈ? শহরের বড় দল দূর অজ পাড়াগাঁয়ে যেতে চায় না। তাছাড়া এদের টাকার খাঁইও খুব বেশি। নতুন গাঁয়ে গরীব বারোয়ারী ক্লাব অত টাকা পাবে কোথায়? কিন্তু এবার পেয়েছে চৌধুরী মশায়ের বদান্যতায়।

নতুন গ্রামের ধনীমানী চৌধুরী বাড়ির বড়কর্তা এবার অনেক বছর পর সপরিবারে গ্রামে এসেছেন লম্বা ছুটি নিয়ে। তিনি বিদেশে থাকেন বাংলার বাইরে। মোটা মাইনের কাজ করেন। কালেভদ্রে আসেন দেশ। চৌধুরী মশায়ের শখ পুজোয় ভাল যাত্রা হোক। অনেক টাকা লাগবে যে! তা লাগুক। চাঁদা তোল। বাকি যা পড়বে আমি দেব। একেবারে ক্যালকাটার সেরা পার্টি হওয়া চাই। ব্যস্, তবে আর ভাবনা কি? ব্রজবিলাসের জামাই কলকাতায় কাজ করে। একটু-আধটু থিয়েটারের ঝোঁক আছে, আলাপ আছে ওসব মহলে। তাকেই লেখা হল ব্যবস্থা করতে। জামাই 'গন্ধর্ব অপেরার' সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে ফেলল।

গন্ধর্ব-অপেরা শুধু নাম-করা পার্টি নয়। আর এক বিশেষ আকর্ষণ আছে দলের। এই দলেই এখন অভিনয় করছে যাত্রা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিরো নটসূর্য চন্দ্র মুখুটি। সত্যি বলতে কি, চন্দ্র মুখুটির সাহায্য না পেলে গন্ধর্ব অপেরা নতুন গ্রামে যেতে রাজী হত কি না সন্দেহ। চন্দ্র মুখুটির অনুরোধেই পার্টি অন্য প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে নতুন গ্রামে ডেট্ ফেলেছে। শুধু তাই নয়, কিছু কমসম করে নিতেই রাজী হয়েছে।

চন্দ্র মুখুটির এই দরদের কারণ আছে বৈকি। নতুন গ্রাম হচ্ছে তার মামার বাড়ি। গ্রামের বয়স্কদের আজও মনে আছে, মাঝে মাঝে পুজো বা গ্রীষ্মের ছুটিতে আট-দশ বছরের ছেলে চাঁদু নতুন গাঁয়ে মামার বাড়ির আদর খেতে আসত।

ফুটফুটে চেহারাটি, কিন্তু এক নম্বর বিচ্ছু। এসেই দলবল জুটিয়ে নানান দৌরাত্ম্য শুরু করে দিত। তার একটা দুষ্টুমি ছিল যার-তার নকল দেখানো। কেউ হাসত, কেউ বা চটত। মায়ের কাছে চাঁদু দু'চারটে চড়চাপড়ও খেয়েছে এই জন্যে। বড় হয়ে চাঁদু অবশ্য আর এ গ্রামে আসেনি, তার কারণ মামা-মামী মারা গিয়েছেন, আর মামাতো ভাই বহুকাল দেশছাড়া।

শোনা যায় চন্দ্রনাথের বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল না। স্কুলের পড়া শেষ করেই সে রোজগারের ধান্দায় এক যাত্রা দলের সঙ্গে ভিড়ে পড়ে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। সুন্দর চেহারা আর অভিনয় ক্ষমতার গুণে দিনে দিনে নামডাক হয়ে আজ সে নটসূর্য।

ব্রজবিলাসের জামাই চন্দ্র মুখুটির সঙ্গে দেখা করে সবিনয়ে তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল তার মামার বাড়ির কথা। চন্দ্র মুখুটি অকৃতজ্ঞ নন। ছেলেবেলার স্মৃতি ভুলে যাননি। খুশি হয়েই নতুন গ্রামে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। জামাইয়ের কাছে মামার বাড়ির অনেক গল্পও করেছেন। তারপর ম্যানেজারকে ডেকে যাবার ব্যবস্থা ঠিক করে দিয়েছেন। যাত্রা হবে বিজয়া দশমীর পরের দিন। এ সব কথা ব্রজবিলাসের জামাই জানিয়েছে চিঠিতে। সে কিন্তু এবার পুজোয় শ্বশুরবাড়ি আসতে পারবে না, কারণ পাড়ায় তার থিয়েটার আছে।

গত দু'সপ্তাহ ধরে নতুন গ্রামের ঘাটে বাটে চণ্ডীমণ্ডপে রান্নাঘরে চলছে কেবল ওই এক আলোচনা। গন্ধর্ব অপেরা এবং চন্দ্র মুখুটি।

বিকেল চারটে নাগাদ প্রকাণ্ড বাসে করে এসে যাত্রাপার্টি গ্রামে ঢুকল। ক্লাবের সেক্রেটারি সকাল থেকেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল বড় রাস্তার ওপরে। সে ড্রাইভারের পাশে বসে সগৌরবে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল। বাস থামল চৌধুরীবাড়ির সামনে।

বিশাল চৌধুরীবাড়ির নিচের তলায় কয়েকখানা ঘরে যাত্রা-দলের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছেলে-বুড়োর এক বিরাট জনতা সারাদিন ধরে ঠায় ভিড় করেছিল। রব উঠল 'এসেছে! এসেছে!' ভিড় ঘিরে ধরল সেখানে বাসকে।

প্রথমে বাস থেকে টপ করে নামল একটি লোক। বেঁটেখাটো, চকচকে টাক মাথাজোড়া। গায়ে প্যান্ট ও হাফসার্ট। গুঞ্জন উঠল—'ম্যানেজার, এ হচ্ছে ম্যানেজার।'

ম্যানেজার গট্ গট্ করে চলল থাকার ঘরগুলো দেখতে। অন্যরা তখন বাসেই বসে রইল। একটু পরে, সরেজমিনে তদন্ত সেরে ম্যানেজার গাড়িতে এসে কি বলতেই হুড়মুড় করে লোক নামতে শুরু করল, ঝপাঝপ মাল পড়তে লাগল। বড় বড় বাক্স-তোরঙ্গ। নানারকম বাজনা বাদ্যি। ম্যানেজারের ইংরেজী বাংলা হিন্দী হাঁকডাকে সরগরম হয়ে উঠল আবহাওয়া। দলের একটা মোটা অংশ চটপট ঘরগুলোর মধ্যে সেঁধুল। দলে তিনটি মেয়েও এসেছে। তারা ঢুকল একটা ঘরে। বাকিরা বাস ঘিরে চেঁচামেচি করতে লাগল।

www.BanglaBook.org

এবার গ্রামের ভিড়টা হুমড়ি খেয়ে পড়ল ঘরগুলোর সামনে। কিন্তু লোক ঢোকা মাত্রই ঘরগুলোর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ম্যানেজার এসে বলল, 'এখানে ভিড় করবেন না দাদা। সরে যান, সরে যান।'

জনতা কয়েক পা হটে গিয়ে আবার যথাস্থানে ফিরে গেল।

কোথায় চন্দ্র মুখুটি? চন্দ্র মুখুটি কে? এই কৌতূহল সবার। দলে বেশ কয়েকটি হিরো প্যাটার্নের চেহারা রয়েছে বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনটি যে স্বনামধন্য নটসূর্য গ্রামের লোক তা ধরতে পারল না। অনেকে জিজ্ঞেস করেছিল পার্টির একে ওকে, 'আচ্ছা, চন্দ্র মুখুটি কোনজন?' তারা যেন শুনতেই পেল না প্রশ্ন, এমন ভারি ব্যস্ত ভাবখানা। অবশেষে জানা গেল চন্দ্র মুখুটি রয়েছেন একেবারে শেষ ঘরটিতে একদম একলা। আগে থাকতেই নাকি বলা ছিল মুখুটিবাবুর আলাদা ঘর চাই। তিনি খাতিরে লোক, তাই স্পেশাল ব্যবস্থা।

মুখুটির ঘরের রাস্তার দিকের দরজা ত বন্ধই, মায় জানালা পর্যন্ত। কেউ কেউ জানালা দরজার কপাটের ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতর কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করে। দেখেই ম্যানেজার হন্তদন্ত হয়ে তেড়ে আসে।—'উঁহু, ডিসটার্ব করবেন না। প্লের আগে উনি রেস্ট নেন। কম্প্লিট বিশ্রাম। ভারি মেজাজী লোক। মুড নষ্ট হয়ে গেলে পালাটাই কেঁচে যাবে মশাই।'

দুচারজন গ্রামের মাতব্বর আসে, দলের খোঁজখবর নেয়, তারপর চন্দ্র মুখুটিকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে, আলাপ করতে চায়। তাদেরও ম্যানেজার সবিনয়ে বলল, 'এখন নয়। প্লে-র পরে। বড্ড মুডি লোক কিনা।'

স্বয়ং চৌধুরী মশাই আসেন তদারক করতে। তাঁরও সেই এক কৌতূহল। ম্যানেজার হাতজোড় করে বলল, 'প্লিজ স্যার। প্লে শেষ হলে আমি নিজে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দেব। এখন পার্টের জন্য উনি নিজেকে রেডি করেন। দেখুন না পার্টির লোকদেরও বিশেষ দরকার না থাকলে ওঁকে বিরক্ত করার হুকুম নেই।'

চৌধুরী বিবেচক লোক। বললেন, 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। পরেই দেখা হবে। তা আপনাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না ত? মুখুটিবাবুর মেজাজ ভাল?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ফাস্টকেলাশ ব্যবস্থা। মুখুটিবাবুও খুব মুডে আছেন। বুঝলেন স্যার'—ম্যানেজার একটু গলা নামিয়ে একান্তে বলে—'একটু আগে আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন মুখুটি! কি বললেন জানেন? বললেন—ম্যানেজার মশাই, ভাবছি আজ একটা "স্পেশাল" দেব।'

'স্পেশাল? সে কি?' চৌধুরীমশাই অবাক।

'ওঃ, সে কি ওয়ান্ডার স্যার। চক্ষু সার্থক হয়ে যাবে। আপনারা ভাগ্যবান। মুখুটিবাবু তেমন উঁচু দরের আসর না পেলে "স্পেশাল" দেখান না। হাজার হোক এ তাঁর মামার বাড়ি স্পেশাল জায়গা ত, তাই। হেঃ হেঃ হেঃ।' ম্যানেজারের দন্ত বিকশিত হয়। ফুলো ফুলো গালের ঢিবিতে চোখদুটো ডুবে মরে। তারপর হাত কচলে বলে, 'স্পেশাল যে কি বস্তু এখন বলব না স্যার। তাহলে চার্ম নষ্ট হয়ে যাবে। একদম দেখবেন স্টেজে।'

'বেশ বেশ।' চৌধুরী খুশি মনে বিদায় নিলেন। স্পেশালের খবরটি রটে গেল। ফলে উত্তেজনা কিঞ্চিৎ বাড়ল।

পার্টির বেশির ভাগ ঘরের দরজাই অবশ্য কিছুক্ষণ পরে খুলে গেল। অভিনেতাদের মধ্যে অনেকেই বেরিয়ে এসে গ্রামের পথে পায়চারি শুরু করল। গ্রামের লোক তাদের সঙ্গে অল্পস্বল্প আলাপ জমাবার সুযোগও পেল। শুধু উন্মুক্ত হল না মুখুটির ঘরের কবাট।

'আচ্ছা, চন্দ্র মুখুটি কী পার্ট করছেন?' অনেকে জিজ্ঞেস করতে থাকে যাত্রা দলের লোকদের। তারা কিন্তু সবাই এ বিষয়ে একেবারে নীরব। প্রশ্নটা এড়িয়ে যায়, বা 'এখনও ঠিক হয়নি' গোছের দায়সারা উত্তর দেয়। ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করতে রহস্যের হাসি হেসে বলল, 'দেখতেই পাবেন। তাড়া কিসের? কি, দেখলে চিনতে পারবেন না?' নতুন গ্রামের লোক অপ্রতিভ হয়ে ঘাড় চুলকায়। চন্দ্র মুখুটিকে তারা যে কেউ কস্মিনকালেও দেখেনি, কোন লজ্জায় তা স্বীকার করে? ম্যানেজারের বাঁকা হাসির সামনে থেকে তাই তড়িঘড়ি পালিয়ে বাঁচে।

সন্ধ্যের পর খাওয়াদাওয়া করে গন্ধর্ব-অপেরা মেক-আপে বসল। যাত্রা হবে কদমতলার মাঠে। কাছেই। সেখানে প্যান্ডেল খাটানো হয়েছে। টিন দিয়ে ঘিরে গ্রীনরুম মানে সাজঘর বানানো হয়েছে। কিন্তু এক্টর-এক্ট্রেসরা এখান থেকেই মেকআপ নিয়ে যাবে। গ্রামের লোক মেকআপ দেখতে উপচে পড়ল ঘরগুলোর সামনে। বেগতিক দেখে আবার ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ হয়ে গেল। নিরাশ হয়ে তখন লোক ছুটল প্যান্ডেলের দিকে। আগেভাগে জায়গা রাখতে।

আজ পালা হবে শ্রীকৃষ্ণলীলা। পৌরাণিক নাটক। কানাঘুষায় শোনা গেল চন্দ্র মুখুটি নাকি সাজবেন কংস। নটবর এই গোপন সংবাদটির পরিবেশকে। দলের মেক-আপ ম্যান ছিরিপতির সঙ্গে সে ভাব জমিয়েছিল। নটবরের পয়সায় কেনা গরম আলুর চপে কামড় বসিয়ে দার্শনিক সুরে ছিরিপতি নাকি বলে ফেলেছিল—'অন্যদের নিয়ে ত ভাবনা নেই, ওই কংসের মেক-আপটাই যা ঝামেলা। এসব ফেমাস্ এক্টররা বড্ড খুঁতখুঁতে। পছন্দ আর হয় না। বড় খাটায়।' ব্যস ওই কথাতেই ধরে ফেলে নটবর ফেমাস্ এক্টরটি কে হতে পারে। নির্ঘাত চন্দ্র মুখুটি। ছিরিপতি অবশ্য এর বেশি আর কিছু খোলসা করেনি।

সন্ধ্যে থেকেই লোক আসতে শুরু করেছে। সারি সারি গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে মাঠে। শুধু নতুন গাঁ নয়, আশপাশ সব গ্রাম থেকে আসছে লোক। অধীর উত্তেজনা। চিৎকার হাঁকাহাঁকিতে সন্ধ্যে না নামতেই আসর জমজমাট।

যাত্রা আরম্ভের প্রায় আধ ঘণ্টা আগে গন্ধর্ব-অপেরা সমেত বাস হুস্ করে এসে দাঁড়াল প্যান্ডেলের কাছে গ্রীনরুমের দরজায়। একটা রৈ রৈ রব উঠল। কিছু লোক ছুটে এল বাস লক্ষ করে। কিন্তু পার্টি খুব তৎপর। টুক করে তারা ঢুকে পড়ল গ্রীনরুমে।

ব্যস্ত ম্যানেজার এক রাউন্ড চক্কর মেরে গেল আসরে। ঝুলনো হ্যাজাক বাতিগুলোর পজিসন্ দেখল। একটু-আধটু বদলাতে নির্দেশ দিল। তার প্রস্থানের পরই চং করে বাজল ফার্স্ট বেল। দর্শকরা নড়েচড়ে বসে।

হারমোনিয়াম ঘাড়ে যে ছোকরাটি সর্বপ্রথম আসরে ঢুকে যন্ত্র রেখে বেরিয়ে গেল তার সার্ট প্যান্টের মাঝা, চৌরি জুলপির নক্সা এবং হাঁটার কায়দা দেখে সবাই থ। আসল অভিনেতা অভিনেত্রীরা না জানি কি রকম হবে? একে একে হারমোনিয়াম,

www.BanglaBook.org

বাঁয়া-তবলা, বাঁশি, কর্নেট, ফ্লুট ইত্যাদি বাজনা পর পর স্থান নিল। তারপর ঢুকল সার বেঁধে কনসার্ট পার্টি। আবার ঢং। সেকেন্ড বেল। অমনি কনসার্ট শুরু হয়ে গেল। প্যাঁ পোঁ বিচিত্র ঐকতানে। ঠিক দশটায় পড়ল থার্ড বেল। ঝপ্ করে বন্ধ হল কনসার্ট। তার পরক্ষণেই আসরে বালক শ্রীকৃষ্ণের পিছু পিছু হন্তদন্ত মা যশোদার আবির্ভাব। ব্যস, পালা শুরু। কৃষ্ণের বাললীলা থেকে ঘটনা আরম্ভ হয়।

প্রথমেই বালক কৃষ্ণ দর্শকদের মন জয় করে নিল। আহা কি সুন্দর শ্যামবরণ দিব্যতনু কিশোর ঠোঁটের কোনে বাঁশিটি ঠেকিয়ে কি মনোহর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা। অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে দেখা গেল হাতজোড় করে কৃষ্ণকে লক্ষ করে পেন্নাম ঠুকছেন। কে বলবে ইনিই সেই বখা চেহারার ছোকরাটি বিকেলে চৌধুরী বাড়ির বারান্দায় বসে সযত্নে চুল বাগাচ্ছিল এবং বিড়ি ফুঁকছিল।

পালা কিন্তু দুর্দান্ত রকম জমে গেল কংস আসরে প্রবেশের পর থেকে, কালো বাবরি চুলের ওপরে মুকুট, মুখে গালপাট্টা দাড়ি, ইয়া এক জোড়া পাকানো গোঁফ—কি জাঁদরেল মূর্তি! বজ্রের মত তার হুঙ্কার। ক্রুর দৃষ্টি, উদ্ধত ভঙ্গি। কংসমামা জানতে পেরেছে গোকুলে বাড়ছে তার পরম শত্রু ভাগনে কেষ্ট। তাকে বধ করতে দানব, রাক্ষস, ঘাতকদের সঙ্গে কংসর কত ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র। দর্শক দুরাত্মা কংসর এই হীন অভিসন্ধিতে ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল। আর শ্রীকৃষ্ণ এবং দাদা বলরাম যখন নানান কৌশলে একটির পর একটি কংসর চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে থাকে তখন উল্লাসে ফেটে পড়ে দর্শকরা।

কংসর ব্যবহারে সব চেয়ে ক্ষেপে ওঠে গ্রামের পরম বৈষ্ণব শিরোমণি ঠাকুর। তিনি 'বর্বর, ঘাতক, পাষণ্ড—' ইত্যাদি চোখা চোখা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করতে থাকেন কংসকে উদ্দেশ্য করে। কৃষ্ণ বলরামকে প্রাণপণে উৎসাহিত করেন। লোকে মজা পেয়ে তাঁকে দেখে। শিরোমণির অবশ্য কোন খেয়াল নেই।

আহা কি একটিং। কাকে ছেড়ে কাকে দেখি? শ্রীকৃষ্ণ বা কংসর কথা বাই দিই। বন্দীরাজা বাসুদেব, বলরাম, নন্দ ঘোষ, মা যশোদা, কৃষ্ণের বালক বন্ধুরা, শ্রীরাধা, সবাই চমৎকার। কৃষ্ণের হাতে ঘায়েল হয়ে বিকটদর্শনা পুতনা রাক্ষসীর কি আর্তনাদ ও দাপাদাপি। ফলে আসরময় কাচ্চাবাচ্চা কেঁদে ককিয়ে একসা করল।

আহা বিবেকের কি গলা। মিঠে দরাজ সুরে কি কালোয়াতি। কংসর সামনে হাত নেড়ে নেড়ে গান গেয়ে সে কত বোঝাল—এমন কর্মটি করবেন না মহারাজ। এ যে মহাপাপ। কৃষ্ণ যে স্বয়ং শ্রীহরি নারায়ণ! কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। কংস কটমট করে দেখে বিবেককে, আর মুখ ফিরিয়ে নেয়।

নতুন গ্রামের লোকদের চক্ষু কর্ণ সার্থক হয়ে গেল। সাধে কি আর গন্ধর্ব অপেরার এত নাম। চন্দ্র মুখুটি এদের মধ্যে কোনজন বুঝতে পারে না লোকে। আর সেই 'স্পেশাল'-ই বা কি? ভেবে পায় না কেউ। যা হোক এ নিয়ে মাথাও আর ঘামায় না তারা।

হু হু করে সময় কেটে যাচ্ছে। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের হাতে কংস ধ্বংস হল। তারপর কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে গেলেন। পাপের পরাজয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল দর্শক।

শিরোমণি ঠাকুর খুশিতে গদ্‌গদ।। দুটিপ কড়া নস্যি

নিয়ে সশব্দে হাঁচলেন—হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্চো।

শেষ দৃশ্য। কৃষ্ণসখা সুদামের প্রবেশ। দর্শকরা আগে দেখেছে কিশোর কানাই-এর বালক বন্ধু সুদামকে। এখন সে যুবক।

অনেক বছর হল বিষ্ণু অবতার শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে গেছেন। গোকুল বা বৃন্দাবনে আর ফিরে আসেননি। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের প্রিয়জনরা ক্রমে তাঁর বিচ্ছেদ ব্যথা ভুলেছে। কেবল সুদামের মন আজও রাখাল রাজার বিরহে ব্যাকুল। কাজ-কর্মে মন বসে না। সুন্দর সুঠাম রূপ বিষাদে ম্লান। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় এলোমেলো লম্বা চুল, পরনে ধুতি ও উত্তরীয়। চক্ষু ঢুলু ঢুলু, স্বপ্নাচ্ছন্ন। কি আবেশ তার কণ্ঠে!—

'আর একবারো কি আসবেন না শ্রীহরি ভক্তকে দেখা দিতে? তিনি ত অন্তর্যামী। তবে কেন আমার আহ্বান তাঁর কানে পৌঁছচ্ছে না?'

অভিমানী সুদাম মথুরায় গিয়ে রাজপুত্র কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে চায় না। সে তাঁকে ধ্যান করে সেই আগের মূর্তিতে। বৃন্দাবন গোকুলের সেই কৌতুকময় বংশীধারী রাখাল বালক রূপে।

তাক বুঝে হাজির হয় বিবেক। গান গেয়ে সে সান্ত্বনা দেয় সুদামকে—ব্যাকগ্রাউন্ডে বাঁশির করুণ সুর। সুদামের অপূর্ব অভিনয়ে দর্শকদের চোখ সজল হয়ে ওঠে। একটি মাত্র সিনে পার্ট করে সে মাত করে দিল। শিরোমণি ঠাকুর ত কেঁদেই ফেললেন। ঘন ঘন কোঁচায় খুঁটে চোখ মোছেন।

এরপর ভক্তের ভক্তিপ্রীতিতে শ্রীহরির আসন টলে উঠল। তিনি বৃন্দাবনে ছুটে এলেন তাঁর প্রিয় সখার সঙ্গে দেখা করতে। সেই আগেকার কিশোর রূপে। ভক্তের সঙ্গে মিলন হল ভগবানের। ধন্য ধন্য ধ্বনি দিয়ে ওঠে দর্শকরা। যাত্রা শেষ হল।

মুগ্ধ জনতা। আসর ছেড়ে যেতে যেন মন চায় না। এমন সময় ম্যানেজারের চিৎকার শোনা গেল—'আপনারা শুনুন। কয়েকজন দর্শক বিভিন্ন অভিনেতার একটিংয়ে খুশি হয়ে তাদের পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার করেছেন। আমি তাদের নাম ও কি কি পুরস্কার দেবেন বলছি।' হুজুগ পেয়ে লোকে আবার বসে পড়ে, দাঁড়িয়ে যায়, যে যেখানে পারে। ম্যানেজার ঘোষণা করে:

—'ঘোষাল মশাই কৃষ্ণকে, মানে বড় কৃষ্ণকে, একটি ধুতি দেবেন।'

www.BanglaBook.org

—'শ্রীযুক্তা ভাবনামোহিনী দাসী, ওঃ সরি, ভুবনমোহিনী দাসী, বালক কৃষ্ণকে পাঁচটি টাকা দিচ্ছেন।'...বিবেকের ভাগ্যে জুটল একখানা মেডেল ও একটি কাঁসার থালা।...

হঠাৎ দেখা গেল শিরোমণি ঠাকুর আসরের মধ্যিখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বলতে থাকেন, 'আমি ভক্ত সুদামের অভিনয়ে অত্যন্ত অভিভূত হয়েছি এবং তাঁকে একটি চাদর উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তিনি সত্যই ভক্তিমান ব্যক্তি। প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত না হলে এরূপ মর্মস্পর্শী অভিনয় করা কখনই সম্ভব নয়। তাঁর আর একবার দর্শন পেলে আমি কৃতার্থ হই।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ সুদামকে দেখব, সুদামকে দেখতে চাই।' আরও অনেক কণ্ঠে দাবী শোনা গেল। অতএব সুদামকে ডেকে পাঠান হল।

সুদাম এসে আসরে দাঁড়াল। বিনীত ভাবে নমস্কার জানাল সকলকে। 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ'—রব উঠল দর্শকদের মধ্যে। গ্রামের ধনী মহাজন পঞ্চানন সাউও সুদামকে একজোড়া ধুতি দেবেন বলে ঘোষণা করলেন। বোধহয় দেখাদেখি আরও কয়েকজন সুদামকে টাকা, মেডেল ইত্যাদির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলল।

এদিকে যাত্রা মণ্ডপের একধারে চৌধুরীমশাইকে ঘিরে তখন এক জটলা শুরু হয়েছে। নটবর বলল, 'কর্তা, পচা সাউ যে ধুতি দিল, তা আপনি কিছু না দিলে যে মান থাকে না।'

থাকহরি মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'চাঁদার বেলায় ত মোটে দশটি টাকার বেশি কিছুতেই ঠেকাল না, এখন জোড়াধুতি দেখানো হচ্ছে। স্রেফ চাল মারা। ব্যাটা সুদখোরকে চিনি না! নির্ঘাত এমন শস্তা মাল দেবে যে কোন ভদ্রলোকে ও ধুতি অঙ্গে চড়াতে পারবে না। দেখে নেবেন।'

চৌধুরী নীরবে চিন্তা করছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, পচা যখন দিয়েছে, আমিও দেব। কিন্তু দিই কাকে?'

'কেন, সুদামকে দিন। খাসা পার্ট করেছে', বলল নটবর।

'ধুত্তোরি। নিকুচি করেছে তোমাদের সুদামের', চৌধুরী খিঁচিয়ে উঠলেন। 'খানিক মেয়েলি গলায় প্যানপ্যান করল, অমনি সব গলে জল হয়ে গেলেন। হ্যাঁ, এক্‌টিং করেছে বটে কংস। কি ভয়েস্! কি মুভমেণ্ট! বিষ্ণু অবতার কেষ্টকে একেবারে "নো-হোয়ার" করে দিয়েছে। নেহাত লোকটা খারাপ তাই।' ক্ষুব্ধ চৌধুরী ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

'আজ্ঞে ঠিক বলেছেন। দারুণ পার্ট করেছে কংস', নটবর তৎক্ষণাৎ সায় দেয়।

চৌধুরী বললেন, 'ও-ই নিশ্চয়ই চন্দ্র মুখুটি। অমন পার্ট করা আর কারো ক্ষমতায় কুলবে না। যাও বলে এস আমি কংসকে এক জোড়া ধুতি দেব, তাছাড়া একটা মেডেল।'

নটবর সঙ্গে সঙ্গে ছুটল।

মঞ্চে রাজসিংহাসন অর্থাৎ কেঠো চেয়ারখানার ওপর লাফিয়ে উঠে নটবর চেঁচাল, 'আমাদের মাননীয় চৌধুরীমশাই কংসর অভিনয়ে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে একজোড়া ধুতি ও একটি মেডেল দেবেন বলে জানিয়েছেন। কংসকে একবার আসরে আসতে অনুরোধ করা হচ্-চে-এ-এ।'

'কংস, কংস কই?' সোরগোল উঠল। দেখা গেল অধিকাংশ অল্প বয়সীর কংসের উপর খুব টান।

সাজঘর থেকে বেরিয়ে কংস আসরের দিকে আসতে থাকে। কিন্তু এ কি? এ কে? গায়ে অবশ্য সেই রাজপোশাক। যদিও বোতামগুলো সব লাগানো নেই, মাথায় মুকুটও আছে। কিন্তু মুকুটের নিচে এ মুখ কার! নেই গালপাট্টা দাড়ি। নেই সু-পুষ্ট গোঁফ জোড়া। নেই বাবরি চুল। তার বদলে—এ মুখ ত সুদামের। সুদাম কংসর পোশাক পরে হাজির হল কেন? একি রসিকতা? হেঁয়ালিটা বুঝতে পারে না লোকে।

আলোর কাছে আসতেই কংসবেশধারী সুদামের চোখের দিকে লক্ষ করে সবাই স্তম্ভিত। কোথায় সুদামের সেই ভাব-বিহ্বল নয়ন দুটি! বিস্ফারিত চক্ষুদ্বয়! তাতে ফুটে উঠেছে কংসর ক্রুর দৃষ্টি। কপালে ভ্রূকুটি। উদ্ধত ভঙ্গিতে হেঁটে এসে সে মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়াল। তারপর রাজকীয় কায়দায় হাত তুলল—যেন অভিবাদন গ্রহণ করছে প্রজাবৃন্দের।

ইতিমধ্যে ম্যানেজার এসে কংসর পাশে দাঁড়িয়েছে। বিস্ময়ে বিমূঢ় জনতা তার গলা শুনল—'লেডিস্ এ্যান্ড জেণ্টেলমেন, দিস্ ইজ্ মুখুটি স্পেশাল। নটসূর্য স্পেশালের দিনে এমনি ডবল্ রোল দেখান। আজ যেমন করলেন কংস এবং সুদামের পার্ট। একজন শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত আর একজন পরম শত্রু।'

একটা তুমুল হৈ চৈ হুড়োহুড়ি লেগে গেল।—'জয়, চন্দ্র মুখুটির জয়!' 'হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।' 'গুরু, গুরু!'—ইত্যাদি স্লোগান তুলল ছোকরার দল। সবাই চন্দ্র মুখুটির কাছে যেতে চায়। নিজের চোখে দেখেও এ যেন ঠিক বিশ্বাস হয় না। কেউই ধরতে পারেনি ঘুণাক্ষরে। হ্যাঁ, একেই বলে 'স্পেশাল'!

আর শিরোমণি ঠাকুর! তাঁর কি খবর? দেখা গেল ভিড় ঠেলে সন্তর্পণে বেরিয়ে যাচ্ছেন শিরোমণি, আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে। তাঁর মুখে ভারি অপ্রস্তুতের ভাব।

www.BanglaBook.org

তিন বন্ধু

শিশিরকুমার মজুমদার

রোজকার মত সেদিনও রাতে খাবারের দোকানের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল খ্যাঁদা। ভাঙ্গা দই মিষ্টির হাঁড়ি চাটবে বলে, বাসি খাবার খাবে বলে। এমন সময় দিক অন্ধকার করে বৃষ্টি নামল। দেখতে দেখতে সবাই এদিকে ওদিকে পালাল। বেশি খাবার পাবে ভেবে বেশ কিছুক্ষণ ও একাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজল, শেষে বুঝতে পারল দোকানদাররা আজ আর কিছুই দেবে না।

রাস্তার এদিক ওদিক দেখে তখন ও এক ছুট লাগাল বড় বাড়ির গাড়ি-বারান্দার দিকে। রাতে ওখানেই ও শুয়ে থাকে।

বারান্দার তলায় পেঁছে আপন মনে ও হাসল একবার। কি বোকাই না ও। এখন বুড়ো আঙ্গুল চুষতে হবে। মাথায় হাত বুলিয়ে জল ঝেড়ে ফেলল ও। ঠান্ডায় হি হি করে তখুনি কাঁপুনি শুরু হল ওর। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল আলি আসেনি। ও তাহলে ওর কবরখানার বাসায় চলে গেছে। তার মনে চট পাবে না ও আজ। ওর ত নিজের কোন বিস্তারা নেই। তাকিয়ে দেখল, ওদিকে জলের ছাঁট বাঁচিয়ে ছেঁড়া চট মুড়ি দিয়ে সারি সারি বেশ ক'জন ঘুমাচ্ছে। দেখে খুশি হল ও, ওদেরই কারও চটের মধ্যে ঢুকে যাবে। রাত তাহলে ঠিক কেটে যাবে।

ভাল করে হাত দিয়ে গা, মাথার জল ও মুছল। এগোতে যাবে যেই অমনি বুঝতে পারল পিছন থেকে ভুলো ওর ছেঁড়া পেন্টু ধরে টান দিচ্ছে।

রাগ করে ও চেঁচিয়ে উঠল, 'এই ভুলো, ছাড় বলছি। ছেড়া পেন্টু আরও ছিঁড়ে যাবে না? তখন তুই পয়সা দিবি? ছাড় বলছি। নইলে এক ঘা লাগিয়ে দেব।'

ভুলো পেন্টু ছেড়ে বলল—কুঁই কুঁই কুঁই!

'কি রে, খেয়েছিস তুই কিছু?' জিজ্ঞাসা করল খ্যাঁদা, 'আমার কিন্তু কিছু জোটেনি। যা বিষ্টি না! নে চল ঘুমুবি'।

ভুলো সামনে এগিয়ে এসে ভীষণ ভাবে ল্যাজটা নাড়তে লাগল। একবার মুখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—ভোউ-উ-উ-উঃ!

'কি হয়েছে রে তোর?'—বসে পড়ে ভুলোকে কাছে টেনে এনে জিজ্ঞাসা করল খ্যাঁদা, 'অমন করছিস কেন? খিদে পেয়েছে তোর? বললাম না পয়সা নেই। কাল সকালে গঙ্গার ঘাটে ভিখ্ মাগবো। পয়সা হলে তোকে রুটি তড়কা খাওয়াব। এখন চল।'

একথা শুনে বেজায় খুশি হয়ে ভুলো আবার ওর ল্যাজটা ভীষণ ভাবে নাড়তে লাগল। তা দেখে হেসে খ্যাঁদা বলল, 'পুটু বায়। তোকে সামনে বড় রং দোকানের বাবুর মত গাড়ি কিনে দেব। ভোঁ ঔঁ ঔঁ করে হাওয়া খেতে যাবি। ফটকওয়ালা লাল বড় বাড়ির কুত্তার মত। নে চল এখন।'

উঠে দাঁড়াল খ্যাঁদা। ওর দিকে কেমন করে তাকিয়ে দেখে ভুলো বলল—উঁ-উঁ-উঁ-উঁঃ। কি হয়েছে কিছু বোঝার আগেই আবার খ্যাঁদার ছেঁড়া জামা ধরে টানাটানি শুরু করল ভুলো!

বেশ ভাবনায় পড়ল খ্যাঁদা, এ ত ওকে কোথাও যেতে বলছে ভুলো। এত বিষ্টিতে কোথায়? ভুলো তো খুব চালাক। আলির থেকেও বেশি চালাক। শুধু যা কথা বলতেই পারে না। তবে ত নিশ্চয়ই কোথাও কিছু হয়েছে। কোথাও নেমন্তন্ন বাড়ির পাতা আঁস্তাকুড়ে পড়েছে! আহাঃ, বিষ্টির জলে এতক্ষণে সব তাহলে ভেসে গেল! যা খিদে পেয়েছে না ওর।

'চল রে ভুলো কোথায় যাবি চল।' খুশিতে চেঁচিয়ে বলল খ্যাঁদা। পরক্ষণেই ভয় পেয়ে চুপ করে গেল। ওই ওদিকে ঘুমুচ্ছে যারা, তারা শুনতে পেলে আর ওর কিছুই জুটবে না। এক একটা আস্ত আক্রোস।

ভুলো ল্যাজ নাড়তে নাড়তে রাস্তায় নেমে পড়ল। জলকে ওর খুব ভয়। কখনও চান করে না। আজ অমন বিষ্টিতেও ওকে জলে নামতে দেখে কেমন যেন বুঝতে পারল না খ্যাঁদা, ব্যাপার কি? এ কোথায় চলেছে ও?

বড় রাস্তা পার হয়ে ডান দিকে এগিয়ে বাঁয়ের পথটার সামনে এসে পিছন ফিরে দাঁড়াল ভুলো। চাপা গলায় ডাক দিল একবার—আঁ-ঔঁ-ঔঁ-ওঃ।

খ্যাঁদা বলল, 'দূর বোকা, ও দিকে ত বটকে আর হরি গোয়ালা গুন্ডারা থাকে। ও দিকে ত বস্তি। ওখানে নেমন্তন্ন খাবে কে'!

এতক্ষণ বাদে বেশ ভেবেই ভুলো বলল—ঘেউ, ঘেউ।

'চল।' বলল খ্যাঁদা, 'কোথায় যে নিয়ে যাচ্ছিস তা কে জানে?'

বস্তির আগেই হরি গোয়ালার টিনের পাকা দালান কোঠা, সোজা সে দালানেই উঠে পড়ল ভুলো। সেখান থেকে গলা বাড়িয়ে চাপা গলায় ডাক দিল—আউঃ।

ভীষণ রাগে ভুলোকে তুলে আছাড় মারতে ইচ্ছা হল খ্যাঁদার। খিদের পেট চুঁই চুঁই করছে, আর ভুলো কিনা ওকে নিয়ে এল এখানে? কাঁপতে কাঁপতে দালানে উঠে দু'হাত বাড়িয়ে ওকে ধরতে যাবে যেই, চাপা একটা অদ্ভুত আওয়াজ তুলে চট করে সরে দাঁড়ালো ভুলো! সে দিকে তাকিয়ে অবাক খ্যাঁদা দেখল, দেওয়ালের কাছে জড়োসড়ো হয়ে কি যেন একটা বসে আছে। তার দিকেই মুখ করে ভুলো বলল—আউঃ আউঃ।

ওটা কি? এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে তাকিয়ে থমকে গেল খ্যাঁদা।

www.BanglaBook.org

ওর দিকে বড় বড় চোখ তুলে তাকিয়ে আছে একটা বাচ্চা। ভয় আর আতঙ্ক মেশান তার চাহনি। ও কাঁদছে না ; আতঙ্কে একদম যেন পাথর হয়ে গিয়েছে।

ভীষণ ভয়ে খ্যাঁদাও নিজের মুখে হাত চাপা দিল। ও কি করবে এখন ? বড্ড ছোট্ট যে বাচ্চাটা !

ওর নিজের বাপ মরেছিল যখন তখন ত ও ওর থেকে আরও অনেক বড় ছিল। ভিখ মাগতে পারত। কিন্তু এ ত একদম ছোট্ট বাচ্চা, ও ত কিছুই করতে পারবে না। ও তবে খাবে কি ? কে ওকে খেতে দেবে ?

ভয়ে চিন্তায় খ্যাঁদা জিজ্ঞাসা করল, 'এই, তুই কে রে ?'

ওর কথা শুনে আরও ভয়ে বাচ্চটা মাথা নিচু করল। আপন মনে একটা আঙ্গুল খুঁটতে লাগল।

'বলবি না ?' আবার জিজ্ঞাসা করল খ্যাঁদা। 'তোর বাবার নাম কি ? বাড়ি কোথায় ?'

আঙ্গুল খোঁটা ছাড়া আর কোন কিছুই করল না বাচ্চাটা। যেন কোন কথা শুনতেই পায়নি।

একবার ভাবল খ্যাঁদা, ছুটে পালিয়ে যাবে ওখান থেকে। তখনি মনে হল ওর, তাহলে ত ও ঠিক ঠিক গুন্ডার হাতে পড়বে। বটকে আর হরি গোয়ালা কি ছেড়ে দেবে ওকে ? হয়ত অন্ধ করে দেবে, না হলে ঠ্যাং ভেঙ্গে দিয়ে ভিখ মাগতে পাঠাবে। সে বড় কষ্ট ! ঝুঁকে ও বাচ্চাটার হাত ধরল। চুপি চুপি বলল, 'আয়, আয় আমার সাথে।'

এক ঝটকায় বাচ্চাটা ওর হাত ছাড়িয়ে নিল। মুখ তুলে তাকাল না কিন্তু। এক পাশে ফিরে বসে আবার দেওয়ালে আঁচড় কাটতে লাগল। সে দিকে তাকিয়ে খ্যাঁদা বলল, 'আয় বলছি। নইলে তোকে ছেলেধরায় ধরবে। পাজী ছেলেধরা ! আসবে এখুনি।'

আতঙ্কে বাচ্চাটা তখুনি উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে ওর হাত শক্ত করে ধরল। বেশ বুঝতে পারল খ্যাঁদা, ও থরথর করে কাঁপছে। জলে ভিজে নয়, ভয়ে !

ভাল করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁ হয়ে গেল খ্যাঁদা ! চোখ বড় বড় করে দেখল সামনে দাঁড়িয়ে একটা পুচকে খুকি ! ঝকঝকে রঙিন ফেরক পরা। কিন্তু কি সর্বনাশ, খুকিটার কানে, গলায়, হাতে গয়না ! অন্ধকারেও ঝিকমিক করছে ! ও ত তবে বাবুদের বাড়ির খুকিই হবে—হারিয়ে গিয়েছে ! ঐ যে ও দিকে যেখানে বড় ময়দান আছে, সেখানে ছেরকাসের খেলা চলেছে, হাতি ঘোড়া বাঘ সিংঘির খেলা। আলিও দেখেনি। এক টাকা পাঁচ টাকা নাকি লাগে দেখতে। সে অনেক টাকা, ও পাবে কোথায় ?

কিন্তু এখন করবে কি ও ! না না, পালাবে না। বটকে আর হরি গোয়ালা পাজী ! রোজ সকালে বারান্দার তলায় চা বিস্কুট খেতে এসে জোর করে ওকে দিয়ে হাত পা গা টেপায় ! গয়না দেখলে ত ওরা খুকিটাকে একদম গুম করে দেবে। তাহলে ?

মেয়েটার দিকে হাঁ করে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে খ্যাঁদা ফিস ফিস করে ভুলোকে বলল, 'ওরে ভুলো, ও বাবুদের বাড়ির খুকি রে ! দেখছিস না কত গয়না ! চল ওকে এখন আলির ডেরায় নিয়ে যাই। লুকিয়ে রাখব। সকাল হলে খুঁজে খুঁজে বাড়ি পৌঁছে দেব। সেই ভাল হবে না ?'

ভুলো খুশি হয়ে ভীষণ ভাবে ল্যাজ নেড়ে বলল—ঘেঁউ ঘেঁউ !

রাগ করে খ্যাঁদা ধমকে উঠল, 'দূর বোকা, তোর বুদ্ধিসুদ্ধি নেই, সবটাতেই এক কথা বলিস ! আজকাল ত আলি একা একা থাকে কবরখানার ভাঙ্গা ঘরে। জিন পিরেতের ভয়ে সেখানে ত কেউ যায় না ! কি করে বটকে খুঁজে পাবে ওকে ? আর তাছাড়া আলি দোস্তকে না হলে একা একা আমি বুঝি খুঁজে পাব খুকিটার বাড়ি ? খেতি হয়ে যাবে না খুকিটার। যদি কিছু বুদ্ধি থাকে তোর।'

পট পট করে লেজ নেড়ে ভুলো বলল—ভেউ ভেউ।

বোধ হয় একটু জোরেই ওরা কথা বলছিল। ভিতর থেকে হরি গোয়ালা গর্জন করে উঠল, 'এই, কোন্ হ্যায় বাহার-মে ? ভাগ ভাগ। উঠে গা ত ডান্ডাসে ঠান্ডা কর দেগা।'

মেয়েটার হাত ধরে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এক ছুট লাগাল খ্যাঁদা। পিছন পিছন ছুটল ভুলো।

ছুটতে কি পারে খুকিটা ? একবার ত হুড়মুড় করে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়ে কাঁদতে শুরু করল। বৃষ্টিতে ভিজে জব-জবে হয়ে গিয়েছে ওরা দুজনেই তখন। হি হি করে কাঁপুনিও লেগেছে। কি আর করে খ্যাঁদা, চট করে ওকে কোলে তুলেই নিল। বলল, 'কেঁদ না গো বাবুদের বাড়ির খুকি। ছেলেধরায় ধরবে তা হলে। তাহলেই সব্বোনাশ হয়ে যাবে।'

দু'হাতে মেয়েটা ওকে জাপটে ধরল। থর থর করে কাঁপছে ও তখন, ঠান্ডায় নয়, ভয়ে ! কেমন যেন লাগল খ্যাঁদার। আহা, বড্ড বাচ্চা খুকি ! সাহস দিয়ে বলল, 'এই ত এসে পড়লাম আমরা। ওই মাঠটা পার হলেই পাঁচিল ঘেরা কবরখানা। সেখানেই থাকে দোস্ত আলি। আমার খুব বন্ধু ! খুব বুদ্ধি ওর, ভুলোর থেকেও অনেক বেশি। দেখো কাল সকালেই তোমাকে তোমার মা'র কাছে নিয়ে যাব। অনেক খেতে দেবে ত তখন আমাকে ? অনেক, অনেক ! নুচি, পান্তাভাত, অসোকোল্লা, বেগুন ভাজা, পাতের জুঠাও আমি খাই।'

হাঁপাতে হাঁপাতে কবরের ভাঙ্গা ঘরের সামনে যখন ও পৌঁছাল, তখন বৃষ্টি থেমেছে। চাপা গলায় ডাকল খ্যাঁদা, 'এই আলি, আলি, আমরা এলাম রে। তুই কোথায় ? সাড়া দিচ্ছিস না কেন রে ?'

ভুলোও কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দেখে ডেকে উঠল—ভোউ ভোউ।

তবুও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না ভাঙ্গা ঘরটার ভিতর থেকে। ভুলো চট করে উঠে পড়ল দালানে। সেখানে গা ঝাঁকিয়ে গায়ের জল ঝেড়ে ফেলে মাটি শুঁকতে শুঁকতে সোজা ঢুকে গেল ভাঙ্গা ঘরটার মধ্যে।

খ্যাঁদাও দালানে উঠে বাবুদের খুকিকে কোল থেকে নামাতে গেল। এতটা পথ ওকে কোলে করে এনে কোমর ধরে গেছে ওর। মেয়েটা কিন্তু কেন যেন কিছুতেই নামবে না। থেকে থেকে শুধু ঘুমে ঢুলে পড়ছিল। একটু জোর করতেই বড় বড় চোখ খুলে কেমন করে যেন খ্যাঁদার মুখের দিকে তাকিয়ে ওকে ওর ছোট্ট দুটো হাত দিয়ে শক্ত করে আবার জাপটে ধরল।

মহা মুস্কিলে পড়ে খ্যাঁদা বলল, 'এই দেখ, আমি যে আর দাঁড়াতে পারছি না। নাম নাম, নইলে পড়ে যাব যে !'

তখনি ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে আলি হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল। কেঁউ করে চেঁচিয়ে উঠে ভুলো এক ছুটে বাইরে এসে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

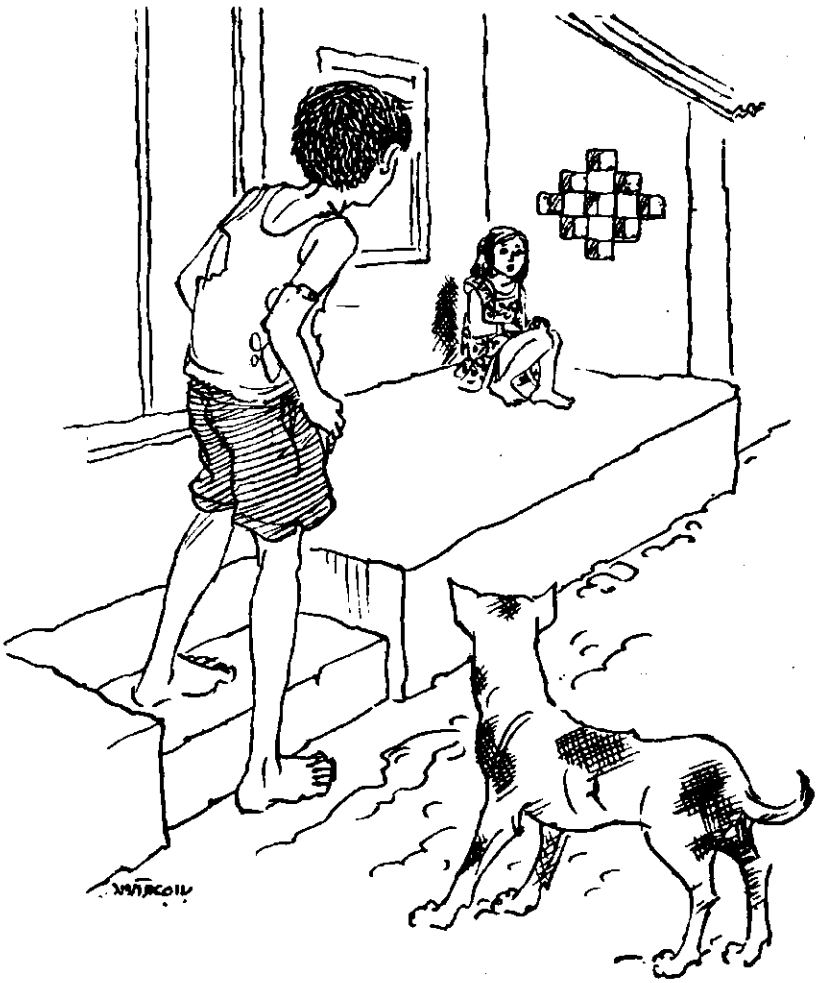

খ্যাঁদার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে ভাঙ্গা ঘরের দরজার দিকে তাকাল।

জোর করে বাবুদের বাড়ির খুকিকে নিচে নামিয়ে দিয়ে খ্যাঁদা বলল, 'এই আলি, আমি রে, আমি। সব্বোনাশ হয়েছে, শিগ্‌গির বাইরে আয়।'

হুড়মুড় করে আলি বাইরে এসে চেঁচিয়ে উঠল, 'তোর ভুলোকে আমি কেটে দুখানা করব। বেটা ঘুমের মধ্যে আমার গালে চেটে দিয়েছে। আমি ত ভয়ে মরেই যাচ্ছিলাম। কোথায় বেটা'...

ঘুরে দাঁড়িয়ে খুকিকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এ কে রে খ্যাঁদা?'

খ্যাঁদা বলল, 'তবেই ত বলছি সব্বোনাশ হয়েছে। এ ত বাবুদের বাড়ির খুকি, দেখ দেখ কত গয়না! নিচ্চয় হারিয়ে গেছে ছেরকাস দেখতে গিয়ে। ভুলোকে বকবি না খবরদার। ওই ত খুঁজে বার করেছে ওকে, নইলে এতক্ষণে বটকে আর হরি গোয়ালা ধরত ওকে।'

শিউরে উঠল আলি, 'আয় আয়, ভিতরি আয় শিগ্‌গির। এই ভুলো তুই ঢুকবি না বলছি। ওই বারান্দায় পাহারা দিবি। বটকেটা ভীষণ পাজী! এলেই কামড়াবি।'

মহা খুশি হয়ে ল্যাজ নেড়ে ভুলো আবার বলল—ভোউ ওউ ওউ।

একটা টুকরো মোমবাতি জ্বালিল আলি। এক কোন থেকে এক টুকরো ছেঁড়া নেকড়া বার করে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই খ্যাঁদা, বাবুদের খুকিকে মুছিয়ে দে ভাল করে। নইলে বুখার হবে। আর তা জানতে পারলে বাবুরা পুলিশে খবর দেবে। জমাদার ডাণ্ডা লাগাবে বলে দিচ্ছি। জিহেল হাজত হয়ে যাবে, হ্যাঁ!'

আলোর দেখে এতক্ষণে মেয়েটার সাহস হল। ছেঁড়া নেকড়াটা দেখে নাক সিটকে বলল, 'এ্যাঃ, ময়লা!'

জোর করেই ওর মাথা গা মুছিয়ে দিল খ্যাঁদা।

'এখন কি করবি?' জিজ্ঞাসা করল খ্যাঁদা।

'সকাল হলে বাড়ি খুঁজে দিয়ে আসব', বলল আলি।

'কোথায় বাড়ি জানবি কেমন করে?'

আলি ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর বাড়ি কোথায় রে বাবুদের বাড়ির মেয়ে?'

উত্তরে মেয়েটা কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, 'বালি যাব। আমি মাল কাছে যাব।'

আলি বলল, 'এ ত দেখছি কিছুই জানে না রে খ্যাঁদা!

www.BanglaBook.org

একেবারে বোকা, ভুলোর থেকেও বেশি!'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভুলো ওদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। বেশ বিরক্ত হয়ে ছাদের দিকে মুখ তুলে বলল—ভাউ, আউ আউ!

'থানার দারোগাবাবুর কাছে নে যাই চল', একটু ভেবে বলল খ্যাঁদা।

'হ্যাঁ, তারপর তিন ডাণ্টা খেয়ে নকআপে যাই আর কি! বোকা, দেখছিস না গায়ে গয়না আছে। বলবে ছেলেধরা। ব্যস ফাঁসি দিয়ে দেবে।' কান চুলকাতে চুলকাতে বলল আলি, 'আমি থানায় যাব না। তুই যাবি তা যা না। আমি ঘুমোই তাহলে আবার।'

এ সব বাজে কথা শুনে বিরক্তিতে ভুলো বলল—ভোউ ওউ ওউ ওউ!

'তাহলে ও নিশ্চয়ই পারেকের ধারের সেই বড় ফটকওয়ালা লাল বাড়ির খুকি! নইলে অত গয়না পরবে কে?' নিজের বোকামি সামলে খুশি হবার ভান করে বলল খ্যাঁদা।

কান চুলকান বন্ধ করে একটু ভাবল আলি, বলল, 'তা হতে পারে রে! কাল সকালেই যাব ওখানে। নে এখন ঘুমো। মেয়েটার খুব ঘুম পেয়েছে দেখছিস না?'

একটা চটের উপরে একটু জোর করে মেয়েটাকে শুইয়ে দিতেই ও একবার ফুঁপিয়ে কাঁদতে চেষ্টা করল। তারপর ঘুমে ঢলে পড়ল। আলি বাইরের দিকে তাকিয়ে ভুলোকে বলল, 'তুই কিন্তু ঘুমুবি না, খবরদার! পাহারা দিবি। দেখছিস না গয়না আছে।'

ভুলো খুশি হয়ে ল্যাজ নেড়ে বলল—ভুক ভুক, ভোউ ওউ।

শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল ওরা দুজনে।

ভুলোর ডাকে যখন ওদের ঘুম ভাঙল, তখন রোদ উঠেছে। মেয়েটা তখনও চটের উপরে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে! সেদিকে তাকিয়ে আলি বলল, 'ওর ঘুম ভাঙলেই খিদে পাবে রে খ্যাঁদা, এখনি আগে খাবার আনতে হবে।'

দেওয়ালের ভাঙা একখানা ইঁট টেনে সরিয়ে ও ফোকর থেকে একটা তোবড়ান কৌটো বার করল। তার থেকে একটা পুরো টাকা বার করে খ্যাঁদাকে দিয়ে বলল, 'যা, মতি মিঠাইওয়ালার দোকান থেকে গরম জিলিবি আন চারটে। আর একটা ছোট ছেলাইস। তিনটে দশ নয়া ফিরবে। ঠকিস না যেন।'

বড় বড় চোখ করে নোটটা হাতে নিয়ে খ্যাঁদা বলল, 'তোর অনেক টাকা, না রে আলি? কোথায় পেলি রে?'

'সে তুইও পেতে পারিস', বলল আলি, 'তোকে সে কাজ শিখিয়ে দেব পরে। এখন যা তাড়াতাড়ি।'

খ্যাঁদা ঘর থেকে বার হতেই ভুলো উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে ল্যাজ নাড়তে লাগল। তা দেখে আলি বলল, 'না না, তোর এখন কোথাও যাওয়া হবে না ভুলো। তুই এখনও পাহারা দিবি। আমিও ত টিপ কল থেকে জল আনতে যাব। কে দেখবে মেয়েটাকে?' ভুলো বেশ গম্ভীর ভাবে বলল—ভোউ ভোউ, ঘোউ ঘোউ।

ওরা দুজনেই দালান থেকে নিচে নামল। আলির হাতে ভাঙা কুঁজোটা। বেশ কিছুটা এসে ওরা পিছন ফিরে দেখল ভুলো দালানের ধারে দাঁড়িয়ে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে। ওদের তাকাতে দেখে বেশ ভারিক্কি চালে বলল—ভাউ আউ।

কবরখানা পার হয়ে ডান দিকে গেল খ্যাঁদা। বাঁদিকে আলি। টিপ কলটা বেজায় শক্ত। বেশ জোর লাগে জল তুলতে। কুঁজোটা নিচে পেতে ক্যাঁচ কোঁচ করে বার কতক হ্যাণ্ডেল টিপেছে আলি, অমনি শুনতে পেল ভাঙা ঘরের কাছে ভুলো ভীষণ চেঁচাচ্ছে! চট করে কুঁজোটা তুলে নিল আলি। নিশ্চয়ই তাহলে বটকে গুণ্ডা খবর পেয়ে মেয়েটাকে ধরতে এসেছে! নইলে ভুলো অমন করে চেঁচাবে কেন! প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল আলি। গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল, 'টেংরি কামড়ে ধর রে ভুলো, খবরদার ছাড়বি না। গয়না নে যায় ত যাক গে! খুকিটাকে ছাড়বি না।'

বড় পরীটার মূর্তিটা বেড় দিয়েই থমকে দাঁড়াল আলি! দালানে ছটফট করছে ভুলো আর চেঁচাচ্ছে। ওকে দেখতে পেয়ে আরও জোরে চেঁচাতে লাগল!

তবে ত সাপ হবে নিশ্চয়ই! মাঝে মধ্যে সাপ বার হয় ভাঙা কবর থেকে! মেয়েটা ত ঘুমুচ্ছে।

কুঁজোটা ছুঁড়ে ফেলে ছিল আলি। একটা শক্ত ডাল তুলে নিয়ে এক ছুটে উঠল গিয়ে দালানে। দেখল, না সাপ-টাপ নয়। ঘুম থেকে উঠে বসে মেয়েটা দু'হাতে চোখ কচলে কাঁদছে। ওকে দেখেই হাত বাড়িয়ে ভুলোকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'তাইগাল কাম্মাবে।'

একগাল হেসে আলি বলল, 'ও ত ভুলো, ও খুব ভাল, তোকে কামড়াবে না। ওই ত তোকে পাহারা দিচ্ছিল।'

মেয়েটা কান্না থামিয়ে নাক ফুলিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা কই, দাদা?'

'দাদা আসছে, খাবার আনতে গেছে, জিলিবি আর ছেলাইস। তুই খাবি না?'

খুকি নড়ে চড়ে বসে বলল, 'তোত তাব, মাথোন তাব, দিম তাব।'

আবার এক গাল হেসে আলি বলল, 'ও সব খাবার আমরা কোথায় পাব বল ত!'

তখনি ছুটতে ছুটতে এল খ্যাঁদা। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে রে? ভুলো অমন চেঁচাচ্ছিল কেন রে?'

'ও কিছু না', বলল আলি, 'খাবার এনেছিস? দে ওকে। ওর খিদে পেয়েছে।'

জিলিপিগুলো সব একটা একটা করে খেয়ে ফেলল মেয়েটা। বলল, 'আলো দাও।'

রুটির একটা ছেলাইস কামড় দিয়ে থু থু করে ফেলে দিয়ে বলল, 'পচা। তাইগাল খাবে।' বলে ওরা কেউ কিছু করার আগেই পুরো রুটিটা ভুলোকে দিয়ে দিল।

আলি ধমক দিয়ে বলল, 'কি বোকা রে তুই খ্যাঁদা, সব রুটিগুলো ওকে দিলি কেন? এখন খাবি কি? তোর ভুলোটাও কি খেকুক দেখ, সব রুটিগুলো খেয়ে ফেলল।'

খ্যাঁদা বলল, 'থাক গে যাক। ওর খুব খিদে পেয়েছিল। আচ্ছা তাইগাল কোন কুকুরের নাম রে? পার্কের ধারের সেই রাজা বাবুদের বাড়ির কুকুরটার নাম, না, যেটা তোকে কামড়ে রক্ত বার করে দিয়েছিল সেটার? নাকি বুড়ো বাবুর সাথে রোজ রোজ চাকর যে সাদা কুকুরটাকে আনে তার নাম? ওটা কিন্তু পাজী কুকুর, ছাড়া পেলেই আমাদের টুঁটি কামড়ে ধরবে।'

আলি বলল, 'তুই ত খুব ধরেছিস খ্যাঁদা! মেয়েটা ভুলোকে

www.BanglaBook.org

তাইগাল বলছিল। তবে নিশ্চয়ই ওদের বাড়ির কুকুরের নাম তাইগাল।'

একটু ভেবে ও লাফ দিয়ে উঠে বলল, 'ওহো মনে পড়েছে, সেই যে ময়দানের ওদিকে বড় রাস্তার পারে গলিতে বড় ফটকওয়ালা বাড়ি, যেখানে গাড়িওয়ালা বাবুরা থাকে। কাগজ কুড়ুতে গেলেই কুকুর লেলিয়ে দেয়। ওদের কালো কুকুরটাই ত বড়বাবুর হুকুমে আমাকে কামড়ে দিয়েছিল। সেই কুকুরটার নামই তাইগাল। চল চল, ওকে আমরা দিয়ে আসি গিয়ে। বাবু তাহলে অনেক বকশিশ দেবে। আর কুকুর লেলিয়ে দেবে না।'

খুশিতে খ্যাঁদাও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চল তাহলে এখুনি। কত বকশিশ দেবে রে? একটাকা দু'টাকা—উঃ!'

মেয়েটাও ওদের দেখাদেখি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মাল কাছে যাবো। বাবাল কাছে যাবো।'

হি হি করে হেসে খ্যাঁদা বলল, 'বাঃ, জামা পর তবে ত যাবে। অমনি অমনি যায় নাকি কেউ।'

আলি ধমকে বলল, 'দূর বোকা, জামা পরবে কি! ওর গায়ের গয়নাগুলোও খুলে ফেল। সব জামার মধ্যে জড়িয়ে নে। কেউ যেন দেখতে না পায় খপরদার। তাহলেই ছেলেধরা মনে করে হাড় গুঁড়ো করে দেবে।'

কিছুতেই গায়ের গয়না খুলতে দেবে না খুকি। ছোট্ট দুটো হাতে কিল চড় ঘুঁষি মেরে সমানে চেঁচাতে লাগল, 'আমাল চুলি, দেব না, দেব না।'

আলি বলল, 'আমরা কিছুটি নেব না রে, সত্যি বলছি। তোর জিনিস তোকেই দিয়ে দেব। দেখিস।'

ময়দান পার হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ওর বড় বাড়ির গলির সামনে এসে পড়ল। এতক্ষণ আগে আগে চলছিল ভুলো। এখন পিছিয়ে পড়ল। ও জানে সামনের রাস্তায় ওর এমন সব প্রতিদ্বন্দ্বী আছে যাদের সাথে সারা জীবন যুদ্ধ করেও জিততে পারবে না। সেখানে জেনে বুঝে কেউ যায়? অবাক হয়ে ও দেখল সেই রাস্তাতেই ঢুকল গিয়ে ওরা দুজনে! মহা বিরক্তিতে ধমকে উঠল ভুলো, আঁউ আঁউ আঁউ!

'চুপ কর বলছি।' ধমকে উঠল আলি চাপা গলায়। ওর কোলেই তখন খুকি। এদিক ওদিক খুব ভাল করে দেখে নিয়ে ও ফের চাপা গলায় বলল, 'খ্যাঁদা, বাড়ির ফটকটা একদম খোলা রে! তাইগাল তেড়ে এলে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে বলে দিলাম। খপরদার আর এগোস না।'

খুকিকে নীচে নামিয়ে দিয়ে সামনের খোলা ফটকটা দেখিয়ে ভয়ে ভয়েই আলি জিজ্ঞাসা করল, 'ওই তোর বাড়ি না খুকি? দেখ ভাল করে দেখ, ওখানে তোর বাবা মা থাকে নারে!'

বড় বড় চোখ করে মেয়েটা কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে খুশিতে চনমন করে উঠে বলল, 'বালি, চলি, আমি যাই।'

'গয়নাগুলো নিয়ে যাও,' বলল খ্যাঁদা। 'ফেলে দিও না যেন, বুঝলে?'

ওর হাতের মধ্যে ভাল করে গুঁজে দিল গয়নাগুলো ও। বেশ শক্ত করেই ওগুলো ধরল মেয়েটা। তারপর মাথা দুলিয়ে বলল, 'আমি যাই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে খ্যাঁদা বলল, 'হ্যাঁ যাও। মাকে বলবে নুচি, পান্তাভাত, অসোকোল্লা আর বেগুন ভাজা খেতে দিতে আমাদের। আমরা এখানে থাকলাম। ভুলোকেও দিতে বলবে। ও খুব ভাল।'

ছাড়া পেয়ে মেয়েটা ছুটতে শুরু করল।

সেদিকে কেমন করে যেন তাকিয়ে রইল ওরা দুজনে!

তারপর চারদিকের বাড়ির দরজা জানলা খুলে গেল। এ-বাড়ির ও-বাড়ির অনেকেই নেমে এল পথে। 'ওমা কোথায় ছিলি রে সারা রাত তুই! মা-মণি এ কি চেহারা হয়েছে তোর! দেখি দেখি!'

বড় বাড়ির ফটক দিয়ে পাগলের মত বার হয়ে এলেন মা। পিছন পিছন বাবা। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ওঁরা। ওঁদের চোখ দিয়ে জল নেমে এল।

কেমন যেন করে উঠল আলি আর খ্যাঁদার মনের ভিতরে! ওদেরও চোখ জ্বালা করে চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। ভুলো থাকতে না পেরে বলে উঠল—ভোউ ওউ!

সে চিৎকারেই চারদিকের অবস্থা বদলে গেল! সবাই যেন কি বলে চেঁচাতে লাগল। তার মধ্যেই আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল ভুলো।

প্রাণপণে পার্কের দিকে ছুটতে লাগল ওরা তিন জনে। পিছনে তেড়ে আসছে তিন তিনটে বাঘের মত বিলিতি কুকুর। পার্ক পার করে দিয়ে কুকুর তিনটে থামল।

ছোটা থামিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে খ্যাঁদা বলল, 'আমি আর পারছি না রে আলি। বড্ড খিদে পেয়েছে! কাল আতে খাওয়া হয়নি।'

আলি এক গাল হেসে ঘাম মুছে বলল, 'নুচি পান্তাভাত অসোকোল্লা আর বেগুন ভাজা খাবি? চল তাহলে আমার সাথে আজ খেকে ছেঁড়া কাগজ কুড়ুতে। ওতে ইজ্জৎ, ভিখ মাংবি কেন রে? আমি তোকে নুচি খাওয়াব, আয়।'

ভুলো খুশিতে লেজ নেড়ে বলল—ভোউ ওউ ওউ।

ওরা তিন জনে এগিয়ে গেল সামনে।

১৩৮৬

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আজ খুলেছে লেডিজ কামরা, রেলগাড়িতে এটাই প্রথম
ভীড় করে তাই দেখছি আমরা, যাত্রীটি কে? মিসেস বথ্যাম।

www.BanglaBook.org

আয় আয় চাঁদমামা

প্রদীপকুমার রায়

এক

দেশ বিদেশে নেইকো জুড়ি,
প্রকাণ্ড সে রাজার পুরী,
বাইরে থেকে তাকিয়ে দেখে লোকে ;
দেয়ালে তার আগাগোড়া
সোনা রুপোর তবক মোড়া,
এমন প্রাসাদ কেউ দেখেনি চোখে !
লম্বা গোঁফে লাগিয়ে চাড়া,
দরজাতে চার পাইক খাড়া,
ঢাল তরোয়াল পাকড়ানো দুই হাতে,
কেউ এলে ঠিক গেটের পাশে
হুমকি দিয়ে এগিয়ে আসে,
দাঁতকপাটি অমনি লাগে দাঁতে।
থাকার কথা যেমন যা যা,
আছেন রাণী, আছেন রাজা,
রাজকন্যে এই পড়লেন আটে,
একটা মোটে ছোট্ট মেয়ে
বেড়ায় ঘুরে নেচে গেয়ে,
আনন্দে তার সারাটা দিন কাটে।
সবাই ছিলেন বেজায় সুখে
গল্পে খেলায় হাসি মুখে,
একদিন এক বিপদ হল ভারি,
রাজার কোলে বিকেল বেলা
বন্ধ করে পুতুল খেলা
রাজার মেয়ে হুকুম করেন জারী,—
'আকাশ করে জোরসে নেড়ে,
চাঁদটা আমায় দাও না পেড়ে
শেকল বেঁধে টাঙিয়ে রাখি ঘরে।'
রাজা বলেন,—'একটু দাঁড়া,
চাঁদটা তো মা যায় না পাড়া,
কুড়িয়ে দেবো, পড়বে যেদিন ঝড়ে।
এখন নে তুই খেলনা যত,
বল দেখি তোর চাই মা কত,
দোকান বাজার উজাড় করে আনি !'
সমস্ত ঘি ভস্মে ঢালা,
চেঁচিয়ে কানে লাগায় তালা,
চুপ করাতে হার মেনে যান রাণী।
চোখের জলে দু'গাল ভাসে,
বদ্যি আসেন, ধাত্রী আসে,
যতোই বোঝাও কার কথা কে শোনে!
মণ্ডা মেঠাই দুধে ভাতে,
অমনি পড়ে রইল পাতে,
কাঁদছে বসে রান্না ঘরের কোণে।

দুই

ব্যাপার দেখে রাজা মশাই
হলেন বেজায় চিন্তিত,
আজকে সভায় সবার গেল
বেজায় খারাপ দিনটি তো !
ধমকে বলেন,—'মন্ত্রী, তুমি
কোন কিছুই দেখছ না,
মাখছ মুখে পাউডার আর
ঘষছ গায়ে রেঙ্গোনা।
চাঁদটা পেড়ে দেবার জন্যে
একটা করে ব্যবস্থা।
দেখছ না কি, রাজকন্যার
কি ভয়ানক অবস্থা !'
মন্ত্রী বলেন,—'রাজা মশাই,
আমায় করুন মার্জনা,
আকাশ দিয়ে চাঁদ খোঁচানো
এসব আমার কার্য না !
জুটিয়ে দিলেম অনেক জিনিস,
দেখুন না এই ফর্দটা,—
রাজ আদেশে বইছি বোঝা,
নেহাৎ বলা বিদ্যটা।'

তিন

'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি আর,
ধাঁধনীর দুধ তিন কাঁচ্চা,
হাতির মুণ্ডু থেকে গজমতি মণিহার,
পক্ষীরাজের দুটো বাচ্চা,
একটা পাঁচ-পাওলা গোটা অজগর সাপ,
ব্যাঙগমা ব্যাঙগমী জ্যান্ত,
রামের খড়ম জোড়া, ভীমের গদার খাপ,
আমি ছাড়া এসব কে আনত ?
চাঁদটা তো সোজা নয়, ঠিক কুমোরের চাক
মাঝে মাঝে ছোটো বড় গর্ত,
কিছু কম পঞ্চাশ হাজার মাইল-টাক
হবে এর সঠিক দূরত্ব !
কল্পতরুর ফল পাড়ার হুকুম হয়,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাতেও বলছি আমি আচ্ছা,
কিন্তু চাঁদটা পাড়া আমার কর্ম নয়!
কথা যা বলবো বাপু সাচ্চা।'

চার

রাজা বললেন বুড়ো মন্ত্রীকে,—
'মনটা তোমার থাকে কোন দিকে?
চাঁদ কত বড়, কত দূরে থাকে,
এ খবর মিছে শোনাচ্ছ কাকে?
আগে কি এনেছ, ক'টা হীরে মণি,
ক'টা সাপ, আর, কত ক্ষীর ননী,
কতটুকু দুধ, কত বড় বীচি,
কেন এইসব বকো মিছিমিছি?
পারবে না তুমি চাঁদ পেড়ে দিতে
এই কথাটাই বল দেখি সিধে।
গুটিয়ে কাপড় মেরে মালকোঁচা,
ভালোয় ভালোয় কেটে পড় চোঁ চাঁ।'

পাঁচ

এবার রাজার ডাকে
এল যাদুকর,
রোগাভোগা, কালোকোলো
নাম রাধু কর!
মেয়ের বায়না শুনে
গায়ে ছোটে ঘাম,
মুখে আর কথা নেই,
খালি রাম রাম।
হেঁচে ফেলে বলে শেষে—
'হুজুর শুনুন,
লেবু কেটে তার থেকে
বার করি খুন,
টুপি থেকে খরগোশ,
হাওয়া থেকে তাস,
শূন্য হাতড়ে টাকা,
ডিম ফেটে হাঁস;
আঁটি পুঁতে তক্ষুনি
বার করি আম,
কিন্তু এবারে প্রভু
বিধি মোর বাম।
বলুন তো কোথা থেকে
পাই হেন ফাঁদ,
তাই দিয়ে চট করে
পেড়ে আনি চাঁদ?
চাঁদ ব্যাটা দূরে থাকে
লক্ষ যোজন,
সতেরো শো তের মণ
ওটার ওজন।
বিকট চেহারা ওর
বিশাল বহর,
ওর ফাঁকে ঢুকে যাবে
আস্ত শহর!
রাজকন্যার হাতে
দেবার দরুণ,
ওটা ছাড়া আর কিছু
হুকুম করুন।'

ছয়

বলেন রাজা,—'বেরোও সোজা,
দূর হয়ে যাও সামনে থেকে,
সবার এলেম যাচ্ছে বোঝা,
বায়না মেয়ের সামলাবে কে?'
ডাকাও দেখি রাজজ্যোতিষী,
এবার শুনি, বলছে সে কি?
থামাক্ মেয়ের কান্না, কেমন
জোরালো তার কলজে দেখি।'
রাজার ডাকে জ্যোতিষ মশাই
ধুলো পায়েই হাজির সোজা,
মাথায় টিকি, নাকে তিলক,
দুই বগলে পাঁজির বোঝা।

সাত

ব্যাপার শুনে জ্যোতিষ মশাই
একেবারে স্তম্ভিত,
মুখের বচন রইল মুখে,
থামল হম্বিতম্বি তো!
কাষ্ঠ হেসে বলেন, 'যদি
চাঁদ ধরা হয় লাঞ্ছনা,
মিটবে নাকো কল্পনা তা,
মাত্র হবে স্রেফ লাঞ্ছনা।
লোভ করাতে দোষ কিছু নেই,
বেজায় সে খাপসুরত তো?
কিন্তু তাকে ধরাই কঠিন,
নিযুত যোজন দূরত্ব!
শরীরটা ওর ঠাণ্ডা বেজায়,
তৈরি যে এ্যাসবেষ্টসে,
শখ করে হাত যে ছোঁয়াবে,
অমনি পাবে কেষ্ট সে।
সময় পেলে আঁক কষে ঠিক
বলতে পারি চূড়ান্ত,
রামের বাণে শুকিয়ে সাগর
কতক্ষণে ফুরান তো।
গ্রহণ কালে যখন রাহু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাঁদের কাছে ঘনিষ্ঠ,
বলতে পারি, চাঁদের তখন
হয় কতটুকু অনিষ্ট।
পাঁজির পাতা খুললে পরে
বলতে পারি বিধান তো
অষ্টমীতে বেগুন খাওয়া
কাজটা খারাপ নিতান্ত।
কিন্তু হুজুর এই কথাটা
শুনুন আমার যথার্থ,
চাঁদকে ধরে আনবো পেড়ে
নয় সে তেমন পদার্থ।
শাস্ত্র ঘেঁটে এই কথা কেউ
করুক দেখি খণ্ডিত,
তখন না হয় আমায় হুজুর
দেবেন করে দণ্ডিত।'

আট

লাফিয়ে উঠে আসন থেকে
বিষম খেয়ে ভীষণ রেগে
বলেন রাজা,—'ডাকাও পাইক বেহারা,
পাকড়ে ধরে তোল্লা করে
ঢোকাও এদের গুমটি ঘরে,
বদলে দেব সবার মুখের চেহারা।
ডাকলে দেখি বারে বারে
সবাই এসে বুকনি ঝাড়ে,
বার করে সব লম্বা যত তালিকা,
বকবে খালি আজেবাজে,
খোঁজ কারো নাই আসল কাজে,
ঘামিয়ে দিল এইটুকু এক বালিকা!
রাজ্যি জুড়ে ঢোল ডগরে
প্রচার করো ঘরে ঘরে,
লক্ষ টাকা কে চায় নিতে কামিয়ে,
শর্তটা নয় কঠিন ততো,
রাজকন্যার হুকুম মতো
চাঁদ আনা চাই আকাশ থেকে নামিয়ে।'

নয়

খবর শুনে এবার ছুটে
এলেন রাজার ভাঁড়,
শিশুর তরে স্নেহের হাসি
ঝরছে মুখে তাঁর।
এসেই বলেন, 'রাজা মশাই,
আপনি ঘরে যান,
এক মিনিটেই সমস্যাটার
করছি সমাধান।'
রাজা বলেন, 'কেমন করে
খুলবে তুমি গিঁট
পণ্ডিতেরা চেষ্টা করেও
সবাই হলেন ঢিট।
সবাই মিলে হদ্দ হল
পাড়তে গিয়ে চাঁদ,
হেলে ধরার ক্ষমতা নেই,
কেউটে ধরার সাধ!'
ভাঁড় বললেন, 'হুজুর আমার
একটা সুযোগ দিন,
রইল না হয় এই অধমের
মুণ্ডুটা জামিন।
পণ্ডিতেরা কেউ ভাবেনি,
কে চেয়েছে চাঁদ,
আর কারো নয়, নিছক এটা
রাজকন্যার সাধ।
রাজার মেয়েই বলতে পারে
চাঁদটা কেমন তার,
রঙীন বেলুন, রুপোর থালা,
কিম্বা বাতির ঝাড়।
খোঁজ করে ঠিক জানতে হবে
রাজকন্যার ঠাঁই,
বায়না যেটার জন্যে মেয়ের
কেমন চাঁদা চাই?'

দশ

ভাঁড় গিয়ে কন, 'রাজকন্যে,
দুঃখু তোমার কার জন্যে?
যেটাই যখন হয় ইচ্ছে,
অমনি তো সব এনে দিচ্ছে।
সোনার হরিণ বাঘবাচ্ছা,
যাই চাও তুমি, তাই আচ্ছা।
বায়না এবারে কিনা চাঁদ।
সেটাও না হয় এনে দিচ্ছি।
কিন্তু চাঁদটা পেড়ে আনতে,
ক'টা কথা আগে হবে জানতে;
পণ্ডিতে কন, চাঁদ মস্ত,
হাজার মাইল ওর প্রস্থ!
কাছে নয় ওটা, বহু দূরে যে,
লক্ষ মাইল দূরে ঘুরছে!
তাই যদি হয় রাজকন্যে,
মিছে কেন কাঁদো তার জন্যে?'

এগার

রাজকন্যে বললে হেসে, 'ভাঁড় মশাই,
পণ্ডিতদের নাক জুড়ে এক কিল বসাই;
মাথায় ওদের ভর্তি ঘুঁটে আর গোবর,
ওদের কাছে যা শোন সব ভুল খবর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসল কথা, আমিই জানি, চাঁদ রুপোর,
কান খাড়া খরগোসের ছবি ওর উপর ;
ঐ তো দূরের অশথগাছের ঠিক আগায়
চাঁদটা এখন আলোর হাসির বান জাগায়।
এই যে আমার রুপোর থালা, ফল রাখার,
ওর মতো খুব ছোট্ট চাঁদা, গোল আকার।
তোমার কাছে এসব খবর নয় নূতন,
আঁকশি দিয়ে দাও না ওকে এক গুঁতোন।
টপ করে ও পড়বে খসে যেই ধুলোয়,
অমনি তুলে জড়িয়ে আনো লাল তুলোয়।
যেমন করেই হোক না, আমার চাঁদকে চাই,
না পারো তো বলো না হয়, ফের চেঁচাই!'

বার

খেয়ে ভীষণ রাজকন্যার বকুনি,
ভাঁড় মহাশয় ছুটে বেরোন তখুনি ;
জোটেন গিয়ে স্যাকরা বাড়ির উঠোনে,
বলেন তাকে, 'রুপোর থালা দুটো নে।
একটা থালা চেঁছে ছুলে র‍্যাঁদাতে,
রুপোর শেকল দে বেঁধে ওর ছ্যাঁদাতে।
তার পরে তোর পাতলা ছুরি শানিয়ে
ওর ওপরে খরগোশ দে বানিয়ে।
আর একখানা থালা, সে তোর মজুরী,
বেচলে ওটা পয়সা পাবি প্রচুরই!
চাঁদ পেড়ে দাও, বায়না ধরে এখনি
রাজকন্যার কাণ্ড তো কেউ দেখনি!
বানিয়ে দিতে পারলে তাকে চাঁদাটা,
থামবে তবে রাজকন্যার কাঁদাটা।'
স্যাকরা বলে, 'একটু ঝেড়ে কাশো না,
খুলেই বলো তোমার মনের বাসনা।
চাঁদটা থাকে লক্ষ মাইল দূরেতে
মাথার ওপর নীল আকাশের কুঁড়েতে।
ঝুলছে দেখ ঐ আকাশের বাঁ কোণে ;
তৈরি ওটা সদ্য তোলা মাখনে।
কেমন করে, দাও বুঝিয়ে আমাকে,
কামারশালায় বানাই চাঁদামামাকে!'
ভাঁড় বলে, 'ভাই, থামাও তোমার বকুনি,
ব্যাপারখানা দিই বুঝিয়ে এখুনি।
চাঁদের খবর বললে যেটা ফেনিয়ে,
অনেক রকম মত-বিরোধ এ নিয়ে।
বললে তুমি নিজের যেটা ধারণা,
এটাই যে ঠিক, বলতে তো তা পার না!
সবাই করে নিজের মতন ভাবনা,
রাজকন্যার চাঁদ তো তাতে পাব না!
ওর মতে চাঁদ একেবারে আলাদা
অশথগাছে ঝুলছে রুপোর থালাটা।
তাই তো আমি রাজকন্যায় ভোলাতে
অমনি চাঁদই চাই যে ঘরে ঝোলাতে।
তোমার এত ভাবনা কেন তা নিয়ে,
বলছি যেমন দাও না তুমি বানিয়ে।'

তের

রুপোর পাতে চকচকে চাঁদ
কামারশালায় বানিয়ে,
ভাঁড় মহাশয় রাজকন্যার
ঘরে দিলেন টানিয়ে।
শেষ বেলাকার সোনার আলো
ঠিকরে পড়ে ছড়িয়ে,
ঠিক যেন তার শরীর থেকে
জ্যোৎস্না পড়ে গড়িয়ে।
রাজকন্যা বেজায় খুসি
লুটিয়ে পড়ে হাসিতে,
ঘরটা যেন উঠল ভরে
সাদা ফুলের রাশিতে।
ঠাণ্ডা হয়ে দুধে-ভাতে
খেল সে গুড় গলিয়ে,
শয্যা পেতে ঘুমের ভেতর
অমনি গেল তলিয়ে।

চোদ্দ

খবর শুনে রাজা মশাই
দিলেন ভাঁড়ার উজাড় করে ;
হাজার টাকার বরাদ্দ ভোগ,
বাড়ল ঠাকুর পূজার তরে।
ভাঁড়ের ইনাম লক্ষ টাকা,
অমাত্যেরা পাঁচশো করে,
পাইক চাকর একশো পেয়েই
মনের সুখে হাস্য করে।
দাসদাসীদের মধ্যে আরো
বিলিয়ে দিলেন হাজার টাকা।
আত্মীয়দের তত্ত্ব কিনে
এক ঘণ্টায় বাজার ফাঁকা।

পনেরো

পরের দিনে বিকেল বেলা
রাজ্যি জুড়ে রথের মেলা,
রাজপ্রাসাদে বইছে খুসির হাওয়া।
মাংস, মেঠাই আর ঘি-ভাতে,
যাচ্ছে মিশে সবার পাতে,
মনের সুখে চলছে খাওয়াদাওয়া।
এমন সময় খবর আসে
চাঁদটা দেখে ফের আকাশে
রাজকন্যার মেজাজ গেছে ঘুরে,
কেবল শুধায়, 'ছাদের কাছে
চাঁদমামা তো ঝুলেই আছে,
কি করে ফের উঠল আকাশ জুড়ে?'
খবর শুনে মেয়ের ভয়ে
রাজামশাই ব্যাকুল হয়ে
বলেন, 'ওকে এতই ভাব সোজা?
মেয়ে আমার নয়কো বোকা,
ফেলল বুঝে ভাঁড়ের ধোঁকা,
মাথাতে ওর গোবর তো নেই গোঁজা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শাস্ত্র আনো, কেতাব ঘাঁটো,
সবাই মিলে বুদ্ধি আঁটো,
একটা কিছু উপায় কর খাড়া,
নইলে মেয়ে আগুন হবে,
কান্না জুড়ে বিকট রবে
জ্বালিয়ে খাবে আবার গোটা পাড়া।'
মন্ত্রী বলেন, 'শুনুন প্রভু,
সমস্যাটা কঠিন, তবু,
একটা উপায় আসছে আমার পেটে,
গোটা কয়েক ছুতোর ডেকে
জানলাগুলো দিন না ঢেকে,
সেগুন কাঠের তক্তা দিয়ে এঁটে।'
জ্যোতিষ মশাই বলেন হেসে—
'ওসব বুদ্ধি সর্বনেশে,
কেমন করে খেলবে হাওয়া ঘরে,
মেয়ের চোখে একটা কালো
চশমা আঁটাই বরং ভালো,
মিস্ত্রী ডেকে নিন না ওটা গড়ে।'
বলল রাজার যাদুকরে,
'ইস্কুলে ও লেখে পড়ে,
শেষকালে কি বন্ধ হবে পড়া?
একটা বিশাল সামিয়ানা
তৈরি করে হোক না আনা,
টানিয়ে দেবো বাঁধিয়ে দড়ি দড়া।'
আসছে যেমন যার মাথাতে
সবাই কাঠি দিচ্ছে ভাতে
সবটা শুনে ভাঁড় বললেন হেসে,
'যাচ্ছি রাজার মেয়ের কাছে,
জবাব আমার জানাই আছে,
ঠাণ্ডা ওকে করব বিনা ক্লেশে।'

ষোল

কাছে গিয়ে ভাল করে
দাঁড়াতে না দাঁড়াতে।
ভাঁড়ের পেটের পিলে
কেঁপে ওঠে তাড়াতে।
রাজকন্যার কাছে
খেয়ে জোর বকুনি,
মনে হয় ভাঁড় বুঝি
কেঁদে ফেলে তখুনি।
'ভেবেছ বুঝি নে আমি
তোমার এ চালাকি,
পেয়েছ আমায় তুমি
বোকা হাবা কালা কি?
কুলিয়ে ঘরের ছাদে
থাকে যদি রাখা সে,
কি করে আবার চাঁদ
ওঠে ফের আকাশে?
খাঁটি চাঁদ নয় ছোটা
ঘরে আছে টানানো,
আমাকে সহজ অত
নয় বোকা বানানো।'
ভাঁড় বলে—'মাগো, তুমি,
এ কথাও বোঝ না,
বুদ্ধি তোমার চেয়ে
বেশি রাখে ক'জনা?
তোমার একটা দাঁত
পড়ে যদি এখনি,
গজাবে না সেটা ফের?
এটা তুমি দেখনি?
জানো না, সবাই গিয়ে
নাপিতের বাড়িতে
রোজ যে লাগায় ক্ষুর
গোঁফে আর দাড়িতে।
তা'বলে কি মুখে আর
গোঁফ দাড়ি ওঠে না?
তুললে গাছের ফুল
আবার কি ফোটে না?
চাঁদটাই বুঝি ফের
পারবে না গজাতে!
তোমাকে কি এত করে
এটা হবে বোঝাতে?'
রাজকন্যার মুখ
ভরে ওঠে হাসিতে,
বলে, 'ওমা, এ কথা তো
জানে দাসদাসীতে;
তুলে নিলে ওঠে ফের,
একথাটা ঠিকই তো,
এ সব খবর আছে
রামায়ণে লিখিত।
গজাবে নতুন চাঁদ
রাত হলে চাঁদিনী,
এ কথা সবাই জানে,
তাই আমি কাঁদিনি।
এবার যাও তো বাপু
দাও খেতে ঘুমোতে,
নইলে তোমাকে দেখো
ধরে খেতে হুমোতে!'

সতেরো

সুনীল গগন চেয়ে
দেখলা রাজার ভাঁড়,
তারাগুলি জ্বলছে ও নিবছে;
মেঘের নৌকা বেয়ে
হচ্ছে আকাশ পার
টিপ টিপ টিপ চোখ টিপছে।
আকাশের গাঢ় নীলে
একটি রুপোর ভেলা,
পূর্ণিমা চাঁদ ঐ হাসছে;
চাঁদে ও শিশুতে মিলে
এ বড় মজার খেলা,
চিরকাল বুঝি খেলে আসছে! ১৩৭৯

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কমল

রেবন্ত গোস্বামী

খাওয়ার পর মুখ ধুতে এসে কুলকুচি করে জল ফেলেই মাটির দিকে তাকিয়ে মঞ্জু চিৎকার করে উঠল, 'মা, কমলালেবুর গাছ বেরিয়েছে দেখবে এস।'

মা রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন। উত্তর দিলেন, 'পরে দেখব'খন। এখন ওদিকে মন না দিয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। ইস্কুলের বাস এসে যাবে।' কাজেই মঞ্জু তখনকার মত বৃক্ষচর্চা মুলতুবি রেখেই বইপত্র গোছাতে গেল।

কিছুদিন আগে মঞ্জুর যখন জ্বর হয়েছিল, তখন বাবা তার জন্যে রোজ কমলালেবু আনতেন। মঞ্জু সেই কমলা-লেবুর বিচিগুলো সব জমিয়ে উঠোনের এই কোণটায় ফেলেছিল আর রোজ দুবেলা সেগুলোর ওপর জল দিত। যদিও এদিকটা জমাদারের ঝাঁট পড়ে না, তবুও মাকে বারবার এই ভাবী কমলা-বাগিচার কথা মনে পড়িয়ে দিতে ভুলত না মঞ্জু আর মাও জমাদার এলে বলতেন, 'দেখিস বাপু, মঞ্জুর কমলা-বাগানটা বাদ দিয়ে ঝাঁট দিস।'

এতগুলো কমলালেবুর বিচি থেকে এতদিন পরে মাত্র একটি চারা জন্মাল কেন সেই রহস্য নিয়ে একটুও না মাথা ঘামিয়ে ঐ সবেধন নীলমণি চারাটির প্রতি মঞ্জু ভয়ংকর রকম যত্ন আরম্ভ করল। ইস্কুল থেকে ফিরেই ঘটি ঘটি জল ঢেলে জায়গাটা কাদা করে ফেলল।

ডাক্তারখানা থেকে ফিরে মঞ্জুর ব্যাপারস্যাপার দেখে আর মার কাছ থেকে সব শুনে, বাবা বললেন, 'কি রে মঞ্জু, তুই কি মাছের চাষ করছিস যে অত জল ঢালছিস? আরে, ওর পূর্ব-পুরুষ হচ্ছে দার্জিলিঙের অধিবাসী। ওদের কি এত পুকুরে হাবুডুবু খাওয়া সহ্য হয়। নির্ঘাৎ দম বন্ধ হয়ে মরবে। তার চেয়ে ওকে দার্জিলিঙ মেলে চাপিয়ে ঘরের ছেলেকে ঘরে পাঠিয়ে দে।'

তিন-চারদিন পরেই গাছের চারাটার পাতাগুলো একটু কুঁকড়ে যেতে দেখেই বাবার কথাগুলো মঞ্জুর মনে হল। সত্যিই কি এখানকার আবহাওয়া কমলের সহ্য হচ্ছে না? চারাটির নাম মঞ্জুই কমল রেখেছে। বাবার কাছে শুনেছে গাছেরও মানুষের মত সুখদুঃখ আছে। তারা জন্মায়, খায়-দায়, আবার বুড়ো হয়ে মরেও যায়। তাছাড়া ঘুমায়ও। এই ত সেদিন সন্ধ্যেবেলা গাছের পাতা ছিঁড়লে মা ওকে বকে বলেছিলেন, 'ছিঃ, সন্ধ্যেবেলা গাছের পাতা ছিঁড়তে নেই, এখন গাছ ঘুমোয় না?' মাকে সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'গাছ যখন জেগে থাকে তখন পাতা ছিঁড়লে কিছু হয় নাকি।' মা হেসে বলে-ছিলেন, 'বিনা কারণে কখনোই গাছকে কষ্ট দেবে না। ওদের বুকেও ভগবান আছেন।'

গাছের বুক কোনটা অনেক চিন্তা করেও ঠিক করতে পারল না মঞ্জু। পারলে বাবার বুক দেখা নলটা লাগিয়ে কমলের বুকটা একবার দেখে নিত।

তারপর ভাবল, বাবার কথা সত্যি হতেও পারে। যদিও কমল তাদের উঠোনে জন্মেছে, কিন্তু তার পূর্বপুরুষ ত সকলেই দার্জিলিঙের। সেই দেশের আবহাওয়াতে হয়ত সে আরো আরাম পেত। যেমন ছোট মাসির মেয়ে রিঙ্কি আমে-রিকায় জন্মেছে, কিন্তু ছোট মাসি চিঠিতে লিখেছে যে সে দিদার পাঠানো আমসত্ত্ব আর বড়ি খেতে খুব ভালবাসে। অথচ কে না জানে ওদেশের ছেলেমেয়েরা দিনরাত শুধু কেক খেয়ে থাকে।

হঠাৎ মঞ্জুর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যেতে নিজের মনেই সে হাততালি দিয়ে উঠল। দার্জিলিঙে সে না গেলেও বাবার কাছে শুনেছে যে সেটা পাহাড়ের ওপরে। চারিদিকে শুধু পাথর। অবশ্য অনেক ওপরে—উ—ই যেখানে মেঘ ভেসে যাচ্ছে। অত ওপরে এরোপ্লেন, চিল আর গ্যাস-বেলুন ছাড়া আর কিছুই উঠতে পারে না। ত হ'ক, তবু ত পাথরের পাহাড় সে করতে পারবে। সরস্বতী পুজোর সময় তারা ত পাহাড় তৈরি করেছিল ইট, কাদা আর ঘাসের চাবড়া দিয়ে।

রবিবার দিন মঞ্জুর সারা সকাল কাটল বাগানের এককোণে একটা পাহাড় তৈরি করতে। দুপুরে খেতে বসে মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মা, গোবিন্দমামার সঙ্গে আজ একটু স্টেশনে বেড়াতে যাব?'

মা বললেন, 'কেন, হঠাৎ স্টেশনে যাওয়ার কি হল?' কিন্তু গোবিন্দমামার সঙ্গে যাবে শুনে তেমন আপত্তি করলেন না।

বিকেলে মঞ্জু রেল লাইন থেকে পাথর তুলে তার জামা আর প্যান্টের পকেটগুলো এমনভাবে ভর্তি করল যে সেগুলো প্রায় ছিঁড়ে যাবার মত হল। তখন আর কিছু পাথর গোবিন্দমামাকে দিয়ে বলল, 'গোবিন্দমামা, এগুলো ধর ত। বাড়ি গিয়ে মামাকে দেবে। এখন বাড়ি চল।' এই বলে হত-ভম্ব গোবিন্দমামাকে প্রায় টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে এল।

পরদিনই রেলপথের পাথরগুলো কর্দম-ইষ্টক-নির্মিত ক্ষুদ্র পাহাড়টিকে শোভিত করল। আর মুমূর্ষু কমলকে আগের জায়গা থেকে সরিয়ে সেই পাহাড়ের চূড়ায় তেনজিং-এর পতাকার মত আবার প্রতিষ্ঠিত করল মঞ্জু।

কিন্তু হায়! মঞ্জুর সমস্ত প্রচেষ্টা আর সমস্ত চিকিৎসা ব্যর্থ করে দুদিনের মধ্যেই কমল একেবারেই নুইয়ে পড়ল। তার পাতাগুলো শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। যখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করার কোন উপায়ই থাকল না, তখন মঞ্জু কেঁদে ফেলল।

www.BanglaBook.org

মা বললেন, 'কিসের না কিসের গাছ! ওটা যে কমলা গাছ তার ঠিক কি? আর তাছাড়া এত নাড়াচাড়া করলে কি গাছ বাঁচে? শেকড় ছিঁড়ে গেছে হয়ত। কিংবা পোকাও লাগতে পারে। এমন কাঁদছে যেন পোষা কুকুর বেড়াল মরেছে।'

বাবা কলে বেরোচ্ছিলেন, বললেন, 'ওরকম হয়। গাছ হলে কি হবে, কমল ত মঞ্জুরই পোষ্যপুত্র ছিল। আসলে যেখানকার গাছ সেখানকার আবহাওয়া ছাড়া বাঁচা কঠিন। আমি ত নিজে আঙুরগাছ লাগিয়েছিলাম। কটা ফল হয়েছিল? এরা ত মানুষ নয় যে লঙ্কায় গেলেই রাবণ হয়ে বসবে।' এই বলে বাবা বেরিয়ে গেলেন।

মঞ্জুর মনে হল হয়ত বাবার কথাই ঠিক। কমল হয়ত দিনরাত দার্জিলিঙের কথা ভেবে মন খারাপ করত। তাই তার অসুখ সারল না।

বিকেলে মার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে সে খেলতে চলে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল একটা গ্যাস বেলুন নিয়ে।

মা যখন রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত, সে তখন গ্যাস বেলুনটার সুতোর সঙ্গে শুকনো চারাগাছটাকে বাঁধল। তারপর আস্তে আস্তে সুতোটাকে ছেড়ে দিল শূন্যে। যতক্ষণ না বেলুনটা আকাশে ছোট হতে হতে একেবারে মিলিয়ে গেল, ততক্ষণ সে চেয়ে রইল সেদিকে।

অন্ততঃ কমলের মরদেহটা ঐ মেঘেদের সঙ্গে দার্জিলিঙের চেনা পৃথিবীতে ফিরে যাবে—এই ভেবে মঞ্জু ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল।

১৩৮১

কবি ও নোবেল পুরস্কার

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৯১৩ সালের অক্টোবরে কবি বিলাত থেকে ফিরেছেন—আছেন 'শান্তিনিকেতন' বাড়ির দোতলায়। এখনো তাঁর উত্তরায়ণের পর্ণকুটির নির্মিত হয়নি, রথীন্দ্রনাথের প্রাসাদোপম অট্টালিকার নির্মাণ-কল্পনাও মনে জাগেনি। পূজাবকাশে বিদ্যালয় বন্ধ—খুলতে দেরী আছে। আশ্রমে ফিরে কবির মন বেশ প্রসন্ন। কলকাতায় যে-দুদিন ছিলেন, নানা সাংসারিক কারণে ক্লান্ত হয়ে ওঠেন—তাই এখানে ফিরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। একখানি চিঠিতে কবি লিখেছেন—'কতো আরাম সে আর বলতে পারিনে!' চারদিক নিস্তব্ধ। সে নিস্তব্ধতা আজ আর কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে 'গানের উৎসটা খুলে গেছে।' লিখলেন বেশ কয়েকটা গান যা প্রায়ই শুনি। মন প্রকৃতির মধ্যে ও গানের মধ্যে এমনই মশগুল হয়ে আছে যে সেই সময় দার্জিলিং যাবার কথা উঠলে তা কবি নাকচ করে দেন।

পূজাবকাশের পর আশ্রম-বিদ্যালয় খুলল ৯ই নভেম্বর। আমরা এসে গেছি—ছাত্ররাও জুটেছে। কয়েকদিন পরে কবির 'নোবেল পুরস্কার' প্রাপ্তির খবর এল।

সে ত আজ থেকে ষাট বছর আগের কথা—সেই পুরনো দিনের কিছু কথা তোমাদের বলছি। সেদিন ভারতের—এই বাংলাদেশের এক কবি পৃথিবীর বুদ্ধিজীবীদের দরবারে বিশ্ব-কবির আসন পেলেন। ১৯১৩ সালের ১৩ই নভেম্বর সুইডেনের স্টকহলম্ থেকে ঘোষিত হল যে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ইংরেজি গীতাঞ্জলির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।'

মনে পড়ছে সেদিনের কথা। শান্তিনিকেতনের রান্নাঘরে খাওয়ার আয়োজন হয়েছে—এখন অবশ্য সে-রান্নাঘরের চিহ্নও নেই। পিঁড়িতে সবাই বসেছে, এমন সময় কবির জামাতা নগেন গাঙ্গুলী ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে ঘোষণা করলেন—'গুরুদেব নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।' যারা নোবেলের কথা জানত, তারা পুরস্কারের ব্যাপারটা বুঝতে পারল। অধিকাংশই জানত না—তারা জিজ্ঞাসু নয়নে চেয়ে রইল। সে সময়ে ত শান্তিনিকেতনে আছে কেবল স্কুলের ছাত্ররা—কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ত তখনো হয়নি। তাই স্কুলের ছেলেদের কাছে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিতে হল নোবেল পুরস্কারের মানে কি। বললাম—'নোবেল সুই-ডেনবাসী বিজ্ঞানী ও শিল্পপতি। তিনি ডিনামাইট আবিষ্কার করে বহু অর্থ অর্জন করেন। তখন ডিনামাইটের ব্যবহার হত পাথর ভাঙতে। যে কাজ মানুষকে সাবল, গাঁইতি দিয়ে, দীর্ঘ সময় ধরে করতে হত—ডিনামাইট বিস্ফোরণের সাহায্যে তা সহজে, সুলভে করা সম্ভব হল। এই বিস্ফোরণ আবিষ্কার করে তিনি

www.BanglaBook.org

নাকি বলেছিলেন—এর ভীষণতা দেখে আশা করি মানুষ যুদ্ধ করতে চাইবে না।' কিন্তু আজ ডিনামাইটের চেয়ে সহস্রগুণ ধ্বংসকারী অ্যাটম্ বোমা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়ে মানুষকে আতঙ্কিত করে রেখেছে। নোবেল ছিলেন শান্তিবাদী। তাই মানুষের কল্যাণের জন্য পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, চিকিৎসা-বিদ্যায় যাঁরা কাজ করবেন তাঁদের জন্যও পুরস্কারের ব্যবস্থা করে দেন। আর সাহিত্যে যাঁরা মহামানবের মধ্যে মৈত্রী ভাবনার কথা প্রচার করবেন তাঁরাও পাবেন এই পুরস্কার এবং বিশ্ব-শান্তির জন্য যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রচেষ্টা করবেন তাঁরা এই পুরস্কার লাভ করবেন। এইজন্যে তিনি বহু কোটি টাকার তহ-বিল রেখে যান। প্রত্যেকটির মূল্য এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা। তোমরা কাগজে দেখেছ গতবৎসর অর্থাৎ ১৯৭৩ সালে শান্তি পুরস্কার প্রদত্ত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাঃ কিসিংগার ও উত্তর ভিয়েতনামের লুডুক্ থো-কে। অর্থাৎ ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রধান প্ররোচক ও সহায়ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সচিব এবং যারা ভিয়েতনামে যুদ্ধ করে তাদের তাড়াল তাদের নেতা—এই দুজনকে একাসনে বসিয়ে সম্মান দেওয়া হল নোবেল শান্তি পুরস্কার দিয়ে। লুডুক্ থো ঐ পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে যোগ্য কাজই করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ষাট বৎসর আগে যখন সাহিত্যে নোবেল পুর-স্কার পেয়েছেন, সে সময় শান্তির জন্য সম্মান পান আমেরিকার Elihu Root (1845-1931) এবং Henri Lafontaine (1854-1943)। Elihu Root ছিলেন মার্কিন আইন-জীবী। আন্তর্জাতিক—বিশেষ করে মার্কিন ও দক্ষিণ আমে-রিকার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। নোবেল পুরস্কার পাবার পরেও বিশ্বশান্তির জন্য তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। দ্বিতীয় প্রাপক Lafontaine ছিলেন বেলজিয়ান—ইনিও আইনজীবী। আন্তর্জাতিক বোঝা-পড়ার একনিষ্ঠ সমর্থক। হেগের (Hague) আন্তর্জাতিক শান্তিপরিষদের স্থায়ী সভাপতি।

মনে আছে কলকাতা থেকে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ নিয়ে টেলিগ্রাম এল ১৫ই নভেম্বর। ১৩ই সান্ধ্য দৈনিক 'এম্পায়ার' কাগজে প্রথম সংবাদটি প্রকাশিত হয়। সেকালে ত আর রেডিও ছিল না যে মুহূর্তে দেশবিদেশে খবর ছড়িয়ে পড়বে। বিদেশ থেকে খবর আসত কেবল টেলিগ্রামে।

কবি তখন যাচ্ছিলেন চৌপাহারি জঙ্গল দেখতে—বোলপুর-ইলামবাজারের পথ গিয়েছে সেই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। দ্বিপুবাবুর নতুন মোটর গাড়ি করে চলেছেন কবি। গাড়িতে অনেকেই আছেন। এখানে একটা কথা বলে রাখি, ১৯১৩ সালে মোটর গাড়ি এদেশে কমই ছিল—এ জেলাতে ত ছিলই না। যা হোক, যাবার পথে পোস্ট্ অফিসে সদ্যপ্রাপ্ত টেলিগ্রাম কবিতে দেওয়া হল। শান্তিনিকেতনে তখন টেলিগ্রাফ অফিস ছিল না—ডাকঘরই খুলেছে বৎসর দুই মাত্র। মোটর গাড়ি ফিরে এলে নগেন গাঙ্গুলী এসে রান্নাঘরে ঘোষণা করলেন খবরটা সেকথা ত আগেই বলেছি।

ছেলেরা খবরটা শুনে সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায়ের কাছে গিয়ে ছুটি চাইল। সেটা মঞ্জুর হওয়ায় তারা খুসি হয়ে জগদা-নন্দবাবুকে একটা নড়বড়ে খাটে উঠিয়ে আশ্রম প্রদক্ষিণ করতে লাগল। তিনি চেঁচাচ্ছেন—'আরে পড়ে মরবো—নামা, নামা!' কে শোনে!! আশ্রম প্রদক্ষিণ করা হল। সে কি উৎসাহ!

পরদিন থেকে টেলিগ্রাম আসতে শুরু করল নানা প্রতি-ষ্ঠান ও ব্যক্তির কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের নেপালবাবুকে ডেকে বললেন—'এবার আপনাদের পাকা ড্রেন ও পাকা পায়-খানা হবে।' কথাটা বলার মানে আছে। সেকালে শান্তিনিকে-তনের প্রায় সবাই প্রাতঃকৃত্য করতে 'মাঠে' যেত—পায়খানা একটা ছিল, তবে খুবই জীর্ণ।

কবি আছেন 'শান্তিনিকেতনে' দোতলার ঘরে। এত উত্তে-জনার মধ্যেও গানের সুরে মন ভরপুর। লিখে চলেছেন গানের পর গান।

১৩৮০

মনের বহর

তমাল চট্টোপাধ্যায়

মিষ্টি জলের নদী মিশে
নোনা সাগর জলে
গর্বে হৃদয় ভরে তবু
সাগরকে সে বলে—
'ছিঃ ছিঃ ছিঃ আমার অমন
স্বাদু শীতল জল
পানের যোগ্য রইল না আর
সবটা রসাতল।'
সাগর বলে, 'আমি তো আর
যাইনি তোমার কাছে
তুমিই ছুটে মিশলে এসে
আমার কি দোষ আছে!
বড়-র সাথে মিশতে হলে
মনের বহরখানা
বড়সড়ই করতে লাগে
নেই কি তোমার জানা!'

১৩৮৩

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শব্দছক

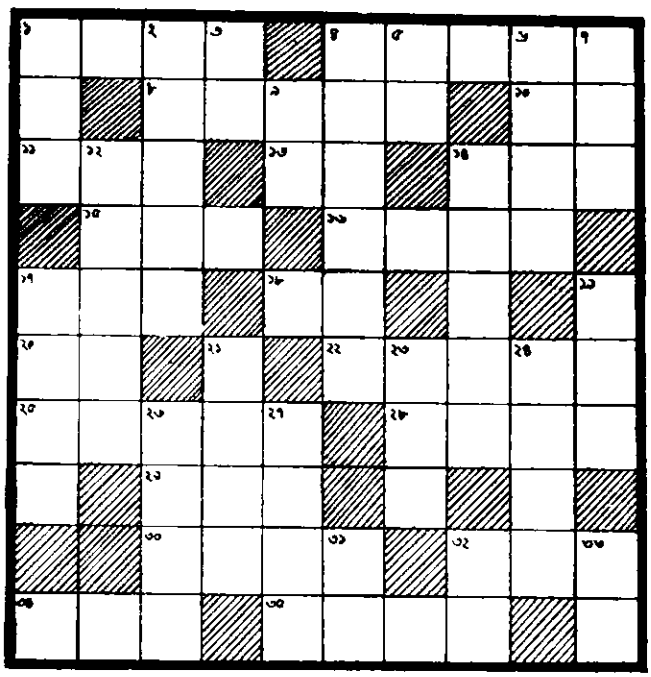

পাশাপাশি

১। এক-দুই দাও দেখি খাজনা
তিন-চার পাও তবে ফল
এ-দুই-তিন-চার বাজনা
এক-চার খুলে পাবে জল।

৪। 'আহা-আহা বেচারা'—
কীবা কথা এ ছাড়া?

৮। এক-দুই দেয় দেখ শস্য
দুই-তিন বাঁধে গাঁটছড়া
সব মিলে পাইবে অবশ্য
জাঁদরেল মক্কেল কড়া।

১০। কুক্কুটের মুণ্ড করে নাশ
পাবে ললাটের দু'পাশ।

১১। ভেঙে গেল হাড় বুঝি?
পড়ে নাকি রক্ত?
উত্তর নয় মোটে শক্ত।

১৩। সন্ধানী বোঝ শব্দমূলা
বাঁ-যোগে লম্ফঝম্প
সো-যোগে বুঝিবে ভ্রাতৃতুল্য
চা-যোগে কম্পিবে কম্প।

১৪। বসবার খাটে যখাটে বাদ
সর্বজনের সাধ।

১৫। এক-দুই ভার তোলহ স্কন্ধে
দুই-তিন নাচে অমর ছন্দে
এক-তিন চলে সপ্তপদীতে
এক-দুই-তিন ভ্রমিছে নদীতে।

১৬। কেষ্ট বিষ্টু পেটে দড়ি
নদী চলে তড়বড়ি'।

১৭। সাদা সিধে উত্তর
বুঝে ফেল সত্বর।

১৮। সোজা কথা বলি শোন,
নাও পরামর্শ,
বিপরীতে সব শেষ, শমনের স্পর্শ।

২০। দুই কাটারি মারলে পরে
অগ্রজরূপ আপনি ধরে।

২২। রাজা বাদশার ছা
দাবা জানব না?

২৫। হক্ কথা তোরে বলি ভাই—
'আসে নাই।'

২৮। লম্বা সাহেব পায়েতে গয়না
আরে বাবা, এ যে খাড়াই রয়না।

২৯। ডিগবাজি খেয়ে বলে খালাদী
'নহি আমি পদ্মের বিলাসী।'

৩০। দুই পাশেতে নিয়ে [illegible]
প্রতিদ্বন্দ্বী রূপকার।

৩২। মধ্যবাদে বাক্যব্যয়
সর্বশুদ্ধ বৈদ্য দেয়।

৩৪। পুষ্পদল রূপ ধরি'
চরণ পঠন করি।

৩৫। মহড়ার ইংরিজি
জানা আছে, ভেরি ইজি।

উপর-নীচ

১। শেষ হল ইস্কুল
এবার দেখ পড়তে গেলেই
পিছনে লাঙুল।

২। তাল হজম হ'লে পরে
প্রাসাদ গড়ি মর্মরে।

৩। রাঘব পুত্র
সোজা এ-সূত্র।

৪। কার বাড়ি?
বা'র বাড়ি।

৫। মস্তকের অন্তভাগ ফেলে
অতিকায় শব্দ এক মেলে।

৬। গমগম সভা রাজা উজীরে
তার মাঝে উত্তর খুঁজি রে।

৭। শোন শহরবাসী
আগেই যদি সাপ দেখালে,
হেথায় কেন আসি?

৯। মানুষের বত্রিশ, দুইখানা হস্তির,
মিলে যাবে উত্তর,
হয়োনাকো অস্থির।

১২। সাবধান! তীক্ষ্ণ মধ্যে
বরদা আসীনা পদ্মে।

১৪। মোহনবাগান সঙ্গে এলেন ঠিক,
শেষ দুটোতে মারব আমি কিক্।

১৭। সরের মধ্যে মার্কামারা
ব্যবসায়ী এ কেমনধারা?

১৯। কোলে আছে কাটারি
মতলব জেনো মাটি কাটারই।

২১। কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং
সাহেব-সে কয় আছি,
দুই হুজুরের মাঝখানে এক
ইংরিজি মৌমাছি।

২৩। কাজখানা হয় যদি শিলনোড়া আনি
এর সাথে মিল দিতে
আছে রাজধানী?

২৪। খাশা দেখ [illegible] পাত্র
রাখে বুঝি ফল একমাত্র?

২৬। গুজবা গেছে শোনা
এইখানেতে ভূতের আনাগোনা।

২৭। জেনে রেখো সন্ধানী মিত্র
উত্তরে আছে বৈচিত্র্য।

৩১। উল্টা হস্ত
ভুলটা মস্ত।

৩২। কহ, সামর্থ্য,
গোলক অর্থ।

৩৩। ডাক নাম কেষ্ট,
শোনে না বাঁশীর স্বর,
এমনই অদেষ্ট!

১৩৭৯

উত্তর শেষ পৃষ্ঠায়

www.BanglaBook.org

গণ্ডালু ও হিড়িম্বাদেবীর রহস্য

নলিনী দাশ

বড় বড় কাঁচের জানলাওয়ালা গোল আকারের কাফেটা দেখেই আমাদের ভীষণ 'কফিতেষ্টা' পেয়ে গেল। পরিশ্রম ত নেহাত কম হয়নি! কোন্ সকালে মায়েদের সঙ্গে বেরিয়ে বাড়ি থেকে বাজার অবধি এক কিলোমিটার পথ নেমে গিয়েছিলাম। ঘুরে ঘুরে রুটি-মাখন-ফল-সব্জি টুকিটাকি কিনে, টুকরি বোঝাই করে আবার সেই পথে ফিরে এসে, ডাইনে মোড় নিয়ে, টুরিস্ট লজ ছাড়িয়ে হিড়িম্বামন্দিরের রাস্তায় আমাদের বাড়ি পর্যন্ত চড়াই উঠে সেসব জিনিস গুছিয়ে রাখলাম। তারপর আমরা চারজনে নেমে এসে আবার উত্তরমুখো চড়াই উঠেছি—তাও প্রায় এক কিলোমিটার হবে। আরো কিছুটা উঠলেই সেই লগ-হাটগুলো পাব, যার একটায় আমাদের নেমন্তন্ন। কিন্তু সকালে খাওয়া ডিমরুটি কখন হজম হয়ে গেছে। এখন সেই পথের ধারে ছোট্ট সুন্দর কাফেতে বসে একটু চাঙ্গা হয়ে নেওয়া বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে।

একটু থেমে চারিদিকে তাকিয়ে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ছোট্ট শহর মানালির প্রধান অংশটা ছেড়ে অনেকটা উত্তরে উঠে এসেছি, এখন ঐ লগ-হাটগুলো পর্যন্ত গিয়েই বড় রাস্তা শেষ হয়ে গেছে, বলতে গেলে সেটাই মানালির উত্তর প্রান্ত। উপত্যকা পার হয়ে দূরে দেখা যাচ্ছে সারি সারি বরফের পাহাড়। কল্পনা করে নিতে পারছি যে ওরই দুটো চূড়ার মাঝে আছে সাড়ে তের হাজার ফিট উঁচু রোটাং পাস, আর আছে বিপাশা নদীর উৎস। পূবে-পশ্চিমেও যতদূর তাকাই, পাহাড়ের পর পাহাড়। তাদের চূড়ায় চূড়ায় বরফ ঝিকমিক করছে সকালের রোদে। পশ্চিমের ঐ পাহাড়ের গোড়ায় টুরিস্ট লজ, একটু উঠে আমাদের বাড়ি। আর বেশ কিছুটা উঠলে পরে হিড়িম্বামন্দির। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার ঠিক পরেই পূর্বদিকে প্রায় খাড়া নেমে গেছে পাহাড়ের গা, নিচে দেখা যাচ্ছে বিপাশা নদী পাথরে পাথরে লাফিয়ে ফেনিয়ে প্রচণ্ড বেগে বয়ে চলেছে। একটা ঝোলাপুল দেখতে পাচ্ছি, ওপারে কয়েকটা ছোট ছোট বাড়ি, তার পাশ দিয়ে ঐ পাকা রাস্তাটাই বোধ হয় রোটাং পাসের দিকে গেছে, যেখানে গতকাল দল বেঁধে, টুরিস্ট বাসে চেপে ঘুরে এলাম।

আবার উত্তরে তাকালাম, রোদে ঝকঝক করছে পাহাড়গুলো। কি যে অপূর্ব দৃশ্য তা বর্ণনা করে বোঝাবার উপযুক্ত ভাষা আমার নেই। উদাসদৃষ্টিতে মালু তাকিয়ে আছে। এখন ওর হাতে খাতা-পেনসিল ধরিয়ে দিলেই নিশ্চয়ই কবিতা লিখে ফেলবে গোটা কতক। আমার মতন নীরস মানুষও মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছি।

কালুটা কিন্তু নিতান্তই বেরসিক। চারদিকের এমন মনোহর দৃশ্য একবারমাত্র চোখ বুলিয়ে দেখেই কাফেতে ঢুকে গিয়ে ঝপ করে অর্ডার দিল, 'চার কাপ কফি আর আটটা পেস্ট্রি।' তারপর উত্তর-পূবের জানলার ধারে একটা ছোট টেবিল বেছে নিয়ে বসে পড়ল। আমরাও গিয়ে যেই বসলাম তখনই কালু বুলুর সঙ্গে তার অসমাপ্ত তর্কটা আবার নতুন করে শুরু করল, বিষয়বস্তু হিড়িম্বাদেবীর দেবলোকে যাত্রা। আমি বললাম 'হিড়িম্বা ত রাক্ষসী ছিল, মহাভারতে পড়িসনি ভীমের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, তাদের ছেলে ঘটোৎকচ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আশ্চর্য বীরত্ব দেখিয়ে শেষে মারা পড়েছিল—'

বাধা দিয়ে বুলু বলল, 'সে সব ত আমরা সবাই জানি। কিন্তু কাল হিড়িম্বামন্দিরের পূজারীর মুখে শুনলি না হিড়িম্বা এমন তপস্যা করেছিল যে সে দেবী হয়ে গিয়েছিল। তাই ত এ দেশের লোকেরা মন্দির বানিয়ে হিড়িম্বাদেবীর পূজা করে প্রাচীন কাল থেকেই।'

কালু এসব কথা মানতে রাজী নয়। তার মতে পাণ্ডব-কৌরবেরা সবাই মানুষ ছিলেন। হিড়িম্বা পুরে যদি সত্যি কেউ থেকে থাকে, তাহলে সেও নিশ্চয়ই মানুষই ছিল, দেবী-টেবী নয়। ওসব রাক্ষসী আর দেবী সব গল্পকথা।

মালু রেগে গেল। 'তুই পুঁথি সবজান্তা হয়ে বসে আছিস। জানিস, বিপাশা নদীর এই অপূর্ব সুন্দর উপত্যকাকে টুরিস্ট বইগুলোতে পর্যন্ত 'ভ্যালি অফ দি গড্‌স' বা দেবতাদের উপত্যকা বলেছে। এমন স্বর্গের মতন সুন্দর দৃশ্য দেখেছিস অন্য কোথাও?'

সমর্থন পেয়ে বুলুও বলল, 'সেদিন কি চমৎকার দশেরা উৎসব দেখলি না—যত দেবদেবী সবাই রঘুনাথজীকে সম্মান জানাতে এসেছিল। কত দূরদূরান্ত থেকে পাহাড় ডিঙিয়ে নদী পেরিয়ে ওরা ওদের দেবদেবীদের সাজিয়ে-গুজিয়ে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে বাজনা বাজিয়ে নিয়ে এসেছিল'—আমি বললাম, 'সত্যি ভারি সুন্দর লাগছিল রে'—কোনঠাসা হয়ে কালু বলল, 'আমি কি একবারও বলছি যে সুন্দর নয়। কত দেশ-দেশান্তর থেকে লোক এসেছিল। কিন্তু এর মধ্যে দেব-লোক-টোকের অলৌকিকত্ব এনে ফেলছিস কেন আবার?'

'আমরা এনে ফেলব কেন? সেই পূজারীই ত বলছিল যে

www.BanglaBook.org

কোন দেবদেবী যখন দেবলোকে চলে যায়, তখন নতুন দেব-মূর্তির অভিষেক হয়।'

'যত সব গাঁজাখুরি কথা! পূজারী বলল আর অমনি তোরা বিশ্বাস করে ফেললি? একটু বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝে দেখবার চেষ্টা করবি না?'

'শুধু শুধু মিছে কথা বলবে কেন পূজারী? আর শুধু শুধু নতুন মূর্তির অভিষেক করবার দরকারই বা পড়বে কেন?' —বাধা দিয়ে কালু বলল, 'তার নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে, কিন্তু জেনে রাখিস, সেটা কোনো অলৌকিক কিছু নয়। হয়ত এটা ওদেরই কারসাজি।'

'না জেনেশুনে এসব বলছিস কেন? আমার ত ওকে বেশ সরল, বিশ্বাসী লোক বলে মনে হয়েছিল।'

'তাহলে কারসাজিটা অন্য কারো। সরল, বিশ্বাসীকে গাল-গল্পে ভুলিয়ে তারা নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে হয়ত।'

তর্ক করতে করতে আমাদের গলা যে ক্রমে সপ্তমে চড়েছিল সেটা উত্তেজনার বশে খেয়ালই করিনি। ততক্ষণে কাফেতে বেশ লোক জমে গেছে। সব কটা সীট ত ভরে গেছেই, কেউ কেউ আবার সীট খালি হবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েও আছে। বেঁটে গোলগাল লোকটা ক্যাশমেমো লিখে লিখে আর পেরে উঠছে না! আমাদের তবু হুঁশ নেই, তর্ক করছি। হঠাৎ চাপা গলায় কালু বলে উঠল, 'সাধ্যাতিরিক্ত বহিরাবরণ ধারণীয় নহে—কাল্পনিক নগাধিরাজের খামখেয়ালী ড়া-ড়া ধ্বনি!'

এই ধরনের কথাবার্তা শুনতে আমরা এমনই অভ্যস্ত যে তক্ষুনি তর্কাতর্কি থামিয়ে দিয়ে সাধারণ কথা শুরু করলাম, দুপুরে কি খাব, বিকেলে কোন দিকে বেড়াব, এইসব। আমাদের সাংকেতিক ভাষাটা প্রথম শুনলে বিদঘুটে লাগে বটে, কিন্তু আসলে এটা খুবই সহজ। প্রত্যেক শব্দের প্রথম অক্ষর নিলেই বোঝা যায় কি বলতে চাওয়া হয়েছে। একবার আড়চোখে চার-দিকে তাকিয়ে দেখে নিলাম। কিন্তু কার সম্বন্ধে কালু 'সাব-ধান' হতে বলছে, কে-যে 'কান খাড়া' করে আমাদের কথা শুনছে, সেটা বুঝতে পারলাম না। এখন ত কাফে ভর্তি লোক, মনে হয় অধিকাংশই টুরিস্ট। আর এদের প্রায় সকলকেই আমরা বার-বার দেখেছি, বাজারে, পথেঘাটে, হিড়িম্বামন্দিরে, কুলুর দশেরা উৎসবে, রোটাং পাসের বাসে বা অন্য কোথাও। এটা খুবই স্বাভাবিক। বেড়াতে এসে সকলেই ত একই দ্রষ্টব্য জিনিস দেখে, তাই পরস্পরের সঙ্গে বারবার দেখা হয়ে যায়। আমরা যা চেঁচাচ্ছিলাম, কাফেশুদ্ধ সকলেই নিশ্চয় আমাদের কথা শুনতে পেয়েছিল, তার মধ্যে কে আবার কান খাড়া করে শুন-ছিল?

ঐ যে ব্রাউন ফেল্ট হ্যাট, বাদামী রঙের স্যুট পরা ঝুলো-গোঁফ ছড়ি হাতে সাহেব কালুর পিছনে বসেছে সেই কি? অবশ্য সাহেব বলছি আন্দাজে, আমাদের দেশেই এরকম ফর্সা রঙ আর কটা চোখ-চুল অনেক দেখা যায়।

নাকি ঐ ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা নীল চশমা পরা বেঁটে ষণ্ডা ভদ্রলোক আর চাপদাড়ি-টুপিধারী লম্বা চওড়া ভদ্রলোক —কুলুর ও আমার পিছনে বসে যারা চাপা গলায় কথা বলছে, তারা? ওদিকের কোনে যে কান ঢেকে মাঙ্কি ক্যাপ পরেছে পাকাচুলো, শ্যামবর্ণ, মোটা এক বৃদ্ধ আর তার পাশে কয়েকটি এ দেশীয় ছেলেছোকরা, শাড়ি পরা চারটি বাঙালী টিচার, ম্যাক্সি সালোয়ার আর বেলবটম্ পরা খুব রঙ মাখা কয়েকটি বেশ সাজা-গোজা মেয়ে, যারা কথায় কথায় কেবলই হাসছে? দরজার কাছে দুটি ছোট ছেলে সঙ্গে নিয়ে বেজায় মোটা এক মহিলা সীট খালি হবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন আর আমাদের দিকে কটমট করে তাকাচ্ছেন—যেন তাকিয়েই ভস্ম করে ফেলবেন আমাদের।

কালু উঠে কফি কেকের দাম চুকিয়ে দরজার দিকে এগোল, পিছন পিছন আমরাও উঠলাম। ছোট ছেলে দুটি ছুটে এসে দুটো সীটে বসে পড়ল আর ছাতা রেখে আর একটা সীট দখল করল। কুলু ফিসফিস করে বলল, 'একটায় কি হবে রে—দুটো সীটই লাগবে!' মহিলা শুনতে পাননি আশা করি, কিন্তু সত্যিই হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের প্রায় ঠেলে সরিয়ে এসে দুটো সীটই জুড়ে বসে পড়লেন। হাসি চেপে রাস্তায় বেরো-লাম। ওমা, ঝুলোগোঁফও দেখি বেরিয়েছে।

কালু বলল, 'একটু দাঁড়া!' কিছু না বুঝেও আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঝুলোগোঁফও দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল। এবার আমরা লগ-হাটের দিকে রওনা হলাম। সেও দেখি লম্বা পা ফেলে সেই দিকেই চলেছে!

কালু হঠাৎ এক কাণ্ড করল, ঝুলোগোঁফের সামনে গিয়ে

www.BanglaBook.org

সোজা তাকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ত আমাদের সব কথা শুনেছ, যা চেঁচাচ্ছিলাম। তোমার এ বিষয়ে মত কি?'

লোকটি ইংরেজিতেই জবাব দিল, 'দুঃখিত। তোমাদের কথা কানে এলেও, ঠিক যে কি নিয়ে তর্ক হচ্ছিল তা ত বুঝিনি, আমি কোনো ভারতীয় ভাষাই জানি না!'

'তোমাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত', বলে কালু চলে এল।

'নট এ্যাট অল, নট অ্যাট অল!' বলতে বলতে লোকটি আবার লগ-হাটের দিকে পা বাড়াল।

কালু নিচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলল, আবার বাঁধল। ঝুলো-গোঁফ একটু এগিয়ে যেতেই মালু চাপা গলায় বলল, 'মিথ্যুক! লোকটি টুরিস্ট লজে উঠেছে। রোজ চার বেলা দেখছি!' আমি বললাম, 'কাল বিকেলেই মোড়ের আপেলের দোকানের সেই বুড়ির সঙ্গে দর-কষাকষি করছিল। ক্যানকেনে গলায় হিন্দিতে বুড়ি যত চেঁচায় লোকটিও সমানে চেঁচাচ্ছিল। হিন্দিতেই।'

'বাংলা না বুঝলে লোকটা কান খাড়া করে আমাদের কথা শুনছিল কেন?' বলল কালু।

হঠাৎ বুলু আঁতকে উঠল, 'এ কি? আমার ঝোলার মধ্যে এই কাগজের টুকরোটা এল কি করে? কি এটা?'

'কই? দেখি!' আমরা সবাই ঝুঁকে পড়লাম। বুলু আমাদের চোখের সামনে একটা ডায়রির ছেঁড়া পাতা মেলে ধরল, তার ঠিক মাঝখানে বড় হাতের ইংরেজি অক্ষরে গাঢ় নীল কালিতে গোটা গোটা করে কতগুলো বিশেষণ লেখা রয়েছেঃ—

'BEAUTIFUL EXCELLENT WONDERFUL ARTISTIC RESPECTABLE EXQUISITE TERRIBLE HORRIBLE ECCENTRIC YELLOWISH ARTIFICIAL RIGOROUS ENORMOUS DOLEFUL AMBIGUOUS NONDESCRIPT GLUTTONOUS EXTRAVAGANT RHEUMATIC OSTENTATIOUS UNSCRUPULOUS SELFISH'—

'কি আপদ, এর ত মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না!'

মালু বলল, 'কিসের কথা লিখছে? একবার বলছে সুন্দর, চমৎকার, ভালো, আবার পরক্ষণেই বিশ্রী, ভয়ঙ্কর, আরো কত কি!'

'সেটা কি অপূর্ব চীজ রে বাবা!'

বুলু কাঁদো কাঁদো ভাবে বলল, 'যাই হোক না কেন, অদ্ভুত বস্তুটার কথা লিখে আমার ব্যাগে ভরল কেন? বড্ড ভয় করছে!'

কালু তাকে ধমক দিল, 'নাকে কান্না থামিয়ে কাগজটা আমার হাতে দে তো দেখি—আরে, আরে, কি বোকা রে আমরা, এই কথাটার মানে বুঝলাম না'—

'না রে বাবা, আমরা ত এখনও বুঝিনি'—

'আরে, মাথা খাটিয়ে বুঝতে চেষ্টা করবি ত, না আগেই হাঁউমাউ করছিস সবাই মিলে—ওগুলো বিশেষণ ভাবছিস কেন?'

'বিশেষণ, তাই বিশেষণ ভাবছি,' বলল মালু।—'হেঁয়ালি না করে বল না কি বুঝতে পেরেছিস!'

'হেঁয়ালিটা খুবই সোজা রে, একবার আমাদের সাংকেতিক ভাষায় বুঝে দেখ না কি বলতে চেয়েছে'—

ততক্ষণে আমরা সকলেই বুঝেছি, আমাদের সংকেতটাই ইংরেজি করে কে লিখেছে B-E-W-A-R-E, T-H-E-Y A-R-E D-A-N-G-E-R-O-U-S! সাবধান, ওরা বিপদজনক।

কথাগুলোর আক্ষরিক মানে বুঝে কিন্তু আমাদের সমস্যার সমাধান হল না, বরঞ্চ সব কিছু যেন আরো গুলিয়ে গেল। কে ভয়ানক? কেন বিপদজনক? তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? কে আমাদের এই ভাবে সতর্ক করে দিচ্ছে এবং কেন?

কিছুই বুঝতে না পেরে আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম।

এই গল্পটা ভাল করে বুঝতে হলে আমাদের বিষয়ে কিছুটা জানা দরকার। অবশ্য সন্দেশের অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকা আমাদের ভালো করেই চেনে। কালু, মালু, বুলু, আর আমি (টুলু) একটা চমৎকার স্কুলে পড়ি, হোস্টেলে থাকি। আমাদের মধ্যে খুব ভাব আর আমরা অনেক রহস্যের সমাধান করেছি বলে বন্ধুরা আমাদের নাম দিয়েছে 'গোয়েন্দা-গণ্ডালু'। আমরা প্রত্যেকে বাকি তিনজনের মা-বাবাকে মাসিমা-মেসোমশাই বলি আর তাঁরা প্রত্যেকে আমাদের চারজনকেই খুব ভালোবাসেন। মজার ব্যাপার হল, আমরা এডভেঞ্চার করতে ভালবাসি তাই এডভেঞ্চারও যেন আমাদের ভালোবাসে। যখনই যেখানেই যাই না কেন, কোনো না কোনো রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি, মাঝে মাঝে বেশ বিপদেও পড়ি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত, সব বিপদ কাটিয়ে রহস্যের সমাধান করে ফেলি। একবার আমাদের চারজনের বাবা-মায়েরা আমাদের নিয়ে মধ্যপ্রদেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন, মান্ডুতে হঠাৎ একটা সাংঘাতিক রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলাম আর নানা এডভেঞ্চারের মধ্য দিয়ে আশ্চর্য ভাবে তার সমাধান করেছিলাম। সেবার বেশ একটু বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়েছিল, তাই বাবা-মায়েদের কাছে বকুনিও খেয়েছিলাম—তাও ত তাঁরা জানেন না ঠিক কতখানি বিপদের মধ্যে পড়তে হয়েছিল আমাদের!

এবারে আমরা চারজনে আর আমাদের বাবা-মায়েরা সবাই মিলে এসেছিলাম হিমাচল প্রদেশের কুলু উপত্যকার পাহাড়ি জায়গা কুলু ও মানালিতে। কুলুর বিখ্যাত দশেরা উৎসবে সবাই মিলে খুব হৈ-চৈ করেছিলাম। মালুর বাবা-মা মাসি-মেসো মানালির সব চেয়ে সুন্দর জায়গা 'লগ-হাটে' একটা কটেজ ভাড়া নিয়েছেন, আর আমাদের তিনজনের মায়েরা টুরিস্ট লজের পিছনের পাহাড়ে একটা ছোট্ট বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। বাবারা কি-যেন কাজে চণ্ডীগড়ে গেছেন। আমরা পালা করে চারজনে মিলে একবার লগ-হাটে থাকছি, আর একবার থাকছি সেই বাড়িটাতে, আর সারাদিন ঘুরে বেড়াচ্ছি। এবারে কোনো এডভেঞ্চার করবার প্ল্যান নেই আমাদের। তার জন্য কোনো দুঃখও নেই। এমন সুন্দর জায়গা মানালি, এত দেখবার জিনিস আর বেড়াবার জায়গা আছে সেখানে যে বিনা রহস্যেই দিব্যি আনন্দে দিন কেটে যাচ্ছে। এর মধ্যে হঠাৎ কি এক উটকো রহস্য এসে হানা দিল কেন, তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না!

মালুর মা চমৎকার রান্না করেন, একবার খেলে তার স্বাদ বহুদিন মনে থাকে। কিন্তু আজ ঘী-ভাত, মুরগির মাংস, মাছের চপ, আরো কি সব ভালো ভালো খাবার অন্যমনস্কভাবে খেয়ে নিলাম। তারপরে, মাসিমাদের খাওয়া পর্যন্তও অপেক্ষা না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেই বললাম, 'উঃ! যা খেয়েছি, একটু ঘুরে না এলে চলছে না।'

তখনই কিন্তু আমরা বেশি দূরে গেলাম না, 'লগ-হাট'-গুলো ছাড়িয়ে সামনা দূরেই রাস্তার ধারে এমন একটা নির্জন জায়গায় বসলাম যাতে যে-কোনো দিক থেকে কেউ এলে একটু দূর থেকেই দেখতে পাই অথচ আমাদের কথা যেন কেউ না শোনে।

কালু আবার বলল, 'প্রথম প্রশ্ন হল, কে আমাদের এই-ভাবে সতর্ক করে দিয়ে থাকতে পারে, এবং কেন?'

আমি বললাম, 'আজ যারা রোটাং কাফেতে উপস্থিত ছিল, তাদের মধ্যে সকলেরই চিরকুটটা দেবার সুযোগ ছিল।'

বাধা দিয়ে মালু বলল, 'কিন্তু তারা সবাই ত আমাদের চেনে না।'

'সবাই না হোক, প্রায় সবাই মুখ চেনে। যেমন, আমরা ওদের প্রায় সকলকেই আগে দেখেছি, পথেঘাটে, বাসে, হিড়িম্বা মন্দিরে, বা এই রোটাং কাফেতেই।'

কালু বলল, 'কিন্তু, এদের মধ্যে কে আমাদের সাংকেতিক ভাষা বুঝে নিয়ে, সেই ভাষাতে চিরকুট লিখে থাকতে পারে?'

'আমরা ত যখন-তখন এই ভাষা ব্যবহার করি, যে-কেউ দু'তিনবার শুনলেই সংকেতটা বুঝে ফেলতে পারে।'

'আমরা কথা বলি বাংলায়, এদের মধ্যে অধিকাংশই ত অবাঙালী—অত সহজে তারা সংকেত বুঝবে কি?'

'বহু সংখ্যক বাঙালীও ত ছুটিতে মানালি এসেছে, কত চেনা লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গেল।'

'তারা সকলেই ত আজ সকালে রোটাং কাফেতে উপস্থিত ছিল না।'

'আজ রোটাং কাফেতে আমরা ছাড়া বাঙালী ছিলেন খালি সেই চারটি টিচার—তা মালু-বুলু ত তাঁদের কাছে ভয়ে ঘেঁষেই না।'

আমরা সবাই এই কথায় হেসে ফেললাম। উত্তরবঙ্গের কোন স্কুল থেকে যে চারটি টিচার মানালি বেড়াতে এসেছেন, তাঁদের দেখে সত্যিই প্রথমে আমরা ভয়ে একটু দূরে দূরে থাকতাম, বিশেষতঃ মালু আর বুলু। তাঁদের নাকি দেখলেই দারুণ কড়া মনে হত, কাছে গেলেই হয়ত 'এ-প্লাস-বি হোল স্কোয়ারের' ফর্মুলা কিংবা বিদঘুটে কোন শব্দ রূপ জিজ্ঞেস করে ফেলবেন মনে হত। যদিও এখন বেশ ভাব হয়ে গেছে, নীলিমাদি, বাসন্তী-দি, মন্দিরাদি আর রমাদি বলে ডাকতে শুরু করেছি, তবু মালু আর বুলুকে ঠাট্টা করার সুযোগ পেলে ছাড়ি না।

কালু বলল, 'যে চিরকুটটা লিখেছে সে যে বাংলা জানে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু বাঙালী নাও হতে পারে। বাঙালী হলে চিরকুটটাও সম্ভবতঃ বাংলায় লিখত।'

'অবাঙালীরাও অনেকেই বাংলা জানে। চাপদাড়ি ত দিদি-দের দেখলেই বাংলায় বলে—নোমোস্কার।'

'তাছাড়া ঝুলোগোঁফ সাহেব হিন্দি জেনেও অস্বীকার করল। হয়ত বাংলাও জানে।'

বুলু অনেকক্ষণ কিছুই বলেনি, এবার ভয়ে ভয়ে বলল, 'একটা কথা তোরা কেউ ভেবে দেখছিস না, বেছে বেছে আমার ঝোলায় চিরকুটটা রাখল কেন?'

মালু তার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'কারণ ওরা যে টের পেয়েছে তুই কত সাহসী!'

কালু বলল, 'তুই যে কিনারে বসেছিলি, তাছাড়া তোর ঝোলার মুখটা একটু ফাঁক হয়ে ছিল, মালুর আর আমার ঝোলার মুখ ত জিপবন্ধ ছিল, আর টুলু বসেছিল একেবারে কোনায়।'

আমরা হাসলাম, কিন্তু বুলু মুখটা হাঁড়ি করেই রইল।

কালু আবার বলল, 'তাহলে, প্রথমে দেখতে হবে, আজ সকালে যারা ঐ কাফেতে ছিল, তাদের মধ্যে কে কে বাংলা জানে।'

মালু তার নোট বুকে লিখে নিল।

'দ্বিতীয়তঃ, কাকে বিপজ্জনক বলেছে, কেন বলেছে, আর সেজন্য আমাদের কে সাবধান করছে এবং কেন?'

'থাম-থাম-থাম,' বাধা দিল মালু, 'দ্বিতীয় কথার মধ্যে যে তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম পর্যন্ত ঢুকিয়ে ফেলছিস! আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।'

'ব্যাপারটা জটিল সে ত বোঝাই যাচ্ছে।'

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, 'তাহলে ওসব জটিল ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এমন সুন্দর বিকালটা নষ্ট করিস না'—'ঠিক কথা—চল একটু বেড়িয়ে আসি'—বলল বুলু। বেড়াবার নামে সবাই এক পায়ে খাড়া। তাড়াতাড়ি লগ-হাটে গিয়ে মাসিমাদের বলে, দক্ষিণমুখো রওনা হলাম। আজ আর মালু ফিরবে না, আমাদের সঙ্গেই থাকবে। হনহন করে নেমে ডাইনে মোড় নিলাম, টুরিস্ট লজ ছাড়িয়ে হিড়িম্বামন্দিরের পথে উঠতে লাগলাম। এক এক জায়গায় রাস্তাটা বেশ খাড়া, বড় বড় গাছের মধ্য দিয়ে 'জিগ-জাগ' করে উঠেছে। যতই ওপরে উঠছি, দূরের পাহাড়ের শোভা আর নিচে মানালি শহরের দৃশ্য ততই সুন্দর দেখাচ্ছে।

হঠাৎ মালুর ইঙ্গিতে চট করে কতগুলো গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। কাছে আসার আগেই ওদের পায়ের শব্দ পেয়েছিলাম, ঠিক পাশ দিয়ে যাবার সময়ে দু-একটা কথাও শুনতে পেলাম, পরিষ্কার বাংলায় ঝুলোগোঁফ সাহেব বলছিল, 'লোক জানাজানি হওয়া ভালো নয়'...বুড়ো বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার কথা বলাও'...আর কিছু শুনতে পেলাম না। ওরা হিড়িম্বামন্দিরের পথে বেশ কিছুটা এগিয়ে যাবার পরে চাপা গলায় মালু বলল, 'দিব্যি বাংলা বলছে, আর তখন বলেছিল যে কোনো ভারতীয় ভাষা জানেই না।'

কালু বলল, 'তাছাড়া, বুড়োটার একমাথা পাকাচুল হলে কি হবে, চেহারা মোটেই বুড়োটে নয়, চড়াই পথে অনায়াসে জোয়ান লোকের মত হনহনিয়ে হাঁটছে কেমন দেখলি?'

'আহা, হয়ত কোরার কম বয়সেই চুল পেকে গেছে—কোনো দুঃখ-কষ্টে, ভাবনা-চিন্তায়।'

'যাকে তাকে অত আহা-উহু করতে হবে না,' ধমক দিল কালু।

'আমার কিন্তু লোকটাকে বেশ সন্দেহজনক মনে হয়!'

হিড়িম্বামন্দিরের কাছাকাছি এসে দেখি এমন চমৎকার দিন পেয়ে অনেকেই এখানে জড় হয়েছে। সেই টিচারেরা, দুই ছেলে-সহ মোটা মহিলা, আরো অনেকে। ঝুলোগোঁফ বা বেঁটে মোটা বুড়োকে কিন্তু দেখলাম না,—যদিও তারা এদিকেই আসছিল, মনে হয়েছিল। চাপদাড়ি নিবিষ্ট মনে কয়েকটি স্থানীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। নীলচশমা ক্যামেরা নিয়ে চার-পাঁচটি বেলবটম্ পরা মেয়ের ফটো তুল-বার জন্য তাদের নানাভাবে হাসাতে চেষ্টা করছিল।

www.BanglaBook.org

বুলু ফিসফিস করে বলল, 'ওরা এমনিতেই এত হাসছে, আর হাসলে ত ছবি উঠবেই না!'

টিচারেরা এতটা উঠে বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, গাছের তলায় একটা প্ল্যাস্টিকের চাদর পেতে বসেছিলেন। নীলিমাদি মোটা মানুষ, একটা খবরের কাগজ দিয়ে হাওয়া খাচ্ছিলেন। আর একটা কাগজে চোখ বোলাচ্ছিলেন মন্দিরাদি। বাসন্তীদি বেজায় আমুদে, আমাদের দেখেই ডাক দিলেন।—'এই মেয়েরা—কি যেন—লু-লু-লু-লু, এদিকে এসে একটু শুনে যাও ত।'

হাসতে হাসতে আমরা এগিয়ে গেলাম। দিদি জানেন যে আমাদের নাম গণ্ডালু, তবু বলবেন লু-লু-লু-লু!

মন্দিরাদি গম্ভীরভাবে বললেন, 'তোমাদের সেই সমস্যার কি হল?'

আমরা অবাক—'কোন সমস্যা?'

রমাদি বললেন, 'বোস এখানে। সেই যে হিড়িম্বা দেবীর দেবলোকে যাওয়া নিয়ে তর্ক জুড়েছিলে, তার কোনো কিনারা করতে পারলে?'

মন্দিরাদি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি কাল খবরের কাগজে দেখেছিলে, না লোকমুখে শুনেছ? দেবমূর্তি-টূর্তি নিয়ে অত হৈ-চৈ করছিলে কেন আজ সকালে?'

আমরা ত আকাশ থেকে পড়লাম। সত্যি কথা বলতে কি, বেড়াতে বেরিয়ে কোনো খবরের কাগজই ভালো করে দেখি না আমরা। দিদি কি বলতে চাইছেন?

মন্দিরাদি চন্ডীগড়ের কাগজের একটা খবর দেখালেন আমাদের। তাতে লিখেছে সে বেশ কিছুদিন হল কুলু উপত্যকায় ও তার আশেপাশে দেবমূর্তি ও মন্দির আর মঠের নানা মূল্যবান জিনিস পত্তর এইসব চুরি যাচ্ছে। সন্দেহ করা হচ্ছে যে খুব চতুর একটা চোরা কারবারী দল সেগুলো বিদেশে পাচার করছে, কিন্তু তাদের গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না। দশেরা উৎসবের সময়ে কুলুর পুলিশ নাকি তাদের দলের পান্ডাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল। কিন্তু তাদের চোখে ধুলো দিয়ে সে মানালি পালায়। মানালি থেকে বেরোবার সবগুলি পথে অনুসন্ধান চালিয়েও যখন তাকে ধরা যাচ্ছে না, তাই পুলিশ সন্দেহ করছে যে সে এখনও মানালিতেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে।

কাগজে লোকটির একটা ফোটোও ছিল, সেটা অবশ্য খুব স্পষ্ট নয়, দেখে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। সঙ্গে বর্ণনাও দেওয়া ছিল, পাঁচ ফুট দু' ইঞ্চি লম্বা, ষন্ডা, ৪০/৪৫

www.BanglaBook.org

বছর বয়স, শ্যামবর্ণ, ঝাঁকড়া কালো চুল, খাঁদা নাক আর ডান কানের লতির খানিকটা কাটা। তার অনেক নাম—গর্জন সিং, পাঁচু মিঞা, ঝোটন সর্দার ইত্যাদি। বুলু শিউরে উঠল, 'মাগো! কি বিশ্রী চেহারা, দেখলেই ভয় লাগে!'

মালু বলল, 'সত্যি, দেখেছিস নাকি এরকম সুপুরুষ কাউকে?'—আমি বললাম, 'হয়ত রোজই দুবেলা দেখছি, খেয়াল করছি না।'

বাসন্তীদি হেসে বললেন, 'কি গো, তোমরাই গুন্ডাটাকে খুঁজবে নাকি?'—মন্দিরাদি কিন্তু গম্ভীরভাবে আমাদের সাবধান করে দিলেন, 'এসব বিপজ্জনক ব্যাপারে তোমাদের নাক গলাতে যাওয়া উচিত নয়।'

তাড়াতাড়ি সামলে নিলাম। আমরা চোরা কারবারীদের নিয়ে মাথা ঘামাই আর নাই ঘামাই, দিদিদের সামনে সে বিষয়ে কোনো খোলাখুলি আলোচনা করা চলবে না।

মালু হেসে বলল, 'কি-যে বলেন দিদি, ওসব ত পুলিশের কাজ।'—কালু বলল, 'এই যে চোরা-চালানকারীরা পয়সার লোভে নিজের দেশের সব প্রাচীন সম্পদ বিদেশে চালান দেয়, তারা সাধারণ চোর-ডাকাতদের চেয়েও খারাপ নয় কি?'

মন্দিরাদি ইতিহাসের টিচার, প্রত্নতত্ত্বে তাঁর খুব আগ্রহ। দুদিন আগেই তিনি কুলু উপত্যকার প্রাচীন মন্দির, দেবমূর্তি এই সব নিয়ে আমদের অনেক নতুন তথ্য বলেছিলেন। আজও কিছু কিছু ইন্টারেস্টিং কথা শুনলাম, তার মধ্যে একটা হল হিড়িম্বাদেবীর অভিষেক উৎসবের খবর। এখন নাকি দেবী দেবলোকে!

কালু উত্তেজিত হয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে?'—মন্দিরাদি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে শুধু মাথা নেড়ে জানালেন, 'হ্যাঁ!'

বেলা পড়ে এসেছে দেখে দিদিরা উঠে পড়লেন। আমরাও তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চললাম। এরই মধ্যে দেখলাম কালু চুপি চুপি খবরের কাগজটা চেয়ে নিয়ে নিজের ঝোলায় পুরল। নীলচশমা আর চাপদাড়ি কথা বলতে বলতে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। হিড়িম্বামন্দিরের পাশে একবার বেঁটে মোটা বুড়োকে দেখলাম, পূজারীর সঙ্গে চুপি চুপি কি সব কথা বলছিল, কিন্তু ঝুলোগোঁফ সাহেবকে দেখতে পেলাম না।

দিদিরা উঠেছিলেন টুরিস্ট লজে আর আমাদের বাড়িটা ছিল আরো বেশ কিছুটা ওপরে একটা ফেকড়া ছোট রাস্তায়। বাড়ির কাছে এসে দেখি মালুর মা আর মাসি এসেছেন, সবাই বেরোবার জন্য প্রস্তুত, আমাদের দেখে তাড়া লাগালেন, 'শিগগির চা খেয়ে তৈরি হয়ে নাও, নইলে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।'

আমরা বললাম যে সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত, এবারে আমরা বিশ্রাম করতে চাই। হয়ত আমাদের উস্কোখুস্কো দেখাচ্ছিল। মায়েরা এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন, চা খেয়ে নিয়ে, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে ঘরেই থাকতে বলে, বেরিয়ে গেলেন।

আমাদের বেরোবার প্ল্যানও ছিল না। বিশ্রামের চেয়ে চুপিচুপি কথা বলবার দরকার হয়ে পড়েছিল বেশি। মায়েরা বেরিয়ে যেতেই মালু চারিদিক ভাল করে দেখে নিয়ে, সামনের দরজা বন্ধ করে দিল। আমাদের বাড়িটা ছিল খুব নিরিবিলি জায়গায়। হিড়িম্বামন্দিরে যাবার রাস্তার কিছুদূর উঠবার পরে দক্ষিণে যে ফেকড়া কাঁচা রাস্তা ছিল, সেই পথে কিছুদূর গিয়ে আমাদের বাংলোটা, তারপর আর বেশি বাড়িঘর ছিল না, তাই পথে লোক-চলাচলও খুব কম ছিল। তবু আমরা পিছনের মাঝের ঘরটায় বসে খুব চাপা গলায় কথাবার্তা শুরু করলাম। কারণ সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন জটিল হয়ে পড়েছিল।

আমি বললাম, 'এরকম ঢাকঢোল পিটিয়ে যার ফোটো আর বর্ণনা খবরের কাগজে বেরিয়েছে, সে কি খোলাখুলি পথেঘাটে ঘুরে বেড়াতে সাহস করবে? নিশ্চয় কোথায় লুকিয়ে বসে আছে।'

মালু বলল, 'ভালো ছদ্মবেশ নিতে পারলে কিছুটা প্রকাশ্যে বেরোনই হয়ত নিরাপদ। লুকিয়ে বসে থাকলে তার আশপাশের বাড়ির লোকেরা সন্দেহ করে পুলিশে খবর দেবে না?'

কালু খুব নিবিষ্ট মনে খবরের কাগজের ছবি আর বর্ণনা লক্ষ করে দেখছিল। বলল, 'ঝাঁকড়া চুল আর শ্যামবর্ণ রঙের খুব গুরুত্ব নেই। ওগুলো সহজেই গোপন করা যায়।'

আমি বললাম, 'কিন্তু লোকটা খুব বেঁটে রে, মাত্র পাঁচ ফুট দু' ইঞ্চি—নিজের উচ্চতা সে সহজে গোপন করতে পারবে না।'

হঠাৎ মালু বলল, 'আমরা যখন এসব ব্যাপার না জেনেই রোটাং কাফেতে বসে দেবমূর্তি-টুর্তির বিষয়ে হৈ চৈ করছিলাম, তখনই হয়ত ঐ তর্জন না গর্জন, পাঁচু না ঝাঁটু, সেখানে ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিল। তাই আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিল।'

'হয়ত আমাদের কাছাকাছিই বসেছিল, ও বাবা, কি হবে?' বলল বুলু।—আমি বললাম, 'সে আমাদের সতর্ক করতে যাবে কেন? বরঞ্চ, যদি জানতে পারতাম, কে সতর্ক করেছে, বুঝতাম সে ওদের দলের নয়।'

কালু বলল, 'এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারিস না। আমরা ওদের ব্যাপারে বেশি উৎসাহ দেখালে ভয় পেয়ে আমাদের সতর্ক করে দেবেই ত।'

মালু বলল, 'আমাদের দেখা কে কে ঐ খাঁদু না বোঁচা হয়ে থাকতে পারে ভেবে বল ত দেখি।'

আমি বললাম, 'অন্ততঃ, চাপদাড়ি যে হতে পারে না, এটা নিশ্চিত, পাঁচ ফুট দু' ইঞ্চি লম্বা লোকটা কখনই ছদ্মবেশে ছ-ফুটের মতন হয়ে যেতে পারে না।'

বুলু বলল, 'আমাদের মুখ চেনা সবাই ত ওদের দলের লোক হয়ে থাকতে পারে।'

'তার মানে, গোয়েন্দা গন্ডালুদের এমনই খ্যাতি বা অখ্যাতি যে যত সন্দেহজনক লোক সব আমাদের চারদিকে জড় হয়েছে?'

হঠাৎ বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে আমরা থমকে চুপ করে গেলাম। এত তাড়াতাড়ি মায়েরা ফিরে এলেন? কিন্তু কই, তাঁদের কথাবার্তা ত শুনতে পাচ্ছি না!

বাইরের ঘরে গিয়ে কালু হাঁক দিল, 'কে?' কোনো সাড়াশব্দ নেই!

হঠাৎ একটা কাগজ মেঝেতে পড়ে আছে, দেখতে পেলাম। ঠিক আগের মতন একটা ডায়রির ছেঁড়া পাতায় গোটাগোটা বড় হাতের ইংরেজি অক্ষরে, গাঢ় নীল কালিতে লেখা কয়েকটা রেল স্টেশনের নাম—**BOMBAY ETTAWA CAWNPUR ALLAHABAD ROURKELA EGMORE FAIZABAD UMRAOTI LUCKNOW**—এক নজরেই

www.BanglaBook.org

মানে বুঝতে পারলাম—BE CAREFUL, মানে সাবধান হও!

নিশ্চয় জানালার ফাঁক দিয়ে কেউ ছুঁড়ে ফেলেছে ভিতরে, কি সর্বনাশ! তার মানে কি কেউ আমাদের পিছনে ধাওয়া করে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত এসেছিল, নাকি আগে থেকেই ওরা আমাদের নাম-ধাম সব জানে? আড়ি পেতে ওরা এখন আমাদের কথাবার্তা শুনছিল নাকি? নাঃ, তা হতেই পারে না, আমরা ত ভিতরের ঘরে বসে খুব চুপিচুপি কথাবার্তা বলছিলাম, বাইরের রাস্তা থেকে শুনবে কি করে?

কালু কাগজটার ভাঁজ খুলে খুঁটিয়ে দেখল। তারপরে নিজের ঝোলা থেকে আগের কাগজটা বের করে দুটো মিলিয়ে দেখে বলল, 'বড় অক্ষরেই লিখেছে তাই হাতের লেখা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু দুটো চিরকুটই একই ধরনের কলম-কালিতে লেখা, আর একই ডায়রির পাতা ছিঁড়ে নেওয়া।'

মালু বলল, 'ঠিক, লক্ষ করে দেখ, এই ডায়রিতে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দুটো করে তারিখ আছে, কেবল শনি আর রবিবার সিকি পৃষ্ঠা মাত্র জায়গা নিয়েছে, তাই সে পৃষ্ঠায় আছে তিনটে তারিখ। প্রথম চিরকুটটা ছিল শুক্রবার ১৪ই থেকে মঙ্গলবার ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আর শেষেরটা ১৯শে বুধবার থেকে ২৩শে রবিবার পর্যন্ত।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এই বিশেষ তারিখগুলোর কোনো তাৎপর্য আছে নাকি?'

'এখনও ত তেমন কিছু বুঝিনি, তবে, এবার খুব তাড়াতাড়ি পুজো পড়েছে—এগুলো হল পুজোর আগের দিন—যে সব দিন কেটে গেছে'—

বুলু বলল, 'আমার বড় ভয় লাগছে, চল, চণ্ডীগড় ফিরে যাই!'

কালুর চোখ দুটো চকচক করছিল আর উত্তেজনায় বড় বড় নিশ্বাস পড়ছিল। তার এই চেহারা আমাদের খুব চেনা। এর মানে তার রোখ চেপে গেছে।

বুলুর কথার উত্তরে সে বলল, 'কি! একটা উটকো লোক মিছিমিছি আমাদের ভয় দেখাবে আর ভয়ে আমরা ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে যাব? এ হতেই পারে না!'

মালু উৎসাহিত হয়ে বলল, 'ওরা যেমন আমাদের পিছনে লেগেছে, আয় না আমরাও ওদের পিছনে লাগি, গোয়েন্দাগিরি করে ওদের সব কীর্তিকলাপ ফাঁস করে দিই।'

বুলু বলল, 'মায়েরা যে সঙ্গে রয়েছেন?'

'তাঁদের চোখ এড়িয়েই খুব সাবধানে গোয়েন্দাগিরি করতে হবে!'

কালু বলল, 'বড় রাস্তায় ত এ ক'দিন বেড়ালাম, এবার যদি ছোট ছোট অলিগলি পথে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে বেড়াতে চাই, সেটা বেশ স্বাভাবিকই হবে নাকি? চোখ কান খোলা রেখে ঘুরে বেড়াব—এছাড়া আর কি করতে পারি?'

মালু বলল, 'কাজ শুরু করবার আগে একটু প্ল্যান করে নেওয়া ভাল।'

কালু বলল, 'বেশ, একে একে সকলের চেহারা মনে করবার চেষ্টা কর, ঐ গর্জন সর্দারের সঙ্গে কারো মিল আছে কিনা।'

আমি বললাম, 'চাপদাড়ি যে খুব লম্বা এটা আমরা সকলেই লক্ষ করেছি কিন্তু ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ত লম্বা নয়, বরং বেঁটেই।'

'তাহলেও সে কি মাত্র পাঁচ ফুট দু' ইঞ্চি হবে? বোধ হয় বেশি।'

'হাই হীল জুতো-টুতো পরে নিজের উচ্চতা দু-তিন ইঞ্চি বাড়িয়ে নেয়নি তো? তাছাড়া, তার নাক কান লক্ষ করেছিলি কি?'

'কাল এ-সবই ভাল করে লক্ষ করে দেখতে হবে।'

'ঝুলোগোঁফ সাহেবও লম্বা নয়, তবে অতটা বেঁটে নয়, সে গর্জন বাহাদুরের সহকারী হতে পারে, কিন্তু খোদ নেতা নয়।'

'বুড়োটা কিন্তু শ্যামবর্ণ, বেঁটে আর হয়ত একটু বেশি মোটা—তা, সেটা ত ছদ্মবেশের অঙ্গ হতে পারে? তাছাড়া সব সময়ে মাঙ্কি ক্যাপ পরে কান ঢেকে রাখে কেন? নাক কিরকম অবশ্য লক্ষ করিনি।'

'আহা, ও ত পাকাচুলো বুড়ো—ঝোটন সর্দারের বয়স মাত্র ৪০/৪৫ বছর।'

'সেটা হয়ত চালাকি! চুল ছেঁটে একটা পাকা চুলের পরচুলা পরতে কতক্ষণ?'

আমি বললাম, 'ওরকম বেঁটে আর ষণ্ডা কয়েকটি স্থানীয় লোককেও দেখেছি, কিন্তু ওদের কারো নাক বা কান লক্ষ করে দেখিনি ত। তবে, বেশির ভাগই গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ আর মাথার চুল কালো।'

'কাল থেকে আমাদের সব লোকেদের নাক কান লক্ষ করে করে বেড়াতে হবে রাস্তাঘাটে—'

'আর গজ ফিতে নিয়ে সকলের উচ্চতা মেপে দেখতে হবে না?'

'না না, অতটা করতে গেলে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। ওটা আন্দাজেই বুঝে নিতে হবে। তবে জুতোর হীল লক্ষ করিস।'

কথা বলতে বলতে মায়েরা এসে পড়লেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে, তখনি ঘুমিয়ে পড়লাম সবাই। কি যে অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম তার ঠিক নেই। প্রথমেই দেখলাম যে ঝুলোগোঁফ সাহেব নিজের গোঁফটা কামিয়ে ফেলে ঠিক সেই ঝোটন সর্দারের মতন চেহারা বানিয়েছে, আমরা বলছি যে, এই লোকটাই আসামী, কিন্তু সে ইংরেজিতে বলছে 'নট গিল্টি স্যার।' হঠাৎ মন্দিরাদি আর বাসন্তীদি দুই কান ধরে চাপদাড়িকে টেনে নিয়ে এলো, একজন তার দাড়িগোঁফ টেনে খুলে দিলেন, অন্য জন টুপিটা খুলতেই একমাথা কালো ঝাঁকড়া চুল বেরিয়ে পড়লো। খুব রেগে মন্দিরাদি বললেন, 'তাহলে তোমারই এই কাজ!' স্কেল দিয়ে তার মাথায় মারতেই ছ'-ফুট লম্বা লোকটা পাঁচ ফুট দু' ইঞ্চি হয়ে গেল, নাকের ওপর মারতেই সুন্দর চোখ নাক খাঁদা হয়ে গেল আর ডান কানে মারতেই লতির একটা অংশ খসে পড়ল। 'কান ধরে বেঞ্চির ওপর দাঁড়াও', কাঁচুমাচু মুখ করে লোকটা তাই করল! আমরা ফিসফিস করে বলতে লাগলাম, 'চাপদাড়ি, তাহলে চাপদাড়িই—'

হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙে গেল—মালু আমাকে ঠেলা মারছে আর ফিসফিস করে বলছে, 'চাপদাড়ি, চাপদাড়িকে দেখলাম রে।'

কালু বিছানা ছেড়ে না উঠেই বলল, 'কি বাজে বকছিস—এখনও সকালই হয়নি—চাপদাড়ির স্বপ্ন দেখছিস নাকি?'

আমি বললাম, 'সত্যিই আমি চাপদাড়ির স্বপ্ন দেখছিলাম,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু মালু বলছে যে জলজ্যান্ত চাপদাড়িকেই দেখেছে।'

ততক্ষণে আমরা চারজনেই বেশ সজাগ হয়ে গেছি। ভোর হয়ে এসেছে দেখে মালু সামনের জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিল, দেখে যে রাস্তা দিয়ে হনহন করে চাপদাড়ি চলেছে। কেমন যেন তার উস্কখুস্ক চেহারা, মনে হয় সবে ঘুম থেকে উঠেছে।

'হয়ত এই রাস্তাতেই ওর বাড়ি।'

বুলু আপত্তি জানাল, 'এই রাস্তাতে ত দু-চারটের বেশি বাড়িই নেই।'

'তারই মধ্যে একটাতে হয়ত চাপদাড়ি থাকে।'

'চল্ না, একটু ঘুরে দেখে আসি ওদিকে কি আছে!'

মায়েরা তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেননি। আমরা চা খাবার আগেই একটু ঘুরে আসতে চাইলে ওঁরা বললেন যেন দেরী না করি। দিনের বেলা আমরা বেড়াতে চাইলে ওঁরা কখনই আপত্তি করেন না, কেবল বেশি বেলা করলে বা রাত করলে বকেন।

কালু মালুকে জিজ্ঞেস করে জানল যে চাপদাড়ি দক্ষিণ দিক থেকে উত্তরে যাচ্ছিল, মানে, যেদিক দিয়ে টুরিস্ট লজ পার হয়ে শহরে যাওয়া যায়। তাহলে আমরা দক্ষিণেই গিয়ে দেখি কি আছে রাস্তায়।—বেরিয়ে দেখলাম যে উত্তর থেকে সেই বেঁটে মোটা বুড়ো আসছে আমাদের বাড়ির দিকে; কিন্তু হঠাৎ কি ভেবে সে একটু থমকে দাঁড়াল, পকেট থেকে একটা ডায়রি বার করে কি দেখল, তারপরে ঘুরে আবার উত্তরেই ফিরে গেল।—'এটাই কি সেই ডায়রি?' বলল মালু।—'সাইজ দেখে মনে হয়, হতেও পারে। লোকটার চালচলন সত্যিই সন্দেহ-জনক', মন্তব্য করল কালু। এই রাস্তাটা বেশ নির্জন। উত্তরে কয়েকটা মাত্র বাড়ি পার হলেই হিড়িম্বামন্দিরের রাস্তা পাওয়া যায়, যেটা নেমে মানালির প্রধান রাস্তায় পড়েছে। সেদিকে আমরা বারবার আসা-যাওয়া করছি কিন্তু দক্ষিণে এর আগে কোনদিন যাইনি। আমাদের বাড়ির পরে রাস্তা থেকে কিছুটা নেমে একটা বাড়িতে কিছু স্থানীয় লোক থাকে দেখলাম। তারপরে, একটু ফাঁকা জায়গা পার হয়ে একটা পোড়ো বাড়ি, তালাবন্ধ পড়ে রয়েছে। সব শেষে একটা ছোট্ট বাংলো, তার পরেই রাস্তাটা পাকদণ্ডীর মতন ওপরে উঠে একটা আপেল বাগানে ঢুকে গেছে, আর কোন বাড়িঘর নেই।

তার মানে চাপদাড়ি যদি সত্যিই এ রাস্তায় থেকে থাকে তাহলে নিশ্চয় ঐ ছোট্ট বাংলোটাতেই থাকে। কালুর যখন রোখ চেপেছে সে ঐ বাংলো পর্যন্ত না গিয়ে ছাড়বে না। এদিকে বুলু বরফের মতন ঠাণ্ডা হাতে আমার হাত চেপে ধরেছিল, কিন্তু কালুর ভয়ে কোনো আপত্তি করতে পারছিল না। আমারও বুক ঢিপ ঢিপ করছিল, কিন্তু বেশ কৌতূহল আর উত্তেজনাও অনুভব করছিলাম। হঠাৎ কালুর ইঙ্গিতে আমরা রাস্তার ধারের একটা ঝোপড়া গাছের পিছনে লুকিয়ে পড়লাম। দেখলাম চাপদাড়ি জোরে পা চালিয়ে উত্তর দিক থেকে আসছে। সেই বাড়িতে এসে সে জোড়ে কড়া নাড়ল। ভিতর থেকে কে যেন খুলে দিল দরজা। আমরা কি করব ভাবছি, এমন সময় চাপ-দাড়ি আবার বেরিয়ে এল। বোধহয় দু'তিন মিনিটের মধ্যেই, তারপরে আবার লম্বা পা ফেলে উত্তরে চলে গেল। আমরা ত অবাক! আরো অবাক হওয়া বাকি ছিল, কারণ এর পরে সেই বাংলোর দরজা খুলে বেরোল আপেলের দোকানের সেই কালো বুড়ি। বেরিয়ে সে দরজায় তালা লাগালো। তারপরে একটা থলে হাতে, উত্তর দিকে চলল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। চাপদাড়ির হাতে এই থলেটাই দু'মিনিট আগে দেখেছি আমরা।

'এটা যদি চাপদাড়ির বাড়ি হয়ে থাকে, তাহলে বুড়ি এখানে কি করছে? আর বুড়ির বাড়ি হয়ে থাকলে, চাপদাড়ি কি করছে?'

মালু বলল, 'বুড়িটা বোধহয় ওর কাজকর্ম করে দেয় রে। আপেলের দোকানেও ত ঝাঁটপাট দেয়, ডালাগুলো সাজিয়ে রাখে।'

কালু ইতিমধ্যে রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে সোজাসুজি বুড়িকে জিজ্ঞেস করল সিংজী বাড়ি আছে কিনা। ক্যানকেনে সরু গলায় বুড়ি জবাব দিল যে সে এইমাত্র বেরিয়ে গেছে, ফিরবে সন্ধ্যের পরে।—'আচ্ছা, তাহলে আমি আর একদিন আসবো।'

বুড়ি চলে গেলে কালুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'চাপদাড়ির নাম জানলি কি করে তুই?'

'ওরকম দাড়িওয়ালাদের নাম সিংজী হয়ে থাকে।'

'মিথ্যুক, সেদিন নীলচশমা ওকে সিংজী বলেছিল, তুই সেটা শুনেছিলি।' মালুর কথার জবাবে কালু হাসতে হাসতে বলল, 'সে ত তোরা সকলেই শুনেছিলি!' আমরাও হাসতে লাগলাম।

বুড়ি অনেক দূরে, সম্পূর্ণ চোখের আড়ালে চলে গেলে আমরা বাড়িটার কাছাকাছি গেলাম। মনে হচ্ছিল যেন তালাবন্ধ বাড়ির ভিতর থেকে কেউ আমাদের লক্ষ করে দেখছে! রাস্তাঘাট একেবারে নির্জন, ঝিঁঝির শব্দ ছাড়া কোনো আওয়াজ নেই। কেমন যেন গা ছমছম করছিল।

বাড়ির সামনে এসে আমরা প্রথমে তালাবন্ধ দরজাতে খুব জোরে জোরে কড়া নাড়লাম। কোনো সাড়া পেলাম না। তারপর কালুকে জানলা দিয়ে উঁকি মারতে দেখে বুলু ভয় পেয়ে গেল। কালু বলল, 'তোরা দু'জন সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপর দৃষ্টি রাখ, কেউ এসে পড়লে বলবি সিংজীর অপেক্ষায় রয়েছি। মালু আর আমি বাড়িটার চারদিক ঘুরে দেখে আসি।'

বাংলোটা খুবই ছোট্ট, কেবল সামনে একটা আর তার পিছনে আর একটা ঘর, কিন্তু বেশ খোলামেলা, অনেকগুলো কাঁচের জানলা, সামনে ছাড়া কোনো জানলায় গ্রিল ছিল না; তাই ঘরের ভিতরের সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কালু আর মালু বলল যে ওদের জামাকাপড়, বাসনপত্র সব এলোমেলো ভাবে ছড়ানো রয়েছে। এক কোনে কতগুলো আপেল আর সবজি মাটিতেই রাখা আছে। তাছাড়া ঘরে সাধারণ খাট আলমারি টেবিল চেয়ার ইত্যাদি আছে। এ রাস্তায় আর কোনো বাড়িঘর নেই দেখে আমরা এবার বাড়ি ফিরে এলাম। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে চা-জলখাবার খেয়ে আবার বেরোবার জন্য তৈরি হলাম। এবারেও মেয়েদের সঙ্গে না বেরিয়ে আলাদা চললাম, কারণ ওঁরা চলেছিলেন হিড়িম্বামন্দিরের দিকে আর আমরা ত কাল বিকেলেও সেখানে গিয়েছিলাম। মায়েরা ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগলেন। আমরা নামব নিচের দিকে, হঠাৎ একটা বাড়ির দরজা খুলে সেই বুড়োকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। এবার আর সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল না। একটু নুয়ে পড়ে আমাদের সে 'নমস্তে' জানাল। যদিও সে বাঙালী সেটা আমরা জেনে গেছি, তবুও আমরা বললাম 'নমস্তে'। লক্ষ করে দেখ-লাম যে বুড়োর নাকটা খাঁদাই বটে। কিন্তু কান ত দেখবার উপায় নেই, আজও সে মাঙ্কি ক্যাপ পরে বেরিয়েছে। মোট কথা লোকটা সত্যিই সন্দেহজনক, দৃষ্টি রাখা দরকার। বুড়ো হন-

www.BanglaBook.org

হনিয়ে নিচের রাস্তার দিকে নেমে গেল।

মালু বলল, 'সব ক'টা সন্দেহজনক লোক কি আমাদের কাছে এসে বাসা বেঁধেছে?'

আমি বললাম, 'না রে, নীলচশমা থাকে বাজারের দিকে, এবার দেখা হলে তার নাক আর কান লক্ষ করে দেখিস।'

'শুধু নীলচশমা কেন, এখন থেকে আমরা সমস্ত বেঁটে আর ষণ্ডা লোকের নাক কান লক্ষ করে দেখে বেড়াব।'

'মানালির সমস্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা কড়া নেড়ে বলব, দেখি ত এখানে বেঁটে মোটা কে কে থাকেন, আর তাদের নাক খাঁদা আর কান কাটা কিনা?'

এইভাবে হাসাহাসি করতে করতে আমরা টুরিস্ট লজের কাছাকাছি এসে পৌঁছলে পর ইচ্ছে হল দিদিদের সঙ্গে দেখা করতে যাই। ভেতরে ঢুকবার দরকার হল না। দিদিরা সামনেই ছিলেন। আরো বেশ কিছু লোক লজের সামনে জটলা করছিল। পুলিশ এসেছে দেখলাম। ঝুলোগোঁফ খুব হাত-পা নেড়ে পুলিশের সঙ্গে তর্কাতর্কি করছে মনে হল। ব্যাপার কি!

দিদিদের কাছে শুনলাম যে ঝুলোগোঁফ নাকি রাত্রে টুরিস্ট লজে ছিল না। সকালে ফিরে এসে দেখে যে তালা ভেঙে তার ঘর তচনচ করে, জামাকাপড় বইপত্তর ছড়িয়ে কে যেন কি খুঁজেছে। এমন কি টুরিস্ট লজের গদীবালিশ পর্যন্ত ফেড়ে দেখেছে! তবু নাকি ঝুলোগোঁফ কিছু রিপোর্ট করেনি। তার ঘরে চা দিতে এসে বেয়ারা হাউমাউ করে ম্যানেজারকে খবর দিয়েছে, সে পুলিশ ডেকেছে। তাতেও নাকি ঝুলোগোঁফের আপত্তি, বলছে যে তার কিছুই যখন চুরি যায়নি, শুধু শুধু পুলিশের এই ঝামেলায় সে জড়িয়ে পড়তে চায় না!

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

মালু ফিসফিস করে বলল, 'চুরি গিয়ে থাকলেও এমন কিছু গেছে যেটা ওর কাছে থাকাটাই বে-আইনী!'

টুরিস্ট লজ থেকে বেরিয়ে, একটু এগিয়ে দেখি সেই মোড়ের আপেলের দোকানের সামনেও বেশ জটলা চলেছে—আলোচ্য বিষয় টুরিস্ট লজের চুরি। দোকানদার খুব বক্তৃতা দিচ্ছে। আরে, আগে ত খেয়াল করিনি, এই লোকটাও বেশ বেঁটে ষণ্ডা, মাথায় ঝাঁকড়া কালো চুল, রঙ অবশ্য ফর্সা, তবে সে তার স্বাভাবিক রঙ নাও হতে পারে।

আমরা চার গ্লাস আপেলের রসের অর্ডার দিলাম। দোকানদার বুড়িকে রস দিতে বললে সে ক্যানকেনে গলায় মুখ ঝামটা দিল। তখন লোকটা নিজেই রস বানাতে বসল। যে ছোকরাটি ফাইফরমাস খাটে সে চারটে টিনের চেয়ার ঝেড়ে-ঝুড়ে, একটু দূরে ফুটপাথে পেতে দিল।

লোকটা আবার বক্তৃতা শুরু করেছে, টুরিস্ট লজের দারোয়ানরা সব অলস, ঘুম লাগায়, আর তা নাহলে চোরের সঙ্গে তাদের যোগসাজস আছে! নইলে কখনও টুরিস্ট লজে চোর ঢুকতে পারে!

ওজনদরে বিক্রি হচ্ছে দেখলাম বড় বড় সোনালী আপেল; যেগুলো রসে টসটস করছে সেগুলো খুব মিষ্টি আর অবিশ্বাস্য রকমের সস্তা। যেগুলো একটু ছোট কিংবা সামান্য দাগ-ধরা, সেগুলোই রস করা হয়, সেই রসও অপূর্ব লাগে খেতে। দোকানদার রস করতে করতে বক্তৃতা করছিল আর কালু বিড়-বিড় করছিল—লম্বা পাঁচ ফুট দু' ইঞ্চি হতে পারে, একটু মোটা বেশি, গোটাকতক জামাকাপড় বেশি পরেছে, একটু বেশি ফর্সা, নিশ্চয় রঙ মেখেছে। নাকটা থ্যাবড়াই বলা চলে, কিন্তু কান? কান যে মাফলারে ঢাকা, দেখব কি করে?'

দোকানদার একগাল হেসে নিজে হাতে আমাদের রস দিয়ে গেল, আমরাও না হেসে পারলাম না।

বুলু বলল, 'না রে, তোদের সন্দেহ মিথ্যা। গুণ্ডাটা বিশ্রী দেখতে মনে নেই? এ লোকটার ত দিব্যি হাসিখুশি অমায়িক চেহারা!'

কালু বলল, 'ওসব হাসি-টাসি হয়ত অভিনয়। সবটাই ওর ছদ্মবেশের অঙ্গ!'

এর পরে আমরা মানালির এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চষে বেড়ালাম। বাজারে গেলাম, হটস্প্রিঙের কাছে ঘুরে এলাম। লগ-হাটগুলোর কাছে বসে লোক চলাচল দেখলাম। ফিরে এসে রোটাং কাফেতে ঢুকে কফি খেলাম। কিন্তু এমন কোনো লোক চোখে পড়ল না যার সঙ্গে গর্জন সিংহের বর্ণনা সবটা মিলে যায়—অথচ, অনেকের সঙ্গেই কিছু কিছু মিলে যাচ্ছে দেখা গেল!

মালু বলছিল, 'আগে ভেবেছিলাম মাত্র পাঁচ ফুট দু' ইঞ্চি লোকের সংখ্যা বুঝি খুব কম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে শত-করা পঞ্চাশ ভাগ না হোক, পঁচিশ তিরিশ জনের উচ্চতা এর চাইতে বেশি হবে না!'

কফি খেতে খেতে কালু ফিসফিস করে বলে উঠল, 'দেখ দেখ, যে লোকটা ক্যাশমেমো লিখছে, তার সঙ্গে কিন্তু গর্জনের বর্ণনা খুব বেশি মিলে যাচ্ছে, বেঁটে ষণ্ডা, নাক খাঁদা, ঝাঁকড়া কালো চুল, শ্যামবর্ণ—কেবল কানটা মনে হচ্ছে আস্ত!'

আমি বললাম, 'হঠাৎ ওর কানের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে দেখব? সত্যিই কি ওটা ওর নিজের কান, না প্ল্যাস্টিসিন দিয়ে বানিয়েছে?'

আমরা ফিসফিস করে কথা বলছিলাম আর হাসাহাসি করছিলাম। ওমা! ঐদিক থেকে বেঁটে মোটা বুড়ো দেখি কট-মট করে তাকাচ্ছে! এদিকে আমাদের ঠিক পিছনে বসেছে নীল-চশমা, লক্ষ করছি যে তারও নাক বেশ চ্যাপা। তবে আজ সে দেখি কান ঢেকে মাফলার জড়িয়েছে। গতকাল মাফলার ছিল না, কিন্তু তখন ওর কান লক্ষ করিনি।

এর পরে আমরা কিছুক্ষণ সামনা মুখ-চেনা সকলের সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলে বেড়ালাম। চাপদাড়িকে রাস্তায় দেখে জিজ্ঞেস করলাম সে বাংলা জানে কিনা; উত্তর দিল যে সে দু-সাল 'বাঙ্গাল দেশে' ছিল, খুব ভালই বাংলা বোঝে, 'থোড়া-কুছ' বলতেও পারে।

নীলচশমাকে বললাম যে তাকে আমাদের খুব চেনা-চেনা লাগে, কোথায় যেন দেখেছি? সে উত্তর দিল, 'রোজই ত দেখা হচ্ছে, মানালিরই পথে-ঘাটে।'

ক্যাশমেমো লিখবার সময়ে সেই লোকটার পাশে দাঁড়িয়ে তার ডান কান খুব খুঁটিয়ে দেখলাম, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করতে পারলাম না! মেনে নিতে হল যে ওর কানের কোনো অংশ কাটা নয়।

বুলু বলল, 'আমাদের মানালিতে থাকার দিন ত এবার ফুরিয়ে এল। ভালই হল। ওসব গুণ্ডা-ডাকাত ধরে কাজ নেই।' আমরা সবাই কিন্তু বেশ উদ্বিগ্ন আর নিরাশ বোধ করছিলাম; আজ পর্যন্ত কোনো রহস্যের ব্যাপারে আমরা ব্যর্থ হইনি। আশ্চর্যভাবে সব জটিল রহস্যেরও সমাধান করে ফেলতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেরেছি, আর এই মানালিতে এসে কিনা হায় মেনে ফিরে যাব?

একথা ভাবতেও যেন মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মুখে যাই বলুক না কেন, রহস্যের সমাধান না হলে, বুলুও দুঃখিত হবে।

সারা মানালি টহল দিয়ে এসে দুপুরে বাড়িতে খাওয়াদাওয়া সারলাম। দিনটা কেমন যেন মেঘলা হয়ে এসেছিল, থেকে থেকে টিপটিপ বৃষ্টিও পড়ছিল। মায়েরা আমাদের ঘরে থাকতে বললেন কিন্তু আমরা বললাম যে ছুটি ত ফুরিয়ে এল, এক-দিন একটু ঘুরে বেড়াই। বর্ষাতি আর টুপি পরে বেরিয়ে পড়লাম, রোদে-জলে ঘুরে আমাদের খুব অভ্যাস আছে। অসুখ-বিসুখ হয় না। আর মেঘলা দিনে ঘরে বসে করবই বা কি?

সোজাসুজি টুরিস্ট লজে গিয়ে ঝুলোগোঁফ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে ইংরেজিতে গল্প করলাম কিছুক্ষণ। কথায় কথায় ওকে জিজ্ঞেস করলাম সেই স্মাগলার সর্দার ধরা পড়েছে কিনা। সে জবাব দিল যে সে জানে না। আর তার জানবার কথাও নয়। তখনই কথা ঘুরিয়ে নিয়ে আমাদের জিজ্ঞেস করল আমরা ফিরব কবে।

এবারে কালু সেই মোড়ের দোকানে গিয়ে এক কিলো সোনালী আপেল কিনতে চাইল। ছোকরাটি যখন আপেল ওজন করে ঠোঙায় ভরছিল তখন কালু দোকানদারের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। কথায় কথায় তাকেও সেই চোরা চালানকারীর কথা জিজ্ঞেস করল।

দোকানী বলল, 'পুলিশ যেমন বুদ্ধু, সে লোক কি আর এখনও মানালীতে বসে আছে? নিশ্চয় ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে।' অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু আমরা তার কান দেখতে পেলাম না। বৃষ্টি নামতেই সে আরো ভালো করে মাফলার জড়িয়েছিল।

এরপরে আমরা মোড়ের যে বাড়িটা থেকে এই বুড়ো বেরিয়েছিল, সেই বাড়িতে হানা দিলাম। বুড়ো বেরিয়ে এল, এখন আর মাঙ্কি ক্যাপ নেই, কিন্তু কান মাথা ঢেকে একটা আলোয়ান জড়িয়ে রেখেছে।

মালু গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে এত চেনা-চেনা লাগে কেন? তুমি কি কলকাতায় থাক?' বুড়ো জবাব দিল যে সে দু'চার বছর আগে কলকাতায় কিছুদিন ছিল কিন্তু আমাদের কাউকে দেখেছে বলে মনে করতে পারছে না।

'তবে বোধহয় আমরাই আর কারো সঙ্গে ভুল করছি।' বলে কালু সে প্রসঙ্গ শেষ করে দিল।

বিকেল হতে না হতেই রীতিমতন অন্ধকার নেমে এল। গোটা চারেকের সময় টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হল। বাড়ি ফিরব ফিরব ভেবেও শেষ পর্যন্ত আমরা চুপিচুপি চাপদাড়ির বাংলো পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম, দরজার কাছে পৌঁছবার আগেই ভিতর থেকে প্রচণ্ড ঝগড়াঝাটির শব্দে থমকে গেলাম। হেঁড়ে গলায় কে যেন কাকে বেজায় গালাগালি দিচ্ছে আর বিশ্রী ফ্যাঁসফেসে গলায় ততোধিক গাল দিচ্ছে দ্বিতীয় পক্ষ। ঐ ফ্যাঁসফেসে গলাটা কি চাপদাড়ির? চেঁচাতে চেঁচাতে গলা ভেঙ্গে গেছে? অন্যটা তবে কার গলার আওয়াজ? আমরা ওদের বাড়ির ঠিক সামনে কয়েকটা গাছের পিছনে দাঁড়িয়ে শুনতে

চেষ্টা করলাম কিন্তু বিশ্রী সব গালাগাল ছাড়া কোনো পক্ষের একটা কথাও বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ দড়াম করে দরজা খুলে চাপদাড়ি বেরিয়ে এল, বাইরে এসেও ঘরের ভেতরের লোকটির উদ্দেশে ভাঙাগলায় গোটাকতক খারাপ কথা বলল, তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে, পাগলের মতন হন্তদন্ত হয়ে উত্তরমুখো রওনা দিল। এমনি তার বিভ্রান্ত অবস্থা যে, আমরা সামনেই যদি দাঁড়িয়ে থাকতাম তাহলেও হয়ত আমাদের দেখতে পেত না!

এতক্ষণ বুড়িটার কোনো সাড়াশব্দ পাইনি, হয়ত এদের কাণ্ডকারখানা দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিল। এবারে সে তার মার্কামারা ক্যানকেনে গলায় কি সব বলতে লাগল, কথা বুঝলাম না, কিন্তু হেঁড়ে গলার পক্ষ থেকে আর কোনো উত্তর এল না।

একটু পরে বুড়িও বকবক করতে করতে ঘর থেকে বেরোল, তালিমারা ছাতা খুলে মাথায় দিল, তারপরে ঘরে তালা লাগিয়ে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রওনা দিল।

আমরা স্তম্ভিত হয়ে ঝোপের আড়ালেই দাঁড়িয়ে রইলাম, বুড়ি অনেক দূর চলে যাবার আগে টুঁ-শব্দটি করতে সাহস পেলাম না। মালু ফিসফিস করে বলল, 'ঐ হেঁড়েগলা তৃতীয় লোকটিকে কি ওরা ঘরের মধ্যেই তালাবন্ধ করে রেখে বেরিয়ে গেল? এ ত বড় রহস্যময় ব্যাপার!'

কালুর চোখ দুটো চকচক করছিল, সে ফিসফিস করে বলল, 'রহস্যময় ব্যাপারও হতে পারে আবার এর মধ্যেই সব রহস্যের সমাধান থাকতে পারে।'

আমিও চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলাম, 'তার মানে তোরা মনে করছিস যে সেই তর্জন-গর্জনকে ওরা নিজেদের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছে?'

মালু বলল, 'নিশ্চয়, শুনলি না কি রকম গর্জন করছিল লোকটা?'

কালু বলল, 'নিশ্চিত কিছু বলা যায় না, কিন্তু এরকম একটা সম্ভাবনা আছে, সেটা ত স্বীকার করবি?'

www.BanglaBook.org

'তুই কি বলতে চাচ্ছিস যে ওরা সেই সর্দারকে বন্দী করে রেখেছে?'

'বন্দী করে রেখেছে নাকি সে স্বেচ্ছায় লুকিয়ে আছে? ঘরের ভেতর একটা জলজ্যান্ত লোককে রেখে ওরা বাইরের দরজায় তালা মেরে বেরিয়ে গেল কেন? এই ব্যাপারের শেষ পর্যন্ত না দেখে আমি আজ এখান থেকে নড়ছি না। এমন সুযোগ আর পাব না। তার জন্য যদি রাত হয়ে যায়, বাড়ি ফিরে বকুনি খেতে হয়, তাও স্বীকার।'

দারুণ ভয় পেয়ে বুলু বলে উঠল, 'ওরে, না-না-না-না—ওদের ঘরে সেই পাঁচু মিঞা না ঝাঁটু মিঞা রয়েছে মনে হচ্ছে—আমাদের মোটেই যাওয়া উচিত হবে না ওদিকে। তার চেয়ে চল টুরিস্ট লজে গিয়ে, দিদিদের বলি, পুলিশে খবর দিই।'

'আর ততক্ষণে যে পাখি উড়ে পালাবে? সে হচ্ছে না—তোর ভয় হয়, তুই বাড়ি যা, আমি যাচ্ছি না।'

আমি বললাম, 'তাছাড়া সেই গর্জন সিংই যে সত্যিই ওখানে আছে তার ত কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও পাইনি আমরা। হেঁড়েগলা যদি চাপদাড়ির ভাই-টাই হয়ে থাকে, ঝগড়াটা যদি ঘরোয়া হয়, পুলিশ ডেকে কিরকম বোকা বনে যাব বল দেখি?'

মালু সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ভয় পাচ্ছিস কেন রে? ঘরের মধ্যে আলো রয়েছে। বাইরের অন্ধকার থেকে আমরা যদি উঁকি মেরে দেখি, ভেতরের লোক আমাদের দেখতেই পাবে না'—কালু বলল, 'আগে দেখি হেঁড়েগলা লোকটা সত্যিই সেই তর্জন-গর্জন হয়ে থাকা সম্ভব কিনা। যদি হয়ে থাকে, তখন না হয় মালু আর আমি এখানে পাহারায় থাকব, আর তুই আর বুলু দৌড়ে গিয়ে টুরিস্ট লজ থেকে পুলিশে খবর দিবি।'

মনে খুব বেশি ভরসা না পেলেও বুলুকে বাধ্য হয়েই কালু ও মালুর যুক্তি মেনে নিতে হল। আমারও যদিও ভয় করছিল কিন্তু কৌতূহল হচ্ছিল তার চেয়েও বেশি।

খুব সন্তর্পণে, পা টিপে-টিপে নিঃশব্দে আমরা বাইরের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কাঁচের জানলা দিয়ে উঁকি মারলাম কিন্তু ঘরে কাউকেই দেখতে পেলাম না! আগেই বলেছি যে এই বাংলোটা ছোট্ট, আর বেশ খোলামেলা। দুটি মাত্র ঘর। চারিদিকে অনেকগুলো কাঁচের শার্সি-দেওয়া জানলা, অবশ্য সবগুলোই ভিতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে বন্ধ। দুটো ঘরেই আলো ছিল, একে একে আমরা বিভিন্ন জানলা দিয়ে উঁকি মারলাম, কিন্তু কোনো ঘরেই কাউকে দেখলাম না!

তাজ্জব ব্যাপার! মাত্র কয়েক মিনিট আগেই যে লোকটা হেঁড়ে গলায় চেঁচাচ্ছিল, সে কি ভোজবাজির মতন উপে গেল? সামনের ঘরে একটা খাটে বিছানা পাতা, একটা স্যুটকেস খোলা পড়ে আছে। খাটে আলনায়, কাপড়চোপড় এলোমেলো, ঠিক যেন তাড়াহুড়ো করে কেউ কিছু খুঁজছে। অবশ্য কোনে একটা বড় আলমারি আছে। তার ভেতর একটা পাঁচফুট-দু'ইঞ্চি লম্বা লোক অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে। খাটের তলাটাও দেখা যাচ্ছে না, কারণ বড় বেডকভার একেবারে মাটি পর্যন্ত ঝুলে রয়েছে। কিন্তু আলমারির ভেতর বা খাটের তলায় মানুষ কতক্ষণ লুকিয়ে বসে থাকবে? সে ত আর জানে না যে আমরা দেখছি।

পিছনের ঘরে একটা দড়ির খাটিয়ায় বিছানাপত্র তালগোল পাকানো। তোলা উনুন, সামান্য বাসনপত্র, কোনে মেঝের ওপরেই ফল, আনাজ, একটা টিফিন ক্যারিয়ার, জলের কুঁজো এইসব সংসারের জিনিসপত্র এলোমেলো পড়ে আছে, কোথাও কোনো গোছ নেই। ছোট একটা টেবিলে বসে বোধ হয় ওরা খেয়েছিল—দুটো ডিশ, তিনটে প্লেট এঁটো পড়ে আছে, দুটো পেয়ালা আর একটা গ্লাস—একজন কেউ বোধহয় গ্লাসে চা খেয়েছিল।

আসল প্রশ্ন হল, তৃতীয় ব্যক্তিটি গেল কোথায়? এ জানলা, ও জানলা দিয়ে গোটা বাড়ি ঘুরে দেখলাম এক কোনে একটা ছোট্ট বাথরুম, তার ভিতর পর্যন্ত উঁকি মারলাম—কোনো জনমানুষের চিহ্ন দেখতে পেলাম না, ব্যাপার কি?

মালু ফিসফিস করে বলল, 'নিশ্চয় এই ঘরের তলায় আর একটা ঘর আছে—সেখানেই লুকিয়ে থাকে লোকটা।'

আমি বললাম, 'তাহলে ত নিশ্চয় ঘরের মধ্যেই একটা ট্র্যাপডোর আছে, যেটা খুলে তলার ঘরে নামা যায়।'

যদিও আমরা কোনো ট্র্যাপডোর দেখতে পাচ্ছিলাম না, মেঝের তক্তাগুলো বেশ আলগাভাবেই বসানো মনে হল, তার মধ্যে একটা গোপন দরজা থাকা অসম্ভব নয়। কিংবা হয়ত ইচ্ছে করেই সেটা খাটের বা টেবিলের তলায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

বাংলোর পিছনে একটা বারান্দায় অনেক জ্বালানি কাঠ ডাঁই করে রাখা ছিল। কালু দেখাল যে কাঠগুলোর পিছনের জানলার একটা কাঁচ ভাঙা, বলল—'ওখান দিয়ে হাত ঢুকিয়ে আমি নিশ্চয় জানলার ছিটকিনি খুলতে পারব। বেশ বুঝতে পারছি ঐ খাটের তলাতেই ট্র্যাপডোর লুকনো আছে।'

এবারে বুলু ভয় পেয়ে গেল, বলল, 'ওরে, অতটা ঝুঁকি নিস না, ওদের ঘাঁটিতে হানা দিতে গেলে কি ওরাই ছেড়ে কথা বলবে?'

'তুই থাম ত, দুজন ত বেরিয়ে গেল, এখন কেবল একটা লোকই লুকিয়ে আছে।'

কালু ভাঙা কাঁচের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ছিটকিনিটা খুলে ফেলল। সবে জানলার পাটটা খুলবে, এমন সময়ে একটা মৃদু শব্দ শুনে আমরা কাঠের গাদার আড়ালে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

সামনের দরজাটা খুলল বলে মনে হল, কেউ বোধহয় সামনের ঘরে ঢুকল। কিন্তু সে ওরকম চোরের মতন চুপি-চুপি আসছে কেন? এবারে নিজে ধীরে দুই ঘরের মাঝের দরজা দিয়ে সে পা টিপে-টিপে ঢুকল—আমরা অবাক হয়ে দেখলাম যে চাপদাড়ি অথবা কালো বুড়ি নয়—সে আমাদের পূর্বপরিচিত ঝুলোগোঁফ সাহেব! চোরের মতন নিঃশব্দে এসে আশ্চর্য কিছুতার সঙ্গে সে কি যেন খুঁজতে লাগল! খাটিয়া সরিয়ে আলমারি খুলে, কাপড় ঘেঁটে কি খুঁজছে সে? এরাই কি ভুলে ওর ঘর থেকে কিছু চুরি করে এনেছিল, এখন সে তাড়াহুড়ো করে সেটা ফিরিয়ে নিতে চায়? এখন আমাদের মতন সেও কি সন্দেহ করছে যে এখানে একটা লুকোন 'সেলার' বা মাটির নিচে ঘর আছে, তারই 'দরজা' খুঁজছে? খাটের তলায় বা সুটকেসের তলায় কি ট্র্যাপডোর লুকনো রয়েছে সত্যি? উত্তেজিত হয়ে পড়লাম।

ঝুলোগোঁফের অনুসন্ধান-পর্ব শেষ হবার আগেই দরজায় মৃদু খুট খুট শব্দ শোনা গেল। দারুণ ভয় পেয়ে সে তাড়াতাড়ি পালাতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার আগেই সেই কালো বুড়ি এসে ঘরে ঢুকল।

www.BanglaBook.org

এর পরে যা ঘটল তাতে আমরা আরো আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ঝুলোগোঁফকে দেখে ভয় পাওয়া বা অবাক হওয়া দূরের কথা, নিঃশব্দে, হিংস্রভাবে বুড়ি তাকে আক্রমণ করল। সাংঘাতিক ধস্তাধস্তি চলল দুজনের মধ্যে, একবার এ ওর ঘাড়ে চড়ে বসে, একবার ও এর ঘাড়ে। আমরা যেন গ্যালারি সীটে বসে দুই কুস্তিগিরের লড়াই দেখছি! আর অবাক হয়ে ভাবছি, কতখানি মরিয়া হলে তবে একটা বুড়ি ওরকম জোয়ান লোককে কাবু করে ফেলতে পারে! হ্যাঁ—শেষ পর্যন্ত বুড়িই কাবু করে ফেলল ঝুলোগোঁফকে! আঁচড়ে কামড়ে, কিলঘুষি মেরে নাস্তানাবুদ করে, তাকে একেবারে উপুড় করে ফেলে ঘাড়ে চেপে বসল। তারপর শক্ত দড়ি দিয়ে তার হাত-পা বেঁধে, মুখে রুমাল গুঁজে বেঁধে ফেলল, তার আর নড়বার চড়বার কি টুঁ শব্দটি করবার শক্তি রইল না। বুড়ির মুখেও কথা নেই।

তখনও আমরা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সেই নাটক দেখছি, আমাদেরও যেন হাত-পা নাড়বার বা শব্দ করবার শক্তি নেই। কিন্তু আরো বড় নাটক যে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে সেটা তখনও বুঝিনি!

ঝুলোগোঁফ সাহেবকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিতে না দিতে আবার সামনের ঘর থেকে মৃদু খুটখাট শোনা গেল। হিংস্র বাঘিনীর মতন বুড়ির চোখ দুটো জ্বলতে লাগল, ঠিক বাঘিনীরই মতন সে খাপ পেতে আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। সামনের ঘর থেকে যখন পা টিপে টিপে সেই বেঁটে মোটা বুড়োটা ঢুকল, মুহূর্তের মধ্যে বুড়ি বাঘিনীর মতনই তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। এবারে ধস্তাধস্তিটা হল আরো প্রচণ্ড, ঠিক যেন গজ-কচ্ছপের যুদ্ধের মতন। নিজের চোখে না দেখলে আমরা বিশ্বাসই করতে পারতাম না যে পাকা-চুলো দুই বুড়োবুড়ি এমন সাংঘাতিক কুস্তি লড়তে পারে! কেউ কারো চেয়ে কম যায় না। বুড়ি বুড়োর গালে দারুন ভাবে আঁচড়ে দিল আর বুড়ো বুড়ির হাতে কামড়ে রক্ত বার করে দিল। এর পরে যখন দুজনে পরস্পরের চুল খিমচে ধরল, তখন দুজনের মাথার পাকা পরচুলা খসে গিয়ে ছোট করে ছাঁটা কালো চুল বেরিয়ে পড়ল। বুড়োর কোট ছিঁড়ে ফালাফালা আর 'বুড়ির' ঘাগরা উড়ে গিয়ে হাফপ্যাণ্ট বেরিয়ে পড়েছে! অবাক হয়ে দেখলাম দুটি বেঁটে, ষণ্ডা লোক পরস্পরের সঙ্গে কুস্তি লড়ছে। এদেরই মধ্যে একজন কি গর্জন সিং? কিন্তু, কোনজন? আর, তাই যদি হয়, তাহলে সেই হেঁড়েগলা লোকটা কে? সে গেলই বা কোথায়? এত কাণ্ডের পরও কি সে কোন গুপ্তঘরে বসে আছে লুকিয়ে? না কি কোনো গুপ্ত পথ দিয়ে পালিয়ে গেছে?

শেষ পর্যন্ত 'বুড়ির'ই জয় হল। অনেক কষ্টে সে বুড়োকেও মাটিতে ফেলে তারও হাত, পা মুখ বেঁধে ফেলল। নিজেও সে তখন বেশ কাবু হয়ে পড়েছে, এত শীতের মধ্যেও দরদর করে ঘামছে, বুড়োর কামড়ে তার হাত কেটে রক্ত ঝরছে! এক মুহূর্তের জন্য সে ধপ করে খাটিয়ায় বসে পড়ল, একটা তোয়ালে তুলে নিয়ে মুখের ঘাম মুছে ফেলল, আর তখনই আমরা দেখলাম যে তার ডান কানের অর্ধেকটা কাটা!

দারুণ চমকে আমরা আর একটু হলেই শব্দ করে ফেলতাম—এই-ই তাহলে গর্জন সিং? কি আশ্চর্য—এই সম্ভাবনাটা ত একবারও আমাদের মাথায় আসেনি। বুড়ির দিকে ভাল করে তাকিয়েও দেখিনি।

পরমুহূর্তেই গর্জন সিং হাঁফাতে হাঁফাতে পাশের ঘরে চলে গেল, মাঝের দরজাটা ভেজিয়ে দিল। মালু চুপি চুপি গিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে এসে জানাল যে 'বুড়ি' ওরফে গর্জন সিং ব্যস্তভাবে সুটকেস গুছোচ্ছে। ততক্ষণে কালু জানলা খুলে পিছনের ঘরে ঢুকে মাঝের দরজার খিল তুলে দিয়েছে আর আমরা তিনজনেও এক এক করে ঢুকে পড়েছি। আমাদের ঝোলার মধ্যে নানারকম দরকারি জিনিস সব সময়ে মজুত থাকে। তাড়াতাড়ি ছুরি, কাঁচি, যে যা হাতে পেলাম, নিয়ে চারজনে আট হাত লাগিয়ে ঝুলোগোঁফ আর বেঁটে 'বুড়োর' বাঁধন কেটে তাদের মুক্তি দিলাম। পরিষ্কার বাংলায় ঝুলোগোঁফ আমাদের তখনই দৌড়ে টুরিস্ট লজে গিয়ে ফোন করে পুলিশ ডাকতে বলল। কিন্তু এমন একটা নাটকের শেষ দৃশ্য পর্যন্ত না দেখে কি আমরা এক পা নড়ি? তাছাড়া এই উত্তেজনাপূর্ণ, রোমাঞ্চকর ঘটনায় আমাদেরও ত আরো সক্রিয় ভূমিকা নেবার দরকার হতে পারে। নিঃশব্দে সামনের ঘরে ঢুকে ঝুলোগোঁফ আর বেঁটে বুড়ো যখন এক-সঙ্গে গর্জন সিংকে দুদিক থেকে আক্রমণ করল, তখন সে বেশ বেকায়দায় পড়ল। তবু কি তাকে সহজে কাবু করা যায়? এরা দুজনে মিলে তাকে ধরে রাখতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেল। এবার ছুটে আমরা পাশের ঘর থেকে দড়িগুলো এনে দিলে তার হাত-পা শক্ত করে বেঁধে ফেলা হল। ক্যানকেনে বিকৃত গলা ছেড়ে এবার গর্জন সিং তার স্বাভাবিক হেঁড়ে গলায় যা গালা-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গালি দিতে লাগল, তেমন খারাপ খারাপ কথা আমার জীবনে কোনোদিন শুনিনি! তাড়াতাড়ি তার মুখটাও বেঁধে ফেলা হল, কেবল হিংস্র চোখ দুটো দিয়ে আগুন ছুটতে লাগল।

এর পরের ঘটনাগুলো সংক্ষিপ্ত, কিন্তু দারুণ চমকপ্রদ। মানালির পুলিশ ত তৈরিই ছিল, সুতরাং টুরিস্ট লজ থেকে ফোন করে দেবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা এসে হাজির হল। দেখতে দেখতে গর্জন সিং, তার সহকারী চাপদাড়ি 'সিং-জী' আর আপেলের দোকানের দোকানী—সবাই গ্রেপ্তার হল।

এত কান্ড ঘটে গেল, তখনও কিন্তু বেশি দেরি হয়নি, সবে মাত্র সন্ধ্যা ছটা! তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে মায়েদের সংক্ষিপ্তভাবে সব বলতেই তাঁরাও আমাদের সঙ্গে টুরিস্ট লজে চলে এলেন। সেখানে দেখি রীতিমত উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। ঝুলে গোঁফ আর বেঁটে বুড়োর সঙ্গে ততক্ষণে আমাদের ভাল করে পরিচয় হয়েছে। জেনেছি যে তাঁরা বাঙালীই, নাম যথাক্রমে তারাপদ ব্যানার্জি আর ঘনশ্যাম মিত্র, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের বড় অফিসার, ছদ্মবেশে টুরিস্ট সেজে এসেছিলেন মানালির পুলিশ বিভাগকে সাহায্য করতে। চাপদাড়ি আর আপেলের দোকানের দোকানীকে তাঁরাও সন্দেহ করেছিলেন, কিন্তু প্রমাণ না পেয়ে, কেবল নজর রাখছিলেন। বুড়িকে কিন্তু তাঁদেরও সন্দেহ হয়নি!

ইতিমধ্যে আমরা এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি দেখে তাঁরাই আমাদের সাংকেতিক চিঠি লিখে সাবধান করে দিয়েছিলেন—সেটা অবশ্য আমরাও অনুমান করেছিলাম—কিন্তু আমরা যে উল্টে তাঁদেরই গর্জন সিং ও তার সহকারী ভেবেছি, সে কথা জেনে তাঁদের সে কি হাসি! কালু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'বাঃ, প্রথমে ত সকলকেই সন্দেহ করতে হবে, যতক্ষণ না প্রমাণ পাচ্ছি, কে সত্যি দোষী!' তাঁরা এ-কথায় সায় দিলেন।

'সাবাস গোয়েন্দা', বলে ওঁরা আমাদের সঙ্গে শেকহ্যান্ড করলেন। ইতিমধ্যে পুলিশ আপেলের গুদামে লুকোন হিড়িম্বাদেবীকে আর আরো অনেক দেবিমূর্তি, প্রাচীন পুঁথি ও নানারকম সুন্দর সুন্দর প্রাচীন জিনিস উদ্ধার করে ফেলল। গর্জন সিং-এর দল নিশ্চয় আশা করেছিল যে দিনকতক পরে পুলিশের তৎপরতা কমে যাবে, তখন তারা সুযোগ বুঝে সব কিছু পাচার করবে।

হিড়িম্বাদেবীর রহস্যের ত সমাধান হল, সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক রহস্যের। তারাপদবাবু আর ঘনশ্যামবাবু বললেন রিপোর্ট দেবার সময়ে তাঁরা জানিয়ে দেবেন যে চারটি খুদে গোয়েন্দার সাহায্য না পেলে এসব কিছুই ঘটতে পারত না, বরঞ্চ তাঁদেরই বন্দী করে রেখে দলের পান্ডারা পালিয়ে যেত।

১৩৮৬

কাক্কোকিল

প্রণব মুখোপাধ্যায়

কাক—

এই তো ভোরে ডিম পেড়েছি দুই দুগুণে চার
কোত্থেকে ফের জুটল এসে বাড়তি দুটি আর?
হিসাব মতে লাভটি বিনা ক্ষতি তো নেই মোটে
চারের ওপর এমনি যদি বাড়তি দুটি জোটে।
জুটল এসে কোন যাদুতে? নাই বা হল জানা—
চারের ওপর বাড়তি দুটি মিলবে আমার ছানা।

কোকিল—

কাকের বাসায় কেমন করে
ডিম ক'খানা এলাম পেড়ে
বেশী তো নয়, দুটি
চারটি ডিমের সঙ্গে ক্রমে
আমার বিনা পরিশ্রমে
ফুটবে তারা ফুটি।
কাকের ছানার সঙ্গে জুটে
খাবার খাবে দিব্যি খুঁটে
হলেই বড়োসড়ো
বাচ্চা দুটি উড়িয়ে নিয়ে
কাকের মাকে বক দেখিয়ে
দিব্যি কেটে পড়ো!

www.BanglaBook.org

কাক—

তা দিয়ে বেশ ফুটিয়েছি তো আমার ছানাগুলো,
খাবার তরে চেঁচিয়ে মরে, আচ্ছা বটে নুলো!
বাড়তি ডিমের ছানা দুটোর চেল্লানীটা বেশি
সবার আগেই খাবারটুকু ফেলছে করে শেষই!
যেই হয়েছি চোখের আড়াল করতে খাবার চুরি
কোকিল কেন বাসার ধারে করছে ঘোরাঘুরি?

কোকিল—

আর দেরি নয় আয় না চলে
মায়ের ছানা মায়ের কোলে
কেউ পাবে না টের,
ছোট্ট ডানা ঝট্‌পটিয়ে
নিমডালেতে বোস না গিয়ে
বয়স হল ঢের!

কাক—

কাণ্ড একি, ছানা দেখি রইল মোটে চার
বাড়তি ডিমের বাচ্চাদুটো কোথায় পগারপার?

কোকিল—

দোহাই বাপু, যেও না চটে
কাকের ডিমে কোকিল ফোটে
আচ্ছা বটে গেরো,
বাচ্চা নিয়ে পড়ছি সরে
এবার থেকে হিসেব করে
ডিম ক'খানা পেড়ো।

কাক—

ডিম ফুটিয়ে বেজায় ঠকান্ ঠকেই গেলাম ছি-ছি
কোকিল ছানার পিছেই খেটে মলাম মিছামিছি।
পক্ষীকুলে বংশ বায়স আমরা চালাক বটে,
জানত কেবা কোকিল এমন বুদ্ধি ধরে ঘটে?

১৩৮৩

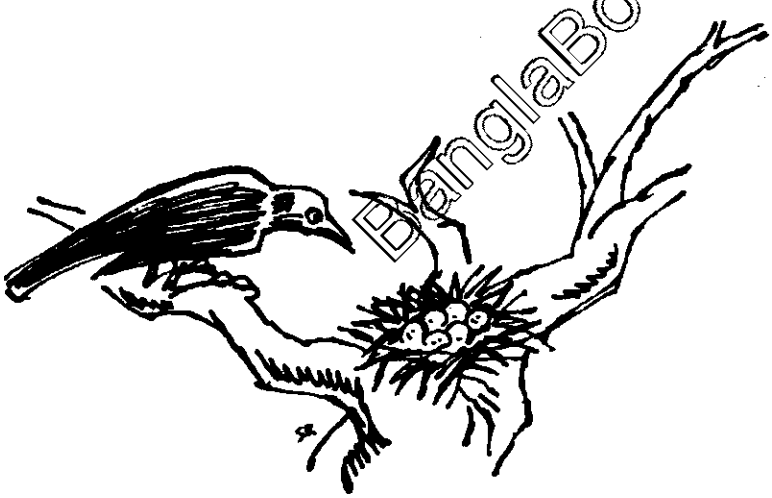

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রতন

বাণী রায়

আমাদের প্রতিবেশী রতন। বয়স বছর দশের বেশী নয়, কিন্তু তার শয়তানী বুদ্ধি একশো বছর বয়সের মানুষের মত। আমাদের বড় রাস্তা থেকে পাশেই একটা গলি গেছে ছোটো-খাটো। সেখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটা ফ্ল্যাটে থাকে রতন মা-বাবার সঙ্গে। রতনের মাসী মালবিকা আবার আমার বন্ধু। আমাদের রাস্তায়ই একটু দূর গেলে উল্টোদিকে থাকেন। কাছা-কাছি সব বাড়ি, আমি তাই রতনকে চিনতাম। এক একটি দুষ্টুমির গল্প ওর রত্নের মালা গাঁথা হয়েছে যেন, কিন্তু দাগে ধরা। রত্ন হচ্ছে রতন।

আমাদের বাচ্চা কৌশিক সোনা রতনের চেয়ে অনেক ছোট। আমার ওপরে সর্বদা আব্দার তার খাটায় সে। কাজেই তাকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া, জিনিসপত্র কিনে দেওয়া হরদম লেগে আছে।

একদিন আমি কলেজ স্ট্রীট থেকে ফিরছি। বাস থেকে নামা মাত্র দেখলাম ওদের গলির মোড়ে রতন দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে সে বলল, 'একা একা কোথায় গিয়েছিলে? ওকে নিয়ে যাওনি?'

কৌশিকের নাম রতন কেন জানি না পারতপক্ষে নিত না, 'ও' বলেই উল্লেখ করে থাকত।

আমি বললাম, 'আমি কাজে গিয়েছিলাম, লেকে বেড়াতে যাইনি তো—কৌশিককে নেব কেন?'

আমি চলে আসছিলাম, কিন্তু রতন রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে বলল, 'রোজ রোজ ওকে নিয়ে বেড়াতে যাও কেন? আমাকে নিয়ে চল না!'

আমি কি ভাবে রতনের অনুরোধ এড়াব স্থির করবার পূর্বেই রতন গলার সুরটা আবদারে ও কাঁদুনে করে বলল, 'আমাকে কেউ কোথাও নিয়ে যায় না। উঃ, কতদিন লেক দেখি না!'

আমার মনে দয়া হল। রতনের বাবার গাড়ী আছে, কিন্তু বাচ্চাটা বেড়াতে পায় না, এ কি রকম?

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। আমি কাল তোমাকে লেকে বেড়াতে নিয়ে যাব।'

বাড়ি ফিরে কৌশিক সোনাকে বললাম, 'কাল রতনকে নিয়ে, তোমাকে নিয়ে লেকে বেড়াতে যাব।'

কৌশিক সোনা সতেজে বলল, 'মোটেই না। আমি ওই দুষ্টু ছেলের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাব না।'

অনেক সাধাসাধি করলেও সে রাজী হল না।

পরের দিন একাই রতনকে ডাকলাম বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে। বেচারী রতনের জন্য মনে কষ্ট হচ্ছিল। বেড়ানোর নামে পাগল, কৌশিকসোনা পর্যন্ত ওর সঙ্গে যেতে রাজী হল না। কি করবে রতন? দুষ্টু বলে কি বেড়াতে নিয়ে গেলে খারাপ কিছু করবে? আর এইটুকু যাওয়া মাত্র। আমি কি ওকে পৃথিবী পর্যটনে নিয়ে যাচ্ছি?

ডাক দেওয়া মাত্র ছুটে বেরিয়ে এল রতন। বেশ সাজগোজ করা, মুখচোখ ঘষেমেজে ধোয়া দেখে ভাল লাগল। একটা সুযোগ পাওয়া মাত্র খানিকটা ভদ্র হয়ে উঠেছে রতন।

রতন অভ্যাসমত কৌশিকের কথা জিজ্ঞেস করল, 'ও এল না?'

'না, রতন। চল তাড়াতাড়ি তোমাকে বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে আমি আবার মিটিং-এ যাব।'

অমনি রতন গলা দিয়ে একটা করুণ সুর বার করে একঘেয়ে ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ সুরে বলতে শুরু করল, 'ওকে নিয়ে বেড়াতে গেলে তুমি তো এমন কর না। সারাদিন ওকে নিয়ে বেড়াও। আমার বেলা কেন একটুক্ষণ? কেউ আমাকে নিয়ে বেড়াতে যায় না।'

আমি অতিষ্ঠ হয়ে বললাম, 'আচ্ছা রতন, আচ্ছা, তোমার যতক্ষণ ইচ্ছা আমরা বেড়াব।'

রতন উৎসাহিত হয়ে আমার হাত ধরে ঝুলে পড়ল। আমি উল্টে যাই আর কি!

একটু পরে দেখলাম রতন খোঁড়াচ্ছে। 'কি হল, রতন?'

'আমার জুতোটা ছিঁড়ে গেছে।'

'সর্বনাশ! চল, বাড়ি থেকে বদলে নিয়ে আসি।'

'বাড়ি থেকে অনেকদূর এসেছি। এতটা পথ আর হেঁটে ফিরতে পারব না। তা ছাড়া, আমার আর জুতো নেই। এই ছেঁড়া একটাই মাত্র।'

বলে কি রতন? এমনি ছেঁড়া একটা জুতো একমাত্র ছেলেকে পরায় ওর মা? নিজে ত দিব্যি ফ্যাসনেবল। রতন চট করে বলে বসল, 'আমাকে একটা জুতো কিনে দাও না তুমি। কেউ আমাকে কিছু কিনে দেয় না। ওকে কত জিনিস দাও তুমি।'

আমি তখন হতবাক্। রতনের বাবার প্রচুর রোজগার, রতনের মায়ের বুদ্ধি আছে। কিন্তু একি কাণ্ড? জামাকাপড় ভালই ত পরিয়েছেন, তবে জুতোর এমন ছিরি! হাঁ হয়ে আছে সুক-তলা, সেলাই খুলেছে, রং কালি করা বহুদিন হয় না। সত্যিই ত এমন একটা জুতো পরে ছেলেটা হাঁটবে কেমন করে? আমাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে রতন আবার সেই খ্যান্‌খেনে কাঁদুনে সুরে ঘ্যাঙানি শুরু করল, 'দাও না! আমাকে কেউ কিছু দেয় না, তুমিও কখনও কিছু দাওনি।'

ভাবলাম, না হয় আমিই একজোড়া জুতো কিনে দিই, প্রতিবেশীর ছেলে ত।

কিন্তু জুতোর দোকানে ওকে নেব কেমন করে? বেচারী

www.BanglaBook.org

যে হাঁটতেই পারছি না।

রতন আমার ভাব বুঝে তৎক্ষণাৎ একটা খালি ট্যাক্সি ডেকে ফেলল। উঠে বসে ডাকল, 'মাসী, এসো।'

অগত্যা আমি রতনের সঙ্গে এক বর্ধিষ্ণু জুতোর দোকানে ট্যাক্সি চেপে হাজির হলাম।

কিন্তু রতনের জুতো পছন্দ করাতে হয়রান হয়ে গেলাম আমি। যে জুতো দেখায় সেটাই রতনের অপছন্দ। কালো দেখালে সাদা আনতে বলে, সাদা আনলে লাল চেয়ে বসে। উঁচু র‍্যাক্ দেখিয়ে বলল, 'ওখান থেকে নিয়ে আসুন।'

অবশেষে দোকানের সেলস্‌ম্যান হাল ছেড়ে দিয়ে গালে হাত রেখে একদৃষ্টে রতনের দিকে চেয়ে রইল। আমি বললাম, 'যা হয় একটা বেছে নাও, রতন। আর সময় নেই।'

তখন রতন বলা বাহুল্য সব চেয়ে দামী জুতোটি বাছল। ব্যাগ ঝেড়ে দাম দিলাম।

বড় রাস্তায় জুতোর দোকান। বার হয়েই রতন উল্টোদিকের খাবারের দোকান দেখিয়ে বলল, 'আমাকে কিছু খাওয়াবে?'

'বাড়ি থেকে বিকেলের জলখাবার খেয়ে আসোনি?'

'না, মা আমাকে বিকেলে দেয় না কিছু।'

যত রতনের কথা শুনছি ততই ওর মা-বাবার ওপরে ঘেন্না ধরছে। বাবা দামী স্যুট পরে গাড়ী চালিয়ে ঘোরেন, মা পার্টি দেন হরদম। সমস্ত আড়ম্বর বাইরে নাকি? ছোট ছেলেটাকে বঞ্চিত করে?

আমি সহানুভূতির সঙ্গে রতনকে নিয়ে খাবারের দোকানে ঢুকি। সাধে ছেলেটা দুষ্টু হয়ে গেছে? ছোট ছেলে নিয়মিত খাবারটা পর্যন্ত পায় না।

রতনের খাবার বহর দেখে আমি স্তম্ভিত। এইটুকু ছেলে এত খেতে পারে? আহা, বেচারীর কত না ক্ষিধে পেয়েছিল! বাড়ের সময় না খাইয়ে রাখলে এমনটা হতে পারে বই কি।

আমি বাধা দিলাম না, প্রাণভরে খেয়ে নিক রতন। নানা মিষ্টির শেষে বড় বড় একটাকা সাইজের সন্দেশ গোটাচারেক খাবার পরে দোকানী বলল, 'দিদি, আর খাওয়াবেন না। অসুখ করে যাবে।'

আমি দাম মিটিয়ে কোনমতে ওকে বার করে আনতেই রতন বলে উঠল, 'এত খেয়েছি যে হাঁটতে পারছি না।'

'ঠিক পারবে, চল, চল, সন্ধ্যা হয়ে এল।'

রতনকে নিয়ে লেকে ঢুকলাম।

ঢালু জমিতে একটু বসে বললাম, 'দেখ রতন, কত হাঁস, মাছ।'

ততক্ষণে রতন হুড়মুড় করে খানিকটা জলে নেমে গেছে একটা হাঁসের পাখনা চেপে ধরে।

হাঁস ছাড়বে কেন?

রতনের আঙুলে ঠোকর দিয়ে চিরে দিল, রতন তারস্বরে কাঁদতে লাগল।

আমি শশব্যস্তে বলি, 'রতন, এতবড় ছেলে কাঁদে না, চল ডাক্তারখানায় গিয়ে বেঁধে আনি।'

রতন চোখ মুছে বলল, 'ট্যাক্সি ডাক।' আমার ব্যাগ ততক্ষণে হাল্কা। পরের ছেলের দায়িত্ব নিয়েছি, করি কি? একখানা রিক্সা ডেকে কাছেই চেনা ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে গেলাম।

ডাক্তারখানা থেকে বার হয়ে বললাম, 'রতন, চল এবার তোমাকে বাড়ি দিয়ে আসি। তোমার দুষ্টুমির জন্যে হাত খালি অনেক ত হল।'

রতন আবার কাঁদুনি শুরু করে, 'তুমিও আমাকে বকছ! কেউ আমাকে ভালবাসে না। সবাই কেবল আমাকে দিন-রাত বকে। আমাকে লিলিপুল দেখাও না! কোন দিন কেউ আমাকে লিলিপুল দেখায়নি।'

রতনের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে এতক্ষণে আমার সন্দেহ হচ্ছে। তবু এত কাছের লিলিপুলে বাচ্চাটাকে কেউ নিয়ে যায়নি শুনে বিরক্ত হয়ে ওকে নিয়ে চললাম।

লিলিপুলের ছোটখাটো জন্তুদের জন্য রতন আমাকে দিয়ে জোর করে কলা, চীনাবাদাম, ছোলা কেনাল।

কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম এত খাবার পরেও সেসব খাদ্য রতনের পেটেই যাচ্ছে।

হরিণগুলো রতনের হাতে খাবার দেখে ছুটে এসে তারের বেড়ার ধারে এসে গলা বাড়াল।

হি-হি করে হাসতে হাসতে কলার খোসাগুলো ওদের মুখে ধরল। তারা শিং নেড়ে চলে গেল। খরগোসের খাঁচায় রতন চীনাবাদামগুলো খেয়ে খোসার রাশ খরগোসকে দিল। এক খরগোস গলায় বাদামের খোসা ঠেকে যায় আর কি! গিনিপিগ-কে দিল সে এক টুকরো কাঠ কুড়িয়ে। গিনিপিগ একটু চিবিয়ে রাগ করে খাঁচার কোনে গিয়ে বসল।

আমি তখন পাগল হয়ে বেরিয়ে আসতে পারলে বাঁচি। বললাম, 'রতন, চল বাড়ি যাই।'

'না, না, আমি ময়ূর দেখব। কেউ আমাকে ময়ূর দেখায়নি কখনও। তুমি আমাকে খালি বাড়ি ফিরিয়ে নিতে চাইছ। ওকে ত কখনও বল না।'

আমি উত্তর দিলাম, 'কৌশিকসোনা কক্ষনও আমার কথা না শুনে চলে না।'

'তা বই কি। সেদিন তোমার বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম তুমি ওর হাত ধরে টানাটানি করছ। আর ও দাপাদাপি করছে। সেটা কি?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেদিন একটা আরশোলা দেখে কৌশিকসোনা ভয় পেয়েছিল। তাই ভয় ভাঙাতে নিচ্ছিলাম।'

রতন গাল ফুলিয়ে বলে, 'আমি ময়ূর দেখবই! আমি কেন কোনদিন ময়ূর দেখতে পাই নে?'

আমি ওর হাত এড়াতে তাড়াতাড়ি বিরাট ময়ূরটার খাঁচার দিকে নিয়ে গেলাম রতনকে। এটুকু আর বাদ রাখি কেন?

ময়ূর দেখতে দেখতে রতন আবদার ধরে বসল, 'আমি ওর ল্যাজের একটা পালক নেব।'

আমি ধমক দিলাম, 'কি যে বল? ময়ূরের পালক নেওয়া যায় নাকি!'

রতন চীৎকার করে বলল, 'হ্যাঁ যায়, যায়। আমাকে কেউ কখনও ময়ূরের পালক দেয়নি, আমি নেবই নেব। ও চাইলে তুমি দিব্যি দিতে। আমি বলে 'না' করছ।'

আমি বললাম, 'আঃ, রতন, কৌশিকসোনা কখনও ময়ূরের পালক চায় না। তুমি ভারী দুষ্টু ছেলে!'

অমনি রতনের শুরু হল অনুযোগ, 'তুমিও আমাকে বকছ, সবাই আমাকে বকে।'

লিলিপুলের এক দারোয়ান কাছে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। সে এগিয়ে এসে বলল, 'আমি একটা পালক দিচ্ছি খোকাবাবুকে।'

ব্যাগে অস্ত টাকা একটিও নেই। ঝেড়ে ঝুড়ে একটা আধুলি বার করে দারোয়ানকে দিলাম। পালক ছাড়া রতন একপাও নড়বে না।

দারোয়ান বললো, 'আপনারা চুপ করে সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকুন। কথাবার্তা বলবেন না কিন্তু। এই ছেয়েরংয়ের ময়ূরটা বেজায় শয়তান।'

তার দিয়ে অনেকটা জায়গা ঘিরে খাঁচার মত করা হয়েছে। মধ্যে ময়ূরটা আকাশের দিকে চেয়ে মেঘ জমেছে কিনা দেখছে উদাস ভাবে।

দরজা খুলে নিঃশব্দে পেছনের দিক দিয়ে দারোয়ান ঢুকল। এই ল্যাজে হাত দিয়েছে; তুলে নিল নাকি পালক?

হঠাৎ রতন বেজায় বিরাট হাততালি দিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল, 'হারে—রে—রে—রে—রে—রে—।'

সঙ্গে সঙ্গে ময়ূরটা বিষম চমকে তীব্র ক্যাঁ-ক্যাঁ ডাক ছেড়ে পেছনে দারোয়ানকে দেখে দিল বেজায় ঠোকর। মাংস উঠে গিয়ে ঝরঝর করে রক্ত ঝরতে লাগল।

'আরে বাপ', কাপড়ে হাত ঢেকে দারোয়ান বাইরে পালিয়ে এসে ঘাসের ওপর বসে পড়ল।

আমি লজ্জায়-ঘেন্নায় মরে গিয়ে বলি, 'আমার কাছে পয়সা নেই। তুমি ডাক্তারখানায় হাত দেখিয়ে যা লাগে আমার বাড়ি থেকে নিয়ো।'

দারোয়ান বলল, 'আমার কিছু লাগবে না। আপনি এনাকে নিয়ে বাড়ি চলে যান। বেশীক্ষণ এমন খোকা থাকলে জন্তুরা কেউ বাঁচবে না, আমরাও থাকব না।'

আমি আর কথা না বাড়িয়ে রতনকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে ওর বাড়ির দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম।

বাড়ির কাছে এসে রতন বলে, 'আমি একাই যাচ্ছি।'

'না, মায়ের হাতে তোমাকে দিয়ে তবে আমি যাব।' রতনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি জোর করেই বাড়ি ঢুকলাম। বসবার সুসজ্জিত ঘরে রতনের মা বসে রেডিও শুনছেন। আমার রাগ হল। ছেলে মন্দ সত্যি, কিন্তু জুতো কিনে না দেওয়া, জলখাবার না দেওয়া কেমন ধারা ব্যবহার? রুক্ষস্বরে বললাম, 'এই যে রতনকে দিয়ে গেলাম। রাত্রে কিছু আর খেতে দেবেন না!'

রতনের মা হাসিমুখে বলেন, 'খুব খাইয়েছেন বুঝি? আপনি খাবার নেমন্তন্ন করেছেন বিকেলে তাই রতন বাড়িতে জলখাবার খেল না। আমি দুধটা খেয়ে যেতে বলায় বলল, না, মাসী কিছুটি খেয়ে আসতে নিষেধ করেছেন। তাহলে খেতে পারব না।'

আমি রতনের মিথ্যা বলার বহর দেখে স্তম্ভিত। এখন রতনের মায়ের কথার প্রতিবাদ করে মুখের ওপর বলা যায় না যে তার ছেলেকে আমি নেমন্তন্ন করিনি। সুতরাং আমি কিছু না বলে শুধু বললাম, 'আমি যাই, একটু কাজ আছে।'

রতনের মা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'আচ্ছা, রতনকে এত খাওয়ালেন, এত বেড়িয়ে আনলেন, এবার আপনাকে একদিন আমার এখানে চা খেতে হবে। কিন্তু কৌশিকসোনা যায়নি সঙ্গে?'

আমি আমতা আমতা করে দায় সারা উত্তর দিয়ে বেরিয়ে আসব, হঠাৎ রতনের মায়ের চোখ ছেলের পায়ে ঝক্‌ঝকে নতুন জুতোর দিকে পড়ল, 'এ কী? রতনের নিজের জুতো কোথায় গেল?'

আমি বললাম, 'পথে জুতোটা ছিঁড়ে গেল, বেচারী হাঁটতে পারছিল না তাই—'

'ছিঁড়ে গেল! সে কী? ছেঁড়া জুতো জোড়া ঝি-এর ছেলেকে দেব বলে আলাদা রেখেছিলাম, সেটা পরে গেছিল বুঝি? জামাকাপড় পরিয়ে সবে টেলিফোন ধরতে গেছি অমনি ওই ফেলে দেওয়া জুতোজোড়া পরে বে'র হয়েছে নাকি? ছিঃ, ছিঃ, কী লজ্জার কথা। আপনি বা কী বলে আমোকা একজোড়া নূতন জুতো কিনলেন? বাড়ি থেকে জুতোটা বদলে নিলে—'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কী? ও যে বলল ওর আর জুতো নেই?'

'এই কথা বলেছে রতন? চার-চার জোড়া জুতো তোমার। আর তুমি মিথ্যে বলে আবার জুতো কেনালে ওঁকে দিয়ে? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।'

আমি বেগতিক দেখে সরে পড়লাম।

গল্পটা শুনে কৌশিকসোনা বলল, 'দেখলে, আমি কেন রতনের সঙ্গে যাইনি? তুমি বড় বোকা।'

কথাটা মেনে নিলাম।

১৩৮০

www.BanglaBook.org

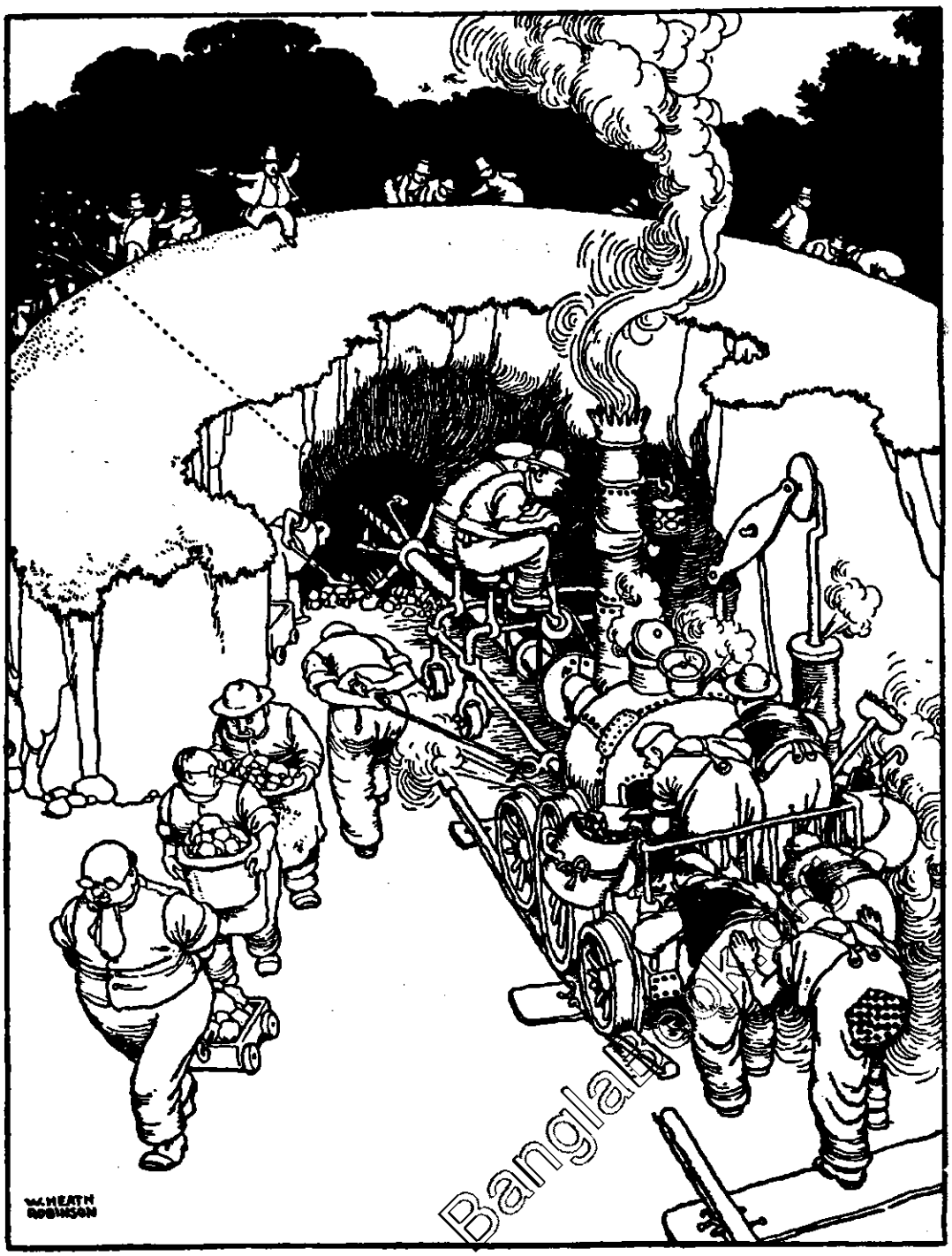

আজ বাদে কাল পাহাড় ফুঁড়ে চলবে রেলের গাড়ি,
টানেল খোঁড়ার উৎসাহে তাই বস্ত বাড়াবাড়ি।

www.BanglaBook.org

কং

সন্দীপ রায়

উচ্চতা—৫০ ফুট, মুখ (থুতনি থেকে কপাল)—৭ ফুট, নাক—২ ফুট, ঠোঁট—৬ ফুট, ভুরু—৪ ফুট ৩ ইঞ্চি, চোখ—১০ ইঞ্চি, কান—১ ফুট, ছাতি—৬০ ফুট, পা—১৫ ফুট, হাত—২৩ ফুট

উপরের এই চোখ ধাঁধানো মাপের তালিকাটি যাঁর, তিনি এখন 'হরর' বা আতঙ্ক চলচ্চিত্র ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিস্ময়—তাঁর নাম কিং কং।

বিশ দশকের কথা। ফ্লোরিডা-নিবাসী মেরিয়ান কোল্ডওয়েল কুপারের তখন তথ্যচিত্র পরিচালক হিসেবে অ্যামেরিকায় বেশ নামডাক। ১৯২৯-এ তাঁর ক্যামেরাম্যান আর্নেস্ট বি. গুডস্যাককে নিয়ে তিনি আফ্রিকা গেলেন জন্তুজানোয়ারদের কিছু ফিল্ম তোলার জন্য। তখনই সেখানকার গোরিলাদের স্বভাব সম্বন্ধে তিনি গভীরভাবে কৌতূহলী হয়ে পড়লেন—আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি উদ্ভট গল্পের নক্শা তাঁর মাথায় বাসা বাঁধতে শুরু করল। কাল্পনিক এক দ্বীপ থেকে একটি দৈত্যের আকারের গোরিলাকে নিউইয়র্ক শহরে এনে ফেলার চিন্তাটি আফ্রিকা থেকে ফিরে এসেই তিনি হলিউডের আর. কে. ও. ফিল্ম স্টুডিওর কর্তৃপক্ষদের জানালেন।

কুপার প্রথমে ভেবেছিলেন একটি জ্যান্ত স্বাভাবিক গোরিলাকে বিভিন্ন ভাবভঙ্গিতে তুলে তাকে ক্যামেরার কৌশলে বড় করে দেখানোর কথা। কিন্তু তা অসম্ভব, কারণ তাঁর গল্পের নক্শা অনুযায়ী সেই জন্তুটিকে দিয়ে রীতিমত প্রথম শ্রেণীর অভিনয় করাতে হবে—আর সেইরকম শিক্ষিত, বুদ্ধিমান গোরিলা পাওয়াও ত আর চাট্টিখানি কথা নয়! সুতরাং এইসব চিন্তায় সময় নষ্ট না করে কুপার সটান চলে গেলেন ক্যামেরা কারসাজির যাদুকর উইলিস হ্যারল্ড ওব্রায়নের কাছে। ওব্রায়ন তার বেশ কিছুদিন আগেই জ্যান্ত জানোয়ারের বদলে ক্ষুদ্রাকার মডেলের সাহায্যে ক্যামেরার কৌশলে তাদের বড় করে নড়িয়ে চড়িয়ে 'ক্রিয়েশন' বলে একটি ছবি করে খুব নাম কিনেছিলেন। ওব্রায়নকে এই গোরিলা গল্পের কাঠামো ভীষণভাবে আকর্ষণ করল। পরীক্ষার জন্য তিনি মোটামুটিভাবে গোটাকয়েক মডেল তৈরি করে কুপারের আদেশে বৃহৎকায় এই গোরিলাটির সঙ্গে একটি প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের যুদ্ধ এবং কিছু খুচরো দৃশ্যের ফিল্ম তুললেন!

ফলাফল দেখে আর. কে. ও'র অংশীদারেরা মহা খুশি। উপ-সভাপতি ডেভিড ও সেলজনিক তৎক্ষণাৎ ওব্রায়নকে কাজে লেগে যেতে বললেন, আর ছবিটি পরিচালনার ভার দিলেন কুপার ও তাঁর ক্যামেরাম্যান গুডস্যাকের উপর। ওদিকে আর. কে. ও. থেকে এই গোরিলাকে ঘিরে একটি চিত্রনাট্য লেখার জন্য তখনকার দিনের বিখ্যাত গোয়েন্দা লেখক এডগার ওয়ালেসকে আট সপ্তাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ করা হল। ওয়ালেস প্রথমে বেশ কিছু ভৌতিক এবং অলৌকিক ছবি দেখলেন। তারপর 'কিং এপ্' নাম দিয়ে একটি চিত্রনাট্যও শুরু করলেন। কিন্তু শেষ আর হল না। লেখার মাঝপথে তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। অবশেষে অনেক খেটেখুটে কুপারের সাহায্যে চিত্রনাট্য সমাপ্ত করলেন গুডস্যাকের স্ত্রী রুথ ও জেমস্ ক্রিলম্যান নামক এক লেখক। কুপার তাঁদের চিত্রনাট্যের নাম 'কি এপ্'-এর বদলে শুধু 'কং' রাখলেন। কিন্তু এ নামটাতেও অনেকের আপত্তি। সুতরাং ১৯৩২ সালের মে মাসে যখন শুটিং শুরু হল, তখন ছবির নাম গিয়ে দাঁড়ালো 'দ্য বীস্ট'।

গল্পের কাঠামো মোটামুটি এইঃ—কার্ল ডেনহাম ফিল্ম তোলার আশায় একটি ছোট্ট দল নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে 'স্কাল' নামক এক রহস্যপূর্ণ দ্বীপের দিকে যাত্রা করে। হিরোইন হবার আশায় অ্যান ড্যারো নামে এক যুবতীও তাদের এই যাত্রায় যোগ দেয়। স্কালে পৌঁছে তারা সেখানকার হিংস্র অধিবাসীদের হাতে গ্রেপ্তার হয়, আর তারাই স্থির করে যে অ্যানকে সে দ্বীপের দেবতা 'কং'-এর সঙ্গে বিয়ে দেবে। বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর রাতের অন্ধকারে হঠাৎ একটা গুরুগম্ভীর পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বনের গাছপালা দু'হাতে অক্লেশে সরিয়ে এক গায়ে-কাঁটা-দেওয়া হুঙ্কার ছেড়ে দানবীয় কং-এর আবির্ভাব। বন্দী অ্যান তার ভাবী স্বামীর এই ভয়ানক চেহারা দেখে আতঙ্কে চীৎকার করে ওঠে। হিংস্র 'কং' কিছুটা মোলায়েম হয়। বোধ হয় এই অতি ক্ষুদ্র মহিলাটিকে তার একটু ভালোও লেগে যায়। অন্যদিকে ডেনহামসহ ফিল্মের দল কোনরকমে ছাড়া পেয়ে বহু চেষ্টা করেও অ্যানকে কিছুতেই তাদের নাগালে আনতে পারে না। শেষে ড্রিস্কল নামে সেই দলেরই এক লোক গ্যাস বোমার সাহায্যে কং-কে ধরাশায়ী করে—এবং তাকে শক্ত শিকল দিয়ে বন্দী করে ধরে আনা হয় নিউইয়র্ক শহরে। কিন্তু তার বন্দীদশা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। সে নিজেকে মুক্ত করে শহর তোলপাড় করে তোলে। ছবির শেষ দৃশ্যে সে অ্যানকে নিয়ে উঠে যায় ১০২ তলা এম্পায়ার স্টেট-বিলডিং-এর চূড়োয়। পুলিশ এবং সেনাবাহিনী কিছু করতে না পারায় শুরু হয় ফাইটার প্লেনের আক্রমণ। অ্যানকে একটি নিরাপদ জায়গায় রেখে 'কং' মেতে যায় যুদ্ধে। শেষে অবিরাম গুলিবর্ষণ আর সে সহ্য করতে পারে না। রক্তাক্ত শরীরে, টাল সামলানোর শক্তি হারিয়ে, নীচে গিয়ে আছড়ে পড়ে প্রাণ হারায়।

www.BanglaBook.org

কিং কং ছবির পোস্টার

সদ্য-সমাপ্ত এম্পায়ার স্টেট বিলডিংটি দেখেই কুপার স্থির করেছিলেন যে তাঁর ছবির শেষ দৃশ্যে তিনি ওখানেই তুলবেন!

ওব্রায়ন 'কং'-এর বিরাটাকার মাপ অনুযায়ী ষোল থেকে আঠারো ইঞ্চির মধ্যে ভেড়ার লোমে ঢাকা ২৭টি রবার ও স্পঞ্জের মডেল তৈরী করলেন, যাতে বেশি ব্যবহারের ফলে তার কয়েকটি নষ্ট হলেও মডেলের কমতি পড়বে না। অন্যান্য ভয়ংকর প্রাগৈতিহাসিক জন্তুজানোয়ার ত বানানো হলই। এই মডেলগুলি এমনভাবে তৈরী করা হল যাতে তাদের প্রতিটি অংশকে নড়ানো-চড়ানো যায়—হাত, পা, মাথা ইত্যাদি। শুধু জন্তুজানোয়ারই নয়—গাছপালা, পাহাড়-পর্বত সবকিছুরই মডেল বানানো হল, যাতে বাইরের শুটিং-এর খরচা ও ঝামেলা দুই-ই কমে। অর্থাৎ ছবির প্রায় নব্বই ভাগই স্টুডিওর নিরিবিলি পরিবেশে তোলার বন্দোবস্ত করা হল।

ওব্রায়ন এক বিশেষ ফিল্ম ক্যামেরায় তাঁর মডেলের কাজ শুরু করলেন।

ফিল্ম ক্যামেরায় এক সেকেন্ডে চব্বিশটি করে ছবি বা ফ্রেম ওঠে। সুতরাং কং-এর যদি তার মাথাটি ৯০ ডিগ্রী ঘোরাতে এক সেকেন্ড বা চব্বিশ ফ্রেম লাগে, তাতে এক একটি ফ্রেমে তার মাথাটি ঘুরছে তিন-পূর্ণ তিন-চতুর্থাংশ ডিগ্রী করে। এই সামান্য একটি মাথা ঘোরানোর ছবি তোলার জন্য ওব্রায়ন তাঁর ফিল্ম ক্যামেরায় এক একটি করে ফ্রেম তুললেন, এবং প্রত্যেকটির মাঝে তিনি ক্যামেরা বন্ধ করে 'কং'-এর মাথাটিকে তিন-পূর্ণ তিন-চতুর্থাংশ ডিগ্রী করে ঘুরিয়ে দিলেন। মাথা ঘোরানোর উপর যদি আবার একই সঙ্গে হাত-পা নড়ানোর ব্যাপার থাকে তাহলে ত আরও অঙ্কের ঝামেলা। ওব্রায়ন তাও করেছিলেন। সেই জন্যেই এইসব নিষ্প্রাণ মডেলগুলিতে প্রাণ সঞ্চার করে এক একটি আধ মিনিটের দৃশ্য তুলতে তাঁর প্রায় ২৩ ঘণ্টার মত সময় লাগত! ছবিতে কং-এর সঙ্গে স্কাল দ্বীপের এক প্রাগৈতিহাসিক টেরোড্যাকটিল পাখির প্রচণ্ড যুদ্ধ আছে। সেটি তুলতে নাকি দিনে দশ ঘণ্টা খেটেও সাড়া এক সপ্তাহ লেগেছিল!

হিরোইনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে ঘুরে বেড়াবার দৃশ্যগুলির জন্যে ওব্রায়ন ১৮ ইঞ্চি লম্বা কং মডেলের হাতে একটি ইঞ্চি তিনেকের পুতুল গুঁজে দিতেন। বাস্তবতা বজায় রাখার জন্য কং-এর আসল সাইজ মাফিক একটি বিশাল হাতও বানানো হল। তার মধ্যে নায়িকা ফে রে-কে রেখে, একটি ক্রেনের সাহায্যে হাতটিকে ওঠা নামা করিয়ে কিছু ফিল্ম তুলে, মডেলে তোলা দৃশ্যগুলির ফাঁকে ফাঁকে জুড়ে দিয়ে এমনভাবে মিলিয়ে দেওয়া হল যে, তখন আর তিন ইঞ্চি পুতুলের ফাঁকি ধরে কার সাধ্য।

হাত ছাড়া কং-এর সাতফুট লম্বা একটি মাথাও বানানো হয়েছিল, যান্ত্রিক উপায়ে যেটার চোখমুখ যেমনটি চাই তেমনটিই করা সম্ভব হত। চল্লিশটি ভাল্লুকের চামড়া দিয়ে ঢাকা এই বিশাল মাথাটির ভিতর দুটি লোক লুকিয়ে থেকে যন্ত্রটি পরিচালনা করত। তার আগে ওব্রায়ন বহু চেষ্টা করেও তাঁর ছোট্ট

www.BanglaBook.org

মডেলে কং-এর মুখে কিছুতেই তার সূক্ষ্ম হাবভাবগুলি ফোটাতে পারেননি।

অন্যদিকে কুপার ও গুডস্যাক্ করছিলেন জ্যান্ত মানুষদের নিয়ে কাজ—আর আরেকদিকে ওব্রায়ন করছিলেন নানারকমের ক্যামেরার প্যাঁচ। সমস্ত ছবি জুড়েই ওব্রায়নের বিস্ময়কর ক্যামেরার কৌশলের ছড়াছড়ি—যার মধ্যে অর্ধেকের বেশি তোলা হয়েছিল একান্ত গোপনীয়ভাবে। এই কারণেই আজও পর্যন্ত ওব্রায়নের কারসাজির ভেতরের খবর অনেকেই জানেন না।

ছবির শেষ দিকে দেখা দিল আর এক সমস্যা। কং-এর হুংকারটি ঠিক কেমন হবে? আর. কে. ও. সাউন্ড বিভাগের কর্তা মারে স্পিভাকে বহু মাথা ঘামিয়ে শেষে একটি দুর্দান্ত ব্যাপার করে ফেললেন। প্রথমে তিনি তাঁর টেপ মেশিনে সাধারণ একটি সিংহের গর্জন তুললেন। তারপর তাঁর মেশিনের স্পীড অর্ধেকেরও বেশি কমিয়ে সেই চিৎকারটিকে উল্টো করে চালাতেই শোনা গেল সম্পূর্ণ একটি নতুন ধরনের ভয়ংকর শব্দ। সেটাই হয়ে উঠল কং-এর অতি পরিচিত রক্ত-হিম-করা হুংকার।

এক বছর অবিশ্রান্ত খাটুনির পর অবশেষে ১৯৩৩ সালের গোড়ার দিকে পরলোকগত এডগার ওয়ালেসের দেওয়া নামের প্রথম শব্দ ও কুপারের দেওয়া নাম মিলিয়ে 'কিং কং' মুক্তি পেল নিউইয়র্কের দুটি সেরা সিনেমা হাউসে—রেডিও সিটি মিউজিক হল ও রক্সি। এই দুটি হাউসে মিলিয়ে দশ হাজার সীটে দশটি করে শোতে কিং কং ছবি দেখতে লোক উপচে পড়ল। টিকিট ঘরের বাইরে ভীড় সামলাতে পুলিশরা রীতিমত হিমসিম খেয়ে গেলেন।

'কিং কং' তুলতে খরচা লেগেছিল তখনকার দিনে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। মুক্তি পাবার কয়েকদিনের মধ্যেই দেখতে দেখতে সে টাকা উঠে এল আর আজ পর্যন্ত সে ছবি যে কত লাভ করেছে তার হিসেব নেই। খবর পাওয়া গেছে যে নিউ-ইয়র্কের এক টেলিভিশন কেন্দ্র এক সপ্তাহের মধ্যে ১৬ বার গোটা ছবিটা দেখিয়েছে। সারা বিশ্বের টেলিভিশনের ইতিহাসে এটা একটা রেকর্ড।

'কিং কং' মুক্তি পাবার ঠিক ৩৪ বছর পর, অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে, হিরোইন ফে রে ও পরিচালক মেরিয়ান কোল্ডওয়েল কুপার আবার একত্র হলেন এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারের জন্য। ফে রে'র কোলে একটি ছোট্ট জিনিসও রাখা হল। জিনিসটি আর কিছুই না, উইলিস হ্যারল্ড ওব্রায়নের বানানো ২৭টি কং-মডেলের মধ্যে একটি। রে সেই ছোট্ট আঠারো ইঞ্চির পুতুলটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বললেন—'অন্যান্য ছবিতে আমি অনেক সুদর্শন যুবকের সংগে কাজ করেছি, কিন্তু 'কং' হচ্ছে নিঃসন্দেহে আমার সবচেয়ে প্রিয় নায়ক!'

১৩৮৪

www.BanglaBook.org

গল্প সল্প

লীলা মজুমদার

॥ ১ ॥

বেনারসকে কাশী বলে জান বোধ হয়? সেখানে বাঁদরের উৎপাত। ছোট ছোট লাল-মুখো বাঁদর নয়, এই বড় বড় কালা-মুখো হনুমান। তাদের ভয়ে লোকে জানলায় শিক লাগায়, জাল দিয়ে উঠোন মুড়ে দেয়। নইলে কিছুই বলা যায় না, কোথা থেকে কি নিয়ে পালাবে। খাবার জিনিস ত বটেই, বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড় কিছুই বাদ যাবে না।

তার ওপর বেজায় বেয়াদব; কিছু বলতে গেলে দাঁত খিঁচোয়। পুরুষরা লাঠি-সোঁটা নিয়ে তেড়ে গেলে, চোঁ চোঁ পালায়। ছোটরা কিম্বা মেয়েরা গেলে, চড় দেখায়! পারলে আঁচড় কামড় দিতেও ছাড়ে না। মাঝে মাঝে নিজেদের ভিতর মারামারিও হয়।

আমাদের এক বুড়ি পিসিমা কাশীতে থাকতেন। একদিন সকালে বাড়ির ছেলেরা সব আপিসে, এমন সময় কিচির-মিচির ক্যাঁও-ম্যাও! বোঝাই গেল হনুমানরা ঝগড়া করছে।

সামনের দরজায় ছিটকিনি দেওয়া; মাঝখানের উঠোনে জাল মোড়া। তবে পিছনের দরজার বাইরে একটু জায়গায় কয়েকটা গাছপালা, জায়গাটার চারিদিকে দেড় মানুষ উঁচু পাঁচিল।

পিসিমা সেখানে সবে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় হাঁচড়-পাঁচড় করে ঐ উঁচু পাঁচিল টপকে, একটা হনুমান এসে হাজির। পিসিমা ত ভয়ে কাঠ! বাইরে হনুমানদের মারামারির আওয়াজ।

হনুমানটা ঝড়ের মত এসে, পিসিমার পায়ের কাছে, কচি একটা ন্যাড়ামত ছানা ফেলে দিয়ে, এক নিমেষে হাওয়া হয়ে গেল। পিসিমার মায়া লাগল; অমনি ছানাটাকে তুলে নিলেন। ছানাটাও তাঁর কাপড় আঁকড়ে ঝুলে রইল।

খুব ছোট হনুমান; পিটপিট করে তাকায়; কুঁই কুঁই করে কাঁদে; গায়ে একটু একটু লোম, কুচকুচে কালো মুখ। পলতে পাকিয়ে পিসিমা তাকে দুধ খাওয়ালেন। খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পিসিমা তাকে ঘরের কুড়িতে ছেঁড়া কাপড় পেতে শুইয়ে দিলেন। সারা দিন ঘুমে দিল।

রাত হবার আগে বাড়ির ছেলেরা ফিরে এসে চা খেয়ে, আবার বেরিয়ে গেল। এমন সময় পিছনের দরজায় কে আঁচড়াতে লাগল। দরজা খুলে পিসিমা দেখেন সেই মা-হনুমান। সে তাঁর মুখের দিকে এমন করে তাকাল, ঠিক যেন মানুষ।

পিসিমা তার ছানা এনে তার কোলে দিয়ে দিলেন। সে আবার পাঁচিল বেয়ে ছানা নিয়ে চলে গেল। পিসিমা বুঝলেন ছানাটা তাঁর কাছে নিরাপদে থাকবে বলে, মা-হনুমান দিয়ে গেছিল। এখন তাদের মারামারি মিটেছে, তাই আবার নিয়ে গেল।

*

এখন যদি আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, দেখতে পাবে দলে দলে বুনো হাঁস, তীরের ফলার আকারে, কেবলি উত্তর দিকে উড়ে চলেছে। কেউ এত উঁচুতে উড়ছে যে কোনো শব্দ নেই; কারো শুধু ডানার শোঁ-শোঁ শোনা যাচ্ছে; আবার কেউ বা বলছে গাঁক-গাঁক-গাঁক। ওরা গরম দেশে শীত কাটিয়ে এখন শীতের শেষে আবার নিজেদের দেশে ফিরে যাচ্ছে। ওদের বেশি গরমও সয় না, আবার বেশি শীতও সয় না।

কেউ কেউ হিমালয়ের উত্তর দিক থেকে, বরফের পাহাড় পেরিয়ে আসে। অনেকে নাকি ভারতের মাটি পার হয়ে, সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে ছোট ছোট দ্বীপে গিয়ে নামে। সেখানে মানুষের বাস নেই। নিরাপদে তাদের শীত কাটে। সেখানে আমাদের শীতকালেও শীত নেই। জানো বোধ হয়, পৃথিবীর দক্ষিণের আধখানায়, আমাদের শীতের সময় গরম, আবার আমাদের গরমের সময় শীত।

এই গল্পটা লাডাকের একটা বরফে-ঢাকা নির্জন জায়গা থেকে শোনা। সেখানে আমাদের জোয়ানদের একটা ঘাঁটি ছিল। কয়েকজন বাঙ্গালী সৈনিক সীমান্ত পাহারার কাজে ওখানে শীত কাটাচ্ছিল।

তখন শীতের শুরু। মাথার ওপর দিয়ে দলে দলে বুনো হাঁস দক্ষিণ দিকে উড়ে যেত। তাই দেখে দেখে দেশের জন্যে, নিজেদের বাড়ির জন্য ওদের মন কেমন করত। চিঠিপত্র বিশেষ পৌঁছাত না, রেডিওতে যেটুকু খবর পেত। তাও ঝড়-বৃষ্টি হলে শোনা যেত না।

একদিন একটা বুনো হাঁস দল ছেড়ে নিচে নেমে পড়ল। একটা ঝোপের ওপর নেমে, থরথর করে কাঁপতে লাগল। তারপর ওরা অবাক হয়ে দেখল আরেকটা বুনো হাঁসও নেমে এসে, এটার চারিদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে। বরফ পড়তে শুরু করতেই জোয়ানরা গিয়ে আগের হাঁসটাকে তাঁবুতে নিয়ে এল। অন্য হাঁসটা প্রথমে তেড়ে এসেছিল, তারপর ওদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেই গিয়ে তাঁবুতে ঢুকল। ভিতরে ছেড়ে দিতেই দেখা গেল

www.BanglaBook.org

প্রথম হাঁসটার ডানা জখম হয়েছে। তাই বেচারি উড়তে পারছিল না। জোয়ানদের মুরগি রাখার খালি জায়গা ছিল। সেখানে বুনো হাঁসরা রইল। টিনের মাছ, তরকারি, ভুট্টা, ভাত, ফলের কুচি, এইসব খেত।

ওদের দেখাশোনা করা জোয়ানদের একটা আনন্দের কাজ হয়ে দাঁড়াল। পরের হাঁসটা ইচ্ছা করলেই উড়ে চলে যেতে পারত, কিন্তু সঙ্গীকে ছেড়ে গেল না। সারা শীতকাল দুজনে ওখানে থেকে গেল। আস্তে আস্তে হাঁসের ডানা সারল। তখন সে একটু একটু করে উড়তে চেষ্টা করত। তাঁবুর ছাদ অবধি উঠে, আবার ধুপ করে পড়ে যেত।

এমনি করে সারা শীত দেখতে দেখতে কেটে গেল। নিচের পাহাড়ের বরফ গলতে শুরু করল। আবার সবুজ ঝোপঝাপ দেখা গেল। ন্যাড়া গাছে পাতার আর ফুলের কুঁড়ি ধরল। তারপর পাখিরা আবার আসতে আরম্ভ করল, এবারে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। দেশে ফিরে ওরা বাসা বাঁধবে, বাচ্চা তুলবে।

এদের হাঁসরা আজকাল তাঁবুর বাইরে চরত আর মাথার ওপর দিয়ে হাঁসের দল গেলেই চঞ্চল হয়ে উঠত। তারপর একদিন জোয়ানরা সকালের কাজ সেরে এসে দেখে হাঁস দুটি উড়ে চলে গেছে। জোয়ানদেরও বাড়ি ফেরার সময় হয়ে এল।

॥ ২ ॥

অনেক দিন পরে শান্তিনিকেতনে এসে বর্ষা দেখলাম। কখনো বৃষ্টি, কখনো রোদ। যেই না বৃষ্টি থামে, মেঘ সরে যায়, আশ্চর্য নীল আকাশ দেখা যায় আর পাখিরা অমনি গান ধরে। কি সব পাখি! এদের নাকি বসন্তকালে গান গাইবার কথা; কোকিল, পাপিয়া, দোয়েল, টিয়া, বেনে বৌ, টুনটুনি আর খানিকটা কাকের মত দেখতে মস্ত একটা লম্বা-ল্যাজ পাখি। গুব-গুব করে ডাকে বলে তার নাম হয়েছে গুব গুব পাখি। সে ঘাসের ওপর নেমে কি যেন ঠুকরে খায়। শীতকালেও ওকে দেখেছি, ভেবেছি ঘাসের পাকা বিচি খায় বোধ হয়। এখন ত পাকা বিচি পাবে না, নিশ্চয় পোকা-মাকড় খায়।

ঘুঘু পাখিরাও আসে। আমাদের রঙ্গন-গাছের গোড়ার কাছে বৃষ্টির জল জমলে, সেখানে স্নান করে রুপোলী ডানা ঝাপটায় আর মনে হয় সত্যি বলছে, 'কেষ্ট ঠাকুর-র-র, ওঠ, ওঠ, ওঠ!' রঙ্গন গাছে বুলবুলিরা থাকে, তাই শুনে তারা ব্যস্ত হয়ে শিস দেয়। অনেক পশলা বৃষ্টি পড়বার আগে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখিরা চরতে বেরিয়ে পড়ে। রোজ ভোর সাড়ে চারটায় পাখিরা আমাদের ঘুম ভাঙায়। বৃষ্টি পড়লেই অমনি সব চুপ!

বাতাস বইলেই গাছের পাতার মধ্যে শুনি শির-শির সর-সর। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। শিলং পাহাড়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছিল সরল গাছের বন। তাদের লম্বা লম্বা ছুঁচের মত পাতার মধ্যে দিয়ে সারা বছর অষ্টপ্রহর কেমন একটা শোঁ-শোঁ শব্দ উঠত, দীর্ঘনিশ্বাসের মত, কানের ওপর শাঁখ ধরলে তার মধ্যে যেমন শব্দ শোনা যায়, সেই রকম। সে আওয়াজে মন উদাস হয়ে যেত। কিন্তু শান্তিনিকেতনের একেসিয়া, মুচুকুন্দ, জারুল, বকুল, সোনাঝুরি, পলাশ, আম, জাম, কাঁঠাল গাছে বর্ষার হাওয়া লাগলে ভারি একটা হৈ-হুল্লোড় পড়ে যায়, কেমন একটা ছুটোছুটি, দাপাদাপি—ঐ এল! ঐ এল! এই ভাব। মনটা চকিত হয়ে ওঠে। ইচ্ছে করে খুব খানিকটা ছুটোছুটি করি।

আর দেখি শান্তিনিকেতনের কুকুরদের কাণ্ড। বর্ষাকালেও তারা খুব একটা অসুবিধা বোধ করে না। যা হোক একটা ব্যবস্থা করে নেয়। এর বাড়ি খাওয়া, ওর দাওয়ায় শোয়া, রাতে তার বাড়ি পাহারা দেওয়াই যাদের স্বভাব, তারা মিছিমিছি বৃষ্টিতে ভিজবে কেন? বাড়ির লোকদের যদি জায়গা হয়, তাদেরি বা হবে না কেন? যেখানে গাল-গল্প, চা ও জল-খাবার চলছে, সেই জায়গা ওদের সব চাইতে পছন্দ। তাড়ালেও যাবে না। এমনিতে বেশ ভদ্র! খাবার-দাবার না দিলে কিছু তুলে কিম্বা ছিনিয়ে নেবে না, তবে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াবে এবং তাড়ালেও যাবে না। এত ভদ্র যে ওদের বেশি মারতেও পারা যায় না। মারলেও ওদের বেশি এসে যায় না; বড় জোর চোখ বুজে মাথা কাত করে, যেমন শুয়ে ছিল, তেমনি থাকে। মোড়ার তলা দেখালে একটু ঘাবড়ে যায়, বারান্দার ডানদিকের সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বাঁ দিকের সিঁড়ি দিয়ে আবার উঠে আসে। অন্য পাড়ার কুকুর না এলে কোনো শব্দ-ও করে না। একবার দেখেছিলাম কবি অন্নদাশঙ্কর রায়ের কুকুর মাঘোৎসবের উপাসনার সভার মধ্যে ঢুকে, সবাইকে ঠেলে-ঠুলে একেবারে আচার্যের মুখের সামনে গিয়ে বসল। আর শুধু বসল না, আড়াই ঘণ্টা উপাসনা ও গান শুনে বিনা বাক্যব্যয়ে চলে গেল! এসব প্রাণীর বর্ষায় আর কি অসুবিধা হতে পারে!

কুকুর বলতে মনে পড়ল তোমাদের অজেয়দাদের আরেকটি কুকুর জুটেছে। সে সকলের জুতোর উপরের দিকটা চিবোয়, রবারের জুতোরও। মুচি দিয়ে না সারালে পরবার জো থাকে না। তাতে মুচির প্র্যাক্‌টিস্‌ খুব বেড়ে গেছে। সে কুকুরটার ওপর খুসি না হয়ে পারে না। প্রায়ই পিঠ চাপড়ে দেয়, টুকিটাকি খাওয়ায়। অজেয়দাদের বাড়ির লোকেদের অবিশ্যি অন্য রকম মনের ভাব। জুতো সেলাই বাবদ প্রতি মাসেই তাদের বেশ কিছু গচ্ছা যাচ্ছে।

একদিন হয়েছে কি, মুচি এসে নিয়মমাফিক এক গাদা কুকুর-বিধ্বস্ত জুতো, চটি মেরামত করে, নগদ পয়সা পকেটে ফেলে হাসিমুখে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়েই, মহা খাপ্পা হয়ে আদরের কুকুরটাকে গালাগাল দিতে আরম্ভ করেছে। কি ব্যাপার? না মুচি যতক্ষণ ভিতরে বসে কুকুরে-খাওয়া জুতো-চটি সেলাই করছিল, কুকুর বাছাধন ততক্ষণ সদর দরজার বাইরে রাখা মুচির নিজের চটি জোড়ার ওপর দিকটা চেটেপুটে সাবাড় করে রাখছিল!

*

যেই না শান্তিনিকেতনে শীত শেষ হয়ে যায়, অমনি শির-শির সর-সর করে দখিনে বাতাস বইতে থাকে আর গাছে যত শুকনো

www.BanglaBook.org

পাতা বাকি ছিল, সব ঝরে মাটিতে পড়ে। পড়েই আবার ঘূর্ণি হাওয়ায় ঘুরতে থাকে, দেখে মনে হয় অদৃশ্য ডাইনীবুড়ি বুঝি লম্বা ঝাড়ু দিয়ে ঝরা পাতা ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ন্যাড়া গাছের খুদে খুদে পাতার কুঁড়ি রাতারাতি খুলে যায়, কোনোটার কচি কলাপাতার রঙ, কোনোটা বা লালচে। জারুলফুলের নতুন পাতা কেমন নরম গোলাপী। আমগাছেও যেই না কচি পাতা দেখা যায়, অমনি বোঝা যায় বোল ধরার সময় এসে গেছে। দুরন্ত বাতাসে বাতাবিলেবুর ফুলের পাপড়ি ঝরে, মনে হয় গাছতলায় কে নরম সাদা গালচে পেতেছে। চারদিক সুগন্ধে ভুর ভুর করে।

দলে দলে হাঁসরা উত্তর দিকে উড়ে যায়। মাঝে মাঝে এত নিচ দিয়ে যায় যে তাদের ডানার শোঁ-শোঁ শব্দ কানে আসে। পাখির ঝাঁক দেখে সবাই বলে, শীত ফুরুল, বসন্ত এল। আর কিছুদিন বাদেই কাল-বোশেখীর ঝড় উঠবে, উত্তর পশ্চিমের জানলা-দরজার হুড়কো কপাট ঠিক আছে ত?

কোথাও বাধাবন্ধ নেই শান্তিনিকেতনে : ঝড়ের দাপট বড় বেশি। উপাচার্য মশাইয়ের বাড়িতে গিয়ে একটা সত্যি গল্প শুনলাম। ওঁদের বাড়িতে এক আম গাছ আছে, সেটি প্রায় দোতলার সমান উঁচু। দোতলার জানলা থেকে গাছের ডালপালার ভিতরটা দেখা যায়। নিচে থেকে যেমন গাছটাকে শান্তশিষ্ট মনে হয়, আসলে মোটেই তা নয়। গাছের মধ্যে ছোটখাটো একটা পাড়া আছে। পাড়ায় দুটি দল আছে, তাদের মধ্যে ভাবসাব নেই।

একদল কাক গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে, গুঁড়ির গা ঘেঁষে কাঠকুটো দিয়ে বাসা করে থাকে। কাকের বাসার না আছে যত্ন, না আছে ছিরি। তবু তারা তারই মধ্যে ডিম পাড়ে, নিজেদের বাচ্চাও তোলে, কোকিলের বাচ্চাও তোলে। আর শালিকরা বাসা করেছে খানিকটা দূরে, ডালের আগার দিকে। তাদের বাসাগুলো অনেক বেশি পরিপাটি কিন্তু ততটা নিরাপদ নয়।

গত বছর একদিন বিকেলে ঝড় উঠল। মনে হতে লাগল হাওয়ায় তৈরি কোনো দৈত্য এসে বড় বড় গাছের ঝুঁটি ধরে নাড়া দিচ্ছে! দোতলার জানলা দিয়ে মেয়েরা দেখল আমগাছের ডালের আগায় একটা শালিকের বাসা হাওয়ায় বড্ড বেশি দুলছে। বসায় চারটি ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা। তাদের গায়ে রোঁয়া বেরিয়েছে, পালক গজায়নি, চোখ ফুটেছে কিনা সন্দেহ। তাদের নিয়েই পাখির বাসা দোল খাচ্ছে। মা-পাখি বাবা-পাখি বোধ হয় খাবারের খোঁজে বেরিয়েছিল। তাদের দেখা যাচ্ছিল না।

দোল খেতে খেতে সকলে যা ভয় করেছিল, তাই হল। বাসাটা নিচে পড়ে গেল। সোজা হয়েই পড়ল, বাচ্চারা একটুও জখম হয়েছে বলে মনে হল না। তারপর ঝড় থেমে গেলে, মেয়েদের মা রামুকে বললেন, 'ওরে, নিচে পড়ে থাকলে ত বেড়ালটাই ওদের সর্বনাশ করবে। বাসাটাকে বরং আবার গাছে তুলে দে। যেখানে ছিল ঠিক সেইখানে।'

রামুর খুব উৎসাহ দেখা গেল না। সে বলল, 'আবার পড়ে যাবে।' মেয়েরা বলল, 'দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ্, তাহলে পড়বে না।' রামু বলল, 'অত সরু ডালে উঠতে গেলে ডাল ভেঙে পড়ে যাব।' সবাই বলল, 'না হয় ঠিক সেই জায়গায় নাই বাঁধলি। ঐ ডালেই একটু সরিয়ে বাঁধ না। বেশি দূরে হলে মা-বাবা খুঁজে পাবে না।'

শেষটা রামু তাই করল। বাসাসুদ্ধ পাখির ছানা পকেটে নিয়ে, সাবধানে গাছে উঠে সেই ডালেরই একটু গোড়ার দিকে বাসাটা বেঁধে রেখে এল। সকলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ছানা পাখিদের ঐটুকু শরীর, তারা এই বড় বড় হলদে ঠোঁট হাঁ করে, খাবারের আশায় আঁকুপাঁকু করতে লাগল। মা-পাখি বাবা-পাখিরা মুখে পোকামাকড় নিয়ে ফিরেও এল। ফিরে এসে তারা পুরনো জায়গায় গিয়ে বাসা না দেখে, মহা ব্যস্ত হয়ে, খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। অথচ বাসাটা ছিল মাত্র দুহাত দূরে, ওদের চোখের সামনে! মেয়েরা কত করে নতুন জায়গাটা দেখাবার চেষ্টা করল, ওরা বুঝতেই পারল না।

আশ্চর্যের বিষয় হল, হন্যে হয়ে খুঁজেও তারা বাসাটাকে দেখতে পেল না! হয়ত বাসাটা এখন কাকদের এলাকায় পড়ে গেছিল, তাই ওদিকে তাকায়নি। এদিকে কাকরা এতক্ষণ নিজেদের বাসা থেকে মজা দেখছিল। এইবার তারা মহা উল্লাসে উড়ে এসে শালিক ছানাদের ঠোকরাতে আরম্ভ করল। মা-পাখি ব্যস্ত হয়ে বাসা খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তারা কিছুই বলল না। দেখতে দেখতে কাকরা ছানাগুলোকে মেরে শেষ করে দিল। মেয়েদের দু' চোখে জল।

খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে, মা-পাখি বাবা-পাখি বাসার পুরনো জায়গাটাতে চুপ করে বসে রইল। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল, তারা মহা উৎসাহে আবার সেই একই জায়গায় নতুন করে বাসা বানাতে আরম্ভ করেছে। সেই বাসাতে তারা ডিমও পাড়ল, বাচ্চাও তুলল, কাকরা কিছু বলল না। তা বলবেই বা কেন, ওটা ত আর কাকদের এলাকা নয়।

১৩৮১/৮৪

www.BanglaBook.org

ইচিংকা

অমিতানন্দ দাশ

এ দুনিয়ায় কি না ঘটতে পারে! বিশেষ করে স্কুলের পথে ওই যেখানে সরু রাস্তাটার দু'দিকে বড় বড় বাগানওয়ালা বাড়ি আর বড় বড় গাছগুলো আছে, বাড়িগুলো সব উঁচু উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, আর গাছের ছায়ায় আঁকাবাঁকা রাস্তাটা দুপুরবেলা প্রায় একা পড়ে থাকে। রোজ স্কুল থেকে ফেরার পথে ভাবি এই নির্জন রাস্তায় ছ'পেয়ে কুকুর বা শিংওয়ালা মানুষ দেখা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। ওই যে বাঁদরটা অশ্বত্থ গাছে বসে রোজ উকুন না কি যেন বাছে, সেটা হয়ত একদিন চোখের সামনে মানুষ হয়ে যাবে। কিম্বা হয়ত একটা ম্যানহোল খুলে এ্যামাজনের জঙ্গলের স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধওয়ালা একহাত মোটা এক এ্যানাকোন্ডা সাপ বেরিয়ে আসবে।

এইখানেই ত টুবলু সেদিন নিজের চোখে দেখেছিল একটা সবুজ রঙের বাছুর। আমরা অবশ্য পরের দিন গিয়ে আর সেটাকে খুঁজে পাইনি, তবে এসব জিনিস কি আর একবারের বেশী দ্বিতীয়বার দেখার সুযোগ মেলে?

তবে হ্যাঁ, উড়ন্ত চাকিগুলো অবশ্য সবাই দেখেছে। আমি দেখেছি, টুবলু দেখেছে, সঞ্জু-পিলু-সুবু সবাই দেখেছে, এমন কি মাকেও বারান্দায় এনে দেখিয়েছি। বাবা অবশ্য বললেন, 'বাঙালী যা হুজুগে জাত, দুপুরবেলা বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকো, দেখবে শ'খানেক লোক হাঁ করে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে—আকাশে কিছু থাকুক কি নাই থাকুক।'

সবাই যখন উড়ন্ত চাকির বিষয়ে গাল-গল্প করে আমি তখন চুপচাপ মনে মনে হাসি। কারণ ইচিংকা ত আমার বন্ধু। সৌরজগৎ ছাড়িয়ে বহুদূরে গভীর মহাকাশে আছে পিংছি তারা, আর সেই তারার জিজিং গ্রহের অধিবাসী ইচিংকা। ইচিংকা পোস্টম্যান, আমাদের সৌরজগতে ও আসে চিঠি ডেলিভারি দিতে। আমাদের বিজ্ঞানের বইতে কি যে সব হিজিবিজি লেখা আছে না—বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতিতে নাকি মানুষ বাস করতে পারে না। হ্যাঁ, মানুষ সেখানে অবশ্য নেই, তবে ইচিংকা বলেছে সে-সব গ্রহে মানুষের চেয়ে উন্নত জাতের অনেক লোকজন থাকে, ওকে প্রায়ই তাদের কাছে চিঠি দিতে হয়। ইচিংকা আমাকে একটা ইরেসার দিয়ে গেছে, সেটা সর্বদা পকেটে নিয়ে ঘুরি—শোবার সময়েও বালিশের নিচে রেখে শুই। ওটা দেখতেই শুধু ইরেসারের মত, আসলে ওটা একটা দারুণ যন্ত্র, ওটার সাহায্যে ইচিংকা সর্বদা টের পায় আমি কোথায় আছি, আবার দেখা হলে ওটা আমাদের পরস্পরের ভাষা অনুবাদ করে দেয়। এরকম যন্ত্র পৃথিবীতে এই একটাই আছে।

কাল লাস্ট পিরিয়ডে ছিল সংস্কৃত। সুবু পিছনের বেঞ্চে বসে একটা কাগজের কুচিতে গাধা-টাধা কিবস লিখে আমার কলারে গুঁজে দিচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরে ওরা হাসছিল, জগদীশ-বাবু খেয়ালও করেননি—আর যেই আমি পিছন ফিরে সুবুর হাতে চিমটি কেটেছি অমনি কিনা তেনার খেয়াল হল! আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন, দু'বার কান মলে দিলেন, বললেন, 'বাঁদর ছেলে কোথাকার!' তারপর কিসব বিটকেল বিটকেল প্রত্যয় জিজ্ঞেস করলেন, আর সেগুলো না পারাতে কিনা আবার ক্লাস থেকে বের করে দিলেন! পৃথিবীর উপর গভীর বিতৃষ্ণা জন্মাল। দারোয়ানকে গিয়ে বললাম আমার পেট ব্যথা করছে, জগদীশ-বাবু বলেছেন বাড়ি চলে যেতে।

বেশি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলে ত বরাতে আর এক চোট বকুনি। কাজেই এক পিরিয়ড কোথাও কাটিয়ে যেতে হয়। ভাবলাম, সেই জায়গাটাতেই যাই টুবলু যেখানে সবুজ বাছুর দেখেছিল। সেই রহস্য-জড়ানো রাস্তাটায় দুটো বাড়ির দেয়ালের মাঝখানে একটা সরু ফাঁক দিয়ে ঢুকে ছোট্ট একটা পোড়ো মাঠ। বাছুরটাকে অবশ্য দেখতে পেলাম না, তবে তা ঠিক আশাও করিনি। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে অশ্বত্থ গাছের বাঁদরটাকে দেখতে দেখতে ভাবছিলাম এখন আমি বাঁদর হয়ে যেতে পারলে কেমন ভাল হত। বিকেলবেলা তবে জগদীশবাবুর বাড়িতে গিয়ে দিতাম তাঁর সবকটা চুল ছিঁড়ে, যেমন আমার কান ছেঁড়ার চেষ্টা!

হঠাৎ কে যেন বলল, 'একটা ম্যাজিক দেখবে?' তাকিয়ে দেখি লাল টিশার্ট আর কালো ট্রেকপাইপ পরা, খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা একটা লোক মন্দিরের উল্টো কোণে বসে জ্বলজ্বল করে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। আবার 'একটা ম্যাজিক দেখবে?'—দেখলাম লোকটা ইসারা করে ডাকছে। কাশে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ম্যাজিক?' লোকটা আঙুল দিয়ে একটা ভাঙা ধামার দিকে দেখিয়ে দিল। তারপরই লোকটা কেমন ধোঁয়াটে হয়ে গেল। ও কি? অদৃশ্য হয়ে যাবে নাকি?

না! এতে ইচিংকা—ওই তিনজোড়া পা, দুজোড়া শুঁড়, দুটো গুঁজাক্ষি, দাঁতহীন মুখ, নাক-টাকের বালাই নেই, প্রত্যেক পায়ে পাঁচটা হাঁটু—তিনটি সামনের দিকে মোড়া, দুটো পিছন দিকে—নাঃ, ভুল হবার জো নেই।

—'কি, কেমন লাগল ম্যাজিকটা? এবার পিছন ফেরো।'

ওমা, ধামাটা দেখি হয়ে গেছে ওর মহাকাশযান। আমরা দুজনেই খুব একচোট হাসলাম।

তার পরই কিন্তু ইচিংকা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল—

www.BanglaBook.org

'তোমাকে এত মনমরা দেখে একটু তামাসা করলাম, কিন্তু তোমার সঙ্গে জরুরী দরকার আছে। পৃথিবীর বিরাট বিপদ ঘনিয়ে আসছে। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ এখন বলতে পার তোমার হাতের মুঠোয়। আমার সঙ্গে চাঁদে চল, যেতে যেতে ব্যাপারটা তোমায় খুলে বলছি।'

—'বাড়িতে একটু বলে এলে হত না? একটা টুথব্রাশ-পাজামা নিয়ে যেতাম।'

—'না, তার আর সময় হবে না। ব্যাব্যারব গ্রহের লোকেরা পৃথিবী আক্রমণ করবে, তাদের রকেট বাহিনী চাঁদে রয়েছে। তাদেরকে বাধা দেবার জন্য তোমার সাহায্য একান্ত দরকার। আর এসব খবর বেশি লোক না জানলেই ভাল।'

তা বটে। আর চাঁদের কথা তুললে মা নিশ্চয়ই যেতেও দিতে চাইবেন না। 'কিন্তু কতক্ষণ সময় লাগবে?'

—'চাঁদে যেতে? তা মিনিট দশ-বারো।'

তাহলে আর ভাবনা কি? চাঁদে যাবার এমন সুযোগ ত আর রোজ রোজ মিলবে না, আর ব্যাব্যারবীয়দের বাধা দেওয়া নিশ্চয়ই পৃথিবীর মানুষ হিসাবেই আমার কর্তব্য। ইচিংকার মহাকাশযানে চড়ে বসলাম। ছোট্ট জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম কলকাতার বাড়িঘর সব ছোট হয়ে আসছে। ওই বঙ্গোপসাগর, ওদিকে হিমালয়! আহা রে! এটা যদি ভূগোলের ক্লাস হত। হুহু করে আরো উঁচুতে উঠছি—এবার পুরো ভারতবর্ষ দেখা যাচ্ছে। ওপারে আফ্রিকা। আস্তে আস্তে সমস্ত পৃথিবীটাই ছোট হয়ে ফুটবলের মত হয়ে গেল। তারপর উল্টোদিকের জানলা দিয়ে দেখি চাঁদটা বড় হচ্ছে। ওই দেখা যাচ্ছে ক্রেটার বা জ্বালামুখগুলো। খোঁচা খোঁচা পাহাড়। চাঁদটার কি বিচ্ছিরি চেহারা—এরই জন্য কিনা এত কাণ্ড করে মহাকাশযাত্রা!

ইচিংকা হঠাৎ মহাকাশযানটাকে ঘচ্ করে চাঁদের চারদিকে এক কক্ষ পথে চালিয়ে দিল। বলল—'ওই দেখ।' দেখে আমার রক্ত জল হয়ে গেল। কি ভয়ানক! এক জ্বালামুখের মধ্যে সূর্যের আলোতে চকচক করছে শয়ে শয়ে উড়ন্ত চাকি। এ যে বিরাট যুদ্ধপ্রস্তুতি। আমরা দুজনে কি করে এদের বাধা দেব? সাবধানে চালিয়ে নিয়ে ইচিংকা ওই জ্বালামুখেরই আর এক কোণে ওর মহাকাশযানটা নামাল।

ইচিংকা বলল—'এবার শোন মন দিয়ে। ব্যাব্যারব গ্রহের লোকেরা অনেকটা তোমাদের গ্রহের ছাগলের মত দেখতে। তারা ওস্তাদ ব্যবসাদার, আর ব্যবসার সুবিধার জন্য ওরা নানা গ্রহে যুদ্ধবিগ্রহ করে। ওরা পৃথিবীতে সবুজ সবুজ কি এক উপাদেয় খাদ্যের সন্ধান পেয়েছে। তাই যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে ওরা সেই জিনিসটার একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার পেতে চায়।'

আমি ভাবতে বসলাম—সবুজ, ছাগলে খায়—ঘাস নাকি? ঘাস নিয়ে যুদ্ধ!' ইচিংকাকে বুঝিয়ে বললাম ঘাস কি জিনিস। ও অতি উৎসাহের সঙ্গে আমার পিঠে চার শুঁড় বুলিয়ে-টুলিয়ে 'ইউরেকা' বলে ছয় ঠ্যাঙে ল্যাগব্যাগ করে নাচতে লাগল। 'ঠিক, ঠিক—ওরা পৃথিবী থেকে কিসব কুচি কুচি সবুজ জিনিস এনে তাই দিয়ে বড়ি বানায়। সে জিনিসটা ঘাসই হবে। আর এই ঘাসবড়ি ওদের কাছে অমৃতসমান। ওদের মতে এমন উপাদেয় খাদ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নেই! ওরা এই ঘাসের স্বাদে মুগ্ধ হয়েই পৃথিবী আক্রমণ করতে চলেছে।'

ইচিংকা আর আমি হাঁটতে লাগলাম ব্যাব্যারবীয়দের ঘাঁটির দিকে। ইচিংকা ওর সেই 'ম্যাজিকে' আমাদের চেহারা ব্যাব্যারবীয়-দের মত বানিয়ে ফেলল। ইচিংকাকে লক্ষ করলাম—স্পেসসুটের মধ্যে দিয়ে যতদূর ঠাহর হচ্ছে ওর মাথায় দুটো শিং, ছাগল-দাড়ি, খুরওয়ালা চারটে পা—তবে উপরন্তু তিনটে হাতও আছে, দু'দিকে দুটো আর সামনে একটা।

জ্বালামুখের দেওয়ালের একটা গুহার মুখে লাগানো এক দরজার কাছে এসে ইচিংকা বলল—এইটাই ঘাসবড়ির কারখানা মনে হয়। ঢুকে দেখি ঠিক তাই: একদিকে জলে জিইয়ে রাখা আছে হাজার হাজার বান্ডিল সুন্দর, মোলায়েম, সুস্বাদু, কচি ঘাস; মাঝে কিছু যন্ত্রপাতি; আর উল্টোদিকে জমা করা রয়েছে শিশি, বাক্স, বোতল ভর্তি শুধু ঘাসবড়ি আর ঘাসবড়ি। একটা বড়ি চেখে দেখলাম। রাম কহ! থুঃ থুঃ! ব্যাব্যারবীয়রা সব সত্যিই আস্ত ছাগল। আমি যতক্ষণ ঘুরেফিরে দেখছি ইচিংকা সমস্ত সময়টা যন্ত্রপাতির মধ্যে খুটখাট কি সমস্ত করল।

বেরিয়ে এলাম। আমাদের ব্যাব্যারবীয় চেহারা দেখে পাহারা-দাররা কিচ্ছুটি বলল না, ব্যাব্যারবীয়দের পক্ষে ঘাসবড়ির কার-খানার ক্ষতি করার চিন্তাও বোধ হয় অবিশ্বাস্য। ইচিংকা বলল এবার আমরা যাব ব্যাব্যারবীয় নেতা ব্যাব্র্যাবরের কাছে। ব্যাব্যার-বীয় ঘাঁটির মধ্যে নানা ছাগল নানা কাজে যাচ্ছে, আমরা তাদের দলে মিশে গেলাম। বিরাট বিরাট বিদঘুটে যন্ত্রপাতি, এগুলো কি অস্ত্রশস্ত্র? আমরা শুধু দু'জনে এর বিরুদ্ধে কি করতে পারি?

ইচিংকা সোজা গিয়ে ব্যাব্র্যাবরের সঙ্গে দেখা করতে চাইল। বলল যে ঘাসবড়ির কারখানায় একটা গড়বড় হয়েছে, জরুরী দরকার। ব্যাব্যারবীয়রা সব দেখি ঘাসবড়ি শুনেই জল। নিমেষের মধ্যে ব্যাব্র্যাবরের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা হয়ে গেল। ব্যাব্র্যাবরের বড়সড় অফিস, অন্যসময়ে হলে চেয়ার-টেবিলে বসা ছাগল দেখে খুব হাসি পেত নিশ্চয়ই, কিন্তু এখন মনে খালি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিন্তা, ইচিংকার মতলব কি? এই শত্রুপুরীর মধ্যে ও কি পাকামো করতে চায়? আমরা গুপ্তচর টের পেলেই ত ব্যাব্যার-বীয়রা আমাদের শেষ করে দেবে। ঘরের টেবিল-চেয়ারগুলো দেখবার জিনিস, একটারও কোনো পায়া নেই। কোন ম্যাজিকে জানি তারা সব শূন্যে ভেসে রয়েছে।

ব্যাব্যাবরের চেহারা ঠিক এক অতিবৃদ্ধ রামছাগলের মত। কারো কোনো কথা শুনবার সময়ে সে মাথা দোলাতে দোলাতে তিনটে হাতই একসঙ্গে দাড়িতে বোলাতে থাকে, আর মাঝে মাঝেই টেবিল থেকে দু-চারটে করে ঘাসবড়ি নিয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে চিবোতে থাকে।

ইচিংকা তাকে ব্যস্তভাবে বলল যে ঘাসবড়ির কারখানায় এক সাংঘাতিক কান্ড ঘটে গেছে। ব্যাব্যাবর দারুণ চিন্তিত হয়ে ইচিংকাকে বিস্তারিত বিবরণ দিতে বলল। ইচিংকা বলল ঘাস-বড়ির কারখানায় কে যেন এমন এক বোমা লাগিয়ে রেখেছে যে গুহার দরজাটা খুলতে গেলেই সমস্ত কারখানাটা উড়ে যাবে। শুনে ব্যাব্যাবর কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল—'ঘাসবড়ি ছাড়া আমরা বাঁচব কি করে?'

ইচিংকা ফিস ফিস করে আমাকে বলল—'এবার দেখবে মজা।' বলেই ও ধোঁয়াটে হয়ে গেল। ব্যাব্যাবর ত তিড়িং করে লাফিয়ে টেবিলের ওপর চড়ে পড়ল—পাহাড়ী ছাগল বোধহয়—আর গোলমাল শুনে আরো পাঁচসাতজন ব্যাব্যারবীয় ঘরে ঢুকে পড়ল। আমি ত ভয়ে কাঠ, এবার দিল বুঝি সাবড়ে আমাদের। কিন্তু ওমা! আমি কই? আমি ত সব কিছু দেখতে পাচ্ছি, খালি নিজেকে ছাড়া—ইচিংকা আমাকে অদৃশ্য করে দিয়েছে! ওই যা, হোঁচট খেলাম একটা চেয়ারে—হোঁচট খেয়ে একটু আশ্বস্ত হলাম, অদৃশ্য হলেও শরীরটা আছে তবে! আর ইচিংকা? ইচিংকা দেখি ইতিমধ্যে এক সিংহ বনে গেছে। ঠিক সিংহ নয়, কারণ সিংহের ত শিংও থাকে না, ডানাও থাকে না—আবার সিংহের কেশরে ত সাধারণতঃ বোধহয় হলদে-বেগুনি ডোরাও থাকে না। তবে ছাগলকে শায়েস্তা করতে সিংহেরই দরকার বটে। ইচিংকা তেড়িয়া হয়ে উঠতেই সবক'টা ব্যাব্যারবীয় ঘরের কোণে গিয়ে আর্তস্বরে ব্যাঅ্যাঅ্যাঃ ব্যাঅ্যাঅ্যাঃ করে কান্না জুড়ে দিল। ইচিংকা তখন ঝটাপট লেকচার ঝাড়ল—'এইসব অসৎ, স্বার্থপর ব্যাব্যারবীয়দের জ্বালায় বিশ্বব্রহ্মান্ডের লোকের জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে করে সব ব্যাটাকে ধরে কোপ্তাকারী বানাই। না, তা চলবে না, এরা বোধহয় একে-বারে অখাদ্য...'

ব্যাব্যাবর করুণ স্বরে বলল—'ঘাসই যদি না পেলাম তবে এ জীবনই বৃথা। তাহলে স্বচ্ছন্দে আমাকে কোপ্তা, কাটলেট, রোস্ট—যা খুশি বানাতে পার।'

ইচিংকা চট করে কোত্থেকে একতাড়া কাগজ বের করে বলল—'তবে সই কর এই আন্তঃগ্রহিক চুক্তিতে! স্বীকার কর তোমরা কখনও পৃথিবী আক্রমণ করবার চেষ্টা করবে না আর যখন ঘাস দরকার হবে সব ন্যায্য দামে কিনবে।'

ব্যাব্যাবরের প্রাণের ভয় কাটতে এবার মানের ভয়ের উদয় হল। বলল—'কিন্তু এরকম চুক্তির কথা জানাজানি হলে যে আমি আর ব্যাব্যারবীয় সমাজে মুখ দেখাতে পারব না আর বিশ্বব্রহ্মান্ড-শুদ্ধু লোক যে ব্যাব্যারবীয়দের নিয়ে হাসাহাসি করবে।'

ইচিংকা এবার আমাকে দৃশ্য করে ফেলল, এবার আমার নিজের চেহারাতেই। বলল—'সে চিন্তা নেই। পৃথিবীর পক্ষে কেবল এই একজনই চুক্তিতে সই করবে, দরকার না হলে আর কেউ জানতেও পারবে না! আর ঘাস যদি একান্তই চাও তবে গোপনেও তা কিনতে পার যথাযথ দাম দিয়ে—কত দাম দিচ্ছ তা আন্তঃগ্রহিক ব্যবসায়ী মহলে প্রকাশ হবার দরকার নেই।'

ব্যাব্যাবর ত সুবোধ বালকের মত সই মারল। আমিও সই মারলাম। এবার ইচিংকা হঠাৎ আমাদের দুজনকেই অদৃশ্য করে বলল—'ছুট মারো আমার মহাকাশযানের দিকে, ব্যাটাদের যদি কিছু বদ মতলব থাকে!'

দৌড়...দৌড়...দৌড়।

যাক, ব্যাব্যারবীয়রা কি ঘটছে ঠিক খেয়াল করবার আগেই আমরা পগার পার। মহাকাশযানে চড়েই ইচিংকা রওনা দিল পৃথিবীর দিকে আর পথে আমাকে সব বুঝিয়ে বলল। ইচিংকা বলল—'চুক্তিটা দিয়ে আমরা জিজিং গ্রহে ফিরে গেলেই ব্যাব্যার-বীয়রা টিট হয়ে যাবে—কারণ আমি ত শুধু পোস্টম্যান নই, আমি আন্তঃগ্রহিক পুলিশবাহিনীর ডিটেকটিভও বটে। আপা-ততঃ পালাতে হল কারণ একটা চালাকি করলাম কিনা—ওই সিংহের মত জীবটা হচ্ছে ব্যাব্যারবীয়দের কাছে হুহুম গ্রহের অধিবাসী। হুহুমীয়রা ব্যাব্যারবীয়দের কাছে জুজুবিশেষ। কিন্তু একটু খোঁজ করলেই ত ব্যাব্যারবীয়রা টের পাবে যে হুহুমের কোনো মহাকাশযান চাঁদে নামেনি। কিন্তু তার আগেই যদি কেটে পড়তে পারি তবে ওদের মনে একটা সন্দেহ থেকে যাবে আর সেই সন্দেহবশতঃ পৃথিবী আক্রমণ করতে সাহস পাবে না।

সেই পোড়ো মাঠটায় আমাকে নামিয়ে দিয়েই তক্ষুনি ইচিংকা আবার ফিরে চলল ওর গ্রহে।

বেলা তখনও বেশি পড়েনি। চাঁদে যাওয়া-আসা সব নিয়ে বোধহয় ঘণ্টাদেড়েক কেটেছে। সবে বই-খাতগুলো গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করছি, এমন সময় ভয়ে লোম খাড়া হয়ে উঠল। ওকি? ব্যাব্যাবর এখানে এল কোত্থেকে? ও বাবা, এবার আমাকে একা পেয়েছে, না জানি কি করে! ওঃ, আসছে—আসছে তেড়ে। পালাবার চেষ্টা করলাম, হোঁচট খেয়ে পড়লাম। মাথা নামিয়ে শিং দিয়ে মারল গুঁতো। আমার ত চক্ষে সর্ষেফুল।

তারপর, কি বলি আর দুঃখের কথা, বাড়িতে বকুনির অন্ত রইল না।—'ইস্কুল পালিয়ে ছাগলামো করা হচ্ছে, না!' ছাগলের গুঁতো খেয়ে শিক্ষা হয়নি, আবার যত সব উদ্ভট গল্প বানানো হচ্ছে!' 'আরে মিথ্যে কথাই যদি বলবি ত সেগুলো একটু মাথা খাটিয়ে বের করতে পারিস না যাতে বিশ্বাসযোগ্য হয়!'

বড়দের নিয়ে যে কি করা যায়, তোমরাই বল? তা টুবলু আর মুবলুই যখন বিশ্বাস করল না, তখন বড়দের আর দোষ দিই কেন?

তবে একটা সান্ত্বনা আছে, ইচিংকার বারণ সত্ত্বেও কথাটা বলে ফেলার জন্য অনুশোচনা হচ্ছিল, তা কেউ বিশ্বাস করেনি যখন, আমার বলার জন্য কিছু ক্ষতি হবে না বোধহয়। তবে হ্যাঁ, বছরকয়েক বাদে যখন ঘাসের দাম সোনার দামের চেয়ে বেশি হবে তখন সকলের কেমন মুখ চুণ হবে তাই ভাবছি।

আর একটা কথা, ঘাসবড়ির মত একটা চিংড়ি-মালাইকারি বড়ি বানানো যায় না কি?

১৩৭৭

www.BanglaBook.org

এই বাঘটাই সেই বাঘটা

বিশ্বপ্রিয়

এক যে ছিল বাঘ।

তার যা চড়া রাগ, যায় না দেখা তেমন!

সব সময়ে কেমন—এই সে লাফায়, এই সে দাপায়,
নয়তো চেঁচায়—'হালুম'!

তখনই হয় মালুম, আসছে বিপদ ঘোর! বনের শমন, হাঁকার অমন চালায় যখন জোর। কারো ছাড়ান নেই। মরবে সকলেই।

তাই ভয়েতে চায় পালাতে—বনের পশু যত। কে চায় মিছে জান খোয়াতে বাঘের খুশি মত?

চায় না বলেই যে যেখানে পারে, আগেভাগে ছুট দেয় সেইধারে।

কেউ বা আবার বনের খাঁজে-খোঁজে, লুকিয়ে থাকার গোপন ডেরা খোঁজে।

হলে কি হয়, বাঘেরা নয়—আচরণে মোটেই সদয়। বরং ওরা খল জানোয়ার। মেজাজেও দারুণ গোঁয়ার! তাই কাউকে সামনে পেলে বাগ মানে না মোটে, ঝোপ-ঝাড় সব ঠেলে মেলে—তার পিছনে ছোটে।

শেষে কেমন তাক্ করে,
লাফ না দিয়ে গাঁক্ করে—
ঘাড়খানা ঠিক মটকে,
জাঁকিয়ে বসে ঝোপ আড়ে,
খুশ মেজাজে ভোজ সারে—
হাড়-মাস সব চটকে!

এমনি ভাবে শিকার ধরে, বনের ভেতর মজা করে দিন কেটে যায় তাই, ভাবনা ওদের নাই।

ভাবে কেবল তারা, নেহাত ভীরু যারা। এই মনে ভয়—কখন কি হয়, কে যায় হঠাৎ মারা!

সেই কারণে নিছক একা, কাউকে আদৌ যায় না দেখা—কখন দলছাড়া।

অথচ এই বনের ভয়
মনের কোণেই রেখে
সারা জীবন কাটাতে হয়—
সদাই সজাগ থেকে।

কাটায়ও তাই, অমনি সবাই। বন ছাড়া নাই—আর কোন ঠাঁই যখন কিছু জানা, মানে কপালখানা।

কপাল মেনেই বোঝে ওরা,
বনের জীবন আগাগোড়া
নয় নিরাপদ মোটে।
চলতি পথের আঁকেবাঁকে,
ওত পেতে যম বসেই থাকে,
নয় এসে ঠিক জোটে!

যা হোক এবার আসল খবর, শোনাই শোন কেমন। ঘটলো সেবার—দারুণ জবর ঘটনা এক এমন! তেমনটি আর যায় না দেখা বড়।

এই ধর না বাঘের কথাই ধর,—

বাঘ তো ছিল, সোঁদর বনের রাজা?

এই কারণেই তার, ঘটলে কসুর, কে তাকে দেয় সাজা? তেমন সাহস কার?

তাই নিয়ত মুখটি বুজে থাকতো সবাই।

ভাব দেখাতো এমন, যেন রাগ কোনো নাই—বাঘের উপর কারো। তাতেই পাজীর বদমেজাজীর চলতো জুলুম আরো।

তখন সে আর, ধারতো না ধার। ছুটতো কেবল এধার ওধার—শিকার ধরার তালে। সামনে পেত যখন যাকে, সুযোগ বুঝে মারত তাকে—লাফ দিয়ে এক চালে।

এতেই নাকি মনের গুমোর কত!
ধরাকে তাই ভাবতো সরার মত।

অথচ নেই তিল ধারণা, পড়ল বাঘের কোপে—ফালতু অমন গুমর কারো টেঁকেই নাকো ঘোপে। পরিণামে যা হয়, আদৌ ভালো তা নয়।

উট্‌কো যত ঝুট, ঝামেলায়, জীবন তখন কাটে হেলায়—জবুথবুর মত। তারপরেতেও কেমন আবার ঠেকার পড়ে মান খোয়াবার কারণ ঘটে কত।...সবাই অবগত।

এই তো সেদিন ঘটলো কি যে—সবটুকু তার শুনলে নিজে, ভাববে তখন মনে, এমনও হয় বনে! হয় মানে কি? ঘটলো যেটা, সেই কাহিনী বলছি হেথা।

ঘটনা এই,—

বাঘ মেরে এক বিশাল বুনো মোষে, পিয়াল গাছের ছায়ায় বসে, খেতে গিয়েই ফেঁকরা বাঁধায় এমন! সেই থেকে তার কেমন, জাগলো মনে বিকার।

তাই ধরে না শিকার—সুযোগ মতন লাফিয়ে তেড়ে মেরে, বুক কাঁপানো বিকট হাঁকার পেড়ে!

খাওয়া-দাওয়া? তাও দিয়েছে ছেড়ে। আগের মতন নেইকো রুচি তেমন। সব সময়েই মুখ গোমড়া কেমন!

জানো কি এর কারণখানা?

www.BanglaBook.org

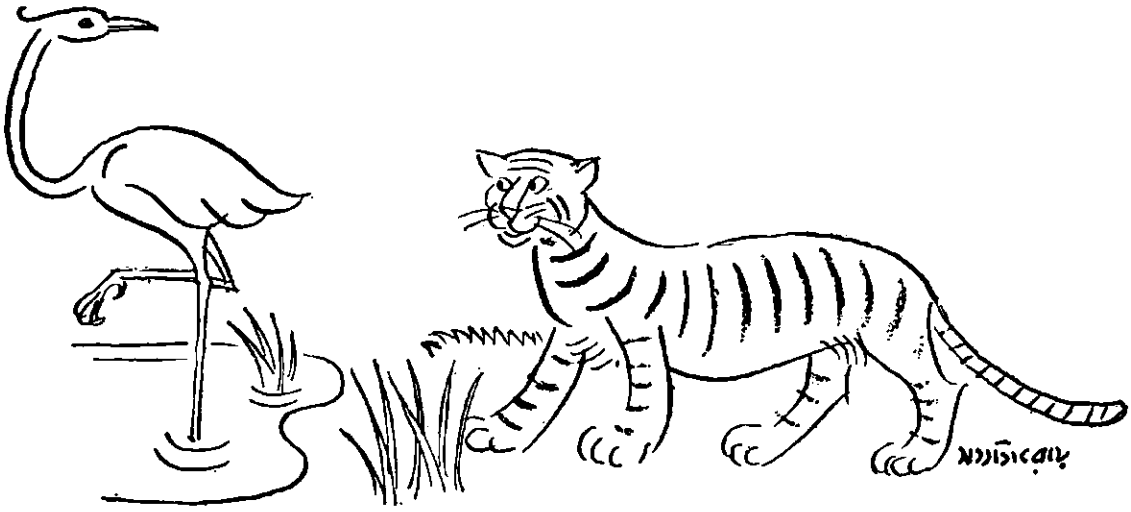

বাঘের কাজের, মন-মেজাজের কেন এমন টালবাহানা?

কারণ হ'ল এই—বাঘ পড়লো ভীষণ ফেরে! সেদিন বনে মোষটা মেরে—হঠাৎ খেতে গিয়েই।...গলায় এমন হাড় ফুটলো—সেই যাতনায় বাঘ ছুটলো—আওয়াজ তুলে গোঁ-গোঁ—হালুম-হালুম-ওহো!

তারপরে সে দেখলো যাকে,
ক'কিয়ে কে'দে বললো তাকে—
গেলুম মারা ছট্‌ফটিয়ে—
যে পারো আজ দাও হটিয়ে,
গলায় বে'ধা হাড়ের কুচি।
কথা দিলাম, যার যা রুচি
চাইলে কিছু তেমন দামী,
সেই উপহার দেব আমি।

বাঘের তখন বিপদ চরম! হয়ত তাতেই মেজাজ নরম এবং মুখের বচন যত, মধুর মতই মিঠে কত!

তবুও সেই কথায় ভুলে কেউ না এসে জোটে, আগেভাগেই চার-পা তুলে দুড়দুড়িয়ে ছোটে।...ছুটলো হরিণ। ছুটলো বানর। মোট্‌কা গতর হোঁত্‌কা শুয়োর। রইলো না কেউ কাছে, বাঘ ধরে খায় পাছে!

উপায়হারা বাঘ বেচারা, তখন কি সে করে? তাই হয়ে বেশ দিশেহারা—শুধুই ভেবে মরে।...ভাবার হেতু ভোগানী ভয়। কে জানে বা কখন কি হয়—এই ধারণা মনে, বেঘোরে জান যেতেই পারে। কে আছে হায়, বাঁচায় তারে ভিষক-ছাড়া বনে?

ভাবতে ভাবতে শেষে, বন ছাড়িয়ে এসে—দেখলো হঠাৎ চোখে...জল থৈ থৈ জলার কাছে, চুপটি করে বসে আছে—কে বটে ওই,—ও কে?

দীঘল ঠোঁট, দীঘল গলা, রঙটা বেশ উজল ধলা!...ওই তবে সেই বক নাকি, মাছ-মারা বক ঠক পাখি? হলোই বা ঠক মাছ-মারা বক রোগে আসান দিতে, ও-ই পারে এই গলায় আটক হাড়টা তুলে নিতে।...কে জানে কি ঘটতে পারে, যায় না কিছু-ই বলা। মেছো বকের চিকিৎসাতেও যায় সারানো গলা।

আর তবে ভয় কিসে? বাঘ খুঁজে পায় দিশে।

তাই না ডেকে বক-মামাকে
বলে, বাঁচাও আজ আমাকে,
গেলাম বুঝি মরে!
গলায় বে'ধা আপদটাকে,
বার করে দাও কোন ফাঁকে
তোমার ঠোঁটে ধরে।
মিললে আরাম বিনিময়ে—
ইনাম যা চাও খুশি হয়ে
দেব দু'হাত ভরে।
কথার খেলাপ হবে নাকো—
এইটুকু আজ জেনে রাখো:
দেখো কি হয় পরে।

ফিকিরবাজ বাঘের কথায় কেউ মানে না বশ। কারণ কি না, সব ঠাঁই ওর দারুণ অযশ! বকও তাই বাঘকে দেখে, কেমন যেন বসল বেঁকে! তাঁকার কারণ হঠাৎ করে—বাঘের কথায় মনে পড়ে।

—ঠিক বটে তো, নেই ভুল আর
এই বাঘটাই তবে,
কথামালা বইয়ের পাতার
সেই বাঘটাই হবে!
ঈশপ নামে কোন কথাকার
জানিয়ে গেছেন তাই—
জীবজগতে শঠ অত আর
ওর মত কেউ নাই।
উপকারীর ধারেই না ধার,
গুছিয়ে আপন কাজ,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেয় না ইনাম—দেয় সে মার—
এমনি ফিকিরবাজ!

যা হোক এ সব ভাবনা ছেড়ে—সেই মেছো-বক পাখ্না নেড়ে দায় এড়ানোর ছলে, বাঘকে তখন বলে—

হায় রামো ছিঃ! শুনছি কি আজ—
একটুও কি নেই ভয় লাজ
আমার খুদে বুকে?
কোন সাহসে বনের রাজার,
হাড়খানা ওই তুলি গলার।
মুখ ঠেকিয়ে মুখে!
এতে রাজার যায় যদি জাত—
নাই বাঁচোয়া, যাবেই নিপাত...
চাই না ইনাম ঘুষে।
তাই বলি কি মরুন-বাঁচুন—
মুখটি বুজে চুপটি থাকুন,
গলাতে হাড় পুষে!

এই না বলে বাঘকে ফেলে, বক গেলো তার ডানা মেলে—নীল আকাশে উড়ে। বাঘ কি করে? অগত্যা সে হতাশ হয়ে বনের ভেতর মরল মাথা খুঁড়ে।

১৩৮৪

গিরিডির স্মৃতি

হিতেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

। ১ ।

তখন আমার বয়স হবে আট কি নয়—আমরা গিরিডির বারগেন্ডা অঞ্চলে থাকতাম। বাড়িটার নাম ছিল 'লালকুঠি'—কেউ কেউ আবার 'আশুবাবুর বাংলো'ও বলত। আমরা গিয়েছিলাম চেঞ্জে, কিন্তু জায়গাটা আমাদের এত ভালো লাগল যে কয়েক বছর আমরা সেখানেই থেকে গেলাম, সেখানেই লেখাপড়া করতে লাগলাম। সেই সময় 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা আমার জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী গেলেন বায়ু পরিবর্তনে। তিনি আমাদের বাড়ির কাছেই একটা বাড়ি ভাড়া নিলেন। বাড়িটা ছিল বিখ্যাত ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের ছোটভাই নানুবাবুর। বাড়িটা উশ্রী নদীর ওপরেই—নামটা যতদূর মনে পড়ে 'নর্থ ভিউ'।

একদিন জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর আমাকে ডেকে বললেন, 'জেঠু, তোমাদের জন্য 'সন্দেশ' এনেছি।' ভাবলাম জ্যাঠামশাই হয়ত আমাদের জন্য সত্যি সত্যিই ভীমনাগের সন্দেশ কলকাতা থেকে এনেছেন। ছোটবেলা সন্দেশ খেতে ততটা পছন্দ করতাম না, গলায় কেমন যেন আটকে যেত, কাজেই সন্দেশের নাম শুনে খুব উৎসাহ পেলাম না। তবুও জ্যাঠামশাই যখন এনেছেন নিতেই হবে। রসিকপুরুষ ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর, আর শিশুমন কি করে জয় করা যায় তা তিনি বিশেষভাবেই জানতেন। একটা মোড়ক আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'জেঠু, এই নাও—আমার সামনেই খোল।' মোড়কটা খুলতে লাগলাম, কিন্তু কই—সন্দেশ বলে ত মনে হচ্ছে না? খুলতে খুলতে বেরিয়ে এল 'সন্দেশ' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা। ঘটনাটা ঠিক কোন সালের তা আর আজ মনে নেই, তবে পঞ্চাশ বছর আগের ত হবেই। বইগুলো হাতে পেয়ে সেদিন কি যে আনন্দ হয়েছিল তা বলতে পারি না। দৌড়ে গিয়ে একটা ঘরে বসলাম 'সন্দেশগুলো' নিয়ে—পড়তে পড়তে যেন কোন রাজ্যে চলে এলাম! পঞ্চাশ বছর আগে শিশুদের জন্য কয়েকটি মাত্র বাংলা পত্রিকা ছিল—এ বিষয় নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামাতো বলেও মনে হয় না। এরি মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর প্রতিষ্ঠা করলেন 'সন্দেশ'। তখনকার দিনে অনেক অভিভাবকের ধারণা ছিল ছোট ছেলেমেয়েরা পড়ার বই ছাড়া অন্য কোনও বই-ই পড়বে না। আমরা কিন্তু নিয়মিত ভাবে 'সন্দেশ' পড়তে লাগলাম—বাইরের জগতের সঙ্গে 'সন্দেশের' মাধ্যমেই আমাদের যোগসূত্র স্থাপিত হল। আমরা পৃথিবীর নানা জায়গার বিষয় কত কিছু জানবার সুযোগ পেলাম। সেদিন হেলেন কেলারের বিষয় পড়ে আমি বিশেষভাবে অভিভূত হয়েছিলাম, আজও মনে পড়ে।

উপেন্দ্রকিশোর যতদিন গিরিডিতে ছিলেন ততদিন বারগেন্ডার ছেলেমেয়েরা এত নূতন উৎসাহে মেতে উঠেছিল। উনি নিয়মিতভাবে রোজ বিকেলে বেড়াতে যেতেন—সঙ্গে জুটিয়ে নিতেন বারগেন্ডার অন্ততঃ কুড়ি-পঁচিশজন ছেলেমেয়ে। আমার স্পষ্ট মনে আছে, সেই সময়ের বিকেলগুলোর জন্য আমরা সারাদিন উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতাম, সারাদিনের কাজগুলি করতেও যেন রীতিমত উৎসাহ পেতাম। উপেন্দ্রকিশোর আমাদের নিয়ে যেতেন উশ্রী নদীর চরে। সেখানে ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি নানারকম খেলা করতেন। আজ ভাবলে সত্যিই আশ্চর্য মনে হয়—তাঁর বয়স তখন প্রায় পঞ্চাশ হবে, আর আমাদের মধ্যে যে সব চাইতে বড় ছিল তার বয়স হবে চোদ্দ।

www.BanglaBook.org

বয়সের এত পার্থক্য সত্ত্বেও মনে হত উনি যেন আমাদের সমবয়সী।

একটা খেলা ওঁর খুবই প্রিয় ছিল—নাম তার "যষ্টি হরণ" অর্থাৎ লাঠি চুরি করা। লাঠিটা অবশ্য তাঁরই ছিল, সেটাই চুরি করতে হবে। কুড়ি-পঁচিশ হাত ব্যাসের একটা চক্র করা হত বালির উপর দাগ কেটে, তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে পুঁতে রাখা হত তাঁর হাতের লাঠিটা। একজন হত পাহারাওয়ালা, সে লাঠিটা পাহারা দেবে কিন্তু তাকে লাঠিটা থেকে অন্ততঃ তিন হাত দূরে থাকতে হবে। আর অন্য সকলে চেষ্টা করবে লাঠিটা সরিয়ে আনতে। লাঠিটা চুরি করতে গিয়ে পাহারাওয়ালা যদি চক্রের ভিতর কাউকে ছুঁয়ে দেয়, তখন সে নেবে পাহারাওয়ালার স্থান। আর সত্যিই যদি কেউ লাঠিটাকে সরিয়ে আনতে পারে, তাহলে পাহারাওয়ালার হবে শাস্তি। বিচারকের ভূমিকায় থাকতেন উপেন্দ্রকিশোর নিজে। শাস্তিও খুব মজার—ষোলবার জোরে জোরে লাফাতে হবে। উদ্দেশ্য ছিল বোধহয় দৈহিক পরিশ্রম। এই দলের মধ্যে ছিল আমার দিদি ইন্দু, জ্যাঠতুত বোন বুলুদি, পিসতুত বোন মালতীদি ও এদেরই সমবয়সী কয়েকজন তের-চোদ্দ বছরের মেয়ে। এরা কেউ কেউ কিছুতেই লাফাতে চাইত না, লজ্জা পেত। তাদের জন্য উপেন্দ্রকিশোর অভিনব শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদের শাস্তি ছিল একটা করে গান গাওয়া। উপেন্দ্রকিশোর গানবাজনা অত্যন্ত ভালবাসতেন—এটা তারই একটি ছোট্ট পরিচয়। শিশুরাই একদিন হবে জাতির কর্ণধার, কাজেই বলিষ্ঠ জাতি গড়ে তুলতে হলে—শিশুদের শরীর ও মনকে প্রথমে সুস্থ ও সবল করে গড়ে তুলতে হবে, এটাই ছিল উপেন্দ্রকিশোরের স্বপ্ন—কাজেই তিনি শিশুদের নিয়ে মেতে থাকতেন।

একবার গিরিডিতে বোলতার খুব প্রাদুর্ভাব হল। সারাদিন কানের কাছে ভন্‌ভন্‌, খাবারের জিনিসের ওপর ভন্‌ভন্‌, অনেকেই বোলতার কামড় খেতে লাগল—সকলেই অস্থির হয়ে উঠল। প্রত্যেক বাড়িতেই এক কথা, 'কি আপদ এসে জ্বালিয়ে মারল!' সেই সময় একদিন সকালবেলা কি কাজে জ্যাঠামশাইর বাড়িতে গেছি। জ্যাঠামশাই তখন বেহালা বাজাচ্ছিলেন, আমার গলা শুনে আমায় ডাকলেন—তাঁর ঘরে গেলাম। খুব মজা করার মত মাথা নেড়ে আমায় বললেন, "জেঠু, একটা বোলতা ত আমায় মেরে দিতে হচ্ছে, কিন্তু দেখো ওর গায়ের কোনও অংশে যেন আঘাত লেগে কোনও রকম জখম না হয়।' জ্যাঠামশাইর এ কাজটা পেয়ে যেন নিজেকে 'হিরো' বলে মনে হল।

জ্যাঠাইমার এক ভাইয়ের ছেলে সুধীরও ওঁদের বাড়িতে থাকতো—সুধীর আমারই সমবয়সী ছিল। আমরা দুজনে মিলে জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলাম কি ক'রে বোলতা মারা যায়, অথচ তার কোন অঙ্গ জখম হবে না। ভয়ও ছিল, মারতে গিয়ে আবার কামড় না খাই। অনেক পরামর্শ করে উপায় ঠিক করা হল। একটা হাতপাখার বাতাস দিয়ে একটা বোলতাকে ধরাশায়ী করব, আর সুধীর একটা বাটি চাপা দিয়ে ওটাকে বন্দী করে ফেলবে। এর পর আমাদের বন্দী শত্রুকে একটা গরমজলের পাত্রে ফেলে হত্যা করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু হয়ে গেল এবং অনায়াসে তা সম্পন্নও হয়ে গেল। তারপর আমাদের মৃত শত্রুকেও নিয়ে গেলাম জ্যাঠামশাইর ঘরে। উনি বোলতাটাকে খানিকক্ষণ হাতে নিয়ে পরীক্ষা করলেন, তারপর আমাদের 'সাবাস' বলে পিঠ চাপড়ে দিলেন।

সব চাইতে অবাক হলাম, ঠিক পরের মাসেই দেখলাম 'সন্দেশে' উপেন্দ্রকিশোরের লেখা একটি প্রবন্ধ—নাম 'বোলতা'। তাতে একটা বোলতার ফোটোও ছিল। সকলের কাছেই গর্ব করে বলতে লাগলাম—আমরাই বোলতাটা মেরে জ্যাঠামশাইকে দিয়েছিলাম। এখানে উপেন্দ্রকিশোরের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির একটা পরিচয় পাওয়া যায়। গিরিডির সকলেই যখন বোলতার উৎপাতে উত্যক্ত, উপেন্দ্রকিশোর তার ভিতর থেকেই শিশুমনের খোরাক যোগড় করে দিলেন।

মাঝে মাঝে উপেন্দ্রকিশোর গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে আমাদের বলতেন। যেদিন খুব পরিষ্কার আকাশ থাকত, সমস্ত তারা স্পষ্ট ফুটে উঠত আকাশে, উনি ছোটদের নিয়ে জড়ো করতেন তাঁর গিরিডির বাড়ির মাঠে। তারপর শুরু করতেন গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে তাঁর কথা। কত মজার করে, কত পৌরাণিক গল্পের ভিতর দিয়ে আমাদের অতি সহজে পরিচয় করিয়ে দিতেন

www.BanglaBook.org

ওগুলোর সঙ্গে। সেসব দিনের কথা কোনোদিন ভুলব না। কতদিন হয়ে গেছে কিন্তু মনে হয় যেন সেদিনের ঘটনা। আজও আকাশে 'কালপুরুষ' দেখলে সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠামশাইর কথা মনে পড়ে।

। ২ ।

আর একটি লোকের সান্নিধ্যে এসেছিলুম গিরিডিতে। তিনি হলেন বাংলা শিশু সাহিত্যের সম্রাট, বিখ্যাত 'হাসিখুসির' লেখক যোগীন্দ্রনাথ সরকার। নূতন করে তাঁর পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। যোগীন্দ্রনাথের মত এমন হাস্যরসিক লোক আর কখনও দেখিনি। প্রত্যেক কথার মধ্যেই যেন তাঁর কৌতুক ছড়িয়ে থাকত। শিশুদের দেখলে উনি সব ভুলে যেতেন। যোগীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করতে আমাদের শিশুমন সর্বদাই উৎসুক থাকত। কত মজার মজার গল্প উনি আমাদের বলতেন। ওঁকে দেখলেই আমরা বলতাম, 'মেসোমশাই একটা গল্প বলুন।' তাঁকেও আমাদের কাছে গল্প বলতে কখনও আপত্তি করতে শুনিনি।

তাঁর বারগেন্ডার বাড়ি 'গোলকুঠিতে' রোজ গিরিডির জ্ঞানীগুণীদের আসর বসত। 'গোলকুঠির' সামনে বেশ বড় একটা খোলা বারান্দা ছিল, তাতে গোল করে বাঁধানো বসবার জায়গা ছিল—সেখানেই আসরটা বসত। সন্ধ্যেবেলা 'গোলকুঠির' সামনে দিয়ে গেলে যোগীন্দ্রনাথের প্রাণখোলা হাসি সর্বদাই শোনা যেত।

যোগীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি মজার ঘটনা বলব। একদিন তিনি আমাদের গিরিডির বাড়িতে এলেন বেড়াতে। মা খাবার দিয়ে গেলেন, আর উনি খেতে খেতে আমাদের সঙ্গে মজার মজার গল্প বলতে লাগলেন। এমন সময় মা আবার একটা মিষ্টি এনে ওঁকে খাবার জন্য পেড়াপিড়ি করতে লাগলেন—উনি বললেন, 'না না, আবার দেবেন না, আমি আর খেতে পারব না—এত খেয়ে প্রাণটা আমার একেবারে গলা পর্যন্ত এসে গেছে, এরপর আরও একটা খেলে এক্ষুনি প্রাণটা বেরিয়ে যাবে।' এমন মজা করে কথাগুলি বলছিলেন যে আমরা না হেসে থাকতে পারলাম না, তবুও আমরা জোর করে বলতে লাগলাম, 'না মেসোমশাই, আপনার এই মিষ্টিটা খেতেই হবে।' উনি ছিলেন শিশুদের বন্ধু, তাই ওঁকে খাওয়াতে পারলেই যেন আমাদের পরম তৃপ্তি। শেষে উনি বললেন, 'তাহলে তোমরা চাও যে আমি মরে যাই? আচ্ছা, তাই হোক।' এই বলে মিষ্টিটা মুখে দিয়ে খেতে খেতে হঠাৎ চোখ বন্ধ করে খাটের ওপর দুম করে পড়ে গেলেন।

আমরা ভয় পেয়ে বলে উঠলাম, 'কি হল, মেসোমশাই, কি হল?' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রসিকপুরুষ যোগীন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে উঠে বসে বললেন, 'আরে প্রাণটা ত গলার কাছেই এসে গিয়েছিল, মিষ্টিটা খেতেই যে জায়গাটুকু ছিল ওটাই ও দখল করে নিল আর প্রাণটা টুপ্ করে বেরিয়ে গেল'। তাঁর বলার ভঙ্গিতে আমরা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লাম। শিশুমনকে আকর্ষণ করবার কি অদ্ভুত ভঙ্গি। এমনিই ছিল তাঁর শিশুদরদী মন। যোগীন্দ্রনাথকে বাংলার শিশুরা কোনোদিনই ভুলবে না। আজ পঞ্চাশ বছরেরও ওপর হয়ে গেছে এসব ঘটনা কিন্তু এখনও যেন চোখের সামনে ভাসে। সত্যিই আমরা ভাগ্যবান যে এ সমস্ত লোকের সাহচর্যে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল।

*

একবার দাদা অর্থাৎ 'আবোল তাবোলের' লেখক সুকুমার রায় গিরিডিতে গেলেন। তার পিতা উপেন্দ্রকিশোর তখন গিরিডিতে ছিলেন না, কাজেই দাদা এসে আমাদের সঙ্গে 'লালকুঠিতেই' রইলেন। দাদাকে পেয়ে তখন আমাদের সে কি আনন্দ, যেন ঠিক উপেন্দ্রকিশোরেরই প্রতিচ্ছায়া। সদা হাস্যময় রসিক পুরুষ। দাদার বয়স তখন খুব কম, সবেমাত্র বিলেত থেকে ফিরেছেন কিন্তু তাঁর প্রতিভ এরই মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

উনি গিরিডিতে যেতেই সেখানকার যুবক সম্প্রদায় একদিন আমাদের বাড়ি এসে দাদাকে 'পূর্ণিমা সম্মেলন' করতে অনুরোধ করল। দাদারও এ সবে খুবই উৎসাহ ছিল, কাজেই আমাদের বাড়িতে রিহার্সাল আরম্ভ হয়ে গেল। অন্যান্য নাচগানের সঙ্গে তাঁরই লেখা 'ভাবুক সভা' ও 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'। 'ভাবুক সভায়' দাদা নিলেন ভাবুকদাদার পার্ট, আর 'লক্ষ্মণের শক্তিশেলে' রামের পার্ট। তখনকার রিহার্সালের দিনগুলোকে আজও মনে হয় আমরা যেন কোন এক স্বপ্নরাজ্যে ছিলাম। দিনগুলো কেমন করে কেটে যেতে লাগল তা যেন বুঝতেই পারলাম না। এখানে একটা বড় মজার ঘটনা ঘটেছিল—সেটা আর না বলে পারছি না। ট্যাম্‌বাবু বলে—ভদ্রলোকের নামটা আজ আর মনে নেই, সকলে তাঁকে ঐ নামেই ডাকত, টম্ থেকে ট্যাম্ হয়েছিল কিনা জানি না—গিরিডির একটি যুবক এসে দাদাকে ধরলেন, তাঁকে একটা পার্ট দিতে হবে। তাঁকে একটু পরীক্ষা করে দেখা গেল একটা কথাও বলতে পারে না, অথচ তাঁর স্টেজে ওঠার ভীষণ সখ। শেষে অনেক সাধাসাধির পর দাদা তাঁকে রামের অতিরিক্ত একজন সভাসদের পার্ট দিলেন যাতে একটা মাত্র কথা তাঁকে বলতে হবে। একটা দৃশ্যে যখন হনুমানকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—তখন উনি শুধু বলবেন, 'হনুমান ব্যাটা গেল কোথায়,' এই পার্টটুকু পেয়েই ট্যামবাবুর কি উৎসাহ। তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলতে শুরু করে দিলেন—তাঁর মোটেই পার্ট নেবার ইচ্ছে ছিল না, সুকুমারবাবু নিজে ডেকে তাঁকে পার্ট দিয়েছেন, সুকুমারবাবুকে ত আর না বলা যায় না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ট্যাম্‌বাবুকে নিয়ে গিরিডির ছেলেমেয়েরা নানারকম ঠাট্টা-তামাসা করত, কাজেই তাঁর একথা শুনে সবাই একটু অবাক হয়ে গেল, সবাই ভাবল দেখা যাক ট্যাম্‌বাবু কি করেন। তারপর একদিন 'পূর্ণিমা সম্মেলন' হল। গিরিডির সবাই গিয়ে জড়ো হল সম্মেলনে যোগ দিতে, হলও খুব চমৎকার। এরপর গিরিডিতে অনেকবারই 'পূর্ণিমা সম্মেলন' হয়েছে কিন্তু তেমনটি আর হয়নি। তবে ট্যাম্‌বাবু বেশ একটা হাসির ব্যাপার করে ফেললেন। তিনি 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকে প্রায় প্রত্যেক দৃশ্যেই রামের সঙ্গে সভায় আসতে লাগলেন কিন্তু কোনও কথা নেই।

প্রত্যেকবারেই স্টেজে এসে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মন চলে যাচ্ছিল দর্শকদের কাছে—তাঁকে দেখে দর্শকরা কি ভাবছে—বিশেষ করে মেয়েরা। তারপর এল তাঁর কথা বলার পালা কিন্তু তাঁর দৃষ্টি তখন দর্শকদের দিকে গভীর ভাবে নিবিষ্ট—সেই দৃশ্যে যে কি হচ্ছে সেদিকে তাঁর কোনও খেয়ালই নেই। এদিকে হনুমানের খোঁজ পড়েছে, অথচ ট্যাম্‌বাবুর কোন উচ্চবাচ্য নাই, তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন দর্শকদের দিকে।

www.BanglaBook.org

পাশেই রামবেশে দাদা ছিলেন—উনি ট্যাম্‌বাবুর অন্যমনস্কতা লক্ষ করে ওর হাঁটুতে দিলেন এক রামচিম্‌টি। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাম্‌বাবু উঃ—বলে এক চীৎকার, আর সঙ্গে দর্শকদের হোঃ হোঃ করে সে কি হাসির ধুম। এদিকে নিরুপায় হয়ে পাশ থেকে আর একজন সভাসদ্‌ যখন বলে উঠলেন, 'হনুমান ব্যাটা গেল কোথায়', তখন ভদ্রলোকের চৈতন্য হল, তিনি লম্বা জিব কেটে ফেললেন। এই নিয়ে সেদিন নাটকের পর সকলে মিলে ট্যাম্‌-বাবুকে যা নাস্তানাবুদ করেছিল তা আর বলার নয়।

দাদার গল্প বলার ভঙ্গি ছিল অসম্ভব মজার। ছোট ছোট ঘটনা অথবা গল্প এমন মজার করে, এমন রস দিয়ে বলতেন যে হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাবার জোগাড় হত। গিরিডিতে আমরা ছোটরা একদিন দাদাকে ধরলাম একটা গল্প বলার জন্য। দাদা হেসে বললেন, 'আচ্ছা, একট ছোট গল্প বলছি শোন।' আমরা তাঁর চারপাশে গোল হয়ে বসলাম। গলাটা অদ্ভুত ধরনের করে বলতে শুরু করলেন,—'নীলুখুড়ো মফঃস্বল থেকে রোজ ট্রেনে করে যেতেন কলকাতা, কোন এক অফিসে কাজ করতে। একদিন ট্রেনে উঠতে গিয়ে নীলুখুড়ো কাটা পড়লেন। তাঁর কোমরের কাছ থেকে দু'ভাগ হয়ে গেল, আর নীলুখুড়োর নীচের দিকটা ট্রেনের তলায় কোথায় যে চলে গেল তা আর খুঁজেই পাওয়া গেল না। তাড়াতাড়ি ওঁর ওপরের দিকটাই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। একটা গরুও সেই সময়ে সেই ট্রেনেই কাটা পড়েছিল। তক্ষুনি গরুর নিচের দিকটা নিয়ে গিয়ে নীলুখুড়োর কোমরের সঙ্গে সেলাই করে জুড়ে দেওয়া হল। নীলুখুড়ো হাসপাতালে আস্তে আস্তে ভাল হয়ে উঠলেন, আবার ট্রেনে চড়ে যাতায়াত করতে লাগলেন। দস্তুরমত কোটপ্যান্ট পরে অফিসের টেবিলে বসে কাজকর্মও করতে লাগলেন। আর সব চাইতে মজার হল নীলুখুড়ো ত্রিশ টাকা করে মাইনে পান আর ত্রিশ সের করে দুধও দেন।'—শুনেই আমরা হো হো করে হাসতে লাগলাম ; হাসি আর থামতেই চায় না। আজ কত বছর হয়ে গেছে, আমি অনেক আসরে এখনও সুকুমার রায়ের নাম করে নীলুখুড়োর গল্পটা বলি—গল্প শুনে ছোট বড় সকলেই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে, সকলেই বলে—কি আশ্চর্য ক্ষমতা! এতবড় প্রতিভার কত তাড়াতাড়ি অবসান হয়ে গেল—কত অল্প বয়সে দাদাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হল। এই গল্পটি সন্দেশেও প্রকাশিত হয়েছিল।

আজ গিরিডি আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, আর হয়ত কোনদিন সেখানে যাওয়াও হবে না কিন্তু গিরিডির হারানো দিনের কথা ভোলা অসম্ভব। আজ স্মৃতি মন্থন করতে গিয়ে গিরিডির আরও কত কথা, কত ঘটনা মনে পড়ছে কিন্তু সব এখনি আর লেখা সম্ভব নয়। ১৩৭৩

লাস্ট ম্যান

অজয় হোম

লাস্টম্যান!

মাঠে ঢুকছে। ফিল্ডাররা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এতক্ষণ ধরে খাটাখাটুনি এবার শেষ হবে। ওঃ, দশ নম্বরী ব্যাট যা না একটা মারকুটে ছিল! সারা মাঠটাকে কি ভাবে না চষিয়েছে। গরমে রোদে শীতের দিনেও গলদ্‌ঘর্ম। এখন যেন একটু আরাম লাগছে। হয় এক বল না হয় আর ক'টা বলের মধ্যেই প্রতি-পক্ষের ইনিংস হবে শেষ। এবারে দম ফেলতে পারব।

লাস্টম্যান সাধারণত বোলাররাই হয়ে থাকে আর দলের মধ্যে যে ব্যাটিং-এ সব চেয়ে খারাপ সেই শেষে আসে। তারপর সে যখন বেগ দিতে থাকে, তখনই হয় মুশকিল। সব ফিল্ডার-দের মাথা গরম হয়ে ওঠে। ওভার থ্রো হয়, অতিরিক্ত সচেতনতার ফলে ক্যাচ পড়ে, পায়ের তলা দিয়ে বল গলে। সে এক বিতি-কিচ্ছিরি ব্যাপার।

মনে মনে এবার একবার উলোটপুরান কল্পনা কর। ধরে নাও, টেস্টম্যাচ হচ্ছে ভারতের সঙ্গে ইংল্যান্ডের। এই টেস্টের ফলাফলের ওপর রাবার নির্ভর করছে। বেদি ত এখন অল-রাউন্ডার—সে খেলছে। প্রসন্ন আউট হয়ে গেল, বেদি লাস্ট বলে রান নিতে পারল না। চন্দ্রশেখর মাঠে নামছে। ইংল্যান্ড দলের সকলের সারা মুখে আনন্দের আভা। নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা মশকরা। বেদির সঙ্গেও। আর গোটা তিরিশেক রান করতে পারলেই ভারতের জয়। মাঠশুদ্ধ লোক এবং দু'দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ই জানে—ভারতের কোনো আশা নেই। সেই সময় দেখা গেল, চন্দ্রশেখর খুব আস্থার সঙ্গে ব্যাট করে চলেছে। চারও মারল একটা নিভুল ভাবে। দুই ফিল্ডারের মাঝে বল ঠেলে রানও নিচ্ছে। এমনকি বেদির অনিচ্ছাসত্ত্বেও লাস্ট বলে রান নিয়ে নিল—এত আস্থা। তিরিশ রানের ব্যব-ধান ক্রমে কমে আসছে। প্রতিটি দর্শক, প্যাভিলিয়নের প্রতিটি লোক উত্তেজনায় থরথর। কাঁপছে। ইষ্টনাম জপছে। নিশ্বাস ফেলাও হয়ে উঠেছে কষ্টকর।

গ্রেগ সাহেব উইলিস-ওলড-লিভারদের দিয়ে বাম্‌পার-বাউন্সার, মাথাভাঙ্গা পাঁজরভাঙ্গা বল যেমন দেওয়াচ্ছে—থেকে থেকে তেমনি স্পিনবোলার আনডারউডদেরও আনছে। নিজেই বল দিয়ে এলিয়ে পড়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। চন্দ্রশেখর অবিচলিত। যেন পোড়খাওয়া ব্যাটস্‌ম্যান। বাম্‌-পারের বিরুদ্ধে কখনও বলের লাইন থেকে সরে যাচ্ছে শেষ মুহূর্তে, কখনও বা মাথা নিচু করছে, বসে পড়ছে। সোজা ব্যাটে নিখুঁত ফুটওয়ার্কে প্রতিটি বল মোকাবিলা করে চলেছে। ইংল্যান্ডের গ্রেগের কালঘাম ছুটছে। তার চুল ইজ দি খাড়া! কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। এভাবে শেষ জুটিতে—তাও আবার

www.BanglaBook.org

একবলের খদ্দের চন্দ্রশেখরের হাতে ইংল্যান্ডের ভরাডুবি! রাবার হাতছাড়া? ভাবা যায়? সত্যি যদি এমন হত.....!

আমরা তিন বন্ধু তখন থার্ড, সেকেন্ড ও ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্র। এখনকার ভাষায় ক্লাস এইট, নাইন ও টেন। খেলতাম শ্যামবাজার দেশবন্ধু পার্কের দক্ষিণ কোনায় একটা মাঠে। তখন আসল বিলেতের এম সি সি—মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব ভারত সফর করছে এ আর গিলিগানের নেতৃত্বে। সুতরাং এম সি সি নামটা নিতে হবে। ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেছিল পমি, রমি আর গৌর। পমির খবর জানি না। রমি—সৌমেন মুখোপাধ্যায় পরে বড় ফিল্ম ডিরেক্টর হয়েছিল। আর গৌরের ছেলে এখন কলকাতার মাঠে একজন বড়ো ক্রিকেট খেলোয়াড়। আর সঙ্গে ছিল কমল—কমল ভট্টাচার্য, যার মুখ থেকে তোমরা আকাশবাণীতে খেলার বেতার ভাষ্য শুনে থাক। তাকে ডাকতাম 'ক্যামেল' বলে। তার দাদা ভজা—বিমলও ছিল। ছিল সুধীর চ্যাটার্জি, যে পরে হ্যাসেটের দলের বিরুদ্ধে ইডেনে খেলেছে। এরকম আরো অনেকে ছিল আমাদের ক্লাবে।

আমাদের একজন ফাস্ট বোলার ছিল। তাকে ডাকতাম 'লম্বু' বলে। ওই নামই ছিল চালু। খুব সম্ভব তার আসল নাম শৈলেন। ঠিক মনে পড়ছে না। সে কথা বলত কম কিন্তু বল করত বেশ জোরের ওপর। বল দু'দিকেই হাওয়ায় বেঁকত। আমরা বলতাম, ওরে লম্বু, তোর বল বেশ 'সোয়ার্ভ' করছে রে। ঠিক মত পিচ ফ্যাল। তখন 'সুইং' নাম জানতাম না। জানতাম না তার দুই শ্রেণী বিভাগ—ইন ও আউট; ওসব সে যুগে চালু ছিল না। এখন বুঝি লম্বু ন্যাচারাল সুইং বোলার ছিল।

বাৎসরিক পরীক্ষা হয়ে যাবার পর, বাড়ির সামনে গলিতে সকাল থেকে টেনিস বলে চলত গলি-ক্রিকেট। ভাঙত বসবার ঘরের আলমারি, ছবির কাঁচ। কমলদের বাড়ির ভাতের হাঁড়ি বা ডালের বাটিতে গিয়ে বল পড়ত। পাড়ার কাকাবাবু যিনি সন্ধ্যেবেলায় নিজস্ব এবং বিকৃত সুরে তবলা সহযোগে পাড়া ফাটিয়ে গান গাইতেন, তাঁর অফিসে বেরোনোর সময়, আমরা টিপ করে ব্যাট দিয়ে খেলে গায়ে বল মারতাম। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ছুটতাম ডিউস বলে ক্রিকেট খেলতে দেশবন্ধু পার্কে। আমাদের মত ছোটো দলের সঙ্গে ম্যাচ খেলাও হত।

ধীরবিক্রম ওয়াই. এম. সি. এ.-তে থেকে পড়তো। সেই বন্দোবস্ত করেছিল ওদের মাঠে, ওদের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার। ওয়াই. এম. সি. এ. বনাম এম. সি. সি.।

আমরা দশটার মধ্যে মাঠে গিয়ে হাজির। 'ক্যামেল' বা কমল বোধ হয় ক্যাপটেন ছিল। টসে হেরেছিলাম কি জিতেছিলাম মনে নেই। সাড়ে দশটায় খেলা শুরু হল। আমরা ফিল্ডিং করতে নামলাম। লাঞ্চের পরেও ওরা খেলে সবাই আউট হল, বোধ হয় ১৫৬ রানে। দু'একজন ফোর্সফুল বা মারকুটে ব্যাটধারী ছিল, খুব খাটাল। উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে ওঠাবাস করেছি সমানে। লম্বু মোটেই বল করতে পারেনি। কোন ক্রমে তিনটে উইকেট নিয়েছিল। কমলই নিয়েছিল বেশি। লম্বু পুজোর ছুটিতে দেশে গিয়েছিল। পরীক্ষার দু'তিন দিন আগে ফিরেছিল। ও এর আগে এবারে কোন ম্যাচ খেলেনি। এই প্রথম মাঠে নামছে। অনভ্যাসে বল ঠিক মত করতে পারল না বলেই মনে হল। স্টাম্পের বাইরেই বল পড়ছিল বেশি। বল ধরতে বেশ বেগ পাচ্ছিলাম। বাইও হচ্ছিল!

আমাদের আটটা উইকেট পড়ে গেছে। বোর্ডে ১৪৪ রান।

দু'ওভার বাকি। কোন ক্রমে দু'ওভার কাটালেই খেলা ড্র। আমি আর ভানু খেলছি। ভানু বেশ খেলছিল। জেতার জন্য বাকি তের রানের কথা চিন্তাই করছি না। হঠাৎ থার্ড বলে ভানুর অফ স্টাম্পের বেলটা উড়ে গেল এক অপ্রত্যাশিত ভালো বলে।

লাস্টম্যান লম্বু আসছে। আর কোনও আশা নেই। তিনটে কেন, ও একটা বলও কোনও দিন আটকাতে পারেনি। ধীরবিক্রমের কাছে দলের ছেলেরা শুনেছে ও একদম ব্যাট করতে পারে না। কি উল্লাস ওদের! লম্বু ক্রিজের কাছে আসতে কাছে গিয়ে বললাম, 'লম্বু ভাই, আনাড়ির মত হাঁকড়াবার চেষ্টা করবি না। সোজা ব্যাটটা শুধু স্টাম্পের সামনে খাড়া রাখিস। বাইরের বল মারবার বা খোঁচা দেবার চেষ্টা করিসনে। পারবি না ভাই তিনটে বল আটকাতে?'

ও ঘাড় নেড়ে বোকার মত মৃদু হেসে বলল, 'চ্যাষ্টা করুম।' কোনও দিনই ওকে গার্ড নিতে দেখিনি। আগের লোকেরা যেখানে ব্যাট করে যাওয়ার জন্যে দাগ কেটে সেখানে ব্যাট রেখে বলের জন্যে অপেক্ষা করে। বল এলেই ব্যাটটা ঘুরিয়ে দেয় আর তেকাঠি ফাঁক হয়ে যায়। সেই লম্বু গম্ভীর হয়ে আম্পায়ারকে বলল, ওয়ান লেগ। অর্থাৎ লেগ স্টাম্প গার্ড দাও। আমি হতভম্ব। সব ফিল্ডাররা ওকে ঘিরে ধরেছে। বোলার দৌড়ে এসে বল ছাড়ল। লেগ স্টাম্পের ওপর বল। লম্বু একটু এগিয়ে হাফভলি করে নিয়ে ব্যাট শূন্যে তুলতেই আমি চোখ বুজিয়ে ফেলেছি। এখুনি কানে আসবে তেকাঠিতে বল লাগার অবিস্মরণীয় আওয়াজ। কানে এল ব্যাটে-বলে সম্পর্কের আওয়াজ। চোখ খুলে গেল আপনা থেকেই। আমার মাথার উপর দিয়ে বল উড়ে চলেছে। মাঠ পার! ছক্কা!!

'এই লম্বু কি হচ্ছে? একটা আন্দাজে লেগে গেছে। আর দুটো বল কোনরকমে আটকা। বাকি ওভারটা আমি সামলে দেব। ইয়ারকির সময় নয়। আটকা ভাই। প্লিজ হাঁকড়াস না।'

ওর এক জবাব—চ্যাষ্টা করুম।

অফস্টাম্পের ওপর বল। দেখছি বলের লাইনে লম্বু বাঁ-পা বাড়িয়েছে। ব্যাটটা তুলেছে লেগস্টাম্পের ওপর। বাঁ হাতের কনুই ভেঙে বলের দিকে কোমরটা একটু বেঁকিয়ে ব্যাটটা নিয়ে এল বাঁ-পায়ের গোড়ায়, যেখানে বলের সঙ্গে ব্যাটের

www.BanglaBook.org

সম্পর্ক হল। ব্যাট কাঁধের ওপর ফিনিশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক্স্ট্রা কভার দিয়ে গোলার মত বল ছুটে গেল মাঠের বাইরে। এত ভাল কভার ড্রাইভ আমরা কেউই কোনোদিন মারিনি। শুধু দেখেছি সাহেব-সুবোদের মারতে।...এ ত আন্দাজ নয়! লম্বু কোথায় শিখল এ মার! কারুর মুখে কথা সরছে না। মাঠ শুদ্ধু লোক হতবাক্। নিশ্চুপ। লম্বু মারছে কভার ড্রাইভ! অচিন্তনীয়!...বিস্ময়ের আরও বাকি ছিল। শেষ বল। অফস্টাম্পের একটু বাইরে ফোর্থ কি ফিফথ্ স্টাম্প হবে। ডান পা বলের লাইনে বাড়িয়ে যা একটি কাট মারল কাঁধ আর ফোরআর্মের জোরে তা ভাবাই যায় না! ম্যাচ জিত! উল্লাসে আমরা সবাই লম্বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

ফেরার সময় ট্রামে লম্বুকে পাশে বসিয়ে এই খেলার রহস্য জিজ্ঞেস করলাম। প্রথমে বলতেই চায় না, লজ্জা পায়। অনেক কষ্টে পরে বলে যে, এবার ছুটিতে ওর ছোটকাকার বন্ধু বাংলার স্বনামধন্য হেমাঙ্গ বসু ওকে শিখিয়েছেন। বলেছিলেন তোমার এমন শরীর, বল কর এত ভালো আর ব্যাট করতে পার না? ছিঃ! প্রতিদিন অত্যন্ত ধৈর্য ধরে শিখিয়েছেন। বাড়িতে আয়নার সামনে ব্যাট নিয়ে কী ভাবে শ্যাডো-প্র্যাকটিস করতে হয়—তাও দেখিয়েছেন। সে রোজ বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাই করে। আর কলকাতার বাড়ির পাশে শিবশঙ্কর মিত্র লেনে যে জমিটি খালি আছে, সেখানে ছোট ভাইকে দিয়ে রোজ বল করায় আর মার প্র্যাকটিস করে। বল করার অভ্যাসটা কমে যাওয়ার জন্যে বল আজ ভাল পড়েনি। জীবনে এমন লাস্টম্যানের আর সাক্ষাৎ পাইনি। ১৩৮৪

ভূতের ওঝা

শৈল চক্রবর্তী

ঘুঘুডাঙ্গার গলির ধারে
গা-ঢাকা এক অন্ধকারে
সেদিন দেখি মাথায় নিয়ে
ছোট্ট একটি বোঝা
চলছিল এক ওঝা।
আমি বললেম, বইছ কি
গুনগুনিয়ে গাইছ কি?
ওঝা বলে, তাও জান না
যাচ্ছি নিয়ে সরষে
ভূত তাড়াব সরষে দিয়ে
মন্ত্র পড়ে জোরসে।
সে ভূত হোক-না যতই পাজি
হোক বেয়াড়া বদমেজাজি
গোয়াল-চাটা হ্যাংলা ভুলো
তেল চিট্‌চিটে নোংরা চুলো,
কিম্বা খাগী হামলাবাজ
ঘুষ খাওয়া যার নিত্য কাজ
যতই পরুক সাধুর ভোল
মুখোশ-আঁটা রাঘব বোল
সরষে পড়ায় মামদো যত ধাড়ি
ছটফটিয়ে গুটোবে পাততাড়ি।
এমন সময় গণ্ডগোল
সরষেগুলো ফুলে ঢোল।
ভিতর থেকে মুখ বাড়াল
বিদঘুটে এক ভূত,
বললে, ছিনু ঘাপটি মেরে
দেখছি আমায় তাড়ায় কে রে
কই সেই কিম্‌ভূত! ১৩৮৭

www.BanglaBook.org

ক্লাস ফ্রেণ্ড

সত্যজিৎ রায়

সকাল সোয়া ন'টা।

মোহিত সরকার সবেমাত্র টাইয়ে ফাঁসটা পরিয়েছেন, এমন সময় তাঁর স্ত্রী অরুণা ঘরে ঢুকে বললেন, 'তোমার ফোন।'

'এই সময় আবার কে?'

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নটায় অফিসে পেঁছানর অভ্যাস মোহিত সরকারের; ঠিক বেরোনর মুখে ফোন এসেছে শুনে স্বভাবতই তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল।

অরুণাদেবী বললেন, 'বলছে তোমার সঙ্গে ইস্কুলে পড়ত।'

'ইস্কুলে? বোঝ!—নাম বলেছে?'

'বলল জয় বললেই বুঝবে।'

ত্রিশ বছর আগে ইস্কুল ছেড়েছেন মোহিত সরকার। ক্লাসে ছিল জনা চল্লিশেক ছেলে। খুব মন দিয়ে ভাবলে হয়ত তাদের মধ্যে জনা বিশেকের নাম মনে পড়বে, আর সেই সঙ্গে চেহারাও। জয় বা জয়দেবের নাম ও চেহারা দুটোই ভাগ্যক্রমে মনে আছে, কারণ সে ছিল ক্লাসে সেরা ছেলেদের মধ্যে একজন। পরিষ্কার ফুটফুটে চেহারা, পড়াশুনায় ভালো, ভালো হাইজাম্প দিত, ভালো তাসের ম্যাজিক দেখাত, ক্যাসাবিয়াঙ্কা আবৃত্তি করে একবার মেডেল পেয়েছিল। স্কুল ছাড়ার পরে তার আর কোনো খবর রাখেননি মোহিত সরকার। তিনি এখন বুঝতে পারলেন যে এককালে বন্ধুত্ব থাকলেও এত কাল ছাড়াছাড়ির পর তিনি আর কোনো টান অনুভব করছেন না তাঁর ইস্কুলের সহপাঠীর প্রতি।

মোহিত অগত্যা টেলিফোনটা ধরলেন।

'হ্যালো!'

'কে, মোহিত? চিনতে পারছ ভাই? আমি সেই জয়—জয়দেব বোস। বালিগঞ্জ স্কুল।'

'গলা চেনা যায় না, তবে চেহারাটা মনে পড়ছে। কী ব্যাপার?'

'তুমি ত এখন বড় অফিসার ভাই; নামটা যে মনে রেখেছ এটাই খুব!'

'ওসব থাক—এখন কী ব্যাপার বল।'

'ইয়ে, একটু দরকার ছিল। একবার দেখা হয়?'

'কবে?'

'তুমি যখন বলবে। তবে যদি তাড়াতাড়ি হয় তাহলে...'

'তাহলে আজই কর। আমার ফিরতে ফিরতে ছ'টা হয়। সাতটা নাগাদ আসতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই পারব। থ্যাঙ্ক ইউ ভাই। তখন কথা হবে।'

হালে কেনা হালকা নীল স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে আপিস যাবার পথে মোহিত সরকার ইস্কুলের ঘটনা কিছু মনে আনার চেষ্টা করলেন। হেডমাস্টার গিরীন সুরের ঘোলাটে চাহনি আর গুরুগম্ভীর মেজাজ সত্ত্বেও স্কুলের দিনগুলি ভারী আনন্দের ছিল। মোহিত নিজেও ভাল ছাত্র ছিলেন। শঙ্কর, মোহিত আর জয়দেব—এই তিনজনের মধ্যেই রেশারেশি ছিল। ফার্স্ট সেকেণ্ড থার্ড তিনজনে যেন পালা করে হতেন। ক্লাস সিক্স থেকে মোহিত সরকার আর জয়দেব বোস একসঙ্গে পড়েছেন। অনেক সময় এক বেঞ্চিতেই পাশাপাশি বসতেন দুজন। ফুটবলেও পাশাপাশি স্থান ছিল দুজনের; মোহিত খেলতেন রাইট-ইন, জয়দেব রাইট-আউট; তখন মোহিতের মনে হত এই বন্ধুত্ব বুঝি চিরকালের। কিন্তু স্কুল ছাড়ার পরেই দুজনের রাস্তা আলাদা হয়ে গেল। মোহিতের বাবা ছিলেন অবস্থাপন্ন লোক, কলকাতার নাম-করা ব্যারিস্টার। স্কুল শেষ করে মোহিত ভালো কলেজে ঢুকে ভালো পাশ করে দু'বছরের মধ্যেই ভালো সদাগরী আপিসে চাকরি পেয়ে যায়। জয়দেব চলে যায় অন্য শহরের অন্য কলেজে, কারণ তার বাবার ছিল বদলীর চাকরি। তারপর, আশ্চর্য ব্যাপার, মোহিত দেখেন যে তিনি আর জয়দেবের অভাব বোধ করছেন না; তার জায়গায় নতুন বন্ধু জুটেছে কলেজে। তারপর সেই বন্ধু বদলে গেল যখন ছাত্রজীবন শেষ করে মোহিত চাকরির জীবনে প্রবেশ করলেন। এখন তিনি তাঁর আপিসের চারজন মাথার মধ্যে একজন; এবং তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হল তাঁরই একজন সহকর্মী। স্কুলের সহপাঠীদের মধ্যে একমাত্র প্রজ্ঞান সেনগুপ্তের সঙ্গে মাঝে মাঝে ক্লাবে দেখা হয়; সেও ভালো আপিসে বড় কাজ করে। আশ্চর্য, স্কুলের স্মৃতির মধ্যে কিন্তু প্রজ্ঞানের কোন স্থান নেই। অথচ জয়দেব—যার সঙ্গে ত্রিশ বছর দেখাই হয়নি—স্মৃতির অনেকটা জায়গা দখল করে আছে। এই সত্যটা মোহিত পুরোন কথা ভাবতে ভাবতে বেশ ভালো করে বুঝতে পারলেন।

মোহিতের আপিস সেণ্ট্রাল এভিনিউতে। চৌরঙ্গী আর সুরেন ব্যানার্জির সংযোগস্থলের কাছাকাছি আসতেই গাড়ির ভিড়, মোটরের হর্ন আর বাসের ধোঁয়া মোহিত সরকারকে স্মৃতির জগৎ থেকে হুড়মুড়িয়ে বাস্তব জগতে এনে ফেলল। হাতের ঘড়িটার দিকে চোখ পড়তে মোহিত বুঝলেন যে তিনি পাঁচ মিনিট তিনেক লেট হবেন।

অফিসের কাজ সেরে সন্ধ্যায় তাঁর লী রোডের বাড়িতে যখন ফিরলেন মোহিত, তখন তাঁর মনে বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট স্কুলের স্মৃতির কণামাত্র অবশিষ্ট নেই। সত্যি বলতে কি, তিনি সকালের টেলিফোনের কথাটাও বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন: সেটা মনে পড়ল যখন বেয়ারা বিপিন বৈঠকখানায় এসে তাঁর হাতে রুলটানা খাতার পাতা ভাঁজ করে ছেঁড়া একটা চিরকুট দিল। তাতে ইংরিজিতে লেখা—'জয়দেব বোস, অ্যাজ পার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট'।

www.BanglaBook.org

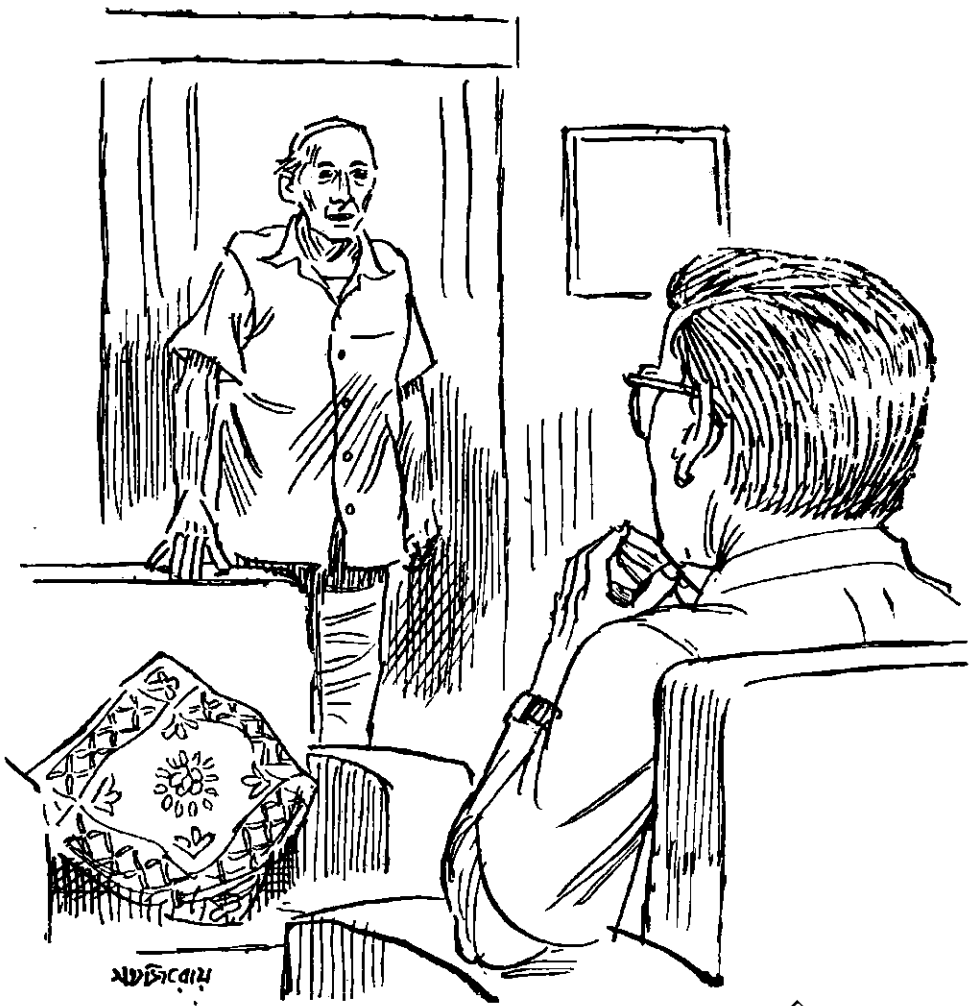

রেডিওতে বি বি সি-র খবরটা বন্ধ করে মোহিত বিপিনকে বললেন, 'ভিতরে আসতে বল'—আর বলেই মনে হল, জয় এত-কাল পরে আসছে, তার জন্য কিছু খাবার আনিয়ে রাখা উচিত ছিল। আপিস-ফেরতা পার্ক স্ট্রিট থেকে কেক-পেস্ট্রি জাতীয় কিছু কিনে আনা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ ছিল, কিন্তু খেয়াল হয়নি। তাঁর স্ত্রী কি আর নিজে খেয়াল করে এ কাজটা করেছেন?

'চিনতে পারছ?'

গলার স্বর শুনে, আর সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বরের অধিকারীর দিকে চেয়ে মোহিত সরকারের যে প্রতিক্রিয়াটা হল সেটা সিঁড়ি উঠতে গিয়ে শেষ ধাপ পেরোনর পরেও আরেক ধাপ আছে মনে করে পা ফেললে হয়।

চৌকাঠ পেরিয়ে যিনি ঘরের ভিতর এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর পরনে ছেয়ে রঙের বেখাপ্পা ঢলঢলে সুতির প্যান্টের উপর হাতকাটা সস্তা ছিটের সার্ট দুটির কোনটিও কস্মিনকালে ইস্তিরির সংস্পর্শে এসেছে বলে মনে হয় না। সার্টের কলারের ভিতর দিয়ে যে মুখটি বেরিয়ে আছে তার সঙ্গে অনেক চেষ্টা করেও মোহিত তাঁর স্মৃতির জয়দেবের সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন না। আগন্তুকের চোখ কোটরে বসা, গায়ের রঙ রোদে পুড়ে ঝামা, গাল তোবড়ানো, থুতনিতে অন্তত তিন দিনের কাঁচা-পাকা দাড়ি, মাথার উপরাংশ মসৃণ, কানের পাশে কয়েকগাছা অবিন্যস্ত পাকা চুল। প্রশ্নটা হাসিমুখে করায় ভদ্রলোকের দাঁতের পাটিও দেখতে পেয়েছেন মোহিত সরকার, এবং মনে হয়েছে পান-খাওয়া ক্ষয়ে-যাওয়া অমন দাঁত নিয়ে হাসতে হলে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাসা উচিত।

'অনেক বদলে গেছি, না?'

'বোসো।'

মোহিত এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। সামনের সোফায় আগন্তুক বসার পর মোহিতও তাঁর নিজের জায়গায় বসলেন। মোহিতের নিজের ছাত্রজীবনের কয়েকটা ছবি তাঁর অ্যালবামে আছে; সেই ছবিতে চোদ্দ বছর বয়সের মোহিতের সঙ্গে আজ-কের মোহিতের আদল বার করতে অসুবিধা হয় না। তাহলে এঁকে চেনা এত কঠিন হচ্ছে কেন? ত্রিশ বছরে একজনের চেহারায় এত পরিবর্তন হয় কি?

'তোমাকে কিন্তু বেশ চেনা যায়। রাস্তায় দেখলেও চিনতে পারতাম'—ভদ্রলোক কথা বলে চলেছেন—'আসলে আমার উপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। কলেজে পড়তে পড়তে বাবা মারা গেলেন, আমি পড়া ছেড়ে চাকরির ধান্দায় ঘুরতে শুরু করি। তারপর, ব্যাপার ত বোঝই। কপাল আর ব্যাকিং এ দুটোই যদি না থাকে তাহলে আজকের দিনে একজন ইয়ের পক্ষে...'

'চা খাবে?'

'চা? হ্যাঁ, তা...'

মোহিত বিপিনকে ডেকে চা আনতে বললেন, আর সেই সঙ্গে এই ভেবে আশ্বস্ত হলেন যে কেক মিষ্টি যদি নাও থাকে তাহলেও ক্ষতি নেই; এনার পক্ষে বিস্কুটই যথেষ্ট।

'ওঃ'।—ভদ্রলোক বলে চলেছেন, 'আজ সারাদিন ধরে কত পুরোনো কথাই না ভেবেছি জান, মোহিত!'

মোহিত নিজেও যে কিছুটা সময় তাই করেছেন সেটা আর বললেন না।

'এল. সি. এম., জি. সি. এম.-কে মনে আছে?'

মোহিতের মনে ছিল না, কিন্তু বলতেই মনে পড়ল। এল. সি. এম. হলেন পি. টি.-র মাস্টার লালচাঁদ মুখুজ্যে। আর জি. সি. এম. হলেন অঙ্কের স্যার গোপেন মিত্তির।

'আমাদের খাবার জলের ট্যাঙ্কের পেছনটায় দুজনকে জোর করে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে কে বক্স ক্যামেরায় ছবি তুলেছিল মনে আছে?'

ঠোঁটের কোনে একটা হালকা হাসি এনে মোহিত বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর মনে আছে। আশ্চর্য, এগুলো ত খুবই সত্যি কথা। ইনি যদি জয়দেব না হন তাহলে এত কথা জানলেন কি করে?

'স্কুল লাইফের পাঁচটা বছরই আমার জীবনের বেস্ট টাইম, জান ভাই,' বললেন আগন্তুক, 'তেমন দিন আর আসবে না।'

মোহিত একটা কথা না বলে পারলেন না।

'তোমার ত মোটামুটি আমারই বয়স ছিল বলে মনে পড়ে'—

'তোমার চেয়ে তিন মাসের ছোট।'

'তাহলে এমন বুড়োলে কি করে? চুলের দশা এমন হল কি করে?'

'স্ট্রাগল, ভাই স্ট্রাগল,' বললেন আগন্তুক। 'অবিশ্যি টাকটা আমাদের ফ্যামিলির অনেকেরই আছে। বাপ-ঠাকুর্দা দুজনেরই টাক পড়ে যায় পঁয়ত্রিশের মধ্যে! গাল ভেঙেছে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির জন্য, আর প্রপার ডায়েটের অভাবে। তোমাদের মত ত টেবিল-চেয়ারে বসে কাজ নয় ভাই। কারখানায় কাজ করেছি সাত বছর, তারপর মেডিক্যাল সেলসম্যান, ইনসিওরেন্সের দালালি, এ দালালি, সে দালালি! এক কাজে টিকে থাকব সে ত আর কপালে লেখা নেই। তাঁতের মাকুর মত একবার এদিক একবার ওদিক। কথায় বলে—শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়—অথচ তাতে শেষ অবধি শরীরটা গিয়ে কী দাঁড়ায় তা ত আর বলে না। সেটা আমায় দেখে বুঝতে হবে।'

বিপিন চা এনে দিল। সঙ্গে প্লেটে সন্দেশ আর সিঙ্গাড়া। গিন্নীর খেয়াল আছে বলতে হবে। ক্লাস ফ্রেন্ডের এই ছিরি দেখলে কী ভাবতেন সেটা মোহিত আন্দাজ করতে পারলেন না।

'তুমি খাবে না?' আগন্তুক প্রশ্ন করলেন। মোহিত মাথা নাড়লেন।—'আমি এইমাত্র খেয়েছি।'

'একটা সন্দেশ?'

'নাঃ, আপ—তুমিই খাও।'

ভদ্রলোক সিঙ্গাড়ার কামড় দিয়ে চিবোতে চিবোতেই বললেন, 'ছেলেটার পরীক্ষা সামনে। অথচ এমন দশা, জানো মোহিত ভাই, ফী-এর টাকাটা যে কোত্থেকে আসবে তা ত বুঝতে পারছি না।'

আর বলতে হবে না। মোহিত বুঝে নিয়েছেন। আগেই বোঝা উচিত ছিল এঁর আসার কারণটা। সাহায্য প্রার্থনা। আর্থিক সাহায্য। কত চাইবেন? বিশ-পঁচিশ হলে দিয়ে দেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ না দিলেই যে উৎপাতের শেষ হবে এমন কোন ভরসা নেই।

'আমার ছেলেটা খুব ব্রাইট, জানো ভাই। পয়সার অভাবে আর পড়াশুনা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এ কথাটা ভেবে আমার রাতে ঘুম হয় না।'

দ্বিতীয় সিঙ্গাড়াটাও উঠে গেল প্লেট থেকে। মোহিত সুযোগ পেলেই জয়দেবের সেই ছেলেবয়সের চেহারাটার সঙ্গে আগন্তুকের চেহারা মিলিয়ে দেখছেন, আর ক্রমেই তাঁর বিশ্বাস বদ্ধমূল হচ্ছে যে সেই বালকের সঙ্গে এই প্রৌঢ়ের কোনো সাদৃশ্য নেই।

'তাই বলছিলাম, ভাই,' চায়ে সশব্দ চুমুক দিয়ে বললেন আগন্তুক, 'অন্তত শ'খানেক কি শ'দেড়েক যদি এই পুরোন বন্ধুর হাতে তুলে দিতে পার, তাহলে—'

'ভেরি সরি।'

'অ্যাঁ?'

টাকার কথাটা উঠলেই সরাসরি না করে দেবেন এটা মোহিত মনে মনে স্থির করে ফেলেছিলেন। কিন্তু এখন মনে হল ব্যাপারটা এতটা রূঢ়ভাবে না করলেও চলত। তাই নিজেকে খানিকটা শুধরে নিয়ে গলাটাকে আরেকটু নরম করে বললেন, 'সরি ভাই। আমার কাছে জাস্ট নাউ ক্যাশের একটু অভাব।'

'আমি কাল আসতে পারি। এনি টাইম। তুমি যখনই বলবে।'

'কাল আমি একটু কলকাতার বাইরে যাব। ফিরব দিন তিনেক পরে। তুমি রোববার এস।'

'রবিবার...'

আগন্তুক যেন খানিকটা চুপসে গেলেন। মোহিত মনস্থির করে ফেলেছেন। ইনিই যে জয়, চেহারায় তার কোন প্রমাণ নেই। কলকাতার মানুষ ধাপ্পা দিয়ে টাকা রোজগারের হাজার ফিকির জানে। ইনি যদি জালিয়াত হন? হয়ত আসল জয়দেবকে চেনেন। তার কাছ থেকে ত্রিশ বছর আগের বালিগঞ্জ স্কুলের কয়েকটা ঘটনা জেনে নেওয়া আর এমন কি কঠিন কাজ?

'রবিবার কখন আসব?' আগন্তুক প্রশ্ন করলেন।

'সকালের দিকেই ভাল। এই নটা সাড়ে নটা।'

শুক্রবার ঈদের ছুটি। মোহিতের আগে থেকেই ঠিক আছে বেলেঘাটার এক বন্ধুর বাগানবাড়িতে সস্ত্রীক গিয়ে উইক-এন্ড কাটিয়ে আসবেন। দুদিন থেকে রবিবার রাত্রে ফেরা; সুতরাং ভদ্রলোক সকালে এলে তাঁকে পাবেন না। এই প্রতারণাটুকুরও প্রয়োজন হত না যদি মোহিত সোজাসুজি মুখের উপর না করে দিতেন। কিন্তু কিছু লোক আছে যাদের দ্বারা এ জিনিসটা হয় না। মোহিত এই দলেই পড়েন। রবিবার তাঁকে না পেয়ে যদি আবার আসেন ভদ্রলোক, তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখা না করার কোনো অজুহাত বার করবেন মোহিত সরকার। তারপর হয়ত আর বিরক্ত হতে হবে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগন্তুক চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সেটা নামিয়ে রাখতেই আরেকজন পুরুষ এসে ঢুকলেন। ইনি মোহিতের অন্তরঙ্গ বন্ধু বাণীকান্ত সেন। আরো দুজন আসার কথা আছে, তারপর তাসের আড্ডা বসবে। এটা রোজকার ঘটনা। বাণীকান্ত ঘরে ঢুকেই যে আগন্তুকের দিকে একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিলেন সেটা মোহিতের দৃষ্টি এড়াল না। আগন্তুকের সঙ্গে বন্ধুর পরিচয়ের ব্যাপারটা মোহিত অম্লান বদনে এড়িয়ে গেলেন।

'আচ্ছা, তাহলে আসি...' আগন্তুক উঠে দাঁড়িয়েছেন। 'তুই এই উপকারটা করলি সত্যিই গ্রেটফুল থাকব ভাই, সত্যিই।'

ভদ্রলোক বেরিয়ে যাবার পরমুহূর্তেই বাণীকান্ত বন্ধুর দিকে ফিরে ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, 'এই লোক তোমাকে তুই করে বলছে—ব্যাপারটা কী?'

'এতক্ষণ তুমি বলছিল, শেষে তোমাকে শুনিয়ে হঠাৎ তুই বলল।'

'লোকটা কে?'

মোহিত উত্তর না দিয়ে বুক শেল্‌ফ থেকে একটা পুরোন ফোটো অ্যালবাম বার করে তার একটা পাতা খুলে বাণীকান্তর দিকে এগিয়ে দিল।

'একি তোমার ইস্কুলের গ্রুপ নাকি?'

'বোটানিক্‌সে পিকনিকে গিয়েছিলাম,' বললেন মোহিত সরকার।

'কারা এই পাঁচজন?'

'আমাকে চিনতে পারছ না?'

'দাঁড়াও, দেখি।'

অ্যালবামের পাতাটাকে চোখের কাছে নিয়ে বাণীকান্ত সহজেই তাঁর বন্ধুকে চিনে ফেললেন।

'এবার আমার ডানপাশের ছেলেটিকে দেখ ত ভাল করে!'

ছবিটাকে আরো চোখের কাছে এনে বাণীকান্ত বললেন, 'দেখলাম।'

মোহিত বললেন, 'ইনি হচ্ছেন যিনি এইমাত্র উঠে গেলেন!'

'ইস্কুল থেকেই কি জুয়া ধরেছিলেন নাকি?' অ্যালবামটা সশব্দে বন্ধ করে পাশের সোফায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রশ্ন করলেন বাণীকান্ত।—'ভদ্রলোককে অন্তত বত্রিশবার দেখেছি রেসের মাঠে।'

'সেটাই স্বাভাবিক,' বললেন মোহিত সরকার। তারপর আগন্তুকের সঙ্গে কী কথা হল সেটা সংক্ষেপে বললেন।

'পুলিশে খবর দে', বললেন বাণীকান্ত, 'চোর জোচ্চোর জালিয়াতের ডিপো হয়েছে কলকাতা শহর। এই ছবির ছেলে আর ওই জুয়াড়ী এক লোক হওয়া ইম্‌পসিবল।'

মোহিত হালকা হাসি হেসে বললেন, 'রোববার এসে আমাকে না পেলেই ব্যাপারটা বুঝবে। তারপর আর উৎপাত করবে বলে মনে হয় না।'

বারুইপুরে বন্ধুর পুকুরের মাছ, পোলট্রির মুরগীর ডিম, আর গাছের আম জাম ডাব পেয়ারা খেয়ে, বকুল গাছের ছায়ায় সতরঞ্জি পেতে বুকে বালিস নিয়ে তাস খেলে শরীর ও মনের অবসাদ দূর করে রবিবার রাত এগারোটায় বাড়ি ফিরে মোহিত সরকার বিপিন বেয়ারার কাছে শুনলেন যে সেদিন যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন তিনি আজ সকালে আবার এসেছিলেন—'যাবার সময় কিছু বলে গেছেন কি?'

'আজ্ঞে না', বলল বিপিন।

যাক, নিশ্চিন্ত! একটা সামান্য কৌশল, কিন্তু তাতে কাজ দিয়েছে অনেক। আর আসবে না। আপদ গেছে।

কিন্তু না। আপদ সেদিনের জন্য গেলেও পরের দিন সকাল আটটা নাগাদ মোহিত যখন বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, তখন বিপিন আবার একটি ভাঁজ করা চিরকুট এনে দিল তাঁকে। মোহিত খুলে দেখলেন তিন লাইনের একটি চিঠি।

ভাই মোহিত,

আমার ডান পা-টা মচকেছে, তাই ছেলেকে পাঠাচ্ছি। সাহায্য স্বরূপ সামান্য কিছুও এর হাতে দিলে অশেষ উপকার হবে। আশা করি হতাশ করবে না।

ইতি জয়।

মোহিত বুঝলেন এবার আর রেহাই নেই। তবে সামান্য মানে সামান্যই, এই স্থির করে তিনি বেয়ারাকে বললেন, 'ডাক ছেলেটিকে।'

মিনিট খানেকের মধ্যেই একটি তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের ছেলে দরজা দিয়ে ঢুকে মোহিতের দিকে এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করে আবার কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মোহিত তার দিকে মিনিট খানেক চেয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, 'বোস।'

ছেলেটি একটু ইতস্ততঃ ভাব করে একটি সোফার এককোনে হাত দুটোকে কোলের উপর জড়ো করে বসল।

'আমি আসছি এক্ষুনি।'

মোহিত দোতলায় গিয়ে স্ত্রীর আঁচল থেকে চাবির গোছাটা খুলে নিয়ে আলমারি খুলে দেরাজ থেকে চারটে পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে একটা খামে পুরে আলমারি বন্ধ করে আবার নিচের বৈঠকখানায় ফিরে এলেন।

'কী নাম তোমার?'

'শ্রীসঞ্জয়কুমার বোস।'

'এতে টাকা আছে। সাবধানে নিতে পারবে?'

ছেলেটি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'কোথায় নেবে?'

'বুক পকেটে।'

'ট্রামে ফিরবে, না বাসে?'

'হেঁটে।'

'হেঁটে? কোথায় বাড়ি তোমার?'

'মির্জাপুর স্ট্রীট।'

'এত দূর হাঁটবে?'

'বাবা বলেছেন হেঁটে ফিরতে।'

'তার চেয়ে এক কাজ কর। ঘণ্টা খানেক বসো, চা-মিষ্টি খাও, অনেক বই-টই আছে, দেখ—আমি ন'টায় অফিসে যাব, তোমায় নামিয়ে দিয়ে আমার গাড়ি তোমায় বাড়ি পেঁছে দেবে। তুমি বাড়ি চিনিয়ে দিতে পারবে ত?'

ছেলেটি আবার মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

মোহিত বিপিনকে ডেকে ছেলেটির জন্য চা দিতে বলে আপিসে যাবার জন্য তৈরি হতে দোতলায় রওনা হলেন।

ভারী হালকা বোধ করছেন তিনি, ভারী প্রসন্ন।

জয়কে দেখে না চিনলেও, তিনি তার ছেলে সঞ্জয়ের মধ্যে তাঁর ত্রিশ বছর আগের ক্লাস ফ্রেন্ডটিকে ফিরে পেয়েছেন।

১৩৮৫

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাদুলে

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার এখন সাত বছর বয়েস।—সাত দুগুণে চোদ্দ, তিন সাতে একুশ। বাবা বলেছেন, একুশে সাবালক হয়। তিন দফায় একুশে—একা, দোক্কা, তিন তেরেক্কা করে পৌঁছতে আমার মোটেই সময় লাগবে না। তখন ঠিক বাবামশাই বেঁকে বসে বলবেন, একান্নতে সাবালক হয়।—কী মুশকিল! কত কতয় একান্ন হয় তা আবার আমার শেখা হয়নি। বাবা কি সত্যিই এখনও সাবালক হতে পেরেছেন? ঠাকুমা ত বলেন, যার নয়ে হয় না তার নিরানব্বুইতেও হয় না। যেমন বাবা।

ঐ রে, সেরেছে! অনিলবাবু, মানে আমাদের ক্লাসের বাঙলার মাস্টারমশাই, আমায় রিডিং পড়তে বলছেন। কোন্ জায়গাটা রে সুকু? সুকু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। লেখা আছে—'বর্ষা-কালে আকাশে মেঘ জমে।' দূর ছাই, সেই একঘেয়ে পড়া। পড়লাম : 'বর্ষাকালে আকাশে কালো কালো মেঘ লাফাতে লাফাতে জমে।'

'থামো!' ওরে বাবা, অনিলবাবু খেপে গেলেন কেন? আরও কিছু বলবেন! কী ভাগ্যিস আজকাল ছপটি মারার নিয়ম নেই।

'তুমি বড্ড বাড়িয়ে তুলেছ বিশ্ব! যখনই রিডিং পড়তে বলি, তখনি ঐরকম যা-তা করে পড়।'

হায়, হায়! সত্যি বললেও দোষ, না বললেও দোষ। এদিকে সদা সত্য কথা বলিবে—ওদিকে সত্য বলিলে শাস্তি!

আমি নিজে চোখে দেখতে পাচ্ছি মেঘ কালো হয়ে আকাশে লাফিয়ে লাফিয়ে এসে জমছে—বইতে লিখলেই হল শুধু একা একা জমছে? মেঘেরা অত বোকা হাবা ল্যাকপেকে নয়।

সু-স্যাঁৎ! বৃষ্টি শুরু হয়েছে! এবার! এবার কেমন? অনিলবাবু এখনও তাকে বকছেন যে!

'তুমি রিডিং-এ শূন্য পাবে। বরাবর এমনি করছ। সেদিন 'বাক্য রচনা'কে তুমি 'বাক্য চরনা' লিখে আবার সেই নিয়ে কত গাঁজাখুরি গল্প শোনালে। এসব আমার ক্লাসে হবে না।'

হবে না ত হবে না। 'বাক্য রচনা' কেটে ফেললেও লিখব না। শূন্যর শূন্য পেলেও না। 'বাক্য চরনা' কথাটা অনেক ভেবেই লেখা হয়েছে স্যার। কেননা, কথাটা চরণে চরণে বেশ নেচে চলে। আর 'রচনা' কথাটা! ছোঃ! একেবারেই অখাদ্য। কেমন 'চেনা চোনা' ভাব। গোবরের সঙ্গে আদল!

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে! আকাশ থেকে হোস্‌পাইপ দিয়ে যে ভদ্রলোক এখন জল দিচ্ছেন তিনি কী মজায় আছেন! ঐরকম একটা চাকরি পেলে ইস্কুলের নামতা শেখার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত।

ঢং ঢং ঢং ঢং! অনিলবাবু তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন ক্লাসের মধ্যখানে ঘণ্টা পড়ছে কেন দেখতে। ফিরে আসার আগেই ক্লাসে ভূতের নাচ শুরু হয়ে গেল। আমি দেখলাম এর মধ্যেই রাস্তায় জল হুহু করে বেড়ে উঠছে আর একটা ষাঁড় বেশ ষাঁড়-ষাঁড় ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী ভেজাটাই ভিজছে ষাঁড়টা! সুকু বলল যে, ও ষাঁড়টা ধম্মের ষাঁড়, ওকে পুলিশরা আর ষণ্ডা ষণ্ডা লোকেরা ধরতে এসেছিল। ল্যাঙ মেরে পালিয়ে এসেছে। আর ও নাকি চার পায়েই সমান ল্যাঙ মারতে পারে। উঃ, সত্যি!

অনিলবাবু ফিরে আসতেই ষাঁড়ের কথাটা চাপা পড়ে গেল। কে একজন নেতা মানুষ মারা গেছেন, তাই প্রথম পিরিয়ডেই ইস্কুল ছুটি। ছেলেদের হৈচৈ করতে বারণ করে অনিলবাবু বেরিয়ে গেলেন। গিয়েই আবার ফিরে এসে বললেন বৃষ্টি থামার আগে যেন কেউ না বেরোয়। বলে চশমাটা পকেটে রাখলেন। ওপরের জানলা থেকে আমরা দেখলাম বেজায় খুশী-খুশী মুখে অনিলবাবু ছপছপ করে পা ফেলে, জলে ভিজে, কাদা মেখে ষাঁড়টার তাড়ায় জলে হোঁচট খেয়ে শেষে পার্কের ধারে চলে গেলেন।

অনেক ছেলেই ঝুপ্-ঝুপ্ বৃষ্টির মধ্যেই সটাসট কেটে পড়ছে। কানের কাছে কানুর গলা শুনলাম—'হাঁ করে কী দেখছিস রে বিশ্ব? চ, কেটে পড়া যাক।'

'চল'। চেয়ে দেখলাম বৃষ্টি ধরে গেছে।

রাস্তা যে একেবারে নদী, অ্যাঁ! বাঃ, এইরকম রাস্তাতেই ত হেঁটে আরাম। ষাঁড়টা একেবারেই নড়ছে না বটে কিন্তু শিং নাড়াচ্ছে, ওকে কায়দা করে যেতে হল—হুঁ, ঠিক হয়েছে। কানু, সুকু আর আমি তিন ধারি থেকে ওকে চটাব। তারপর যেই ও ছুটবে অমনি ছাতা খুলে সিনেমার ষাঁড় খেলোয়াড়দের মত খেলা যাবে।

কিন্তু পিঠে বাঁধা ব্যাগটা জ্বালালে ত! যেদিন থেকে বাবা কাগজে পড়েছেন পিঠে বোঝাই-করা ব্যাগ লাগালে পিঠ সোজা হয় সেদিন থেকেই এই ব্যাগটির আমদানী। অরে এ কথা ত সবাই জানে যে, যতদিন না সাবালক হই ততদিন (নিরানব্বুই বছর) ঐ বুড়ো ব্যাগটা আমার ঘাড়ে ভর হয়ে থাকবে।

সুকু চেঁচাল—'রেডি!'

কানু হাঁকল—'স্টেডি'!

সাঁ করে ছাতা খুলে আমি চেঁচালাম—'লাগ লাগ লাগ ভেলকি—গোঃ।'

সঙ্গে সঙ্গে ষাঁড়টা শুয়োরের মত ঘোঁত করে উঠে শিং ঘুরিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। ফত! ফত! ওরাও ছাতা খুলে ফেলেছে। ব্যস, তখন যা হল না—! ষাঁড়টা একবার এ ছাতা

www.BanglaBook.org

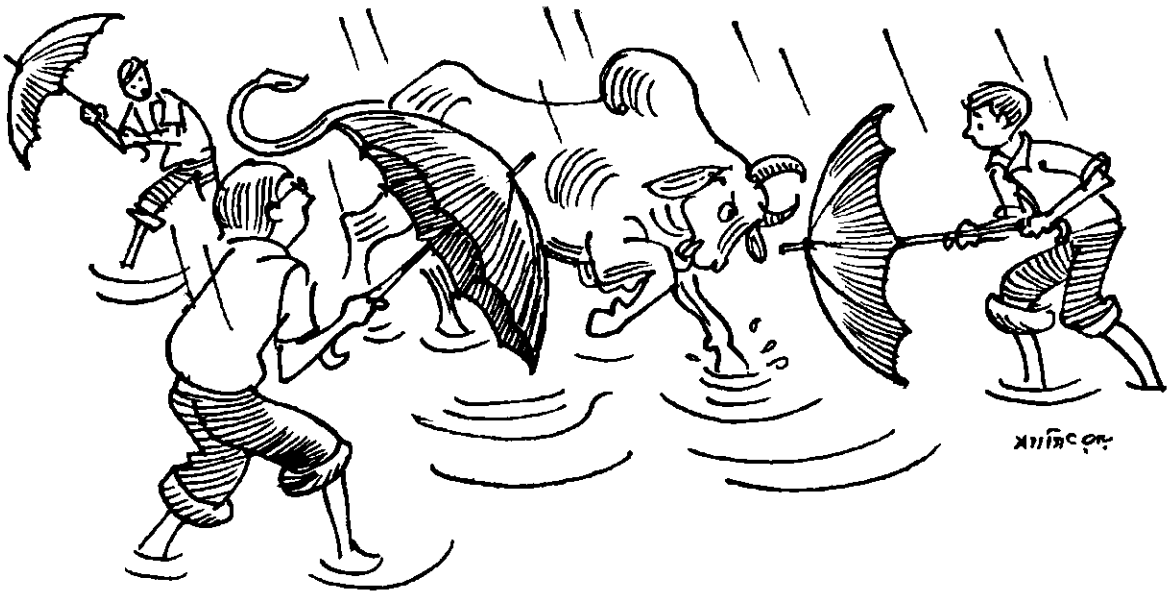

গুঁতোয়, একবার ও ছাতা গুঁতোয়। এদিকে ছাতার গুঁতো-গুঁতির চোটে কানুর ছাতায় শিং বসে গেল। ব্যস্। ষাঁড়-মশাইয়ের ভণ্ডতপস্বীর ভাব একেবারে গোল্লায়। লাফিয়ে, ছুটে, ছাতাটা কুটিকুটি করে, জলে ঢেউ তুলে, ষাঁড়টা আবার যেন ছবির মত ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়াল।

ঠিক সেই সময় দেখি দূরে জানলায় মা দাঁড়িয়ে। আমাদের বাড়িটা কিনা ঠিক ইস্কুলের গায়ের পার্কটার উল্টোদিকে, তাই মা অনবরত জানলায় দাঁড়িয়ে পাহারা দেন। আমার মার মত পাহারা দিতে কারুর মাকেই দেখিনি। সবাই বলে এক-ছেলেদের মায়েরা নাকি অমনি হয়। এক-ছেলে হওয়া তাই দেখতে পারিনে ; মা আবার বললেন, এক-ছেলে হলে নাকি সে একলসেঁড়ে হিংসুটে হয়। কিন্তু আমি ত দেখছি ব্যাপারটা ঠিক উলটো। বরং বাবা-মারাই হিংসুটে হয়ে পড়েন। সারাক্ষণ দুধ খাও, ফুচকা খেও না, জলে ভিজো না, যুক্তাক্ষরটা ভালো করে শেখো, পিঠে ব্যাগ বাঁধো! যেগুলো ভালবাসি, সব 'না।' আর যেগুলো দেখতে পারিনে, সব 'হ্যাঁ'। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে কে বা কারা বেশি হিংসুটে।

ছাতাটা ঘুরিয়ে নিলাম। মা ঢেকে গেলেন। একেবারে চোখের আড়াল,—আশা করি চিনতে পারেননি। কিন্তু উঃ—বাপ্‌স! ঘাড়ের কাছে ফোঁস! ষাঁড়টা আমার গাল ছুঁল! কানুরা পালাচ্ছে। ষাঁড়টা ঠেলছে যে! একেই কি গুঁতোনো বলে? ষাঁড়টা হয়ত এক-ছেলে—একলসেঁড় ভূত!

কী করা যায়? ছাতাটা ঘুরিয়ে দেব নাকি? ষাঁড়টার নাকের সামনে দিতে গেলে আবার ওদিকে আমার মা দেখে ফেলবেন। নাঃ, ষাঁড়টাকেই বেশি মুশকিলের মনে হচ্ছে। দাও ওকে ঢেকে।

ওদিকে ভিড় জমে গেছে। কানুরা চেঁচিয়ে কী যেন বলছে।

'মাটাডোর, মাটাডোর!'

ওঃ, মনে পড়েছে। নীলুদা ঐ নামটা বলেছিল বটে। যেসব সায়েবরা ষাঁড় খেলায় তাদের বলে মাটাডোর। আমিও মাটাডোর! হু-র্-রে!

কিন্তু এ কী! আমি ত জলে নেই। ছাতাটা ভেসে যাচ্ছে। আমি উঁচুতে লটকে গেছি। ষাঁড়টা কোথায়? ওরে, সেরেছে রে! পেটের তলাটা ষাঁড়-ষাঁড় লাগছে যে! ষাঁড়ই ত! আমি ষাঁড়ের পিঠে এলাম কী করে? দুষ্টু এক-ছেলে ষাঁড়টা আমায় তা হলে শেষ পর্যন্ত গুঁতিয়েছে দেখছি। আমাকেও বোকা বলতে হবে। কখন পিঠে তুলল জানতেই পারলাম না?

স্যাঁ-স্যাঁ-সোঁক। ষাঁড়-ধরা লরি এসে পড়েছে। অনেক সব ষণ্ডামার্কা লোক নামছে। দড়ি ঘুরছে মাথার ওপর। ষাঁড়টা ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের একবার দেখল। সঙ্গে সঙ্গে আমি ওর পিঠ থেকে পড়ে গেলাম—ধপাস, ছপ ছপ! পড়েই একটু জলে ওলটপালট। নিশ্বাস নিলাম। দেখি ছাতাটা মুখের সামনে আমার জন্যেই হুমড়ি খেয়ে বসে আছে।

এরকম মজা কক্ষনো আগে কোনদিন হয়নি। জানলায় মা, সামনে ষাঁড়, আর বৃষ্টির জলে ঝপাঝপ, জড়াজড়ি, গড়াগড়ি। অঃ, আঃ, আয় বৃষ্টি ঝেঁপে! তু-তু!

ষাঁড়টা ও' ও' ও' করে ডেকে লেংচে জল ছিটিয়ে ছুটছে। আমিও ছাতা মাথায় দড়ি কি মরি করে এগুচ্ছি। ষণ্ডামার্কা লোকেরাও দড়ি ঘোরাচ্ছে।

ঐ ঐ ঐ বৃষ্টি এল। আকাশেও কী কাণ্ড! আরও মেঘ গোঁ গোঁ করে কালো, আরও কালো হয়ে এগিয়ে আসছে। সু-স্যাঁ! জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হল।

আমার গলা থেকে বেরিয়ে এল—গ্যাঙর গ্যাঁ, গ্যাঁঙ গোঁঙ শব্দ! বৃষ্টি পড়লেই আমার অমনি ব্যাঙ-ব্যাঙ লাগে। ছাতাটা মাথার ওপর বেড়ে উঠে যাচ্ছে—ব্যাঙের ছাতা! বৃষ্টি লেগে ব্যাঙের ছাতা বাড়ছে, বাড়ছে!

টকাস! দড়ির ফাঁসটা আমার ছাতায় লেগে, ষাঁড়ের শিং ছুঁয়ে, হেরে গিয়ে জলে পড়ল। ষাঁড়টাও আমাকে, ব্যাঙ না ষাঁড়ের ছানা কী ভেবে জানি না, শিং দিয়ে আদর করতে এল।

এক জায়গায় একটা লাল নিশেন ধরে কয়েকজন লোক

www.BanglaBook.org

দাঁড়িয়েছিল। সেখানকার জলে খুব টান। জলটা আমার পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে ডাকছে কেন? এত হাসি পাচ্ছে কী বলব!

হেসে উঠতেই চেয়ে দেখি ষাঁড়ে, ছাতায় আর আমার জটা-পটকি বেধে গেছে। ষাঁড়টা লাল নিশেনের দিকে চেয়ে, আমি আকাশের দিকে, আর ছাতাটা মাঝখানে পড়ে কাতরাচ্ছে।

সোঁ-ও'-ৎ! কানে এল—

'ম্যানহোল, ম্যানহোল।'

এ মা, চারিদিক অন্ধকার হয়ে এল যে! নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আর কী জোরে জোরে নীচের দিকে টানছে রে বাবা! ম্যানহোল জিনিসটা কী ব্যাপার?

সব এলোমেলো লাগছে। তবে হ্যাঁ, ছাতার বাঁটটা হাতে ধরা আছে। আর—এ কে? ষাঁড়টা যেন আমায় পিঠে বসিয়ে নিয়েছে মহাদেবের মত করে! ষাঁড়টার আবার ডানা গজাল কখন? আমি তো অবাক। নিজের দিকে চেয়ে দেখি, আমারও হাত দু'খানা ডানা হয়ে গেছে আর ছাতাটা উড়ু-উড়ু হয়ে খুকখুক করে হাসছে।

ষাঁড়টা ঘাড় ঘুরিয়ে কুত্তো চোখ মটকে বলল—'আমায় ধরবে ভেবেছে বোকাগুলো, আমি বাবা ধর্মের ষাঁড়—মহাদেবের বাহন। আমার সঙ্গে এসেছে পেজোমি করতে মানুষ ভূত!'

আমি বললাম—'তা হলে আমি কি মহাদেব?'

বলতেই ষাঁড়টা বলল, 'আচ্ছা দেখি।' বলে দু'বার নাচল। নাচতেই, ছাতা আমায় নিজের উড়ু-উড়ু পক্ষীরাজ ভেবে জড়িয়ে নিয়ে ধাক্কা খেতে খেতে কীরকম অচেনা অন্ধকারের মধ্যে এনে ফেলল। দূর থেকে ষাঁড়ের হেঁড়ে গলা শোনা গেল—'দুর্-তোর-নে শোলার মহাদেব! বোম্ কেদার—বোম্ মহাদেব!'

দুম করে পড়লাম। দম করে শব্দ হল একটা। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার।

চোখ খুলে দেখি একটা অচেনা ঘর। চারিদিকে লোকে লোকে বোঝাই।

শুনলাম একজন ছেলে বলছে—'উঃ, কী করে যে বেঁচেছে ছেলেটা! ভাগ্যিস ছাতাটা খোলা ছিল। অবিশ্যি ছাতাটায় ষাঁড়ের শিং আটকে না থাকলে এতক্ষণে গঙ্গায় পৌঁছে যেত। তা ছাড়া অনন্ত তাগ বুঝে সময়মত হাতটা ধরেছিল তাই রক্ষে।'

একজন মোটা গলায় বলে উঠল—'ষাঁড়টা ফেরার। ধরা যায়নি।'

'লেকে হাওয়া খেতে গেছে। বৃষ্টি দেখে মন উদাস হয়েছে ষাঁড়-ভায়ার।'

সবাই হেসে উঠল।

যাক বাবা, কেউ জানেই না আমার রক্ষাকর্তা ষাঁড়টা মহাদেবের আর বৃষ্টি পড়লে ও কথা কয়। আমি চোখ বুজে সব ঠিক করে ফেললাম। ও আমায় শোলার মহাদেব বলেছে, বলুক গে। হাজার হোক ও সত্যিকারের মহাদেবেরই চেলা। মহাদেব বলে যখন স্বীকারই করেছে (আমার নামও ত বিশ্বনাথ) তখন সাবালক হলে (হে মহাদেব, আমায় সাতে সাবালক করো) আমি ওর পিঠে চড়ে বৃষ্টিবাদলে মাঠে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াব। ততদিন হে মহাদেব, ততদিন ও যেন ফেরার হয়ে থাকতে পারে, একটু চোখ রেখো! ১৩৬৯

॥ হেঁয়ালি ॥

রাজভবন পেরিয়ে গরিং দক্ষিণ দিকে চলল। মর্তের শহর যেন ভীড়ে ফেটে পড়ছে। অলিম্পা গ্রহের প্রতিনিধি হয়ে এসেছে গরিং। বিনা যানবাহনে সে কলকাতায় এসে নেমেছে। নেমেই সে অবাক। তার কল্পনাতীত এই বিপুল জনতা। কিন্তু এতে তার একটুও ভয় নেই। কোনো প্রাণী তার সূক্ষ্ম অদৃশ্য দেহের কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না।...তবে ভাবনা আছে। অমরত্বের একমাত্র মন্ত্র তার কাছে। সেইটে সুপাত্রে দান করা চাই। কিন্তু এত প্রাণীর মধ্যে কাকে? এই ভীড় কোলাহলের মধ্যে ভালো পাত্র কোনটি? গরিং মনে মনে ভাবল—তার ভাগ্যই খারাপ। নইলে এত গ্রহ থাকতে এমন নোংরা বিশ্রী গ্রহে তাকে পাঠায়?...ঘুরে ঘুরে গরিং অগত্যা গঙ্গার ধারে এসে মন্ত্রটা আকাশে ছুঁড়ল। যে পেল তার নাম কলকাতা।

উপরের ছোট গল্পটার মধ্যে সংকেতে একটি বিখ্যাত গানের প্রথম পংক্তি লুকিয়ে আছে। বলো ত সে পংক্তিটি কী এবং কী সংকেতে সেটি লেখা হয়েছে!

[উত্তর শেষ পৃষ্ঠায়]

www.BanglaBook.org

টিয়া-ডাক

সুকুমার দে সরকার

খাঁচাটা বেশ বড়সড়। খাঁচার লোহার শিকগুলো বেয়ে বেয়ে টিয়া পাখিটা চারদিক ঘুরে ঘুরে, শিকগুলো কামড়ে কামড়ে দেখে যে কোথাও কোনো শিকটাকে কামড়ে ভেঙে ফেলা যায় কিনা। প্রতিদিন সকালে সূর্যি ওঠার আগে থেকেই মনে হয় —আজ, আজ নিশ্চয় সে পারবে। শহরের কাকগুলো কা-কা করে বাজার করতে যাওয়ার আগেই আসল টিয়া-ডাক শুনিয়ে সে উড়ে চলে যাবে আকাশে আকাশে সবুজের বিদ্যুৎ খেলিয়ে। থাকগে শহুরে কাক আর চড়াই মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে চুরি করে।

খাঁচার ভেতর টিয়া পাখিটা যেন হঠাৎ সবুজের ঝলমল। গলায় তার কিছু লাল-হলুদে মেশানো একটা রঙের বালা, লম্বা ল্যাজটা খাঁচার তলা অবধি ঝাপটানো। আর ঠোঁটটা পাকা লঙ্কার মত টুকটুকে লাল।

খাঁচার লোহার শিকগুলো কিন্তু বড়ই শক্ত। হেলেও না, নোয়ায়ও না।

—শুনছিস? টিয়্যাঁ টিয়্যাঁ ভাষায় নেংটি ইঁদুরটাকে সে বলল—দে না ভাই শিকগুলো কেটে!

রাতটা বোধহয় অন্ধকার নয়। কোন একটা আকাশে বোধহয় আজও পাকা বাতাবী লেবুটির মত টুসটুসে চাঁদ উঠেছে। কিন্তু দত্যির মত লম্বা লম্বা বাড়িগুলোর পাহারা পার হয়ে চাঁদের আলোও খাঁচাটার কাছে আসতে সমীহ করছে, হাসি আর হাতছানি হয়ে শুধু জানান দিচ্ছে, আমি আছি। আছি রে আছি!

আসল টিয়া-সংস্কৃত ভাষা নেংটি ইঁদুর বুঝতে পারবে কেন? খাঁচার শিকগুলোর ভেতর মুখ গলিয়ে হাতের কাছে পাওয়া টিয়া পাখির ভিজে ছোলাগুলোয় ভাগ বসাতে বসাতে নেংটি ইঁদুর বলল—দু-পেয়ে মানুষগুলোর মাথায় যদি একটু বুদ্ধি থাকে! ট্যাঁ ট্যাঁ টিয়া পাখি পুষবে, ধান ছোলা খেতে দেবে অথচ কিছুতেই ইঁদুর পুষবে না। ইঁদুরই ত ভগবানের সব চেয়ে ভাল জানোয়ার। তা নয়, বরং মেয়েগুলো ইঁদুর দেখলেই তিড়িং মিড়িং লাফাতে শুরু করে দেবে। এত আহ্লাদ কেন রে বাপু? দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে ধান ছোলা দিলেই হয়। তা নয়, পুষবে হুলো আর টিয়া পাখি। টিয়াগুলো ত উড়ে উড়েই খেতে পারে—ধানের ডগায় শিষ, গাছের গায়ে ফলন্ত কচি কচি ছোলা, আরও কত কি। ইঁদুরেরা ত উড়তে পারে না।

ওড়ার কথা! টিয়া পাখিটা ভাবে, আহা একবার যদি খাঁচার শিকগুলো কাটা যেত, সে ঠিক উড়ে গিয়ে আকাশটা খুঁজে নিত। তারপরে? তারপরে দূরে—সেই কত দূরে সোঁদর বনে, নদী যেখানে হাজার ধারায় নেচেকুঁদে খিলখিলিয়ে ছুটে চলেছে, সুঁদুরী আর গরান বনে যেখানে বুনো মৌমাছিরা তাদের দুর্গ গড়েছে, সে আর কত দূর?

ভোরের পুবে রুপোলী আস্তর দেওয়া হয়েছে সবে। একটা বনমোরগ খুশিতে ভরে ডাকছে, আসুন আসুন দিনমণি আসুন। সেই নিস্তব্ধ রাত আর দিনের মেশার মুহূর্তে বন-মোরগের চাঁচা চেঁচান ডাকটাও কি মিষ্টি লাগে। তারপর বন কাঁপিয়ে গুরুগম্ভীর সোঁদর বনের বাঘের ডাক। বুকের ভেতর সুদ্ধ গুরগুরিয়ে ওঠে।

টিয়া পাখিটা এবার আরও মিষ্টি করে বলল—দে না ভাই নেংটি! একবারটি একটা শিক কেটে দে। তোদের দাঁতে ত অনেক ধার।

দুটো ছোট ছোট থাবা দিয়ে গোঁফ মুছতে মুছতে চিকচিক করে নেংটি ইঁদুরটা বলল—দে দেখি আর দুটো ছোলা এগিয়ে।

টিয়াটা আহ্লাদে নাচতে নাচতে বলে উঠল—হ্যাঁ ভাই, এই-বার শিকগুলো কাটতে লেগে যা।

তার ল্যাজের ঝাপটায়, তাকে খেতে দেওয়া একটা পাকা লঙ্কা ইঁদুরটার মুখের গোড়ায় এসে পড়ল।

নেংটি বলল—ইয়ার্কি হচ্ছে; ছোঃ।

এমন সময়—ম্যাও!

হুলো ভায়ার গোদা ল্যাজটা ওপরে খাড়া হয়ে উঠেছে। চোখে একেবারে দধীচি মুনির মিষ্টি চাউনি।

নেংটি ইঁদুর তুড়ুক করে একেবারে হাওয়া।

হুলো ভায়া খানিকক্ষণ একটু উঁচুতে টাঙানো টিয়া পাখির খাঁচাটার দিকে তাকিয়ে জিভ দিয়ে গোঁফটা চেটে নিল।

—দু' চক্ষে দেখতে পারি না, টিয়াটা বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল। আহা, ল্যাজের কি বাহার! তাও যদি টিয়াদের মত হত!

পিঠটা ফুলিয়ে গায়ের রোঁয়াগুলো ঝেড়ে নিতে নিতে হুলো বলল, হ্যাঁ ভাই টিয়া পাখি, কি ছাই দিনরাত একটা ছোট্ট ঘরের ভেতর বসে থাকিস? একটু বেরিয়ে নেমে আয় না, কত ধুম্বর কথা বলব। আঃ জ্যান্ত তাজা মুড়মুড়ে হাড়...'

—বেরো! বেরো! টিয়াটা চেঁচিয়ে ওঠে।

এমন সময় বাড়ির গিন্নীমার গলা শোনা যায়—দেখ ত পাখিটা চেঁচাচ্ছে কেন? নিশ্চয় বেড়ালটা খাঁচার ধারে গেছে। ইঁদুর মারার মুরোদ নেই, টিয়া ধরার শখ! এক ত নেংটি ইঁদুরের জ্বালায় মরছি, আবার ধেড়ে ইঁদুরের গর্ত হয়েছে উঠোনে। যা ত বাবা সনাতন, বেড়ালটাকে তাড়িয়ে পাখিটাকে একটু জল ছোলা দিয়ে আয়।

সেইদিন রাতে টিয়াটার কপাল খুলে গিয়েছিল। একটা

www.BanglaBook.org

কিছু মন-প্রাণ দিয়ে বিশেষ করে চাইলে সে অভাবটা না মিটে পারে না।

হুলোটাকে তাড়িয়ে টিয়া পাখির খাঁচায় জল ছোলা দিয়ে, সনাতন সেদিন ঘুমচোখে খাঁচার দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেল।

শেষ রাত। বগী থালার মত প্রকাণ্ড চাঁদটা নিভু নিভু লণ্ঠনের মত মুখ করে, বাড়িগুলোর গা ঘেঁষে হেলে পড়েছে। আর কিছু পরেই আকাশ উঠবে ঝকমকিয়ে। আর সেই আকাশে চিলের ডানা ভেসে যাবে। ছোট হতে হতে ছোট্ট। আঃ, ডানায় বাতাসের স্বাদ, ঢেউ খেলিয়ে ছুটে যাওয়া, যেখানে হাজারমুখো নদী কলকলিয়ে ছুটে চলেছে।

টিয়াটা ঝিমোতে ঝিমোতে হঠাৎ দেখল খাঁচার একটা জায়গায় যেন শিকগুলো নেই আর সেইখানটা দিয়ে এক চৌকো চাঁদের আলো এসে ঢুকছে।

যুদ্ধের কোন বন্দী যদি হঠাৎ একদিন দেখে যে জেলের খোলা দরজা দিয়ে চাঁদের আলো হাতছানি দিচ্ছে তখন বুলেটের ভয় কতটা তাকে আটকে রাখে গো?

টিয়াটা এক লাফে বেরিয়ে এসে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ও মা! বিষাদের পর বিষাদ। হুড়মুড়িয়ে ঝটপট করতে করতে মাটিতে এসে পড়ল টিয়া। বহুদিনের বন্দী অনভ্যাসে সে উড়তে ভুলে গেছে। মাটির থেকে লাফিয়ে উঠে আর একবার সে ডানা ঝাপটে লাফিয়ে উঠল। ওই ত, ওই ত চাঁদের ম্লান মুখখানা দেখা যাচ্ছে। এবার খানিকটা উঠেছিল সে, কিন্তু আবার চটপটিয়ে উঠোনে এসে পড়ল। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সভয়ে সে দেখল একটু দূরে নীলকান্ত মণির মত দুটো চোখ জ্বলছে। টিয়াটার ঝটাপটির শব্দে হুলোমশাই জেগে উঠে ওত পেতেছেন নিঃশব্দে।

ছুট, ছুট, নড়বড়ে ছুট। শিকারী বেড়ালের পেছু-ধাওয়া পায়ে আওয়াজ ওঠে না। হুলো মশাই লাফ মেরেছেন। মুখে গোঁফ-চোমরানো খুশি। আর একবার প্রাণপণে ডানা চালিয়ে হুলোর লাফের ওপর উড়ো লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল টিয়া পাখিটা, আবার পড়ল মাটিতে। হুলো ভায়া ধনুকের মত পিঠটা বেঁকিয়ে কান খাড়া করে, ল্যাজ তুলে লাফ মারল আর কি! এবার আর বাঁচা অসম্ভব। এমন সময় সামনেই একটা গর্ত। টিয়াটার আর ভাববার সময় ছিল না। চট করে সে ঢুকে পড়ল গর্তটার ভেতর। হুলোর থাবাটা তার লম্বা ল্যাজের রগ ঘেঁষে কেটে গেল।

হাঁপাচ্ছিল টিয়াটা। সমস্ত শরীর তার তখনও থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু আপাতত ত বাঁচা গেল। মন-প্রাণ দিয়ে বিশেষ করে চেয়ে খাঁচার থেকে মুক্তি পেয়েছে সে, আরও মনে-প্রাণে চাইলে কি হুলোর নজর এড়াতে পারবে না?

হঠাৎ সেই সুড়ঙ্গের ভেতর কি যেন খসখস করে উঠল আর টিয়াটা সভয়ে দেখল সুড়ঙ্গের ভেতর দুটো প্রবালের মত লাল চোখ জ্বলতে জ্বলতে এগিয়ে আসছে। ধেড়ে ইঁদুর। পারলে পাখি মারতে একটুও বাধে না তাদের।

বাইরে সুড়ঙ্গের মুখে হুলো বেড়াল আর পেছনে হুলো ইঁদুর। ক্যাঁ-অ্যা করে চেঁচিয়ে উঠে, সুড়ঙ্গ থেকে লাফ মারল টিয়াটা। সঙ্গে সঙ্গে লাফ মেরেছে সামনের হুলো বেড়াল আর পেছনের হুলো ইঁদুর। কি যেন কি হয়ে গেল ওই তিনটে একসঙ্গে লাফানোর ফলে। হুলো বেড়াল পড়ল হুলো ইঁদুরের ঘাড়ে। আর নিচের থেকে একটা দমকা হাওয়া যেন লুফে নিল টিয়াটাকে।

ডানা মেলে দিল টিয়া। ল্যাজে ঈষৎ মোচড় দিয়ে হাওয়ায় পাক খেয়ে গোঁৎ মেরে ওঠা ঘুড়ির মত সে ওপরে উঠে যেতে লাগল। সাঁতার কখনও কেউ ভোলে? চাঁদের লাল মুখ তখন ফ্যাকাশে রুপোলী হয়ে এসেছে। অনুকূল হাওয়ায় ঢেউ খেলিয়ে গা ভাসিয়ে দিয়েছে টিয়া। বাতাসে কি পাকা ধানের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে সুন্দরী গরান বনের ভেতর বয়ে যাওয়া হাজার ধারা ভৈরব নদীর ঘ্রাণ মিশে নেই?

মনের ভেতরের গভীর আনন্দে টিয়াটা ডেকে উঠল টিয়াদের যাযাবর যাত্রা ডাক—টিঁয়া, টিঁয়া টিঁয়া!

১৩৬৮

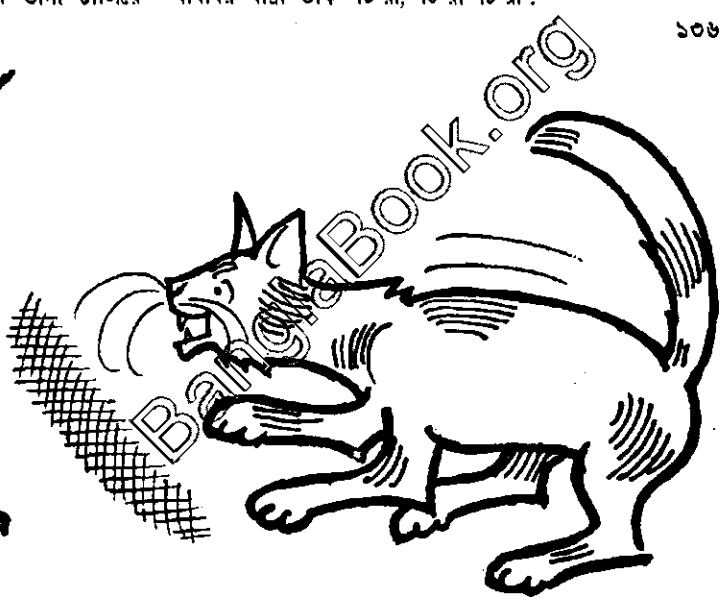

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

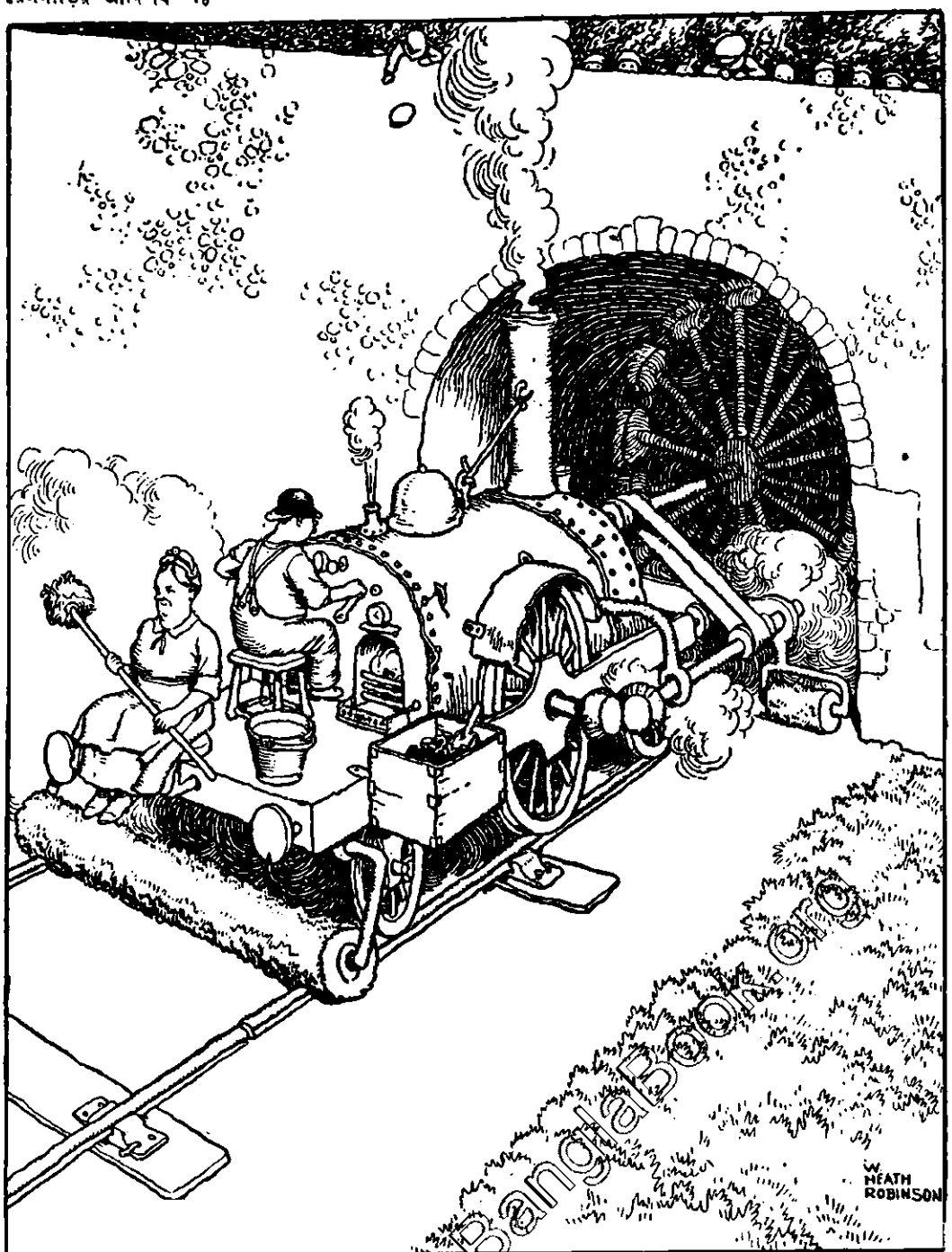

ঝুলকালি লাগে যদি টানেলের অন্ত্রে
নির্ঘাৎ হবে সাফ জেনো এই যন্ত্রে।

www.BanglaBook.org

॥ নৃত্যনাট্য ॥

রূপ বদলের রূপকথা

বারীন বসু

প্রথম দৃশ্য

[অনেক অনেকদিন আগের কথা। এক দেশে ছিল এক রাজা, তার এক রাণী। রাণীর ভারি বুদ্ধি। কতবার যে রাজা বিপদে পড়ে রাণীর কাছে বুদ্ধি চেয়েছে, চেয়ে বিপদ কাটিয়েছে, তার আর কোনো লেখাজোখা নেই। একবার রাজা কার মুখে শুনলে সাতসাগর পেরিয়ে দত্যিদানবের দেশে হীরে মাণিকের সারি সারি পাহাড়। সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাজা অমনি বেরিয়ে পড়ল দত্যিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। যুদ্ধ করে দত্যিদের হারিয়ে হীরে মাণিকের পাহাড় আনবে দেশে, পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে, এই তার সাধ। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। রাজা আর যুদ্ধ থেকে ফেরে না। রাণী এদিকে ভেবে ভেবে আকুল হয়। কেঁদেকেটে একসা করে। শেষে রাণী ডাকলে তার পোষা হীরেমন, পোষা টিয়েকে।]

(মঞ্চে আলো জ্বলছে। রাণী চিঠি লিখছে। চিঠি লিখে—)

রাণী : কই রে আমার লাল হীরেমন
কই রে আমার টিয়ে ?
সাতসাগরের পার থেকে আয়
রাজার খবর নিয়ে।
(সেই) মেঘমহলের শেষে
দত্যিদানার দেশে
আর কতকাল কাটবে রাজার
অস্ত্র ঝনঝনিয়ে ?
দিনের পরে দিন ফুরোল
জমল বছর কত,
তবুও রাজা দত্যিপুরে
যুদ্ধ খেলায় রত !
কবে, ঘুচিয়ে পথের দেরি
রাজার বিজয় ভেরী
শূন্য এ বুক ভরবে আমার
আনন্দ সুর দিয়ে ?

(গানের মধ্যেই হীরেমন ও টিয়ের প্রবেশ।)

হীরেমন ও টিয়ে : দু'চোখের ঢেউ মোছো
আর মা গো ভেব না,
নিমেষে আসব যাব
তার বেশি নেব না !

যেখানেই রাজা থাক্
শোনাব দেশের ডাক্
দুখের এই রাতটাকে
বড় হতে দেব না।

(রাণী চিঠি বেঁধে দিল পাখিদের পায়ে। উড়ে গেল তারা।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[চলল হীরেমন, সবুজ টিয়ে নীল আকাশের বুকে ডানা ছড়িয়ে দত্যিপুরীর পথ ধরে উড়ে চলল। উড়তে উড়তে, উড়তে উড়তে দেশের পর দেশ, মাঠের পর মাঠ, নদীর পর নদী পেরিয়ে অনেকদিন পরে পৌঁছুল তারা দত্যিপুরীর দেউড়িতে। সেখানে গিয়ে যা দেখল যা শুনল, তাতে তাদের রক্ত হিম হয়ে এল।]

(মঞ্চে আলো জ্বলল। হীরেমন, টিয়ে প্রবেশ করল। পা টিপে-টিপে। চারদিক দেখছে তারা ভয়ে ভয়ে। হঠাৎ কাদের পায়ের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শব্দে লুকিয়ে পড়ল দুজনে। দত্যিরাজা, দত্যিরাণী ও অনুচর-দের প্রবেশ।)

অনুচরগণ : দত্যিরাজার জয় বল ভাই
দত্যিরাজার জয়।
কীর্তি যে তার দীপ্তি ছড়ায়
আকাশ বাতাসময়।
যেখানে যে আছে তিন পৃথিবীর,
যত বড় রাজা, যত বড় বীর,
দত্যিরাজার নখের আগার
ধুলোর যুগ্যি নয়।

দত্যিরাজ : কাজ শুরু হক বিচার সভার
বন্দী রাজাকে আনো এইবার।
(প্রহরী বেষ্টিত বন্দী রাজার প্রবেশ)

দত্যিরাজ (বন্দী রাজাকে) **:**
পাথর বুকে শেকল পায়ে
পাতাল কারার ঘরে
বন্দী যত কাতার দিয়ে
তেষ্টা ক্ষিদেয় মরে,
তাদের দলে জুটবে তুমি
বুঝবে লোভের সাজা,
বুঝবে কত ভেল্কি জানে
দত্যি-দানার রাজা!
(তুমি) দিন কাটাবে রাত কাটাবে
দুঃস্বপ্নের ঘোরে,
দত্যিরাজা যাদুর ফুঁ-এ
রূপটি তোমার ধরে
তোমার দেশে সিংহাসনে
বসবে তোমার জাঁকে,
মিথ্যে রাজা সত্যি হবে
চিনবে না কেউ তাকে!
চিনবে নাকো বুঝবে নাকো
রাত্রি নিঝুম হ'লে
রাজ্যে যত হরিণ পাঁঠা
কার পেটে যায় চলে!
হরিণ-পাঁঠা নয়তো শুধু
সঙ্গে মানুষ চাই,
অল্প ভেটে কোথায় মেটে
দত্যিরাজার খাঁই?
জ্যান্ত ছেলে জ্যান্ত বুড়ো
এক গেরাসেই শেষ,
ঠিক দু'দিনে যাদুর দাপে
উজাড় তোমার দেশ!
(দত্যিরাজার ইঙ্গিতে বন্দীরাজাকে নিয়ে প্রহরীদের প্রস্থান।)

দত্যিরাণী : কাজ কি তোমার গিয়ে মানুষের
দেশে?
বিপদের ফাঁদে যদি ধরা পড় শেষে!

দত্যিরাজ : স্বর্গ মর্ত্য পাতালপুরে
ভয়টা আমার কাকে?
আর কে কোথায় শরীর জুড়ে
শক্তি এতই রাখে!

দত্যিরাণী : তবে, বুদ্ধিতে খাটো তুমি একথাটা ভুলো না;

দত্যিরাজ : শরীরের সঙ্গে কি বুদ্ধির তুলনা?
(বিরক্ত মুখে দত্যিরাণীর প্রস্থান।)

দত্যিরাজ : হিং ঘট্ ঘট্ রিং খট্ খট্
ভেল্কির যাদু জাগ্ রে,
বন্দী রাজার রূপ চটপট
শরীরে আমার লাগ রে!
(দত্যিরাজার বন্দী রাজায় রূপান্তর। অট্টহাসি।)

দত্যিরাজ : স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালপুরে
ভয়টা আমার কাকে?
আর কে কোথায় শরীর জুড়ে
শক্তি এতই রাখে!
(প্রস্থান। ভীত সন্ত্রস্ত হীরেমন ও টিয়ের প্রবেশ)

টিয়ে : দত্যিটা বহুরূপী—একি ভয়ানক!

হীরেমন : পালা ভাই চুপি চুপি, থামা বক্ বক্!

টিয়ে : ধড়াস ধড়াস বুক, ঠকাঠক হাড়ে,
থামে বুঝি ধুক্‌পুক্, নাড়ি বুঝি ছাড়ে!

হীরেমন : গড়িমসি নয় টিয়ে, তড়িঘড়ি চল্,
রাণীকে জানাই গিয়ে রাজাটা নকল।
(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[মঞ্চে আলো জ্বলল। সাত সাগরের এপারে বন্দী রাজার দেশ। বুদ্ধিমতী রাণী পায়চারি করছে। ভঙ্গীতে অস্থিরতা। কিংকরীর প্রবেশ]

কিংকরী : রাজ অনুচর দাঁড়িয়ে দুয়ারে।

রাণী : যাও ছুটে যাও ডেকে আনো তারে।
(কিংকরীর প্রস্থান ও অনুচরকে নিয়ে প্রবেশ)

অনুচর : জয় মহারাণী, প্রণাম শ্রীপদে,

রাণী : মহারাজা কোনো পড়েনি বিপদে?

অনুচর : না, না, তিনি শুধু যুদ্ধে জিতে
এইবারে দেশে ফিরতে চান তো।

রাণী : জুড়োল দু'কান, পাবে বক্‌শিশ।
(কিংকরীকে) ঝাঁপি ভরে এনে সোনাদানা দিস।
(কিংকরী ও অনুচরের প্রস্থান। রাণী আনন্দে উদ্বেল)

রাণী : আয় সখী আয় ছুটে,
নেব চল্ লুটেপুটে
হাসিখুশি যেখানে যা আছে!
আলোয় ভরাব বুক
কোনো মেঘ কোনো দুখ
এগোবে না আমাদের কাছে।
(সখীদের প্রবেশ)

রাণী : আন্ সখী হীরে মোড়া সেই কানবালা,
মুকুতার সীতাহার সাতনরী মালা!
আগুনের মত রাঙা বেনারসী কই?
চুনী দেওয়া টায়রাটা পরিয়ে দে সই।
(সখীরা সাজিয়ে দিল রাণীকে)

রাণী : বল্ দেখি এইবারে আমার সমান

www.BanglaBook.org

রঙে রূপে অপরূপা আছে কোন্‌খান?

সখীরা: আহা যেন তাজা গোলাপের ফুল
কোনো দেশে নেই এর সমতুল
(রাণী ও সখীদের আনন্দনৃত্য)

সমবেত গান: আয় সখী আয় ছুটে...আমাদের কাছে।
(গানের মধ্যেই হীরেমন ও টিয়ের দ্রুত প্রবেশ)

হীরেমন ও টিয়ে: দত্যিপুরীতে পাতাল কারায়
আমাদের রাজা বন্দী,
হানা দেবে এই মানুষপাড়ায়
দত্যিরাজার ফন্দী।
সামনে যা পাবে করবে সাবাড়
পাহাড় জমাবে পেটে
গোটা দেশখানা হলে ছারখার
শখ তবে তার মেটে।
পূর্ণিমা রাতে আসছে সে তাই
আমাদের রাজা সেজে,
আহ্লাদে কেন জ্বালো রোশনাই
ভেল্কির ধোঁকা এ যে!

রাণী: থাম্‌ তোরা থাম্‌
দূরে পাঠালাম
শিখতে কি এই কাজ?
কুকথার বিষ
দু'কানে ঢালিস
মাথায় ভাঙিস বাজ!

টিয়ে: সু-কথা কু-কথা বোঝে কে রাণীমা,
যা ঘটেছে শুধু সেইটে জানি মা!
(পাখীদের প্রস্থান)

রাণী: না, না, তাই বলে কেঁদে মরব না,
ডাকো মন্ত্রীকে দিক্‌ মন্ত্রণা!
(একজন সখীর প্রস্থান ও মন্ত্রীসহ প্রবেশ)

রাণী: ঘনিয়েছে আজ ঘোর দুর্যোগ
সারাটা রাজ্য জুড়ে,

মন্ত্রী: উঠবে আবার সূর্য রাণীমা
মেঘেরা যাবেই উড়ে।
(রাণীর ইঙ্গিতে রাণীর অনুবর্তী হয়ে মন্ত্রীর প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

[নকল রাজা, মন্ত্রী ও রাজ অনুচরদের প্রবেশ]

রাজা: অন্তঃপুরে কেন হৈ-চৈ
সব দোর কেন খোলা?

মন্ত্রী: রাজপুরী ছেড়ে চলেছে যে ওই
রাণীর চতুর্দোলা!
(চতুর্দোলা কাঁধে বাহকদের একদিক দিয়ে প্রবেশ ও অন্যদিক দিয়ে প্রস্থান)

রাজা: নির্জনে হবে ব্রত পার্বণ
মহারাণী যাবে বনে,
অদ্ভুত কথা শুনিনি এমন
কোথাও ত্রিভুবনে।

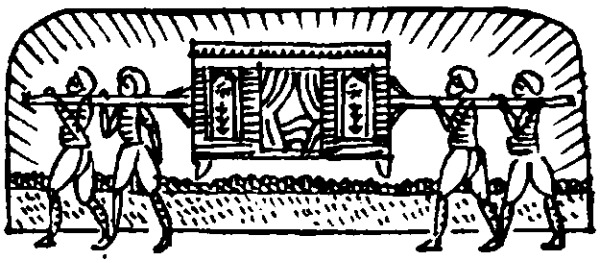

(মন্ত্রী ব্যস্তসমস্তভাবে, রাজার কথাটা চাপা দেওয়ার ভঙ্গীতে)

মন্ত্রী: আজকের মত রাজ-কাজ শেষ
শুরু হবে কাল ফের,
ঘরে ফিরে যাই, করুন আদেশ
বেলা গড়িয়েছে ঢের।
(রাজাকে প্রণাম জানিয়ে প্রস্থান)

রাজঅনুচর: (চারিদিকে সতর্কভাবে তাকিয়ে):
দত্যি আমরা, নই যে মানুষ
এখনো এদের জাগেনি সে হুঁশ।
গোটা রাজ্যির বুক জুড়ে তাই
আহ্লাদে রাঙা এত রোশনাই।
হোক মাতামাতি হোক রৈ রৈ
আমাদের কাজ আমরা গুছেই!

রাজা: কতখানি ভেদ আসলে নকলে
পারেনি তা এরা ধরতে,
দত্যিরাজাকে তাই দলে দলে
এসেছে প্রণাম করতে!
জানে না যে আমি সাক্ষাৎ যম,
জানে না আমার বধের নিয়ম,
জানে না যে কেন দু'দিনেই হবে
সব প্রজাদের মরতে!
(সকলের মিলিত উল্লাস)

পঞ্চম দৃশ্য

[মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণা করে ব্রতপুজোর ছলে রাণী গেল বনে। কিন্তু শুধু বনে লুকিয়ে থাকলে ত চলবে না! রাজাকে উদ্ধার করতে হবে। দত্যিরাজাকে মেরে রাজা বাঁচাতে হবে। রাণী তাই দত্যিদের সঙ্গে বুদ্ধির খেলায় নামল। একদিন সে পাখিওয়ালি সেজে হাজির হল নকল রাজার রাজসভায়।]

(রাজসভা। রাজা কোনো এক ফরমানে চোখ বুলোচ্ছে। গান গাইতে গাইতে পাখিওয়ালিবেশিনী রাণীর প্রবেশ)

পাখিওয়ালি: আমার পাখি অচিন্‌ পাখি
অচিন্‌ দেশে বাসা,
অচিন্‌ সুরে সাঁঝ সকালে
গান শোনাবে খাসা।
কোথায় ছিল সঙ্গোপনে
অচিন নামে অচিন্‌ বনে,

www.BanglaBook.org

ভরতে এল আমার মনে
অচিন্ ভালবাসা।

মন্ত্রী : বাঃ, অচিন্ পাখি অচিন্ সুরে
গাইবে ভোরের বেলা,
ফুরিয়ে যাবে রাজার চোখে
স্বপ্ন দেখার খেলা!

পাখিওয়ালি : কিন্তু পড়েছি বিপদে ঘোর
খুলছে না আর খাঁচার দোর
হারিয়ে গেছে চাবি।
তাই নিদারুণ পাখির হাল
পায়নি সে দানা আজ কি কাল
খাচ্ছে শুধু খাবি।

রাজা : ভাবনা কি তাতে? এই নাও ধর
মন্তর পড়া ধুলো,
শেষ রাত্তিরে গলবে খাঁচার
সমস্ত শিকগুলো।
ঠেকাবে কে এর শক্তি অথৈ?
বিশ্বভুবন ছার,
স্বর্গপুরীর মর্ত্যপুরীর
মানবে সবাই হার।

(ধুলো নিল রাণী। নিয়ে রাণীর ফের ক্রন্দন।)

মন্ত্রী : এ কি জ্বালাতন—
কেন অকারণ
ভাসাও চোখের কোল?
মিটে যাবে দায়
পেয়েছ উপায়
তবুও বাধাও গোল?

পাখিওয়ালি : মিছে গোল নয়, মরেনি যে ভয়
দায় আছে ঢের বাকি,
মস্ত শকুনি ওত পাতে শুনি
ধরতে অচিন্ পাখি!
রাতদিন ও যে ফাঁকতাল খোঁজে
তাক্ বুঝে দেবে হানা,
শকুনির ঠোঁট দেখালে দাপট
বাঁচবে পাখির ছানা?

রাজা : কান্না হুতাশ মিথ্যেই, নাও
মন্তর পড়া ফুল,
প্রাণ জাগে যদি হাড়েও ঠেকাও
নেই কোনো এর ভুল!

(রাজার কাছ থেকে যাদুফুল নিয়ে 'আমার পাখি অচিন্ পাখি' গাইতে গাইতে পাখিওয়ালি-বেশিনী রাণীর প্রস্থান।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

[যাদুফুল আর যাদুধুলো নিয়ে বনে ফিরে চলল রাণী। সে কি যে-সে বন? সেখানে কত পশু, কত পাখি কত আনন্দে দিন কাটায়।]

(আলো জ্বলল মঞ্চে। পশুপাখিদের গান গাইতে গাইতে একে একে প্রবেশ ও একে একে প্রস্থান। প্রথমে ঢুকবে বনের নানা-রকম পাখিরা।)

পাখিরা : সোনারোদ গায়ে মাখি
সারাদিন ক'টি পাখি
খেলা করি আকাশের বুকে,
সন্ধেটা নামে যেই,
ঘরে ফিরে আসি সেই
গাছের কোটরে পড়ি ঢুকে।
(হরিণের প্রবেশ)

হরিণ : হাল্কা পায়ে ঝড়ের গতি
নামটি আমার মৃগ,
বনটি জুড়ে বেড়াই ঘুরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিনলে আমায় কি গো।
(ময়ূরের প্রবেশ)

ময়ূর : খুশির ময়ূর আমি
নাচি আর গাই,
পেখমের রঙে রঙে
স্বপ্ন ছড়াই !
(খরগোসের প্রবেশ)

খরগোশ : আমি খুদে খরগোশ থাকি হেসে খেলে
ভারি খুশি হই শুধু কচি ঘাস পেলে !
(পাখিওয়ালি-বেশিনী রাণীর প্রবেশ)

রাণী : লাল হীরেমন শোন পাখি শোন,
উড়ে যা দত্যিপুরী !
দত্যিরই চালে কর্ ছারখার
দত্যির জারিজুরি !
এই যাদুধুলো দিবি যার গায়
সেই কারা যাবে গলে,
রাত ভেঙে ফের রাজা আমাদের
ফিরবে আলোর কোলে।

(রাণীর কথার মধ্যে হীরেমনের প্রবেশ। রাণী হীরেমনের পায়ে বেঁধে দিল যাদুধুলোর মোড়ক। হীরেমনের প্রস্থান।)

পাখিওয়ালি-বেশিনী রাণীর গান : আয় টিয়ে আয় দেরি কেন আর
ফুরিয়ে যে এল বেলা,
রাজাকে জানাগে রাণীর প্রণাম
দেখাগে যাদুর খেলা !
নিয়ে যা এ ফুল মন্তর পড়া
ছোঁয়াটি পেলেই এর,
দত্যিরা যত মেরেছে সৈন্য
বাঁচবে সবাই ফের !

(রাণীর কথার মধ্যেই টিয়ের প্রবেশ। টিয়ের পায়ে ফুল বেঁধে দিতে তার প্রস্থান। হীরেমন-টিয়ের উড়ে যাওয়া দেখতে দেখতে রাণীরও প্রস্থান। রাণীর সখীদের প্রবেশ। সখীরাও ছদ্ম-বেশধারিণী।)

সখী : বনের দেবতা নমি চরণতলে,
জয়মালা দেবে নাকি রাণীর গলে ?
যেদিকে তাকাই ফিরে
রেখেছে বিপদ ঘিরে
ভেঙে সে পড়েনি তবু চোখের জলে !

সপ্তম দৃশ্য

[হীরেমন আর টিয়ে মন্তরপড়া ধুলো, মন্তরপড়া ফুল নিয়ে ফের ছুটে গেল দত্যিপুরীতে। সেই ধুলোর ছোঁয়ায় গলে গেল কারাগারের সমস্ত শিক, সেই ফুলের ছোঁয়ায় প্রাণ ফিরে পেল রাজার সমস্ত সৈন্য।]

(মঞ্চে আলো জ্বলল। যুদ্ধক্ষেত্র। মাটিতে নিহত সৈন্যরা। আসল রাজার প্রবেশ। আসল রাজা যাদুফুলে ছুঁল সৈন্যদের। জেগে উঠল তারা।)

রাজা : শব্দ নয়, শব্দ নয়, একেবারে ধীরে,
(গান) নইলে জেনো জীবন থেকে আবার
যাবে ফিরে।
[রাজা ও সৈন্যদের পা টিপে টিপে প্রস্থান]

অষ্টম দৃশ্য

[গোপনে আসল রাজা ফিরে এল তার নিজের দেশে। লুকিয়ে রইল সুযোগের আশায়। রাণীও পাখিওয়ালির বেশ খুলে, বেনারসী পরে মাথা থেকে পা পর্যন্ত মণিমুক্তো জড়িয়ে ফিরে চলল রাজবাড়ি। আর নকল রাজা ? মনের আনন্দে সে তার অনুচরদের নিয়ে 'রাজ্যি উজাড়' করবার কাজে নেমে পড়েছে। ভাবছে বুঝি এ সুখ আর ফুরোবে না।]

(মঞ্চে আলো জ্বলল। নকল রাজা অস্থির-ভাবে পায়চারি করছে।)

নকল রাজা : এত দেরি কেন মানুষ ধরতে,
চরগুলো গেল কোথায় মরতে ?
আলো ফোটে ওই, রাত যে পালায়
আর তো বাঁচি না ক্ষিদের জ্বালায়।
সারাটা পৃথিবী ঘুমে একাকার
শুধু দুর্ভোগ দত্যিরাজার।
(শুকনো মুখে অনুচরদের প্রবেশ)

নকল রাজা : কি হল ? কোথাও পাওনি কিছুই ?
মিটবে না তবে পেট চুঁই চুঁই।

অনুচর : রাণী ফিরছেন আহ্লাদে তারই
সারা দেশ জুড়ে হাঁক-ডাক ভারি।
চাঁদ ডুবু-ডুবু শেষ রাত্তির
দশদিকে তবু দমফাটা ভিড় !
ছেলে থেকে বুড়ো যে কোনো খাদ্য।
তাই তো জোটানো ভারি অসাধ্য !

নকল রাজা : তোমরা থাকতে মানুষ পাড়ায়
কাতরাব আমি ক্ষিদের তাড়ায় ?
আচ্ছা তোমরা ফেরে পাবে কাল
কত ধানে হয় কতখানি চাল !
এ কি এ ? সবে তো ভোর হয় হয়,
মন্ত্রীমশাই কেন অসময় ?
(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী : বন থেকে দূত এনেছে খবর
সন্ধে নামলে আজ,
রাণীমার রথ সিংহদুয়ারে
পৌঁছুবে মহারাজ !

নকল রাজা : কি কথা শোনালে মন্ত্রীমশাই
এতদিন পরে তবে,
খাঁ-খাঁ রাজপুরী প্রাণ পাবে ফের
স্বপ্ন-মহল হবে।
দৃষ্টি ধাঁধিয়ে স্বপ্নের সোনা,
এত খুশি আমি একা বইব না।
ভরে দাও বুক সারা রাজ্যের

www.BanglaBook.org

আহ্লাদে উৎসবে।
(রাজার আনন্দনৃত্যের তালে প্রস্থান)

মন্ত্রী : কাকে বলে প্রতিশোধ
কাকে বলে সাজা,
বুঝবে তা এইবার
দানবের রাজা !

নবম দৃশ্য

[রাণীর মহল। রাণী ও সখীদের উদ্দাম রণনৃত্য। কিংকরীর প্রবেশ।]

কিংকরী : রাজা আসছেন রাণীর মহলে

রাণী (সখীদের) : তোমরা এবার লুকোও তাহলে।
দূরে নয় যেন কাছেই থাকিস
আসল রাজাকে সঙ্গে রাখিস।

(সখীদের প্রস্থান। রাণীর কৃত্রিম ক্রন্দন। নকল রাজার প্রবেশ।)

রাজা : চাঁদমুখে কই জ্যোছনার আলো ?
বন থেকে ফেরা লাগছে না ভালো !

রাণী : খুশির ঝিলিক চারদিকে, তবু
স্বপ্ন দেখায় ভয়,
দত্যির ছায়া দেশ ছেড়ে যেন
কিছুতে যাবার নয়।
যেদিকে তাকাই দত্যির মুখ
ঘুম ভেঙে তবে বাঁচি
যেই বুজি চোখ পেঁছুই ফের
দত্যির কাছাকাছি।

রাজা : পৃথিবীতে আমি সব সেরা বীর
আমি তো রয়েছি পাশে,
দত্যিরা যদি আনে দুর্যোগ
তাতে কি বা যায় আসে ?
তবু কাঁদো রাণী ? তবু ভয়ে কাঁপো ?
তবু করো মুখ চুণ ?
শুনে রাখ তবে যাদু-ভরা এই
মণিকৌটোর গুণ !
ধরা আছে এতে সোনালী ভোমরা
ছিঁড়ে দিলে তার টুঁটি,
সব কাঁদা-হাসা চুকিয়ে তখুনি
দত্যিরাজার ছুটি !

রাণী : তোমার মুঠোয় যাদু কৌটোয়
দত্যিরাজার প্রাণ কাঁদে,
ভাবনা কি আর ? তবে এইবার
আটখানা হই আহ্লাদে !

রাজা : খুশির জ্যোছনা তবু জ্বলে কই ?

রাণী : রাত হল ঢের, এবারে ঘুমোই।

(রাজা-রাণী ঘুমোতে শুল। রাজা ঘুমোল, কিন্তু রাণী জেগে। রাজার মাথার কাছে মণিকৌটো। রাণী আস্তে সেটা তুলে নিতে গেল, ঘুম ভেঙে গেল রাজার।)

রাজা : শেষরাতে রাণী এখানে কি খোঁজে ?

রাণী : ঘুমোতে দিল না দুঃস্বপ্ন যে।
খালি ভয় হয়, এল বুঝি চোর,
উধাও ভোমরা মণি-কৌটোর।
তাই তো উঠেছি কৌটোটা নিতে,
অন্তঃপুরে চোরা কুঠুরীতে
সোনালী ভোমরা থাকবে লুকোনো
কেউ তার খোঁজ পাবে না কখনো।

রাজা : আমার মতন নেই কোন বীর
আমায় যে দেবে ফাঁকি,
তত বড় চোর তিন পৃথিবীর
কোথাও মেলে নাকি ?

(আবার রাজা ঘুমোল, রাণী কিন্তু ঘুমোয়নি। চিন্তা করছে একমনে।)

রাণী : মণি-কৌটাটা হাতে পাওয়া দায়,
দত্যি মারার কি করি উপায় ?

(হঠাৎ কি ভেবে আনন্দে দুলে উঠল রাণী। আলতো হাতে তালি দিল তিন বার। হীরেমন, টিয়ে উড়ে এল। রাণী তাদের কানে কানে কি বলল।)

হীরেমন : নকল রাজার নিস্তার নেই আর,
রসাতলে গিয়ে পেঁছবে এইবার।
তাড়াতাড়ি কর, ওই উঁকি দেয় ভোর,
আমরা তো আছি, হারিও না মনে জোর।

টিয়ে : কাছাকাছি আছে আসল রাজাও,
বুক বাঁধো, খেলা শুরু করে দাও।

(পাখিরা সারাঘর তোলপাড় করতে লাগল। কেঁদে উঠল রাণী।)

রাণী : ওঠো রাজা, দেখ কোত্থেকে উড়ে
পাখি এল একজোড়া—
তোলপাড় করে ঘর।
মন বলে, এরা পাখি নয় কোন
যদু মন্তরে মোড়া
দত্যি রাজার চর।

(ঘুম ভেঙে বিরক্তিভরে জেগে উঠল রাজা।)

রাজা : আঃ রাণী একি ধুম ?
মাটি হল কাঁচা ঘুম।
মেজাজটা প্রথমে চড়ল।
বেয়াদপ পাখিদের
এখুনি কাওয়াব টের
এই দেখ এক কোপে মরল।

(রেগেমেগে নকল রাজা খাপ থেকে তলোয়ার খুলে লাফিয়ে উঠে পাখিদের ধরতে দৌড়ে গেল। পাখিরা দুজনে ঘরের দুদিকে—ঘরময় ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে রাজাকে। সেই সুযোগে রাণী পালঙ্ক থেকে তুলে নিলে মণিকৌটো। মণিকৌটোটা সবে খুলেছে, অমনি রাজা এক নিমেষে দত্যিরাজ হয়ে গেল। খসে পড়ে গেল ছদ্মবেশ। রাণীকে তলোয়ারে কাটতে ছুটল, বাধা দিল হীরেমন। বেশিক্ষণ যুঝতে পারল না। কাটা পড়ল দত্যির হাতে। তখন এগোল টিয়ে। এদিকে রাণী ভয়ে দিশেহারা, কাঁপছে রীতিমত। প্রায় মূর্ছা যায় আর কি। কিন্তু আসল রাজা ত কাছেই আছে। এইবার সুযোগ বুঝে আসল রাজা প্রবেশ করল ঘটনাস্থলে। দৌড়ে এসে ধরে ফেলল রাণীকে। রাণীর হাত থেকে মণিকৌটো নিয়ে বের করল ভোমরাকে।

www.BanglaBook.org

দত্যিরাজ এদিকে টিয়েকেও শেষ করে রাজার দিকে এগোচ্ছে। রাজাকে মারতে তলোয়ার উঠিয়েছে, এমনি সময়ে রাজা মেরে ফেলল ভোমরাকে। হাতের তলোয়ার হাতেই রইল—দত্যিরাজ বিকট সুরে চেঁচিয়ে উঠেই মাথা ঘুরে চোখ উল্টে মাটিতে পড়ে মরে গেল। দূরে দত্যিরাজার অনুচরদেরও অন্তিম আর্তনাদ শোনা গেল।)

রাজা : রাজা নয় শুধু, সাঙ্গপাঙ্গ
যে যেখানে ছিল তার,
মণি-কোটোর দৌলতে তবে
সকলেই ছারখার।
তবু রোশনাই জ্বালল না মন
দূরে রয়ে গেল সুখ,
ছেড়ে চলে গেল টিয়ে, হীরেমন
ভেঙে দিয়ে গেল বুক।

রাণী : ছেড়ে যাবে কেন? রয়েছে কাছেই
ফিরবেই এক্ষুনি,
মিথোই কেন দিশেহারা হও
ভেঙে পড়ো কেন শুনি?
দত্যিরাজার যাদুভরা ফুল,
আছে তো তোমার কাছে
ভুলে গেলে তাকে হাড়ে ঠেকালেও
প্রাণ পেয়ে হাড় বাঁচে!

(যাদুফুলের ছোঁয়ায় বেঁচে উঠল টিয়ে আর হীরেমন। রাজা-রাণী তাদের জড়িয়ে ধরল। কি আনন্দ! কি আনন্দ! রাণীর সখীরাও এসে যোগ দিল সেই আনন্দে। সকলের আনন্দের মাঝখানে আনন্দের সুরে ও তালে যবনিকা পড়ল নাটকে।)

১৩৮৫

আবহাওয়ার কথা

অশোকানন্দ দাশ

বৈশাখের কোনো দিন দেখি আকাশে পাহাড়ের মত উঁচু উঁচু মেঘ উঠেছে। আষাঢ় কিংবা শ্রাবণ মাসে খবরের কাগজে পড়ি চেরাপুঞ্জিতে একদিনেই কুড়ি ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছে। পৌষ কিংবা মাঘ মাসে শ্রীনগর, সিমলা অথবা দার্জিলিঙে বরফ পড়ে। আবার কোনোদিন নীল আকাশে মেঘের টিকিও দেখা যায় না। মাঠের উপর, নারকেলপাতার উপর, বাড়ির আঙিনায় সোনার রৌদ্র খেলা করে। এই মেঘ, এই বৃষ্টি। এই তুষারপাত, এই মেঘহীন নির্মল দিন—আবহাওয়ার বিভিন্ন রূপ। যেমন তুমি কখনও হাস, কখনও কাঁদ, কখনও ভ্রূকুটি কর—তোমার মুখের ভিন্ন ভিন্ন ছবি আমরা দেখতে পাই।

আমাদের প্রত্যেককেই অনেক সময় আবহাওয়া কিরকম হবে, এই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। জন্মদিনে বাড়ির ছাদে বসে, আত্মীয়-বন্ধু নিয়ে, লুচিমণ্ডা খেলে, খেলাধুলো করলে মজা হয় খুবই। কিন্তু ভাবতে হয়—ঝড়বৃষ্টি এসে সব লণ্ডভণ্ড করে দেবে না ত! পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলোয়াড়ের দল খেলতে আসবে কানপুরে আর কলকাতায়—ভাবি এমন শীত হবে না ত যে কানপুরে খেলোয়াড়দের হাত-পা জমে যাবে, খেলা আর জমবে না! অথবা কলকাতায় বৃষ্টি এসে খেলা মাটি করে দেবে না ত!

আবহাওয়ার বিষয়ে তাই সকলেরই অল্পস্বল্প জ্ঞান থাকা ভাল।

তিনটি জিনিস মিলে বিভিন্ন আবহাওয়ার সৃষ্টি :

সূর্য —তাপ দেয়, আলো দেয়, শক্তি যোগায়।

হাওয়া—চারদিকে হাওয়ার সমুদ্র। মাছ যেমন জলে বাস করে, আমরা তেমনি হাওয়ার রাজ্যে বাস করি।

জল —সমুদ্রের জল ; নদীনালার জল ; খালবিলের জল ; ভিজে কাপড়ের জল ; সবুজ পাতার জল।

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ৯,৩০,০০,০০০ মাইল। অন্যান্য তারাদের মধ্যে যেটি আমাদের সবচেয়ে কাছে পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব হচ্ছে ২৬,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল। সুতরাং তারাদের মধ্যে সূর্যই আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। সূর্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১০৮ গুণ।

সূর্য একটি জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড। এর তাপ ১০,৩০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট। বাংলাদেশে বছরের যেদিন সবচেয়ে বেশি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গরম, সেদিনের সবচেয়ে বেশি তাপ ১১০ ডিগ্রী কি ১১১ ডিগ্রী ফারেনহাইটের বেশি নয়। এর থেকেই অনুমান করে নিতে পার যে সূর্যের তাপ কি সাংঘাতিক। সূর্যের তাপ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে : তার বেশির ভাগই অপচয় হয় ; অতি সামান্য অংশই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহে পৌঁছয়। কিন্তু সূর্যের তাপের এই সামান্য অংশই বিরাট শক্তির উৎস।

যখন আমরা কয়লা জ্বেলে রান্না করছি, তখনও সূর্যের কাছ থেকে ধার করা শক্তিরই ব্যবহার করছি। হাজার হাজার বছর আগে যে শাল-পিয়ালের বন ছিল, সূর্যের আলোর সাহায্যে আজকের গাছগাছালির মতই সে-সব গাছ বড় হয়েছিল। ঝড়ে হয়ত পড়ে গিয়েছিল, রোদের তাপে শুকিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। মাটির স্তরে স্তরে তা আজ কয়লায় পরিণত হয়েছে।

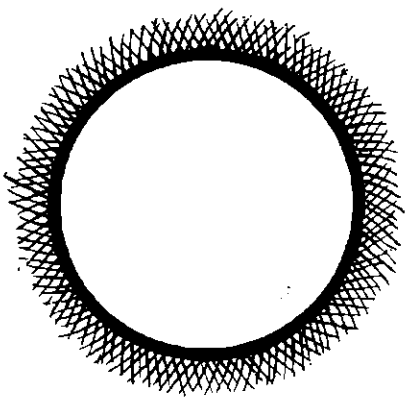

আমরা হাওয়ার রাজ্যে বাস করি। পৃথিবীর আয়তন যদি হয় উপরের বলটির মত, পৃথিবীর চারিদিকের হাওয়ার বিস্তার হবে বলের পাশের ছায়া-ছায়া বেষ্টনীর মত।

হাওয়াকে ত আমরা চোখে দেখতে পাই না। হাওয়ার অস্তিত্বকে তবে কি করে প্রমাণ করা যায়?

একটি গ্লাস উপুড় করে যদি কোনো বালতির জলের উপর চেপে ধর, দেখবে গ্লাসে জল উঠছে না। কেন উঠছে না? কে বাধা দিচ্ছে? গ্লাস বায়ুতে পূর্ণ ছিল, সেই বায়ুকে না সরালে জল কি করে উঠবে? গ্লাসটা কাত করে বায়ুকে সরবার পথ দিলেই বায়ু সরে যাবে ; তখন জল উঠবে।

একটা ড্রপার কালির দোয়াতে ডুবিয়ে দেখ কালি উঠবে না। কিন্তু ড্রপারের উপরের রবারের টুপিতে চাপ দিয়ে যদি ড্রপারের থেকে কিছুটা হাওয়া সরিয়ে দাও, কালির দোয়াতে ড্রপারের মুখ ডুবিয়ে তারপরে ছেড়ে দাও, দেখবে সরে-যাওয়া হাওয়ার জায়গায় কালি আসছে। একটা বেলুন যদি ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে দেওয়া যায়, সেটা বেশ শক্ত হয়ে ওঠে, চাপ দিলে বোঝা যায় যে সেই আগের নরম বেলুন আর নেই। বেলুনের ভিতরে হাওয়া ঢুকে বেলুনকে চাপ দিয়ে শক্ত করে দিয়েছে। হাওয়ার অস্তিত্ব এইভাবে বোঝা যায়। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় দেখতে পাই নিম-কাঞ্চনের পাতা দুলছে, ঘরের ভিতর পাতলা কাগজ-পত্র উড়ে যাচ্ছে, ঘরের দেওয়ালের ক্যালেন্ডার নাচতে শুরু করেছে। আমরা বুঝতে পারি ঐ সবই হাওয়ার কীর্তি।

হাওয়ার ওজন আছে কি?

একটা বেলুন ওজন কর। তারপর তাকে ফুলিয়ে আবার ওজন কর। দেখবে যে ফোলানো বেলুনের ওজন বায়ুশূন্য বেলুনের চেয়ে বেশী। একটা বোতল যদি ওজন করা যায়, আবার বোতল থেকে হাওয়া পাম্প করে বার করে নিয়ে বায়ু-শূন্য বোতল যদি ওজন করা যায়, দেখবে বায়ুশূন্য বোতলের ওজন বায়ুপূর্ণ বোতলের চেয়ে কম। দেখা গেছে যে এক ঘনফুট হাওয়ার ওজন ১·২৯১৫২ আউন্স। নেহাত কম নয়, কি বল?

তুমি বাগানে বেড়াচ্ছ। তোমার মাথা আর ঘাড়ের ওপর যে বায়ুস্তম্ভ রয়েছে, তা প্রায় দু'শো মাইল উঁচু। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে তুমি কি ভীমের চেয়েও বেশি শক্তিশালী? না হলে অক্লেশে এত ওজন কি করে বহন করছ? এটা সম্ভব হয়েছে, কারণ তোমার চারিদিকেই ত বায়ুর সমুদ্র রয়েছে, তোমার শরীরের উপর সেই সব বায়ু ঘাড়ের উপরের বায়ুর উল্টোদিকে চাপ দিচ্ছে। ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে দুদিকের চাপ সমান হওয়ায় তুমি বায়ুর ওজন বুঝতেই পারছ না।

একটা সহজ পরীক্ষা করলেই জিনিসটা পরিষ্কার হবে। তোমার কোনো বন্ধুকে বলো একটা পাতলা কাগজের দু'পাশে দু'হাত দিয়ে কাগজটাকে টেনে ধরে থাকতে। একটু আঙুল দিয়ে কাগজটাকে চাপ দাও, দেখবে কাগজটা ছিঁড়ে যাবে। এবার ঠিক সেইরকম আর একটা পাতলা কাগজ নিয়ে, দু'দিকে দু'-আঙুলে চাপ দাও। কিছুই হবে না, কারণ দু'দিকের চাপ সমান।

পৃথিবীকে হাওয়ার যে সমুদ্র বেষ্টন করে আছে, তার উচ্চতা প্রায় দু'শো মাইল। কিন্তু মাটির কাছাকাছি, নীচের স্তরের হাওয়াই সবচেয়ে বেশি ভারি। তুমি যদি একটার ওপর একটা লুচি রেখে দশ ফুট উঁচু লুচির একটা স্তম্ভ তৈরি কর, তাহলে দেখবে যে সবচেয়ে নীচের স্তরের লুচির ওপর সবচেয়ে বেশি চাপ পড়েছে। তুমি যদি স্কেল দিয়ে সবচেয়ে ওপরের পাঁচ ইঞ্চি আর সবচেয়ে নীচের পাঁচ ইঞ্চি লুচি মেপে নিয়ে আলাদা আলাদা ওজন কর, দেখবে নীচের লুচির ওজন বেশি, লুচির সংখ্যাও বেশি।

হাওয়ার ক্ষুদ্র কণাকে বলা হয় হাওয়ার অণু। একটা আল-পিনের মাথায় সেইরকম দশ পরার্ধ (এক্কের পর ১৯টা শূন্য দিয়ে যে সংখ্যা হয়) হাওয়ার অণু সাজিয়ে রাখা যায়। এইসব অণু আবার স্তম্ভের লুচির মত একটার ঘাড়ে একটা চেপে বসে আছে। সুতরাং মাটির কাছাকাছি সবচেয়ে নীচের স্তরের হাওয়ার অণুর সংখ্যা বেশি। তাই সেই স্তম্ভের হাওয়ার ওজনও বেশি, ঘনত্বও বেশি।

হাওয়ার রাজ্যে যতই উঁচু স্তরে উঠবে, দেখবে হাওয়ার ঘনত্ব কমে যাচ্ছে। হিমালয়ের মত উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় অথবা এয়ারোপ্লেনে হাওয়ার উঁচু স্তরে উঠলে দেখবে হাওয়া এত হাল্কা হয়ে যাচ্ছে যে নিঃশ্বাস নেবার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হচ্ছে।

যদি কোনো গ্রীষ্মের দিন শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙে ওঠ, শিলিগুড়িতে প্রচণ্ড গরম পাবে, ঘাম হবে : একটু উঁচুতে উঠলে গরম অনেকটা কমে যাবে, বেশ আরাম পাবে, আরো উঁচুতে উঠলে গরম জামা গায়ে দিতে হবে। যত উপরে উঠবে, হাওয়ার তাপ ততই কমে যাবে। অণুগুলো তখন আর নীচু স্তরের হাওয়ার মত পরস্পরের গায়ে গায়ে চেপে নেই, বরং কিছুটা দূরে দূরে আছে।

মাটির কাছের হাওয়ার অণু শুধু গায়ে গায়ে লেগেই থাকে

www.BanglaBook.org

না, অশান্ত ছেলের মত সব সময় ছুটোছুটি করে। পরস্পর গায়ে ধাক্কা দেয়। এইরকম ছুটোছুটি ও ধাক্কাধাক্কিতে হাওয়ার তাপ বেড়ে যায়!

হাওয়ার চলাচল হয় কেন?

গরম হাওয়া ঠান্ডা হাওয়ার চেয়ে হাল্কা। হাওয়া গরম হলে তাই ওপরের দিকে ওঠে, আর তখনই চারিপাশ থেকে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা হাওয়া এসে উড়ে-যাওয়া গরম হাওয়ার স্থান দখল করে।

আগেই বলা হয়েছে যে গরম হাওয়া ঠান্ডা হাওয়ার চেয়ে হালকা। যে জায়গায় গরম হাওয়া ছিল, সেখানে যদি কিছু ঠান্ডা হাওয়া এসে মেশে, তাহলে হাওয়ার চাপ আগে যা ছিল তার চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি হবে।

বিভিন্ন স্থানে হাওয়ার তাপের তারতম্য না থাকলে হাওয়ার চলাচল হত না, হাওয়ার চাপ সমানই থাকত, আবহাওয়ার পরিবর্তন হত না। তাহলে তাপ বস্তুটিই হচ্ছে যেন একটা চামচ যা বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন স্থানে শুষ্ক বা আর্দ্র হাওয়াকে মেশাচ্ছে, এবং মিশিয়ে আবহাওয়ার সৃষ্টি করছে।

সূর্যের কিরণে জলের চেয়ে ঢের তাড়াতাড়ি গরম হয় মাটি আর পাথর। একটা পাত্রে কিছুটা মাটি আর অন্য একটা পাত্রে খানিকটা জল নিয়ে রোদে রেখে দাও। আধ ঘন্টা পরে দেখবে মাটি বেশ তেতে উঠেছে, কিন্তু জল ততটা তেতে ওঠেনি।

একই কারণে, দিনের বেলা দেখবে জলের চেয়ে ডাঙা বেশি গরম। মাটির তাতে মাটির উপরকার হাওয়াও তেতে ওঠে। হাওয়া গরম হলে হালকা হয়। মাটির উপরকার হালকা হাওয়া উপরের দিকে ওঠে। তখন তার জায়গায় উড়ে এসে জুড়ে বসে জলের উপরকার হাওয়া ; এই হাওয়া মাটির উপরকার হাওয়ার চেয়ে ঠান্ডা।

সূর্যাস্তের পর ঘটে উলটো ব্যাপার। মাটি তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়, কিন্তু জল অনেকক্ষণ গরম থাকে। তার কারণ, সূর্যের কিরণে মাটির শুধু উপরের স্তরই গরম হয়, কিন্তু জলের অনেকখানি নিচেও সূর্যের তাপ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, সূর্যাস্তের পর মাটি তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয় কিন্তু অতখানি জল ঠান্ডা হতে একটু বেশি সময় নেয়। তখন জলের উপরকার গরম হালকা হাওয়া উপরের দিকে ওঠে আর মাটির উপরকার ঠান্ডা হাওয়া এসে তার জায়গা দখল করে। তাই তখন ডাঙা থেকে জলের দিকে হাওয়া বইতে থাকে।

সূর্যের তাপে জল বাষ্প হয়ে বায়ুর সঙ্গে মিশে যায়। গ্রীষ্মকালে দেখা যায় অনেক পুকুরের জল শুকিয়ে গেছে। কারণ সূর্যের তাপে ছোট জলকণারা পুকুর থেকে একে একে লাফিয়ে বায়ুর সঙ্গে গিয়ে মিশেছে।

তাপ যত বেশি হয়, জল ততই তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে যায়। একই মাপের দুটো পাত্রে এক চামচ করে জল নিয়ে একটিকে রোদে আর একটিকে ছায়ায় রেখে পরীক্ষা করো। কিছুক্ষণ পরে দেখবে রোদে রাখা পাত্রে একফোঁটাও জল নেই, কিন্তু ছায়ায় রাখা পাত্রটিতে তখনও জল রয়ে গেছে।

জল যতই ছড়িয়ে থাকবে, ততই তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে যাবে। এক চামচ জল একটা প্লেটে ঢেলে দাও, জল প্লেটময় ছড়িয়ে পড়বে। আর এক চামচ জল নিয়ে চামচেই রাখো। দেখবে প্লেটের জল চামচের জলের চেয়ে অনেক আগেই শুকিয়ে গেছে।

শুকনো দিনে, যখন বায়ুতে জলের ভাগ কম থাকে—জল তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে যায়। ফলে, শরীরে ঘাম জমতে পারে না, কিন্তু গ্রীষ্মে যদি বাতাসে জলের ভাগ বেশি থাকে, তাহলে ঘাম সহজে বাষ্প হতে পারে না। তখন সারা গা ঘেমে ওঠে।

বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সবসময়ে একরকম থাকে না। কখনও থাকে খুব বেশি, যেমন বর্ষাকালে। আবার কখনও খুব কমে যায়। বাতাসে এই জলের ভাগকে বলা হয় বায়ুর আর্দ্রতা। যখন আমরা বলি বায়ুর আর্দ্রতা কত, তখন বুঝি—কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কত। যেমন, এক ঘনমিটার বায়ুতে কত গ্রাম জলীয় বাষ্প থাকে তাই দিয়ে বায়ুর আর্দ্রতা স্থির করা যায়।

যে বায়ুর উত্তাপ যত বেশি, জলীয় বাষ্প গ্রহণ করবার ক্ষমতাও তার তত বেশি। আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলতে বুঝি কোন বিশেষ উত্তাপে বায়ু যতটা জলীয় বাষ্প গ্রহণ করতে পারে তার কতখানি অংশ সেই বায়ুতে বর্তমান আছে। যখন নির্দিষ্ট পরিমাণ জলীয়-বাষ্পপূর্ণ বায়ু ঠান্ডা হয়, তখন তার আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেড়ে যায় ; আবার যখন সেই বায়ু গরম হয়, তখন তার আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমে যায়। যে কোন উত্তাপে বায়ুতে যতখানি জলীয় বাষ্প গ্রহণ করা সম্ভব, সবটাই যখন গ্রহণ করা হয়ে যায়, তখন বলা হয় যে, ঐ বায়ু জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিপূরিত—অথবা তার আপেক্ষিক আর্দ্রতা শতকরা ১০০।

রোজ হাজার হাজার মন জল বাষ্পে পরিণত হচ্ছে। নদী, নালা, পুকুর, দীঘি, সমুদ্র—রোজই বায়ুর মধ্যে জলীয় বাষ্প পাঠাচ্ছে। আর্দ্র বায়ু উপরে উঠে ঠান্ডা হচ্ছে। উঠতে উঠতে তার আপেক্ষিক আর্দ্রতা বাড়তে বাড়তে যখন ১০০% হচ্ছে, তখন মেঘ হচ্ছে। মেঘ থেকে সেই জল আবার বৃষ্টি অথবা বরফ হয়ে ঝরে পড়ছে। ঘুরে ঘুরে জল থেকে বাষ্প, বাষ্প থেকে মেঘ, তারপর মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়ে আবার ঝরে পড়া—একে বলা হয় জলচক্র।

ঘরের জানলা দিয়ে যখন সূর্যের আলো তেরছাভাবে পড়ে, তখন সেই উজ্জ্বল আলোর ভিতর অসংখ্য ধূলিকণা দেখতে

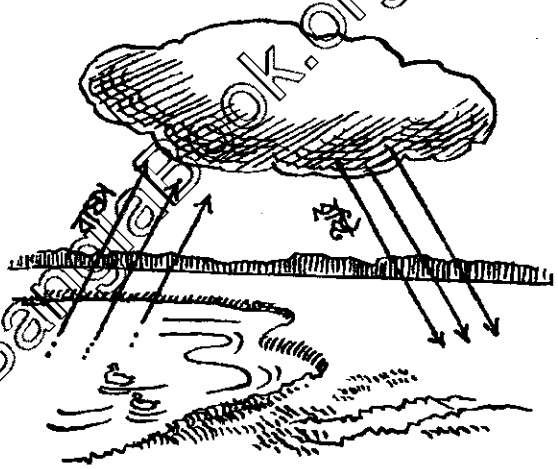

পাওয়া যায়। বায়ুর মধ্যে এরকম অসংখ্য ধূলিকণা ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। সমুদ্রের জল উঁচুতে লাফিয়ে উঠছে, তা থেকে লবণের কণা বায়ুর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বাড়িঘর ভাঙা

www.BanglaBook.org

হচ্ছে, বালি সিমেন্ট চুনের কণা বায়ুতে আস্তানা বাঁধছে। তেমনি উনুনের ধোঁয়া, ধুলো, ফুলের রেণু—সবই বাতাসের সঙ্গে উপরে উঠে ভেসে বেড়াচ্ছে।

বায়ু যখন উপরে উঠে ঠান্ডা হয়, জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ছোট ছোট শিশিরকণার মত জলের বিন্দু সৃষ্টি হয় আর এইসব জলবিন্দু ধূলিকণার গায়ে লেগে থাকে। ধূলিলগ্ন হাজার হাজার জলকণা দলবদ্ধ হয়ে যখন আকাশের গায়ে ভাসতে থাকে, তখন সেইদিকে তাকিয়ে আমরা বলি আকাশে মেঘ হয়েছে।

মেঘহীন শীতের রাত্রে মাটি থেকে খুব তাড়াতাড়ি তাপ বেরিয়ে যায় বলে মাটি খুব ঠান্ডা হয়। মাটির উপরের হাওয়া মাটির সংস্পর্শে এসে এত ঠান্ডা হতে পারে যে, বায়ু জলীয় বাষ্পে পরিপূরিত হাওয়ার পরেও আরো ঠান্ডা হতে থাকে। তখন বাষ্প ঘনীভূত হয়ে কুয়াশার সৃষ্টি করে। কুয়াশাকে বলা হয় 'ডাঙার মেঘ'।

সমুদ্র অথবা হ্রদের উপরকার আর্দ্র গরম হাওয়া অনেক সময় ঠান্ডা মাটির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যথেষ্ট পরিমাণে ঠান্ডা মেঘের সৃষ্টি করে।

হাওয়া বয়ে যেতে যেতে সামনে পাহাড়ের বাধা পেলে উপর দিকে ওঠে, আর উপরে উঠলেই হাওয়া ঠান্ডা হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে ঠান্ডা হলেই মেঘের সৃষ্টি হয়। তাই পাহাড়ের গায়ে কিংবা পাহাড়ের ঠিক উপরেই অনেক সময়ে মেঘ দেখতে পাওয়া যায়।

আবার অনেক সময়ে ঠান্ডা হাওয়া ঢুঁ মেরে তার সামনের গরম হাওয়াকে উপরে তুলে দেয়। উপরে উঠে গরম হাওয়া যথেষ্ট ঠান্ডা হলেই মেঘের সৃষ্টি হয়।

কখনও কখনও উঁচু মেঘ থেকে ঠান্ডা বরফ অথবা বৃষ্টি পড়ে নিচের স্তরের হাওয়াকে এত ঠান্ডা করে যে, সেই স্তরেও মেঘের সৃষ্টি হয়।

একটা পরীক্ষা করে দেখতে পারো। ঠান্ডা, অথচ বেশ রোদ উঠেছে, এমন দিনে একটা কাঁচের গেলাস নিয়ে বাগানের ঘাসে উপুড় করে রাখো। কিছুক্ষণ পরে দেখবে গেলাসের ভিতরের দিক একটু ধোঁয়াটে হয়েছে। গেলাসের বাইরে হাত দাও, শুকনোই আছে; কিন্তু ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে দেখবে ভিতরের দিকটা ভিজে গেছে। ঘাস আর মাটি থেকে জলকণার দল সূর্যের তাপে জলীয় বাষ্প হয়ে উড়তে শুরু করেছিল। ঠান্ডা গেলাসের গায়ে লেগে আবার তারা ঠান্ডা হয়ে, ঘনীভূত হয়ে জলকণায় পরিণত হয়েছে। আর এরকম দশ-বিশ হাজার জলকণা মিলে গেলাসের ভিতরেই ক্ষুদ্র মেঘের সৃষ্টি করেছে।

শীতের দিনে ফুঁ দিয়ে মুখের ভিতর থেকে যদি হাওয়া বার করে দাও, তাহলে দেখবে ঠান্ডা হাওয়ার ছোঁয়াচ লেগে মুখের গরম হাওয়ার জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে অতি ক্ষুদ্র একটি মেঘের সৃষ্টি করেছে।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, বায়ু জলীয় বাষ্পে পরিপূরিত হবার পর যে-কোন কারণে আরো ঠান্ডা হলেই বাষ্প ঘনীভূত হয়। ঘনীভূত বাষ্পকেই আমরা বলি 'মেঘ'। ১৩৬৮

একানড়ের ছুরি

এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

এক যে ছিল একানড়ে
সে থাকে তালগাছে চড়ে।

বাবির বয়স যখন সাড়ে তিন, তখন তার দুষ্টুমির চোটে কেউ আর পেরে উঠছিল না। বেশি রাগ হলে ঠাকুমা বলতেন, 'আয় ত রে একানড়ের ঠান্‌দি, বাবিকে ধরে নিয়ে যা।' বাবি লম্ফঝম্ফ করে বলত, 'একানড়ের ঠান্‌দিকে আমি ভেঙে গুঁড়িয়ে হেলিকপটারে চড়িয়ে রাঁচী পাঠিয়ে দেব।' রাঁচীতে বাবির জেঠু থাকেন। বাবি কখনো যায়নি; তাই কাউকে অনেক দূরে সরিয়ে দেবার দরকার হলে বাবি তাকে রাঁচী পাঠিয়ে দিত। ঠাকুমা তখন চুপিচুপি গোপালকে বলেন, 'যা ত গোপাল, পাঁউরুটি-কাটা ছুরিটা নিয়ে জানলার বাইরে থেকে ঘরের মধ্যে একটু একটু করে ঢোকা, আর শার্সি নেড়ে ঘটাঘট আওয়াজ কর। গোপাল একানড়ে সেজে বাইরে থেকে ছুরি ঠকঠক করলেই বাবি একেবারে ঠান্ডা।

এমনি করে দিন যাচ্ছিল। প্রায় রোজই দু-তিনবার করে একানড়ের ছুরি দেখা যায় আর বাবি সেই দেখে খানিকক্ষণের জন্যে দুষ্টুমি থামিয়ে লক্ষ্মী হয়ে থাকে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? সাইকেলসুদ্ধ সিঁড়ি দিয়ে নামবার চেষ্টা করা, দেওয়ালে পেন্সিল দিয়ে লেখা, গোপালকে ব্যাট দিয়ে পেটানো, যখন-তখন রসগোল্লা খাব বলে বায়না করা, দুপুরে ঘুমোতে না চাওয়া, এইরকম সব খারাপ খারাপ কাজে বাবির সারাদিন কাটত। একদিন বিকেলের দিকে বাবি যখন ছোট ভাই বিলির সঙ্গে মারামারি করছে, ঠাকুমা চেয়ারে বসে গোপালকে বকাবকি করছেন, এমন সময় শোঁ-শোঁ হুড়মুড়-দুড়দাড় করে ভীষণ ঝড় এসে সব দরজা-জানলা পটাপট করে বন্ধ হয়ে গেল। বাবি তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে গেল ঠাকুমার কাছে—'ঠাকুমা, ঠাকুমা! আমার আর বিলির মুখের মধ্যে কী ঢুকে গেল?'

'ওটা ধুলো ঢুকে গেছে, মানিক।'

'কী করে ধুলো এল?'

www.BanglaBook.org

'ঝড়ের সঙ্গে।'

বাবি এর আগে কখনো ঝড় দেখেনি। আরো ব্যস্ত হয়ে বললে, 'কী ঝড়? কী ঝড়? ঝড় কোথা থেকে এল?'

ঠাকুমা দেখলেন এই সুযোগ। বললেন, 'ওমা, তাও জানো না? তিনটে একানড়ে হুড়োহুড়ি করে মারামারি করতে করতে এসে সব দরজা-জানলায় ধাক্কা দিয়ে গেল। তাকেই বলে ঝড়।'

বাবি শুনে একটু গম্ভীর হয়ে রইল।

তার পরের দিন সকাল থেকেই বাবি বাঘ হয়ে গেছে। মা বলছেন, 'এসো বাবি, দাঁত মাজা হবে।' বাবি বললে, 'ঘেঁয়াও।' মা আবার বললেন, 'এসো, এসো, ও কি পাগলামি হচ্ছে!' বাবি 'হালুম হালুম' বলে হামাগুড়ি দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল, সেখানে লছমন রুটি টোস্ট করছিল—গিয়েই পায়ে এক কামড়।

পুজোর সময় বাবিরা পাটনায় দাদু-দিদুর কাছে বেড়াতে গেছে। দাদুর বাড়ির ছাদ থেকে চোখে পড়ে তিনটে পাশাপাশি তালগাছ; গাছগুলোর গায়ে আবার হাঁড়ি ঝোলানো। রোজ বিকেলে একটা লোক পায়ে দড়ি বেঁধে সেই তালগাছে চড়ে আর উঠতে উঠতে চেঁচায়—

'তাড় চড়্ হে
পর্দা কীজিয়ে।'

বাবি প্রথমদিন এই দেখেই রান্নাঘরে দিদুর কাছে দে ছুট। দিদু পায়েস করছিলেন। হেসে বললেন, 'কী হল?' বাবি হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, 'জানো দিদু, এক্ষুনি একানড়েকে দেখলাম, তালগাছে চড়ছিল।' দিদু মনে করলেন একানড়ে বুঝি বা কোনো জানোয়ারের নাম, বাবি ওরকম অনেক নাম বার করেছে—যেমন পিঁপড়ের নাম পিকিপোকা, বুড়ো আঙুলের নাম লবডংকা। তাই শুধু বললেন, 'দেখো, তোমাকে কামড়ায়নি ত?' বলেই আবার কড়াইয়ের দিকে ফিরলেন।

বাবির কিন্তু সেই থেকে মনের মধ্যে খচখচানি শুরু হয়েছে। এই যদি একানড়ে, তবে মুলোর মত দাঁত কই? কুলোর মত কান কই? ওটা ত একটা ময়লা কাপড়-পরা লোক। দেখতে অনেকটা লছমনের মত। বাবি ভাবল—তাহলে বোধহয় এটা লক্ষ্মী একানড়ে। যাই হোক, নিশ্চিন্ত হবার জন্যে সে দাদুর কাছে গেল।

'দাদু, একানড়েটা কী বলে চেঁচাচ্ছে?'

দাদু প্রথমটা বুঝতে না পেরে বললেন, 'কে চ্যাঁচাচ্ছে?'

বাবি হাত দেখিয়ে বললে, 'ওই ত একানড়ে, তালগাছে চড়ছে।' দাদু বুঝলেন এর মধ্যে একটা ব্যাপার আছে। তাই সবটা না ভেঙে বললেন, 'ও সবাইকে সাবধান হতে বলছে।'

'বাবিকে সাবধান হতে বলছে?'

'হাঁ বাবিকেও, নিশ্চয়। দুষ্টু ছেলেদের ত সবচেয়ে বেশি সাবধান হওয়া দরকার।'

এরপর যতদিন পাটনায় ছিল, বাবি খুব সাবধানে সাবধানে থাকত, সকলেই ওর এরকম পরিবর্তন দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল।

ছুটির পর সবাই কলকাতায় ফিরেছে। আবার একদিন বাবি বাঘ হয়ে সব জিনিসপত্র ভেঙে দিচ্ছে, কারো কথাই শুনছে না। তখন ঠাকুমা রেগে বললেন, 'আয় ত রে একানড়ে, বাবিকে ধরে নিয়ে যা।'

বাবি চট করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'একানড়ে ত পাটনায়।'

'কে বলেছে?'

'আমি দেখেছি। ওর দুটো হাত, দুটো পা আর পায়ে দড়ি বাঁধা।'

ঠাকুমা দেখলেন মুশকিলে পড়া গেল। তখন ভেবেচিন্তে বললেন, 'ওটা অন্য একানড়ে।'

'কোন্ অন্য?'

'পাটনার একানড়ে। আমি কলকাতার একানড়েকে ডাকছি, তোমায় ধরে নিয়ে যাবে। কই রে, গোপাল?'

বাবি মাটিতে পা ঠুকে বললে, 'আমি একানড়েকে ডাকছি তোমায় ধরে নিয়ে যাবে, গোপালকে ধরে নিয়ে যাবে, সব্বাইকে ধরে নিয়ে যাবে। আমি শুধু একলা থাকব, খাব-দাব, ঘুমোব।' বলতে বলতে যেই না ছুটে গিয়ে জানলাটা খুলেছে, দেখতে পেল গোপাল ছুরি হাতে দাঁত বার করে দাঁড়িয়ে হ্যা হ্যা করে হাসছে।

১৩৬৯

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইন্তাবিলের পুঁথি

শিবানী রায়চৌধুরী

আমার বন্ধু গোপাল। গোপালের ছোটবেলাকার বন্ধু হল ইন্তাবিল। আমি তাকে দেখিনি। কিন্তু তার কথা এত শুনেছি যে মনে মনে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলেছি। গোপালের লোহার খাটের মশারির চালে ইন্তাবিল বাস করত। সেই সুবাদে গোপালের সঙ্গে তার পরিচয়। ইন্তাবিল লম্বায় ছিল এক ফুট আধ ইঞ্চি। আর তার শরীরটা ছিল শোলার মত হালকা। ডানা ছিল না। কিন্তু হাত দুটো শূন্যে নাড়লেই উড়তে পারত। তার পায়ের তলায় একজোড়া চাকা লাগানো ছিল। তাই সে মাটিতে পা ঘষলেই স্কেটিং করে চলতে পারত। তার মুখে একটা লম্বা-মতন স্ট্র লাগানো ছিল। সেই স্ট্র দিয়ে সে শুধু সবুজ সিরাপ আর কোকো খেত। ইন্তাবিলের গায়ের রংটা ছিল হলুদ আর মুখটা ছিল লাল রঙের। তবে সময়ে সময়ে তার গায়ের রং পালটে যেত। যেমন শীতকালে কুয়াশা-রং হত, বসন্তকালে সোনালী ধরত। এতে ওর রাস্তা দিয়ে চলাফেরার সময় সুবিধা হত। হাওয়ায় মিশে যেতে পারত। এই ত হল ওর চেহারা। ওর সম্পত্তির মধ্যে ছিল একটা পাখির পালক আর একটা বিরাট টুপি। টুপির গায়ে হিজিবিজি ভাষায় কীসব লেখা ছিল। ইন্তাবিল বলত ওর ঠাকুরদাদার সেজো জ্যেঠামশাই ছিলেন পেঙ্গুইনের বংশধর। তিনি ওই টুপিটা ওকে দিয়ে গেছেন। টুপির গায়ে উত্তরমেরু যাবার রাস্তা বাতলে দেওয়া আছে। বোধহয় ইন্তাবিলের শখ ছিল শেষ বয়সে উত্তরমেরুতে বান-প্রস্থে যাবে।

ইন্তাবিল যে সারাদিন কী করত এ খবর কেউ রাখত না। এমন কি গোপালও না। সে ত আজকালকার ছেলে। ক্রিকেট খেলে। লাফিয়ে লাফিয়ে চলতি ট্রামে ওঠে। ইন্তাবিলের মত পাগলা লোকের খোঁজ রাখার তার সময় হয় না। আমার সঙ্গে যদিও ইন্তাবিলের আলাপ হয়নি, তবুও আমি তার খোঁজখবর করতাম। ইন্তাবিলের পিসতুতো ভাই চট্‌পটি বলত, তার মনে হয় ফড়িয়াপুকুরের মোড়ে ইন্তাবিল জুতো সারাই করে। কিন্তু এ বিষয়ে আমি চট্‌পটির সাথে একমত হতে পারিনি। চট্‌পটি লোক সুবিধের বলে মনে হয় না। নইলে কেউ কি আপন মামার ছেলেকে জুতো সেলাইয়ের মত কাজে লাগায়! যাই হোক, ঝগড়াঝাঁটি আমি পছন্দ করিনে। সেবার একজনের মুখে শুনেছিলাম ইন্তাবিল প্রজাপতিদের ডানা রং করার কাজ করে। এ কাজটা বেশ ভাল। তবে ইন্তাবিলের মাথায় গোলমাল। সে কি এত কঠিন কাজ পারে! তাই আমি বলি কি—ইন্তাবিল পুঁথি লেখে। পাখির পালক সবুজ সিরাপে ডুবিয়ে হলুদ কলাপাতায় সেই হিজিবিজি ভাষায় লেখে (ভূর্জপত্র ত আজকাল পাওয়া যায় না)! সে ভাষাটা খুব খটমটে। সেটা পড়তে গিয়ে আমার ত একটা দাঁতই ভেঙেছে। চশমার পাওয়ার বেড়েছে। একবার প্লাস ওয়ান্, একবার মাইনাস ওয়ান্। এখন জিরো। এত কষ্টেও আমি সবায়ের মুখ চেয়ে পুঁথিটা অনুবাদ করেছি।

এদের জ্বালায় একটুও শান্তিতে থাকার উপায় নেই। দুপুর রোদ্দুরে ভাজাভাজা হয়ে বাড়ি ফিরেছি। গলার বেগুনী রংটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলার রং-চটা জায়গাটায় একটু কায়দা করে গোলাপী রং লাগাচ্ছি, এমন সময় ঝিঙেফুল কানের কাছে প্যানপ্যান করতে লাগল—একটা গল্প বলো না ইন্তাবিল। আমি বললাম—দাঁড়া, চুপ কর। গলার রংটা ঠিক হচ্ছে না কিছুতেই। তাও শোনে না।

একঘেয়ে নাকি-নাকি মেয়েলি সুরে বলে চলল—দাও না একটা গল্প বলে। ইন্তাবিল, তোমার মত গল্প কেউ লিখতে পারে না। আমি বললাম—কাজের সময় বিরক্ত কোরো না। তবুও আরও মিঠে গলায় বলতে শুরু করল—পরশু আমাদের 'ঝাঁড়-ফুঁক' ক্লাবে সাহিত্যসভা। তুমি একটা গল্প বলে না দিলে কী পড়ব ইন্তাবিল? আমাদের সাহিত্যসভায় তুমি যাবে ত? আমি রেগে গনগন করে বলে উঠলাম—সে দেখা যাবে, এখন কথা দিতে পারছি না। আমার সেদিন অনেক কাজ। ব্যাঙের ছাতার জন্মদিন আছে। আবার হুক্কাহুয়ার কাশি হয়েছে, তাও দেখতে যেতে হবে। দেখো আমাকে বিরক্ত কোরো না। আমি একটুও সময় পাচ্ছি না। তোমার মত ত অমাবস্যায় দখিন হাওয়া লাগিয়ে কাব্য লিখলে চলবে না। দেশের উন্নতি করতে হবে। তোমার আর কী? চাঁদের দিকে মাথা তুলে তাকাও, আর কবিতার চাষ করো। চাঁদ যদি না থাকে ত অমাবস্যার রাত্তিরে নারকেল গাছে হ্যারিকেন বেঁধে কবিতা লেখো। আমার ওসব ন্যাকামি সহ্য হয় না। আমি বাপু প্র্যাকটিক্যাল লোক। কবিতার চাষ না করে তামাকপাতার চাষ পছন্দ করি। দেখ, ফের বলছি ক্যানক্যান করিসনে। কিচ্ছু ফল হবে না বলে দিলাম। ঝিঙে-ফুল ত আমার কাছে ধমক খেয়ে প্যাঁচামুখে ফ্যাঁচফ্যাঁচ করতে করতে চলে গেল। আমি বললাম—দেখ ওসব নাকিকান্না আমার এখানে চলবে না। আমার এখন অনেক কাজ। এই বলে আমি একটা গুরুতর বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে বসে গেলাম। প্রবন্ধটা খুব দরকারী জনহিতকর বিষয়ে লেখা হচ্ছিল। বিষয়টা ছিল—'ছেঁড়া শালপাতার দুর্দশা'। লেখাটাকে কিন্তু প্রবন্ধ বললে ভুল হবে। অনেকটা আত্মকাহিনীর মত করে লিখছিলাম। চট্‌পটি এসে জ্বালাতন করতে লাগল (ওটাই ওর একমাত্র গুণ)—পড়ে শোনাও না; যতটুকু লিখেছ, ততটুকুই শোনাও। এক লাইনই শোনাও। নইলে খাব না, ঘুমোব না, চানই করব

www.BanglaBook.org

না। এমন কি তোমার সিগারেটও কিনে আনব না।

অগত্যা আমার নেহাত অনিচ্ছা সত্ত্বেও লেখাটা চট্‌পটিকে দেখাতে হল। আমার চট্‌পটির মত বাজে লোককে লেখাটা শোনাবার একটুও ইচ্ছে ছিল না। ও লেখার কী বোঝে? লিখেছে কখনো? দৌড়ই ত ধোপার হিসেব রাখা আর বেগুনির দাম বাড়ল কি কমল তাই লেখা পর্যন্ত। পারবে আমার মত কঠিন কঠিন বিষয়ে রচনা লিখতে? একটুও পারবে না। ও খালি পারে নিন্দে করতে। বিশ্বনিন্দুক একটা। বলবে—ইন্তা-বিল, তোমার লেখার সমালোচনা করছি। এর দোষ থাকা সত্ত্বেও সেই চট্‌পটিকেই আমার লেখাটা পড়ে শোনাতে হল। কারণ তত্ত্বকথা ত আজকাল কেউ গায়ে পড়ে শুনতে চায় না। কি বলছিলাম যেন? ও—

ছেঁড়া শালপাতার দুর্দশা

কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে আলুকাবলিওয়ালার ঝুড়ি থেকে ফসকে গিয়ে ছেঁড়া শালপাতাটা ফড়ফড় করে উড়ে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় একটা গোলগাল পেটুক গোছের ছেলে নগদ দু-আনার আলুকাবলি খেয়ে একটা আস্ত শালপাতাকে চেটে চেটে, তারপর পাতাটাকে পা দিয়ে আকাশে ছুঁড়ে খাইখাই মুখ করে আইসক্রীমওয়ালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ফ্যালফ্যাল করে আইসক্রীমের বাক্‌সোটা গিলে খেতে লাগল। এদিকে আস্ত শালপাতাটা ছেঁড়া শালপাতাটাকে এক ধাক্কা মেরে চলে গেল।

ছেঁড়া শালপাতা গজগজ করে উঠল—দেখেশুনে পথ চলতে পার না। দিলে ত আমার রেশমী মেজাজটাকে বিগড়ে। এখন মেজাজ কী করে সারাই বলো ত? আস্ত শালপাতা বলল—এতে আর অত রাগের কী আছে? চুনকাম করলেই মেজাজ ঠিক হয়ে যাবে। দেব নাকি মিস্ত্রি ডেকে?

না, না, অত উপকারে কাজ নেই আমার, যে কাজে যাচ্ছ যাও—ছেঁড়া শালপাতা কটকটিয়ে উঠল—যাচ্ছিলাম বেলোয়ারী চালে সিনেমা দেখতে। যতসব অনাসৃষ্টি কাণ্ড, রাস্তায় বেরুতে না বেরুতেই এক ধাক্কা। আস্ত সোয়া ছ-মিনিট সময় নষ্ট হয়ে গেল। এত দেরিতে কি আর সিনেমার টিকিট পাওয়া যাবে? কী আর করি!

বলে ছেঁড়া শালপাতা কাঁচের আয়না লাগানো ফুলের দোকানটায় ঢুকে গোলাপ ফুলের পাশে দাঁড়াল। তারপর আয়নাটায় নিজের ছবি দেখার চেষ্টা করতে লাগল। দোকানে রং-চং করা একটা মেয়ে এসে খুব খুশী হয়ে সেই গোলাপগুলো কিনতে চাইল। দোকানদার ত অ্যাক্কেবারে গদ্‌গদ হয়ে ফুল-গুলো দিতে গিয়ে হঠাৎ ছেঁড়া শালপাতাটাকে দেখে খিঁচ-খিঁচ করে উঠল—এ শালপাতাটা এখানে এল কী করে?—বলেই সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

তারপর শালপাতাটা উড়তে উড়তে শ্যামবাজারে একটা বাড়ির উঠোনে গিয়ে পড়ল। বাড়ির উঠোনে এক গোমরামুখো পিসি গঙ্গাজল ছিটোচ্ছিলেন। তাঁর পায়ে শালপাতাটা লাগলে তিনি তিড়বিড় করে উঠলেন—দিল আমার সক্কালবেলার পুজোটা মাটি করে।—বলেই তিনি ঝাঁটা নিয়ে শালপাতার দিকে এগিয়ে এলেন।

তারপর শালপাতাটা ধুলোয় লুটোপুটি খেয়ে ঘাপটি মেরে পড়ে রইল। বাগানের উড়ে মালী তাকে দেখতে পেয় বাঁশের বেড়ার ফাঁকে রেখে দিল। আর শালপাতাটা ঝিরঝিরে হাওয়ায় ফুরফুর করে দোল খেতে লাগল। তার চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়তে লাগল। আর তার মনে পড়তে লাগল : অনেক অনেক দূরে কলকাতা ছাড়িয়ে ভুবনডাঙার মাঠের ওপারে শাল-বন। সেই শালবনে বড় বড় আকাশছোঁয়া গাছের মধ্যে দিয়ে শেষরাতে দখিন হাওয়া বয়ে যায়। সেই হাওয়ায় শালগাছের পাতাগুলো শিরশিরিয়ে ওঠে।

অনেক শালপাতা গলাগলি হয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়। তাদের মিষ্টি গন্ধে মন কেমন করে। হঠাৎ ছেঁড়া শাল-পাতার মনটা টনটন করে উঠল। সে শুনতে পেল একটা হাওয়ার সুর তার কানে কানে বলল : এই যে, এই, আমার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলো।

কাহিনীটা ত শেষ হল। তাকিয়ে দেখি চট্‌পটি লেখাটা

www.BanglaBook.org

শোনা ত দূরে থাকুক, একমনে সরু সরু কঞ্চি ভাঙা ভাঙা দাঁত দিয়ে চিবোচ্ছে। আমি থামতেই বলল—বাঃ! বেশ ত হচ্ছিল। থামলে কেন? চালিয়ে যাও। আমি বললাম—গল্পটা শেষ হল। কেমন লাগল তোমার, চট্‌পটি?

চট্‌পটি ভেঙচি কেটে বলল—রাজামশাই শেষকালে যুদ্ধে হেরে গেলেন! হায়! হায়!

আমি বললাম—তোমার মাথা চট্‌পটি, তোমার মাথা! এ গল্পে যে কোন রাজাই ছিল না—যুদ্ধ আবার থাকবে কোথা থেকে বলো!

চট্‌পটি বলল—ওই হল আর কী? গল্প মানেই রাজা-রানী, মারামারি, কাটাকাটি, ফাটাফাটি, ভাব-ঝগড়া এইসব।

আমি বললাম—চট্‌পটি, এটা একটা নতুন ধরনের লেখা ছিল। একটা শালপাতার করুণ কাহিনী। তোমর চোখ চকচক করত।

চট্‌পটি কঞ্চি চিবোতে চিবোতে উত্তর দিল—হুঁ! শালপাতার দুর্দশায় আমার কান্না পাবে কেন? বরং তোমার দুর্দশায় আমার হাসি পেত। তারপর আবার বলল—ইন্তাবিল, তুমি পদ্য লিখতে পার না, রবি ঠাকুরের মত পদ্য?

আমি বললাম—না, পারি না। পদ্য-টদ্য আমার আসে না। আমি খালি গুরুপাক উপকারী প্রবন্ধ লিখতে পারি। সে সব তুমি বুঝবে না। এই ত এতক্ষণ ধরে পড়লাম একটা। মগজে কিছু ঢুকল?

চট্‌পটি তোষামোদি সুরে বলল—ইন্তাবিল, তুমি ছবি আঁকতে পার না? অবন ঠাকুরের মত রাজারানীর ছবি?

আমি বললাম—না, ইন্তাবিল কিচ্ছু পারে না।

তখন চট্‌পটি কেঁদেই ফেলল—ইন্তাবিল! তুমি রাগ করেছ? তুমি রাগ করলে কে আমাদের গল্প শোনাবে? ছবি দেখাবে? রাগ করো না লক্ষ্মীটি, তোমাকে একটা নীল ফড়িং দেব। তুমি গল্প লেখো ইন্তাবিল, আমরা তোমার কথা খুব মন দিয়ে শুনবো। ১৩৬৮

অদ্ভুত যতো আউট

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্রিকেট মাঠে প্রায়ই এমন সব ঘটনা ঘটে যার তুলনা মেলা ভার। দারুণ মজার সেই সব ঘটনার কথা তাই কেউ ভোলেন না। ক্রিকেট-রসিকদের মনে সেই সব ঘটনা চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকে। কেউ কোনোদিন তাই ভুলতে পারেন না ডেনিস কম্পটনের সেই ফুটবলের মত কিক্ করে বিজয় মার্চেন্টকে আউট করার কথা। কিংবা তার নিজেরই সেই অদ্ভুতভাবে আউট হয়ে যাবার ঘটনার কথা। অথবা ট্রেভর বেইলির বোকা বনে আউট হয়ে যাওয়া। শুধুমাত্র প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের অসুবিধে সৃষ্টি করে ফেলার জন্যে ইংলন্ডের অধিনায়ক লেন হাটনের আউট হবার কথা। কিংবা কেনিয়ন সাহেবের মাথার টুপি খুলে উইকেটের ওপর পড়ে যাওয়ায় আউট হয়ে যাবার মত মজার ঘটনার কথা কেউ কোনোদিনই ভোলেন না।

মজার খেলা ক্রিকেটের কয়েকটি দারুণ মজার ঘটনার কথাই এখন আমরা বলব। বেশ কয়েক বছর আগের কথা। ভারত সেবার গেছে ইংলন্ড সফরে। ওভাল টেস্টে সেদিন তখন ব্যাটিং করছিলেন ভারতের নামকরা ব্যাটসম্যান বিজয় মার্চেন্ট। খুব সুন্দর ভাবে খেলছিলেন তিনি। তাঁর দর্শনীয় মারের চমকে মাঠের পরিবেশই গিয়েছিল পাল্টে। রান উঠছিল খুব তাড়াতাড়ি। দেখতে দেখতে একসময়ে সেঞ্চুরিও করে ফেললেন মার্চেন্ট। ইংলন্ডের খেলোয়াড়রা হাজার চেষ্টা করেও পারছিলেন না তাঁকে আউট করতে।

ইংলন্ডের নামকরা ব্যাটস্‌ম্যান ডেনিস কম্পটন তখন ফিল্ডিং করছিলেন শর্ট লেগে। শুধু মাত্র ক্রিকেট নয়, ফুটবল খেলাতেও কম্পটনের তখন খুব নাম। ফুটবল খেলাতেও তিনি করেছেন নিজেদের জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব। একসময়ে এই শহর কলকাতাতেই কম্পটন কাটিয়ে গেছেন বেশ কয়েক বছর। সেই সময়ে তাঁকে যাঁরা ময়দানে ফুটবল আর ইডেনে ক্রিকেট খেলতে দেখেছেন, তাঁদের অনেকেই আজও ভেবে পান না যে ফুটবল, না ক্রিকেট, কোন্‌টা কম্পটন ভালো খেলতেন।

সেই কম্পটন তখন শর্ট লেগে ফিল্ডিং করছিলেন আর ভাবছিলেন যে কি করে মার্চেন্টকে আউট করা যায়। অথচ মার্চেন্টকে তাড়াতাড়ি আউট করতে না পারলে ইংলন্ডের ভীষণ বিপদ।

১২৮ রান করার পর একটা বল লেগের দিকে ঘুরিয়ে মেরে রান নিতে শুরু করলেন মার্চেন্ট। কম্পটন ফিল্ডিং করছিলেন শর্ট লেগে। তিনি ছুটলেন বলটার পেছনে। মার্চেন্ট তখন একটা রান নিতে শুরু করেছেন। বলের কাছে পৌঁছে কম্পটন বুঝলেন তা হাতে তুলে সেই বল উইকেটে ছুঁড়ে মেরে মার্চেন্টকে কিছুতেই আউট করা যাবে না। তখনি কম্পটনের মাথায় খেলে গেল একটা সাংঘাতিক বুদ্ধি। কম্পটন করলেন কি—উইকেট লক্ষ করে ফুটবলের মত সেই ক্রিকেট বলটায় করলেন এক কিক্। মুহূর্তেই মধ্যে বলটা গিয়ে ভেঙে দিল উইকেট। হতভম্ব মার্চেন্ট বোকা বনে গিয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলেন উইকেটের দিকে। তারপর প্রশংসার চোখে কম্পটনের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেলেন মাঠ ছেড়ে।

প্রথমে ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারেনি। তারপর উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল সারা মাঠ। হাততালি আর থামে না। এমন অভিনব রান আউট আর যে কেউ কখনো দেখেনি। ক্রিকেট ইতিহাসের এ এক নতুন নজীর।

মার্চেন্টকে যেমন বোকা বানিয়ে আউট করে দিয়েছিলেন কম্পটন, তেমনি নিজেও একবার অনেকটা ওইরকমভাবেই আউট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে গিয়েছিলেন।

সেদিন লর্ডস মাঠে সারের বিরুদ্ধে খেলছিলেন কম্পটন। খুব সুন্দরভাবে ব্যাটিং করছিলেন তিনি। মারের পর মার, রানের পর রান—সারা মাঠে ফিলডারদের ছুটোছুটির অন্ত নেই। উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে উইকেটরক্ষক আর্থার ম্যাকেন্টায়ার সুযোগ খুঁজছিলেন কম্পটনকে আউট করার। ব্যাকওয়ার্ড শর্ট লেগে বেশ ভয়ে ভয়েই দাঁড়িয়েছিলেন এরিক বেডসার। কম্পটন যেভাবে লেগের দিকে ঘুরিয়ে বল মারছেন, তাতে যে কোনো মুহূর্তেই বেডসার বলের আঘাতে আহত হয়ে পড়তে পারেন!

ঠিক তখনি একটা লাফানো বল পেয়ে কম্পটন কষে হুক করলেন। ভীষণ জোরে মেরেছেন কম্পটন—নির্ঘাত বাউন্ডারি। বলটা কিন্তু ব্যাকওয়ার্ড শর্ট লেগে এরিক বেডসারের পায়ের বুটে লেগে ছিটকে গিয়ে পড়ল উইকেটরক্ষক আর্থার ম্যাকেন্টায়ারের হাতের গ্লাভসের মধ্যে। প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই 'হাউজ দ্যাট' বলে চীৎকার করে উঠলেন আর্থার। আম্পায়াররা আউটের নির্দেশ দিতে দেরি করলেন না এক মুহূর্তও। কম্পটন তখন থ! ঠিক এইভাবে যে কট আউট হবেন তিনি তা বোধহয় কোনদিন ভাবতেও পারেননি।

'আউট অফ্ হিজ গ্রাউন্ড' নিয়ম অনুসারে ইংলন্ডের ট্রেভর বেইলী একবার আউট হয়ে গিয়েছিলেন ভারি অদ্ভুতভাবে। এ সেই ১৯৫৩ সালের কথা। সেবার লীড্স্ মাঠে টেস্ট খেলা হচ্ছিল অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংলন্ডের। একটা বল মারার পর রান না নিয়ে বেইলী দাঁড়িয়ে দেখছিলেন বলটা কোথায় যায়। পপিং ক্রীজের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হবে, বেইলীর ব্যাটটা ছিল ক্রীজের প্রায় এক ফুটের মধ্যে। কিন্তু বলটা দেখতে বেইলী এতই ব্যস্ত ছিলেন যে ক্রীজের মধ্যে তাঁর ব্যাটটা যে মাটি ছুঁয়ে নেই সেদিকে এতটুকুও লক্ষ ছিল না তাঁর। ব্যাপারটা কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষকের নজর এড়ায়নি। ফলে বলটা হাতে পেয়েই তিনি উইকেট ভেঙে দিলেন। আর বেইলীও অসহায়ের মত আউট হয়ে গেলেন—ক্রিকেট খেলার আইন-কানুনের ৩২ নম্বর আইন 'আউট অফ্ হিজ গ্রাউন্ড' নিয়ম অনুসারে।

ক্রিকেট খেলার আইন-কানুনের ৪০ নম্বর নিয়মটি হল অসুবিধে সৃষ্টি করার জন্যে আউট, অর্থাৎ 'অবস্ট্রাক্টিং দ্য ফিল্ড'। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় আজ পর্যন্ত এই নিয়ম অনুসারে একজন খেলোয়াড়ই আউট হয়েছেন। আর তিনিই হলেন ইংলন্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটস্ম্যান লেন হাটন।

ঘটনাটা ঘটে ১৯৫১ সালে ওভাল মাঠে। ইংলন্ডের সঙ্গে সাউথ আফ্রিকার পঞ্চম টেস্ট ম্যাচ খেলার সময়। একটা বল হাটন সাহেবের ব্যাটে লেগে উঠে গেল মাথার ওপরে—ঠিক উইকেটের ওপরে। পড়তে দিলে বলটা নির্ঘাত ওই উইকেটের ওপরেই পড়বে। তাই হাটন গেলেন তাঁর উইকেট বাঁচাতে। ওদিকে আবার সাউথ অ্যাফ্রিকার এনডেন ছুটে এলেন ক্যাচটা লোফার জন্যে। ওদিকে হাটনও তাঁর উইকেট সামলাতে ব্যস্ত। ফলে তিনি এনডেচের ক্যাচ লোফায় বাধার সৃষ্টি করলেন। তাই ক্যাচ লোফা হল না। ক্যাচটা লুফতে না পেরে এনডেন আর সাউথ অ্যাফ্রিকার আরো কয়েকজন খেলোয়াড় অসুবিধা সৃষ্টির জন্য আউট নিয়ম অনুসারে আবেদন জানালেন। আম্পায়ারকেও তাই বাধ্য হয়েই আউটের নির্দেশ দিতে হল।

খেলতে গিয়ে উইকেট ভেঙে ফেললে ব্যাটস্ম্যান 'হিট উইকেট' নিয়ম অনুসারে আউট হয়ে যান। উইকেট যেভাবেই ভাঙুক না কেন, ব্যাটস্ম্যান 'হিট উইকেট' হবেন—তা সে ব্যাটস্ম্যানের শরীরে লেগে কিংবা অন্য যে কোনোভাবেই হোক-না-কেন।

ইংলন্ডের ডন কেনিয়ন একবার এইভাবে আউট হয়ে গিয়েছিলেন। এ সেই ১৯৪৯ সালের কথা। নটিংহামশায়ারের সঙ্গে খেলা হচ্ছিল উরচেস্টার দলের। উরচেস্টার দলের কেনিয়ন সাহেব ভালো ব্যাটস্ম্যান। আর সেদিন ব্যাটিংও করছিলেন খুব সুন্দরভাবে। এইসময় লেগ স্টাম্পের বাইরে একটা বল পেয়ে কষে হুক্ করলেন ডন কেনিয়ন। খুব জোরে মেরেছিলেন কেনিয়ন। মারার পর সমস্ত শরীরটা তাঁর এক পাক ঘুরে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথা থেকে খুলে পড়ে গেল মাথার কাউন্টি ক্যাপটা। আর টুপিটা গিয়ে পড়ল একেবারে উইকেটের ওপরে। ফলে স্টাম্পের মাথা থেকে বল দুটো ছিটকে পড়ল মাটির ওপরে। ভেঙে গেল উইকেট। ফলে আউট হয়ে গেলেন উরচেস্টার দলের নামকরা ব্যাটস্ম্যান ডন কেনিয়ন। আউই হয়ে গেলেন বড় বিশ্রী ভাবে অসহায়ের মত হিট উইকেট হয়ে।

এরকম সব দারুণ মজার আর ভারি অদ্ভুতভাবে আউট হয়ে যাবার ঘটনা ক্রিকেট মাঠে প্রায়ই না ঘটলেও মাঝে মাঝে ঘটে। তাই সেই সব ঘটনার কথা আমরা কেউই ভুলে যাই না। পরিষ্কার মনে করে রাখি। আর সময়-অসময়ে খেলার মাঠে, গল্পের আসরে কিংবা জমাটি আড্ডায় এইসব অদ্ভুত যত আউটের ঘটনার কথা বলে আনন্দ-হাসি-গানে ভরিয়ে তুলি সকলের মন। ক্রীড়ারসিকদের কাছে এইসব ঘটনার দাম যে সত্যিই অনেক...

১৩৭৬

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জবরখাকি

সত্যজিৎ রায়

বিল্লিগি আর শিঁথ্‌লে যত টোবে
গালুমাগিরি করছে ভেউ-এর পরে
মিম্‌সে মেরে যাচ্ছে বোরোগোবে
মোমতারা সব গড়বড়িয়ে মরে।

'যাসনি বাছা জবরখাকির কাছে
রামখিঁচুনি রাবণকামড় তার,
যাসনি যেথা জুব্‌জু বসে গাছে
বাঁদর-ছ্যাঁচা মুখটি ক'রে ভার।'

তাও সে নিয়ে ভুরপি তলোয়ার
খুঁজতে গেল মাংসুমি দুশমনে,
অনেক ঘুরে সন্ধে যখন পার
থামল গিয়ে টামটা গাছের বনে।

এমন সময় দেখতে পেল চেয়ে
ঘুলচি বনে চুল্লিচোখের ভাঁটা,
জবরখাকি আসছে বুঝি ধেয়ে
হিলফিলিয়ে মস্ত করে হাঁ-টা।

সন্‌ সন্‌ সন্‌ চলল তরবারি
সানিক্‌ সিনিক্‌। জবরখাকি শেষ।
স্কন্ধে নিয়ে মুণ্ডখানা তারই
গালুম্ফিয়ে যায় সে আপন দেশ।

'জবরখাকি তোর হতেতেই গেল?
আয়রে বিমি বোস্‌ না কোলে এসে,
ফরসা দিনে আয় রে আমার কেলো',
বললে বাপে চট্‌খিলিয়ে হেসে।

বিল্লিগি আর শিঁথ্‌লে যত টোবে
গালুমাগিরি করছে ভেউ-এর পরে
মিম্‌সে মেরে যাচ্ছে বোরোগোবে
মোমতারা সব গড়বড়িয়ে মরে॥

—লুইস ক্যারলের 'জ্যাবারওয়াকি' অবলম্বনে

১৩৬৮

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিশন

ভবানীপ্রসাদ দে

রজনী দত্ত রোড আর ফণীন্দ্রচন্দ্র এভিনিউয়ের মোড়ের মাথায় ছ'তলা ফ্ল্যাট বাড়িটার একেবারে উপরের তলায় উঠেই কলকাতা শহরের যত তালা-ভাঙিয়েদের সর্দার ছোটেলাল যা দেখল, তাতে তার মাথার রক্ত গরম হয়ে উঠল। উপর তলায় দুটো ফ্ল্যাট, দুটোই বন্ধ। ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা ক'দিন হল দরজায় তালা ঝুলিয়ে কলকাতার বাইরে গিয়েছেন। আর সেইজন্য ঠিক ভরদুপুরে সে তালাভাঙার যন্ত্রপাতি নিয়ে উঠে এসেছে। সে কী দেখল, তাই বলি এখন।

একুশ-বাইশ বছরের একটি ছেলে, মুখে তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে নোংরা জামাকাপড়, চেহারাটা ছিঁচকে চোরের মতই—সে একটা ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার সামনে বসে দরজার তালাটার মধ্যে কী একটা ঢুকিয়ে সেটাকে খোলার চেষ্টা করছে আর মাঝে মাঝে দেখছে কেউ এসে পড়ল কিনা। ছোটেলাল বুঝল ছেলেটা পেশায় তারই স্বজাতীয়। তাকে দেখেই ছেলেটার হাত গেল থেমে, সে থতমত খেয়ে তাকিয়ে রইল।

এসব ছিঁচকে তালা-ভাঙিয়েরা অনেক চেষ্টা করেও তালা খুলতে পারে না, সেগুলোকে খুঁচিয়ে-খাঁচিয়ে একটা বিতি-কিচ্ছিরি অবস্থা করে রেখে ফিরে যায়। তালা কোম্পানীর লোক বড়াই করে বিজ্ঞাপন দেয়—আমাদের তালা বার্গলার-প্রুফ। এসব বিজ্ঞাপন দেখে ছোটেলালের হাসি পায়, কারণ তার হাতে যে-কোনো তালা অনায়াসে খুলে যায়। ছোটেলালের ছাত্ররা পুলিশের হাতে ধরা পড়লে সে রাগ করে না, তার রাগ হয় তারা তালা ভাঙতে না পেরে শুধু হাতে ফিরে এলে।

ছেলেটা ছোটেলালের ছাত্রদের কেউ নয়, এমন কি তার চেনা-জানা তালা-ভাঙিয়েদেরও কেউ নয়, তবু সে ছোটেলালকে চেনে বলে মনে হল। সে তার তালা ভাঙার যন্ত্রপাতি মাটিতে নামিয়ে রেখে দু'হাত কচলিয়ে ছোটেলালকে বলল, 'মাস্টার, তুমি আসবে জানলে আমি আর এদিকে আসতাম না। বড় ভুল হয়ে গিয়েছে।'

ছোটেলাল খুশি না হয়ে পারল না। ছেলেটার পিঠ চাপড়ে বলল, 'আদবকায়দা ভালোই শিখেছিস, কিন্তু কাজের কায়দা শিখিসনি। এতক্ষণ ধরে করছিলি কী?'

তালাটার মধ্যে চাবিকাঠির মত কী একটা ঢুকিয়ে অল্প চাড় দিল সে, অমনি তালাটা টুক করে খুলে গেল। আনন্দে ছোটেলালের চোখদুটো চক্‌চক্ করে উঠল। কোথায় কোন্ ঘুলঘুলির মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটা পায়রা ডেকে উঠল, 'বক্ বক্ বকুম্!'

ছোটেলাল আর ছেলেটা ফ্ল্যাটের ভিতর ঢুকে পড়ল। দরজা বন্ধ করে ছোটেলাল ছেলেটাকে বলল, 'এখন হঠাৎ যদি কেউ এসে দরজার কড়া নাড়ে, তুই মিনিটখানেক দেরি করে দরজা খুলবি। তারপর চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিরাট দুটো হাঁই তুলবি। লোকে

যেন বোঝে তুই এবাড়ির চাকর, দুপুরবেলা ঘুমুচ্ছিলি। বলবি, বাবুরা কলকাতার বাইরে গিয়েছেন, ফিরতে সপ্তাখানেক দেরি হবে।'

'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু...মানে...'

ছোটেলাল হেসে ফেলল। বলল, 'বুঝেছি, বখরার ব্যাপার ত? ঠিক আছে, তুই সিকি ভাগ বখরা পাবি। এখন দাঁড়া, কাজটা আগে সারা করি।'

সে ভিতরের আরেকটা দরজার তালা ভেঙে ফ্ল্যাটের অন্দর-মহলে ঢুকে গেল। একটু পরেই সেখান থেকে খুটখাট আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। ছেলেটা একবার গিয়ে দেখে এল ছোটেলাল একটা স্টীলের আলমারির তালা ভাঙতে ব্যস্ত। সে ফিরে এল মিনিট পনেরো বাদে, সঙ্গে আলমারি ভেঙে পাওয়া গহনাপত্র, টাকাপয়সা, ক্যামেরা, টেপ রেকর্ডার—এইসব। জিনিসগুলো থলের ভর্তি করতে করতে সে বলল, 'আজ একদম সাকসেসফুল মিশন।'

ছেলেটা বলল, 'মিশনের কথা যখন বললেই, তখন শোন, সেবার মুন্সীপুরের ক্যাথলিক মিশনে কী হয়েছিল। নিশুতি রাতে পাদ্রী সাহেবের ঘরের আলমারি খুলে পেতলের বাতিদান বের করেছি গোটা সাতেক। হঠাৎ কী করে একটা মাটিতে পড়ে গেল ঝন্‌ঝন্ করে। বুড়ো পাদ্রী ঘুমুচ্ছিল। আওয়াজ শুনে

www.BanglaBook.org

তার ঘুম ভেঙে গেল। তড়াক করে উঠে এসে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে ফেলল, তারপর একগাছা বেত দিয়ে বাকি রাতটা আমাকে আপাদমস্তক ঠেঙাল। শুনেছি বিলেতে না কোথায় কোন চোর এক পাদ্রী সাহেবের রুপোর বাতিদান চুরি করে পালাচ্ছিল। পুলিশ তাকে পাদ্রী সাহেবের কাছে ধরে নিয়ে এল। তখন তিনি বললেন, ও চুরি করেনি। আমি ওকে বাতিদানগুলো দিয়েছি। —তা মুন্সীপুরের পাদ্রী সাহেব ওসবের ধারেকাছেই গেল না। উল্টে ভোরবেলা পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দিল।'

ছোটেলাল বিরক্ত হয়ে বলল, 'এ মিশন সে মিশন নয়। লালবাজারের টিকটিকি পুলিশরা জাল ফেলে আমাদের পাকড়াও করে নিয়ে গিয়ে ওপরওয়ালা সাহেবদের কাছে লম্বা স্যালুট ঠুকে বলে, 'স্যার, মিশন সাকসেসফুল।' আমার কাজ হাসিল হলে ওদের দেখাদেখি আমিও বলি মিশন সাকসেসফুল।'

দেওয়ালের ওপর একটা দেওয়াল-ঘড়ি লাগানো, ছোট অথচ সুন্দর। সেটা দেখলেই লোভ লাগে। ক'দিন দম দেওয়া হয়নি বলে কাঁটাগুলো থেমে গিয়েছে। ছেলেটা বলল, 'মাস্টার, ঘড়িটা পাড়ো না ! দারুণ জিনিস।'

ছোটেলাল বলল, 'দেখ, দেওয়াল-ঘড়ি চুরি করে আজকাল মজুরিতে পোষায় না। তবে তুই যখন আবদার ধরেছিস, তখন সেটা রাখতেই হয়।'

ঘড়িটা যেখানে ছিল, ঠিক তার নিচেই দেওয়াল ঘেঁষে বইয়ের একটা আলমারি বসানো। মাস্টার সেটার উপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘড়িটাকে পাড়বার জন্য দুহাত উপর দিকে তুলেছে, এমন সময় সেই ছেলেটা তার জামার তলা থেকে একটা পিস্তল বের করে সেটা ছোটেলালের দিকে তাগ্ করে বলল, 'তুমি যেমন হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছ, ঠিক তেমনটি দাঁড়িয়ে থাক। নড়াচড়া করলেই গুলি করব।'

তীব্র একটা বাঁশি বেজে উঠল। ছোটেলাল সমস্ত ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে উঠবার আগেই ভূতের মত ভুঁই ফুঁড়ে কোথা থেকে দুজন কনস্টেবল এসে তাকে হিঁচড়ে নামিয়ে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

ফ্ল্যাটের মধ্যেই একটা টেলিফোন ছিল। ছোটেলাল শুনল ছেলেটা তাতে কথা বলছে, 'হ্যালো, লালবাজার ?...আমি আই. বি. ইন্সপেক্টার কৌশিক সোম কথা বলছি। তালা-ভাঙিয়েদের সর্দার ছোটেলালকে এক্ষুনি বামাল সমেত গ্রেপ্তার করেছি।... আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, মিশন সাকসেসফুল।' ১৩৮৩

কুমড়ো-লতা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মনে পড়ছে একটা নিমগাছ।

তার তলায় চারটে খাটিয়া। জায়গাটা লাহোর। রাস্তার নাম জেল রোড। বাড়িতে বেশ বড় এক বাগান। সেখানে মা পুঁই-মাচা করেছিলেন। তার কাছেই আমি নানান গাছ বসাতাম। আম-কাঁঠাল, লিচু-বেদানা, আঙুর—আরো সব কত জাতের গাছ। জল ঢালতাম রোজ। কিন্তু...হরি-হরি, কোনো গাছ বেরুত না।

মা একদিন হেসে বললেন, 'তুই কুমড়ো বীজ পোঁত, গাছ হবে।'

তাই পুঁতলাম। সকাল-বিকেল জল ঢালি আর রোজ সকালে চুপিচুপি দেখে আসি গাছ গজিয়েছে কিনা।

মনে পড়ে অসহ্য গরম তখন। বাবা বললেন পাহাড়ে যাবেন। বাবার হাবভাব তখন ভালো করে বুঝতাম না। শুনতাম তিনি বড় চাকরি করেন। কিন্তু তাঁর চেয়ে যাঁরা ছোট চাকরি করেন তাঁদের বাড়িতে বেয়ারা-বাবুর্চি-ড্রাইভার। জমকালো সব উর্দি। কিন্তু আমাদের বাড়িতে শুধু খদ্দর-পরা এক চাকর, বামুন আর ঝি। ঝি দিদিমার মত। আসলে সেই ছিল বাড়ির গিন্নি। আমাদের অসুখ-বিসুখ করলে মা-কে সে বকত। মা হাসতেন।

মনে আছে সমস্ত রাত ভালো ঘুম হয়নি। নিমগাছের শুকনো পাতা গায়ে পড়েছে। বিছানা ছেড়ে উঠলাম। তারপর গেলাম মা-র সেই পুঁইমাচার কাছে। সেইখানেই পুঁতেছিলাম একটা হলদে কুমড়ো-বীজ। রোজ জল দিতাম। ভাবতাম সেই বীজ কখন টোপর মাথায় দিয়ে রাজার মত খাড়া হয়ে উঠবে। একদিন সেই ঘুম-ছাড়া অন্ধকার-অন্ধকার রাতশেষে গিয়ে দেখে অবাক ! সেই কুমড়ো-বীজ মাটি ফুঁড়ে সত্যি-সত্যি যে আকাশের দিকে উঠেছে। মাথায় টোপর, ঠিক রাজার মত।

পরের দিনই বাবা আমাদের পাহাড়ে নিয়ে চললেন।

আর এক ভদ্রলোক বাবার সঙ্গে একই কাজ করতেন। মস্ত সায়েব লোক। বাবুর্চি, বেয়ারা, বয় ত বটেই, তার উপর আবার একজন ড্রাইভার ! মস্ত মোটরগাড়ি তাঁর। তখনকার দিনে মোটর-গাড়ি-রাখা লোক খুবই কম।

সেই ড্রাইভার আমাদের সব ছেলে এবং মেয়েদের খোকা ও খুকি বলে ডাকত। কেন জানি না। তার পরনে পায়জামা, গায়ে সিল্কের এক শার্ট। তাতে ইস্তিরির বালাই নেই। সন্ধেবেলায় বাড়ির সামনের এক গাছতলায় বাঁশি বাজাত। বলত কলকাতায় নানা থিয়েটারে সে নাকি বড় বড় পার্ট করেছে। তার আঁকা ছবি নাকি জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু কেন যে সেইসব বড় বড় কাজকর্ম ছেড়ে লাহোরের মত এক জায়গায় ড্রাইভারি করতে গিয়েছিল কখনো সে কথা আভাসে-ইঙ্গিতে প্রশ্ন করলে ভারি রাগ করত সে।

www.BanglaBook.org

কাউকে না পেয়ে সেই ড্রাইভার ভদ্রলোককেই যাবার আগের দিন বললাম আমার সেই টোপর-মাথায়-দেওয়া কুমড়ো-লতাটিকে দেখতে। একমুখ হেসে সে বলল দেখবে, নিশ্চয়ই দেখবে।

সেই পাহাড়ের পায়ের কাছে আমরা পৌঁছলাম। সেখান থেকে এক্কা গাড়িতে তখন উপরে উঠতে হয়।

জগো নেমেই বলল, 'সব্বোনাশ, বাঁদিকে সাপ।' হলও তাই। জগোর এক্কা-গাড়ি ঠোক্কর খেল। জগো পড়ল। মারাত্মক না হলেও বেশ জখম হল। আমাদের চাকর, যাকে আমরা শ্রীপতিদা বলতাম, জগোকে পাঁজাকোলা করে তুলে এক্কায় ওঠাল।

পাহাড়ে পৌঁছলাম আমরা। লাহোর থেকে পাহাড়—যেন ফুটন্ত আগুন থেকে মেঘের হিমরাজত্বে। শরীর জুড়িয়ে যায়! সুন্দর বাড়ি, কাঁচে ঘেরা বারান্দা। সামনে খাদ। ছোট্ট এক রুপোলী ঝর্না তরোয়ালের মত ঝিকমিক করে। প্রায়ই বৃষ্টি। তাই বেরুনো প্রায় বন্ধ। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত প্রায় রোজই সেই ঝর্না দেখতাম, খাদ দেখতাম, খাদ থেকে উঠে আসা মেঘ দেখতাম—আর কেন জানি না লাহোরের ফেলে-আসা সেট ছোট্ট টোপর-পরা কুমড়ো-লতার কথা ভাবতাম। আর মন কেমন করত।

ভাবতাম এবার বুঝি দুটি থেকে চারটি পাতা হল। ভাবতাম এবার বুঝি লতানে গাছ হবার জন্য সে সবুজ, কচি, নরম শুঁয়ো বার করছে।

কিছুতেই সেই কুমড়ো-লতাকে ভুলতে পারতাম না।

তারপর সেই পাহাড়েই আমার ভাইয়ের ভয়ানক অসুখ হল। সেখানকার বড় বড় সাহেব ডাক্তার দেখে বললেন তাকে দুধে গুলে মুরগির ডিমের সঙ্গে দশ ফোঁটা করে ব্র্যান্ডি খাওয়াতে। তার নাম নাকি এগ্‌ফিলিপ্‌।

গরুর খাঁটি দুধ পাওয়া সেই পাহাড়ে ছিল দুষ্কর। ভোর-বেলায় জগো আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিত আর শ্রীপতিদা ও আমি হাত ধরে যেতাম সেই দুধ আনতে।

মাঝে-মাঝে শ্রীপতিদাকে জিগগেস করতাম, 'বল ত আমার সেই কুমড়ো-গাছটা কত বড় হয়েছে?'

হেসে সে বলত, 'হেসে-খেলে সে বেশ বড় হয়েছে।'

পাহাড়ে গেলেই যা হয়। ঘোড়া ভাড়া করে টহল দিতাম আমরা। একটা দিনের কথা এখনো বেশ মনে পড়ে। আমার ঘোড়ার সহিস আমাকে ছেড়ে কোথায় যেন তামাক-টামাক খেতে বসেছিল। কেন জানি না ঘোড়াটার যেন মাথা খারাপ হয়ে গেল। আমাকে নিয়ে সোজা সে দৌড়তে শুরু করল সেই পাহাড়ের বাজারের মধ্যে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করলাম, পারলাম না—পড়ে গেলাম। বহু লোক আমাকে তখন তোলবার জন্য ব্যস্ত। কী জানি কেন, কিন্তু তখন আমার মনে পড়েছিল সেই টোপর-পরা কুমড়ো গাছটির কথা!

তারপর সেখান থেকে গেলাম আমরা চম্বা উপত্যকায়। সেখান থেকে বৃষ্টিতে জুবজুবে হয়ে গেলাম কাংড়া ও জ্বালা-মুখী। মনে আছে এক্কা গাড়িতে যাবার সময় জগোকে জিগগেস করেছিলাম আমার সেই কুমড়ো-গাছটা কী রকম আছে। জগো কী যে স্বর্গত্ব আমার মধ্যে পেয়েছিল জানি না। আমাকে বলত 'সোনা'। বলল, 'তোর গাছটা ঠিকই আছে; ভাল আছে, বড় হচ্ছে।'

তারপর লাহোরে যখন আসি মনে তখন কত আশা। সময় যেন যায় না। ভাবছি সেই গাছটিতে ফুল ধরেছে। ভাবছি সেই ফুল, সেই ফল কাউকেই ছুঁতে দেব না।

সবাই বাড়িতে নামলাম একসঙ্গে—মা, বাবা, ভাই, বোন, শ্রীপতিদা, জগো। বুক ধুকধুক করছে। কারা যেন আমাদের মালপত্র নামাচ্ছিল। আমার কিন্তু কোন জিনিসপত্রের উপর খেয়াল নেই। বুক ধুকধুক করছে। ছুটে গেলাম আমার সেই কুমড়োগাছের কাছে।

ও হরি! কোথায় গাছ! শুধু শুকনো মাটি। সেই ড্রাইভার—গায়ে সেই সিল্কের কোঁকড়ানো জামা, পরনে লুঙ্গি—হেসে বলল, 'কবেই ত ডাঁটা-চচ্চড়ি করে খেয়ে ফেলেছি!'

১৩৬৯

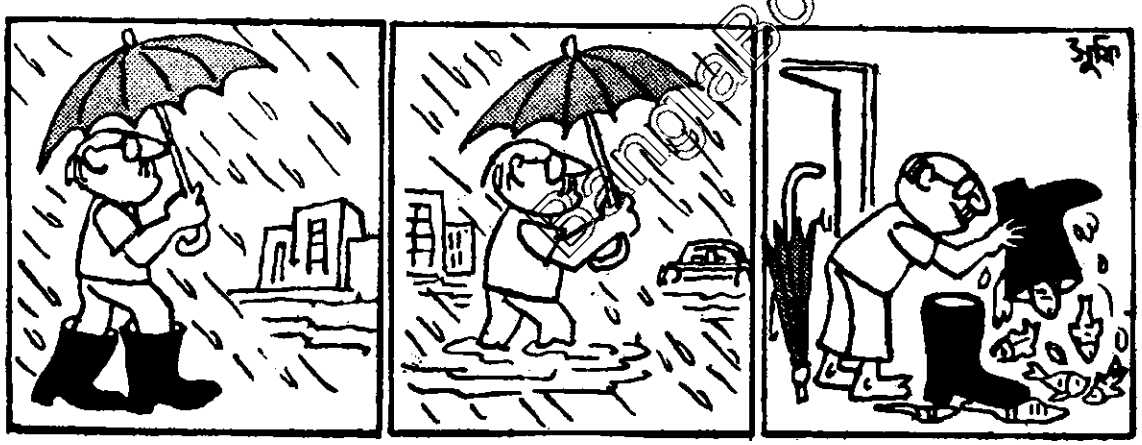

www.BanglaBook.org

নতুন বছর

সুরুচি সেনগুপ্ত

নতুন বছর ভাই,
তুমি আসছো শুনে আমার খুশির অন্ত নাই।
তুমি প্রথম আসবে যেদিন, হই-না ধনী,
হই-নাকো দীন,
যে করেই হোক্ একটু ভালো খাবার আমরা খাই।
দিনটা কাটাই হেসে খেলে, যার ভাগ্যে যেটুক মেলে,
ভালো সব কাজের সেদিন 'বউনি' করা চাই।
নতুন বছর ভাই!

সবাই বলে নতুন বছর আজ,
ঝগড়াঝাটি কিম্বা মন্দ কাজ
যা করব, তাই চলবে সারা বছরটাই।
তাই বিধাতার নাম স্মরি, ঠাকুরঘরে প্রণাম করি,
গাল ফুলিয়ে ভোঁ ভোঁ করে শংখ বাজাই।
গুরুজনের পায়ের ধূলি, নিচ্ছি সবাই মাথায় তুলি,
আজ যেন সকলেরই আশীর্বাণী পাই।
নতুন বছর ভাই!

সবই আগের, তবু যেন, বল দেখি, এমন কেন,
নতুন নতুন গন্ধ পাই, নতুন হাওয়া বয়।
আজকে তোমার ছোঁয়া পেয়ে,
পুরনো উঠল নতুন হয়ে
'নতুন বছর' 'নতুন বছর' সবাই শুধু কয়।
তুমি নতুন তুমি খাঁটি, সোনা হয় ছুঁলে মাটি,
সে ছোঁয়াতে আমরা সবাই হব স্বর্ণময়।
তুমি নিয়ে এলে জয়, মুঠো মুঠো বরাভয়
সে জয় তোমার হোক্ অক্ষয়, অচল অব্যয়।
বছর শেষে তোমায় দেখে, কাঁচা আম উঠল পেকে
হলুদ সিন্দুর অঙ্গে মেখে রূপে ঢল্‌ঢল্
সারি সারি সাজি ভরা, বাজার হাট আলো করা,
দেখেই কিন্তু আমাদের জিভে আসে জল।
ল্যাংড়া ফজলি বোম্বাই, সঙ্গে নিয়ে এলে ভাই,
যেমন রূপ, তেমনি গুণ, সবার সেরা ফল।
তোমার পিছু পিছু আসে গরমের ছুটি,
কবিগুরুর জন্মোৎসব এলো গুটি গুটি,
তোমার তো ভাই সবই ভালো, ঘুচল আঁধার
ফুটল আলো
কিন্তু তোমার সূর্যদেবের ভীষণ ভ্রূকুটি!
এমন সূর্য আনলে সাথে, বিশ্ব পোড়ে আগুন-তাতে,
গ্রীষ্ম ঋতু হলেই কি এমনি হওয়া চাই?
কি দোষ হয়, যদি একটু ঠান্ডা হাওয়া পাই?
নতুন বছর ভাই!

১৩৭৪

www.BanglaBook.org

একটি ভয়ংকর গ্রেপ্তারের কাহিনী

তুষারকান্তি বসু

একটা ভয়ংকর প্রাণীর কথা আজ বলতে যাচ্ছি।

অবশ্য প্রথমেই একটা তর্কের সূচনা এসে যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন শিকারী, প্রাণিতত্ত্ববিদ ভয়ংকর প্রাণীর বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। হুইটেকার মাকনা হাতিকে ভয়ংকর প্রাণী বলে মনে করেন। জর্জ মাইকেল মনে করেন বুনো মোষকে। হান্টার সাহেবের ধারণা দলছুট হাতি সব চাইতে ভয়ংকর। ব্রান্ডার সাহেবের ধারণা বাঘ অতি ভয়ংকর। অবশ্য জিম করবেট কোন নির্দিষ্ট মত পোষণ করতেন না। তিনি পারিপার্শ্বিক, সেই পশুর তখনকার মেজাজ, তার জীবন ধারণ করার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে এ-বিষয়ে বিচার করতে বলতেন। তাঁর এই হিসেবে অতি নিরীহ পশুও অতি ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে, আবার আমরা যাকে অতি ভয়ংকর বলি তা অতি নিরীহ মেষশাবক ছাড়া আর কিছু নয়। রুদ্রপ্রয়াগের মানুষখেকো যেভাবে করবেটকে এড়িয়ে চলেছে এবং তাঁর সঙ্গে যে লুকোচুরি খেলেছে তাতে তার ভয়ংকর চরিত্রের ছাপ তেমন ফুটে ওঠেনি। অথচ কয়েক বছর ধরে সেই বাঘ এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ত্রাসের রাজত্ব শুরু করে দিয়েছিল। হান্টার সাহেব যেভাবে হাতির বংশ ধ্বংস করেছেন তাতে কিন্তু তাঁর কথার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। হান্টার সাহেবের শিকার জীবনের কাহিনী পড়লে দেখা যাবে এক পাল মহিষের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি নির্বিবাদে ফটো তুলে চলেছেন। তাই কোন জানোয়ারকে অনায়াসে একটা বিশেষণ দিয়ে যেমন তাকে বড় করা যায় না তেমনি তাকে ছোটও করা যায় না।

আমার ধারণা বনে যত জন্তুজানোয়ার আছে তার মধ্যে ভারতের শঙ্খচূড় সাপকে সব চাইতে ভয়ংকর জীব বলতে পারি। বনের প্রত্যেকটি জন্তুজানোয়ার তার শক্তি এবং অস্ত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহমুক্ত নয়। ফলে বনে অনেক সময় অসমযুদ্ধ ঘটলেও অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী অনায়াসে শক্তিধরকে সসম্মানে পথ ছেড়ে দেয়। সাপ তার শক্তি সম্বন্ধে যতই সন্দেহগ্রস্ত হোক না কেন, অস্ত্র সম্বন্ধে তার বিশ্বাস অতি দৃঢ়। ফলে যে কোনো জন্তুজানোয়ারের সামনে সে ফণা তুলে দাঁড়াতে ইতস্ততঃ করে না। এর ফলে দেখা যায় একটি ছোট বিষধর কেউটের সামনে বনকাঁপানো ব্যাঘ্র-পুঙ্গব কিছুমাত্র অপেক্ষা না করে নিজের লাঙ্গুল গুটিয়ে নিজের জীবন বাঁচাবার মূলমন্ত্র রক্ষা করে পালিয়ে যায়। তবে বিষধর সাপের সঙ্গে মোকাবিলায় যারা পারদর্শী, তাদের কথা আলাদা। যেমন বেজী, গোসাপ, ময়ূর, হাড়গিলা, শুয়োর ইত্যাদি। এরা জন্মসূত্রেই যেন সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করার কৌশল আয়ত্ত করে নেয়।

আজ সেই ভয়ংকর এক সাপের কথা বলব।

শুনেছি শ্যামদেশে একধরনের শঙ্খচূড় আছে। এদের দৈর্ঘ্য নাকি ১৫।১৬ ফুট পর্যন্ত হয়। কোলকাতার যাদুঘরে এধরনের এক প্রকাণ্ড সাপের কঙ্কাল রাখা আছে। জনশ্রুতি, এরা অনায়াসে নিজের বুকে ভর দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে হাতির পিঠে বসা মহুতকে ছোবল মারতে পারে। শ্যামদেশের সেই সাপটির দংশনে একটি হাতি নাকি কয়েক মিনিটের মধ্যে মৃত্যু বরণ করে। শ্যামদেশের যে বনে এদের প্রাচুর্য, সে বনে নাকি অন্য জানোয়ার থাকে না। এমন কি পাখিও নাকি গাছে বাসা বাঁধতে ভয় পায়। বাঘও সেখানে ঢুকতে ভয় পায়। ভয়ংকরের মনে যে ভয় ঢোকাতে পারে সেই তো ভয়ংকর।

ঘটনার সময় আজ থেকে ১৫।১৬ বছর আগে। নায়ক হচ্ছেন ২৫।২৬ বছরের তরুণ এক চা-বাগিচা কর্মী। নাম শ্রীসুধাংশু গুহ। সমগ্র উত্তরবঙ্গে তিনি পটুদা নামেই সমধিক পরিচিত। আজ জয়পুর চা-বাগানের ম্যানেজার মিঃ গুহকে দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন যে আজ থেকে বছর পনেরো আগে বারো ফুট এক ইঞ্চি লম্বা পৃথিবীর বৃহত্তম এক ভয়ংকরতম শঙ্খচূড় সাপ তিনি ধরেছেন শুধু হাত দিয়ে। প্রৌঢ়ত্বের দরজায় দাঁড়িয়ে, কানের দু'পাশে কাঁচা-পাকা চুল, কপালের ওপর সরু কয়েকটা ভাঁজ এবং চোখে পুরু লেন্সের চশমা তাঁর ঋজুতা কিছুটা খর্ব করলেও চোখের গভীর দৃষ্টি তাঁর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ইঙ্গিত দেয়।

ঘটনাস্থল উত্তর বঙ্গের বিখ্যাত লাটাগুড়ি ফরেস্টের পূর্বাংশে ডায়না ফরেস্টরেঞ্জের লাগোয়া রেড ব্যাঙ্ক চা-বাগান। পটুদা (এখন থেকে এঁকে এ নামেই ডাকব) তখন রেড ব্যাঙ্ক চা-বাগানে কাজ করেন। ইতিমধ্যে উত্তর বঙ্গে তিনি শিকারী বলে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। শিকার করতে গিয়ে তাঁর সাহসের কাহিনী কল্পনাকে ম্লান করিয়ে দেয়। বিভিন্ন শিকারে তাঁর উদ্ভাবিত কৌশল যথেষ্ট কৌতূহল এবং কৌতুকের সৃষ্টি করে। বনের রীতিনীতি বজায় রেখে তাঁর উদ্ভাবিত বিভিন্ন পন্থা তাঁকে অনেকবার পুরস্কৃত করেছে।

জীবনে তিনি অনেক শিকার করেছেন। কয়েক মাস আগেও আক্রমণোদ্যত এক মত্ত হাতিকে তিনি কয়েক গজ সামনে থেকে গুলি করে বধ করেছেন।

বন্দুক রাইফেল দিয়ে শিকার করা ছাড়া তাঁর আরো একটা প্রিয় নেশা হল হাত দিয়ে জ্যান্ত সাপ ধরা। খুব ছোট থেকেই তিনি সাপ ধরতে অভ্যস্ত। বছর ২০।২২ আগে আমরা যখন খুব ছোট তখন পটুদা আচমকা পকেট থেকে কেউটে অথবা গোখরোর বাচ্চা কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে মজা পেতেন। যখন তখন তাঁর পকেট থেকে সাপ বের হত। হাত দিয়ে সাপ ধরে তার বিষদাঁত উপড়ে ২।৪ দিন খেলা করে শেষে আবার তাকে জঙ্গলে ছেড়ে দিতেন। সাপ ধরায় তিনি এত ব্যুৎপত্তি

www.BanglaBook.org

লাভ করেন যে, অনেক সময় মনে হত তিনি বোধ হয় ফড়িং অথবা প্রজাপতি ধরছেন।

সালটা ঠিক মনে নেই। সম্ভবত ১৯৫৭।৫৮ হবে। দুপুরে তখন তিনি তাঁর মৌচাকের পরিচর্যায় ব্যস্ত। যাঁরা চা বাগানের কাজের ধারার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানেন, চা বাগানে সকাল ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত কাজ হয়! মাঝে এক ঘণ্টার জন্য ছুটি পাওয়া যায় প্রাতঃকালীন জলযোগের জন্য। ১২টা থেকে ২-৩০ পর্যন্ত দুপুরে খাওয়ার এবং বিশ্রাম করার ছুটি। বিকেল ৬টায় দিনের মত ছুটি হয়ে যায়।

এই সময়ে চা বাগানের এক ওঁরাও শ্রমিক পটুদাকে এসে জানাল চা বাগানের বড় নালার মধ্যে প্রকান্ড একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। শীতকালে সাপ এভাবে অনেক সময় নিজের গর্ত থেকে বের হয়ে রোদ পোহাতে বসে। সাপের মাথাটা বোধ হয় দেখা যায়নি। কারণ সেটা তখন তার বিড়ের মধ্যে জড়ান ছিল।

চা গাছের গোড়ায় জল জমতে দেওয়া হয় না। গোড়ায় জল জমলে গাছ মরে যায়। এজন্য চা বাগানের মধ্যে ছোট ছোট নালা কাটা হয়। এ সব নালার আবার বড় একটা নালার সঙ্গে যোগ থাকে। এই বড় নালাতে ছোট নালার জল এসে পড়ে এবং সে জল বের করে দেওয়া হয় বাগানের সীমানার বাইরে কোন এক নদীতে। সাধারণত এই বড় নালাগুলি ৭।৮ ফুট গভীর এবং ৩।৪ ফুট চওড়া হয়। বর্ষার সময় এগুলির চেহারা অনেকটা কাটা-খালের রূপ নেয়। মাঝে মাঝে এর মধ্যে শ্রমিকদের শিশুপুত্র ডুবে মারা গেছে এমন নজির আছে।

শ্রমিকের বর্ণনা-মত পটুদা বুঝতে পারলেন সাপটা হয়ত অজগর হবে। এই অঞ্চলে প্রায়ই পাহাড় থেকে পাহাড়ী পাইথন ভেসে আসে। এর আগে তিনি দু'একটা পাইথন ধরেছেন। তাই ওখানে পাইথন থাকা অসম্ভব নয়।

পটুদা কয়েক মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে নিলেন। যন্ত্রপাতির মধ্যে নিলেন একটা তীক্ষ্ণধার দা, বেশ কয়েক হাত লম্বা শক্ত সরু দড়ি, একটা চটের বস্তা, লম্বা একটা বাঁশের লাঠি এবং ১২ বোরের বন্দুক।

সাপটা পাইথন বলেই পটুদার সন্দেহ। শ্রমিকটি সাপের পরিধির যে বর্ণনা দিয়েছে তাতে তাই মনে হয়। কিন্তু খটকা বেধেছে রং নিয়ে। পটুদার জানা-চেনা কোন পাইথনের রংয়ের সঙ্গে এই সাপের রং মিলছে না। রাস্তায় যেতে যেতে পটুদা শ্রমিকটির কাছে বার বার সাপটার বর্ণনা খুঁটিয়ে জেনে নিচ্ছিলেন।

বাগানের শেষ সীমায় ডায়না নদী। অবশ্য বাগানের গা-লাগা না। বাগানের পর ছোট এক টুকরো বন। ডায়না ফরেস্টের একটা অংশ। তার পরই ডায়না নদী। শীতের সময় এই নদী একটি দশ বছরের শিশু অনায়াসে হেঁটে পার হয়ে যেতে পারে। বর্ষার প্রলয়ংকরী ডায়নার সঙ্গে এখনকার তুলনাই হয় না। বর্ষায় একটা পূর্ণ বয়স্ক হাতিকেও কেউ এখানে নামাতে সাহস পাবে না। ১৯৫৪ সালে একটা রেল ইঞ্জিন এই পুল থেকে পড়ে যায়। যদিও অভাবনীয় ভাবে ইঞ্জিনের লোকজন বেঁচে যায়, কিন্তু ইঞ্জিনটিকে পাওয়া যায় মাইল খানেক নিচে। সেবার একটা বুনো হাতিও কি করে এই নদীতে ভেসে যায়।

এখানে বাগান নেই। আছে ছোট ছোট কিছু গাছ এবং বুনো ঝোপঝাড়। শ্রমিকটি পটুদাকে দূর থেকে সাপের সঠিক অবস্থানের নিশানা দিয়ে দিল।

বন্দুকটা শ্রমিকের হাতে দিয়ে পটুদা দড়ির মাথায় ল্যাসোর মত একটা ফাঁস বানালেন। তারপর বস্তা এবং লাঠি নিয়ে প্রায় হামাগুড়ির ভঙ্গীতে এগিয়ে যেতে থাকলেন। শ্রমিকটি বন্দুক নিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকল।

অনেকেই হয়ত জানেন সাপ কানে শোনে না। তাঁর শোনার প্রধান যন্ত্র হচ্ছে তার দেহ। মাটিতে কম্পনের মধ্য দিয়েই সাপ শ্রবণের স্বাদ পায়। তাই পটুদার এই সাবধানতা। হেঁটে গেলে আওয়াজ হবে। কিন্তু হামাগুড়ি দিয়ে গেলে সে আওয়াজ হবে না।

পটুদা ধীরে ধীরে সাবধানে নালার ধারে দাঁড়ালেন। নালার মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালিয়ে দিলেন। প্রথমে তাঁর নজরে কিছু পড়ল না। তারপর হঠাৎ তাঁর দৃষ্টিতে ধরা দিল সাপের কুণ্ডলীটা। অভ্যস্ত চোখে এক পলক তাকিয়ে পটুদা বিস্ময়ে থমকে গেলেন। তাঁর চিন্তাশক্তি যেন লোপ পেয়ে গেল। এ কী দেখছেন তিনি! পটুদা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন তাঁর দাঁড়ানোর অবস্থান থেকে মাত্র ৮।১০ ফুট দূরে কুণ্ডলী পাকিয়ে যে সাপ পড়ে আছে তা পৃথিবীর ভয়ংকরতম এবং দীর্ঘতম শঙ্খচূড় অথবা কিং কোবরা। সাপটা যদি ইচ্ছে করে তবে পটুদাকে ওখান থেকে আক্রমণ করতে পারে। আর এদের ক্ষিপ্রতা কিং-বদন্তীকেও হার মানায়।

পটুদা যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন ঠিক সেভাবে পিছিয়ে এলেন। পাইথন ধরার কায়দা এবং কিং কোবরা ধরার পন্থা এক নয়। পটুদার কাছে বিভিন্ন ভূতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র।

চিন্তা করতে তাঁর বেশি সময় লাগল না। শ্রমিকটিকে দিয়ে দূরের একটা গাছ থেকে লম্বা একটা ডাল কাটালেন। ডালটা লম্বায় প্রায় ১৪।১৫ ফুট। সোজা সরল ডালের মাথাটা ছোট্ট একটা ইংরেজী 'ওয়াই' অক্ষরে শেষ হয়েছে। 'ওয়াই'-এর লেজ হচ্ছে ডালটা। 'ওয়াই'-এর মাথার বাহু দুটি লম্বায় ৪।৫ ইঞ্চি হবে।

দড়ি এবং এই ডালটা নিয়ে পটুদা এগিয়ে যেতে থাকলেন। এবার তিনি শ্রমিকটিকে সঙ্গে আসবার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। দুজনে পা টিপে টিপে এগিয়ে যেতে থাকলেন। এবার যদি সাপ শব্দ শুনে পালিয়ে যেতে থাকে তাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ তার আগেই ওঁরা তাকে ধরে ফেলতে পারবেন।

সাপটা বাস্তবিক শব্দ শুনতে পেয়েছিল; ওঁরা নালার ধারে এসে দেখলেন সাপটা তার কুণ্ডলী থেকে মাথা বের করে পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজছে। তখনও তার পাক সমস্তটুকু খোলেনি।

পটুদার বিস্মিত হওয়ার আরো অনেক বাকী ছিল। ওঁদের আওয়াজ পেয়ে, শত্রুপক্ষের আঁচ পেয়ে সাপটা আচমকা ফণা তুলে দাঁড়াল। পটুদা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন সাপের ফণাটা একটা কুলোর সমান প্রায়। মানসিক শক্তিতে প্রচুর বলশালী লোকেরও হৃৎকম্প হবে সাপের ফণা তুলে দীর্ঘস্থায়ী হিস্-হিস্ আওয়াজ। পটুদাও কয়েক সেকেন্ডের জন্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। সাপটা সম্বন্ধে যা আন্দাজ করছেন তার চাইতে অনেক বড়। বিড়ে পাকানো নিরীহ একটা সাপ দেখে তার ফণাতোলা-বিক্রম বিচার করা যায় না। কল্পনাও করা যায় না। পটুদাও এর কোনটাই পারেননি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পটুদা কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে চিন্তা করলেন। এর আগে ছোটখাট ভয়ংকর বিষাক্ত সাপ ধরেছেন সন্দেহ নেই। তিনি সাপের ক্ষিপ্রতাকে পরাস্ত করেছেন নিজের ক্ষিপ্রতা দিয়ে। এখানে তাঁকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শক্তির মোকাবিলা করতে হবে।

সাপটা ধীরে ধীরে ফণা গুটিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ করতে থাকে।

গোটা প্ল্যানই অন্যরকম। এর আগে পটুদা যে সব পাইথন ধরেছেন তা অতি সহজে, কিন্তু যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে। চলন্ত সাপের সামনে পথ রোধ করে দাঁড়াতেন তিনি। সাপের মুখের সামনে বস্তার মুখ তুলে ধরতেন। সাপ ভেতরে ঢুকতে ইতস্ততঃ করলে পিঠের ওপর লাঠি দিয়ে আস্তে টোকা দিতেন। সাপ আস্তে আস্তে বস্তার ভেতরে কুণ্ডলী পাকাত। সব শেষে বস্তার মুখ দড়ি দিয়ে বেঁধে বাড়ি বয়ে নিয়ে আসতেন!

বিষধর সাপের বেলা অন্য পদ্ধতি। কোন রকমে সাপের লেজটা হাতের মুঠোর মধ্যে এনে চকিতে তিনি মাথার ওপর লাঠি ঘোরাবার ভঙ্গীতে বন্‌বন্‌ করে কয়েক পাক ঘুরিয়ে নিতেন। সাপের মেরুদণ্ড আলগা ভাবে একটার পর একটা হাড়ের টুকরো দিয়ে বসান। ওভাবে ঘোরানোর ফলে তার মেরুদণ্ডের হাড়ের জোড় খুলে যেত। ফলে বেশ কয়েক মিনিটের জন্য সাপ নিস্তেজ হয়ে পড়ত। এ সময়ে তার কিছু-মাত্র নড়ার ক্ষমতা থাকে না। তারপর তার মাথা চেপে ধরে কোন হাঁড়িতে অথবা বাক্সে বন্দী করতেন।

এক্ষেত্রে এর কোনটাই সম্ভব নয়। সামনে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। লেজ চেপে ধরে তাকে ঘোরাবার আগেই চকিতে ফিরে সাপটা ছোবলের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিমাণ বিষ ঢেলে দেবে তাতে যে কোন পূর্ণবয়স্ক মানুষ মিনিট খানেকের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

পটুদা 'ওয়াই' লাঠি দিয়ে সাপটাকে একটা খোঁচা দিলেন। তড়িৎ বেগে সাপ ফণা তুলে রক্ত-জল-করা তীব্র হিস্‌ হিস্‌ আওয়াজে তার বিরক্তি ও রাগ প্রকাশ করছিল। কয়েক সেকেন্ড এভাবে থেকে আবার সে যেতে উদ্যত হল। পটুদা সঙ্গে সঙ্গে লাঠি দিয়ে আবার আঘাত করলেন। সাপও ফণা তুলে উঠে দাঁড়াল।

এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে বার বার। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে সাপটাকে ব্যস্ত রাখলেন পটুদা। এরপর আঘাত করার পর সাপ রুখে দাঁড়াল না। অনেকটা লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাওয়ার মনোবৃত্তি নিয়ে সাপটা তখন এগিয়ে যেতে থাকে। এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন পটুদা।

চকিতে তিনি লাঠির 'ওয়াই' দিয়ে সাপের মাথাটি মাটির মধ্যে চেপে ধরলেন! গলার চাইতে মাথাটা মোটা হওয়ায় এবং আঁশ উল্টো দিকে থাকায় পিছিয়ে এসে মাথা বের করার কোনই সুযোগ ছিল না। এগিয়ে যাওয়ারও কোন প্রশ্ন নেই। এই সময়ে সাপের লেজটা এমন ভাবে মাটিতে আছড়ে পড়ছিল যার একটি আঘাত একজন মানুষকে সটান মাটিতে ফেলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পটুদা শ্রমিকটিকে নালায় নেমে সাপের লেজ হাত দিয়ে চেপে ধরতে বলেন। তিনি ভুল করেছিলেন। নিজের সাহস এবং ক্ষিপ্রতা একজন সাধারণ শ্রমিকের কাছে আশা করা যায় না। শ্রমিকটি ভয়ে পিছিয়ে এল। পটুদা চিন্তা করেছিলেন শ্রমিকটি যদি লেজ চেপে ধরতে পারে এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট শক্তিতে যদি লেজ ধরে টানতে পারে তবে সাপের মেরুদণ্ডের হাড়ের জোড় খুলে যাবে। তখন তাকে ইচ্ছেমত বশে আনা যাবে। কিন্তু শ্রমিকটি সভয়ে পিছিয়ে আসাতে সে ফন্দী ব্যর্থ হল।

এর পর পটুদা এক অসমসাহসিক সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি শ্রমিকটিকে ডেকে লাঠিটা চেপে ধরতে বললেন। তাকে ভাল করে বোঝালেন যে, তার দৃঢ় মুষ্টি বিন্দুমাত্র শিথিল হলে পটুদার মৃত্যুর কারণ ঘটবে।

পটুদা সাপের লেজের আঘাত এড়িয়ে নালায় নেমে পড়লেন। তারপর সন্তর্পণে লাঠির গোড়ায় সাপের গলাটা দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরলেন। দু'হাতে চেপে ধরে শ্রমিকটিকে বললেন লাঠি তুলে নিতে। লাঠি তোলার সঙ্গে সঙ্গে পটুদা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক পা পিছিয়ে সাপের মাঝখানে দু'পা দিয়ে চেপে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সাপের লেজের তীব্র আঘাত এসে পড়ল তাঁর পিঠের উপর। দেহের অর্ধেক চাপা থাকায় আঘাতের তীব্রতা না থাকলেও মনে হল যেন সরু লিকলিকে বেতের প্রচণ্ড মার পড়েছে পিঠের ওপর।

কপাল ভাল পটুদার। ওরকম আর দু'চার ঘা পিঠে পড়লে কি ঘটত বলা যায় না। কিন্তু সাপটা একটা অবলম্বন পাওয়ায় বিদ্যুৎ বেগে পটুদার পা জড়িয়ে ধরল। কী তীব্র তার বাঁধুনি তা কল্পনা করা যায় না। ক্রমাগতই তার বাঁধুনি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল।

ইতিমধ্যে শ্রমিকটি নালার মধ্যে নেমে এসেছে পটুদার ইঙ্গিতে। পটুদাকে এভাবে সাপের সঙ্গে লড়াই করতে দেখে হয়ত তার সাহস ফিরে এসেছিল। পটুদার নির্দেশে সে লাঠিটার 'ওয়াই' মাথা সাপের মাথার কাছে নিয়ে এল। পটুদা তখন সাপের মাথা আর লাঠির মাথা এক জায়গায় করলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকটি দড়ি দিয়ে সাপের মাথা লাঠির মাথার সঙ্গে কয়েক প্যাঁচ দিয়ে জড়িয়ে ফেলল। এভাবে পা দিয়ে চাপা জায়গা পর্যন্ত সাপের দেহ দড়ি দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার মত করে লাঠির সঙ্গে সাপকে জড়িয়ে ফেলা হল।

ইতিমধ্যে পটুদার পায়ের অবস্থা সঙ্গীন। সমস্ত পা সমেত নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে এসেছে। অতি কষ্টে পা তুলে তুলে একেক পাক খুলে তাকে দড়ির প্যাকে জড়াতে থাকেন পটুদা।

পনের মিনিটের যুদ্ধ। পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম একটি প্রাণী হার মানল পটুদার সাহস এবং কৌশলের কাছে।

ওপরে উঠে গাছের নিচে বসে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হল পটুদাকে। পায়ে তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছিল। কিছুক্ষণ হাত দিয়ে মালিশ করার পর ব্যথার কিছুটা উপশম হল।

শ্রমিকের কাঁধে বন্দুকের মত লাঠিটা নিয়ে বিজয় গর্বে পটুদা বাগানে ফিরে এলেন।

লাঠির সঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা সাপটার দৈর্ঘ্য মাপা হল। দৈর্ঘ্যে তার মাপ ছিল ১২ ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি। প্রস্থে পেটের কাছে পরিধি ছিল এগার ইঞ্চি।

যতদূর জানা যায় এই সাপটি ছিল পৃথিবীর জীবন্ত ধরা শঙ্খচূড় অথবা বিষাক্ত জাতীয় সাপের মধ্যে সবচেয়ে বড়।

পটুদা পরে সাপটির বিষ বের করেছিলেন এবং তার দাঁত তুলে ফেলেছিলেন। একবারে তার থলে থেকে বড় চামচের দেড় চামচের মত বিষ বের হয়েছিল।

সাপটাকে কোলকাতা চিড়িয়াখানায় উপহার দেওয়া হয়। কয়েক বছর ধরে চিড়িয়াখানায় দর্শকদের ভীতি ও বিস্ময় সঞ্চার করে মারা যায় খুব সম্ভবত ১৯৬৭ সালে।

১৩৮১

ভাষাজ্ঞান

শ্যামলী বসু

'কোদাল খনিত্র হবে, রথ হবে স্যন্দন,
নৌকা বহিত্র হবে, ছেলে হয়—নন্দন,'
ভুলে যায় ছাত্র
মার খাওয়া মাত্র—
কেঁদে বলে 'কাঁদিনি তো, করি আমি ক্রন্দন!'

১৩৮২

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিড়িয়াখানা

লীলা মজুমদার

মনের দুঃখে রেগেমেগে বিশু ঐ বনে এসেছিল। বাবা বলেন বন নয়, বনভূমি। ওখানে ডাকাত, হিংস্র জানোয়ার ইত্যাদি কিচ্ছু নেই। এ বন ঘরের চেয়েও নিরাপদ। বাবার জানা উচিত, কারণ বাবা বন-বিভাগে কাজ করেন। রাগ বা দুঃখ হলেই বিশু ঐ বনে চলে আসে। মন ভালো হয়ে যায়। সব মাইনের টাকা বাজারে কে বাবার পকেট থেকে তুলে নিয়েছিল, তাই ওদের পুজোর কাপড়চোপড় কেনা হল না। বিজয়ার পর পয়সা খরচ করে গৌহাটিতে দিম্মার বাড়িতেও যাওয়া হল না।

এ জায়গাটা বড় ভালো। কেমন রাগ পড়ে যায়। ত্রিশ হাত উঁচু থেকে ঝর ঝর করে দিনরাত জল পড়ে তলায় একটা ছোট্ট গোল দীঘি হয়েছে। সেই দীঘি থেকে একটা নদী বেরিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে।

নদী নয় নালা। এত ছোট, এত সরু। কিন্তু কি তার স্রোত, কি তার রূপ! নালা কখনো অমন সুন্দর হয়? ছোট বড় নানা রঙের গোল পাথরের ওপর দিয়ে ছলছল করে জল ছিটিয়ে, পাক খেয়ে, খুদে খুদে ঢেউ তুলে, কলকল শব্দে সেই নদী ছুটে চলেছে। দু' পাশের ছাতার মত বড় বড় ফার্ন-গাছের ঝুলো পাতায় জলের ফোঁটা লেগে থাকছে; তারপর এক সময় টুপ করে ঐ জলেই ঝরে পড়ছে। দু'ধার থেকে ফার্নের ঝালর-পানা পাতাগুলো জলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। এক জায়গায় দুই তীরের পাতা জুড়ে একটা সুড়ঙ্গ তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে দিয়ে কুলকুল কলকল করে জল ছুটে চলেছে।

জুতো বগলে নিয়ে, মাথা নিচু করে বিশুও চলল সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে। কি ঠাণ্ডা জল, কি চমৎকার জায়গা। মাঝে মাঝে পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ ঢুকে জলের গায়ে বাঘের মত ডোরা কেটে দিচ্ছে। সেই বাঘ-ডোরার তলা দিয়ে জল দৌড়চ্ছে। হঠাৎ সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে গেল। কুলকুল করে জলের স্রোত রোদে বেরিয়ে, ফিক্‌ফিক্ করে হাসতে হাসতে ছুটতে লাগল।

টলটল করছে পরিষ্কার জল। তলা দেখা যাচ্ছে। বালি। বালির ওপর নানা রঙের নুড়ি গড়াচ্ছে—সাদা, হলুদ, গোলাপী, লাল, কুচকুচে কালো। ছোট ছোট মাছ বিদ্যুতের মত ঝলক দিচ্ছে। নুড়ির আড়াল থেকে বড় মাছগুলো জুলজুল করে বিশুর পায়ের দিকে তাকাচ্ছে। জলের তলায় পায়ের আঙুলগুলো কেমন সুন্দর ফরসা দেখাচ্ছে।

ঝুপ করে এক পাটি জুতো বগল থেকে খসে জলে পড়ে স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলল। অমনি বুড়ো-আঙুলের-নখ-ছাঁচা একটা হাত খপ করে জুতোটি তুলে ধরে বলল, 'নাও। জল নেড়ো না! মাছ পালাবে!'

বিশু চেয়ে দেখল এক বেজায় বুড়ো হাঁটু মুড়ে জলের ধারে রোদে বসে। তার হাতে একটা ছোট ছিপ, পাশে সরু-মুখ চুপড়ি। তাতে একটাও মাছ নেই। বিশু বলল, 'তোমার পাথরে একটু রোদ্দুরে বসি?'

বুড়ো ফোক্‌লা মুখে এক গাল হাসল, 'বস, বস, খুব খুসি হলাম। তাছাড়া পাথর-ও আমার নয়, রোদ-ও আমার নয়। কিন্তু নড়াচড়া হট্টগোল কর না, তাহলে আমার মাছ পালাবে। অবিশ্যি মাছ-ও আমার নয়।'

বিশু রোদে পা গরম করতে আর বুড়োর মাছ ধরা দেখতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বঁড়শীতে একটা আধ বিঘৎ মাছ গাঁথল। বুড়ো চটপট সেটি তুলে যত্ন করে বঁড়শী খুলে, মাছটাকে চুপড়িতে না ফেলে, জলে ফেলে দিল। বিশু দেখে অবাক। আবার মাছ পড়ল, আবার তাকে জলে ফেলা হল। জলে মাছ কিলবিল করছে।

এমনি করে সাতটা মাছ ফেলা হল পর, বিশু জিজ্ঞাসা না করে পারল না, 'ছেড়েই যদি দেবে ত ধরছ কেন?'

লোকটা অবাক হল। 'ছাড়ব না ত কি করব?'

'কেন, চুপড়িতে রাখবে!'

'তাহলে ত মরে যাবে।'

'বাঃ, মরবে না? জ্যান্ত ত আর খাওয়া হবে না।'

বুড়ো বঁড়শী গুটিয়ে বলল, 'আমি মাছ মাংস ডিম খাই না।'

'খাও-টাও ত ধরছ কেন?'

'মাছ ধরতে মজা লাগে তাও জান না? চল, ওঠ।'

'কোথায় যাব?'

'আমার ঘরে চল, কালো বেরি খাওয়াব।'

কালো বেরি বড় মিষ্টি। বিশু খালি চুপড়িটা হাতে নিয়ে তার ঘরে গেল। ঘর ত নয়; আধখানা তার পাহাড়ের গায়ে পাথরের গুহা। তার সামনে গাছের গুঁড়ি বসিয়ে তিন দিকের দেয়াল হয়েছে, ছাদ হয়েছে, দেয়ালে তাক হয়েছে, সামনের অর্ধেকটা জুড়ে দরজা হয়েছে। ঘর রোদে ভরে গেছে।

www.BanglaBook.org

তাকের সামনে জাল লাগিয়ে খাঁচা হয়েছে! খাঁচা ভরা ছোট বড় পাখি, সাদা লাল নীল সবুজ মেটে ছাই হলুদ কালো। নাচছে, কুঁদছে, গান গাইছে। দেখে বিশু অবাক।

'কোথায় পেলে এদের? আকাশের পাখিকে খাঁচায় পোরা নিষ্ঠুর কাজ।'

'কুড়িয়ে আনলাম। ডানা ভাঙা, ঠ্যাং খোঁড়া! আকাশে এরা কেউ উড়তে পারে না। ছেড়ে দিলে কাগ প্যাঁচারা ঠুকরে খাবে!'

'ঐ বেজিটা কেন? যদি পাখি ধরে?'

'ওর তিনটে ঠ্যাং। কামড়ানো-ফাঁদে পড়েছিল। কোথায় যাবে ও?'

'সাপ মারে আশা করি?'

'কি জ্বালা! বলছি সামনের একটা ঠ্যাং নেই, সাপ ধরবে কি করে? কামড়ে দেবে না? সাপের ভয়ে ও পাখির খাঁচার ছাদে চড়ে বসে।'

'তবে ঐ ধেড়ে কালো সাপ কেন?'

'ও ত ধ্যানশ, ওর বিষ নেই। শিরদাঁড়া ভাঙা, চলতে পারে না। বাইরে বেরুলে শেয়ালে খাবে।'

'তাহলে শেয়ালটা রেখেছ কেন?'

'ও চোখে দেখে না; যাবেটা কোথায়?'

'ওরা কি খায়?'

'কি আবার খাবে, আমি যা খাই তাই খায়। বনের ফল-পাকুড়, শাঁকালু, মিঠে আলু, ছাগলের দুধ দিয়ে মকাই সেদ্ধ। আমার ছাগলকে বাইরে চরতে দেখনি?'

'গন্ধ পেয়েছি। কিন্তু এত সব পুষতে কিছু টাকা ত লাগে কোথায় পাও?'

বুড়ো তখন তার বুনো ভুরুর তলা থেকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'জোগাড় করি।'

বিশু রাগ করে বলল, 'কেমন করে জোগাড় কর তা আমি জানি। বড়বাজারে তুমি আমার বাবার পকেট থেকে মাইনের সব টাকা তুলে নিয়েছিলে। বাবা তোমার নখ-ছ্যাঁচা-বুড়ো-আঙুল দেখেছিল, ভিড়ের মধ্যে আর কিছু দেখতে পায়নি। কিন্তু পুলিসরা বলছিল এ নাকি ঝানু চোর চানু বলে এক ছোকরার কাজ। সে কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে থাকে কেউ জানে না। আমাদের পুজোয় নতুন কাপড় হয়নি। গৌহাটিতে দিম্মার বাড়িতেও যাওয়া হবে না।'

বুড়ো বলল, 'কেন, তোমাদের অন্য কাপড় নেই?'

বিশু বিরক্ত হয়ে উঠল, 'তা নিশ্চয় আছে। সকলের থাকে।'

বুড়ো মাথা নাড়ল, 'আমার ত নেই।'

বিশু তখন সেই বুড়োকে জাপ্টে ধরে বলল, 'কিনে নিও। ঐ টাকা থেকে গরম কোট পাজামা কিনো। আমি পুজোর কাপড় চাই না, গৌহাটি যেতে চাই না। কিন্তু তুমি মরে গেলে, এদের কে দেখবে?'

বুড়ো হাসল। 'কেন চানু দেখবে। সে রোজ রাতে এসে আমার ঘরদোর সাফ করে। সাপটার শীত লাগে, কারো গা ঘেঁষে না শুলে ও বাঁচবে না। তাই চানু ওর পাশে শোয়। সারাদিন খেটেখুটে রাতে এখানে এসে নিরাপদে থাকে। আর কালো বেরি খাবে না?'

বিশু উঠে পড়ে বলল, 'না, চলি। দেরি করলে মা আমাকে খুঁজতে ন্যাপাকে পাঠাবে। তুমি ভেবো না বুড়ো, আমি কাউকে কিছু বলব না। আবার আসব।' ১৩৮৪

রাজবৈদ্য জীবক

রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী

বৌদ্ধযুগের স্বনামধন্য চিকিৎসক জীবক ইতিহাসের এক স্মরণীয় পুরুষ। প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। আয়ুর্বেদশাস্ত্র সম্পর্কে জীবকের লেখা 'কাশ্যপ সংহিতা' গ্রন্থখানি একাই বহুখ্যাত রচনা, আজও গ্রন্থখানির সুনাম অক্ষুণ্ণ আছে।

খ্রীষ্ট-জন্মের প্রায় দু'শো বছর আগের কথা। বিম্বিসার তখন মগধের সম্রাট। দক্ষিণ বিহারে পাটনা ও গয়া জেলাকে প্রাচীনকালে মগধ বলা হত। বিম্বিসার ছিলেন এই মগধ রাজ্যের সব চেয়ে প্রসিদ্ধ রাজা। জীবক ছিলেন রাজবৈদ্য-প্রধান; অর্থাৎ সম্রাটের খাস ডাক্তার।

পালি গ্রন্থে জীবনের জীবন ও জীবিকা সম্বন্ধে অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে। তাই থেকে জানা যায়, জীবকের জন্ম বিহারের রাজগীর শহরে। তাঁর পিতার নাম অভয়, মায়ের নাম শালবতী. অভয় ছিলেন সম্রাট বিম্বিসারের পুত্র। কিন্তু শালবতী তাঁর প্রকৃত ধর্মপত্নী ছিলেন না বলে পিতার মৃত্যুর পর জীবকের পিতৃরাজ্য লাভ করার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

ছেলেবেলা থেকেই জীবকের বুদ্ধি ছিল প্রখর। মেধাবী ছাত্র হিসেবে পাঠশালায় তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করতে তাঁর বেশী দিন সময় লাগেনি। কিন্তু এই সামান্য শিক্ষায় তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছিল, জীবনে স্বাবলম্বী হতে হলে আরও শিক্ষার প্রয়োজন। রাজ্য লাভের আশা যখন নেই, তখন যে কোন উপায়েই হোক তাঁকে স্বাবলম্বী হতে হবে এবং সেই সঙ্গে জীবিকা অর্জনের পথ খুঁজে নিতে হবে।

অনেক চিন্তার পর জীবক একদিন কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর তক্ষশিলার পথ ধরে হেঁটে চললেন। তক্ষশিলা ছিল সে যুগে ধর্ম ও শিক্ষার পীঠভূমি। সেখানের বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন ভারত বিখ্যাত শল্যবিদ আত্রেয় চিকিৎসা শাস্ত্রে অধ্যাপনা করতেন। আত্রেয় ছিলেন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত। আয়ুর্বেদ বিষয়ে তাঁর অনেকগুলি বই আছে। তার মধ্যে 'আত্রেয় সংহিতা' বইখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।...এই মহা পণ্ডিতের খ্যাতি ছিল দূরবিস্তৃত। দেশ-বিদেশ থেকে বহু ছাত্র তাঁর কাছে

www.BanglaBook.org

আয়ুর্বেদ পড়বার জন্য ভিড় করত। তবে সেই সকল শিক্ষার্থীরা অধিকাংশই ছিল ধনীর সন্তান। সুতরাং শিক্ষার জন্য আচার্যকে উপযুক্ত দক্ষিণা দিতে তারা কেউই অক্ষম ছিল না।

তাছাড়া উপযুক্ত দক্ষিণা না পেলে আত্রেয় কোন ছাত্রের শিক্ষাভার গ্রহণ করতেন না। সে কথা তখন সকলেই জানত। জীবকও জানতেন। তবু তিনি নিরাশ হলেন না। তক্ষশিলার পথ ধরে এগিয়ে চললেন। মনে তাঁর অনেক চিন্তা, অনেক সংশয়। শিক্ষালাভের জন্য আচার্যকে উপযুক্ত দক্ষিণা দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। নিঃসহায় কপর্দকশূন্য এক তরুণ ছাত্র তিনি ; পরের ওপর একান্ত নির্ভরশীল। এই তাঁর একমাত্র পরিচয়। এই অবস্থায় আত্রেয় কি তাঁকে শিক্ষালাভের সুযোগ দেবেন? জীবকের মনে তখন অনেক সংশয় ভিড় করে আসে, আশাহত মন চকিতে থমকে দাঁড়ায়। পথ চলার গতি ক্রমে মন্থর হয়ে আসে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সংশয় কেটে যায়। আবার ক্ষীণ আশার আলো মনে উঁকিঝুঁকি দেয়। সম্ভাবনার একটা ইঙ্গিত ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে দেহমনে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। হারানো উদ্যম যেন ফিরে পেলেন জীবক। নিজের মনে তখন বলে উঠলেন,—গুরুকে দক্ষিণা দেবার ক্ষমতা আমার না থাকলেও, তাঁর কাছে নিজেকে দক্ষিণা স্বরূপ উৎসর্গ করার মনোবল আমার আছে। পণ্ডিতপ্রবর আত্রেয় নিশ্চয় এই আত্ম-নিবেদনে প্রীত হবেন। যাই হোক,—আশা-নিরাশায় বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে জীবক পুনরায় তাঁর গন্তব্য পথে রওনা হলেন।

অতঃপর এক সকালে জীবক তক্ষশিলায় এসে পৌঁছলেন। আর কিছুটা পথ অতিক্রম করতে পারলেই, তক্ষশিলা বিদ্যালয়। দ্রুত পদে হেঁটে চললেন জীবক, বেশি দেরি হলে হয়ত আচার্যের সাথে দেখা হবে না, একটা দিন বৃথা নষ্ট হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেন জীবক। বিদ্যালয়ে তখন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পুরো দমে চলেছে। পণ্ডিত আত্রেয় যথারীতি নির্দিষ্ট কক্ষে বসে ছাত্রদের পাঠ দিচ্ছেন। ছাত্ররা মনযোগ সহকারে তাঁর আলোচনা শুনছে। জীবক ধীর পদক্ষেপে আচার্যের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ সামনে এক তরুণ যুবককে দেখে আত্রেয় কিছুক্ষণের জন্য নীরব হলেন। সমস্ত ছাত্রদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হল জীবকের ওপর। আত্রেয় চোখের ইশারায় তরুণকে কাছে ডাকলেন। আত্রেয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে জীবক তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন। তারপর তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে করজোড়ে বললেন—'গুরুদেব, আপনার ছাত্র হবার বাসনা নিয়ে বহুদূর থেকে আসছি। করুণা করে আমাকে একটা সুযোগ দিন।'

আত্রেয় মৃদু হেসে প্রত্যুত্তর করলেন—'আমার ছাত্র হতে হলে উপযুক্ত দক্ষিণা লাগে। তুমি তা দিতে পারবে ত?'

এতটুকু বিচলিত না হয়ে জীবক উত্তর দিলেন—'গুরু-দক্ষিণা না দিলে যে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, সে কথা আমার অজানা নেই। দক্ষিণা নিশ্চয় দেব।'

বিস্ময়ের সুরে আত্রেয় বললেন—'ভাল কথা, দেখি কি এনেছ?'

জীবক তখন আত্রেয়ের চরণে মাথা রেখে বললেন—'আপনার সেবায় আজ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করলাম। এই পরম আনুগত্যই আমার দক্ষিণা। আজ থেকে আমার বলতে আর

কিছু রইল না। সকল অস্তিত্বকে আপনার চরণে উৎসর্গ করে ধন্য হলাম। আপনি আপনার ইচ্ছামত আমাকে পরিচালিত করুন।'

আচার্য সস্নেহে জীবককে আলিঙ্গন করে বললেন—'তুমি ধন্য। তোমার দক্ষিণা স্বর্ণ মুদ্রার চেয়ে অনেক বেশী।'

এরপর দীর্ঘ সাত বছর কেটে গেছে। জীবক তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন। কেবল আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেই নয়, অস্ত্রোপচারেও তিনি অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর এই দক্ষতা লক্ষ করে গুরু আত্রেয় মাঝে মাঝে বিস্মিত হয়ে পড়েন। কোন জটিল ব্যাধির সন্ধান পেলেই তিনি জীবককে পাঠিয়ে তাঁর বুদ্ধি পরীক্ষা করেন। প্রতি ক্ষেত্রেই জীবক তাঁর সুদক্ষতার পরিচয় দিয়ে আত্রেয়কে বিমুগ্ধ করেন। শেষে যত দুরারোগ্য ব্যাধিই হোক না কেন, আচার্য আত্রেয় জীবকের ওপর চিকিৎসার ভার সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতেন।

কিছুকাল এইভাবে কাটল। ততদিনে জীবকের চিকিৎসা-খ্যাতি চারদিকে রাষ্ট্র হতে শুরু করেছে। একদিন আচার্য ভাবলেন, জীবকের কোন পরীক্ষাই আর বাকী নেই, কেবল একটি ছাড়া। ভেষজের গুণাগুণ সম্পর্কে জীবকের কতদূর জ্ঞান, একবার পরীক্ষা করা দরকার। এই কথা চিন্তা করে আত্রেয় একদিন জীবককে ডেকে বললেন—'তোমাকে একটা বিশেষ কাজের ভার দিতে চাই। তুমি ছাড়া এ কাজ কেউ করতে পারবে না। যা চিকিৎসার কোন কাজে লাগে না, এমন কতকগুলি লতা-পাতা আমার বিশেষ প্রয়োজন। তুমি তক্ষশিলার আশে-পাশে বন-জঙ্গলে ঘুরে দেখ, ঐ লতাপাতা পাও কি না।'

'আপনার আদেশ শিরোধার্য,' এই বলে জীবক সেদিন বিদায় নিলেন। কিন্তু আত্রেয় লক্ষ করলেন ছাত্রের চোখেমুখে তেমন কোন উৎসাহের চিহ্ন ফুটে উঠল না।

তার পরদিন থেকে গুরু-শিষ্যের প্রায়ই দেখা হয় না। জীবক আর লোকালয়ে থাকেন না। লতাপাতার খোঁজে বনে-

www.BanglaBook.org

জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। এইভাবে এক মাস কেটে গেল, গুরু আত্রেয় জীবকের খোঁজ নিলেন। জীবক যথারীতি একদিন উপস্থিত হয়ে গুরুকে প্রণাম করে জানালেন—'গুরুদেব, এখনও আমার অনুসন্ধান শেষ হয়নি। আরও কিছুদিন সময় লাগবে।'

দেখতে দেখতে দ্বিতীয় মাস কেটে গেল। গুরু সংবাদ নিয়ে জানলেন, জীবক এখনও তাঁর প্রয়োজনীয় লতাপাতার খোঁজ পাননি।

এই ভাবে ছমাস কেটে গেল, জীবককে দেখলে এখন আর চেনা যায় না। দেহখানি কঠোর পরিশ্রমে শীর্ণপ্রায়। দু'চোখের কোলে কালিমা, কিন্তু চোখ দুটো যেন আগের তুলনায় অনেক উজ্জ্বল।

এই অবস্থা নিয়ে জীবক একদিন গুরুর কাছে উপস্থিত হলেন। মাথা নিচু করে অত্যন্ত হতাশ সুরে গুরুকে জানালেন—'গুরুদেব, দীর্ঘ ছমাস ধরে কঠোর পরিশ্রম করেও এমন লতাপাতার খোঁজ পেলাম না, যা চিকিৎসার কোন না কোন কাজে লাগে না। আপনার আদেশমত যথাসাধ্য পরিশ্রম করেও আমি অকৃতকার্য হলাম। এর চেয়ে বড় দুঃখ আমার ছাত্র-জীবনে আর কিছু নেই।'

গুরু আত্রেয় এই কথা শুনে জীবককে বুকে টেনে নিয়ে বললেন—'ধন্য জীবক, সার্থক তোমার শিক্ষা। তোমার অক্ষমতাই আজ প্রমাণ করল, তুমি একজন কৃতবিদ্য চিকিৎসক। সত্যিই, তোমার জ্ঞানের তুলনা নেই। শেষ পরীক্ষায় তুমি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছ। এবার নিজের দেশে ফিরে যাও। যে বিদ্যা তুমি এতকাল ধরে অর্জন করলে, মানব জাতির কল্যাণ কাজে তা প্রয়োগ করবে। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার বিদ্যা সার্থক হোক।'

গুরুর আশীর্বাদ মাথায় করে জীবক সেদিন মগধের পথে যাত্রা করলেন।

মগধে ফিরে এসে জীবক তাঁর চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেছিলেন। চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যায় তাঁর খ্যাতি দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের নানা জায়গা থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে জীবকের বিদ্যাবত্তার কথা একদিন সম্রাট বিম্বিসারের কানে গিয়ে পৌঁছুল। সম্রাট তাঁকে ডেকে পাঠালেন। জীবক যথাসময়ে রাজসভায় উপস্থিত হলে সম্রাট তাঁকে বহুমূল্য দান সামগ্রী উপহার দিলেন। অবশেষে বিদ্যাবত্তার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসেবে জীবককে রাজবৈদ্য-প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত করে সম্মানিত করলেন। সেইদিন হতে জীবক রাজগৃহে অবস্থান করতে লাগলেন।

তখনকার দিনে রাজবৈদ্য-প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। এত বড় সম্মান সকলের ভাগ্যে জুটত না। জীবক সেই সম্মানের অধিকারী হয়ে আজীবন মানব জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

চিকিৎসা ও শল্য, এই দুই বিদ্যাতে কৃতিত্ব অর্জন করলেও গাছগাছড়ার ভেষজশক্তি নির্ধারণে জীবক ছিলেন অদ্বিতীয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সকল বিভাগে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। অসাধারণ দক্ষতা লক্ষ করেই তাঁর গুরু আত্রেয় তাঁকে 'জীবক' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। অনেকের মতে, জীবকের প্রধান খ্যাতি ছিল শিশু চিকিৎসায়। কঠিন রোগাক্রান্ত শিশুদের রোগমুক্ত করে তিনি একজন শিশু-চিকিৎসক রূপে সুখ্যাত হয়েছিলেন।

রাজবৈদ্য হলেও জীবক সাধারণ মানুষের একজন প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ তাঁর কাছে ছিল না। ধনী, দরিদ্র সকল রোগীই ছিল তাঁর কাছে সমান। বারাণসী ও উজ্জয়িনীর বহু রোগীকে তিনি নিরাময় করেন বলে পালি গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তক্ষশিলা হতে মগধের পথে শাকেত রাজ্য। ঐ রাজ্যের লোকেরা দলে দলে চিকিৎসার জন্য জীবকের কাছে ভিড় করত। জীবকের আহার নিদ্রার সময় থাকত না। দিবারাত্র রোগীর সেবা ও চিকিৎসায় তাঁর সময় কাটত। একবার সম্রাট বিম্বিসার কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে জীবক তাঁকে রোগমুক্ত করেন। উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোৎ সেন এক সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে জীবককে তিনি নিজের রাজ্যে ডেকে পাঠান। জীবক যথাসময়ে উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হয়ে অসুস্থ রাজার চিকিৎসাভার গ্রহণ করেন। রাজা প্রদ্যোৎ সেন অবশেষে জীবকের চিকিৎসায় ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করেন। একবার ভগবান বুদ্ধ কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। জীবকের সুচিকিৎসায় বুদ্ধের আমাশয় রোগ শান্ত হয়। শুধু একবার নয়, কয়েকবারই তথাগত অসুস্থ হয়ে পড়লে জীবক তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। জীবকের চিকিৎসক জীবনে এ এক পরম সৌভাগ্য।

গুরু আত্রেয়ের শেষ উপদেশ জীবনে কোন সময় ভোলেননি জীবক। আজীবন মানুষের সেবা ও চিকিৎসা করে গেছেন। মানুষের সেবা ও চিকিৎসার সুযোগকে তিনি বিদ্যা শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলে মনে করতেন। শেষ জীবনে ভগবান বুদ্ধকে পরিচর্যা করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন।

বুদ্ধদেব ছিলেন জীবকের ধর্মগুরু। শেষ জীবনে বুদ্ধের করুণা লাভ করে জীবক বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধ ধর্মকে নিজের অধ্যাত্মসাধনার প্রকৃষ্ট উপায় বলে মনে করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের কাজে জীবকের অবদান বড় কম নয়। তাই বৌদ্ধ ধর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে জীবকের নাম উল্লেখ না করলে অনেক কিছুই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

১৩৮৩

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘুড়ির কথা

দে. না. বি.

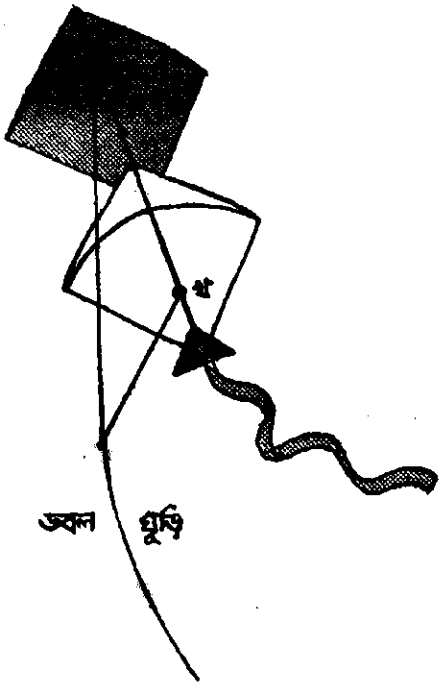

তোমাদের মধ্যে বোধহয় এমন কেউ নেই যে কখনও ঘুড়ি ওড়াওনি। ঘুড়ি ওড়াবার মত নির্মল আনন্দ ও উত্তেজনা খুব কম খেলাতেই আছে। প্যাঁচ খেলাতে প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘুড়ি 'ভো-কাট্টা' করে দেওয়া এবং কাটা ঘুড়ি 'লোটার' মত আনন্দও অন্য খেলাতে নেই। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন আকাশ ঘুড়িতে ঘুড়িতে ছেয়ে যায়। কত রং-বেরংয়ের, কত ডিজাইনের ঘুড়িই না আছে! পেট-কাটা, ময়ূর-পঙ্খী, চৌকো, ডোরাকাটা (সতরঞ্জি), চিলে—আরও কত কি! কেউ কেউ হয়ত ঘুড়িতে লেজও লাগাও। তবে তোমরা যে সব ঘুড়ি ওড়াও বা উড়তে দেখো তা সবই মূলতঃ একই রকমের। চৌকো বা ডায়মণ্ড আকৃতির কাগজের সঙ্গে দুটো বাঁশের কাঠি—একটা খাড়াভাবে (চ্যাপটা কাঠিটা) আর অন্যটা ধনুকের মত বাঁকাভাবে (যে কাঠিটা সরু ও গোল মত), আঠা দিয়ে লাগানো। এরকম ঘুড়ি ওড়াতে চাই একটা লাটাই আর কিছু সুতো। প্যাঁচ খেলার জন্য মাঞ্জা দেওয়া সুতো।—এ ছাড়া অন্য রকমের ঘুড়ি তোমরা হয়ত দেখোনি।

এখানে আরও কয়েক রকম ঘুড়ির কথা বলছি যা আমাদের বাল্যকালে আমরা দেখেছি ও কিছু কিছু উড়িয়েছি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলছি। যে ঘুড়িগুলোর কথা এখন বলবো তা পূর্ববঙ্গের পাবনা অঞ্চলেই শুধু দেখেছি (আমাদের আদি নিবাস পাবনা জেলাতে)। তার বাইরে, পশ্চিম বঙ্গের বা ভারতের অন্য কোন অঞ্চলে—আসাম, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ইত্যাদি রাজ্যের কোথাওই দেখিনি, যদিও এ সব রাজ্যের নানা জায়গায় অনেক দিন কাটিয়েছি। সব জায়গায় একই রকমের ঘুড়ি, যার কথা উপরে বলেছি, শুধু তাই দেখেছি। উপরোক্ত ঘুড়িকে পাবনা অঞ্চলে 'পতন' বলে। হিন্দীতে পতঙ্গ অর্থ ঘুড়ি। মনে হয় 'পতন', পতঙ্গ শব্দেরই অপভ্রংশ। (পাবনা অঞ্চলে ঘুড়িকে 'ঘুন্নি' বলে)।

'চিল্যা' বা 'চিলে' ঘুড়ি—'পতন' ঘুড়িতে দু'তিন হাত লম্বা লেজ লাগালেই 'চিলে' ঘুড়ি হয়। সাধারণতঃ ছোট ছেলেরা এই ঘুড়ি দিয়েই ঘুড়ি ওড়ানোর হাতেখড়ি করে। এ ঘুড়ি তৈরি করা ও ওড়ানো সহজ। লেজ থাকার জন্য এ ঘুড়ি সহজেই ভারসাম্য (balance) রাখতে পারে, তাই ছোট ছেলেদের পক্ষে এ ঘুড়ি উপযোগী। তোমরাও অনেকে এ ঘুড়ি তৈরি করেছ বা উড়িয়েছ।

'ডবল ঘুড়ি'—দুটো 'চিলে' ঘুড়িকে উপরে-নিচে একসঙ্গে করলে যা হয়, এ ঘুড়ি দেখতে সেই রকম। এতে তিনটে কাঠি লাগে। একটা খাড়া কাঠিই উপরে নীচে দুটো ঘুড়িকে যোগ করে। দুটো সরু কাঠি ধনুকের মত বাঁকা করে উপর ও নিচের ঘুড়িতে আলাদা ভাবে লাগানো হয়। নিচের ঘুড়ির তলায় লেজ থাকে। 'কল' (পাবনার স্থানীয় ভাষায় 'বুকদাড়ি') লাগানো হয় উপরের ঘুড়ির দুই কাঠির সংযোগস্থলে ও নিচের ঘুড়ির পেটের নীচের অংশে, খাড়া কাঠির সঙ্গে। (চিত্রের ক ও খ বিন্দুতে)।

'সাপা' বা 'সাপ' ঘুড়ি—এ ঘুড়ি প্রায় 'চিলে' ঘুড়ির মত, তবে উপরের দিকটা একটু গোলাকার আর নিচের দিকটা একটু লম্বাটে হয়। এর লেজ খুব লম্বা হয়। ঘুড়ির সঙ্গে লাগানো অংশ চওড়া। লেজ ক্রমশঃ সরু হয়ে শেষ হয়। এ ঘুড়ি উড়লে ডাইনে বাঁয়ে কাঁপতে থাকে; মনে হয় সাপ ফণা দোলাচ্ছে।

'কোরে' বা 'কোয়ারে' ঘুড়ি—পাকা হাত ছাড়া এ ঘুড়ি তৈরি করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। এর আসল কাজ কাঠি দিয়ে আগে খাঁচা বা ফ্রেম বানানো। এতে নানা মাপের অনেক কাঠি (বাঁশের) লাগে। ঘুড়িটা দেখতে লম্বা চতুর্ভুজ আকারের; এর উপরের দিকটার চেয়ে নিচের দিকটা একটু কম চওড়া হয়। সাধারণতঃ এ ঘুড়ি লম্বায় এক গজ মত হয়; কখনও কখনও এর চেয়ে ছোট বা বড়ও হয়ে থাকে।

এ ঘুড়ির উপরের কাঠিটা চওড়া মোটা ও বেশ মজবুত হয়। দু'পাশ আর তলার কাঠিটা চ্যাপ্টা ও পাতলা হয়। এ ছাড়া সমস্ত ফ্রেমটায় ছোট বড় অনেক পাতলা কাঠি লাগানো হয়। সে কাঠিগুলো খাড়া ও আড়াআড়িভাবে, অথবা কোণাকুণিভাবে লাগানো হয়—উদ্দেশ্য ফ্রেমটাকে মজবুত করা। দুটো মোটা, বড় কাঠি কোণাকুণিভাবে নিচের দুই কোণ থেকে লাগানো হয়, যা উপরের দিকে মাথা ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা বেরিয়ে থাকে। শিং-এর মতই বেরিয়ে থাকে বলে এই কাঠি দুটোকে 'শিং-শলা' বলে। উড়তে উড়তে বাতাসের বেগ বেড়ে গেলে বা অন্য কোনও কারণে ভারসাম্য (balance) হারালে এ ঘুড়ি শিং-শলা

www.BanglaBook.org

বাগিয়ে দ্রুত নিচে নেমে আসে। তখন সুতো ঢিলে দিতে হয় যাতে মাটিতে পড়ে গোঁত্তা না খায়।

খাঁচা বা ফ্রেম তৈরি হয়ে গেলে কাগজ দিয়ে ঘুড়ি 'ছাইতে' হয়। সাধারণ ঘুড়ি তৈরিতে ব্যবহৃত রঙীন, পাতলা কাগজ এ ঘুড়ির পক্ষে উপযোগী নয়। ফুলস্কেপ কাগজের মত একটু মোটা ও শক্ত কাগজ লাগে এ ঘুড়িতে। পুরোনো ধুতি বা শাড়ী কেটে, ইচ্ছামত রং করে চারটে লম্বা, তিনকোণা পতাকা বা নিশান-মত করে দুই শিং-শলার উপরের অংশে ঘুড়ির নিচের অংশে লাগানো হয়। উপরের নিশান দুটো একটু বেশী লম্বা। ঘুড়ি ওড়ালে এই নিশানগুলি হাত-পায়ের মত আন্দোলিত হতে থাকে। ঘুড়ির উপরের দিকের মোটা কাঠিটার সঙ্গে বেতের খুব পাতলা করে চাঁচা ছিলে লাগানো হয়। ঘুড়ি ওড়ালে ওই বেতের ধনুক থেকে 'বোঁ'—করে একটানা জোরালো শব্দ হয় যা অনেক দূর থেকে শোনা যায়। এই শব্দ হঠাৎ বেড়ে বা কমে গেলে বুঝতে হবে বাতাসের বেগ যথাক্রমে বেড়ে বা কমে যাচ্ছে এবং তখন ঘুড়ি নাবিয়ে ফেলতে হয়।

এ ঘুড়ি ছোট ছেলেদের উপযুক্ত নয়, কারণ এ ওড়াতে বেশ শারীরিক শক্তির প্রয়োজন হয়। এ ঘুড়ি ওড়াতে সুতোর বদলে ব্যবহৃত হয় শক্ত গুণ-সুতো। গুণ-সুতো গোটানো হয় বলের মত গোল আকারে। শহরে এ ঘুড়ি ওড়ানো যাবে না, কারণ বড়, ফাঁকা মাঠ চাই এর জন্যে। উড়লে এ ঘুড়ি বেশীক্ষণ হাতেও ধরে রাখা যায় না, কারণ ধরে থাকতে বেশ শক্তি লাগে। তাই এ ঘুড়ি উড়িয়ে কোন গাছের ডালে বা খুঁটিতে বেঁধে রাখতে হয়। হঠাৎ হাত থেকে ছুটে গেলে এ ঘুড়ি অনেক দূরে (৩।৪ মাইল বা তারও বেশী) গিয়ে পড়ে।

এ ঘুড়ির 'কল' বা 'বুকদড়ি' তিনটি বিন্দুতে বাঁধতে হয় —দুই শিং-শলা সংলগ্ন ফ্রেমের দুই কোণায় আর দুই শিং-শলার সংযোগস্থানে (ঘুড়ির প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়)—চিত্রে প্রদর্শিত ক, খ ও গ বিন্দুতে।

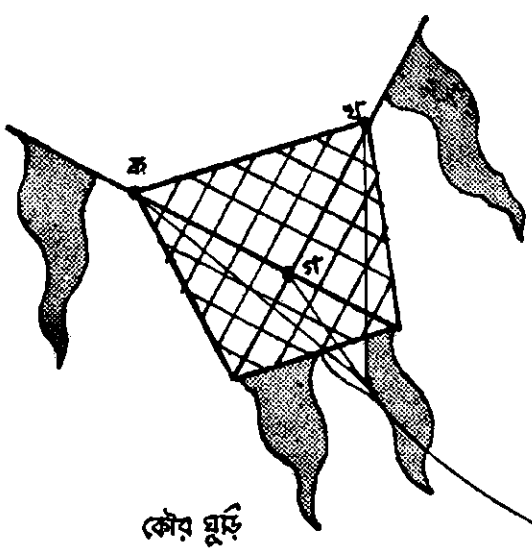

কৌর ঘুড়ি

'বজরা' ঘুড়ি—এ ঘুড়ি উপরে বর্ণিত 'কৌরে' ঘুড়িরই মত তবে সাইজে আরো অনেক বড় হয়—ঘরের দরজার সমান বা আরও বড়। পূর্ণবয়স্ক, শক্তিশালী মানুষের পক্ষেই এ ঘুড়ি ওড়ানো সম্ভব, আর বাতাসের বেগও বেশী চাই। এ ঘুড়ি ওড়াতে মোটা গুণ-সুতো (নৌকো টানার গুণ-সুতো) ব্যবহৃত হতে দেখেছি।

'ঢাউস' ঘুড়ি—এ ঘুড়ি দেখতে চিত্রের মত। এ তৈরি করতেও বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়, কারণ ঠিকমত না হলে এর ভারসাম্য (balance) রাখা যাবে না। এতে ক, খ, গ এবং ঘ চারটি কাঠি লাগে। খাড়া কাঠিটা (গ) মোটা, চ্যাপ্টা ও মজবুত হয়। ডানাতে দু'টি কাঠি (ক ও খ) থাকে। এ কাঠি দুটো সরু, গোলমত এবং বেশ লম্বা। কাঠি দুটোর দুই প্রান্ত একটু চ্যাপ্টা, যাতে ঠিকমত আকার দেওয়া যায়। তলার দিকে যে কাঠিটা ধনুকের মত বাঁকা (ঘ), সেটাও সরু, গোলমত। তলার কাঠিটার দুই প্রান্ত সুতো দিয়ে ডানার নিচের (খ) সঙ্গে টান দিয়ে বাঁধা হয়। এ ঘুড়ি তৈরিতেও প্রথমে খাঁচা বা ফ্রেমটা তৈরি করে নিয়ে তারপর কাগজ দিয়ে ছাইতে হয়। এতেও 'কৌরে' ঘুড়ির মত শক্ত কাগজ লাগে।

এ ঘুড়ি সাধারণতঃ আড়াই থেকে তিন ফুট মত লম্বা-চওড়া হয়। লম্বার চেয়ে ডানার দিকটাই একটু বেশী চওড়া হয়। এ ঘুড়ি ওড়াতেও শারীরিক শক্তির প্রয়োজন হয় আর গুণ-সুতো দিয়ে ওড়াতে হয়। এর জন্যেও চাই বড় ফাঁকা মাঠ, তাই শহরের পক্ষে এ উপযোগী নয়। খাড়া, মোটা কাঠিটার মাথার (বা ঠোঁটের) ফাঁকে সামান্য ওজন (weight) লাগাতে হয়। এ জন্য কাঠিটার মাথা আগে থেকেই একটু চিরে রাখতে হয়। ভাঙা মাটির পাত্রের টুকরো অথবা ছোট চাঁচা বেতের ছিলের ধনুক বেঁধে দিয়ে এই ওজন লাগানো হয়। বেতের ধনুক লাগালে ওড়বার সময় 'বোঁ'—করে একটানা জোরালো শব্দ হয়।

এ ঘুড়ির 'কল' লাগাতে হয় খাড়া কাঠি ও ডানার উপরের দিককার কাঠির সংযোগস্থানে আর নিচের অংশের (পেটের) মাঝামাঝি অংশে খাড়া কাঠির সঙ্গে। এ ছাড়া কলের উপরের দিক থেকে দুটো ছোট সুতো (গুণ) বাঁধতে হয় ঠোঁটের দু'-পাশে, ডানার উপরের দিকের কাঠিতে (যেখানে ফ্রেমের সুতো

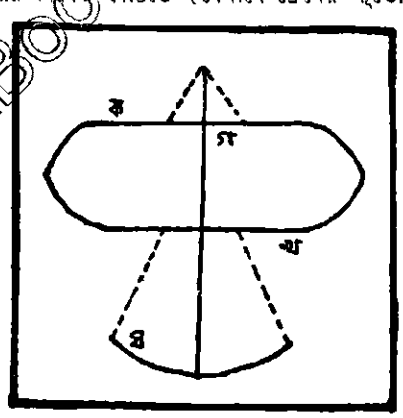

ঢাউস ঘুড়ি ১

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আছে (ঠোঁটের জন্যে)—চিত্রে প্রদর্শিত চ, ছ, দুটোতে এমন ভাবে গিঁট দিতে হয় যাতে 'কল' বরাবর উপরে নিচে ওঠানো-নামানো যায় (sliding)।

'ফেঁচকা' বা 'ফিঙে' ঘুড়ি—এ ঘুড়ি প্রায় ঢাউস ঘুড়িরই মত, তবে ডানার নিচের অংশ গোলাকার না হয়ে ফিঙে পাখীর লেজের মত দুই ভাগে বিভক্ত হয়।

এ ঘুড়িতে ডানায় দুটো আর খাড়া একটা মোট তিনটে কাঠি লাগে। খাড়া কাঠিটার নিচের দিকটা চিরে দু'ভাগ করা হয় ও সুতো দিয়ে ডানার নিচের কাঠির সঙ্গে বাঁধা হয়। প্রথমে ফ্রেম তৈরি করে নিয়ে পরে কাগজ দিয়ে ছাইতে হয়। কল লাগানো ও ওড়াবার কায়দা ঢাউসেরই মত। ট ঠ ড এবং ঢ বিন্দুতে এই ঘুড়ির 'কল' বাঁধা হয়।

উপরে বর্ণিত ঘুড়িগুলি ('বজরা' ছাড়া) কৈশোরে ওড়াবার সৌভাগ্য হয়েছে। কিছু কিছু নিজেও তৈরি করেছি। এ ছাড়া আরও কয়েক রকম ঘুড়ির নাম শুনেছি, কিন্তু সেগুলো ওড়াবার বা দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। এমন কয়েকটি ঘুড়ি হল—

"মানুষ" ঘুড়ি—এ ঘুড়ি দেখতে নাকি মানুষের মত। এর হাতে আকাশ-প্রদীপ ঝুলিয়ে দেওয়া হত।

"এরোপ্লেন" ঘুড়ি—এ ঘুড়ি দেখতে নাকি সত্যিকারের এরোপ্লেনের মত। এ ঘুড়ি তিন-তল-বিশিষ্ট (3-dimensional) হত।

"বাক্স" বা "ক্যানেস্তারা" ঘুড়ি—এ ঘুড়ি নাকি বাক্স বা ক্যানেস্তারা টিনের মত তিন-তল-বিশিষ্ট (3-dimensional) হত।

আগেই বলেছি, 'চিলে' আর 'পতন' ঘুড়ি ছোট ছেলেদের উপযোগী। তা ছাড়া শহরেও—যেখানে ফাঁকা মাঠ ও উন্মুক্ত আকাশ পাওয়া কঠিন, সেখানেও এই ঘুড়িই উপযোগী। শহরে আবার ঘুড়ির প্যাঁচ খেলাটাই বেশী জনপ্রিয়—ছোট-বড় প্রায় সকলেই ঘুড়ির প্যাঁচ খেলে। অন্যের ঘুড়ি কেটে গেলে খুব মজা লাগে। বাল্যকালে পাবনার গ্রামাঞ্চলে 'কৌরে', 'ঢাউস' ইত্যাদি ঘুড়ির প্রাধান্যই দেখেছি। ছোট ছেলেরা 'চিলে', 'পতন', 'সাপ' ইত্যাদি ঘুড়ি ওড়াতো। ঘুড়ি ওড়ানো যেন তখনকার গ্রামবাংলার সচ্ছলতা ও আনন্দের প্রতীক ছিল। ছোট, বড়, রাখাল, চাষী, শিক্ষিত, অশিক্ষিত—অনেকেই ঘুড়ি ওড়াতো। —ঘুড়ি বলতে 'কৌরে', 'ঢাউস', 'বজরা' ইত্যাদি ঘুড়ির কথাই বলছি। ঘুড়ির জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই (গ্রাম্য) ছড়াটির মধ্যে—

'ঢিল্যা করে চিল্যা-মিল্যা
কৌর‍্যা করে টান,
ঢাউস শালা উঠ্যা বলে
আরো সুত্যা আন'।

এই ছড়াটিতে বিভিন্ন ঘুড়ির বৈশিষ্ট্যও জানতে পারা যায়। 'চিলে' ঘুড়ির টানে শক্তি নাই তাই এর সুতোটা ঢিলে থাকে ; 'কৌরে' ঘুড়ির শক্তি আছে তাই এর সুতোটা বেশ টান থাকে, আর 'ঢাউস' ঘুড়ি খাড়া উপরের দিকে উঠে গিয়ে যেন বলতে চায়—আমি আরও উপরে উঠতে পারি, আমাকে আরও সুতো দাও।

এইসব ঘুড়ি ওড়ানোতে নির্মল আনন্দ ত ছিলই, সেই সঙ্গে ছিল হস্তশিল্পের ও কারিগরির নিদর্শন। গুণী ওস্তাদরাই সাধারণতঃ এসব শক্তিধর ঘুড়ি তৈরি করতো। তা ছাড়া এতে শেখবার বা জানবার বিষয়ও অনেক ছিল বা এখনও আছে। বায়ুর গতি, বেগ, আবহাওয়া, উড্ডয়ন-বিদ্যা, ঘর্ষ-তড়িৎ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কিছুই জানা যায় ঘুড়ি ওড়ানোর মাধ্যমে। কারিগরি জ্ঞানের অভাবে 'কৌরে', 'ঢাউস', 'এরোপ্লেন', 'মানুষ' ইত্যাদি ঘুড়ি এখন আর কাউকে তৈরি করতে বা ওড়াতে দেখা যায় না। এসব আজ অতীতের স্মৃতি হয়ে আছে।

১৩৮২

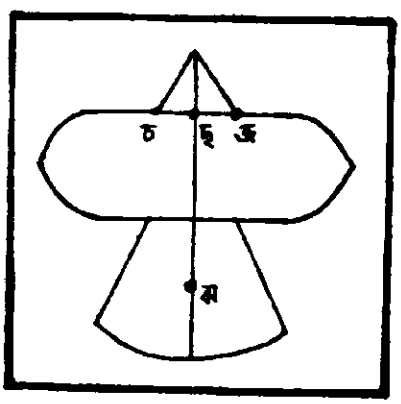

ঢাউস ঘুড়ি ২

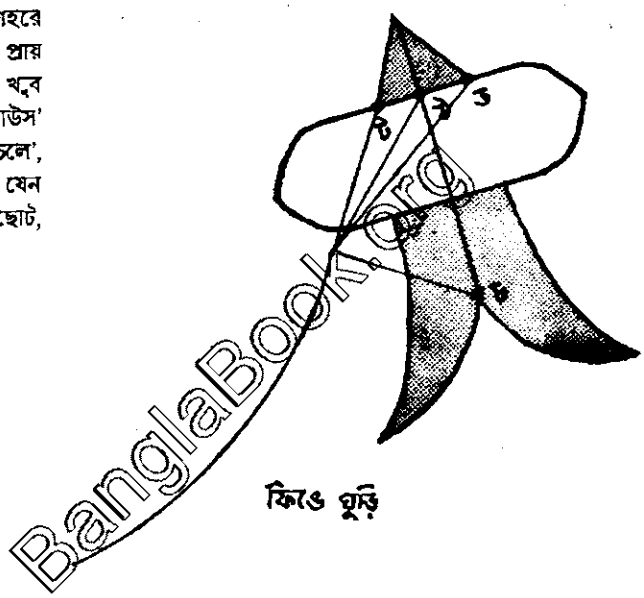

ফিঙে ঘুড়ি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

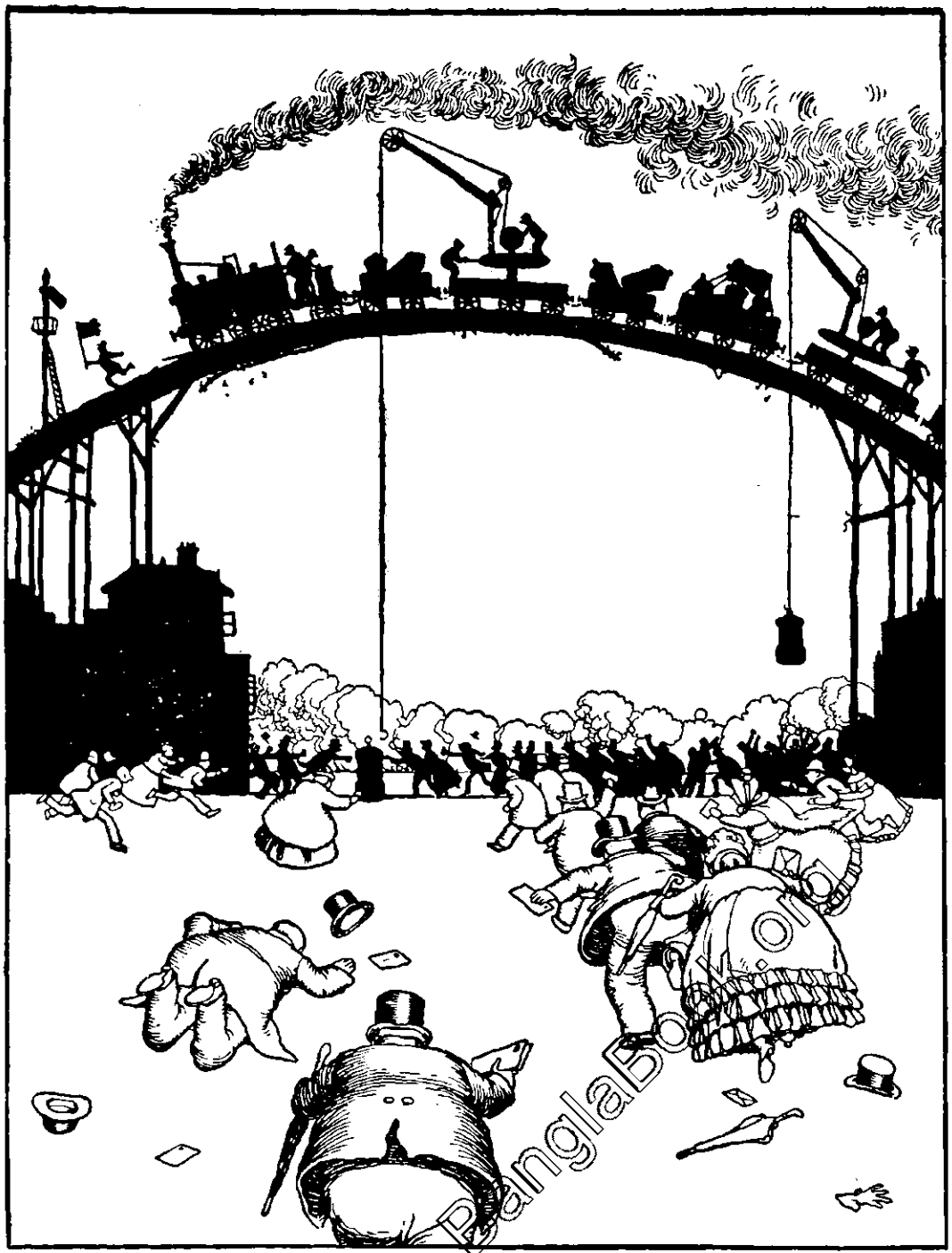

ডাক গাড়িটা হল্ট করেছে, মারছে জোরে সিটি
তাই না শুনে ছুটল সবাই ফেলতে ডাকে চিঠি।

www.BanglaBook.org

ঘরছাড়া

মঞ্জিল সেন

দিল্লি। গোটা ভারতের রাজধানী। শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। কনট প্লেসের একটা বড় দোকানের পাশে একটি বছর পনের বয়সের রোগা ছেলে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আজ সারাদিন তার খাওয়া হয়নি, ঠান্ডায় ঠক্‌ঠক্‌ করে সে কাঁপছে, ঠোঁট নীল হয়ে গেছে। কোনো কাজ তার জোটেনি, পকেটে একটি পয়সাও নেই। কারও কাছে হাত পাততেও পারেনি, তাই সে সারাদিন অভুক্ত!

এক ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে দোকানের মধ্যে ঢুকলেন। ঢোকার মুখে ছেলেটির দিকে অজান্তেই তাঁর দৃষ্টিটা পড়ে গেল। ভদ্রলোক যেন একটু ভুরু কুঁচকোলেন। মিনিট কয়েক পরেই তিনি আবার বেরিয়ে এলেন, আবার তাঁর দৃষ্টিটা পড়ল ছেলেটির উপর। ছেলেটি মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না, নির্বাক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। ভদ্রলোক কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করলেন। হাতের প্যাকেটগুলো নিয়ে রাস্তায় দাঁড় করানো গাড়ির দিকে তিনি এগিয়ে গেলেন, তারপর গাড়ির দরজা খুলতে গিয়ে কি ভেবে তিনি আবার ফিরে তাকালেন। ছেলেটি তাঁর দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। তিনি ঠোঁট কামড়ালেন, তারপর হঠাৎই ফিরে এসে ছেলেটির সামনে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি বাঙালী?' ছেলেটি মৃদু ঘাড় নাড়ল।

'তোমার নাম কি?'

'তপন।'

'পদবী?'

'মজুমদার।'

'কোথায় থাক তুমি?'

ছেলেটি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করলেন, 'তোমার বাড়ি কোথায়? বাড়ি নেই?'

'না।'

'বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ?'

ছেলেটি বলল যে তার কেউ নেই। ভদ্রলোকের মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'তোমার বাবার নাম কি?'

'শিবনাথ মজুমদার।'

'তোমাদের কোথায় বাড়ি ছিল বল ত?'

এবার ছেলেটি সঠিক জবাব দিল। ভদ্রলোক যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে।'

গাড়ির দরজা খুলে তিনি ড্রাইভারের আসনে বসলেন, ছেলেটিকে পাশের সীটে বসালেন। গাড়ি চালাতে চালাতে তিনি সব কিছু জানতে চাইলেন। ছেলেটি বলে চলল তার আশ্চর্য কাহিনী...

বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে, কত আদরের সন্তান, কিন্তু কি থেকে কি হয়ে গেল! বাবা শিবনাথ ছিলেন কৃতী অধ্যাপক, ছাত্রদের তিনি ছিলেন আদর্শ গুরু, বজ্রের মত কঠোর, কুসুমের মত কোমল। কত দুঃস্থ ছাত্র যে তাঁর দয়ায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে তার হিসেব নেই। অধ্যাপনা ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান, অর্থের মোহ কোনদিনই তাঁকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। এ হেন দেবতুল্য মানুষও একদিন হিংসার বলি হলেন। গোটা শহর এই ঘটনায় শিউরে উঠল, ছি ছি করল, কিন্তু যিনি গেলেন তিনি আর ফিরলেন না, যাদের গেল তারা অনাথ হল।

মা এই নিদারুণ শোক সহ্য করতে পারলেন না। এই ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনিও তাকে ফাঁকি দিয়ে পরপারে চলে গেলেন। মাত্র পনের বছর বয়সে বাপ-মা হারিয়ে এই বিশ্বসংসারে সে একেবারে একা হয়ে গেল। হিতৈষীদের সান্ত্বনা, সহানুভূতির অভাব ছিল না, কিন্তু তাতে ত আর পেট ভরে না। অগত্যা তাকে মামাবাড়ি আশ্রয় নিতে হল। মামাবাবু ভাল মানুষ কিন্তু মামীমার ভয়ে জুজু। নিজেদেরই কায়ক্লেশে দিন চলে, তার ওপর আবার আর একজন বাড়তি লোক এসে পড়ায় মামীমা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে তপন দিশেহারা হয়ে পড়ল। এ কোথায় সে এল! দেবতুল্য পিতার স্নেহচ্ছায়া, মায়ের গভীর মমতা, আর এ সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ। মামা ভাল মানুষ, মামীমার মুখের ওপর কথা বলতে সাহস করেন না, এক কথার মামীমা দশ কথা শুনিয়ে দেন। মামীমার কাছে একদিন গাল-মন্দ খাবার পর তপন যখন বিমর্ষ মুখে ঘরে আসছিল তখন অন্ধকার ঘরে মামাকে সে হাপুস নয়নে কাঁদতে দেখেছে। ভাগ্নের লাঞ্ছনায় তিনি নীরবে কেঁদে যেন তাঁর মন হালকা করতে চাইছেন। নিজের অসহায় অবস্থার মধ্যেও তপন মামাবাবুর জন্য একটা করুণা অনুভব না করে পারেনি। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, মামীমার দুর্ব্যবহার যেন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে চলল। শেষ পর্যন্ত একদিন একবস্ত্রে সে মামাবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। হাতে সামান্য কয়টি টাকা নিয়ে সে পশ্চিমের গাড়িতে চেপে বসল, কপালে যা আছে তাই হবে।

থার্ড ক্লাস গাড়ি, তিল ধারণের জায়গা নেই। তখন কোনোমতে কোলের কাছে একটা পুঁটলি নিয়ে এক কোনে জড়োসড়ো হয়ে বসেছে। ট্রেন যেন ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে, বাইরে নিঃসীম অন্ধকার। অন্ধকারের দিকে তপন স্তব্ধভাবে তাকিয়ে আছে, তার ভবিষ্যৎ যেন বাইরের অন্ধকারের চাইতেও গাঢ়তর। পাশ দিয়ে একটা পূর্বগামী ট্রেন সশব্দে বেরিয়ে গেল। তপন জানালা থেকে মুখ ঘুরিয়ে কামরার দিকে ফিরিয়ে দেখল তার

www.BanglaBook.org

বিপরীত বেঞ্চিতে বসা মাথায় পাগড়ি অবাঙালী একটি লোক তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। লোকটি মৃদু হেসে তাকে জিগ্যেস করল, 'কুথায় যাবেন খোকাবাবু?'

ভূগোলে পড়া পশ্চিমের একটা জায়গার নাম টপ্ করে তপনের মনে এল, সে তাই বলল। লোকটি জিগ্যেস করল সেখানে তার কে আছে। তপন জবাবে বলল যে তার কেউ নেই। লোকটি এবার যেন একটু সন্দিগ্ধ।

'বাড়ি ছোড়কে চলে এসেছ নাকি খোকাবাবু?'

তপন ম্লান হেসে উত্তর দিল যে তার বাড়িই নেই ত বাড়ি ছেড়ে আসবে কি! লোকটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার সব কিছু জেনে নিল। তারপর সখেদে বলল, 'কি আফশোষের কথা, এই বচপন বয়সে তোমাকে অজানার পথে পাড়ি দিতে হয়েছে, মাথার উপর কেউ নেই!' একটু যেন ইতস্তত করে সে বলল তপন যদি তাঁর সঙ্গে বেনারস যায় তবে তার একটা হিল্লে সে হয়ত করতে পারবে। তপনের মন এই প্রস্তাবে আনন্দে নেচে উঠল। তার অবস্থা ডুবতে থাকা লোকের মত, খড়কুটো পেলেও সে আঁকড়ে ধরে। লোকটি তার কেউ নয়, এমন কি অল্প কিছুক্ষণ আগেও তাকে সে চিনত না, অথচ এই বিদেশী লোকটিই তার দুঃখভরা জীবনের কাহিনী শুনে অভিভূত হয়ে তাকে সাহায্য করতে চাইছে। ভগবানকে সে মনে মনে ধন্যবাদ জানালো।

কাশী। হিন্দুদের প্রাচীন তীর্থস্থান। বরুণা আর অসী এই দুই নদীর মাঝখানে বলে এর আর এক নাম বারাণসী। স্টেশন থেকে টাঙ্গায় চেপে যেতে যেতে তপন অবাক বিস্ময়ে শহরের দৃশ্য দেখছে। বিশ্বনাথের মন্দির, দশাশ্বমেধ ঘাট—এসবের কথা সে কলকাতায় থাকতে শুনেছে, কিন্তু কোনোদিন নিজের চোখে দেখেনি। এবারে দেখবার সুযোগ হবে।

টাঙ্গা একটা সরু গলির মুখে থামল, তপনের হিতৈষী লোকটি তাকে নিয়ে টাঙ্গা থেকে নেমে পড়ল। পুরনো মহল্লা, বাড়িগুলিও অতি প্রাচীন। একটা বাড়ির তলায় নোংরা একটা হোটেল, তার ওপরেই লোকটি থাকে। একটি মাত্র ঘর। তপনের মন খুঁতখুঁত করতে থাকে। এই পরিবেশে যার বাস তার অবস্থা নিশ্চয় সচ্ছল নয়, সে আবার অপরের কি উপকার করবে! লোকটি বোধ হয় তার মনের ভাব বুঝল, মুচকি হেসে বলল, 'ডরো মৎ খোকাবাবু, হাম সব কুছ ঠিক করিয়ে দিবে। হামার জান পছান দো চার রঈস আদমী আছে, হামি তুমাকে উনসে ভেট করিয়ে দিবে।' তপন কিছু বলল না, দেখাই যাক না কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া তার অবস্থা 'সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়!' ঠিক তেমন। লোকটি তাকে একা কোথাও যেতে নিষেধ করল। অচেনা জায়গায় পথ হারাবার ভয় ত আছেই, তা ছাড়া আছে গুন্ডা প্রকৃতির লোকের পাল্লায় পড়ার সম্ভাবনা। কাশীর গুন্ডারা নাকি সাংঘাতিক, নতুন মুখ দেখলেই ছিনে জোঁকের মত পেছনে লাগে।

এই ভাবে দু'দিন কেটে গেল। লোকটি সকালে বেরিয়ে যায়, আসে দুপুরে খাবার সময়। খেয়েদেয়ে এক ঘুমে বিকেল পার করে আবার বেরোয়, ফেরে অনেক রাত্রে। নিচের হোটেলেই তপনের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। তৃতীয় দিন তপন আর ধৈর্য রাখতে পারল না, লোকটিকে স্পষ্টই জিজ্ঞেস করল তার মতলব কি? তাকে এমন করে আর কতদিন বন্দীজীবন কাটাতে হবে? লোকটি উত্তরে বলল যে সে দু-একজনের সঙ্গে ইতিমধ্যেই তপনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে, আর দিন দুই সবুর করলেই ওর একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

সেদিন দুপুরে নিচে গিয়ে খাবার সময় হঠাৎ তপনের মনে হল কেউ যেন একদৃষ্টে তাকে লক্ষ করছে। মুখ তুলতেই একজনের সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল; লোকটা চট্ করে মুখ ফিরিয়ে নিলে। তপন লক্ষ করে দেখল লোকটার চেহারা ও বেশভূষা দুষমনের মত। লোকটা তাকে অমন করে দেখছিল কেন? একটা নিদারুণ অস্বস্তিতে তার মন ভরে গেল। খাওয়া শেষ হতেই সে ওপরে চলে এল।

ঘরে এসে জানলার সামনে দাঁড়াতেই তার চোখে পড়ল দুষমনের মত লোকটি হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে রাস্তায় নামল। তপন তাড়াতাড়ি নিজেকে আড়াল করে লোকটা কি করে দেখতে লাগল। লোকটি সামনের এক পানের দোকান থেকে এক খিলি পান কিনল, আর ঠিক সেই সময় তপনের আশ্রয়দাতা কোথা থেকে এসে ওর পাশে দাঁড়াল। দুজনে নিচু গলায় কি সব কথাবার্তা বলতে লাগল। তপনের বুকটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল, ওদের মতলব যে ভাল নয়, তা বুঝতে তার দেরি হল না। সে যে দুষ্টু লোকের পাল্লায় পড়েছে সে বিষয়ে তার আর সন্দেহ রইল না। তার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে দরদ দেখাবার ভান করে আশ্রয়দাতা লোকটি তাকে এখানে এনে তুলেছে। আসলে ওর মতলব খারাপ, নইলে একটা গুন্ডা গোছের লোকের সঙ্গে অমন ফিসফিসই বা করবে কেন আর ওই লোকটিই বা তাকে অমন করে দেখছিল কেন? ভগবান তপনের সব কিছু কেড়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু দুটি জিনিস তাকে দিয়েছিলেন, সে দুটি হল বুদ্ধি আর সাহস; তাই এই ঘোর বিপদেও সে মাথা ঠান্ডা করে ভাবতে লাগল কি ভাবে এই সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

খানিক বাদেই তপনের আশ্রয়দাতা ফিরে এল। সোৎসাহে সে বলল একটা সুখবর আছে, তপনের একটা খুব ভাল ব্যবস্থা সে করে ফেলেছে। একজন দয়ালু পয়সাওয়ালা লোকের কাছে সে তপনের দুঃখের কাহিনী খুলে বলেছিল, তিনি সব শুনে মনে খুব ব্যথা পেয়েছেন, তপনকে আজ রাত্রেই তাঁর বাড়ি নিয়ে যেতে বলেছেন। তিনি ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবেন। আশ্রয়দাতার কথায় তপন চিন্তাগ্রস্ত হল, তবে কি যে লোকটি এসেছিল সে দয়ালু ব্যক্তির মাইনে-করা কোনো লোক? কিন্তু তাই যদি হয় তবে অমন গোপনীয়তার কি প্রয়োজন ছিল?

সেদিন আর তার সঙ্গী ঘর ছেড়ে বেরুল না। রাত প্রায় দশটায় তাদের দরজায় মৃদু করাঘাত হল। তপনের আশ্রয়দাতা যেন এতক্ষণ এরই প্রতীক্ষায় ছিল। এক লাফ মেরে উঠে সে দরজা খুলে দিল। সেই দুষমনের মত লোকটি ঘরে ঢুকে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল। দুজনের মধ্যে ওদের ভাষায় কিসব কথাবার্তা হল। তপন আড়চোখে লক্ষ করল আগন্তুকের পকেট থেকে একতাড়া নোট চোখের নিমেষে তার আশ্রয়দাতার পকেটে চালান হয়ে গেল। তপনের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল, লোকটি তাকে বিক্রী করে দিল নাকি! এ যুগে তাও কি সম্ভব! আশ্রয়দাতার কণ্ঠস্বরে তার চমক ভাঙল। সে তাকে বলল আগন্তুক তার খুব পেয়ারের লোক, যে বড়লোকের কথা আগে সে বলেছিল তাঁর অধীনেই কাজ করে। তপনকে নিয়ে যেতে তার মনিব তাকে পাঠিয়েছে, কোনো ভয় নেই। আগন্তুক তপনকে তাকে অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করল। তপন বুঝল সে

www.BanglaBook.org

এক গভীর ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়েছে, এখন আর পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে সে লোকটির পেছন নিল।

বাইরে একটা টাঙ্গা অপেক্ষা করছিল। নির্জন রাস্তা দিয়ে টাঙ্গা ছুটে চলল। পথঘাট কিছুই তপনের জানা নেই, কোথায় যে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কে জানে! টাঙ্গা কিছুটা যেতেই আরও একজন লোক টাঙ্গায় উঠে তার পাশে বসল। তপন মনে মনে মতলব আঁটছিল সামান্য সুযোগ পেলেই সে টাঙ্গা থেকে লাফ মেরে এক ছুটে কোনো গলির মধ্যে লুকিয়ে পড়বে, কিন্তু সে আশা ত্যাগ করতে হ'ল তাকে।

টাঙ্গা এপথ ওপথ, এ গলি ও গলি অতিক্রম করে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াল। একটা পানের দোকানের সামনে জনাকয়েক লোক জটলা করছিল, তারা মুখ তুলে একবার তাদের দেখে নিয়েই আবার কথাবার্তায় মেতে উঠল। লোকগুলির চেহারা ও বেশভূষা মোটেই ভাল নয়। যে লোকটি তপনকে নিয়ে এসেছিল তার নাম হরদয়াল। সে টাঙ্গা থেকে নেমে বাড়ির সদর দরজায় তিনবার করাঘাত করল। দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে গেল। সেই ফাঁক দিয়েই তপনকে নিয়ে হরদয়াল বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল। দ্বিতীয় লোকটি টাঙ্গা থামার সঙ্গে সঙ্গেই কোথায় যেন অদৃশ্য হয়েছিল।

একটা খুপরির মত ঘরে ওকে ঢুকিয়ে হরদয়াল একটা নোংরা বিছানা দেখিয়ে ওকে শুয়ে পড়তে বলল, তারপর বেরিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তপন বুঝল যে সে বন্দী। নিজের মন্দ ভাগ্যের কথা মনে করে তার চোখে জল এল। বাবা-মার কথা তার মনে পড়তে লাগল। তাঁরা কি স্বর্গ থেকে তার এই দুর্গতি দেখছেন না!

কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা সে নিজেও জানে না, ঘুম ভাঙ্গল একজনের ধাক্কায়। ধড়মড় করে সে উঠে বসল। দুচোখ কচলে সে অবাক হয়ে দেখল তার সমবয়সী এবং বয়সে বড় কতগুলি ছেলে তার দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে আছে। তপন লক্ষ করে দেখল ছেলেগুলি নানা প্রদেশের, বাঙ্গালীও আছে। তাকে উঠে বসতে দেখে একটি ছেলে মন্তব্য করল, 'লবাবপুত্তুরের ঘুম ভেঙ্গেছে', বাকি সব হো হো করে হেসে উঠল। একজন তার হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে বলল, 'নিচে চল্, সরদার তোকে সেলাম দিয়েছে।' সবাই আবার হেসে উঠল।

তপন যন্ত্রচালিতের মত তাদের পেছন পেছন চলল। একটা ঘরে হরদয়াল আর অন্য একজন লোক বসে ছিল। দ্বিতীয় লোকটিকে দেখে তপন শিউরে উঠল। বিশাল চেহারা, ডান দিকের গালে একটা পোড়া দাগ কুৎসিত মুখটাকে ভয়াবহ করে তুলেছে। কুৎকুতে চোখ দুটিতে যেন সাপের দৃষ্টি। তপনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে লোকটি কয়েকবার ঘাড় দোলাল। তারপর বলল, 'এই বাচ্চে, তোর নাম কি আছে?' তপন ভয়ে ভয়ে তার নাম বলল। লোকটি বলল, 'যা তাকে শিখানো যাবে, চুপচাপ শিখে লিবি। বদমাসি করবি ত তোর হাড় গুঁড়ো করিয়ে দিব, সমঝা?' তপন কোনো মতে ঘাড় হেলিয়ে জানাল যে সে বুঝেছে। কি কর্কশ লোকটার কণ্ঠস্বর! আরও দু-চারটে কথার পর সরদার চলে গেল। হরদয়াল যেমন করে তার পেছনে পেছনে ছুটল তাতে তপনের বুঝতে বাকি রইল না যে, সরদারকে সে রীতিমত সমীহ করে চলে।

সকাল বেলাই ছেলেরা বেরিয়ে যায়, ফেরে সেই রাত্রে। এরই মধ্যে একটি বাঙ্গালী ছেলের সঙ্গে তপনের আলাপ হল। ওই ছেলেটির ওপরই তপনের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। তপন ওর মুখেই শুনল এটা হল সরদারের একটা ট্রেনিং সেন্টার। আরও এমন কয়েকটা সেন্টার শহরে ছড়িয়ে আছে। কিসের ট্রেনিং! চুরি, পকেটমার, এইসব। নানান জায়গা থেকে ছেলেদের ধরে এখানে আনা হয়, তার জন্যে সরদারের লোক সারাদেশে ছড়িয়ে আছে। অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনাথ ছেলেরাই এদের শিকার হয়। এখানে তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রত্যেক রাজ্যেই এ ধরনের কারবারীদের সঙ্গে

www.BanglaBook.org

এদের যোগ আছে, একটা আন্তরাজ্য চক্র গড়ে উঠেছে। নিষ্ঠুর, নির্দয় এরা, দয়ামায়া এদের কুষ্ঠিতে লেখা নেই।

ছেলেটির নাম বল্কু। তপনের সুন্দর মুখ, কোঁকড়ানো চুল আর টানা টানা চোখ দুটি দেখে ওর কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল। তপনের ইতিহাস শুনে সে বলেছিল, 'আমাদের অদিষ্টই এই, নইলে তোর মত ভাল ছেলে এসে পড়ে!' বল্কুর মা মারা যাবার পর বাবা আবার বিয়ে করেছিলেন। সৎমার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সে বাড়ি থেকে পালায়। তারপর ঘুরতে ঘুরতে এদের খপ্পরে এসে পড়েছে। এখান থেকে পালাবার কথা আর সে ভাবে না, পালিয়ে যাবেই বা কোথায় আর করবেই বা কি? তা ছাড়া এদের চোখে ধুলো দিয়ে পালানো সহজ কথা নয়। প্রত্যেকের ওপর ওদের তীক্ষ্ণ নজর, এমন কি যখন ওরা কাজে বেরোয় তখনও ওদের পেছনে ফেউ থাকে। দু-একজন পালাবার চেষ্টা করেছিল, ধরা পড়লে তাদের পিটিয়ে আধমরা করা হয়েছিল।

তপনের শিক্ষা শুরু হল। দু' আঙ্গুল দিয়ে কেমন ক্ষিপ্র ও নিপুণ ভাবে পকেট সাফ করে দেওয়া যায় তাই হল প্রথম পাঠ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কঠিন অভ্যাসের পর, তবে সাফাইয়ের কাজ রপ্ত হয়। দ্বিতীয় পাঠ হল পকেট কাটা। স্টিলের ছোট্ট অথচ শক্ত একটা সরু তারের মত জিনিস, ইঞ্চি আড়াই লম্বা, তার মাথায় আধখানা চাঁদের মত একটা পাতলা স্টিলের পাত —এক ইঞ্চি চওড়া সওয়া ইঞ্চি লম্বা, ওপরটাতে নতুন ব্লেডের মত ধার, আস্তে একবার বুলিয়ে দিলেই সার্ট বা প্যান্টের সেলাই কেটে যায়। সবটুকুই কিন্তু হাতের মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায়। ওটা জামার পেকেটের তলার দিকে একবার বুলিয়ে দিলেই তলাটা কেটে ফাঁক হয়ে যায় আর পকেটমাররা চট্ করে হাতটা পকেটের তলায় মেলে ধরে যাতে পকেটের টাকা-পয়সা তাদের হাতে পড়ে। চোখের নিমেষে ব্যাপারটা ঘটে যায়, নিপুণ ওদের হাতের কাজ। শিকার টেরও পায় না তার কি সর্বনাশ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে অবশ্য ওরা ধরা পড়ে। লোকের হাতে বেদম মার খায়, জেল খাটে, ফিরে এসে আবার ওই পেশাই ধরে। ধরা না পড়লেও পালা করে ওরা জেল খেটে আসে কিংবা ইচ্ছে করেই ধরা দেয়, তাই নাকি নিয়ম। পুলিশ ওদের জানে তাই এই ব্যবস্থা। পুলিশের সঙ্গে নাকি ওদের আরও অনেক ব্যবস্থা আছে, সে এক বিচিত্র ইতিহাস।

মার খাওয়াটাও ওদের শিক্ষার একটা অঙ্গ। তপনের নরম শরীর কিল, চড়, লাথি খেয়ে ব্যথায় নীল হয়ে যেত। রাত্রে ময়লা বিছানায় শুয়ে ও কাঁদত, ভাগ্যবিড়ম্বনায় কোন জগতে সে এসে পড়েছে! মা-বাবা বেঁচে থাকলে আজ কি আর এই অবস্থা হয়!

ক্রমে তপনের হাতেখড়ি শেষ হল, এবার অন্য ছেলেদের সঙ্গে ওকেও বেরুতে হবে। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথা সে জীবনে ভুলবে না। হরদয়াল তার কপালে পুজোর ফুল ঠেকিয়ে কতগুলি উপদেশ দিল। বউনিটা ভাল হওয়া চাই নতুবা তার কপালে দুঃখ আছে এ কথা জানাতেও ভুলল না। বেইমানী করে সে পার পাবে না, শহরের সর্বত্র তাদের লোক ছড়িয়ে আছে, তার গতিবিধির ওপর তারা কড়া নজর রাখবে। একটু বেচাল দেখলেই তাকে খুন করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে। কেউ জানতেও পারবে না। আরও একটা কথা হরদয়াল বলল। পুলিশের সঙ্গে তাদের রফা আছে সুতরাং ওখানে গিয়ে কোনো সুরাহা হবে, এ চিন্তাকে তপন যেন মনে ঠাঁই না দেয়।

একটা প্রচণ্ড ভয় নিয়ে তপন বল্কুর সঙ্গে বেরুল। বল্কু তার মনের অবস্থা বুঝেছিল। এই সুন্দর, ভদ্র চেহারার ছেলেটার ওপর তার কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল। তপন যে তাদের শ্রেণীর ছেলে নয় এটা সে সব সময় অনুভব করত কিন্তু তার কিছু করার ছিল না। তবু যতটা পারত তপনকে সে আগলে আগলে চলত।

বল্কু বলল, 'ভয় করিসনে তপন, ঘাবড়ে গেলে বিপদে পড়ে যাবি, মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করে যা, দেখবি আপনা থেকেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ওদের দলের ছেলেরা ছড়িয়ে পড়েছিল। একটা জায়গায় একজন লোক বাঁদর নাচ দেখাচ্ছে, তাকে ঘিরে বেশ কিছু উৎসুক দর্শক দাঁড়িয়ে আছে। ওরা গিয়ে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াল। বল্কুর অভিজ্ঞ চোখ দুটো দর্শকদের ওপর দৃষ্টি বুলোতে লাগল। হঠাৎ সে তপনকে কনুই দিয়ে মৃদু ঠেলা মেরে চোখের ইঙ্গিতে একজন লোককে দেখিয়ে দিল। লোকটির পোশাক দেখে মনে হয় পকেটে কিছু টাকাপয়সা আছে। শিকার চিনে নিতে ওদের ভুল হয় না।

তপনের বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফাতে শুরু করল, একটা ভীষণ ভয় তাকে পেয়ে বসল। কিন্তু পেছোবার উপায় নেই, হরদয়াল তাকে মেরে শেষ করে দেবে। কতগুলি চেনা মুখও তার চোখে পড়ল। প্রথম দিন তার ওপর লক্ষ রাখার জন্য হরদয়াল তাদের পাঠিয়েছে, এটা বুঝতে তার কষ্ট হল না। সে এক পা দু'পা করে এগুল। লোকটির প্যান্টের হিপ্ পকেটে ব্লেড টানবার সময় তার হাতটা ভীষণ কেঁপে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে লোকটি পেছন ফিরে খপ্ করে তার হাতটা চেপে ধরল। ব্যাপারটা যেন চোখের নিমেষে ঘটে গেল। ধরা পড়ে তপনের মুখ শুকিয়ে গেল, দু'চোখ জলে ভরে গেল, কাতর দৃষ্টিতে সে ঐ লোকটির দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটি তাকে রূঢ় কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল, যে হাতটা তপনকে আঘাত করার জন্য শূন্যে উঠেছিল সেটা সেখানেই থমকে রইল। তপনের মুখের দিকে তাকিয়ে লোকটি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেল; সরল, নিষ্পাপ এমন একটি মুখ, সুশ্রী চেহারা, সে কিনা পকেটমার! ঠিক যেন বিশ্বাস হয় না। ছেলেটি তার দিকে জলভরা চোখে তাকিয়ে আছে, দু'চোখে যেন আকুল মিনতি। লোকটি কিছুতেই মনস্থির করতে পারে না।

ইতিমধ্যে তাদের ঘিরে দু-চারজন করে লোক জমতে শুরু করেছে। হাতেনাতে পকেটমার ধরা পড়েছে, উৎসুক জনতার হাত নিশপিশ করছে। ঠিক এই সময় কয়েকজন ছেলে তাদের ঘিরে ধরল। তপন তাকিয়ে দেখল তাদের মধ্যে বল্কুও রয়েছে, দলেরই ছেলে সব।

'শালা পকেটমার', আর দ্বিতীয় কথা না বলে তারা তপনের ওপর কিল চড় শুরু করে দিল। লোকটির হাত থেকে তপনকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়েই তারা মারতে মারতে এগিয়ে চলল একটা গলির মুখে। গলির মধ্যে ওকে ঠেলে ঢুকিয়ে একজন কানে কানে বলল, 'গলিসে নিকাল যা।' গলির অন্য মাথা গিয়ে পড়েছে আর এক গলিতে। কাশীর অলিগলি বিখ্যাত। সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে গেছে, যেন গোলকধাঁধা। তপন ছুটে চলল। তার চোখমুখ ফুলে গেছে, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে।

www.BanglaBook.org

সন্ধ্যেবেলা তপনের ডাক পড়ল হরদয়ালের ঘরে। ওর বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল, কপালে আজ দুঃখ আছে। ঘরে ঢুকে সে চমকে উঠল, সর্দার বসে আছে, তার হিংস্র মুখটা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। হরদয়ালের হাতে একটা চাবুক। সে বলল, 'ক্যা সমঝা ? তু বৈঠকে বৈঠকে খানা খায়গা ?' তারপরই সে এলোপাথাড়ি চাবুক চালাতে লাগল। সপাং সপাং শব্দ তুলে সাপের ছোবলের মত চাবুকটা তার সর্বাঙ্গে আছড়ে পড়তে লাগল। যন্ত্রণায় সে কুঁকড়ে উঠল, ছটফট করতে করতে একসময় জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ল লুটিয়ে।

যখন তার জ্ঞান হল তখন সে বিছানায় শুয়ে আছে, সমস্ত শরীরে অসহ্য ব্যথা, জ্বরে গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। কয়েকদিন ভুগে তপন আবার খাড়া হয়ে দাঁড়াল। এই কয়দিন বঙ্কুই তার দেখাশুনা করেছে ; ওষুধ খাইয়েছে, চাবুকের ক্ষতে মলম লাগিয়েছে। সুস্থ হতেই তপনকে আবার বেরুতে হল। হরদয়ালের চাবুকের ভয়েই হোক কিংবা অন্য যে কারণেই হোক, দ্বিতীয়বার আর তার হাত কাঁপল না। প্রথম রোজগার হরদয়ালের হাতে তুলে দিতেই খুশি হয়ে উঠল তার মুখ। তপনের কাঁধ চাপড়ে বলল, 'সাবাস, আভি তু পাশ হো গয়া।' তারপরই সে এক কাণ্ড করল। তপনের জামাকাপড় এমন কি শরীর পর্যন্ত তল্লাস করে দেখল টাকাপয়সা সে কিছু সরিয়েছে কিনা। যখন সে নিশ্চিন্ত হল যে তপন কিছু সরায়নি তখন যে মনিব্যাগটা তপন তার হাতে তুলে দিয়েছিল তার থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট তুলে নিয়ে, সে তপনকে বকশিশ দিল। ব্যাগের মধ্যে দশ পাঁচ মিলিয়ে মোটা টাকাই ছিল।

ক্রমে তপন ওদের একজন হয়ে গেল। ঘড়ির কাঁটার মত ওদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে, ফেরে রাত্রিবেলা। সারাদিনের রোজগার হরদয়ালের হাতে দিয়ে কোনমতে নাকেমুখে কিছু গুঁজে ক্লান্ত শরীরটাকে বিছানায় এলিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই চোখে গাঢ় ঘুম নেমে আসে। রোজগারের একটা সামান্য অংশ ওদের ভাগে পড়ে, কেউ তা থেকে কিছু সরাবার চেষ্টা করলে যদি ধরা পড়ে যায়, তবে তার কপালে জোটে প্রচণ্ড প্রহার। তপনের মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে ওঠে, এই পঙ্কিল জীবন থেকে সে মুক্তি পেতে চায়, কিন্তু চারদিকে যেন সদা সতর্ক প্রহরীরা তাকে ঘিরে আছে।

একবার সে পালাবার চেষ্টা করেছিল। সেদিন কাজে বেরুবার পর ভিড় থেকে আস্তে আস্তে সরে একটু নির্জন রাস্তায় পড়ে জোরে হাঁটতে শুরু করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল কোন ভদ্র পরিবারে গিয়ে আশ্রয় চাওয়া। হঠাৎ পেছন থেকে কাঁধের ওপর একটা থাবা পড়ল। চমকে পিছন ফিরে একটা নিদারুণ হতাশায় তার মন ভরে গেল। এক চোখ কানা কাল্লু তার দিকে তাকিয়ে আছে, তার বসন্তে ক্ষত বিক্ষত কুৎসিত মুখে সন্দেহের ছায়া।

'কি মোতলব ?' কাল্লু জিজ্ঞেস করল।

প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মসংযম করে তপন বলেছিল, 'নতুন রাস্তায় শিকার খুঁজছি।' কাল্লু কি বুঝল কে জানে, দূর থেকে তার পেছনে জোঁকের মত লেগে রইল। সেদিন রাত্রে হরদয়ালও চোখ দুটো কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে ছিল, যেন তার মনের অন্তস্তলে ঢুকে তার ইচ্ছেটাকে জানবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তাই বলে তপন হাল ছেড়ে দেয়নি। এই ভাবে পশুর মত সারাটা জীবন সে কাটাবে না, যেমন করেই হোক এই জঘন্য পরিবেশ থেকে পালাবে।

হরদয়ালের মনে তার ওপর যাতে বিশ্বাস জন্মায় তার জন্য সে নানারকম ফন্দি-ফিকির বার করতে লাগল। ফল ফলতে বেশি দেরি লাগল না। তার উপার্জিত অর্থের সবটাই সে হরদয়ালের হাতে তুলে দিত, একটা কানাকড়িও লুকিয়ে রাখত না। প্রায়ই বাড়ি ফেরার পর তাদের দেহ তল্লাস করা হত, অনেকের কাছেই লুকনো জায়গা থেকে সরানো টাকাপয়সা পাওয়া যেত, কিন্তু তপন কোনোদিন সে চেষ্টা করেনি। তার সততার ওপর হরদয়ালের আস্তে আস্তে আস্থা জন্মে গেল। তপন ক্রমেই তার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। এই ব্যাপারে অন্য ছেলেদের মধ্যে হিংসেও দেখা দিল। তাকে ওরা নানাভাবে নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা করতে লাগল। তপন কিন্তু ওদের প্ররোচনায় কান দিত না, টিটকিরি গায়ে মাখত না, তার একমাত্র লক্ষ্য হল হরদয়ালের বিশ্বাসভাজন হয়ে এখান থেকে সরে পড়া।

বাংলার বাইরে দশেরা উৎসবের মহা ধুমধাম ! সেদিন সন্ধ্যের পর ওদের ছুটি হয়ে গেছে, সবাই হৈ-হুল্লোড়ে মেতেছে। অনেক রাত্রে ওরা যখন ফিরল তখন সবাই অল্পবিস্তর নেশা করেছে, এমন কি হরদয়াল পর্যন্ত। তপনই একমাত্র যে তাদের ডেরা থেকে বেরোয়নি। ওরা ফিরে এসে শুয়ে পড়ল আর শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমে অচেতন। সব ক'টা ঘরেই ওরা ভাগাভাগি করে শোয়, বাইরের ঘরটায় শোয় হরদয়াল আর বড় ছেলেদের কয়েকজন।

তপনের ঘুম আসছিল না, একসঙ্গে অনেকের নাক ডাকার একটা বিচিত্র শব্দে ঘরটা ভরে উঠেছিল। হঠাৎ তপনের মাথায় একটা চিন্তা যেন বিদ্যুতের মত ঝিলিক খেলে গেল। আজ রাত্রেই পালাবার সুবর্ণ সুযোগ, সবাই নেশা করে অর্ধ অচেতন হয়ে আছে। চুপি চুপি বেরিয়ে গেলে কেউ টেরও পাবে না। তপন দ্বিতীয়বার আর ভাবল না, তৎক্ষণাৎ উঠে প্রস্তুত হয়ে নিল।

অন্ধকারে পা টিপে টিপে, দু'হাত বাড়িয়ে দেয়াল ধরে সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিশানা ঠিক করে এগুচ্ছে। একবার একজনের গায়ে তার পা লেগে গেল, কিন্তু যার গায়ে লাগল সে তখন মড়ার মত ঘুমুচ্ছে, টেরও পেল না! প্রতিটি মুহূর্ত যেন একটি ঘণ্টা মনে হচ্ছে, তাড়াতাড়ি বেরুতে না পারলে সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে। কাশীতে থাকলেই সে ধরা পড়ে যাবে, এদের জাল এমন ভাবে ছড়ান যে কারও তা গলে বেরুনো সম্ভব নয়। তাকে যেমন করেই হোক আজ রাত্রের মধ্যেই বেনারস ছাড়তে হবে।

শেষ পর্যন্ত বাইরের ঘরে সে পৌঁছল। এই ঘরেই হরদয়াল ঘুমিয়ে আছে। তপনের বুক দুরু দুরু করে উঠল। আচমকা একটা কিছুতে পা লাগতেই একটা শব্দ হল আর সঙ্গে সঙ্গে হরদয়ালের ঘুম জড়ানো কণ্ঠ শোনা গেল, 'কৌন?' তপনের কিছু ভাবার সময় ছিল না, সে সটান মাটির ওপর শুয়ে পড়ল। তার বুকের ভেতরে যেন হাপর পড়ছে, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে! ধরা পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই।

ফস্ করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠল। সেই স্তিমিত আলোয় হরদয়াল চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। না, সব ঠিক আছে, তার শোনারই ভুল। ছেলেগুলি সব মাটিতে ঘুমে বেহুঁশ। তার আবার নাক ডাকতে শুরু করল।

তপন চুপচাপ শুয়ে রইল। দরজা খোলার সময় শব্দ হলেই সর্বনাশ! হরদয়ালের ঘুম যে ভীষণ পাতলা তা সে আগেই শুনেছিল, কিন্তু নেশার মধ্যেও যে সে সামান্য শব্দে জেগে উঠবে তা সে ভাবতেই পারেনি। একটা দারুণ হতাশায় ওর দুচোখে জল এসে গেল। অবশেষে মরীয়া হয়েই সে উঠে পড়ল। সাহসে বুক বেঁধে না এগুলে আর কোনদিনই সে এখান থেকে পালাতে পারবে না, এমন সুযোগও হয়ত আর কোনদিন আসবে না। হয় মুক্তি নয় মৃত্যু। সে সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে চলল। হাতড়ে হাতড়ে দরজার কাছে এসে সে উঠে দাঁড়াল। প্রায় মিনিট খানেক সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর দম বন্ধ করে আস্তে আস্তে একটু একটু করে ছিটকিনিটা খুলে ফেলল, এতটুকু শব্দ হল না। দরজাটা সামান্য ফাঁক করে তার মধ্য দিয়ে সে সুড়ুৎ করে গলে গেল, তারপর বাইরে থেকে দরজাটা টেনে দিল।

বাইরে অন্ধকার গলিটায় আলোর সংখ্যা অল্পই, তাও জোরালো নয়। তপন সারি সারি ঘিঞ্জি বাড়িগুলির গাঁ ঘেঁষে অন্ধকারের ছায়ায় ছায়ায় তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। গলির মুখ পেরিয়ে যে রাস্তাটা পুব মুখে গিয়েছে ও সেই রাস্তা ধরল। এসব রাস্তা তার চেনা আছে, কিন্তু স্টেশনটা ঠিক কোনদিকে তা সে জানে না। মিনিট পনের হাঁটার পর হঠাৎ ভারি জুতোর শব্দে সে চমকে উঠল! রাত্রের পাহারাদার টহল দিতে বেরিয়েছে। তপন তাড়াতাড়ি অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ল। পুলিশের হাতে পড়লেও নিস্তার নেই, তাকে চোর ভেবে ধরে নিয়ে যাবে। হরদয়াল কিংবা সর্দারের কাছে খবর চলে যেতেও দেরি হবে না। পুলিশের সঙ্গে তাদের একটা অলিখিত চুক্তি আছে, যোগাযোগও আছে ঘনিষ্ঠ। তারপরের পরিণাম ভাবতেই তপন শিউরে উঠল। বেইমানির অপরাধে তার লাশটা গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হবে।

পাহারাদার একটু দূরে চলে যেতেই সে প্রায় দৌড়তে লাগল। একটা টাঙ্গা সে ভাড়া করতে পারত কিন্তু এখানকার বেশির ভাগ টাঙ্গাওলার সঙ্গেই সর্দারের বন্দোবস্ত আছে। কত নিরীহ যাত্রীকে যে টাঙ্গাওয়ালারা এ গলি ও গলি ঘুরিয়ে সর্দারের লোকদের খপ্পরে এনে ফেলে তার হিসেব নেই। যাত্রীদের টাকা-পয়সা, ঘড়ি সব ছিনতাই করে ওরা তাদের নিঃস্ব করে ছেড়ে দেয়।

হঠাৎ তপনের মনে পড়ল বঙ্কু একদিন কথায় কথায় বলেছিল যে স্টেশন ওদের ডেরা থেকে পুবদিকে। বঙ্কুর কথাটা মনে হতেই ওর বুকটা মুচড়ে উঠল। ওকেও যদি সে সঙ্গে আনতে পারত! আজ রাত্রের ব্যাপারটা এমন সহসা ঘটে গেল যে বঙ্কুর সঙ্গে পরামর্শ করার সময় ছিল না, তা ছাড়া ও আজ বেহুঁশ হয়ে আছে। আরও আধঘণ্টা হাঁটার পর ওর মনে হল যেন দূরে ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে তপন দেখল পুব আকাশ ফিকে হয়ে আসছে, রাত আর বেশি নেই। সে আরও জোরে ছুটতে লাগল। হ্যাঁ, দূরে ওই ত স্টেশন দেখা যাচ্ছে। মুক্তির আনন্দে তার মন নেচে উঠল।

স্টেশনে পৌঁছে খোঁজ নিয়ে সে জানতে পারল তখনি একটা গাড়ি ছাড়বে, সে তাড়াতাড়ি একটা দূরের টিকেট কিনে গাড়ির একটা কামরায় উঠে পড়ল। গাদা ভিড়, লোকের দাঁড়াবার জায়গা নেই, তবু তপনের মনে হতে লাগল এতদিনে একটা নিরাপদ আশ্রয়ে সে এসেছে, কামরার লোকেরা যেন তার আপনজন।

হৃষিকেশ। ঘুরতে ঘুরতে তপন হৃষিকেশ এসে পড়েছে। তীর্থযাত্রীদের ফাইফরমাস খেটে কোনমতে তার দিন চলে। এ জীবনও তার ভাল লাগছে না। এভাবেই কি সে নিঃশেষ হয়ে যাবে? তার বাবা যে কৃতী অধ্যাপক ছিলেন তা সে ভুলতে পারে না। তাঁর একমাত্র বংশধর সে, কুলীগিরি করেই কি তার সারা জীবন কেটে যাবে! অন্ধকার থেকে আলোর মুখ কোনদিনই কি সে দেখবে না!

গঙ্গার ঘাটে সে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। ঘাটে সেদিন খুব ভিড়। কি একটা যেন যোগ ছিল সেদিন। আশপাশ থেকে বহু যাত্রী এসেছে, দূর-দূরান্ত থেকেও এসেছে। তপনের ভালই রোজগার হয়েছে। যাত্রীরা স্নান সেরে ঘাটের ওপরই পাতায় করে পুরি, তরকারি নিয়ে বসে পড়েছে। বাবা-মা-ভাই-বোন এক একটা পরিবার বসে গেছে, কাকু, কাকু, দাদু, দিদিমা-রাও সঙ্গে আছেন। তপন ওদের দেখছিল আর ভাবছিল সকলেরই কেউ না কেউ আছে, শুধু তারই কেউ নেই। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মুখটা ফেরাতেই চমকে উঠল। বিশাল চেহারার একজন সাধু কখন যে তার পাশেই এসে বসেছেন তা সে টেরও পায়নি। ঘন জটা ও দাড়ির মধ্য দিয়ে জ্বলজ্বল চোখে সাধু একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। তপনের বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে উঠল। চরপোড়া গরু যদি সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। চোর-ডাকাতের হাত থেকে পালিয়ে শেষে কি আবার সাধু-সন্ন্যেসীর পাল্লায় পড়ব! সে উঠতে যাচ্ছিল, সাধু জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'তিষ্ঠ!' তপনের সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে গেল। হায় ভগবান, কেন বার বার তার এত বিড়ম্বনা। সাধুর মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল, তিনি বললেন, 'বহুত্ দুখ্ পায়া বেটা, বহুত্ কষ্টভি কিয়া।' তপন আবার চমকে উঠল, সাধুর কণ্ঠস্বরে যেন একটা প্রচ্ছন্ন মমতার সুর।

সাধু তার আরও কাছে এগিয়ে এলেন। গভীরভাবে তার কপালের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন, তারপর তার ডান হাতের

www.BanglaBook.org

তালুর ওপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখতে লাগলেন। মিনিট দুয়েক মাত্র, তারপরই তিনি দু'চোখ বুজলেন। তপন অবাক হয়ে সাধুর কার্যকলাপ লক্ষ করছিল। সাধু হঠাৎ চোখ খুলে আকাশের দিকে আঙুল প্রসারিত করে বললেন, 'দেখ্ বেটা।'

তপন আকাশের দিকে তাকাল। নীল আকাশে সূর্য ঝলমল করছে আর একখণ্ড সাদা মেঘ বেগে তার দিকে ছুটে যাচ্ছে। পরক্ষণেই মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর আলোও কমে গেল। কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই মেঘ কেটে গেল, সূর্যদেব আবার প্রসন্ন হাসি হেসে উঠলেন।

তপন সাধুর দিকে চোখ ফেরাল। তিনি ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছিলেন। স্নিগ্ধ কণ্ঠে এবার তিনি বললেন, 'সব কুছ কা অন্ত হ্যায়। তেরা দুখভি খতম হো গয়া, অভি সুখকা সময় আয়া। তেরা ভালা হোগা, যশ, সম্মান সব কুছ হোগা।'

খপ্ করে তপনের ডান হাতটা নিজের হাতের একটা মুঠিতে শক্ত করে চেপে ধরে সাধু বললেন, 'আও বেটা, মেরা সাথ আও, ডরো মাৎ।' তপন মন্ত্রমুগ্ধের মত সাধুর সঙ্গে সঙ্গে চলল। গঙ্গার তীরেই সাধুর আস্তানা ; একটা পাতার কুটির। সাধু তাকে কিছু ফলমূল খেতে দিলেন। কেন জানি না অনেকদিন পরে তপন একটা নিশ্চিন্ততা অনুভব করল। খিদেও পেয়েছিল, নিমেষে পাত খালি হয়ে গেল। সাধু ওর খাওয়া দেখে হাসলেন, বললেন, 'আওড় থোড়া?' তপন সলজ্জ হাসি হেসে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

সাধুর কাছে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। তপনের ভয় ভেঙে গেছে। সাধু যে ভণ্ড নয়, সত্যিকারের জ্ঞানী-গুণী, তা সে তাঁর কথাবার্তা থেকে মন দিয়ে অনুভব করেছে। সাধু সন্ধ্যেবেলা ধুনী জ্বালিয়ে তপনকে সামনে নিয়ে বসেন, তাকে নানা উপদেশ দেন, ধর্মকথা শোনান, আর বলেন, 'জীব সৃষ্টি জিসনে কী উনকে উপর বিশ্‌ওয়াস রাখো।'

তপন সাধুর রুটি পাকায়, তাঁর পা টিপে দেয়, সেবা করে। সাধুর যেন তার ওপর কেমন মায়া পড়ে গেছে। অনেকদিন পর সে স্নেহের মুখ দেখতে পেয়েছে। কিন্তু এভাবে চিরটা কাল সাধুবাবার শরণাপন্ন হয়ে থাকা চলে না। বলি বলি করে একদিন সে মুখ ফুটে সাধুর কাছে কথাটা পাড়ল। তাঁর কাছে বিদায় চাইল। তিনি একটু হাসলেন, তারপর বললেন, 'হাঁ, যাও বেটা, তুমহারা সময় আ-গয়া।' সাধুকে প্রণাম করে তপন বেরিয়ে পড়ল। আবার সে ভেসে পড়ল অজানার উদ্দেশে। আজ তিনদিন হল সে দিল্লি এসেছে। ভবিষ্যৎ আবার অন্ধকার। আজ বাদে কাল কী হবে, কোথায় সে যাবে, কিছুই তার জানা নেই...

গাড়ি যখন ওয়েলেসলি রোডে একটা কোয়ার্টারের সামনে এসে দাঁড়াল তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে। একজন ছোকরা গোছের পাহাড়ি চাকর ছুটে এসে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়াল। তপনকে দেখে, বিশেষ করে তার মলিন বেশভূষায় সে যেন অবাক হয়েই তার মনিবের মুখের দিকে তাকাল। ভদ্রলোক সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তপনের একটা হাত ধরে বললেন, 'এস'।

দোতলা ফ্ল্যাট। ভদ্রলোক একতলায় থাকেন। ভেতরে যেতেই ছোট বছর তিনেকের ফুটফুটে একটি মেয়ে নাচতে নাচতে ছুটে এল, তারপরই তপনকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল। দুটো আঙুল মুখে পুরে দিয়ে যেন কি করবে ভাবতে লাগল। একজন সুন্দরী

অল্পবয়সী বৌ তাদের দিকে এগিয়ে এলেন। তপনকে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তিনি ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালেন। ভদ্রলোক বললেন, 'রমা, এ ছেলেটিকে আগে কিছু খেতে দাও, তারপর সব বলছি।'

একটা ঘরে ওরা সবাই বসেছে, তপনের গায়ে ভদ্রলোকের ধোপদুরস্ত পোশাক, গায়ে একটা গরম শাল। ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে শুরু করলেন, 'আজ আমি তোমাকে একটা বিচিত্র কাহিনী শোনাব। ঈশ্বর কতভাবে যে মানুষকে যাচাই করেন হয়ত এই কাহিনীই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।'

একটু থেমে তিনি আবার বলতে থাকেন, 'আজ থেকে প্রায় বছর কুড়ি আগেকার কথা। এক গ্রামে এক দরিদ্র বিধবা আর তাঁর একমাত্র ছেলে বাস করত। ছেলের বয়স তখন পনেরো, লেখাপড়ায় ভাল, সেবারই স্কুলের শেষ পরীক্ষা দেবে। বিধবা মায়ের বড় সাধ ছিল, ছেলে অনেক লেখাপড়া শিখবে, মানুষ হবে, বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। তাঁর স্বামীর অকাল মৃত্যু সংসারে যে বিপর্যয় ডেকে এনেছে, আত্মীয়স্বজন তাঁকে যে ভাবে দূরে ঠেলে দিয়েছে, সে সবই তিনি ছেলের সাফল্য দিয়ে ঢেকে ফেলতে চান।

ছেলে পরীক্ষায় ভাল ভাবে পাশ করল, মায়ের মন আনন্দে নেচে উঠল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্যভাবে। কলেজে পড়তে হলে ছেলেকে শহরে যেতে হবে, সেখানে খরচ অনেক। বৃত্তির টাকা দিয়ে সব খরচ মেটানো সম্ভব নয়। মায়ের এমন সামর্থ্য নেই যে সংসার থেকে দুটো টাকা তুলে শহরে তার থাকা-খাওয়ার খরচ বাবদ পাঠাবেন, তা ছাড়া ছেলেটি কোনদিন মায়ের কাছ-ছাড়া হয়নি, শহরে গিয়ে সে একা থাকবেই বা কেমন করে। মায়ের মন দুশ্চিন্তায় ভরে গেল।

অনেক ভেবেচিন্তে ছেলেটিকে নিয়ে তার মা শহরে এসে কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁরা সহানুভূতির

www.BanglaBook.org

সঙ্গে তাঁর কথা শুনলেন, ছেলেটিকে ফ্রীতে ভর্তি করে নিতেও রাজী হলেন, কিন্তু তার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার কথায় তাঁরা পেছিয়ে গেলেন। বিধবা মা যেন অকূল পাথারে পড়লেন। শহরের কাউকেই তিনি চেনেন না যার কাছে সাহায্যপ্রার্থী হতে পারেন।

'ছেলেটির মুখও শুকনো, তার নিজের লেখাপড়ার খুব ইচ্ছে। তারা কলেজের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কি করবে ভাবছে এমন সময় একজন তরুণ অধ্যাপক কলেজ থেকে বেরিয়ে এলেন। ছেলেটিকে আর তার মাকে অমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। একটু ইতস্ততঃ করে তিনি এগিয়ে এলেন। ছেলেটির মাকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা কোথায় এসেছেন এবং কি চান। বিধবা মা অধ্যাপকের কথার মধ্যে যেন একটা অবলম্বনের ইঙ্গিত পেলেন। তিনি আকুল কণ্ঠে অধ্যাপকের কাছে সব খুলে বললেন। ছেলেটি অংক ও ইংরেজিতে লেটার পেয়েছে শুনে অধ্যাপকের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'মা, আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনার ছেলেকে আমার হাতে দিন, আমি ওর সব ভার নেব।' বিধবা মা আনন্দে কেঁদে ফেললেন, অধ্যাপকের দু'হাত চেপে ধরে অজস্র আশীর্বাদ করলেন।

'অধ্যাপক ছেলেটিকে তাঁর বাড়ি নিয়ে এলেন। তিনি একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতেন, তখনও বিয়ে করেননি। অধ্যাপনার মহান আদর্শে ব্রতী হয়ে উঁচু সরকারি পদের প্রলোভন তিনি দু'হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন। ছেলেটি ওই অধ্যাপকের কাছে থেকে তাঁর অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টায়, একটার পর একটা পরীক্ষা কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করল। পরে সরকার থেকেই বৃত্তি দিয়ে তাকে আমেরিকা পাঠানো হল। সেখানেও বছর চারেক লেখা-পড়ার পর ভাল ভাবে পাশ করে সে দেশে ফিরল। ভাল চাকরি হল, প্রতিষ্ঠা পেল, তার জীবনের মোড় ঘুরে গেল।

'দেশে ফিরে সেই মহানুভব অধ্যাপকের সঙ্গে প্রথম সুযোগেই সে দেখা করেছিল। তিনি ততদিনে বিয়ে করেছেন, বছর সাত-আটের একটি ছেলেও আছে। অধ্যাপক তার সাফল্যে আনন্দে তাকে বুকে টেনে নিলেন, অধ্যাপকের স্ত্রী তাকে ভ্রাতৃস্নেহে সাদরে গ্রহণ করলেন, সে দিনগুলি মধুরে মধুর। ইতিমধ্যে তার মা মারা গিয়েছেন। ছেলে ধাপে ধাপে ওপরে উঠছে, তাঁর আশা মুকুলিত হচ্ছে, সেটা দেখে পরম তৃপ্তিতে তিনি চোখ বুজেছেন।

'সেই ছেলেটিকে সরকারি প্রয়োজনে কিছুদিন পর আবার বিদেশে যেতে হল। দীর্ঘদিন পর দেশে ফিরে সে দিল্লিতে উঁচু পদে বহাল হল। এর মধ্যে সে আর দেশে যাবার সুযোগ পায়নি। অধ্যাপকের সঙ্গে চিঠির যোগাযোগ সে রেখেছিল, কিন্তু যে কারণেই হোক, তার সংখ্যা কমতে কমতে বছরে একটা দুটোতে দাঁড়িয়েছিল। গত এক বছরে অধ্যাপকের কোন চিঠিই সে পায়নি।

'সেই ছেলেটি কে জান রমা?' ভদ্রলোক একটু থেমে স্ত্রীকে বললেন, 'সে আমি। প্রতিষ্ঠা, সম্মান সব আজ আমার হাতের মুঠোর মধ্যে আর সেই মহানুভব অধ্যাপকের ছেলে আজ ভাগ্য-বিড়ম্বনায় পথের ভিখিরি।'

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল। বাচ্চা মেয়েটি অবাক হয়ে তার বাবার মুখের দিকে তাকিয়েছিল, তারও ভীষণ কান্না পাচ্ছিল।

ভদ্রলোক চোখ মুছে বললেন, 'আজ আমার ওই দোকানে যাবার কথা ছিল না, অফিস ফেরত হঠাৎই দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়েছিলাম। আর যদি তা না করতাম তবে ওর সঙ্গে দেখাই হত না। মানুষের ভিড়ে ও হারিয়ে যেত। সব কিছুর পেছনে একটা অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিত আমি অনুভব করছি।'

ভদ্রমহিলাকে লক্ষ করে অনেকটা অনুনয়ের কণ্ঠে তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে ঋণমুক্ত হতে সাহায্য করবে ত?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন? তোমার ঋণ কি আমার ঋণ নয়? যাঁর দয়ায় তুমি বড় হয়েছ তিনি আমার নমস্য।' তারপরই তপনের দিকে ফিরে তিনি মিষ্টি হেসে বললেন, 'আজ থেকে তুমি আমাদের বড় ছেলে।' মেয়ের দিকে ফিরে বললেন, 'খুকু, তোমার দাদা।' বাচ্চা মেয়েটির মুখে হাসি ফুটে উঠল। তপনের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে তার মাকে সে বলল, 'মা, দাদা আমার সঙ্গে খেলবে ত?'

তপন দু'চোখ বুজল। অনেকদিনের ক্লান্তি, অনেক ব্যথা-বেদনার পর সে আজ পরম নিশ্চিন্ত। তার জীবনের পূর্ব-আকাশে কালো মেঘ কেটে গিয়ে যেন তরুণ রবি সোনা-রঙ নিয়ে ঝলমল করছে। ১৩৭৯

কার্টুন: অমল চক্রবর্তী

www.BanglaBook.org

আগ্নেয়গিরি ! আগ্নেয়গিরি !

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতই বোধ হয় সবচেয়ে ভয়াবহ ও প্রলয়ংকর। আশ্বাসের কথা, ভারতে কোনো আগ্নেয়গিরি নেই, অগ্ন্যুৎপাতের ধ্বংসলীলা আমাদের কোনোদিনই দেখতে হয়নি ! তবু ঐ প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে আমাদের ভীতির অন্ত নেই ! ভূ-তাত্ত্বিকেরা বলেন, হিমালয়ের একাংশ ও আসামের একটি বিস্তৃত এলাকা ভূমিকম্প-বলয় ও আগ্নেয় বলয়ের (Seismically active belt) অন্তর্গত, তবু দু-চারটি বহুপূর্বে মৃত (Extinct) আগ্নেয় পর্বত ছাড়া ভারতে সুপ্ত (Dormant) বা সক্রিয় (Active) কোনো রকম আগ্নেয়গিরিই চোখে পড়ে না। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা গেছে ধূমায়মান বা মাঝে মাঝে অগ্নিবর্ষী (অর্থাৎ সক্রিয় বা জাগ্রত) আগ্নেয়গিরির সংখ্যা পৃথিবীতে প্রায় ৫৩৫টি। এর মধ্যে আবার ৮০টি রয়েছে সমুদ্রের নীচে ! প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর ও পূর্ব তীরে, মধ্য অ্যাটলান্টিক অঞ্চলে, আফ্রিকার বিস্তৃত গ্রস্ত উপত্যকায়, দক্ষিণ আমেরিকায়, হাওয়াই, জাপান, ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলিতে পৃথিবীর অধিকাংশ সক্রিয় ও সুপ্ত আগ্নেয়গিরি অবস্থিত।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী সক্রিয় ও সুপ্ত আগ্নেয়-পর্বত আছে ইন্দোনেশিয়ায় ; এ পর্যন্ত ঐ দেশে ১৬৭টি সক্রিয় আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে ! এই সমস্ত পাহাড়ের প্রায় অধিকাংশই ছড়িয়ে আছে ঐ এলাকার নানা ছোট ছোট দ্বীপগুলিতে।

এ পর্যন্ত আগ্নেয়গিরির সর্বনাশা অগ্নিবর্ষণের যে সমস্ত লোমহর্ষক বিবরণ পাওয়া গেছে তার মধ্যে ধ্বংসের ব্যাপকতায় বোধ হয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাম্বোরার অগ্ন্যুৎপাত। এই তাম্বোরা পাহাড়টি ছিল ইন্দোনেশিয়ার সুমবাওয়া দ্বীপে ; ১৮১৫ সালের ৭ই এপ্রিল ধোঁয়ার মুকুট-পরা তাম্বোরা হঠাৎ ক্ষেপে উঠলো ; শুরু হলো প্রচন্ড অগ্ন্যুৎপাত। শোনা যায়, জ্বালামুখ থেকে নিক্ষিপ্ত পাথর, আগুন, লাভা, কাদা ছড়িয়ে পড়েছিল প্রায় ৩৬.৪ ঘন বর্গমাইল। এ ছাড়া সুউচ্চ তাম্বোরার ৪,১০০ ফুট উঁচু চূড়াটিও বিধ্বস্ত হয় সম্পূর্ণ ভাবে। সে জায়গায় তৈরি হয় ৭ মাইল ব্যাসের এক নারকীয় জ্বালামুখ !

তাম্বোরার এই মারাত্মক অগ্নিবর্ষণের সঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিক কালের আরও দু'টি ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতের তুলনা করলে এর ব্যাপকতা সহজেই অনুমান করা যাবে ; আমরা জানি সান্তোরিনি আগ্নেয়গিরি অগ্নিবর্ষণ করেছিল আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে। কথিত আছে, তার পাথর, লাভা ছড়িয়ে পড়েছিল ১৫ ঘন বর্গমাইল। আর ক্রাকাতোয়ার অগ্ন্যুৎপাতের কথা কে না জানে। কিন্তু তার লাভা বর্ষিত হয়েছিল ৪·৩ ঘন বর্গমাইল পর্যন্ত। এছাড়া, অগ্ন্যুৎপাতের সময় তাম্বোরার অভ্যন্তরে যে প্রচন্ড চাপের সৃষ্টি হয়েছিল, একালের বিজ্ঞানীর ধারণায়, তা ছিল প্রায় প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৪,৬৫,০০,০০০ পাউন্ডের মত।

অবশ্য বিস্ফোরণের প্রচন্ডতা বিবেচনা করলে ইজিয়ান সাগরে অবস্থিত থিরা দ্বীপের পূর্বকথিত সান্তোরিনির অগ্ন্যুৎপাতের কথাই আগে বলতে হয় ; এই অগ্নিবর্ষণ হয়েছিল ১৪৭০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। সম্ভবত ঐ অগ্ন্যুৎপাতেই ক্রিট দ্বীপের সমৃদ্ধ মিনোয়ান সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। থিরা থেকে ক্রিটের দূরত্ব প্রায় ৮০ মাইল, তবু অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যে ১৬০ ফিট উঁচু সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয় তাতেই ভেসে গিয়েছিল ক্রিটের ব্যাপক অঞ্চল।

সাম্প্রতিক ভূতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে ৩,০০০,০০০ বছর আগে অধুনা মৃত একটি আগ্নেয়গিরির প্রচন্ড অগ্ন্যুৎপাতে আমেরিকার ওরিগণ, আইডাহো, নেভাডা, কালিফোর্নিয়া অঞ্চলের ব্যাপকাংশ লাভা স্রোতে ভরে গিয়েছিল ! এই এলাকা প্রায় ১,০০,০০০ বর্গমাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। সম্ভবত এটাই সবচেয়ে ব্যাপক ও ভয়াবহ আগ্নেয় বিস্ফোরণ।

কেউ কেউ বলেন, আধুনিক কালের সবচেয়ে প্রলয়ংকর অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছে ১৮৮৩ সালের ২৭শে আগস্ট। সুমাত্রা আর জাভা দ্বীপের মধ্যে ছিল পান্না-সবুজ ছোট্ট এক দ্বীপ ; তার মোট এলাকা ছিল ১৮ বর্গমাইল। সেকালের লোকে ঐ দ্বীপটির নাম রেখেছিল ক্রাকাতোয়া। ২৭শে আগস্ট সকালে স্বাভাবিক ভাবেই চলছিল সেই দ্বীপের জীবনযাত্রা ; হঠাৎ নটা বেজে ছাপ্পান্ন মিনিটে দ্বীপের একধারে ধোঁয়া আর মেঘের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সুউচ্চ পাহাড়টি কেঁপে উঠলো থর থর করে। তারপর শোনা গেল কয়েকটি প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দ ; পাহাড়ের চূড়াটি ভেঙে পড়লো হুড়মুড় করে, আর সেই জ্বালামুখ থেকে পাথর কাদা ছাই ছিটকে পড়লো দূর-দূরান্তে। গনগনে লাভা স্রোত নেমে এল পাহাড়ের গা বেয়ে। ভেসে গেল বাগান, ক্ষেত-খামার, জনপদ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হলো ১৬৭টি গ্রাম। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে, পাথরের আঘাতে, লাভার আগুনে মারা পড়লো প্রায় ৩৬,৩৮০ জন অসহায় মানুষ। প্রায় ৩৪ মাইল এলাকা জুড়ে চললো ব্যাপক ধ্বংসলীলা ; আর দশদিন ধরে অগ্ন্যুৎপাতের ছাই ছড়িয়ে পড়তে থাকলো প্রায় ৩,৩৯৩ বর্গমাইল পরিমিত অঞ্চলে ! ক্রাকাতোয়ার এই প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দ প্রথম নাকি শুনতে পাওয়া গিয়েছিল ২,৯৮৬ মাইল দূরবর্তী রড্রিগজ দ্বীপ থেকে। অবশ্য ঐ শব্দতরঙ্গ গিয়ে পৌঁছেছিল প্রায় চার ঘণ্টা বাদে। কালো আকাশে আগুনের আভাও নাকি দেখেছিল ঐ দ্বীপের মানুষ। কামান গর্জনের মত সে কর্ণবিদারী আওয়াজ শুনতে পেয়ে-

www.BanglaBook.org

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আঁকা
ক্রাকাতোয়া অগ্ন্যুৎপাতের ছবি

ছিল কলকাতা, রেঙ্গুন, মাদ্রাজ, টোকিও এমনকি লন্ডনের লোকেরাও! একালের বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, এ যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমার থেকেও ক্রাকাতোয়ার ঐ বিস্ফোরণ ছিল ২৬ গুণ বেশী শক্তিশালী। বলা বাহুল্য, ঐ বিস্ফোরণে ঘন জনবসতিপূর্ণ ক্রাকাতোয়া দ্বীপটি সাগরতলে চিরকালের মত হারিয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে আরও দুটি ঐতিহাসিক অগ্ন্যুৎপাতের কথা বলা যেতে পারে। প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্যনিবাস ছিল পম্পেই। ছবির মত ভিলা, দ্রাক্ষাকুঞ্জ আর পথঘাট দিয়ে সাজানো ছিল শহর। নেপল্‌স উপসাগরের তীরবর্তী এই পম্পেই-এ বেড়াতে আসতেন রোমের সম্রাটরাও। হঠাৎ ৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগস্ট ঘটলো এক অঘটন। পম্পেই-এর শিয়রে এতকাল চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা ভিসুভিয়াস হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই শুরু করলো অগ্নিবর্ষণ! কয়েকদিনের অগ্ন্যুৎপাতে লাভা আর পাথরের নীচে চাপা পড়ে গেল প্রায় ২০,০০০ মানুষ; আর পুরো পম্পেই শহরটাই হারিয়ে গেল একেবারে। সেই লুপ্ত নগরীর ধ্বংসাবশেষ গত শতকে মাটির নীচে থেকে খুঁজে বের করেছি আমরা। এখনও চলেছে সেই উৎখননের কাজ। এই পম্পেই শহরকে ধ্বংস করেই ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত যে বন্ধ হয়েছিল তা নয়; সেই সঙ্গে বিধ্বস্ত হয়েছিল জনবহুল হারকিউলেনিয়াম উপনগরীটিও। লর্ড লিটনের লেখা 'লাস্ট ডেজ অব পম্পেই' উপন্যাসে এই দুই শহরের ওপর কি ভাবে হঠাৎ মহা বিপর্যয় নেমে এসেছিল তার একটি বাস্তবধর্মী চিত্র পাওয়া যাবে। তোমরা ইচ্ছা করলে সেটা দেখতে পার।

ভিসুভিয়াসের মত আর একটি আগ্নেয়গিরি হঠাৎ জেগে উঠে পলকে প্রলয় ঘটিয়েছিল ১৯০২ সালে; সেন্টপীয়র ও মারটিনিক দ্বীপের নাম হয়ত অনেকেই শোননি; সেই ঘন জনবসতিপূর্ণ দ্বীপটির মাঝখানে আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল মাউন্ট পেলে (Mt. Pelee)। মাঝে মাঝে ধূমোদ্গারণ করা ছাড়া মাউন্ট পেলে বিশেষ ঝামেলা করেনি কোনদিন। কিন্তু হঠাৎ একদিন শুরু হয়ে গেল অগ্ন্যুৎপাত। বিস্ফোরণের প্রথম চোটে তলিয়ে গেল ঐ দ্বীপের একটি বড় অংশ, মারা পড়লো প্রায় ৩০,০০০ নরনারী। ক্রাকাতোয়ার পর সাম্প্রতিক কালে এতবড় বিস্ফোরণ আর ঘটেনি।

উপসংহারে, আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে আরও কিছু অভিনব তথ্য পরিবেশন করলে পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ হবে। বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু সক্রিয় আগ্নেয়গিরি হচ্ছে আর্জেন্টিনায় অবস্থিত 'ভলকান এন্টোফাল্লা'। এই পাহাড়ের উচ্চতা ২০,০১৩ ফিট। এছাড়া ১৯৫৯ সালেও অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে চিলির 'ভলকান গুয়াল্লাতিরি'তে; এটির উচ্চতা ১৯,৮৮২ ফিট। সর্বোচ্চ সুপ্ত আগ্নেয়গিরি হচ্ছে চিলি ও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর্জেন্টিনা সীমান্তে অবস্থিত ভলকান লুলাইলাকে। ঐ পাহাড়ের উচ্চতা ২২,০৫৮ ফিট ; এ ছাড়া আফ্রিকার কিলিমানজারো (১৯,৩৪০ ফিট) পর্বতের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। মৃত অগ্নেয়গিরির মধ্যে উচ্চতায় সবাইকে টেক্কা দিয়েছে আর্জেন্টিনার কেরবো এ্যাকনকাগুয়া. এটির উচ্চতা প্রায় ২২,৮৩৪ ফিট। এটি আন্দিজ পর্বতমালার অন্তর্গত। এই পাহাড়ের চূড়ায় একদল পর্বত অভিযাত্রী আরোহণ করেছেন ১৪ই জানুয়ারী, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে।

অনেকেই জানে না চিরতুষারাবৃত উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতেও রয়েছে বেশ কয়েকটি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি। পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরবর্তী অগ্নেয় পর্বতের নাম বিয়ারেন বার্গ। এটির উচ্চতা ৭,৪৭০ ফিট। গ্রীনল্যান্ড উপসাগরের ইয়ান মায়েন দ্বীপে এটি অবস্থিত। পৃথিবীর দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত আগ্নেয়গিরির নাম মাউন্ট ইরেবাস্ (উচ্চতা ১২,৪৫০ ফিট)। এটি 'আর্কটিক সারকেল'-এর অন্তর্গত রস্দ্বীপের সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরি। ১৮৪১ সালের ১৮ই জানুয়ারী স্যার জেমস্ ক্লার্ক রস্ মেরু অভিযান কালে এটি আবিষ্কার করেন।

এই প্রসঙ্গে আগ্নেয়গিরির বৃহত্তম জ্বালামুখ বা ক্রেটার সম্বন্ধেও দু-একটি কথা বলা যেতে পারে। জাপানের ৫,২২৩ ফিট উঁচু মাউন্ট আসোর জ্বালামুখই সবচেয়ে বৃহৎ। এটির উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃতি হচ্ছে ১৭ মাইল, আর পূর্ব-পশ্চিমে ১০ মাইল। সর্বসাকুল্যে ব্যাস হচ্ছে প্রায় ৭১ মাইল। সবচেয়ে লম্বা লাভা প্রবাহ দেখতে পাওয়া যায় তুষারাবৃত আইসল্যান্ডে। ঐ প্রবাহের দৈর্ঘ্য ৬০ মাইল!

এই সত্তরের দশকেও মোটামুটি সক্রিয় রয়েছে এমন কয়েকটি আগ্নেয়গিরির কথা বলে আলোচনা শেষ করি। এই সক্রিয়তাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা, ধূম উদ্গিরণকারী, গর্জনশীল আর অগ্নিবর্ষী। ধূম উদ্গিরণকারী আগ্নেয়গিরির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ইকুয়েডোরের ১৯,৩৪৭ ফিট উঁচু কোটাপ্যাক্সি-এর জ্বালামুখ থেকে এখনও ধোঁয়া ও আগুনের হল্কা নির্গত হয়ে থাকে। এ ছাড়া ঐ অঞ্চলের লাসকার (চিলিতে অবস্থিত), টুপানগাটিটো (চিলি সীমান্তে), কোটাকাচি (ইকুয়েডোরে অবস্থিত), পুরেস (কলম্বিয়ায় অবস্থিত) প্রভৃতি পাহাড় পঞ্চাশের দশকেও অগ্নি লাভা বর্ষণ করেছে! এই সঙ্গে ইটালীর ভিসুভিয়াস, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের স্ট্রম্বোলি-এর নামও করা চলে। বছর পনেরো আগেও এরা ছিল বেশ সক্রিয়।

হাওয়াই দ্বীপের ১৩,৬৮০ ফিট উঁচু মাউনা লোয়া কারও কারও মতে আদর্শ সক্রিয় আগ্নেয়গিরি। সকল সক্রিয় আগ্নেয়গিরির সমস্ত বৈশিষ্ট্যই এটির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৫০ সালের এর অগ্ন্যুৎপাতের ছায়াচিত্র তুলে রেখেছেন ভূ-বিশারদেরা। সেই ছায়াচিত্র দেখলে অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়গুলি বেশ সুন্দরভাবে অনুধাবন করা যায়।

ষাটের দশকে যে সব আগ্নেয়গিরি লাভা, পাথর বর্ষণ করেছে তাদের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার ১৫,৫৮৪ ফিট উঁচু ক্লাইভুচেভস্কায়ার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৪ সালে এটির অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল। এছাড়া গুয়াটেমালার ১৩,৮১২ ফিট উঁচু তাজোমুলকো ও ১২,৫৮২ ফিট উঁচু ফুটগো (দুটিরই অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে ষাটের দশকে), ইন্দোনেশিয়ার ১২,২২৪ ফিট উঁচু রিন্দজানি (১৯৬৪ সালে বিস্ফোরণ ঘটেছিল), সিসিলীর ১১,০৫৭ ফিট উঁচু মাউন্ট এটনার (১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত দুবার অগ্ন্যুৎপাত) নামও উল্লেখযোগ্য। আইসল্যান্ডের বরফ ঢাকা ৫৬৮ ফিট উঁচু সারটসে পাহাড় ১৯৬৩ সালের পর থেকে নিয়মিত আগুন ও লাভা বর্ষণ করছে। বর্তমানে বহু পর্যটক ঐ সজীব আগ্নেয়গিরিটি দেখতে গিয়ে থাকেন। ১৩৮১

আজব আমন্ত্রণ-লিপি

আর. এস. ফজরুল ইসলাম

আমার আত্মার আত্মীয় আনন্দদা,

আরম্ভেই আমার আন্তরিক আশ্রদ্ধা-আদর আপনাতে আরোপিত। আজ আচমকা আপনার আগমনবার্তায় আমি আশান্বিত আর আনন্দে আপ্লুত। আশা—আমাদের আসরের আমন্ত্রণ-লিপি আপনার আয়ত্তে আসিয়াছে।

আসন্ন আনন্দময়ীর আগমনে আগামী আশ্বিনের আটাশে আমাদের আহূত আনুষ্ঠানিক আনন্দমেলার আকর্ষণীয় আসরে আত্মপর, আপনার আপনজনে আপনারা আমাদের আকুতি-সহ আমন্ত্রিত। আপনাদের আতিথ্য আর আপ্যায়নে আমাদের আসর আন্তরিক আগ্রহী।

আমি আজই আপনার আগমনবার্তা আমাদের আসরের আলোচনাসভায় আনিব। আপনি আটাশে আশ্বিনের আগেই আজিমগঞ্জ আপট্রেনে আসানসোলে আমাদের আসরের আপিসে আসিবেন। আমার আব্দার, আপনি আসার আগে আমার আকাঙ্ক্ষিত আলোকচিত্রটি আনিবেন।

আজ আর আগ-বাড়িবনা। আগামীতে আপনি আমি আর আর আলোচনায় আসিব।

আচ্ছা, আজ আপাতত আসিতেছি।

আপনার আশীর্বাদধন্য আর আদরণীয় 'আশীষ'।

১৩৮৫

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যমদুয়ারের ছোকরা বাঘ

বুদ্ধদেব গুহ

জায়গার নাম যমদুয়ার। তার নৈসর্গিক দৃশ্যের তুলনা হয় না। একপাশে ভুটান পাহাড়, অর্থাৎ হিমালয় পর্বতমালা, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার সবুজ সীমারেখা, আর এদিকে আসাম—সেখানে আমরা আছি। বনবিভাগের দোতলা বাংলোটি একেবারে সংকোশ নদীর দিকে মুখ-চাওয়া। সংকোশ নদীই বাংলা আর আসামের সীমানা দেখিয়ে বয়ে চলেছে এখানে। বড় সুন্দর নদী। নদীময় বড় বড় পাথর। স্বচ্ছ জলে কালো ছায়া ফেলে মাছের দল সাঁতরে চলেছে। সারাক্ষণ কুলকুল কুলকুল করে গান গাইছে সংকোশ।

সঙ্গে আছে স্থানীয় শিকারী সাত্তার, পুরো গোয়ালপাড়া জেলার লোকেরা একে জানে 'ছাত্তার ভাই' বলে। নাম আবু সাত্তার। সত্যিই বড় ভাল শিকারী। এ পর্যন্ত ও কত যে বাঘ, চিতা, কুমির ইত্যাদি মেরেছে তার আর লেখাজোখা নেই।

দুবেলা খাই-দাই, রাইফেল কাঁধে ঘুরে বেড়াই—বাঘের পায়ের দাগের খোঁজ করি। এ পর্যন্ত বাঘের হদিস পাওয়া গেল না। দু-একদিনের মধ্যে মোষ বেঁধে বসব ভাবছি জঙ্গলে। বাঘের হদিস পাওয়া না গেলেও, বাঘ যে-পথে মাঝে মাঝে সংকোশে জল খেতে যায় সে-পথটা সাত্তার আর আমি খুঁজে বের করলাম একদিন। তারপর ঠিক করলাম, একদিন বিকেল-বেলা গিয়ে সেই পথের ধারের কোনো গাছে বসব, যদি বরাতে বাঘের দেখা মেলে।

বসলাম গিয়ে একদিন। বাংলো থেকে পাহাড়ী সুঁড়িপথে প্রায় মাইল তিনেক। নদীর ধার দিয়ে রাস্তা। রাস্তায় দুটো বড় বড় খাদ থাকাতে জীপ যাওয়া মুশকিল। তাছাড়া জীপ নিয়ে যেখানে বসব সেখান অবধি যাওয়াটা ঠিক হবে না। হেঁটে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। সাত্তার বলল, 'কপালে থাকলে এখনই আসবে বাঘ।'

উঠে বসলাম একটা খয়ের গাছে। দেখতে দেখতে আমাদের পিছনে, সংকোশের দুধলি-বালি আর স্বচ্ছ জল পেরিয়ে ভুটান পাহাড়ের আড়ালে সূর্যটা ডুবে গেল।

আস্তে আস্তে রাত নামল। রাত বাড়তে লাগল। এখন চারদিকে ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। গরমের সময় জঙ্গলে ফুর-ফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। কিছু দূরে ভুটানের পর্বতমালা পূর্ণিমার রাতে আলোর ওড়না মুড়ে ঘুমোচ্ছে। আমাদের পেছন দিয়ে সংকোশের স্রোত বয়ে চলেছে একটানা, কলকল শব্দ করে।

রাত প্রায় নটা বাজে। জ্যোৎস্নামাখা বন-পাহাড়ের যে একটা মিষ্টি ঠাণ্ডা আমেজ আছে সেটা একেবারে বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় আমাদের সামনে প্রায় দুশো গজ দূরে একদল ভারী জানোয়ারের পায়ের আওয়াজ পেলাম। আমরা যে গাছে বসে ছিলাম ঠিক তারই তলা দিয়ে জানোয়ারদের চলার সুঁড়িপথ গেছে। শব্দ শুনে মনে হল, যাদের পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, তারা এই পথেই আসবে। সাত্তার ফিসফিসিয়ে কানে কানে বললে, 'সেই জংলী মোষের দল, যাদের কথা আপনাকে বলেছি। সংকোশে জল খেতে চলেছে।'

সাত্তারের কাছে শুনেছিলাম যে, এই রাঙ্গা ব্লকে, যে ব্লকে আমরা বাঘ মারার জন্যে বনবিভাগের অনুমতি নিয়েছি, তাতে নাকি একদল দেখবার মত জংলী মোষ আছে। ভেবেছিলাম পূর্ণিমা রাতে যদি বাঘ গাছের নীচে একবার চেহারা দেখায়, তাহলে গুলি করতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। কিন্তু বাঘের আশায় এসে জংলী মোষের দলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

ততক্ষণে শব্দটা এগিয়ে আসছে। শক্ত ভারী পায়ের ইতস্তত আওয়াজ। কখনো থামছে, কখনো এগোচ্ছে। আমাদের গাছের বাঁ দিকে প্রায় পঁচিশ গজ দূরে, সেই সুঁড়িপথে একটা বাঁক ছিল। দেখতে দেখতে সেই বাঁকের মুখে এসে দাঁড়াল এক অতিকায় প্রাণী। বনের পটভূমিকায় চাঁদের রুপোলী আলোয়, বলিষ্ঠতার প্রতিমূর্তির মত এসে দাঁড়াল দলপতি। দলপতি হবার যোগ্যই বটে। মাথার শিং দুটো দুখানা অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক হাতের মত, সামনের সমস্ত কিছুকে আঁকড়ে ধরার জন্য যেন হাত বাড়িয়ে আছে। গায়ের রঙ লাল-কালোর মাঝামাঝি, একটা প্রকাণ্ড মাথা।

মোষের দলের আমাদের দেখতে পাবার কোনো কথা ছিল না, দেখেওনি। পুরো দলটা নিজেদের মনে নীচের শুকনো পাতা-পড়া পথে, খচমচ আওয়াজ তুলে সংকোশের দিকে চলে গেল। মারতে চাইলে অতি সহজে মারা যেত। অত বড় মাথা, এবং অত ধীরে ধীরে চলে। কিন্তু জংলী মোষ মারতে আমরা যাইনি সেবারে। তাছাড়া মোষ মারার অনুমতিও ছিল না। তবু দেখা ত হল। সেই বা কম কী?

মোষের দল যখন এখনই জলে গেল, তখন বাঘের এখনই এদিকে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই মনে করে সে রাতের মত আমরা গাছ থেকে নেমে হেঁটে যমদুয়ারে বাংলোয় এসে পৌঁছলাম।

সকালে দরজায় ধাক্কা দিয়ে চৌকিদার ঘুম ভাঙাল। দরজা খুলে কী ব্যাপার জিগগেস করাতে সে বাংলোর নীচে, রান্নাঘরের পাশে, মাটিতে গোল হয়ে বসে থাকা চার-পাঁচজন লোকের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। নীচে নামতেই ওরা বললে, 'সাহেব, এক্ষুনি একবার যেতে হবে আমাদের সঙ্গে!' জঙ্গলের মধ্যে, ভুটানের সীমানার একেবারে পাশেই ওদের মোষের বাথান। সেখানে কুড়ি-বাইশটা মোষ থাকে। ওরা মোষ চরায়, আর দুধ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে ঘি করে সংকোশের ওপারে ভুটানের হাটে বিক্রি করে। ওরা বললে, 'কাল শেষ রাতে একটা বাঘ এসে বাগানের চার-পাশে ঘোরাঘুরি করতে থাকে—আর ডাকাডাকি করতে থাকে। কিন্তু মোষগুলো সব একসঙ্গে থাকাতে প্রথমে কিছু করতে সাহস পায় না। কিন্তু একটা মোষের অসুখ হওয়াতে, অন্য মোষদের থেকে আলাদা করে, বাথানের বাইরে, ঘরের পাশে একটা শাল গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে, বাঘ মুহূর্তের মধ্যে সেই মোষটাকে মেরে দড়ি ছিঁড়ে ওদের ঘর থেকে মোটে পঁচিশ-তিরিশ গজ দূরে কতগুলো জার্মান-জঙ্গলের মধ্যে (বিহারে যাকে বলে পুটুস) নিয়ে গিয়ে খেতে আরম্ভ করল। ওরা বললে, ওদের জীবনে ওরা এরকম দুঃসাহসী বাঘ দেখেনি। ঘরের মধ্যে থেকে ওরা কড়মড় করে হাড় চিবনোর শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। প্রতিকারে কী যে করবে তা ভেবেই ঠিক করতে পারছিল না। শেষে ওরা সবাই মিলে সাহসে ভর করে ঘরের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কেরোসিনের টিন বাজালো ও চেঁচামেচি করার পর তিন-চারটে মশাল জ্বেলে, হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে জ্বলন্ত মশালগুলো বাঘের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আবার দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর সে কী কাণ্ড! একে বাঘ খিদের মুখে খাচ্ছিল, তায় জ্বলন্ত মশাল গিয়ে পড়েছে তার ঘাড়ে। পনের মিনিট সে এক প্রচণ্ড অবস্থা। বাঘের বিকট গর্জন, বাথানের মোষেদের গলায় ভারী ঘণ্টার সঙ্গে মেশা সমবেত ভয়ার্ত চীৎকার। সব মিলে বেচারাদের প্রাণ উড়ে যাবার অবস্থা।

তাদের জিগগেস করলাম যে, মোষটার অবশিষ্টাংশ ওখানেই আছে না বাঘ যাবার আগে অন্য জায়গায় টেনে নিয়ে গেছে? ওরা বলল, মোষটাকে বাঘ ওখান থেকে আরো একশ গজ দূরে নিয়ে গিয়ে একটা বেতের ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে। বোধহয় সবটা খেতে পারেনি।

তক্ষুনি আমি আর সাত্তার জীপে উঠে বসলাম। প্রায় সাত-আট মাইল পথ গিয়ে জঙ্গলের প্রধান সড়কে জীপ রেখে আমরা প্রায় মাইলখানেক হেঁটে সেই গোয়ালে এসে পেঁছিলাম। ওখানে আগে একজন ঠিকাদারের ঘর ছিল। ঘন শালের জঙ্গলের মধ্যে, প্রায় ২৫০ বর্গগজ জায়গায় গাছ নির্মূল করে পরিষ্কার করা হয়েছে। তারই একপাশে শক্ত শক্ত শালের খুঁটি দিয়ে ঘেরা বাথান, আর অন্য পাশে গোয়ালাদের দুটি থাকার ঘর।

আমরা ভাবলাম যে রাতে বাঘ নিশ্চয়ই আসবে। অতএব মড়ির কাছে কোনো গাছে মাচা বেঁধে বসব। মোষের মড়িটা কোথায় আছে শুধোতে গোয়ালাদের মধ্যে একজন আমাদের সেদিকে নিয়ে চলল। ওদের ঘর থেকে প্রায় পঁচাত্তর গজ উত্তরে একটা সরু শুকনো নালা গেছে। সেই পাহাড়ী নালার এক পাশে একটা ঘন বেতের ঝোপ দেখিয়ে গোয়ালা বলল, বোধহয় এখানে রেখেছে মোষটাকে। আমরা বেত-ঝোপটাকে প্রদক্ষিণ করে ঝোপের ওপাশে গিয়ে সবে পেঁছেছি, হঠাৎ সাত্তার গোয়ালাটাকে বলল, তুই পালা, শিগগির পালা। আমার হাতে .৩৬৬ রাইফেল ছিল, সাত্তারের হাতে বন্দুক। কিন্তু এই সকালবেলায়, চারদিকে ঝকঝক-করা রোদের মধ্যে রাতে-মারা মোষের কাছে ভয়ের কী কারণ থাকতে পারে বুঝলাম না। সে যাই হোক, গোয়ালাটি কিন্তু ততক্ষণে ঘরের দিকে বড় বড় পা ফেলে চলে গেছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে মোষের মড়ি দেখা যাচ্ছিল না। সাত্তার ঝোপের দিকে আঙুল

দেখিয়ে আমাকে ফিসফিস করে কিছু বলতে যাবে, এমন সময় ঝোপের মধ্যে থেকে একটা সংক্ষিপ্ত চাপা আওয়াজ শোনা গেল। আশ্চর্য কথা। বাঘ এখনো মড়ির উপরে আছে?

আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুজনে দুদিকে সরে গিয়ে ভাল জায়গা বেছে দাঁড়ালাম—আর প্রায় তক্ষুনি বাঘ মোষ ছেড়ে এক প্রকাণ্ড গর্জন করে এক লাফে আমাদের দিকে প্রায় উড়ে এল। সকালের রোদে থাবাতে-মুখে রক্তমাখা ক্রুদ্ধ বাঘের সেই প্রলয়ংকর মূর্তি বহুদিন মনে থাকবে। সাত্তার আর আমি বোধ-হয় একসঙ্গেই গুলি করেছিলাম। গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে বাঘ শূন্যে একটা ডিগবাজি খেয়ে একেবারে সটান লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। আমরা আশ্বস্ত হলাম যে বাঘটা সত্যিই পড়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই আমাদের ভীষণভাবে চমকে দিয়ে বাঘটা প্রায় পেটে ভর করে আমি যেদিকে দাঁড়িয়ে ছিলাম (নালার দিকে) সেদিকে তেড়ে এল। এখন, সেটা আমাকে শেষ-আক্রমণ করার জন্যেই, কি আহত অবস্থায় নালার আশ্রয় নেবার জন্যে, তা বুঝলাম না। তাছাড়া তখন অত বোঝাবুঝির সময়ও ছিল না। আর বেশী ঝুঁকি নেওয়া কোনোমতেই বুদ্ধির কাজ হত না—তাই বাঘের তেড়ে-আসার সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল তুলে, একেবারে বাঘের মাথা লক্ষ করে গুলি করলাম। অত কাছ থেকে ছোঁড়া রাইফেলের গুলি বাঘের মগজ থেঁতলে দিল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর কতগুলো শালের চারার উপর কিছু-ক্ষণ থরথরিয়ে কেঁপে বাঘটা একেবারে নিশ্চল হল।

বাঘটা যে একটা প্রকাণ্ড, তা ছিল না। বয়সেও একে-বারে ছেলেমানুষ। সবে বড় হয়ে, মাকে ছেড়ে, শিকার ধরতে আরম্ভ করেছে একা একা। সেই কারণেই হয়ত এমন বোকার মত দিনের বেলাতেও মড়িতে বসে খাচ্ছিল আর ছেলেমানুষি করেছিল রাত্তিরে। সাত্তার বলল, 'ছোকরা না হলে এত ফকরা হয় না।'

গোয়ালারা খুব খুশী হল, মোষের দুধে ফোটানো চা খাওয়াল, আমাদের খাওয়ার জন্যে জোর করে এক ভাঁড় ভরষা ঘি দিল। কিন্তু সেই ছেলেমানুষ, সুন্দর বাঘটাকে মেরে, সত্যি বলতে কি, আমাদের একটু কষ্টই হল। ১৩৭০

www.BanglaBook.org

হারানো ছেলে

শৃগ্বন্তী পাল

তিনকুড়ির ওপর বয়স হল ঠাক্‌মার—এমন সমস্যায় তাকে কখনো পড়তে হয়নি।

গাঁ-শুদ্ধ সকলে বলে ঠাক্‌মা। আপদে-বিপদে কতজন উপদেশ নিতে আসে ওর কাছে। ঠাক্‌মা কখনো কাউকে ফেরায় না। ওর গোবর-নিকানো দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসিয়ে, সকলকে সে নিজের সাধ্যমত পরামর্শ দেয়। হয়ত বলে, 'তোর ঐ গরুকে নিয়ে যখন এত ঝামেলা, তুই ওটা বেচে ফেল্‌। ভাদ্রটা কাটুক—তারপর এট্টা নতুন ছাগল কেন্‌ ; নইলে ঐ গরুই তোকে খাবে।' কাউকে হয়ত ভবিষ্যদ্বাণী জানায়, 'তোর ছেলে একদিন মস্ত বড় হবে রে ছোটবৌ—আমি বললুম দেখে নিস। অমনভাবে রাতদিন ওকে মারধোর করিস না।' বুড়ির কাছে বশীকরণের নানারকম ওষুধ-বিষুধ, শেকড়-বাকড় পাওয়া যায়। দু-পক্ষের ঝগড়াঝাটি হলে, সন্ধি করতে কখনো কখনো ওর ডাক পড়ে! ওষুধ ঠিকমত ধরলে বা পরামর্শে কাজ হলে বুড়ি হাসে—ওর কোটরে বসা চোখদুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে, দু-একটা কাল্‌চে দাঁত শুকনো ঠোঁটের ফাঁকে বেরিয়ে যায়, বসে-যাওয়া গালের ওপর ভাঁজ পড়ে। তবু সকলে বুড়ির ঐ হাসি দেখতে ভালোবাসে। ইচ্ছেমত দিয়ে আসে গাছের কলা, খেতের ফসল। ঠাক্‌মাও তাদের টোকো আমচুর আর শুকনো আমলকী খাওয়ায়। যখন ঠাক্‌মার কথা ঠিক হয় না, তখন রেগেমেগে কেউ যে দু'কথা শুনিয়ে যায় না এমনও নয়। কিন্তু এবারে ঠাক্‌মার যে সমস্যা তা একেবারে অন্যরকম!

ঐ যে রাস্তার তেমাথায়, যেখানে একটা মস্ত বটগাছ আছে শিবুগোয়ালার বাড়ির পাশে—ঐখান দিয়ে ঠাক্‌মা আসছিল লাঠি ঠুক্‌ঠুকিয়ে। তখন সকাল অনেকখানি গড়িয়ে গেছে। একটা গরুর গাড়ি ধুলো উড়িয়ে চাকার দাগ ফেলে চলে যাচ্ছে ; হঠাৎ গাড়োয়ান হৈ-হৈ করে উঠল, 'হেঠ্‌, হেঠ্‌, রাস্তা দেখে চলতে পারিস না ছোঁড়া, কানা নাকি?' বুড়ি দেখে একটা বছর দশের একরত্তি ছেলে, গায়ে ছেঁট হাফপ্যান্ট আর ময়লা জামা, পথের ওপর থেকে সরে গেল একপাশে। গরুর গাড়িটা হৈ-হৈ করে চলে গেল, আঁটি-বাঁধা খড় থেকে কিছুটা ঝরে পড়ল ধুলোয়। ঠাক্‌মা ছেলেটার কাছে এসে দ্যাখে, ধুলো-বালি-মাখা হাত দিয়ে ছেলেটা ওর চোখ দুটো মুছছে।

'ওমা! হ্যাঁগা তুই কাঁদিস কেন? তোর কি লেগেছে গাড়িতে?'

ছেলেটা উত্তর দেয় না, তেমনিই ফোঁপাতে থাকে। বয়সে ঝিমিয়ে যাওয়া চোখদুটো দিয়ে বুড়ি ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে—'না, লাগেনি ত দেখচি। তা হ্যাঁরে তুই কাঁদিস কেন?' বুড়ি ওর মুখ থেকে হাত দুটো জোর করে নামিয়ে নিল। ওর হাতের ধুলোয় চোখের ঠিক তলায় আঠাল কালচে রং লেগেছে। বুড়ি ওর চুলে হাত বুলিয়ে বলল, 'কি হয়েছে রে, কাঁদচিস কেন? মা বুঝি মেরেছে?'

ছেলেটা অবাক-চোখে ঠাক্‌মার দিকে তাকাল, মাথা নাড়ল কেমন বোকার মত, আঙুল দিয়ে কি যেন দেখাতে গিয়ে হাতটা দিয়ে আবার ঢেকে ফেলল চোখ। তারপর ফোঁপাতে লাগল।

হাটবারে পথটায় লোকজন অনেক। একজন চেনা মানুষ ঠাক্‌মাকে বলল, 'ঠাক্‌মা, বোধহয় হারিয়েছে ছেলেটা, এ গাঁয়ে ওকে কখনো দেখিনি ত। পাশের গাঁ থেকে বাবা-কাকা কারুর সাথে এসেছিল, হারিয়ে গেছে।'

'তা আমি কি করি বল্‌ দে-নি। কোথায় পাই ওর বাবা-মাকে।'

'তোমাকে আমি কি বলব ঠাক্‌মা। তুমি হলে গে' গাঁয়ের...'

'থাক্‌ থাক্‌। তা বেশ আমি একে এখন বাড়ি নিয়েই চল্লুম। তুই সকলকে এট্টু বলে দিস, কেউ ছেলে খোঁজ কল্লে ইদিকে যেন আসে।'

'ওর বাড়ি কোথায়? বাবা-মার নাম?' ছেলেটার দিকে তাকাল মানুষটা। ছেলেটা তেমনি চোখের জল মুছছে যদিও কান্না কিছুটা কমেছে। ঠাক্‌মা তার চিবুক ধরে তুলল, 'হ্যাঁরে ছেলে, তোর ঘর কোতা? জানিস? কি রে? কথা কস না কেন?'

মানুষটা হাসছে, 'বাড়ি নে তুমি ওরে খাওয়াও দাওয়াও, তবে যদি ঠাণ্ডা হয়ে বলে।'

'সে কি আর তোকে শিখ্যে দিতে হবে? আমি ত ওকে ঘরে নিয়েই যাচ্চি। তুই এট্টু দেখিস বাছা, কেউ যদি ছেলে খোঁজে ত আমার কাছে পাঠিয়ে দিস।'

ছেলেটাকে নিয়ে বুড়ি এগোল বাড়ির পথে। বুড়ির সঙ্গে চলতে কোনরকম আপত্তি করল না, চোখের জলে ভিজে হাতটা বুড়ির শুকনো চামড়া-মোড়া হাতে সমর্পিত করে ধীর পায়েই সে চলতে লাগল। ঠাক্‌মা একবার করে ওর দিকে চায়, এক একটা গাছের ছায়া পেরোয়, আর ভাবে—আহা, কাদের বাড়ির ছেলে আজ আমার কাছে এসে পড়েছে পথ হারিয়ে। হয়ত বাবা-মার একমাত্র আদরের ধন। বাবার হাত ধরে হাটে যাবার বায়না করে রোজ, তাই বাবা আজ এনেছিল। হয়ত হাট থেকে ওর জন্য কিনে নিয়েছে রং-করা মিঠাই এবং আরও কত-কি। গাঁয়ের পথে ওকে দেখিয়েছে টুকটুকে লাল লঙ্কা-ভরা গাছ, পেরিয়েছে রোদ-টলমল পুকুর। তারপর—তারপর ঐ দস্যি, চঞ্চল ছেলেটা বাবার হাত ছিটকে কখন ছুটেছে কোন রং-ঝলমল প্রজাপতির পেছনে, আর হারিয়ে গেছে অচেনা এই পৃথিবীর পথে। কিংবা হয়ত কোথাও সাপ-নাচানো বাঁশির সুরে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভিড়ের মধ্যে, বাবা চলে গেছে—সে একলা পড়ে আছে পথের ওপর।

বাড়ির সামনের চেনা লালু-কুকুরটা যেন ঠাক্‌মার চিন্তা ভাঙাতেই শব্দ করে ডেকে উঠল। 'আয় ভালমান্‌সের ছেলে ঘরে আয়', বুড়ি হাত ধরে ওকে নিয়ে ঘরে ঢুকল, ওর মাটি-লেপা একটুকু ঘরে, ওর একলার জগতে।

কিন্তু ঠাক্‌মা ভুল করেছিল, এখন ঠাক্‌মা বুঝতে পারছে—ও ভুল করেছিল। সে কি একবারও বুঝতে পেরেছিল ছেলেটা—অমন সবুজ পাতার মত সুন্দর ছেলেটা বোবা, একেবারে বোবা আর কালা! গলা দিয়ে পশুর মত একটা আওয়াজ ছাড়া তার আর কিছু বেরোয় না। দু' চোখ দিয়ে যেন শুধু গিলতে চায় পৃথিবীকে। ওর কাছ থেকে কি করে জানবে ও কার ছেলে, ওর কোথায় ঘর, ও কেন হারাল? তবু বুড়ি ওকে ছেড়ে দিতে পারেনি। চিন্তা-ভাবনায় দুলতে দুলতে ওকে নাইয়েছে, খাইয়েছে, ওর ময়লা জামাটা ধুয়ে পেরেকে শুকোতে দিয়েছে। আর এখন দাওয়ায় বসে মশলা গুঁড়নোর শব্দে গাঁয়ের নিঝুম দুপুরটাকে ভাঙতে ভাঙতে বুড়ি ওর কথাই ভাবছে। ঐ যে ছেলেটা দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে আনমনে দুপুরের রোদ্দুরের মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে আঙুল চুষছে, ওর যেন কিছু হয়নি এমনভাব—ঐ দিকে তাকিয়ে বুড়ি ভাবে আর ভাবে। শালের বনে ছায়া ঘনায়, পুবের হাওয়ায় ধুলো উড়ে যায়, সিঁদুরে মেঘে জাম-রং ছড়ায়—বুড়ির মশলার গুঁড়ো এদিক-ওদিক ওড়ে। 'কেউ ত নিতে এল না ওকে—তবে আমি কি করি?' বুড়ি আপনমনে ভাবে, 'একে ত ছেড়ে দেওয়া যায় না, একবার যাকে এনেছি তাকে কি অমন করে ফেলে দিতে পারি? কিন্তু জাত-বেজাত কিছু জানলুম না, ঘরে রাখি কি করে?' বুড়ির কোনদিকে খেয়াল নেই, এমন ঝামেলায় সে ত কখনো পড়েনি।

'ঘি লাগবে ঠাক্‌মা, ঘি!' কার ডাকে বুড়ি সচকিত হয়।

'ও—গন্‌শা! না ভাই ঘি এই করে নেলুম। দু'দিন পরে আয়।'

গণ্‌শা ব্যস্ত পায়ে চলে গেল দূর থেকে দূরে—। দু'দিন বাদেই ঘি-মাখন বেচতে আসা চাই ওর। ভারি জ্বালাতন করে। কিন্তু ঠাক্‌মার চোখে ব্যথার ছায়া নামে, করবেই বা কি ও! বাড়িতে চোদ্দজন মানুষ সব মিলে; বড় অভাবের সংসার—তাই ওকে সারাদিন এভাবে ঘুরে বেড়াতে হয়। বুড়ির উঠোনে ছায়া নেমেছে ঘন হয়ে, একটা ব্যাঙ ডাকতে শুরু করেছে—ক্রোক ক্রোক। যে পথ দিয়ে গণ্‌শা এইমাত্র চলে গেল, সেদিকে চেয়ে বুড়ি হঠাৎ কেঁপে উঠল।

ঐ যে ছেলেটা এই মুহূর্তে চোখে বিন্দু বিন্দু জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খুঁটি ধরে—ও হয়ত সত্যিই হারিয়ে যায়নি। হয়ত গণ্‌শার মত একটা লোক, যার পরিবার চোদ্দ-পনেরো-জনের,—সে-ই এ ছেলেটার বাবা। সংসারে তার গণ্‌শার মত অভাব, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, এ-পাড়া ও-পাড়া ঢুঁড়ে ফেরে—'ঘি চাই, মাখন চাই, দুধ চাই!' দূরের হাটে-বাটে চলে যায় বিক্রি করতে নিজের সামান্য সম্বল। বুড়ি মা খোঁটা দেয়, 'বুড়ো বয়সে এম্নি বরাত ছেল রে!' বিধবা পিসী হয়ত দশ-জনের কাছে বলে বেড়ায়, 'ওয়ার টাকা আছে, আমাকেই শুধু ছ্যাঁড়া কাপড় পর্যে রাখে, পর কিনা!' ছেলেমেয়েগুলো মেলায় খাবারের দোকানের দিকে জুলজুল করে তাকায়—'বাবা যদি দশটা পয়সা দিত!' আবার ঐ বোবা ছেলেটা হয়েছে এক জ্বালা, তাকে বলে-কয়ে কিছু করানো যায় না, হয়ত করতেও চায় না সে—সব ভাইবোন হাবা বলে ক্ষেপায়; আঁচড়ে, কামড়ে, থুতু ছুঁড়ে সে ক্ষেপাটের মত পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। অকর্মণ্য, ডানপিটে ছেলেটাকে কোনদিন আধ-পেট-খাওয়া শরীরের বিকৃত মনটা সহ্য করতে পারেনি—'কি হবে আর ওটাকে বাড়িতে রেখে, শুধু বসে গেলে...।' দূরের এই হাটে নিয়ে এসে কায়দা করে ছেলেটাকে ছেড়ে সে চলে গেছে; আর কোনদিন ফিরে নিতে আসবে না, কোনদিনও না। ভাবতে ভাবতে পাগল বুড়ি ছেলেটার দিকে চাইল। আবছায়ায় ঢেকে গেছে তার মুখ। দাওয়ার খুঁটি ঠেস দিয়ে শ্রান্ত ছেলেটা বসে পড়েছে। ঠাক্‌মা আঁচলে চোখ মুছল।

না, না, মা-বাবা এত নিষ্ঠুর হতে পারে কখনো? ঠাক্‌মা বারবার চিন্তাটা মুছে ফেলতে চাইল। এ ভাবনা এল কেন তার মাথায়—বুঝতে চাইল। কই! এমন ত সে কখনো দেখেনি,—তাদের রায়বাড়ির ছোটবাবুর ছেলেপিলে ছিল না বলে একটা অনাথ-আশ্রমের ছেলেকে পুষ্যি নিয়েছিল। ছেলেটা বড় হয়ে বয়ে গেল, তবু কি ফেলতে পারলে তারা? বুড়ির মশলা-পেষা কখন থেমে গেছে, শাঁখ বেজে উঠছে গাঁয়ের কোন্ বাড়ি থেকে। ঠাক্‌মার বাড়ির পাশের নালায় একটা কুকুরের চক্‌চক্ জল চেটে খাওয়ার শব্দ। কেমন নিথর সন্ধ্যা!

আচ্ছা, ছেলেটা ত অনাথ হতে পারে, কুড়িয়ে পেয়ে কেউ ওকে বাড়িতে রেখেছিল; আদর দিয়ে মানুষ করতে নয়, বাড়ির কাজকর্ম করাতে ঐ বোবা অবোধ শিশুটাকে দিয়ে; কত-কত-দিন আগের ধূসর স্মৃতি এই সন্ধ্যার ধূসর বেলায় বুড়ির বুকে ঢেউ দিল, সে-ও একদিন মা-কে হারিয়ে গিয়েছিল এক বাড়িতে কাজকর্ম করে দিতে, ডুরে শাড়ি তখনো সে ঠিকমত সামলাতে পারে না। তারপর কত ঘটনা কত যুগ পেরিয়ে গেছে...। ছেলেটাও তার সেই সেদিনের মত বাড়িতে সবার কাছে মার-ধোর খেয়ে, গালাগাল খেয়ে মানুষ। বুড়ির গাল ভিজে উঠছে,

www.BanglaBook.org

নাঃ—গালাগাল ওকে কে করছে—বোবা যে! গাল দিতে পারে না বলে হাত আরো বেশী চলে আর মনে মনে হয়ত বিড়বিড় করে, 'একে তো বোবা, তায় আবার কাজের ছিরি! রাখা কেন ওটাকে?' সহ্য করতে পারেনি ছেলেটা শেষে, পথে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু কোথায় যাবে? কথা বলতে পারে না যে কাউকে বলবে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা, কাউকে বলবে 'আমাকে রাখবে তোমরা? আমি সব কাজ করে দেব। আমাকে তোমরা মেরো না।' শুধু ঐ বড় বড় চোখ দুটোকে রক্তাক্ত করে কাঁদা ছাড়া আর কিই বা করতে পারে ও? ঠাক্‌মার চোখের জল জ্বলতে লাগল গাঁয়ের তুলসী গাছে দেওয়া প্রদীপের একটু আলোর মত।

ঠাক্‌মা ঠিক করতে পারল না ছেলেটা সত্যিই কে, সত্যিই কী! ওর কালো-মাটির সরার মত বুকে তার কোন কল্পনাটা ঠিক-ঠিক লেগে যায়। শুধু বুঝতে পারল ওর এতদিনের জীবনটা, এতদিনের ঘুঙুরের-মত-বাজতে-থাকা বুকটা ছেলে-টাকে ফেলে দিতে পারছে না, বুকে তুলে নিতেও পারছে না। বুড়িকে আজ কে বলে দেবে ও কি করবে? ঠাক্‌মার ঘোমটা খুলে গেছে, মেঘের মত সাদা চুলওলা মাথাটা স্পষ্ট হয়ে আছে অন্ধকারে, ওখানে হাতড়ে হাতড়ে ঠাক্‌মা খুঁজে পাচ্ছে না সে কি করবে। শ্মশানের দিকে মুখ করে বসে দু'দিনের জন্য ছেলেটাকে কোলে তুলে নেবে, না, পৃথিবীর সমস্যায় ছেড়ে দেবে ওকে জীবনের পথ খুঁজে নিতে নিজে-নিজে?

বড় অন্ধকার! ঠাক্‌মার মনে পড়ল আজ ঘরে বাতি জ্বালা হয়নি, বিকেল-সন্ধ্যের সব কাজ রয়ে গেছে বাকি। ছেলেটা বোধহয় অন্ধকারে ঘুমিয়ে গেছে, মনে হল তার। ঠাক্‌মা নুয়ে-নুয়ে হেঁটে ঘরে ঢুকল—তার এক-চিলতে ঘরে। ফড়ফড় করে ছিঁড়ল কাপড়টা দরজার একটা দেরেকে আটকে! দেশ-লাইটা খুঁজে পেতেও বড্ড দেরী। তারপর লম্ফ জ্বলে উঠল—টিমটিম। ঠাক্‌মার ছায়া মাটির দেওয়ালে কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল—পড়ল দাওয়ায়। খুঁটির কাছে আলোটা ধরল ঠাক্‌মা, ঝুলা-ধরা, মলিন, উইয়ে খাওয়া, কুমিরে-পোকার বাসাওলা খুঁটিটার লম্বা ছায়া পড়ল দালান চিরে। ঠাক্‌মার কথা ফোটে না—ছেলেটা কোথায়? অন্ধকার বাগানে আঁতিপাঁতি খুঁজল সে, যে হঠাৎ এসেছিল সে হঠাৎ আবার চলে গেছে!

ঠাক্‌মা কি এই চেয়েছিল? এইরকম? নিশ্চয়ই। তার ত আর কোন সমস্যা রইল না, তাকে বইতেও হল না বোবা ছেলেটাকে, আবার নিজের হাতে সরিয়ে দিতেও হল না। তবু ঠাক্‌মার বুড়ো রক্ত তোলপাড় হয়। চোখের কোটরে নোনা সমুদ্র বাঁধ ভাঙতে চায়। ছেলেটা ঠাক্‌মাকে হারিয়ে দিয়ে গেছে। ঠাক্‌মা কত লোকের বিপদ কাটিয়েছে কতদিন, আর ঐ এক-রত্তি ছেলেটা—যার মধ্যে নিজের সব কল্পনা নিয়ে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল—সে তাকে হারিয়ে দিয়ে গেছে।

'ঠাক্‌মা ঘরে আছ? আমার বড় জ্বালা।'...একটা মূর্তি বেড়ার দরজা ঠেলে পার হচ্ছে। ঠাক্‌মা লম্ফ হাতে ঘরে ঢুকে গেল।

১৩৮৪

মাকড়সার লড়াই

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

মকড়সা বা মাকড়সার জালের সংগে তোমাদের সকলেরই কিছু না কিছু পরিচয় থাকার কথা। কিন্তু মাকড়সা হলেই যে তাকে জাল বুনতে হবে, এমন কোন কথা নেই। বিভিন্ন জাতের হাজার হাজার রকমারি মাকড়সা দেখা যায়। এদের অনেকেই কিন্তু জাল বোনে না—ইচ্ছামত যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। সামান্য কয়েকটি জাতের মাকড়সা ছাড়া অধিকাংশ মাকড়সাই সামাজিক প্রাণীর পর্যায়ে পড়ে না। একাকী বিচরণ করাই তাদের স্বভাব। এরা একে অন্যকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে। দৈবাৎ কোন কারণে একে অপরের সামনাসামনি এসে পড়লে আর কথা নেই—সংঘর্ষ অনিবার্য। প্রতিদ্বন্দ্বীর যে কোন একটি সম্পূর্ণ রূপে পর্যুদস্ত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই থামে না। বিভিন্ন সময়ে কয়েক জাতের মাকড়সার মধ্যে এই রকমের কয়েকটি লড়াই প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ হয়েছিল—তারই একটি ঘটনার কথা বলছি।

আমাদের দেশে ঘরের দেয়ালে, আনাচে-কানাচে ধূসর বর্ণের অন্ততঃ দুই জাতের বেশ বড় বড় মাকড়সা দেখা যায়। এক জাতের মাকড়সা ডিমগুলিকে পর্দা দিয়ে দেয়ালের গায়ে আটকে রেখে সেখানে বসে বসে পাহারা দেয় আর অপর জাতের মাকড়সা ডিম বুকে নিয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। এরা রাত্রিচর প্রাণী। দিনের বেলায় সময় সময় এই মাকড়সাকে ডিম বুকে নিয়ে পা ছড়িয়ে দেয়ালের গায়ে চেপ্টে বসে থাকতে দেখা যায়। এরা সাধারণতঃ ঘরো মাকড়সা নামেই পরিচিত। আকস্মিক-ভাবেই একদিন এই রকমের দুটি মাকড়সার মধ্যে ভয়াবহ এক লড়াইয়ের দৃশ্য নজরে পড়েছিল।

সন্ধ্যার পর একদিন ঘরে বসে কাজ করছি। হঠাৎ দেয়ালটার দিকে নজর পড়লো—বেশ বড় একটা ঘরো মাকড়সা ডিমের থলি বুকে নিয়ে দেয়ালের গায়ে নিশ্চলভাবে বসে আছে। প্রায় দশ-পনেরো মিনিট কেটে গেল—মাকড়সাটার নড়বার কোন লক্ষণই নেই। ইতিমধ্যে উপরের একটা ফাটল থেকে আরশোলার মত ছোট্ট একটা পোকা বেরিয়ে এসে এদিক-ওদিক একটু ঘুরে-ফিরে দ্রুতগতিতে আবার ফাটলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। পোকাটার মাকড়সার নজর এড়িয়ে যাবার কথা নয়—তথাপি সে কিন্তু পূর্বের মতই নিশ্চল, চাঞ্চল্যের কিছু মাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। কিছুক্ষণ পরেই পোকাটা আবার ফাটল থেকে বেরিয়ে এসে বেশ দ্রুতগতিতেই বোধ হয় নীচের দিকে যাচ্ছিলো। ইতি-মধ্যে চোখের নিমেষে বিপরীত দিক থেকে ডিমের থলি বুকে নিয়ে আর একটা মাকড়সা বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটে এসে বসে-থাকা মাকড়সাটার মুখোমুখি হতেই হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেল। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান তখন দশ-বারো ইঞ্চির বেশী নয়।

www.BanglaBook.org

পোকাটা যে কোথায় গেল, সেটা আর লক্ষ্যই করিনি। প্রায় ৪।৫ মিনিট কেটে গেল—উভয়েই উভয়ের মুখোমুখি হয়ে নিস্পন্দ-ভাবে বসে আছে—ঠিক যেন ঝড়ের পূর্বের নিস্তব্ধতা। কিন্তু এই নিস্তব্ধতা বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না। বসে-থাকা মাকড়সাটা তার সামনের পা দুটোকে উঁচু করে আগন্তুক মাকড়সাটার দিকে ছুটে গেল। আগন্তুক মাকড়সাটা ভয় পেয়ে প্রথমটা পালিয়ে যাবার উপক্রম করেছিল বটে, কিন্তু পালাবার উপায় নেই দেখে সেও এবার সামনের পা দুটোকে উঁচু করে আক্রমণকারীকে ঠেকাবার চেষ্টা করতে লাগলো। উঁচু-করা পায়ে পা ঠেকিয়ে উভয়ে কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলি করবার সময়েই এক ফাঁকে আক্রমণকারী মাকড়সাটা আগন্তুক মাকড়সটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং উভয়ে জড়াজড়ি করে পরস্পরকে দংশনের চেষ্টা করতে লাগলো। মাত্র দু-তিন সেকেন্ড এই রকম ব্যাপার চলবার পর উভয়েই সরে দাঁড়ালো, কিন্তু কেউ স্থান ত্যাগ করলো না। দু-তিন মিনিট বাদেই আবার দ্বিতীয় দফায় লড়াই শুরু হয়ে গেল। সে এক ভীষণ দৃশ্য। উভয়ে জড়াজড়ি করে যেন একটা ডেলা পাকিয়ে গেল—কেউ কাউকে ছাড়ে না। উভয়ে উভয়কে বিষদাঁত ফুটিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। এই গুরুতর অবস্থার মধ্যেও কেউ ডিমের থলি ছাড়ে না। প্রাণ গেলেও কেউ ডিমের থলি ছাড়বে না। কয়েক সেকেন্ড ধস্তাধস্তির পর টাল সামলাতে না পেরে জড়াজড়ি করে উভয়েই মেঝের উপর বড় একটা এনামেলের পাত্রের মধ্যে পড়ে গেল। উঁচু থেকে পড়ে গিয়েও কিন্তু তারা বিচ্ছিন্ন হলো না—একই ভাবে সমানে ধস্তাধস্তি করতে লাগলো। ধস্তাধস্তির মধ্যেই একটা মাকড়সার একখানা ঠ্যাং শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একপাশে ছিটকে পড়ে কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করবার পর একেবারে নিস্পন্দ হয়ে গেল। এতেও কিন্তু কোন পক্ষের উগ্রতা হ্রাসের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। কিছু-ক্ষণ পরেই তারা আবার দ্বিতীয়বারের জন্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল—তবে সেটা মুহূর্তেকের জন্যে। পরক্ষণেই তৃতীয় দফায় লড়াই আরম্ভ হলো। ছিন্নপদ মাকড়সাটা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং তৃতীয়বার লড়াই শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই নিস্তেজ হয়ে পড়লো—তার আর নড়বার শক্তি নেই। বিজয়ী মাকড়সাটা এবার পরাজিত মাকড়সাটাকে চিৎ করে ফেলে তার বুকের উপর উঠে শরীরের এখানে-সেখানে বিষদাঁত ফুটিয়ে দিতে লাগলো। দংশনের জ্বালায় মরণোন্মুখ মাকড়সাটার পা ও সর্বশরীর থরথর করে কাঁপছিল। ডিমের থলিটা তখনও তার বুকে শক্ত করে ধরা ছিল। বিজয়ী মাকড়াসাটা এবার সেই ডিমের থলিটাকে ছিনিয়ে নিয়ে একটা পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে পালিয়ে যাবার জন্যে পাত্রটার কিনারায় ছুটে গেল। কিন্তু পাত্রটার মসৃণ খাড়া পাড় বেয়ে উঠতে না পেরে সেখানেই বন্দী হয়ে রইলো। পরীক্ষাগারে বন্দীশালায় নিয়ে যাবার আগে বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করবার জন্য তাকে অবশ্য দীর্ঘ সময় দেওয়া হয়েছিল।

১৩৭৪

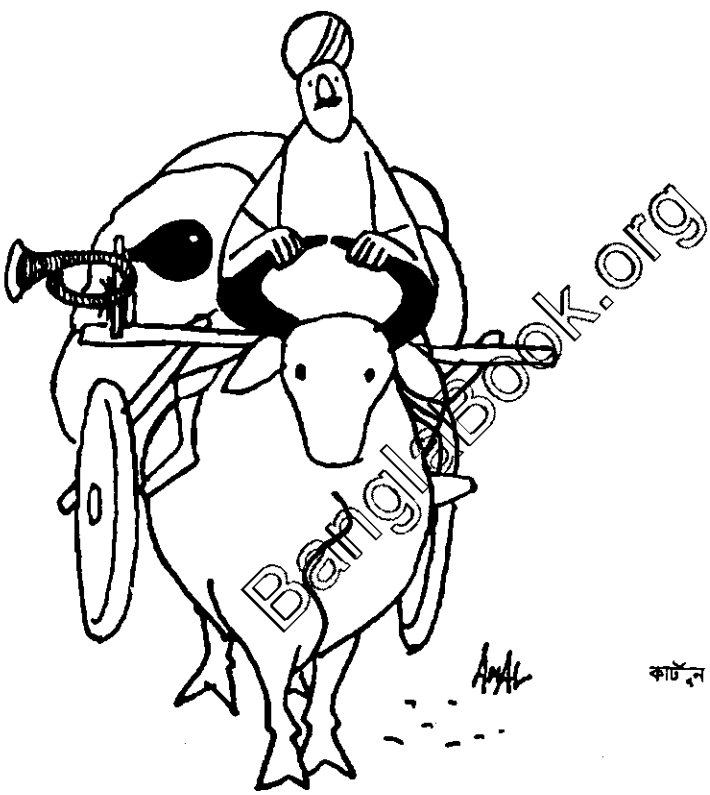

কার্টুন : অমল চক্রবর্তী

www.BanglaBook.org

সাধ

জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবার ঘরে তাকের 'পরে
বই কত যে থরে থরে
সে-সব দেখে ইচ্ছে করে মিঠুর হতে কবি।
কত নতুন রঙীন দিনে
নানা রঙের মেঘকে চিনে
সাধ জাগে তার তুলি কিনে আঁকতে অনেক ছবি।
মা কি কিছুই বোঝে?
তাই তো মিঠুন মায়ের চোখের আড়ালটুকু খোঁজে।
লিখবে বলে মিঠুন যখন বাবার পাতা টানে,
কিম্বা ছবি আঁকবে বলে রং-তুলি সব আনে,
মা শুধু কয় 'ছি ছি,
কাগজ তুলি নষ্ট করিস কেন মিছিমিছি!'

বাগানমালী মেহের আলী
তার কাছে এক ছোট্ট শালী
মেহেদ পাতা লাগিয়ে থালি রং করে সে হাতে।
অমনি করে দু'হাত ভরে
মাখতে যে রং ইচ্ছে করে
চুপি চুপি মালীর ঘরে গিয়ে সে হাত পাতে।
মা কি কিছুই বোঝে?
তাই তো মিঠুন মায়ের চোখের আড়ালটুকু খোঁজে।
সারা গায়ে চোখে মুখে সাদা জামার ফুলে
লাল মেহেদীর রং লেগে যায় নরম কালো চুলে
মা শুধু কয় 'ছি ছি!
জামা-কাপড় নষ্ট করিস কেন মিছিমিছি?

কেমন করে বুঝবে যে মা মিঠুর মনের সাধ
তাড়াহুড়োয় গন্ডগোলে ঘটায় প্রমাদ।

১৩৭৯

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মন্দোদরী

সুধীরকুমার চৌধুরী

রাবণ রাজা মস্ত রাজা, দশটা মাথা ঘাড়ে,
দশ রকমের ফন্দি মাথায় জোগাত একবারে।
এক সাথে দশ দিকে দৃষ্টি,
উলটে বেড়ান সকল সৃষ্টি,
হয় না সাহস কারুর তাঁকে বলতে কিছু পারে।

মন্দোদরী ভাগ্যবতী,
তাই পেয়েছেন অমন পতি,
ভাবত এবং বলত যারা, জানত না তো তারা,
রাবণ যখন দশটা নাকে
ডাক শোনাতেন রাত্রে তাঁকে,
তখন মন্দোদরীর দশা হত কেমনধারা।

দশটা মাথা ধরলে রাতে
টিপতে হত একলা হাতে,
অবিশ্যি যাঁর ধরত মাথা, কষ্ট ছিল তাঁরও;
দশ মুখে দশ রকম রুচি,
কার যে ঘি-ভাত, কার যে লুচি,
হিসেবটা রোজ গুলিয়ে যেত,—সে সব কথা ছাড়ো।

কে আগে খায়, বেশী কে খায়,
কে যে কখন কাকে ঠকায়,
তাই নিয়ে দশ মুখের বকায় লাগত কানে তালা,
যতক্ষণ না ঝগড়া মেটে
পেটের ক্ষিদে থাকবে পেটে,
মন্দোদরীর ভাত শুকোবে, রোজ ছিল এই জ্বালা।

দশটা মুখের একটা মুখও
দেখত যদি, এতটুকুও
রান্নাতে নুন কম হয়েছে উচিত যা তার চেয়ে,
তখন ভুলে ঝগড়াঝাঁটি
দাঁত খিঁচোত কুড়ি পাটি,
ভির্মি যেতেন মন্দোদরীর মতন শক্ত মেয়ে।

১৩৬৯

www.BanglaBook.org

পত্রমিতা চাই নাকি?

কার্তিক ঘোষ

পত্রমিতা চাই নাকি ভাই,
পত্রমিতা চাই নাকি?
আমার সঙ্গে ভাব জমাবে
ইচ্ছে আছে, তাই নাকি?
তবে তো ভাই ভালোই হল
দাও চিঠি দাও চট করে।
কোথায় থাকি তাও জান না,
নাও টুকে নাও ঝট করে!
তেইশ-এর-এ, ভূপেন্দ্রনাথ
রোড লিখো নীল খামটাতে,
উত্তরপাড়া, হুগলী, লিখে
খেয়াল রেখ নামটাতে—
নামট যেন ভুল কর না
হুঁশ থাকা চাই তখন যে
নইলে কোথায় গোল বেধে যায়
কেউ জানে না কখন যে।
ভাবছ আমার বয়স কতো—
এক-বয়সী হই কি না?
একই ক্লাসের ছাত্র কিংবা
লক্ষ্মী সোনা নই কি না?
যা খুসি তাই নাও ধরে ভাই
হলই বা তা মনগড়া
মজা কি তার কম কিছু ভাই—
একটু হলেই মনভরা!
শখ রয়েছে তোমার মতন
লিখেই চিঠি টুপ করে
লাল লেটারের বাক্সটাতে
দিই গলিয়ে ঝুপ করে!
শখ রয়েছে বই পড়া আর
জানলা দিয়ে গাছ দেখা,
সাত-সকালে গাছের পাতায়
মিষ্টি রোদের নাচ দেখা!
শখ রয়েছে তোমার মতই
আঁকা-লেখা-গান করা
টই-টুম্বুর পুকুর পেলেই
সাঁতার কেটে চান করা।
একটি আঁকি, তিনটে লিখি
দিই পাঠিয়ে সন্দেশে
হঠাৎ ছাপা হয়ে এলেই
ঘুমোয় তখন গন্ধে কে?
আমার মতন পত্রমিতা
তোমরা সবাই চাও কিনা
সন্দেশেতে ছাপিয়ে চিঠি
দেখছি জবাব দাও কিনা!
তবে তেমন চাই না জবাব
যে সব শুধু দায় সারা,
আজকে তাদের শুভেচ্ছা দিই—
পত্রমিতা চায় যারা।

১৩৭৯

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নামকরণ

অসিতবরণ হাজরা

হাসপাতালের ডাক্তারেরা ক'দিন আগে মা'কে
একটা নোতুন ভাই দিয়েছে—জানাচ্ছি আপনাকে!
হাত-পা ছোঁড়ে এখন থেকেই এটুখানি বালক,
ব'লছে পিসি, নাম হ'বে তার হয় জ্যোতি নয় আলোক।
ঠাম্মা বলে, নাম রাখা হোক বিদ্যুৎ বা তড়িৎ,
'রিভার-পাম্পে' কাজ করে যে, নাম দিলো সে সরিৎ!

অন্ধকারে লোড-শেডিং-এ সবাই খোঁজে আলো;
এই সব নাম সবার কাছে তাই মনে হয় ভালো!
আমার মতে বিদ্যুৎ বা তড়িৎ, সরিৎ, জ্যোতি
মাস কাবারে 'বিল' দিয়ে যায় মিশিয়ে দুর্গতি।
তাই তো আমি অ-নে-ক ভেবে নাম দিয়েছি সে'টার—
ব'লুন তো কী? পাল্লেন না? ব'লবো?—'জেনারেটার'।

১৩৮৬

এক যে ছিল ডাইনি

বিনোদ বেরা

এক যে ছিল ডাইনি,
রাত্রি হলে বলত—আমি বছর পাঁচেক খাইনি।
জুড়ত বিষম কান্না—
হুতোমপেঁচা বলত তারে : আর না বুড়ি, আর না।
চেঁচামেচির শব্দে তোমার রাত্রি গেছে থমকে,
ঘুমের ভিতর খোকাখুকু উঠছে বিষম চমকে,
থাম রে, বুড়ি আর না—
থামাও তোমার চেঁচামেচি, থামাও তোমার কান্না।
ডাইনি তবু থামত নাকো। তখন হুতোমপেঁচা
ধরত বিকট মূর্তি, বলত—এবার বুড়ি চেঁচা!
ভীষণ ভয়ে হাবিয়ে দিক্‌দিশে
ডাইনি বুড়ি পালিয়ে যেত অন্ধকারে মিশে॥

১৩৭০

www.BanglaBook.org

হবে না কেন?

রাধারমণ গোস্বামী

আঁক যদি বা অঙ্ক
ঠাকুরদাদার টাক না হয়ে
হতেও পারে টঙ্ক।

হাসি যদি হাস্য
কাশি হলে বলবে কি ছাই
হয়েছে যে কাশ্য!

গান যদি হয় গীত
ক্ষুরের গায়ে শান না লেগে
লাগবে নাকি শীত?

গাল যদি হয় গণ্ড
মামার পাতে দাল না দিয়ে
দিয়ো তাঁরে দণ্ড।

পক্ষী যদি পাখী
'চক্কীমশাই' নাম কখনো
নেবে না শ্যাম চাকী।

রাত যদি হয় রাত্রি
লোহার পাতের বিনিময়ে
আনব কিনে পাত্রী।

হাতী যদি হস্তী
বাতিগুলো না জ্বালিয়ে
জ্বালাবে কি বস্তী?

মিত্র যদি মিতা
হাবার বাবার চিত্রটাকে
বলবে কি কেউ চিতা?

১৩৬৮

ছড়া

আশানন্দন চট্টরাজ

ইচিং, বিচিং চিচিং ফাঁক
গুব্‌রে পোকার খোকার ঢাক,
ঢাকের ভেতর শাকের আঁটি
আঁটির গায়েই এঁটেল মাটি,
এঁটেল মাটির বাটীর বেড়া
বাঁশের বাতায় বেশ তো ঘেরা।
ঘেরার গায়েই গাবের গাছ
গাছের আগায় বাঘের নাচ।
নাচের তালেই তব্‌লা ঠুকে
কাছিম, কুমীর হাঁটছে বুকে।
বল্‌ছে বারেক,—বাজাও শাঁখ
ইচিং, বিচিং চিচিং ফাঁক।

১৩৭৩

ছড়া

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

ব্র্যাবোর্ন রোডে উড়াল পুল
ভূগর্ভেতে রেল
আজব শহর কলকাতাতে
নিত্য নতুন খেলা।
এই খেলারই পাশে পাশে
আদিম খেলা চলে—
ঝমঝমাঝম বৃষ্টি হলেই
শহর ভাসে জলে।

১৩৮৬

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিটমাট

রাম চট্টখুণ্ডী

তেড়ে এসে বলে রুখে আমাদের রামদা,
'কেটে করি কুচি-কুচি, নিয়ে আয় রাম দা!'
ভয়ে কাঁপে ভোলানাথ, মুখ গেল চুপসে,
খাটের তলায় ঠায় বসে রয় চুপ সে।
ছুটে এসে বলে শেষে হরিহর বিশ্বাস,
'আমার কথাটি আজ কর ভাই বিশ্বাস!
লক্ষ্মীটি, মাথা খাও! দেখ ভেবে-চিন্তে—
আসল চোরকে দাদা, পারনিকো চিনতে!
কাকটা যে মুখে নিয়ে সাবানের 'কেসটা'
উড়ে গেল, নিজ-চোখে দেখে এল কেষ্টা!'
গোলমাল শুনে এল গদাধর ডাক্তার—
বোস-বাড়ি রুগী দেখে, ভারি নাম-ডাক তার।
দেখে-শুনে বলে হেসে রামদাস ভড়কে,
'হাঁক-ডাক শুনে ভাই, গিয়েছিনু ভড়কে!
ভাগ্যিস্ হরিহর ব্যাপারটি জানত—
নইলে খতম হত ভোলার এ জান্ তো!'
রামদা বলেন, 'দেখি, সত্যের রোশনাই,
ভেঙে গেছে ভুল মোর, আর মনে রোষ নাই।'
হাত দুটি ধরে বলে ভোলানাথ চাকরে,
'ওরে ভোলা, ক্ষমা কর, নিয়ে আয় চা করে!'
আহ্লাদে আটখানা ভোলানাথ পাত্র,—
তাড়াতাড়ি 'কফি' দেয়—ভরে তিন পাত্র।
রামদাস, হরিহর, গদাধর আষকে—
ভোলানাথ খেতে দেয়—গুড়পিঠে, আসকে।

১৩৭৯

লিমেরিক

পথ্বীরাজ রায়

রকেট চড়ে মানুষ হাজির চন্দ্রলোকে,
বাজে খরচ—নিন্দা রটায় মন্দ লোকে।
বহু যুগের অপূর্ণ সাধ
মিটল এনে এক কিলো চাঁদ,
কবি মরেন চাঁদের হাসির অন্ধ শোকে।

১৩৮৩

www.BanglaBook.org

দেখুন খাতা খুলে

বীণা দেবী

অনেক দিনের কথা সে যে
ছোট্ট একটি মেয়ে
পথের পাশে রইত বসে
দূরের পানে চেয়ে।
দশটা বেলা বাজবে কখন
আসবে পিওন দাদা,
মস্ত বড় চিঠির ঝুলি
পিঠের 'পরে বাঁধা।
দেখতে পেলেই ছায়াটি তার
ফুটত হাসি মুখে
মনখানি যে উঠত দুলে
অজানা কোন সুখে।
'পিওন দাদা বই এনেছো?
আমার সে সন্দেশ?'
'সে বইখানি তোমার বুঝি?
আহা তা বেশ বেশ।'
দৌড়ে যেত ছোট্ট খুকী
আনত ডেকে মাকে
মা ছাড়া সে বইয়ের ভাষা
কে বোঝাবে তাকে?
সুকুমারের আবোল তাবোল
কত হাসির ঢেউ
তুলতো মনে খুশির তুফান
বুঝবে কি আজ কেউ?
দেশ-বিদেশের নানান কথা
ধাঁধা মজাদার
দিতেন যাঁরা সাজিয়ে ডালি
তাঁদের নমস্কার।
সেই যে খুকী—বুড়ী হল
যায়নি আজও ভুলে
গ্রাহকসংখ্যা 'এক' ছিল তার—
দেখুন খাতা খুলে।

১৩৮৪

এই চিঠিটা পেলে

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছোট্ট মিতুন লিখছে চিঠি
দাদুর কাছে তার,
লিখছে চিঠি দিদার কাছে,
মামার কাছে, আর—
যে বোনটা সেই খেলত পুতুল
লিখছে তারই কাছে,
ক'মাস আগের কথা সে আর—
পষ্ট মনে আছে।

বাবার সাথে গিয়ে মিতুন
দিচ্ছে ডাকে ফেলে,
দারুণ খুশি হবে সবাই
এই চিঠিটা পেলে!

১৩৭৭

ছড়া

সর্বাণী দাশগুপ্ত

কালি, কলম, মন
লেখে তিন জন—
ভাবনা আমার তাই—
কলম, কালি চিনতে পারি
মনটা কোথায় পাই?

১৩৮৬

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাল-বেতালের ছড়া

যাদুকর এ. সি. সরকার

দেখতে এসে দিল্লী শহর
লাগল তালা কর্ণে
ভূতের রানী শাঁকচুন্নীর,
মোটর গাড়ীর হর্ণে!

হেকিম এলো, বদ্যি এলো,
যায় না কানের তালা।
হদ্দ হল ওষুধ খেয়ে,
একি বিষম জ্বালা!

স্কন্দকাটা মামদো এল
বাজিয়ে মাদল-কাঁশি,
ভূতের রানীর কান সারাতে
বাজল শিংগা বাঁশী!

এত করেও সারলো না রোগ
ভূতের রাজা শেষে,
শাঁকচুন্নীর কান সারাতে
পিটলো ঢেঁড়া দেশে।

খবর পেয়ে রোগ সারাতে
বেতাল মশাই এলো,
মস্তবড় পাকানো গোঁফ,
পোষাক এলোমেলো।

এসেই বেতাল ঝুলির থেকে
বের করলো ছুরি।
সবাই ভাবে এবার বুঝি
ফাঁসায় রোগীর ভুঁড়ি।

মুচকি হেসে বেতাল বলে,
"আন রে লেবু আন—
লেবু কেটে রক্ত নিয়ে,
সারিয়ে দেব কান।"

কাটলো লেবু বেতাল মশাই
বসিয়ে ছুরির পোঁচ,
পড়লো ঝরে রক্ত ধারা।
চোমড়ালো সে মোচ্।

অবাক হয়ে ভূতের রানী
বিষম বিষম খেল,
হেঁচকি উঠে কানের তালা
আপনি খুলে গেল।

এক পলকে রোগ হতে দূর,
সবাই বলে, 'ধন্য!
বেতাল মশাই মস্ত গুণিন,
নেই জগতে অন্য!'

অল্প পরেই সেই কথাটা
তাল-এর কানে উঠলো,
বেতালেরে করতে নাকাল
তক্ষুনি সে ছুটলো!

তাল বললো, 'বুজরুকি সব,
নয় কিছু এর সত্য।
শুনুন সবে, প্রকাশ করি—
আসল গোপন তথ্য:

জবা ফুলের পাপড়ি ঘ'ষে
ছুরির ফলার 'পরে,
সেই ছুরিতে কাটলে লেবু
লাল রঙা রস ঝরে।

দেখুন সবে পরখ করে,
ঐ তো জবা ফুল।
আচ্ছা, আমিই দিচ্ছি ভেঙে
সবার চোখের ভুল।'

এই না বলে তক্ষুনি তাল
করলো শুরু কার্য।
তারপরে যা ঘটলো সে তো
ঘটাই অনিবার্য।

তাল-বেতালের মুড়িয়ে মাথা
চড়িয়ে গাধার পিঠে—
সবাই দিলো তাড়িয়ে তাদের
ছাড়িয়ে বসত ভিটে!

১৩৭৫

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

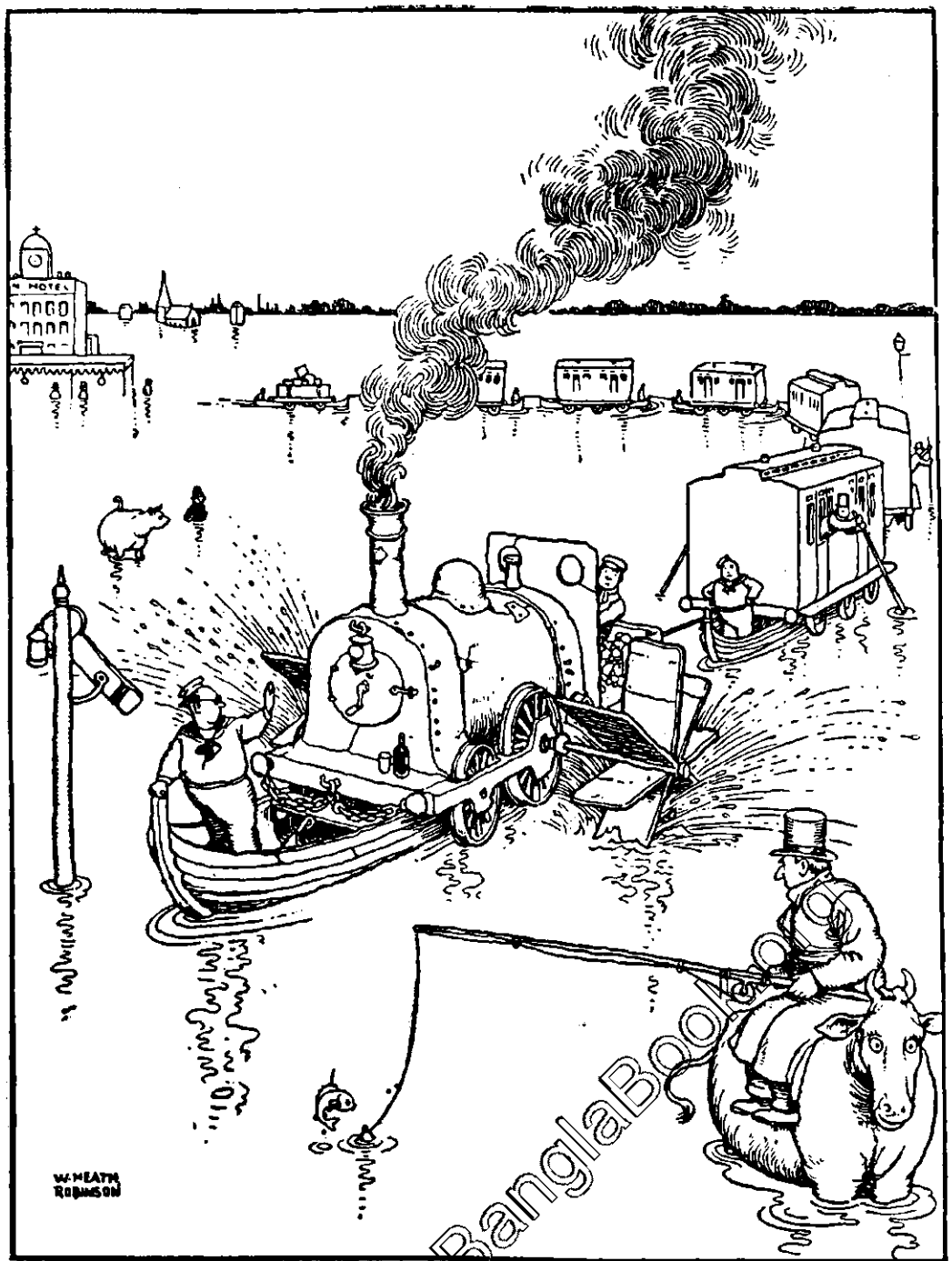

রেল লাইন ভেসে যদি যায় ঘোর বন্যায়
এইভাবে ট্রেন চালু রাখাটা কি অন্যায় ?

www.BanglaBook.org

'মাজের পাড়া জুবক শংঘো'

ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়

ইনু দোতলার বারান্দায় ঝুঁকে সামনের বাড়ির মেয়েকে ডাকলে—বুলি, ও বুলি, জানিস আমার মামাবাবু আসছেন।' বুলি ওবাড়ির জানলায় দাঁড়াতেই, তার পাশ দিয়ে তার ভাই শুঁটে মুখ বার করে বললে, (তার মুখে সব "শ" এবং "স" ইরেজী S-এর মত) 'তোমার কোন মামা ইনুদি, Sেই কাগজে লেখে—খুব বিদ্বান? Sেই Sেবার তোমার মামী আর মামাতো ভাইবোনকে নিয়ে ঢিSকা করে আSতে গিয়ে ঐ গলির মোড়ে যাঁর Sন্দেSর কৌটো আর তিনটে চামচ পড়ে গিয়েছিল, আমি ফুটো কুড়িয়ে দিয়েছিলুম?' ও পাশ থেকে ফুটো বলে উঠল, 'চামচে তিনটে নয় Sার, একটা হাতা, দুটো চামচে আর এক পাটি চটি, আমার মনে আছে; আর কৌটয় সন্দেশ ছিল না, কালাকাঁদ ছিল, আমি অনেকটা খেয়ে—' বুলি বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'উঃ যাঃ যাঃ, তোদের ইনুদি ফোড়ন দিতে ডাকেনি! বেরো এখান থেকে!' শুঁটে বললে, 'দাঁড়া যাচ্ছি। ইনুদিকে একটা কথা জিজ্ঞেS করেই চলে যাব। তোমার মামাবাবু আমাদের Sাহিত্য Sভার Sভাপতি হবেন ত ইনুদি? কোনো বড়লোক পাওয়া যাচ্ছে না, Sবাইকে ঢিঙ্গির গলির যুবক Sংঘ ভাঙিয়ে নিচ্ছে।' ইনু বললে, 'বেশ ত দুপুরে খাওয়ার পর তোরা কয়েকজন আসিস্, আমি মামাবাবুকে বলে দেব।'

তাই হল। কিন্তু বলাটা সহজে হল না। ইনুর কাছে সাহিত্য সভার কথা শুনে মামা যখন চশমাটা তাঁর উঁচু তীক্ষ্ণ নাকের ওপর ঠেলে তুলে কট্‌মট্ করে শুঁটে-ফুটোর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কারা করবে সভা! এরা?' তখন সবাই ভয় পেয়ে চুপ করে আছে দেখে শুঁটে দাঁত বের করে হেসে বলতে আরম্ভ করেছিল, 'হ্যাঁ Sার, আমরাই Sভা করব, Sাহিত্য Sভা—' কিন্তু 'কী কী, কী বললে?' গর্জন শুনে আর এগোতে পারেনি। ইনু উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে সামলে নিয়েছিল অবশ্য। বিনীত হাসি হেসে সে বলেছিল, 'ওর জিভটা একটু কেমন আছে ছোটবেলা থেকে, তাই সব কথাই ওই রকম বলে। এরাই সাহিত্য সভা করবে একটা। একটা রচনার প্রাইজ দেওয়া হবে। আপনি যদি সভাপতি হন তবে আপনিই দেবেন। আর রচনাটা কি করে লেখা হবে তাও একটু বলে দেবেন ওদের।' মামার মনটা বোধ হয় নরম হয়ে আসছিল, কিন্তু ওদের দলের সর্দার মত একটা ছেলে প্রথম ভয়টা ভেঙে যেতেই ফস্ করে বলে বসল, 'রচনাটা আর কি বলে দেবেন। রবি ঠাকুরকে নিয়ে লেখা—মানে রবি ঠাকুরের জন্মদিন কি না'—'কি মাস এটা?' একজন ছেলে বললে 'ভাদ্র', একজন বললে, 'দূর, শ্রাবণ'। আর একজন 'জুলাই, অপর একজন 'আষাঢ়'। মামাবাবু আষাঢ়ের মেঘের মত মুখ এবং অনেকটা তারই শব্দের মত গলায় প্রশ্ন করলেন, 'রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন কোন মাসে? তারিখ কি?' ফুটো ছিল সামনে, সে হকচকিয়ে বলে ফেললে, '২৫শে ডিসেম্বর।' আর যায় কোথা, মামা কি দিয়ে মারবেন খুঁজতে গিয়ে দেখেন সামনে ছেঁড়া কাগজের রাশ, আর খান কয়েক চটি খাতা ছাড়া কিছু নেই। ইতিমধ্যে একটি ফুট্‌ফুটে মেয়ে এগিয়ে এসে হেসে বললে, 'আমি জানি মামাবাবু, ২৫শে বৈশাখ, ইস্কুলে দিদিমণি বলে দিয়েছেন। ওরা কিছু জানে না, ২৫শে ডিসেম্বর ত বড় দিন।' মামার মেজাজ বোধ হয় মেয়েটির মিষ্টি মুখ দেখে, আর ঠিক কথা শুনে খানিক শান্ত হল। তিনি গুরুগম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কি?' সে বললে 'পিউ'। 'আর তোমার?' প্রশ্নটা শুঁটেকে। শুঁটে ভয়ে ভয়ে বললে, 'বু-বু-বুদ্ধদেব S-S-Sেনগুপ্ত।' পিউ তাকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে নীচু গলায় বললে, 'যাঃ, তোর নাম তো দেবব্রত, ফুটোর নাম তো বুদ্ধদেব।' একটু উঁচু গলায় মামাবাবুকে হেসে হেসে বুঝিয়ে দিলে—'ওদের দুজনের নাম কিছুতেই মনে থাকে না, ইস্কুলে নাম লিখিয়েছে, তাও ভুলে যায়। শুঁটে আর ফুটো বলে ওদের ডাকা হয় কি না—'। 'ফুটো, হাঃ হাঃ হাঃ! ফুটো আর ছেঁদা হলে আরও ভালো হত। সব বিদ্যেবুদ্ধি ফুটো আর ছেঁদা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে—হাঃ হাঃ হাঃ! সকলকে অবাক করে তিরিক্ষি মেজাজ মামা হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে এমনি হেসে উঠলেন যে নাক থেকে চশমাটা ফট্ করে তাঁর লেখা আলগা কাগজের গাদার উপর পড়ে গেল। ঠিক সেই সময় আবার একটা দমকা বাতাসে কাগজগুলো উড়ে ঘরময় হয়ে যেতে লাগল। তখন 'ধর্ ধর্' রব উঠল। ছেলেমেয়ে যারা এসেছিল তারা মহানন্দে হুড়ে ঢুকে কাগজ কুড়িয়ে এনে মামাবাবুকে দিতে লাগল। এভাবে দৈব দুর্যোগে সন্ধি স্থাপনটা ভাল মতই হয়ে গেল। ফুটো যখন চশমাটা হাতে দিলে তখন তিনি খুসি হয়ে বললেন, 'বেশ, বেশ, কি রচনা লিখবে বল। ভাল করে লিখতে হবে কিন্তু, ফাঁকি নয়।' সেই সর্দার ছেলেটা আবার ফাঁসাতে খন্‌খনে গলায় বলে, 'ওটা ত ডাঃ নিতাইপদ মিস্ত্রীর "রচনা চয়নে" খুব ভাল আছে। আমার সবটা মুখস্থ হয়ে গেছে।' শুঁটে বললে, 'ভুলুদার রচনা বইয়ে ওর চেয়ে ঢের এর আর ভাল রচনা আছে, দেখ্‌গিয়ে চন্দ্র তার থেকে মুখস্থ করেছে। তোর আর ফাস্ট হতে হবে না!' মামাবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন—'রচনা মুখস্থ? কর রচনা? কি নিয়ে? ভাল রচনা-লিখিয়ে চন্দ্র বল্‌লে, 'কেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে।' পিউ তখন ব্যাখ্যা করে বললে, 'আমাদের ত ঐ রকম করেই প্রাইজ দেওয়া হয় মামাবাবু। সেবার আমাদের জুনিয়র বেসিকে যখন রচনা পোতিযোগিতা হল তখন তেলি-পাড়া বেসিক ফাস্ট হয়ে গেল ত ঐ জন্যেই। ওদের মাস্টার মশায় রচনাটা বোর্ডে লিখে দিয়েছিলেন, আর ওরা সব মুখস্থ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

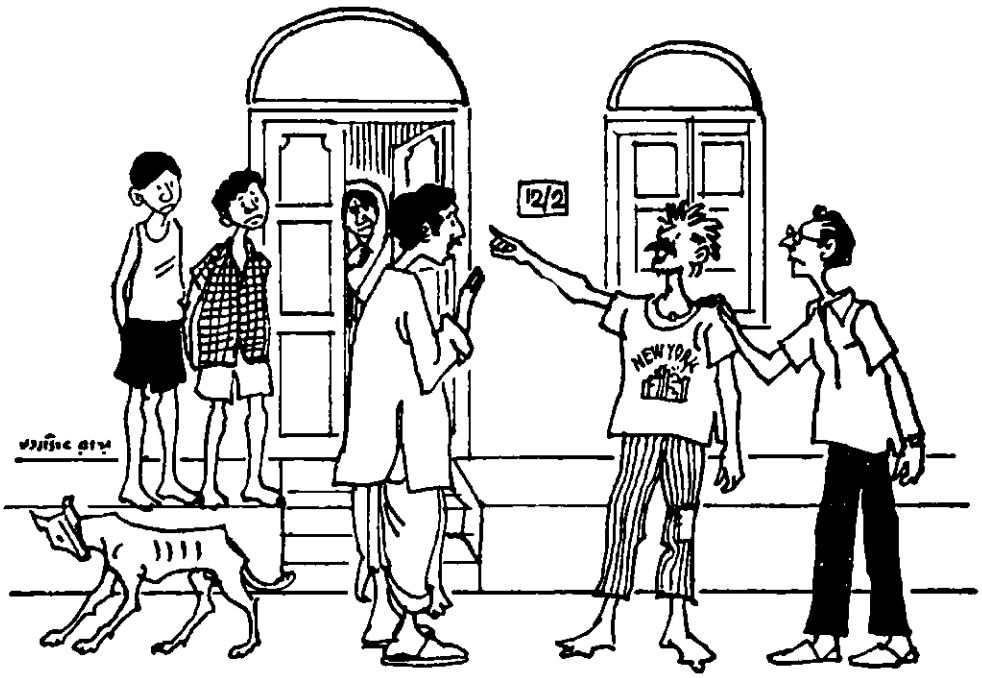

করে এসে ফাস্ট আর ফোর্থ হল। আমরা থাড আর সেকেন হলুম। আমাদের দিদিমণিও লিখে দিয়েছিলেন খাতায়, তবে তাঁরটা তেমন বড় হয়নি।' কথা শুনে মামাবাবু খানিক হাঁ করে রইলেন, তারপর দরজার দিকে আঙুল তুলে হাঁকলেন, 'বেরোও সব।'

এমন সময় নীচে একটা বিষম হট্টগোল, কুকুরের ডাক, মানুষের চেঁচামেচি, সবায়ের উপর ইনুর জ্যাঠাইমার হিন্দীতে বকুনি শোনা গেল। জ্যাঠাইমা বলছিলেন—'আরে বাবা দুপুরমে একটু চোখের পাতা এক করতে পারতা নেহি। কী পায়া তুম-লোক, কুকুরকে লোভ দেখাতা কাঁহে, কাঁহে ফিন্ পিট্‌তা? উ কৃষ্ণের জীব হ্যায় কি নেহি?' ছেলের দল ও ইনু ছুটে নীচে গেল। ব্যাপার এই যে একটা লোক ওদের রকে বসে থাকে, আর একটা কুকুরকে রুটির লোভ দেখায়, কিন্তু যেই সেটা কাছে আসে অমনি ঠেঙায়; কুকুরের কেঁউ কেঁউ শব্দে পাড়া মাত। জ্যাঠাইমার ঘরটা ঠিক রাস্তার ওপর, কাজেই তিনি ভীষণ রেগে গেছেন। সেই অদ্ভুত লোকটা রুখে দাঁড়িয়ে তার বাংলায় বলছে—'হামি পাবলিকের রাস্তামে সেই খুসি করবো। হামি ত হাঁপনার ঘরে ঘুসকে কুকুর মারছি না।' কুঁচো কাগজগুলোর উপর দুটো বালিশের পেপার ওয়েট চাপিয়ে, ইনুর মামাবাবুও ইতিমধ্যে এসেছিলেন। তিনি গিয়ে সোজা লোকটার ঘাড়ে হাত দিয়ে বললেন, 'ভদ্রমহিলার সঙ্গে ওরকম করে কথা বলতে হয় না।' লোকটা এধার ওধার চেয়ে বললে, 'ভদ্দর মহিলা কাঁহাসে বাবু, উন্‌হি ত চাটুজ্জি বাড়ির মেঝোমা, উন্‌হি ভদ্দর মহিলা হোবেন কেনো? উন্‌হি ছাতা আর বেগ্ লেকর ইস্‌কুল যান?' এমন সময় ভট ভট শব্দ করতে করতে একটা মোটর সাইকেল এসে দাঁড়াল, এবং তার থেকে নেমে এলেন ইনুর বাবা। ফরসা মোটাসোটা হাসিমুখ মানুষটি। তিনি যেই বললেন, 'কি রে ফকির, আজ আবার কি হল?' অমনি লোকটা ভালমানুষের মত 'রাম রাম বাবুসাব' বলে চটপট সরে পড়ল। অন্য লোকের ভীড়টাও পাতলা হয়ে গেল। ইনুর বাবা তখন মামার কাছে এসে বললেন, 'লোকটা আধ-পাগলা। ওর একটা কুকুর ছিল, আর কেউ ছিল না, নেইও। রিকসা টেনে টেনে যা পেত কুকুরটাকে খাওয়াত। সেই কুকুরটা ওর শত্রুরা বিষ দিয়ে মেরে দেয়—, সেই থেকে ওর মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে। কুকুরকে ডেকে খাওয়ায়, মারেও। মরবার সময় আমি কুকুরটাকে কিছু ওষুধ দিয়ে দেখছিলাম বাঁচান যায় কি না, তাই আমার কথা খুব শোনে। কই দাদা, চলুন ওরা চলে গেছে।' কিন্তু মামা আর নড়েন না। অনেকক্ষণ পর যেন জ্ঞান ফিরে পেয়ে বললেন, 'রচনা লিখবে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মুখস্থ করে! কেন, ঐ লোকটাকে নিয়ে লিখুক না, যাকে চোখে দেখতে পাচ্ছে। কোনো রচনার বইয়ে ত ওর কথা লেখা নেই। এই, কোথায় গেলে তোমরা!' ফুটো আর চন্দ্র কাছেই ছিল। তখন সেই পথের উপর দাঁড়িয়ে ঠিক হল যে ওরা রচনা লিখবে ঐ ফকিরকে নিয়ে। মুখস্থ ত লেখাই যাবে না। উপরন্তু বাড়ি থেকে কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়াও যাবে না। কারণ, প্রতিযোগীদের ইনুদের বাড়ি এসে তাঁর সামনে বসে লিখতে হবে। মামা বললেন পুরস্কার তিনিই দেবেন—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার থাকবে। যেদিন শুরু হবে সেদিন পুরস্কার বিতরণ করা হবে এবং ভাল করে পড়া হবে। মামা সভাপতি হয়ে নিজহাতে পুরস্কার বিতরণ করবেন। মামা-আকাশের কালো কেটে গিয়ে হঠাৎ এত সূর্যের আলো বেরিয়ে পড়াতে ফুটো আর চন্দ্র আহ্লাদে আট-খানা হয়ে ছুটল দলবলকে খবর দিতে, কিন্তু আনন্দের চোটে যে মোচড়ান কার্ডখানা মামার হাতে দিয়ে গেল সেটার জন্য আবার ইনুকে কিছু বেগ পেতে হল। উপরে এসে চশমা পরে মামাবাবু কার্ডখানা দেখলেন। সেটা এই রকম:—

"মাজের পাড়া জুবক শংঘো"

www.BanglaBook.org

ভাগ্যে "জুবক বিন্দের" কেউ মামার হাতের কাছে ছিল না! ইনু অনেক কষ্টে সিংগীর গলির যুবক সংঘের বুড়ো বুড়ো ছেলের এ বেচারাদের পিছনে লাগা এবং ২৫শে বৈশাখ থেকে আজ পর্যন্ত এদের সভা করার সমস্ত চেষ্টা ভণ্ডুল করে দেবার করুণ বর্ণনা শুনিয়ে মামাকে ঠাণ্ডা করলে। এদের যে তিনিই একমাত্র আশা-ভরসা একথাও জানাতে ভুললে না। কারণ সিংগীর গলির সাহিত্য সভার যতই জাঁকজমক হোক, সভাপতি হয়েছিলেন হাইস্কুলের একজন মাস্টার মশায়। আর এদের হবেন একজন সত্যকার লেখক, কাগজে ছাপার অক্ষরে যাঁর নাম বেরয়! জিতল কারা?

কিন্তু সভাপতি মশায়ের কড়া শর্তের জন্যেই বোধহয় নির্দিষ্ট দিনে মাঝের পাড়া জুবক শংঘের মাত্র চারটি সভ্য রচনা লিখতে ইনুদের বাড়ি এল।

যে কজনই লিখুক কেমন লিখেছে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধিতে দেখাতে গিয়ে মামাবাবু ও ইনুদেরই চক্ষুস্থির। হায়, হায়, মুখস্থ-রাক্ষসীকে কিছুতেই ঠেকান গেল না, সকল পথ বন্ধ দেখে সে গুপ্ত পথে রচনার মধ্যে প্রবেশ করে বেশ জাঁকিয়ে বসে গেছে। প্রথম রচনাটি এই রকম ঃ—'ফকির পাগল রকে বসে। ফকিরকে লইয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একটা গল্প লিখিয়াছিলেন। গল্পটি ফাইভের বইয়ে আছে। বেশ লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দ্বারকানাথের পুত্র। ইহার পিতার নাম অবনীন্দ্র ঠাকুর। ভারতের আকাশে রবি উদিত হইয়া পামর সাধারণের হিদয়ে অন্দকার দূর করিয়া যে যোতি কিরণ বিকরণ করিতেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।'

লেখকের নাম—চন্দ্রকান্ত গড়াই। আরও দুটি রচনা এমনি ভাবে ফকিরের নামের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথকে টেনে এনে মুখস্থ করা রচনা নানা ভুল সমেত লেখা হয়েছে। বোধ হল লেখকরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করেই এসেছিল। একটি মাত্র রচনা পাওয়া গেল যেটি মুখস্থ নয়, আসল ফকির সম্বন্ধেই লেখা। সেটি এই—'ফকির বলে একটি লোক ছিল। সে চাটুজ্জে বাড়ির রকে বসিত। উহার একটি কুকুর ছিল। তাহার নাম ভুলো। ভুলোকে ফকির খুব ভালবাসিত। সামনের বাড়িতে একটা ফণি বলে ছেলে আছে। সে সিংগীর গলির জুবোক শংঘের ছেলে। সে খুব পাজী। সে কুকুরটাকে বিষ খাইয়া দিল। কুকুরটা ধড়-ফড় করিতে লাগিল। আমি কত জল দিলাম, সে খাইতে পারিল না। ইনুদির বাবা বিমলকাকু অষুধ দিলেন। তবু ভুলো বাঁচিল না। মুখে ফেনা উঠিতে লাগিল আর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। শেষে মরিয়া গেল। ফকির তখন পাগল হইয়া গেল এবং কাঁদিতে লাগিল। ছেলেগুলো খুব হাসিল। আমার কান্না পাইছিল তাই পলাই গেলাম। আমার খাইতে ভাল লাগিল না। সব বমি হইল। বিছানায় শুইয়া ভুলোকে মনে পড়িল। আর আমার মাকে মনে পড়িল। মাও মরিয়া গিয়াছে।'

লেখকের নাম বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত, অর্থাৎ ফুটো। মামা কেন জানি না রচনার শেষ দিকটার দিকে চেয়ে বসেই রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর ইনুর দিকে তাকিয়ে বললেন—'দেখ এরা কেউ ফুটোও নয় ছেঁদাও নয়। আমরা বুড়োগুলো এদের ফুটো করে দিচ্ছি।' মামাবাবু মাঝে মাঝে ঐ রকম আবোলতাবোল বকেন, তাই ইনু তাড়াতাড়ি প্রাইজ কি দেওয়া হবে সেই কথা তুলল। মামা বললেন, 'সে আমার ঠিক আছে; তুই সভার জোগাড় কর।'

পরের দিন বিকালে ইনুদের উঠোনে ছোট্ট বেদীতে সভাপতিকে মালা দিয়ে বসিয়ে, সামনে আলপনা দিয়ে ফুল দেওয়া ঘট সাজিয়ে, ধূপ জ্বালিয়ে সভা যা হল, সিংগীর গলির যুবক সংঘের মাইক আর চেঁচানি তার কাছে ম্লান হয়ে গেল। ইনুর গান, পিউয়ের নাচ ও মাঝের পাড়ার একজন 'জুবকের' আবৃত্তি খুব জমল। আর সব চেয়ে ভাল হল এই যে, সভাপতি একজন আস্ত লেখক হয়েও একটুও বক্তৃতা দিলেন না। কেবল ফুটোর রচনা পাঠের পর বললেন যদি মাঝের পাড়ার যুবকবৃন্দ না মুখস্থ করে রচনা লেখার এবং বানান ঠিক লেখার অভ্যাস করে তবে আসছে বছরও তিনি তাদের পুরস্কার দেবেন। প্রথম পুরস্কার ৬টি কাবলী কলা, ১টি মোটা খাতা ও ১টি পেন (বানান ভুলের জন্যে নেপথ্যে সভাপতির হস্তে একটি কানমোলা)। ফুটো ঘন ঘন হাততালির মধ্যে প্রথম পুরস্কার নিলে। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার নিতে কেউ এল না। কারণ ঐ পুরস্কার প্রাপকদের নামের সংগে পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছিল, যথা—দ্বিতীয় পুরস্কার কলা-খাতা-ইত্যাদি-হীন চারটি চড় ও একটি কানমোলা। তৃতীয় পুরস্কার—ছয়টি চড় ও দুইটি কানমোলা।

মামাবাবু বড় একটা কলার কাঁদি এনেছিলেন, আর ইনুর বাবা প্রকাণ্ড এক ঠোঙা ভাজা চীনা বাদাম। তার থেকে মাঝের পাড়ার "জুবক বিন্দের" প্রত্যেককে প্রচুর "সান্ত্বনা পুরস্কার" দেওয়া হল। সংগে ইনুর মায়ের তৈরী ঝাল-মশলা। তাই সকলেই খুসি হয়ে বাড়ি গেল।

১৩৮৩

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

কন্

রুনু চট্টোপাধ্যায়

কন্ যে জাতে বেড়াল, সে কথা অনেক দিন পর্যন্ত জানত না ও। অনেক দিন আয়নার সামনে বসে নিজেকে দেখেছে। মনে হত মা, বাবা, দিদির চেয়ে একটু যেন ফরসা। অমন ত কত লোকেরই হয়ে থাকে। ঐ যে কুকুল। ওর ত মা-বাবা ফরসা নয়, তাই বলে কি কুকুল ওদের ছেলে নয়? ঐ সব কথা কন্ আয়নার সামনে বসে ভাবত আর মুখটা এদিক ওদিকে ঘুরিয়ে দেখত। আর চোখটা? চোখটা ত সত্যি সত্যি অশোকাভিচের মত। তবে? এই সব কথা মনে হত কারণ মাঝে মাঝে বাবা-মার কথার টুকরো কানে আসত যে!

লোকে বেড়াতে এলেই বাবা-মা আদিখ্যেতা করে কন্‌কে নিয়ে যেত, দেখাত। তারপর বলত, ঐ ত আলসেতে এইটুকুনি ছোট্ট বেড়ালটা পড়ে ছিল, কত কাণ্ড করে তুলে এনে খরগোশের দুধ খাইয়ে মানুষ করা হল ওকে। কেউ যদি বলত, নাম কী? বলা হত—কন্, মানে ক আর ন। বাবা ত আবার কনের চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকা, কান নাড়ানো, ল্যাজ নাড়ানো এইসব দেখাত।

রাত্তিরে শুয়ে জানলা দিয়ে একটা মিটমিটে দুষ্টু তারার দিকে তাকিয়ে কনের যেন কেমন দুষ্টুমি পেত। মনে হত এমনি নিস্তব্ধ রাতে কার্নিশ দিয়ে পাশের বাড়ির জানলায় গিয়ে দেখলে কেমন হয়? ওদের ঘরগুলো কেমন, কে কে আছে? আর দুষ্টু বুদ্ধিটা মাথায় গজগজিয়ে উঠল একদিন। ভারি ত কার্নিশ দিয়ে হাঁটা! ঐ ত ওদের বাড়ির মণ্টুকে দেখেছে পাঁচিল দিয়ে এবাড়ি-ওবাড়ি করতে। ও কি তাতে বেড়াল হয়ে গেল?

ও মা! কী সুন্দর ঘরটা ওদের! দোলা আছে একটা। ছোট্ট বাচ্চা শুয়ে আছে তাতে। ছোটবেলায় ওকেও ত মা অমনি শুইয়ে রাখত দোলায়। আচ্ছা, এখন ত সত্যি সত্যিই ও তেমন বড় হয়নি—দোলায় শুলে কেমন হয়, ঐ ছেলেটার পাশে? সবে দোলায় কন্ লাফিয়ে উঠেছে অমনি ছেলেটার কী কান্না! আর ছেলেটার মা ভাঙা-ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'বিল্লি বিল্লি!' ছেলেটার গালে আস্তে একটা চড় মেরে বাড়ি ফিরে এল কন্। বাব্বাঃ, ছেলেটার মার কী ক্যানকেনে গলা! আর বিল্লি-বিল্লি বলে চেঁচানোই বা কেন? কে জানে বিল্লি মানে কী? বেড়াল নয় ত?

দুপুরবেলাগুলো কনের ভারি একা একা লাগত। বাবা আপিস যায়, মা ঘুমোয়, দিদি পড়ে। জানলা দিয়ে দেবদারু-গাছের মাথা বাঁকানো, পাশের উঠোন, কাকগুলোর কার্নিশের পাশে চুপচাপ বসে থাকা—এইসব দেখা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না কনের। রোদ্দুরে বাইরে বেরুলে মা যে আবার বকে।

এমনি এক দুপুরে জানলার ধারে বসে কন্ পাশের বাড়ির উঠোনে গাড়ি সারানো দেখছিল। হঠাৎ জানলার ওপাশে কার্নিশে কে যেন বলে উঠল, 'কী রে, তুই এখানে থাকিস নাকি?' কার্নিশের দিকে তাকিয়ে দেখে একটা কালো-সাদা-ছাপওলা বেড়াল ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে।

কন্ বলল, 'কে রে তুই, এখানে এসেছিস কেন? দুধ আছে যে আঢাকা। পালা!'

কনের কথা শুনে সেই বেড়ালটার কী হাসি! অনেকক্ষণ দুলে দুলে হেসে বলল, 'ও, তুই তাহলে বেড়াল তপস্বী, যা যা সব দেখি, কোথায় দুধটা আছে, আয় না বরং ভাগাভাগি করে খাই দুজনে।'

'দেখ, খবরদার, বেড়াল বলবি না আমায় বলে রাখছি। জানিস, সামনের বছর আমি ইস্কুলে যাব। দিদি বলেছে।'

'ইস্কুলে যাবি? তা ভাল, ওখানে অনেক মাছ পাওয়া যায়। আমরা ত মাঝে মাঝে হাসপাতালে, ইস্কুলে দল বেঁধে যাই। মাছ, দুধ বেশ পাওয়া যায়।'

এইসব শুনতে শুনতে কনের ভারি রাগ হতে লাগল, সবে 'ও-ও' বলে বকতে শুরু করেছে আর অমনি মা বলে উঠল, 'কন্ আবার চেঁচাচ্ছ, যত সব দুষ্টু বেড়ালদের সঙ্গে মিশছ, যাও শিগগির শুয়ে পড়ো দুষ্টু ছেলে।'

সন্ধেবেলা ত কন্ নিজের কানে শুনলে মা বাবাকে বলছে, 'কনের কিন্তু বেড়াল বন্ধু হচ্ছে।'

অনেক রাতে যখন চাঁদের আলোয় গাছের পাতাদের ছায়া এসে পড়েছে বিছানার চাদরে, তখন সেই ছায়াগুলোর সঙ্গে কনের ভারি খেলতে ইচ্ছে করল। এই ধরতে যাচ্ছে, অমনি হাওয়া এসে গাছটা দুলিয়ে দিচ্ছে আর ছায়াটা পালিয়ে যাচ্ছে দূরে। হাত বাড়িয়ে দূরের পাতাটা ধরতে যাবে, অমনি শুনলে সেই বেড়ালটা ফিসফিসে গলায় বলছে, 'কী যেন নাম তোর বাপু, কন্ না কী? শোন্ না, এদিকে আয় না।'

জানলার কাছে গিয়ে কন্ বলল, 'অমন চেঁচাচ্ছিস কেন? সকলের ঘুম ভেঙে যাবে যে? ঘুম নেই নাকি তোর চোখে?'

'অতরে আয় না উঠোনে। আমরা আট-দশজন মিলে চাঁদের আলোয় ধুলোয় গড়াগড়ি দেব, তারপর সবাই মিলে পাড়ার বিয়েবাড়িতে যাব। যা বড় বড় মাছ হয়েছে ওখানে, তোর ভয় নেই, ভোরবেলা তোকে আবার বাড়ি পৌঁছে দেব। আয় না!'

'আমায় বেড়াল বলে ভাববি না ত তোদের সঙ্গে গেলে?'

'না রে না, তুই মানুষ, তোকে বেড়াল ভাবতে পারি? হ্যাঁরে কন্, তুই সব খাবার খেয়ে ফেলেছিস? আজ বিকেল থেকে ভাল খাওয়া হয়নি।'

'কাল আমাদের বাড়ি আসিস, তোকে মাছ খাওয়াব। আজ

www.BanglaBook.org

ত এ'টোকাঁটাও নেই।'

'চল্ তাহলে উঠোনে। কী বললি, সিঁড়ি দিয়ে নামবি? কেন রে? এই দেখ, আমার মত করে নাম।'

উঠোনে এসে সেই মোটা ছাপওলা বেড়ালটা অন্য বেড়াল-দের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন চোখ মটকে বলল, 'এই দেখ, কন্ এর নাম। সেই যে বলেছিলাম ঐ বাড়িতে থাকে, ক'দিন আগে আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, আমাদের সঙ্গে খেলতে এসেছে। তোরে ফিরে যাবে বাড়ি। লাগাও ডিগবাজি, ধুলো ছোঁড়াছুঁড়ি করো।'

অমনি হুটোপুটি করে ধুলোমাখা শুরু হয়ে গেল। কনের অবিশ্যি খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। আজই নিম-সাবান দিয়ে চান করিয়ে দিয়েছে মা ওকে। একটু ময়লা ঘাঁটলে মা কী রকম রাগ করে।

কন্‌কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কতকগুলো বেড়াল ওকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। আর তারপর হুটোপুটি ধুলো-মাখামাখি। কখন যে খেলায় মেতে গেছে সে নিজেই ভুলে গেছে।

হঠাৎ শুনল পাশের বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে কে বলছে, 'বেড়ালগুলোর জ্বালায় রাত্তিরে ঘুমোবার উপায় নেই। কী চেঁচামেচি রে বাবা।' তারপরই একঘটি জল ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে জানলা বন্ধ করে দিল।

কনের লজ্জায় মাথা কাটা গেল যেন। সত্যি সত্যি ওকেও বেড়াল ভাবল ত? তাড়াতাড়ি বাড়ি পালিয়ে এসে সেই ধুলো-মাখা অবস্থাতেই বিছানায় শুয়ে পড়ল।

যখন ঘুম ভাঙল তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে।

ভয়ে ভয়ে রান্নাঘরে মা-র সামনে দাঁড়াল কন্। মা-র মুখটা থমথমে, ও যে এসে দাঁড়াল মা দেখেও দেখল না। কন্ মা-র চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে বলল, 'আর কখনো ওরকম করব না, দোষ হয়েছে।'

'যাও, দুধ রয়েছে বাটিতে, খাও গে, আর চেঁচিয়ো না। পার ত আবার বেড়াল-পল্টীতে যেও! স্বভাব যাবে কোথায়!'

মাথা নীচু করে দুধ খেয়ে কন্ দিদির কাছে গেল।

'কী রে কন্, পড়াশুনো ছেড়ে দিলি? আয়, পড়বি আয়।' বলে দিদি কন্‌কে কোলে তুলে নিল। দিদির কাছে বসে অঙ্ক দেখতে দেখতে কনের কিন্তু মনে হল ওরা বোধ হয় (মানে, ঐ বেড়ালগুলো আর কি!) এতক্ষণে বিয়েবাড়িতে ঘোরাঘুরি করছে। সত্যি, কন্ ত কোনোদিন বিয়েবাড়ি দেখেনি। একবার বিয়েবাড়ি যাবে ঠিক।

দুপুরটা সেদিন মেঘলা। কন্ বসে আছে জানলায়। এই মেঘলা দুপুরে কী করবে কন্ তাই ভাবছে। কেমন হয়, পাশের বাড়ির পাঁচিলে বেড়ালে? মা ত ঘুমোচ্ছে, জানতে পারবে না। বিকেলবেলা আবার ফিরে আসবে বাড়িতে। পাঁচিলের দিকে তাকাতেই দেখল সেই কালো-সাদা-ছাপওলা বেড়ালটা পাঁচিল দিয়ে হাঁটছে। বেড়ালটা ওকে দেখতে পেয়েই চোখ মটকে বলল, 'কন্, আসছি দাঁড়া।'

'কী রে কন্, কেমন লাগল তোর সেদিন? আচ্ছা, আজও কি তোদের বাড়িতে কিছু নেই নাকি? কী রকম পেরুশ রে তোরা?'

কনের মনে হল—সত্যি, আজও যদি না খাওয়াতে পারে ওকে, তবে ত ভারি লজ্জার কথা। বলল, 'চল্ রান্নাঘরে, সাব-ধানে কিন্তু। রাত্তিরের মাছ আছে, তোকে একটা খাওয়াই তার থেকে। পুডিং খাস?'

বেড়ালটা কেমন একটা মুখ করে বলল, 'ভাই, আমরা ডাঁটা-চচ্চড়ি থেকে পুডিং না কী বললি যেন, কিছুই বাদ দিই না।'

কন্ ভাবল ওকে একা খাওয়ালে বড় খারাপ দেখায়। বেচারা কী ভাববে! একটা একটা মাছ ত ভারি খাবে ওরা দুজনে। আর মাছ খেলেই বুঝি বেড়াল হয়ে গেল ও! দিদিও সেদিন ইলিশমাছের ডিম রান্নাঘরে এসে তুলে নিয়ে পালিয়েছিল। অবিশ্যি কন্‌কেও ভাগ দিয়েছিল।

বেড়ালটা খেয়েদেয়ে বলল, 'বেশ রান্না করে তোর মা। জানিস, আজ আবার একটা বিয়েবাড়ি আছে পাড়াতে। বিকেল নাগাত সবাই আমরা বাড়িটার চারদিকে থাকব। অনেক মাছ ত আজ ওখানে!'

বেড়ালটাকে জানলার কাছে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে যখন, হঠাৎ কনের চোখ পড়ল আয়নাটার দিকে। একবার মুখটা দেখার লোভ সামলাতে পারল না ও! মুখটা এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে দেখছে এমন সময় বেড়ালটা বলে উঠল, 'কন্, তোর মুখটা কিন্তু অনেকটা আমার মত।'

আয়নাতে দুজনের চেহারাটা দেখল কন্। আর কোনো সন্দেহ নেই। জাতে সে বেড়াল। ঘর, বাড়ি, মা—সব দূরে চলে গেল যেন। একটু থেমে, কী ভেবে নিয়ে বেড়ালটাকে বলল, 'চল্, আমিও যাব বিয়েবাড়ি।'

পাশের বাড়ির উঠোন দিয়ে যখন যাচ্ছে, কন্ শুনতে পেল মা ডাকছে 'কন্' বলে। জানলার দিকে তাকাল কন্। একটু দাঁড়াল। ভারি মন-কেমন করে উঠল মা-র জন্যে।

গেটের ওপাশ থেকে বেড়ালটা বলল, 'কন্, শিগগির আয়, ওদের বাড়ির বর এসে গেছে।' কন্ খানিকক্ষণ ভাবল। একবার মা-র দিকে তাকাল। তারপর বেড়ালটার সঙ্গে বিয়েবাড়িতে চলে গেল।

১৩৮৯

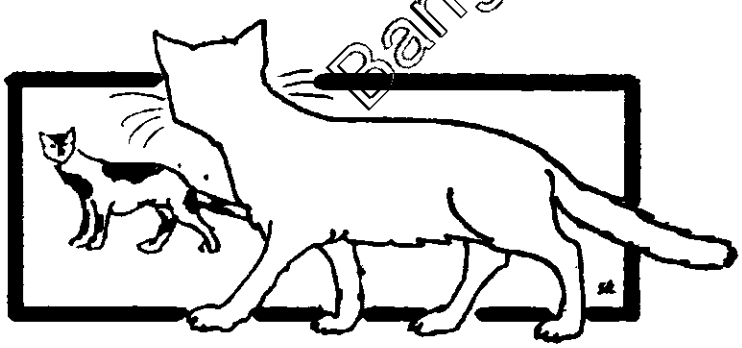

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চক্রান্ত

কানাই পাকড়াশী

হরিহর শেষ পর্যন্ত গঙ্গার এই খাঁড়িটার ধারেই তার ডেরা বাঁধল। ডেরা মানে একটা ঝুপড়ি আর কি। তা হলেও বেশ পা ছড়িয়ে শোয়া যায় তাতে। সামনের দিকটায় বাঁখারি-গুলোকে আড়াআড়ি ভাবে দাঁড় করিয়ে একটু বাইরে বসার জায়গা করা হয়েছে। পাশেই কয়েকটা চাল কুমড়ো গাছের বিচি পুঁতে দিয়েছে মাটিতে, একটা বর্ষা যেতেই বেশ লতিয়ে উঠে গাছটা তার ঝুপড়িটাকে বেশ আব্রু দিয়েছে। আব্রুর অবশ্য তার যে খুব দরকার আছে তা নয়, কারণ মানুষ বলতে ত সে একা। আর একটা কুড়িয়ে আনা কুকুর।

বাংলা দেশটা ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার পর উদ্বাস্তুদের যে স্রোত এ বাংলার খানাখন্দ খালবিল সব পরিষ্কার করে দেখতে দেখতে যে সব বসতি গড়ে তুলেছে, এ তল্লাটটা তার মধ্যে পড়ে না। না পড়ার একটা কারণ হল, খাঁড়িটার পরই মস্ত এক ঝিলমত জায়গা, তার ওপারে পুরোনো আমলের এক জমিদারের বাস। তাদের জমিদারী বলতে অবশ্য কিছু নেই তবে খাস যে জায়গা ছিল তা আর বিলি হয়ে ওঠেনি। জমিদার মারা গেলেন নাবালিকা এক মেয়ে রেখে, আর জমিদারগিন্নির সেই মৃতুশোকে আধ-পাগলা অবস্থা। কাজেই পোড়ো জমির মত দেখতে হয়েছে চারপাশের বাগান, বাড়ি, আর সুন্দর যে ঝিলটা খাঁড়ির মুখ থেকেই শুরু হয়ে বাড়ির ঘাট পর্যন্ত গেছে সেটাও। ঝিলের ঠিক মুখটাতেই কিছুটা জংলা সাফ করে হরিহর তার ঝুপড়ি বানিয়েছিল।

এখানে ঝুপড়ি করা তার দুটি উদ্দেশ্যে। এক ছিল তার অতীত জীবনের কুকীর্তিগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে একেবারে বনবাস গোছের কিছু একটা করা, আর দুই হল হাতে যখন নেই বলতে নেই কিছুই নেই, আর কিছু করার মত যখন সামর্থ্যও কমে এসেছে তখন এই ঝিলটাকে আশ্রয় করে অর্থাৎ মাছ-টাছ মেরে বা শামুক-গুগলি খেয়ে কাটানো যাবে এই ভরসা। তাই প্রায়ই ওকে ঐ ঝিলের ধারে ধারে আঁদাড়ে পাঁদাড়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। লোকে বলে পাগল, কেউ বলে সেয়ানা। আসলে সে কিন্তু জীবনের শেষ সময় এই ভাবেই কাটিয়ে দেবে বলেই ভেবেছিল। কিন্তু হঠাৎ এমন এক কাণ্ড ঘটে গেল যার জন্যে মোটেও সে প্রস্তুত ছিল না।

সেদিন ভোর বেলাটায় বেশ কুয়াসা ছিল। সাদা ঘন কুয়াসায় ঢাকা ছিল জলের ধারটা। হঠাৎ শব্দ শুনল ছপ ছপ করে যেন দাঁড় পড়ছে, নিথর কালো জলগুলোতে ছোট ছোট ঢেউ ভাঙছে। একটা গাছের আড়াল থেকে ভাল করে লক্ষ করল সে। সত্যিই ত বাবুদের ঘাট থেকে একটা নৌকো করে কারা যেন বেয়ে আসছে। নৌকোটা কাছে আসতে দেখল একটি মাঝবয়সী লোক আর একটি ছোট্ট মেয়ে ছাড়া নৌকোয় আর কেউ নেই।

হঠাৎ কি যেন একটা চিন্তা হরিহরের মনে খেলে গেল। বহু কুকর্মে হাত পাকিয়েছে হরিহর তার বয়সকালে, তাই এই নিশ্চিন্তে নির্জনে নৌকো বাওয়াটা ভাল ঠেকল না তার। একটা ঝোপের পাশে ঘাপটি মেরে সে লক্ষ করতে লাগল তাদের।

ঠিক, যা ভেবেছিল তাই। মাঝবয়সী লোকটা চাপা গলায় ঝাঁজিয়ে উঠল মেয়েটার ওপর।

'না, খাঁড়িতে নৌকো নেবো না। এখানেই ঘুরবো।'

'চল না কাকু, খাঁড়ির দিকে,' বায়না ধরল মেয়েটি।

কাকুর যতই গলা বাড়ে মেয়েটিরও ততই জেদ বাড়ে।

ঝুপ করে একটা আওয়াজ। হরিহর বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিল। ঘটনাটা ঠিক ভাল করে লক্ষ করতে পারল না। একটু পরেই দেখা গেল নৌকোটা কাত হয়ে উল্টে গেছে। মাঝবয়সী লোকটা সাঁতরে চলেছে ডাঙ্গার দিকে! হরিহর কি করবে ভাবছে—মেয়েটা কি ডুবে গেল? কিন্তু লোকটা চোরের মত পালাল কেন? তবে কি ইচ্ছে করে...

ঠিক এমনি সময় ছোট্ট একটা মাথা ভুস করে, হরিহর যেখানে ছিল ঠিক তার কাছাকাছি ভেসে উঠল। হরিহর ছুটে যেয়ে মেয়েটিকে তুলে আনল। তারপর নিজের ঝুপড়িতে নিয়ে গিয়ে, তারই আধময়লা গামছা দিয়ে মুছিয়ে দিল গা। একটা ঢোলা শুকনো পায়জামা পরতে দিল তাকে।

বড় বাড়ির বড়লোকের মেয়ে, তার জামাকাপড়েই স্পষ্ট। যাই হোক একটু তার কিছু বন্দোবস্ত করতে হয়, কিন্তু কি-ই বা করবে। এক বাটি জল গরম করে এনে খাওয়াল মেয়েটাকে। একটু পরেই দেখে মেয়েটা চোখ দুটো মস্ত বড় বড় করে ওর দিকে চেয়ে আছে।

'তুমি কে?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।

'আমি হরি-পাগলা, তুমি কে?' বলল হরিহর।

'আমি? আমি রুনু।'

'ওখানে কি করছিলে?'

'কাকুর সঙ্গে নৌকোয় বেড়াতে এসেছিলাম।'

'কাকুর সঙ্গে? তা এত ভোরে?'

'কদিন থেকেই ত বেরুচ্ছি, আজ এই দিকটায় প্রথম এলাম।'

'তা কাকু গেল কোথায়?'

'আমায় ধাক্কা মেরে জলে ডুবিয়ে দিয়ে পালিয়েছে।'

'কই, তুমি ত ডোবোনি?'

'ডুববো কেন, আমি যে সাঁতার জানি!—ভারী মজার

www.BanglaBook.org

ব্যাপার হল। আমি না বাবা মারা যাওয়ার পর সেই কলকাতায়, মেয়েদের এক বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশোনা করি! আর ছুটিতে ছুটিতে বাড়ি আসি। আমি যে ওখানে সাঁতার শিখে ফেলেছি তা এরা কেউ জানতো না। কাকু না আমাকে মারবার মতলব করেছিল! তাই রোজ রোজ নৌকো করে বেড়াতে নিয়ে বেরোতো, আর ফাঁক খুঁজত আমাকে ডুবিয়ে মারার! আমি সব বুঝি। এখন কেমন জব্দ হবে বল ত? এখন সোজা যখন বাড়ি গিয়ে হাজির হব, কাকু কেমন চমকে যাবেন দেখো। আর মাকে আমি সব বলে দেবো। কি দুষ্টু কাকুটা...' কাঁদো কাঁদো হয়ে এল মেয়েটির গলা।

হরিহরের সামনে সব ছবিটা পরিষ্কার হয়ে উঠল। এবার হরিহরের সেই পুরোনো ধড়িবাজ মতলবগুলো একটা একটা করে ফিরে এল মাথায়। মেয়েটিকে দেখে একটু যে মায়াও না হল তা নয়। তবে একটা বেশ শাঁসাল মতলবে মনটা ভরে উঠল তার।

'না মা, তোমার কোন ভয় নেই। এই হরি-পাগলা তোমায় ঠিক রক্ষা করবে, তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাবে বৈকি। ঠিক পৌঁছে দেবো, কিন্তু এখন না মা, সময় হলেই যাবে। তবে কি জান তোমার ঐ কাকুটাকে একটু সায়েস্তা করতে হবে।'

মেয়েটা যেন খুশিতে টগবগিয়ে উঠল, 'হাঁ ঠিক বলেছ, এখন যাব না, যখন ওরা খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে যাবে, তখন হুস্ করে হাজির হয়ে চমকে দেবো সবাইকে।'

'সে দেখা যাবে, কিন্তু এখন কিন্তু তোমার কোথাও বেরোনো চলবে না, এখানে চুপটি করে ক'দিন থাকতে হবে, কেউ যেন টের না পায়। আর আমি ওদিকে ব্যবস্থা করছি কি করা যায়।...আচ্ছা তোমার ঐ কানের একটা দুল দাও ত, ওটা দিয়ে কিছু খাবারদাবার ব্যবস্থা করি।'

হরিহরের ঘরে যা খুদকুঁড়ো ছিল তাই মেয়েটিকে খাইয়ে ও বেরিয়ে পড়ল। গোপনে দুলের ব্যবস্থা করে খাবারদাবার আর সামান্য কিছু জামাকাপড় নিয়ে ঝুপড়িতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল হরিহরের। পোশাকের মধ্যে একটা বড় সাদা কামিজ জাতীয় পোশাক আনতে ভুলল না সে।

হরিহর ফিরতেই মেয়েটি জানাল, 'জান হরি-পাগলা, আজ সারাদিন কি তোলপাড় ঐ ঝিলের জলে। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখলাম। কত জেলে নামাল, জাল ফেলল আমাকে তোলার জন্য, কোথায় পাবে'!...হা হা করে হেসে উঠল রুনু।

'যাক্, ওরা জেনে গেছে ত তোমায় পাওয়া যায়নি! ভালই হল, এখন আমাকে একটু বেরোতে হবে। তুমি ভয় পেও না। এই কুকুরটা তোমায় পাহারা দেবে।'

হরিহর এই বলেই তার ভোল পাল্টাতে শুরু করল। দেখতে দেখতে একজন ফকির সেজে ফেলল। তারপর বেরিয়ে গেল বড় বাড়ির দিকে।

জমিদার বাড়ির সবারই খুব মন খারাপ। সন্ধ্যার সময় ফকির সাহেব দোর গোড়ায় হাজির। অন্যসময় হলে ফিরেই যেতে হত। এবার স্বয়ং গিন্নিমা এসে হাজির ফকিরকে বিদায় দিতে।

গিন্নিকে দেখে হরিহর সজোরে বলতে শুরু করল, 'মা, তোর দুঃখ দেখে আমার মত মানুষেরও মনে দুঃখ হয়। আমি তোর মেয়েকে এনে দেবো।'

'বাবা কি বলছ তুমি! আমার যা আছে সব দেব, আমার মেয়েকে যদি ফিরিয়ে দাও বাবা—'

'হবে মা হবে, সব হবে, তবে সে কি আর এ জগতে মা, সে পরপারে গেছে, তাকে কি আর মানুষ হিসেবে পাবি!...'

'তবু বাবা, আমায় একবার চোখের দেখা দেখাও—'

'সে ত অনেক খরচের ব্যাপার যে...'

'কার জন্যে এসব সম্পত্তি...'

সব ঠিক হয়ে গেল, সামনের অমাবস্যায়, মেয়ের দেখা পাওয়া যাবে। এত শিগ্‌গির সব যে তার মতলব মাফিক চলবে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি আগে। একমাত্র উত্তরাধিকারীকে হঠিয়ে রুনুর কাকু তখন আইনের অন্য বিষয়গুলির তদ্বিরে শহরে গেছে।

হরিহর ফিরে এসেই রুনুকে তার মায়ের সংবাদ দিল। তারপর শুরু হল তার তালিম। ইতিমধ্যে লম্বা সাদা আলখাল্লা তৈরী হল রুনুর মাপে। কিছু মোমবাতি কেনা হল। তারপর ধীরে ধীরে কিভাবে পা ফেলতে হবে, কিভাবে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ইত্যাদি ট্রেনিং চলল। এর সঙ্গে সঙ্গে হরিহরের সেই চিরকেলে স্বভাব অনুযায়ী সবসময়ই একটা অঘটন ঘটাবার আশঙ্কায় তৈরী হচ্ছিল সে তার নিজের মত করে।

ফকির সাহেব যথা সময়ে বড় বাড়ির দরজায় হাজির হল। আর তারই নির্দেশমত রুনু তার বিশেষ পোশাকে সবার অলক্ষ্যে তার পথ ধরে ওপরের তলায় গিয়ে লুকিয়ে রইল। প্রথমেই চাকর-বাকররা জানাল এসব বুজরুকি চলবে না। কাকাবাবুর আদেশ। কিন্তু সে আদেশ ভেসে গেল গিন্নিমার হস্তক্ষেপে।

নিচের হল-ঘরে ফকিরের নির্দেশে ক্রমে আলোর সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হল। রইল শুধু তার সামনে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি। কিছুক্ষণ ধরে চলল তার মন্ত্রতন্ত্রের ছলাকলা, তারপর হাত বাড়িয়ে টাকার বাণ্ডিলটা নিয়ে নিজের আলখাল্লার ভেতর গুঁজে নিল। সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্তে সব অন্ধকার। তার মধ্যে শুরু হল ফকিরের সুর করে মন্ত্র পড়া। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে ছোট্ট একটি মেয়েকে নেমে আসতে দেখা গেল। পরনে তার সাদা রং-এর দেবদূতের মত আলখাল্লা। হাতে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি। উর্ধ্বনেত্র হয়ে ধীরে ধীরে পা ফেলে সে নামছে।

সে ঘরে যারা ছিল সকলেই স্তম্ভিত। ছোট্ট মিষ্টি একটি ভূতের ছানা যেন নেমে আসছে ধীরে ধীরে। সিঁড়ির অর্ধপথে আসতে মা ছুটে গেল তাকে জড়িয়ে ধরতে। রুনুর কাকু এসে ঘরের আলো জ্বেলে দিল। সবাই ছুটে গেল ফকিরের দিকে। কিন্তু কোথায় সে!...

হরিহর ছুটতে ছুটতে তার ঝুপড়িতে পৌঁছেই বুঝেছে এখানে থাকার দিন তার ফুরিয়েছে। তাই জামাকাপড় যা পারল বদলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার মুখেই দেখা হয়ে গেল রুনুর কাকুর সঙ্গে। হরিহর এই মুহূর্তটার কথা ভেবেই রেখেছিল।

'পালাচ্ছ কোথায়? আমার অংশটা?' হাত বাড়িয়ে চাইতেই, রুনুর কাকুকে একটা হাঁড়ি দেখিয়ে বলল হরিহর, 'সে আমি ভেবেই রেখেছিলাম বাবু, ঐখানে আপনার অংশটা।'

রুনুর কাকু সোজা সেই হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়েই চিৎকার করে হাতটা বের করে নিল। ততক্ষণে তার দেহে বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে। হরিহর তখন আর সে তল্লাটে নেই। ১৩৮২

www.BanglaBook.org

কাগজ ফুলের গাছে

তারাপদ রায়

॥ ১ ॥

বাইরের বারান্দার একপাশে সিঁড়ির ঠিক নিচেই অনেকদিন আগে একটা বুগেনভেলিয়ার বাগান ছিল। অনেক দিন মানে প্রায় একবছর, পুতুলের হিসেবে সেটাই অনেকদিন। ঐ গাছটাকে পুতুলের রাঙাদাদু খুব পছন্দ করতেন। যখনই পুজোর ছুটিতে বা অন্য কোনো সময় দেশ থেকে আসতেন, রাঙাদাদু একটা বেতের মোড়া নিয়ে বারান্দায় ঐ গাছটার ছায়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকতেন। গাছটাকে রাঙাদাদু বলতেন 'কাগজ ফুলের গাছ'। আর সত্যিই লাল-নীল-সাদা পাতলা ফুরফুরে রঙীন কাগজের মত ঝকঝকে পাতায় প্রায় সারা বছর ছেয়ে থাকতো গাছটা।

কাগজ ফুলের গাছটা নাকি অনেকদিনের পুরনো, পুতুলদের এ বাড়িটা যতদিনের ঠিক ততদিনের। একটা গাছ নয়, অনেকগুলো গাছ নাকি একসঙ্গে মিলেমিশে ছিল, তাই এত রঙের পাতার ছড়াছড়ি ছিল। এ বাড়িটা কতদিনের তা অবশ্য পুতুল ভালো করে জানে না, কিন্তু পুতুল যতদিনের কথা মনে করতে পারে, সেও কম দিনের কথা নয়, এই ত বড় দিনের সময় পুতুলের এগারো পূর্ণ হবে, পুতুল জন্ম থেকেই কাগজ ফুলের গাছটা দেখে আসছে। গত বছর গরমের সময় পুতুলেরা বাড়ির সবাই দেওঘর গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখলো দারুণ গরমে গাছটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। পুতুল আর পুতুলের মেজদা দুজনে প্রথম দু-একদিন খুব জল ঢাললো গাছটার গোড়ায়। পুতুলের মা বলেছিলেন, 'জলের অভাবে গাছটা শুকিয়ে গেছে, বর্ষা এলেই পাতা গজাবে আবার, কাগজ ফুলের গাছ সহজে মরে না। তাই দুই ভাই মিলে কয়েকদিন খুব জল দেওয়া চলল গাছটায়।

কিন্তু আষাঢ় মাসে যখন বৃষ্টি নামলো, যখন উঠোনের একপ্রান্তে ইঁটের আড়ালে জমাদারের চোখ বাঁচিয়ে লুকিয়ে থাকা আমের আঁটিতে কচি সবুজ পাতা ঝলমল করে উঠলো, এমন কি ছাদে শেফালি ফুলের গাছটার বড় টবের মধ্যে কি করে একটা কুল গাছের ছোট্ট গোলগাল চারা হাওয়ায় তিরতির করতে লাগলো, তখনো কিন্তু কাগজ ফুলের গাছে আর পাতা গজালো না। শুকনো, পাতাহীন ন্যাড়া গাছটা দিনের পর দিন বোকার মত বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজলো, একটা কচিপাতাও মরা ডাল ফুটে বেরুলো না।

বর্ষাকালে বোধ হয় কাকের বাসাগুলো সব ঝড়বৃষ্টিতে ভেঙে যায়। বর্ষা শেষ হতেই বাসা মেরামত করার জন্যে কিংবা নতুন বাসা তৈরি করার জন্যেই কাগজ ফুলের গাছের শুকনো ডালগুলো কাকেরা আস্তে আস্তে ঠোঁট দিয়ে ভেঙে ভেঙে নিয়ে গেল। তারপর কবে একদিন ছোট গুঁড়িটাও কে যেন মুচড়ে ভেঙে দিল। এখন সেই গুঁড়িটার পাশে একটা কলাপতি ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে। এই নতুন গাছটা বিশেষ বড় হয়নি কিন্তু আস্তে আস্তে হাত-পা ছড়াচ্ছে।

সেই কাগজ ফুলের গাছটা এখন আর কোথাও নেই। শুধু পুতুল ইচ্ছে করলেই ইলেকট্রিক বাল্ব বা সূর্যের আলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ বুজলেই চোখের পাতার ভিতরে রঙবেরঙের ঝিলিমিলি পাতায় ভরা সেই গাছটা বানাতে পারে, তবে দুঃখের কথা অন্য কাউকে দেখাতে পারে না।

এদিকে আবার পুতুলের মেজদা আজ কিছুদিন হলো চশমা নিয়েছে, দৈনিক চুলে শ্যাম্পু করছে আর সকাল-সন্ধ্যা নিজের ঘরে জানলার পাশে বসে কি সব লিখছে। সব চেয়ে অবাক হল পুতুল সেদিন যখন মেজদারই সমান হবে একটি ছেলে—উস্কো-খুস্কো চুল, উদাস চোখ, বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে এসে বাইরের বারান্দায় পুতুলকে পেয়ে তাকেই জিজ্ঞাসা করলো, 'কবি অনিরুদ্ধ রায় কি এখানে থাকেন?' অনিরুদ্ধ মানে পুতুলের মেজদা, মেজদাকে কবি বলায় পুতুল যেমন অবাক হল তেমনি খুশিও হল।

মেজদা যখন ঘরে থাকে না পুতুল গিয়ে মেজদার লেখার খাতাগুলো উলটেপালটে দেখে আসে। গদ্য-পদ্য মিলিয়ে অনেকগুলো মোটা খাতা, তার মধ্যে একটা একটু আলাদা রকমের, এই খাতার পাতাগুলো আলগা, এখনো সেলাই করে খাতা গাঁথা হয়নি। ভেতরের পাতাগুলো একেকটা একেক রঙের, খাতার উপরে লেখা—

'কাগজ ফুলের গাছে'

॥ ২ ॥

তরুণ কবি অনিরুদ্ধ রায়ের ঘরটা দোতলায়। কাগজ ফুলের রঙীন পাতাগুলোর যত আনাগোনা ছিল কবির ঘরের জানলার পাশে। এখন সেই গাছটা মরে গেছে, ছাদের চারপাশে বিরাট জঙ্গল তৈরি করে ছিল গাছটা ; এখন কবির ঘরে আলো-হাওয়া অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু সেই গাছটার জন্যে, সেই গাছটার পাতার আড়ালে একটা চড়ুই পাখির বাসা ছিল—সেই পাখির জন্যে, সেই গাছটার রঙীন পাতাগুলোর জন্যে কবি অনিরুদ্ধ রায় কি রকম একটা আকুলতা বোধ করেন ; অনেক-সময় তাঁর বুকের ভেতর হুহু করে ওঠে। কবির বয়েস এখন সতেরো, সদ্য কলেজে পড়ছেন, সামনের নির্বাচন যদি ঠিক পাঁচ বছর পরে হয় তখন কবি ভোট দিতে পারবেন, কবির দু-একটি আট-দশ লাইনের কবিতা কাটছাঁট করে ইতিমধ্যেই ছাপা

www.BanglaBook.org

হয়েছে। কবি অনিরুদ্ধ মনস্থির করেছেন তাঁর প্রিয় পরলোকগত কাগজ ফুলের গাছটিকে তাঁর রচনায় অক্ষয় করে রাখবেন। তাঁর প্রথম কবিতার বইয়ের নাম হবে 'কাগজ ফুলের গাছে'।

কলেজ থেকে ফেরার পথে একদিন বন্ধুদের সঙ্গে বৈঠকখানা বাজারে গিয়ে কাটা কাগজ কিনে এনেছেন অনিরুদ্ধ রায়। বৈঠকখানা বাজারে চমৎকার সব ভালো ভালো দামি কাগজের কাটা টুকরো ওজন দরে বিক্রি হয়। নানা রকম হালকা ও গাঢ় রঙের কাগজ দিয়ে 'কাগজ ফুলের গাছে' বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি। অবশ্য এখনো ঐ আলগা পাতাকটাকে পাণ্ডুলিপি বলা সম্ভব নয়, কারণ তার অধিকাংশ পৃষ্ঠাই ফাঁকা। কিন্তু কবি অনিরুদ্ধ রায় একেবারেই ফাঁকিবাজ লেখক নন, তিনি প্রায় সব সময়েই নিজের টেবিলে বসে কিংবা বালিশ বুকে দিয়ে বিছানায় শুয়ে খস খস করে লিখে যাচ্ছেন। লিখছেন আর পড়ছেন আর কোনো কারণে অপছন্দ হলেই সেটা জানলা দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছেন।

কবি অনিরুদ্ধ রায়ের সমস্ত পাড়াময় রঙীন কাগজের টুকরো উড়ে বেড়াচ্ছে। তার কোনটাতে দু-লাইন, কোনোটাতে চার লাইন লেখা, আবার কোনোটা শুধুই কাটাকুটি বা নক্সা। কবি অনিরুদ্ধের শুধু লেখার কাগজগুলোই রঙীন তাই নয়, তিনি হাল ফ্যাসনের এক ডজন, মানে বারো রঙের বারোটা ফেল্ট পেনের একটা সেট্ কিনে নিয়েছেন, একেক রঙের কাগজে তাঁর পছন্দসই একেক রঙের কালিতে লিখছেন। লিখছেন আর পড়ছেন, বেশ সুর করে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে পড়ছেন, তারপর রাখছেন অথবা উড়িয়ে দিচ্ছেন। শুধু বাড়ির মধ্যেই নয়, বাইরের বারান্দার ধারে, সিঁড়িতে সামনের রাস্তায় পর্যন্ত এখন কবিতার ছড়াছড়ি।

বাতিল কবিতা উড়িয়ে দেওয়ার পরে অনেক সময় আবার কবির হয়ত খেয়াল হচ্ছে ঐ লেখাটি বেশ ভালোই হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে দোতলার ঘর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন কবি, তারপর এদিকে ওদিকে পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছেন প্রয়োজনীয় লেখাটি।

এই ত সকাল বেলাতেই তিনি অনেক কাটাকুটি করে শেষে সন্তুষ্ট না হয়ে 'কাগজ ফুলের গাছে' বইয়ের সদ্য রচিত নাম-কবিতাটি ফেলে দিয়েছিলেন, এখন আর খুঁজে পাচ্ছেন না। রান্নাঘরের বারান্দায়, বাথরুমের ভিতরে, ছাদের কার্নিশের পিছনে, একতলার বারান্দায়, রাস্তায় খুঁজে খুঁজে কবি হয়রান হয়ে গেলেন। হঠাৎ টাকা হারিয়ে গেলে লোকে যেভাবে খোঁজে অনিরুদ্ধ সেই রকম করতে লাগলেন।

এই ত এখানে একটা হলুদ কাগজের টুকরো এই বারান্দায় জানলার নিচে পড়েছে, মাত্র ঘণ্টাতিনেক আগে, তাঁর নিজের লেখা বাতিল কবিতা। উপরের জানলায় পড়ার টেবিলে বসে যে কবিতাটি তিনি নিজেই অসমাপ্ত অবস্থায় অগ্রাহ্য করেছিলেন, এখন নিচের তলায় জানলার পাশে দাঁড়িয়ে সেটি পড়তে তাঁর চমৎকার লাগছে, মনে হচ্ছে শেষ করলেই হত—

'এ গান যে গায়
সে যে আছে খালি গায়
সে কথা কি আমি আর জানি না
এ গান সে গায়
বসে কোন্ জায়গায়.....'

এইটুকু লিখেই কবিতাটি ফেলে দিয়েছিলেন অনিরুদ্ধ, এখন কিন্তু পড়ে ভালই লাগছে, কবিতাটি আর ফেলে দিলেন না তিনি, ভাঁজ করে পকেটে তুলে রাখলেন হলুদ রঙের কাগজের টুকরোটা। কিন্তু সেই 'কাগজ ফুলের গাছে' নাম-কবিতাটি বোধ হয় আরো ভালো হয়েছিল, অল্প অল্প মনে পড়ছে—

'আমার একটি মজার গল্প আছে
মজাটা এই যে গল্পটা নেই কাছে.....'

তারপরে কি যেন ছিল, কাগজ ফুলের কথাও ছিল ঐ কবিতাটায়, এখন মনে হচ্ছে চমৎকার হয়েছিল কিন্তু উড়ে যাওয়া রঙিন কবিতার পাতাটি, ফিকে বেগুনি রঙের কাগজে জাহাজি নীল রঙের কালি দিয়ে লেখা সেই কবিতাটি কোথায় যে গেল!

সিঁড়ির নিচে নোংরার মধ্যে অনিরুদ্ধ রায় কবিতাটি খুঁজছিলেন, এমন সময় রান্নাঘর থেকে তাঁর মা তাঁকে ডাকলেন, 'খোকা, ওখানে নোংরার মধ্যে কি করছো?' কবি অনিরুদ্ধ রায়কে যাঁরা শিশু বয়েস থেকে চেনেন তাঁরা তাঁকে খোকন বা খোকা বলে ডাকেন। এইভাবে নাম ডাকা হলেই অনিরুদ্ধ রায় একটু গুটিয়ে যান, তাই মা ডাকতেই কোনো জবাব না দিয়ে তরতর করে দোতলায় নিজের ঘরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

॥ ৩ ॥

আমার একটা মজার গল্প আছে,
মজাটা এই যে গল্পটা নেই কাছে।
জামার পকেটে গল্পটা ছিল গোঁজা,
একদিন গেল ধোপার বাড়িতে সোজা।
এখন দেখছি গল্পটা ফুটে আছে,
সিঁড়ির নিচেই কাগজ ফুলের গাছে।

এই মজার কবিতাটি কিছুক্ষণ আগে পুতুল কুড়িয়ে পেয়েছে সেই জায়গাটায়, যেখানে এখন একটা বাচ্চা কলাপতি ফুলের গাছ রয়েছে, আগে যেখানে কাগজ ফুলের গাছটা ছিল। ফিকে বেগুনি রঙের কাগজে জাহাজি নীল রঙের কালি দিয়ে রচিত আশ্চর্য ছয় লাইন পর পর দু'বার পড়ে কোন মানে বুঝবার আগেই পুতুলের মুখস্থ হয়ে গেল।

এই কাগজের টুকরোটি আরো কয়েকটা ফেলে দেওয়া কাগজের সঙ্গে পুতুল কুড়িয়ে নিয়ে নিজের পড়ার জায়গায় অঙ্কের বইয়ের মধ্যে তুলে রেখেছিল। ওখানে বসেই সে দেখছিল, মেজদা চারপাশে হন্যে হয়ে কি যেন খুঁজছে, মেজদা যে তার নিজের ফেলে দেওয়া, অমনোনীত কবিতা খুঁজছে পুতুল সেটা বুঝতে পারেনি। তাছাড়া তার আবার কাল সাপ্তাহিক অঙ্ক পরীক্ষা, এ সপ্তাহে ঐকিক নিয়ম হবে, ভীষণ গোলমেলে জিনিস, তিনটে বিড়াল তিন দিনে যদি তিনটে ইঁদুর ধরে, একটা চোখ বুজলে এক মাইল দেখা যায়...যতসব বিশ্রী ব্যাপার। পুতুল মোটামুটি গুছিয়ে এনেছে, প্রথম থেকে ঠিকই কষে ফেলতে পারছে কিন্তু শেষ ধাপে প্রায়ই কি একটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে; যেখানে তিন দিয়ে আঠারোকে ভাগ দিয়ে ছয় মণ ছোলা উত্তর হবে, সেখানে পুতুলের গুণ করে চুয়াল্লিটা ঘোড়া উত্তর হচ্ছে। এর মধ্যে আবার মাথার মধ্যে বারবার ঐ কাগজ ফুলের গাছে, 'আমার একটা মজার গল্প আছে' ঘুরঘুর করছে। ঐ ঘুরঘুর করতে করতে পরের অঙ্কটায় যখন কলকাতা থেকে বর্ধমানের দূরত্ব বেরুলো এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার

www.BanglaBook.org

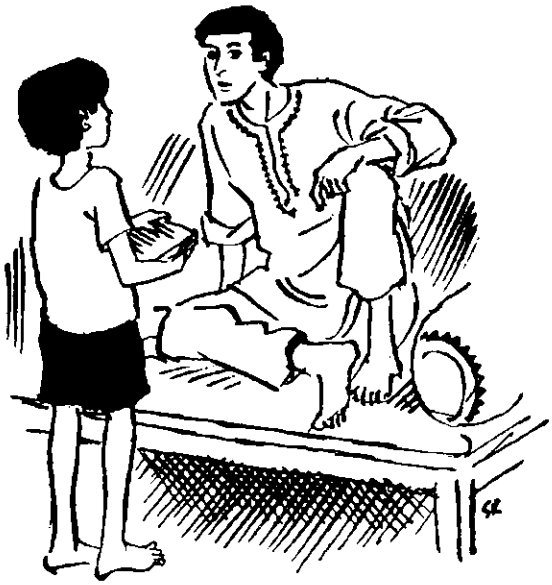

কিলোমিটার তখন বাধ্য হয়ে পুতুল অঙ্কের বইখাতা নিয়ে দোতলায় মেজদার ঘরের দিকে চললো।

কবি অনিরুদ্ধ রায়ের অতীত ইতিহাস খুব কবিত্বময় নয়, অঙ্কে তাঁর খুব মাথা ছিল, এই ত গত বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় মাত্র তিন নম্বরের জন্যে অঙ্কে লেটার পাননি, অবশ্য এখন সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি পড়ছেন ; অঙ্কের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন তবু সময়ে অসময়ে তাঁকে দিয়েই পুতুল অঙ্ক দেখিয়ে নেয়, হোমটাস্ক কষিয়ে নেয়।

আজকে পুতুল খাতাবই নিয়ে আসতেই অনিরুদ্ধ রায় একটু বিরক্ত হলেন, এই মুহূর্তে তিনি একটি রহস্য রোমাঞ্চ পদ্য প্রায় কায়দা করে এনেছেন—

কবরখানায় ছায়া ছমছম,
রক্তের দাগ লোকটা জখম,
লোকটা হাসছে মরণের হাসি,
দুপুর রাত্রে বাজে কার বাঁশি ?
সজারুর কাঁটা বাজে ঝন্ ঝন্.....।

এই সজারুর কাঁটার পংক্তিতে কবি একটু আটকিয়ে গেছেন, এর পরে আর এগোচ্ছে না, একবার কেটে দিয়ে লিখলেন—

সাপের চোখের মণি ঝক্‌ঝক্

এটাও পছন্দ হল না, আবার কেটে লিখলেন—

শেয়ালের ডাক হুয়া হুয়া হুয়া

কিন্তু এটাও তেমন জমছে না, এর মধ্যে পুতুল আবার অঙ্কের বইখাতা নিয়ে উপস্থিত হল। ভুরু কুঁচকে একবার পুতুলের দিকে তাকালেন অনিরুদ্ধ, তাকাতেই হঠাৎ নজরে পড়লো অঙ্কের বইয়ের ভাঁজে রঙীন কাগজের টুকরোগুলির দিকে। একটু কড়া গলাতেই অনিরুদ্ধ পুতুলকে বললেন, 'এগুলো তুই লুকিয়ে বসে আছিস, আর আমি চারদিকে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলাম!' পুতুল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'আমি লুকিয়ে রাখবো কেন, এগুলো আমি সব কুড়িয়ে পেয়েছি।' উপযুক্ত উত্তরে অনিরুদ্ধ একটু নরম হলেন, ঠান্ডা গলায় বললেন, 'দ্যাখ ত ওর মধ্যে কাগজ ফুলের গাছে বলে একটা কবিতা আছে কিনা ?' পুতুল সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের ভাঁজ থেকে বেগুনি রঙের কাগজের টুকরোটি বের না করেই গড় গড় করে মুখস্থ বলে গেল—

'আমার একটা মজার গল্প আছে...
...সিঁড়ির নিচেই কাগজ ফুলের গাছে।'

স্বরচিত কবিতা অন্যের মুখে মুখস্থ শুনে কবি অনিরুদ্ধ রায় বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখে হাঁ করে তাঁর এই ক্ষুদ্র পাঠকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর অনেকক্ষণ থেমে পুতুলের দিক থেকে চোখ সরিয়ে বললেন, 'কবিতাটা ভালো হয়েছে না ?' পুতুল চুপ করে রইলো, তারপর আস্তে আস্তে অঙ্কের বইখানা কবির দিকে এগিয়ে দিল। অনিরুদ্ধ সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে বললেন, 'সাতশো টাকা জোগাড় করতে পারলেই একটা কবিতার বই বার করবো, নাম দেবো 'কাগজ ফুলের গাছে'। পুতুল এবার বললো, 'আচ্ছা, গাছটা খুব সুন্দর ছিল, তাই না ?' অনিরুদ্ধ বললেন, 'তোর নিশ্চয় মনে নেই, তুই তখন বেশ ছোট, একবার তোর জন্মদিনে ঐ গাছটায় অনেক টুনিবাল্ব লাগিয়েছিলাম আর কাগজের শিকল। সন্ধ্যাবেলায় গাছটা পুরো পাড়াটার চেহারা পাল্টে দিয়েছিল।' পুতুল বললো, 'বা, মনে থাকবে না ? আমি ত তখন ক্লাস টু-তে পড়ি। সেই টুনি-বাল্বগুলো এখনো আলমারির নিচের তাকে রয়েছে, আমি সেদিনও দেখেছি।'

একটু পরে অনিরুদ্ধ রায় বললেন, 'আজ অঙ্ক থাক।' পুতুলেরও খুব ইচ্ছে নেই অঙ্ক কষায়, শুধু কাল সাপ্তাহিক পরীক্ষা বলে বিবেকের টানে অঙ্ক বুঝতে এসেছিল। এখন সুযোগ বুঝে ঐকিক নিয়মকে পুতুল একদিনের ছুটি দিলে।

কুড়িয়ে পাওয়া কবিতার টুকরোগুলো অঙ্কের বইয়ের ভাঁজ থেকে বার করে পুতুল ফেরত দিল, সেগুলো সব অনিরুদ্ধ রায়ের দরকার নেই, শুধু একটিই দরকার, তবু সব কয়টা কাগজের টুকরোই তিনি এবার নিজের কাছে রেখে দিলেন, তারপর পুতুলকে বললেন, 'একটা চারা আনতে হবে কোথাও থেকে, আমরা আরেকটা কাগজ ফুলের গাছ লাগাবো ওখানটায়।' পুতুলও এ বিষয়ে একমত, কিন্তু সে এখন অনেক বেশী চিন্তিত কাগজ ফুলের গাছের চেয়ে 'কাগজ ফুলের গাছে' নামে কবিতার বইয়ের জন্যে। যত তাড়াতাড়ি পারে পড়াশুনো শেষ করে পুতুল উপার্জন করা আরম্ভ করবে আর তখন প্রথমেই সাতশো টাকা দেবে বইটা বার করার জন্যে। বইটার মলাটে একটা রঙীন এলোমেলো পাতাওলা গাছের ছবি থাকবে, প্রচ্ছদ পুতুল নিজেই আঁকবে, ভেতরেও অনেক ছবি দেবে। বই খুললেই একেবারে সামনের পাতায় লেখা থাকবে—কাহিনী অনিরুদ্ধ রায়, চিত্র অনির্বাণ রায়। অনির্বাণ পুতুলের ভাল নাম।

পুতুল এসব ভাবতে ভাবতে উত্তেজিত হয়ে পড়লো, পুতুলের মুখচোখ দেখেই কবি তার উদ্দীপনা অনুমান করতে পারলেন, খুব খুশি হয়ে বললেন, 'নে তোকে একটা কবিতা উপহার দিচ্ছি', বলে একটা গাঢ় লাল কাগজ এগিয়ে দিলেন, তাতে সাদা রঙের একটা বেড়ালের ছবি আঁকা, নিচে লেখা—

খুশি যখন অল্পে খুশি
পুষি বেড়াল পেলেই পুষি
পুষি বেড়াল খুশি বেড়াল
তুমি পোষো আমিও পুষি।

১৩৮৪

www.BanglaBook.org

॥ নাটিকা ॥

বাংলার বাঘ

ধীরেন্দ্রলাল ধর

প্রথম দৃশ্য

[সকাল বেলা ঝামাপুকুরের রাজা দিগম্বর মিত্রের বৈঠকখানা। বিদ্যাসাগরমশাই ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বসে আছেন। কোন এক সময় বিদ্যাসাগর মশাই উঠে পড়লেন।]

রাজা। কি বিদ্যাসাগর, এরই মধ্যে উঠে পড়লেন যে?

বিদ্যাসাগর। একবার পটলডাঙ্গায় যাবো।

রাজা। পটলডাঙ্গায় কার কাছে?

বিদ্যাসাগর। এক মেসে একটি ছেলে থাকে, তার একবার খবর নিয়ে আসি।

রাজা। কোন ছেলে, আমরা চিনি?

বিদ্যাসাগর। নবীনচন্দ্র।

রাজা। নবীনচন্দ্র? চট্টগ্রামের ছেলেটি, যে এবার বি-এ পাস করেছে?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ। ছেলেটি ভালো। বড় শান্ত। মুখখানি দেখলেই মায়া হয়। ক'দিন আগে বেচারার বাবা মারা গেছেন! বড় বিপদে পড়েছে। ছেলেমানুষ!

রাজা। আপনাকে ধরেছে বুঝি কোন কাজকর্ম করে দেবার জন্য?

বিদ্যাসাগর। না, মুখ ফুটে কোনদিন কিছু বলেনি। তবে একটা কাজকর্ম করে দিতে পারলে ভাল হয়।

রাজা। আপনি একটু চেষ্টা করলেই তো একটা কিছু করে দিতে পারেন।

বিদ্যাসাগর। কি করতে পারি তাই ভাবছি।

রাজা। আপনি যখন তার কথা ভাবছেন তখন তার একটা সুব্যবস্থা হবেই।

[দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো যুবক নবীনচন্দ্র]

বিদ্যাসাগর। কে, নবীনচন্দ্র, এসো এসো, তোমার কথাই ভাবছিলাম।

[নবীনচন্দ্র ভিতরে এসে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের পদধূলি গ্রহণ করলেন। রাজামশাইকেও প্রণাম করলেন।]

বিদ্যাসাগর। কেমন আছ বাবা, বাড়ির সব কুশল তো?

নবীন। হ্যাঁ, মা'র চিঠি পেয়েছি, সবাই ভাল আছেন।

বিদ্যাসাগর। মা কিছু লিখেছেন, সেখানকার খরচপত্র চলছে কেমন করে?

নবীন। মা তো সে কথা কিছু লেখেননি।

বিদ্যাসাগর। আবার চিঠি লিখে জেনে নাও।

নবীন। লিখবো।

বিদ্যাসাগর। আমার চিঠি নিয়ে সংস্কৃত প্রেসে গিয়েছিলে?

নবীন। আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁরা আমাকে চল্লিশটি টাকা দিয়েছেন, সেটা আমি নিয়ে এসেছি। [জামার পকেট থেকে চারখানা দশ টাকার নোট বের করে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কাছে রাখলেন।]

বিদ্যাসাগর। [ব্যস্ত ভাবে] আহা-হাঃ ওটা আবার আমার কাছে নিয়ে এলে কেন, ওটা তোমার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দাও। [নোটগুলো তুলে নিয়ে নবীনের হাতে গুঁজে দিলেন।] সংসারে কত রকম খরচ, টাকা ছাড়া চলবে কি করে। টাকার প্রয়োজন সবার আগে। ওটা আজই মনিঅর্ডার করে দাও।

নবীন। [রুদ্ধকণ্ঠে] তাই দোব।

বিদ্যাসাগর। তুমি এদিকে কিছু সুবিধা করতে পারলে?

নবীন। সকালে বিকালে দুটি টিউশনি করি, তাতে এখানকার খরচটা চলে।

বিদ্যাসাগর। ছেলে পড়াও? না না, ছেলে পড়ানোর দরকার নেই। ওতে নিজের বড় ক্ষতি হয়। আমি তোমাকে একখানা চিঠি দোব, তুমি একবার লাটবাহাদুরের সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা কর।

নবীন। লাটসাহেবের সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করবো?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ। মানুষটি ভালো। ভয় করার কিছু নেই। আমার চিঠি পেলেই ডেকে পাঠাবেন। বি-এ পাস করেছ, যদি একটা ডেপুটিগিরি হয় তো সারা জীবনের খাওয়া-পরার সমস্যা মিটে যাবে।

নবীন। লাটসাহেবের সেক্রেটারি, কথাবার্তা কইতে পারবো তো? যদি ভুলচুক হয়?

বিদ্যাসাগর। বিলেতীর ভাষা বলতে গেলে ভুলচুক তো হতেই পারে, সে জন্যে ভয় কি। সত্য পথে চললে কোন কিছুতেই ভয় নেই, ন্যায় সত্য ধর্ম মানুষকে সদাই রক্ষা করে। শুভকর্মে দেরী করতে নেই, তুমি আজই সন্ধ্যাবেলা এসো, চিঠি লিখে রাখবো। কাল সকালেই গভর্নমেন্ট হাউসে যাবে।

নবীন। তাই যাবো।

[বিদ্যাসাগরমশাই ও রাজামশাইকে প্রণাম করলো।]

বিদ্যাসাগর। থাক্ থাক্ বাবা, আর প্রণাম করতে হবে না। ভগবান তোমার কল্যাণ করুন।

[নবীনচন্দ্রের প্রস্থান।]

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাজা। বেশ ছেলে, শান্ত ভদ্র বিনয়ী।

বিদ্যাসাগর। সেই জন্যই তো আমার ভালো লেগেছে।

রাজা। যাক আর তো পটলডাঙ্গায় যেতে হবে না, বসুন, দুটো সুখদুঃখের কথা বলি।

বিদ্যাসাগর। না, আজ আর বসতে পারবো না। একবার কলুটোলায় মতিশীলের বাড়ি যেতে হবে। আতুরশালার জন্য খানিকটা জমি দেবেন বলেছেন, তার একটা পাকা কথা কয়ে আসি।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কয়েক বছর পরের ঘটনা। প্রান্তরের পথ, মাঝে মাঝে বনভূমি। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে। বাতাসে ঝড়ের পূর্বাভাস। মাঠের পথ ধরে একখানি পালকি চলেছে। পালকির পাশে পাশে বন্দুকধারী বরকন্দাজ ছুটছে। পালকির মধ্যে বসে আছেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নবীনচন্দ্র সেন।

নেপথ্যে। ধাঁই কিরি কিরি, ধাঁই কিরি কিরি—

পালকির প্রবেশ।]

নবীন। একটু জোরে চল, আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে। ঝড়-জল এলে রাতের পথে চলতে বড় কষ্ট হবে।

জমাদার। তাড়াতাড়ি যেতেই হবে হুজুর, পিছনে একটা দঙ্গল আসছে।

নবীন। দঙ্গল আসছে! [মুখ বের করে পিছনে তাকালেন।] ওরা কারা?

জমাদার। বোধ হয় রাজার পাইক হুজুর। হাতে লাঠিসোঁটা আছে।

নবীন। অতো জন পাইক আমাদের পিছনে আসছে কেন?

জমাদার। অনেকক্ষণ ধরে আসছে হুজুর।

নবীন। একটা হাঙ্গামা হুজ্জত বাধাবার জন্য তৈরী হয়ে আসছে বলে মনে হয়।

জমাদার। রাতের বেলা এই মাঠের মাঝে হুজ্জত বাধালে আমরা বে-কায়দায় পড়বো হুজুর।

নবীন। থানা আর কত দূর?

জমাদার। তা চার-পাঁচ ক্রোশ হবে হুজুর।

নবীন। সে তো অনেক পথ, তার আগেই ওরা আমাদের উপর চড়াও হবে।

জমাদার। আমরা যতটা পারি এগিয়ে যাই।

নবীন। না, এখানেই পালকি রাখো।

জমাদার। সে কি হুজুর!

নবীন। ওদের স্পর্ধা বড় বেড়ে গেছে, আমি এখনি ওদের সঙ্গে একটা মোকাবিলা করতে চাই। রাখো পালকি।

[বেহারারা পালকি নামালো। নবীনচন্দ্র পালকি থেকে নামলেন।]

নবীন। জমাদার, কজন সিপাহী আছে?

জমাদার। চারজন।

নবীন। চারজনেরই তো বন্দুক রয়েছে।

জমাদার। হ্যাঁ, হুজুর।

নবীন। বন্দুক চালানোর অভ্যাস আছে?

জমাদার। হ্যাঁ হুজুর।

নবীন। ফাঁকা আওয়াজ করো।

জমাদার। যো হুকুম হুজুর, আপনি পালকিতে বসুন, আমরা সব ঠিক করে দিচ্ছি। সিপাহীলোগ, বন্দুক লাগাও। হুজুরের হুকুম, হাওয়া বাজি। সামনামে এক সাথ্ খাড়া হো যাও, বন্দুক লাগাও,—এক, দো, গোলি উঠাও—এক, দো, তিন, চার, রেডি— চালাও—এক, দো, তিন, চার।

[চারজন পুলিশ জমাদারের নির্দেশমত সার দিয়ে দাঁড়ালো, বন্দুক বাগিয়ে ধরে শূন্যে গুলি ছুঁড়লো। একে একে চার বার বন্দুকের শব্দ হলো—দুম দুম দুম দুম।]

নবীন। ঠিক হ্যায় [পালকিতে উঠে বসলেন।]

বার বার চার বার বন্দুক গর্জন
কাঁপাইয়া পথঘাট,
কাঁপাইয়া বনমাঠ,
রাত্রির অন্ধকারে ওঠে সেই ধ্বনি,
দিগন্তের প্রান্তরে জাগে প্রতিধ্বনি।

নবীন। [পিছনের পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে] জামাদার!

জমাদার। হুজুর।

নবীন। ওরা দাঁড়িয়েছে, তুমি যাও, ডেকে আনো ওদের দলের সর্দারকে।

জমাদার। যো হুকুম হুজুর। [প্রস্থান]

নবীন। [আপন মনে]

জীবন পথ সহজ নয়, হিংসা দ্বেষ কণ্টকিত
পদে পদে বিঁধবে কাঁটা, চিত্ত হবে সশঙ্কিত।
সত্য ন্যায় হারিয়ে যায়, মেঘে ঢাকে চন্দ্রালোক,
তুমি তখন পথের দিশা, তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

[জমাদারের প্রবেশ, সঙ্গে একজন পাইক।]

জমাদার। হুজুর, সর্দার এসেছে।

সর্দার। দণ্ডবৎ হই হুজুর।

নবীন। তুমি কে?

সর্দার। আমি রাজার গোমস্তা হুজুর।

নবীন। এত লোক নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

সর্দার। এরা সবাই রাজার পাইক হুজুর। রাজার মামলা দেখতে সবাই কটকে গিয়েছিলাম, ফিরছি।

নবীন। এতো লাঠিসোঁটা কিসের জন্য?

সর্দার। মাঠের পথে রাতের বেলা লাঠি ছাড়া যেতে নেই হুজুর।

নবীন। তোমার নাম কি?

সর্দার। বলরাম পয়রা।

নবীন। বলাই পয়রা?

সর্দার। হ্যাঁ, হুজুর।

নবীন। আমি তো তোমাকে চিনি, কটকের সেই ভুঁড়িওয়ালা উকিলবাবুর বাড়িতে তুমি গিয়েছিলে, হৈ চৈ করেছিলে, তখনও তো তোমার সঙ্গে একটা দল ছিল।

সর্দার। আমি হুকুমের চাকর হুজুর, আমার উপর তখন যেমন হুকুম ছিল।

www.BanglaBook.org

নবীন। আজও বুঝি হুকুম আছে মাঠের মাঝে একটা হাঙ্গামা বাধাতে হবে?

সর্দার। না হুজুর, হুকুম আর কে দেবে, রাজার তো কালাপানি হয়ে গেল।

নবীন। তোমরা বারবার হুজ্জত বাধাবার চেষ্টা করছ, বার বার রেহাই দিচ্ছি, এবার হুজ্জত বাধালেই তোমাদেরও কালাপানি পার করে দোব।

সর্দার। হুজুর, আমি নির্দোষ, রাজার নুন খাই, রাজার হুকুম মানি।

নবীন। তোমাদের দলবল নিয়ে আগে আগে চলে যাও, কোন শব্দ যেন না শুনি।

সর্দার। যো হুকুম হুজুর।

নবীন। জমাদার, সিপাইদের বল বন্দুক তৈরী রাখতে, বেসামাল কিছু দেখলেই গুলি চালাবে।

জমাদার। যো হুকুম হুজুর। [উচ্চকণ্ঠে] সিপাহীলোগ্ বন্দুক লাগাও, হুজুরের হুকুম।

নবীন। কি বলাই পয়রা, এখনও দাঁড়িয়ে আছ যে?

বলাই। দণ্ডবৎ হই হুজুর।

নবীন। যাও।

[বলাই চলে গেল।]

নবীন। [আপন মনে]
জয় কর মিথ্যা দ্বেষ অন্যায় সংশয়
মনোমাঝে জেগে থাক চির জ্যোতির্ময়।

[বলাই পয়রার প্রবেশ। পিছনে এক সারি লাঠিয়াল। একে একে তারা সামনে দিয়ে চলে গেল।]

নবীন। জমাদার।

জমাদার। হুজুর!

নবীন। বন্দুক লাগাও, ফাঁকা আওয়াজ।

জমাদার। যো হুকুম হুজুর। [আদেশের সুরে] সিপাহী-লোগ, বন্দুক লাগাও।...গোলি লাগাও...রেডি... হাওয়া বাজি—এক দো তিন চার।
পর পর চারবার বন্দুকের শব্দ হল।]

নবীন। ঠিক হ্যায়।

জমাদার। জয় বাবা জগড়নাথের জয়, একটা বড় হাঙ্গামা কেটে গেল হুজুর। ওদের দু'চারটেকে আমি চিনি, পাকা বদমাস। ওরা হাঙ্গামা বাধাতেই এসেছিল হুজুর। আপনি রাজাকে কালাপানি পাঠিয়েছেন, ওরা তার শোধ তুলতে চায়। আমাদের বন্দুক দেখে ওরা সাহস পেলে না।

নবীন। ওসব বদমায়েসকে আমি ভয় করি না জমাদার। রাজাটা অত্যন্ত দুষ্ট লোক। নেলাখোর সন্ন্যাসী ঐ সত্যবাদী বাবাজী কোন অন্যায় করেনি, রাজা তাকে মেরে ফেললে! ওর তো দ্বীপান্তর হবেই। অমন শয়তানকে সমাজে বাস করতে দেওয়া উচিত নয়।

জমাদার। আপনাকে তো অনেক টাকা দিতে চেয়েছিল হুজুর।

নবীন। হ্যাঁ, লাখ টাকা। লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে আমায় কিনতে চেয়েছিল।

জমাদার। আমরা জানি হুজুর।

নবীন। আবার ভয় দেখিয়েছিল। টাকা না নিলে খুন করবে।

জমাদার। আপনি মহাপ্রভু, জগড়নাথের লোক, আপনার কে কি করবে হুজুর?

নবীন। মহাপ্রভুর লোক! হ্যাঁ, জীবন্ত মহাপ্রভু আমি দেখেছি রে, তিনি বিদ্যাসাগর। তিনি আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন—সত্য ন্যায় ধর্ম মেনে চলবে, কোন অন্যায়কে ভয় করবে না, ভগবানের আশীর্বাদে সব বিপদ পার হয়ে যাবে। সেই মহাপ্রভুর দয়াতেই আমার সব।

জমাদার। মহাপ্রভুর জয়। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটি অবধি নড়ে না হুজুর।

নবীন। [অন্যমনস্কভাবে] জমাদার, আর বসবো না, এবার চল।

জমাদার। ওরে পালকি ওঠা—চল।

[বেহারা চারজন পালকি কাঁধে তুলে নিল। ধীরে ধীরে পালকি চলে গেল, নেপথ্যে শোনা গেল—ধাঁই কিরি কিরি, ধাঁই কিরি কিরি! জমাদার ও সিপাহী চারজন সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ালো।]

১৩৭১

www.BanglaBook.org

পুলকের অ্যাডভেঞ্চার

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

সে-বছর গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হওয়ার কিছু আগে পুলক শুনতে পেল যে এবারে সেই একঘেয়ে সমুদ্রের ধারে না গিয়ে ন'মামার ক্যাম্পে যে যাওয়া হচ্ছে সুবর্ণরেখা নদীর ওপারে গারো-নালার কাছে। এই ভূতত্ত্ববিদ মামার গল্প সে অনেক শুনেছে কিন্তু কদাচিৎ দেখেছে তাঁকে। তিনি উত্তর ভারতে বসবাস করতেন আর সফর করে বেড়াতেন জম্মু-কাশ্মীর, নেপাল, রাজস্থান, মহীশূর ও গুজরাটে। মামীমা মাঝে মাঝে আসতেন আর মামার ক্যাম্প-জীবনের যে-সব বিপদসংকুল রহস্যপূর্ণ গল্প বলতেন তাই শুনে সে মনে মনে ঠিক করেছিল যে বড় হলে জিওলজিস্ট্ হবে।

খবর পাওয়া মাত্র সে অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে সহপাঠী প্রিয়তম বন্ধু তরুণকে জানাতে গেল।

ডানপিটে আর অসমসাহসী বলে ছেলেরা সবাই তরুণকে সমীহ করে চলত। অনেক দুষ্টুমির ব্যাপারে ও নাকি তার শাগরেদি করেছে। ভাবল ওকে জাপিয়ে জাপিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে খুব মজা হয়। অবশ্য ওরও মা-বাবা আছেন। তাঁদেরও মত করাতে হবে। গত বছর ওরা দেশের বাড়িতে গিছল। দেদার আম-কাঁঠাল খেয়ে পেটের অসুখ করে গিছল তরুণের।

কিছু বলতে হলো না কাউকে। তরুণ শুনেই বললে, 'বলিস কি রে, খুব মজা হবে ত। বাবা যে আমাদের ঘাট-শিলাতে বেড়াতে নিয়ে যাবেন বলে বাড়ি ভাড়া করেছেন। তোর মামার ক্যাম্প ত সেখান থেকে কাছে। কি নাম বললি? বিনয় পালিত? বাবা হয়ত চিনতেও পারেন।'

পুলকের আর আনন্দ ধরে না। মায়ের কাছ থেকে নিয়ে মামার চিঠিখানা ভাল করে পড়ে দেখল। তিনি লিখেছেন নামতে হবে রাখা-মাইন্স্ স্টেশনে। সেখান থেকে জীপগাড়ি নিয়ে আসবে সকলকে। দুখানা বড় বড় তাঁবু খালি করে রাখা হবে। হাল্কা বিছানা আর মশারি ছাড়া আর কিছুই আনতে হবে না।

পরের দিন সে ইস্কুলে গিয়ে দেখল যে তরুণ একটা সার্ভে-অফ্-ইন্ডিয়ার ম্যাপ যোগাড় করে এনেছে কোথা থেকে, তাতে ঘাটশিলা, গালুডি, রাখা-মাইন্স্ প্রভৃতি রেল-স্টেশন ছাড়াও নদী, নালা, জঙ্গল, পাহাড়, গরুর গাড়ি চলাচলের পথ নিখুঁত ভাবে ছাপা আছে।

তরুণ পুলককে সঙ্গে নিয়ে ভূগোলের শিক্ষকের কাছে জেনে নিল পাহাড়ের স্তর, উচ্চতা, দূরত্ব কেমন করে নক্সাতে দেখানো হয়। মাস্টারমশায় তাদের বললেন যে তিনি ঘাটশিলাতে অনেকবার গেছেন। সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বাদ দিলেও কেবলমাত্র পাথর আর ধাতুর সমাবেশ, বিশেষ করে সে-সবের উৎপত্তি কেমন করে হয় তার বিবরণ শুনতে পেলে অনেক উপকার হবে। উপদেশ দিলেন ওরা যেন বিভিন্ন ধরনের পাথরের নমুনা সংগ্রহ করে আর রোজনামচা লিখে রাখে।

পুলকের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি হেসে বললেন, 'আমি কেবলমাত্র ঘাটশিলা সহরতলির কথা বলছি না। বলছিলাম সমস্ত ধলভূম অঞ্চলের কথা। রাখা-মাইন্স্ হচ্ছে তারই একটা অংশ।'

তরুণের উপস্থিত বুদ্ধি আর সাহসের প্রতি পুলকের শ্রদ্ধা অসীম। সে তার কাছ থেকে কথা আদায় করল যে-কোনো একটা ছুতো করে রাখা-মাইন্স্ ঘুরে আসে যেন।

শেষ পর্যন্ত পুলকের বাবার কাজ পড়ে যাওয়ায় ওদের যেতে এক সপ্তাহ দেরি হয়ে গেল। তরুণ ঘাটশিলাতে পৌঁছাবার দিনতিনেক পরে যে চিঠি লেখে পুলককে, তাইতে একটা বড় খবর ইচ্ছা করেই বাদ দিয়েছিল। তার বাবার বাল্য-কালের বন্ধু সঞ্জীববাবু ঘাটশিলার কাছে একটি বড় কৃষিফার্মের মালিক এবং তাঁর সঙ্গে বিনয়বাবুর খুব খাতিরের আলাপ। ঘাটশিলা পৌঁছবার কয়েকঘণ্টার মধ্যে তরুণ একখানি পরিচয়-পত্র সংগ্রহ করে পালিত সাহেবের ক্যাম্পে হাজির হয়। ছেলেটির উৎসাহে খুসি হয়ে তিনি তাকে জরিপের কাজ শেখাবার জন্যে তাঁর প্রধান সার্ভেয়ার সমরেশ দত্তর কাছে পাঠিয়ে দেন।

এইসব কোনো খবরই সে পুলককে জানায়নি। চিঠি ভরিয়েছিল ঘাটশিলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে। ওরা কবে রওনা হচ্ছে জানাতে বলে।

পুলক খুব আশা করেছিল যে সে ঘাটশিলা রেল-স্টেশনে তরুণকে দেখতে পাবে। আগ্রহ ভরে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে-ছিল। মা বললেন, 'তুইও যেমন, এই ঠা-ঠা করা রোদ্দুরে কেউ কখনও বাড়ি থেকে বার হয়।'

গাড়ি সুবর্ণরেখা নদী পার হয়ে রাখা-মাইন্স্-এ থামল। দূর থেকেই জীপ, ট্রাক আর লোকজন দেখা গেল। ছোট স্টেশন জমজমাট। এখানে এত লোকের সমাগম অভূতপূর্ব ব্যাপার। উত্তেজনার চোটে পুলক তরুণের প্রতি অভিমান ভুলে গেল।

খানিকটা জঙ্গল সাফ করে উঁচু জমিতে, নদীর কিছু দূরে তাঁবু পড়েছে পালিত সাহেবের ও তাঁর অতিথিবর্গের। সহকারী কর্মচারীদের ছোট ছোট অনেকগুলি তাঁবু ভিন্ন দিকের ঢালুর ওপর ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে পরস্পরের দৃষ্টির অগোচরে!

পুলক জীপ গাড়ীর পিছন থেকে লাফিয়ে নেমে এক ছুটে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছোট পাহাড়ের মাথায় উঠে

www.BanglaBook.org

দেখতে পেলো ওদিকে নদী বেঁকে গিয়ে আরো ঘন বনের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে, আর দেখা যাচ্ছে ব্যাঙের ছাতার মত কতকগুলো তাঁবু। তারই একটার মধ্যে যে তরুণ থাকে সে কথা সে জানলে পরে নিশ্চয়ই ছুটে যেত। সে অবাক হয়ে ভাবছিল কেমন করে গ্রীষ্মের খরায় গাছে গাছে অমন গাঢ় সবুজ পাতা গজায়।

দুপুরের খাওয়া সারা হলে মামা বললেন, 'অন্যদিন কাজ সেরে তাঁবুতে ফিরতে বেলা আড়াইটা হয়ে যায়। আজ সকাল সকাল ফিরতে হয়েছে বলে বিশ্রাম করবার সময় হবে না। সঙ্গে যাবে নাকি পুলক? ফিরতে কিন্তু রাত হয়ে যেতে পারে।'

পুলক লাফিয়ে উঠল। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা লিখে রাখতে হবে বলে ও একটা খাতা এনেছে। তরুণকে তাক লাগিয়ে দিতে হবে। বললে, 'নিশ্চয় যাব।' সে জীপের দিকে যাচ্ছিল। মামা হেসে বললেন, 'এটা ঠিক মামার বাড়ি নয়। এটা হচ্ছে অবিরাম কাজের মধ্যে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেওয়ার ছাউনি। যাদের পাথর খুঁজে বেড়ানোর কাজ তাদের গাড়ি চড়ে আকাশের শোভা দেখতে দেখতে গেলে কাজ এগুবে না। আমাদের জঙ্গল কেটে কেটে পাহাড়ে উঠতে হবে।'

পুলক একটু লজ্জা পেয়ে জুতো আর জামাকাপড় বদল করে নিল। সঙ্গে রাখল জলের বোতল, হাতুড়ি ও বস্তা-বাহক। লোকটি একটি টাঙ্গিও সঙ্গে নিয়েছে পুলক দেখল। প্রথমে ভেবেছিল সেটা বুঝি আত্মরক্ষার অস্ত্র। পরে দেখল সেটার কাজ হচ্ছে আগাছা আর কাঁটা ঝোপঝাড় কেটে পথ করে দেওয়া। প্রথম প্রথম খুব হোঁচট খেল পুলক পাথরের ওপর, অল্প উঠেই হাঁপিয়ে উঠতে লাগল—পরে কিছুটা অভ্যাস হয়ে গেলে সে মামার নাগাল পেল।

ওদিকে তরুণ সার্ভেয়ারদের সঙ্গে বেরিয়েছিল আরও ঘণ্টাখানেক আগে ভিন্নদিকে। তারা প্রত্যহ ভোর থেকেই কাজ শুরু করে। দুপুরে ফিরে স্নানাহার সেরে আবার সদলবলে হাঁটতে বেরিয়েছে। একটা দল যন্ত্রপাতি, টেবিল, চেন, নিশানার পোল ইত্যাদি অনেক রকম সরঞ্জাম নিয়ে নদীর ধারেই গাছ-তলায় বিশ্রাম করে নিয়েছিল।

সমরেশবাবু দূর থেকে নিচে রাস্তার এক প্রান্ত দেখিয়ে বলেছিলেন, 'ওখান থেকে আরও দু-চার পা এগিয়ে গেলে দেখতে পাবে বাঁ দিকের পাহাড়ের গা বেয়ে একটা পথ উঠে গেছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের তলা দিয়ে! তারপর ভাল করে দেখলে ডালপালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাবে একটা বাংলো বাড়ির ছাদ। ওদিকে কোন ঝর্ণা আছে কিনা খোঁজ করতে গিয়ে আমার লোকজনেরা তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসে। ওটা ল্যাংকা-স্টার সাহেবের বাড়ি। ওর সব কিছুই হচ্ছে রহস্যপূর্ণ। লোকটা ইউরোপের কোনো জায়গা থেকে আসে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে আর এখানেই বা কেন আস্তানা গেড়ে বসে যায় সে কথা সঠিক কেউ জানে না। নিজেকে ইংরেজ বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু জনশ্রুতি হচ্ছে যে ও প্রথম মহাযুদ্ধ বাধবার উপ-ক্রম হতেই নিজের সাবেকি নাম বদল করে নেয়। এখন ওর বয়স প্রায় সত্তর হবে কিন্তু পরিশ্রম করবার ক্ষমতা আমাদের চেয়ে বেশি। লোকটি আমাদের কিম্বা সরকারী কর্মচারীদের বড় একটা পাত্তা দেয় না কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহলে ওর খাতির আছে। উদ্ভিদ, পাথর, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ আর প্রত্নতত্ত্বের যে কোন বিভাগ সম্বন্ধে ওর জ্ঞান এমন ব্যাপক আর গভীর যে কলকাতা আর পাটনা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের এক্সকার্সানে নিয়ে এলে অধ্যাপকেরা ওর সাহায্য নিয়ে থাকেন। ওর সংগ্রহের মধ্যে আছে প্রস্তর-যুগের কুড়ুল, খল, মুষল, ছুরির ফলা আরও অনেক কিছু—এ সব অবশ্য আমার শোনা কথা। অনাহূত অতিথি কিম্বা গাঁয়ের লোকেদের গেট পার হয়ে ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয় কুকুরের ভয়ে। লোকটার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কেউ সঠিক কিছু বলতে পারে না। শোনা যায় যে মাইল কুড়ি-পঁচিশ দূরে ওর নাকি আর একটা আরও নিরালা আস্তানা আছে। কখন কোন জায়গায় ওকে পাওয়া যাবে তার স্থিরতা নেই। লোকজনদের এড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করে।

এত কথা তরুণ একসঙ্গে শোনেনি। সে ওঠা-নামা করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছিল। সমরেশবাবুর নিজেরও কাজ ছিল, তা ছাড়া তিনি তরুণকে যন্ত্র ও সরঞ্জামগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। সে এই প্রথম দেখল থিওডো লাইটের ব্যবহার। স্পষ্ট করে প্রথমে খাতায় তারপর নক্সায় তোলা তার কাছে খুব মজার কাজ মনে হল। কিন্তু মন পড়েছিল গল্পের মধ্যে। সুযোগ পেয়েই বললে—'সাহেবের এমন লুকোচুরি করে থাক-বার কারণ কি?'

'অনেকে অনেক রকম কথা বলে। তার মধ্যে কোনটা সত্যি বোঝবার উপায় নেই! ওর বউ নাকি ওর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। ইংরেজি উচ্চারণ শুনে লোকে বলে পোলিশ, হাঙ্গে-রিয়ান, কিম্বা রাশিয়ান হবে। ওর বেশভূষা, ধরন-ধারণ নাকি জিপসিদের মত। একটি মেয়ে আছে তোমার চেয়ে বেশ কিছু বড়। দেখতে নাকি সুন্দরী কিন্তু ওর বাবা কারো সঙ্গে মিশতে দেন না। তামা কোম্পানির ইংরেজ অফিসারদের মধ্যে কেউ কেউ আলাপ করবার চেষ্টা করেছে কিন্তু আমল পায়নি। বেচারি মেয়েটাকে গাড়ি চালাতে হয়, পাথর ভাঙতে হয়, এমন কি শোনা যায় তাকে মাথায় ঝুড়ি চাপিয়ে মাটি বইতেও দেখা গেছে দূর থেকে।'

তরুণ প্রশ্ন করল, 'খুব কঞ্জুস বুঝি?'

ওরা বছরে একবার করে ইউরোপে বেড়িয়ে আসে নাকি। শোনা যায় ভূমধ্যসাগরের ধারে সলিল কিনে বাড়িয়ে চলেছে। এ সব অবশ্য শোনা কথা। তবে ধলভূমের আদিবাসীরা ওকে খুব খাতির করে। নিজেরা দরিদ্রের মত থাকলেও ওদের বেলায় খরচের হাত দরাজ। অনেকদিন এই অঞ্চলে থেকে সাহেব মুণ্ডারী আর সাঁওতালী দুটো ভাষাই ভাল করে শিখেছে। যেখানেই যায় আশ্রয় পায়। লোকেরা খোঁজখবর দেয়। অদ্ভুত মানুষ ইউরোপের লোকেরা, যেখানেই থাকুন না কেন, ফুলের বাগান তৈরি করে থাকে। ল্যাংকাস্টার-এর সে শখও নাই।'

'রেজগড় হয় কি থেকে?'

সমরেশবাবু তরুণকে কতকগুলি নাতিউচ্চ পাহাড়ের সারি দেখিয়ে বললেন, 'এখান থেকে ঐ পর্বতসংকুল অঞ্চল পর্যন্ত সবটাই নানা রকম মূল্যবান ধাতুপদার্থ দিয়ে ঠাসা। খুব প্রাচীন কালে এখানে তামা আর সোনার খনি ছিল। সুবর্ণরেখা নদীর জল খরস্রোতা আর পাথরের জন্যে বিপদসংকুল বলে এখান-কার মাল চালান হত গরুর গাড়িতে রূপনারায়ণ নদী পর্যন্ত, তারপর সেখান থেকে তাম্রলিপ্ত বন্দরে গিয়ে বিদেশে চালান হত। এখনও সেই পথের গ্রামগুলোর নামকরণ দেখবে কোনটা সংস্কৃত কোনটা আদিবাসী ভাষায় প্রচলিত রয়েছে। কবে কি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কারণে খনির কাজ বন্ধ হয়ে গেল তা কেউ জানে না। তারপর দু'তিন হাজার বছর ধরে জঙ্গলে ঢেকে ফেলেছিল প্রাচীনকালের সে উদ্যম। ইংরেজ আমলে আদিবাসীরা বিদ্রোহ করে বন্দুকের সঙ্গে মোকাবিলা করতে না পেরে এই জঙ্গলে পালিয়ে এসে বসবাস শুরু করে। পরে রেল পাতার সময় ইংরেজ বণিকরা সেই সকল খনির আকর আর ধাতুর গাদ অনুসরণ করে কাজ আরম্ভ করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেউলিয়া হয়ে সরে পড়ে। ল্যাঙ্কাস্টার আসে আরো অনেক পরে। তার মধ্যে আর কোনো শ্বেতাঙ্গ লোক এদিকে বসবাস করতে আসেনি। ও এসেই গ্রামে গ্রামে গিয়ে জনশ্রুতি থেকে অনেক কিছু তথ্য সংগ্রহ করল। তন্ন তন্ন করে এই অঞ্চলের মাটি আর পাথর পরীক্ষা করে শেষ পর্যন্ত ইজারা নিল মাত্র পাথরের। অবশ্য সাধারণ রাস্তা তৈরির পাথর না—কঠোর এ্যালুমিনা-সিলিকেট পাথর—যাকে কায়নাইট বলে। বেশি উত্তাপের চুল্লীর দেয়াল হয় তাই দিয়ে। কিন্তু ওর রোজগার তেমন হয় না যেহেতু লোহার খাদ আছে ওই পাথরে। সরকারী মহলের গুজব হচ্ছে যে ও পাথরের খাঁজ থেকে সোনা বার করে বিক্রি করে—তা ছাড়া হাণ্টলির টাকা—'

তরুণ নিবিষ্ট হয়ে শুনতে শুনতে হাঁটছিল, প্রশ্ন করল 'সে আবার কে?'

'একজন ইংরেজ। রেল কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আসে শুনেছি। কোনো একটা শাখা লাইন পাতবার সময় পাহাড় কাটাতে কাটাতে মূল্যবান কোন ধাতুর সন্ধান পায়। কাউকে কিছু না বলে নমুনা সংগ্রহ করে রেখে দেয় আর ধাতুপূর্ণ অনাবৃত পাথরগুলোকে ঢেকে রাখে মাটি দিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল বিলেতে গিয়ে মূল্য যাচাই করে তেমন লাভের সম্ভাবনা থাকলে কাজ ছেড়ে দিয়ে খনির ইজারা নেবে। জাহাজে আলাপ হয় ল্যাঙ্কাস্টার পরিবারের সঙ্গে। তাদের মধ্যে কি ব্যবস্থা হয় অবশ্য কেউ জানে না, কিন্তু ছ'মাস পরে ল্যাঙ্কাস্টার উড়িষ্যার এক অঞ্চলে সীসাখনির ইজারা চেয়ে দরখাস্ত দেয় সরকারকে। দেখা যায় সেই একই সময়ে হাণ্টলির চাকরি যায় রেলের এক ঠিকাদারের কাছে মোটা টাকার ঘুষ নেওয়ার অপরাধে। ইংরেজ রাজত্বে সাদাচামড়ার সাহেব-অফিসারদের খোলাখুলি ভাবে অপদস্থ করা হত না। হাণ্টলি দেশে ফিরে যাবে কথা দিয়েও কিন্তু গেল না। টাকাকড়ি সব কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে ল্যাঙ্কাস্টার-এর প্রতিবেশী হয়ে এদেশেই থেকে গেল।

ল্যাঙ্কাস্টার সরকার মহলে মোটেই প্রিয় ছিল না, অনেক কারণে। দরখাস্তে সামান্য ভুলের অছিলায় সীসার আকরের ইজারা দেওয়া হয়নি তাকে। তাছাড়া সীসার সঙ্গে কিছু কিছু সোনা রূপাও মিশ্রিত আছে বলে সাবধান হতে হল। যাই হোক, পালিত সাহেব যখন আমাদের নিয়ে এলেন নেপাল থেকে বাংলাদেশে, তারপর সেখান থেকে এখানে—তার আগেই একদিন এক ঝড়জলের রাত্রে বাজ পড়ে মারা পড়ে হাণ্টলি। ঐ যে দূরে দেখা যায় সিগন্যালের লাল আলো, ওর ডান দিকে সাদা ভুতুড়ে মত বাড়িটার গায়ে যে বিরাট তেঁতুল গাছ দেখছ ওর নিচেই হচ্ছে হাণ্টলির কবর। ওর একটা পুরনো মোটর গাড়ি ছিল। সেটা আর একটা গাছের তলায় পড়ে ছিল।

একদিন ল্যাঙ্কাস্টার সাহেবের বউ দেখতে পেল হাণ্টলির আত্মা কবর থেকে উঠে গাড়িতে উঠে বসেছে। সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকে ভয়ে। ল্যাঙ্কাস্টারকে ডাক্তার ডেকে আনতে হয় মোসাবনী থেকে। মোট কথা সেই থেকে রটে গেল হাণ্টলির ভূতের কথা। গাড়িটাকে সরিয়ে ফেলা হল, কিন্তু ভূতের ভয় গেল না সেই অঞ্চল থেকে। রেল-বসতির লোকেরা আর ওদিকের গ্রামবাসীরা বলে চাঁদনি রাতে অনেক সময় হাণ্টলির প্রেতাত্মাকে কবর থেকে উঠে রাখা-মাইন্স-এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মিলিয়ে যেতে দেখা যায়। সেই ভয়ে সূর্যাস্তের পর ওদিকে কেউ যায় না বড় একটা।'

সার্ভেয়ার এবার গল্প শেষ করে বললেন, 'ঐদিকটায় চল, দেখতে পাবে সূর্যাস্তের কত পরে পর্যন্ত মেঘে মেঘে রঙের অদল-বদল হতে থাকে। আজকের মত আমাদের কাজ শেষ।'

তরুণ সত্যিই অপূর্ব রঙের সমাবেশ দেখে মুগ্ধ হয়ে বসে পড়ল একটা বড় পাথরের ওপর। তার চমক ভাঙল সার্ভেয়ার-এর ডাকে পাহাড়ের আর এক দিক থেকে, 'দেখে যাও প্রকাণ্ড বড় চাঁদ উঠেছে—' তরুণ দেখল নদী, উপত্যকা, তামাখনির প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, শাল-বন, ঝোপঝাড় নালা সব কিছুর ওপরে ধীরে ধীরে স্বচ্ছ একটা আঁচল পড়ে গেল।

ওরা স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশব্দে নেমে গেল। তরুণের মনে হল প্রকৃতির ধ্যান ভেঙে যাওয়ার ভয়ে সমরেশবাবু যেন অতি সন্তর্পণে পা ফেলে চললেন। তরুণ কলকাতার ছেলে, আকাশ দেখবার সময় বা সুযোগ পায় না বড় একটা। গ্রামের বাড়িতে গেলে সারাক্ষণ হই হই করে কাটে সমবয়স্ক অস্থিরমতি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। পরিণত বয়স্ক কবি-ভাবাপন্ন মানুষের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেল এই প্রথম। সে তাঁর নীরব ইঙ্গিত ঠাহর করে দেখল যে দিন আর রাত্রির সন্ধিক্ষণে পৃথিবী পুলকে রোমাঞ্চিত হয়। বড় রাস্তায় নামতে নামতে চাঁদের আলোতে প্রকৃতি যেন এক নতুন সাজে দেখা দিল। তরুণের মনে কেমন যেন একটা বেপরোয়া আনন্দের ছোঁয়া লাগল। দলের আর সকলের সঙ্গে মিলিত হবার আগে সে প্রশ্ন করল, 'আজ ত পূর্ণিমা, হাণ্টলি সাহেবের প্রেতাত্মার ঘুরে বেড়াবার কথা নয়?'

উত্তর শুনে সে একটু আশ্চর্য হল। ভেবেছিল সমরেশবাবু তার কৌতূহল দেখে ঠাট্টা করবেন। কিন্তু উনি গম্ভীর কণ্ঠেই বললেন, 'আমাদের ঐ বৃদ্ধ জল-বাহকটি হচ্ছে খেণ্ডাভি গ্রামের মোড়ল। ও মিছে কথা বলা শেখেনি। ও নিজের চোখে দেখেছে হাণ্টলি সাহেবের আত্মা কবর থেকে উঠে রাখা-মাইন্স-এর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মিলিয়ে গেল।'

তরুণের প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে, কাপড়জামা বদল করে গরম গরম লুচি আর চা খেয়ে নিল। অন্য তাঁবু থেকে বাবুরা এলেন তাস খেলতে সমরেশবাবুর তাঁবুতে। তরুণ তাস খেলে না তাই সরে পড়ল।

পুলক সেই সময় তার মামার সঙ্গে আর একটা পাহাড় থেকে নামছিল। সে ভূগোলের পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল শুনে খুসি হয়ে সমরেশবাবু তাকে বোঝাচ্ছিলেন। কোটি কোটি বছর আগে-কার কোনো প্রলয়কারী ভূকম্পের কথা, যখন ভূত্বক ফেটে তীব্র উত্তাপের সৃষ্টি হয়, যার ফলে এই কঠোর কায়নাইট পাথরের উৎপত্তি হয়। তারপর নদীর প্রবাহ দিক পরিবর্তন করে সেই ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়ে কেমন করে পাথর কেটে অনুর্বর অঞ্চলে পলিমাটি ফেলে প্রকৃতির রূপ বদল করতে থাকে। কেমন করে জল-বাতাসের প্রকোপে ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাথরে পাথরে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

পুলক মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনে। ততক্ষণে অস্তগত সূর্যের

www.BanglaBook.org

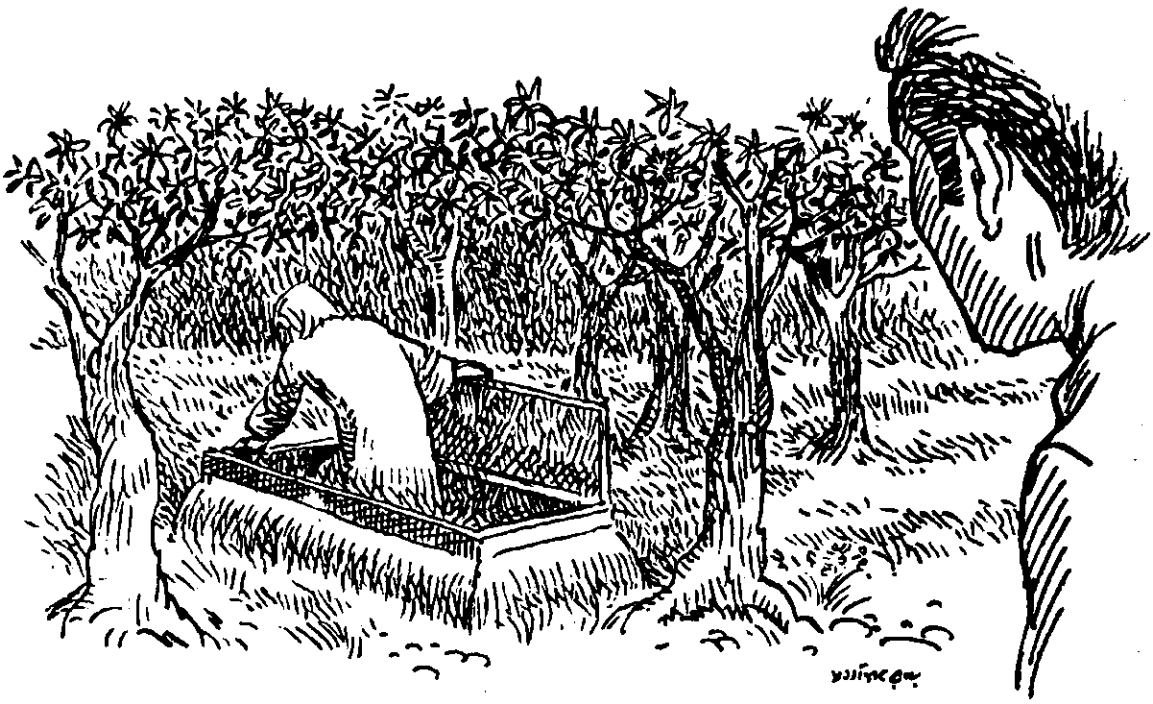

শেষ রশ্মিটুকু মলিন হয়ে মিলিয়ে গেছে। চাঁদের আলোতে চলার পথ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হঠাৎ একটা খোলা জায়গাতে দাঁড়িয়ে গিয়ে পালিত সাহেব বড় পাথরের ওপর একখানা নক্সা ছড়িয়ে বললেন, 'আমরা রয়েছি এইখানে, আমাদের ক্যাম্প হচ্ছে ঐখানে। লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ করে দিয়েছি। সোজা-সুজি নামতে গেলে গভীর খাদ পাবে। গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে থাকলেও তুমি পার হতে পারবে না। তোমাকে যেতে হবে এই পাহাড়টার গা বেয়ে। ঘুরে যাবে। বলছিলে স্কাউট থাকতে কম্পাস ব্যবহার করতে শিখেছিলে, বেশ আমার এই যন্ত্রটা নাও—হারিও না। দেখি কত তাড়াতাড়ি ফিরতে পার। এদিকে অবশ্য বাঘ ভাল্লুক বা হাতি নেই। সাপখোপ সরে যাবে। কোনো কারণে ভয় পেলে রথীয়াকে ডাক দিও—ও আড়ালে থাকবে। আমাকে ওদিক থেকে শর্টকাট করে রাস্তায় নামতে হবে। জীপ গাড়িটা অপেক্ষা করছে, একবার মোসাবনী যেতে হবে। রাত্রে ফিরে এসে তোমার এ্যাডভেঞ্চারের কথা শোনা যাবে।'

পুলক তার প্রতি মামার এই আস্থায় খুব খুসি হল। রোজনামচায় লিখতে হবে সব কথা, সে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল। একটু পরে জীপগাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ শোনার পর, সে স্তব্ধ হয়ে বসে চারদিকের দৃশ্যটা ভাল করে দেখে নিল। যে গাছের নাম জানে না তার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে পকেটে পুরল, তারপর পায়ে-চলা একটা পথ অনুসরণ করে মনের আনন্দে গুন গুন করে গান করতে করতে চলল, নক্সাটা ভাঁজ করে হাতুড়ির সঙ্গে নিয়েছে, আর এক হাতে কম্পাস।

মাথায় তার দুষ্ট বুদ্ধি চাপল। একটু পা চালিয়ে এগিয়ে যাবার পর সে একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। দেখল রথীয়া কেবল একাই নাই, তার সঙ্গে আছে আর একজন দেহরক্ষী। তারা টাঙ্গি আর তীর-ধনুকে সুসজ্জিত। সাঁওতালী ভাষা সে জানে না কিন্তু বেশ বুঝতে পারল যে তার নেমে যাওয়ার দিক সম্বন্ধে তর্ক লেগে গেছে। অবশেষে ওরা দক্ষিণের ঢালু পথ দিয়ে নামতে শুরু করল। পুলক ভাবল ওদের পশ্চাদ্ধাবন করবে। কয়েক পা নেমেই বুঝতে পারল পাহাড়ে ওঠার চেয়ে নামা অনেক বেশি কঠিন।

একবার পিছল পাথরে পা হড়কে হাড়গোড় ভাঙবার উপক্রম হল। হাতুড়ি ছিটকে কোথায় পড়ল, সে খুঁজে পেল না। কম্পাসটা অবশ্য হাতছাড়া করেনি, কিন্তু পা মুচকে যাওয়াতে অসহায়ের মত বসে থাকতে হল কিছুক্ষণ। সামলে নিয়ে সোজা পথ দিয়ে একরকম মরিয়া হয়ে এগিয়ে চলল। দেখল সেটা পথ নয়, একটা শুকনো নালা। দুদিকের দেওয়াল ক্রমশঃ খাড়া হয়ে উঠে চাঁদের আলো আড়াল করছিল। সেখান থেকে লোক ডাকবার চেষ্টা করে লাভ নেই, কারণ রথীয়া আর তার সঙ্গী ভিন্ন দিকে গেছে, তাছাড়া এত সহজে হাল ছেড়ে দিলে মামাই বা কি ভাববেন!

ধীরে ধীরে নরম বালি বা নুড়ির ওপর পা ফেলে ফেলে পুলক হঠাৎ এসে পড়ল একটা খোলা জায়গায়। সেখান থেকে কিছু দূরে দেখল কয়েকটি কাঞ্চন গাছে অদ্ভুত ফুলের শোভা আর মাঝখানে একটা ভাঙা অতি প্রাচীন কবর। অন্ধকার থেকে আলোতে উঠে আসবার আগেই তার মনে হল কবরটা যেন নড়ছে। তারপর সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দেখল ক্রস সমেত কবরের ঢাকাটা মাথার ওপর তুলে একটা প্রেতমূর্তি খাড়া হয়ে উঠল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়াতে পুলকের কণ্ঠ হতে কোনো আওয়াজ বার হল না। সে দেখল সাদা আলখাল্লা পরা লম্বা দাড়িগোঁফে মুখ ঢাকা একটা দেহ বেরিয়ে এসে কবরের ডালাটা নামিয়ে রেখে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

www.BanglaBook.org

পুলকের আতঙ্ক কৌতূহলে পরিণত হল যখন সে তাজা পাউডারের গন্ধ পেল বাতাসে। সে বুঝল ভূত কখনই নয়, নিশ্চয় মানুষ। তাছাড়া অদৃশ্য হওয়ার আগে মূর্তিটা সচকিতে দেখে নিয়েছিল চারদিকটা। পুলক পায়ের গাঁটের ব্যথার কথা ভুলে গিয়ে গাছের আড়ালে আড়ালে অতি সন্তর্পণে ঘুরে গিয়ে দেখল ওদিকে একটা সুড়ঙ্গ পাহাড়ের মধ্যে ঢুকেছে। সে অনুসরণ করতে সাহস করল না।

আস্তে আস্তে অনেক কষ্টে পাহাড়ের গা বেয়ে সে নামতে লাগল। অনেকখানি নেমে দূর থেকে ট্রাকের হেডলাইট দেখতে পেয়ে ভরসা হল কাছাকাছি রাস্তা আছে। তখন আর হাড়-গোড়ের মায়া না করে এক রকম গড়িয়ে নেমে পড়ল। গাড়ি থামিয়ে দুজন লোক তার কাছে ছুটে এসে নিরাশ কণ্ঠে বললে, 'এ ত সে ছেলে নয় দত্ত সাহেব।' সমরেশবাবু নেমে আসতে পুলক হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের পরিচয় দিল। তাকে তুলে নিয়ে সার্ভেয়ার বললেন, 'আমরা অবশ্য আর একটি ছেলের সন্ধান করছিলাম তবে তোমাকে পেয়ে ভালই হল। পালিত সাহেব এখনও ফেরেননি মোসাবনী থেকে, ফিরে এসে তোমাকে না দেখতে পেলে নিশ্চয় দুর্ভাবনা হত।'

ক্যাম্পে পেঁছে দেখা গেল হই-হই ব্যাপার। পালিত সাহেব আর তাঁর এক বন্ধু সঞ্জীববাবু ভিন্ন পথে একটি শেভরোলে গাড়ি করে ফিরে এসে পর্যন্ত পুলকের তল্লাশে এধার ওধার লোক পাঠিয়েছেন। রথীয়া আর তার সঙ্গী নাকি পথেই গাড়ি থামিয়ে খবর দেয় যে পুলক সেই জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তারা ভেবেছে নিশ্চয় ভৌতিক কান্ড। সার্ভেয়ারদের ক্যাম্পে লোক পাঠিয়ে শুনলেন তারা কেউ ফেরেনি। চৌকিদার বলল দত্ত সাহেব এসে ট্রাক নিয়ে বেরিয়েছেন।

সমরেশবাবুও পেঁছে খবর দিলেন যে তাদের ক্যাম্পের ছেলেটিও নিখোঁজ হয়েছে। তিনি আবার খুঁজতে বার হলেন, শেভ গাড়ি ফিরতে সেটাকেও পাঠান হল। জীপ গাড়ি আটকে গিয়েছিল অন্য কোন কাজে।

সঞ্জীববাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বন্ধুর ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু তরুণের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে রইলেন। একবার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আজকালকার ছেলেগুলো এমন ডানপিটে হয় যে ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা দায়। এবার ও ভালয় ভালয় ফিরলে হয়!'

পুলকের ছালচামড়া ছিঁড়ে গেছল অনেক জায়গায়। ওর মা গরম জলে ধুইয়ে টিনচার আইডিন দিয়ে বেঁধে দিলেন। বাবা কিছু বললেন না কারণ পালিত সাহেব নিজের দায়িত্বে ওকে নিয়ে গেছলেন। ও যখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে মামার তাঁবুতে ফিরে গেল তার অল্পক্ষণ পরেই ট্রাক আর মোটর গাড়ি ফিরে এল। পুলক বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে দেখল হাতে আর মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় তরুণ নামল গাড়ি থেকে।

তারা কথা বলবার সুযোগ পেল না। সঞ্জীববাবু বললেন, 'আচ্ছা ছেলে তো তুমি, তরুণ ; কাজ থেকে ফিরে এসে কাউকে কিছু না বলে কোথায় উধাও হলে? এঁদের কতখানি হয়রান হল—'

পালিত সাহেব হেসে বললেন, 'আগে একটু গরম গরম কফি খেয়ে নাও ; তারপর কথা হবে। সঞ্জীববাবু, এরা দেখছি সমবয়স্ক, তরুণকে আলাপ করিয়ে দিন পুলকের সঙ্গে।'

পুলক আর তরুণ সমস্বরেই বলে উঠলো, 'আমরা কে জি ক্লাস থেকে একসঙ্গে পড়েছি।'—তরুণ আরও বললে, 'পুলক আমাকে আসতে বলেছিল—'

পালিত সাহেব খুসি হয়ে বললেন, 'সে কথা বলতে হয়। তাহলে ত তোমাদের এক তাঁবুতে থাকবার ব্যবস্থা করা হত—এখন চটপট করে কফি খেয়ে নিয়ে তোমাদের অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প বল। তরুণ তুমিই আগে বল।'

তরুণ বললে, 'সমরেশবাবু আমাকে ল্যাংকাস্টার সাহেবের গল্প বলতে বলতে হাণ্টলি সাহেবের ভূতের গল্প বলেন। শুনলাম চাঁদনি রাতে ভূত দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ওঁরা তাস খেলছিলেন, আমার তখন কিছু করবার ছিল না তাই বেরিয়ে পড়লাম। ল্যাংকাস্টার সাহেবের বাংলোর নিচের রাস্তা দিয়ে গেলাম না, কতকটা কুকুরের ভয় আর কতকটা বাধা পাবার সম্ভাবনায়। ভাবলাম ট্রাকটা চলে আসতে পারে আমার খোঁজে। তখন ভূত দেখার আবদার নিশ্চয় মঞ্জুর হবে না। তাই চুপটি মেরে উঠে গেলাম পাহাড় বেয়ে বাংলোর পিছন দিকে। ওদিকটার বড় বড় গাছগুলোর তলা ঘোর অন্ধকার হলেও ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে ওঠা যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা আলো দেখলাম ঘরের মধ্যে। দেখি লম্বা রোগা মত একটা সাহেব আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথায় আর মুখে সাদা চুল আর দাড়ি গোঁফ পরছে। পরনে একটা সাদা রঙের আলখাল্লা। একটু পরে সে বেড়া ডিঙিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। তারপর একটা ছোট টর্চ বার করে দূরে সংকেত করতে লাগল। কিসের সংকেত তা বুঝলাম না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম সেদিকে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের নিচে ওরই মত আর একটা সাদা আলখাল্লা পরা মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রথম মূর্তি এবার পকেটের মধ্যে টর্চটা পুরে আমার পেছন দিয়ে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল। দ্বিতীয় মূর্তি টলতে টলতে রাখা-মাইন্স-এর ধ্বংসাবশেষের দিকে এগিয়ে গিয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল। আমিও নেমে গেলাম সেই দিকে। কাছে গিয়ে স্ল্যাগের স্তূপের পাশে একটা গর্ত থেকে চাপা কাশির শব্দ! সেখানটা অন্ধকার। হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ির মত পেলাম। নামতে নামতে দেখলাম ক্ষীণ আলো পড়েছে সুড়ঙ্গের মধ্যে—'

পালিত সাহেব বললেন, 'সাবাস ছেলে, বলে যাও—'

তরুণ বললে, 'আলোটা পড়ছিল সামনের দিকে হাণ্টলি সাহেবের ভূতের মাথার টুপি থেকে—আমি অবশ্য প্রথম থেকেই বুঝেছিলাম যে রহস্যটা মোটেই ভৌতিক নয়। কৌতূহল দমন করতে না পেরে অনুসরণ করলাম তাঁর। তাছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। অন্ধকারে ফেরা অসম্ভব। হঠাৎ খোলা হাওয়াতে এসে পড়লাম। দেখি খালি বস্তা আর একটা ডান্ডা কাঁধে নিয়ে একটি ইয়োরোপীয় মেয়ে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে সেই আলখাল্লা পরা মূর্তির পিছন পিছন চলল।

এবার চাঁদের আলোতে সব কিছু দেখা যাচ্ছিল। ওরা পাহাড়ের গা বেয়ে দ্রুতগতিতে উঠে যেতেই, হুড়মুড় করে অনেকগুলো পাথরের চাঙ্গড় গড়িয়ে আমার ঘাড়ে মাথায় পড়ল। ওরা ইচ্ছে করে ফেলল, কি আপনা থেকে ধ্বসে পড়ল জানি না। মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম ফেটে রক্ত বার হচ্ছে, আর একটা হাত জখম হয়েছে। পাথরগুলো খোঁচা খোঁচা যেন সদ্য ভাঙা বলে মনে হয়। ভয় হল আর একবার পড়লে হয়ত জ্যান্ত সমাধি হয়ে যাবে। আমি ছুটে গাছের আড়ালে গিয়ে আর একটা রাস্তা দেখলাম, মেয়েটা নিশ্চয় সেই পথেই এসেছিল।

www.BanglaBook.org

এবার নামতে অসুবিধে হল না। রুমালটা রক্তে ভিজে গেল কিন্তু দুর্বল লাগছিল না। ছুটলাম খানিকটা, তারপর দেখি ট্রাকে—'

পালিত সাহেব এতক্ষণ একান্ত নিবিষ্ট হয়ে কথা শুনছিলেন। কোনো মন্তব্য প্রকাশ করেননি। এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সাবাস ছেলে। এবার পুলক তুমি বল কেমন করে দেহরক্ষীদের চোখে ধুলো দিলে—'

পুলক বলে গেল। তার কথা শেষ হতে পালিত সাহেব বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছিলে সঞ্জীব। আজকালকার ছেলেরা কেবল ডানপিটে নয়, ওদের ভয়-ডর বলে কিছু নেই। আচ্ছা এবার আমার গল্প বলার পালা। তবে তোমাদের কথা দিতে হবে যে আজ যা শুনবে তা সরকারীভাবে প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কোনো লোককে বলবে না। তরুণ, তোমার মা-বাবাকেও নয়।'

সঞ্জীববাবু বললেন, 'আজ দেখছি ফেরা হবে না। একটু বিস্তারিত করেই বল—বিনয়, ব্যাপারটা না জেনে আমি উঠছি না এখান থেকে।'

পালিত সাহেব বললেন, 'তুমি ল্যাংকাস্টার সাহেবের ভক্তবৃন্দের মধ্যে পড়, কাজেই তোমার শোনার দরকার আছে। সকলে জানে আমি এখানে এসেছি হ্যামিল্টন রিফ্র্যাক্টরী কোম্পানির তরফ থেকে কায়নাইট পাথরের সন্ধানে। সেটা একটা অছিলা, আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঢের বেশি গুরুতর। প্রায় ছ'মাস আগে বোম্বাই বন্দরের গুদামে একটা বিশ টন ওজনের বস্তাবন্দী মাল পাওয়া যায় উলফ্রামের—'

পুলক বললে, 'বইতে পড়েছি উলফ্রাম আর টাঙ্গস্টন হচ্ছে এক জিনিস—'

তরুণ বললে, 'ইস্পাতকে কঠিন করবার কাজে লাগে—না?'

পালিত সাহেব বললেন, 'ঠিকই বলেছ, কঠোর পাথরের মধ্যে গভীর গর্ত করতে হলে, আমরা হীরা কিম্বা টাঙ্গস্টন ব্যবহার করে থাকি। তাছাড়া এর বিশেষ জরুরী দরকার সামরিক সরঞ্জামে—মহামূল্যবান ধাতু—আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য। তার ওপর বস্তাগুলোর মধ্যে পাওয়া গেল জোরালো তেজস্ক্রিয় পাথর। দিল্লীতে খবর যেতে হই হই পড়ে গেল। গোপনে তদন্ত করতে হবে বলে জিওলজিক্যাল সার্ভে কিম্বা বুরো মাইন্সের অফিসারদের কাজে না লাগিয়ে আমার ডাক পড়ল।'

বোম্বাই বন্দরের এক নতুন অধ্যক্ষ এসে লক্ষ করে যে পার্সেলটার জন্যে হাণ্টলি বলে একজন লোক নির্বিবাদে গুদাম ভাড়া পাঠিয়ে দিচ্ছে মাসের পর মাস, অথচ রপ্তানি করবার নাম নেই। তখন খানিকটা নমুনা তুলে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যে পাঠানো হয়। যাই হোক, ব্যাপার গুরুতর বলে প্রথমে হাণ্টলির খোঁজ হয় কিন্তু কোনো পাত্তাই পাওয়া যায়নি তার।

রেকর্ড দেখে জানতে পারা যায় যে পার্সেলগুলি পাঠাচ্ছিল টাটানগর থেকে। কাছাকাছির মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশের বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার এমন এক জায়গায় কিছু কিছু উলফ্রাম পাওয়া যায় যেখানে মানুষের বসতি খুব কম। সেখানে তখন রাস্তাঘাটও নাই। ক্ষুদিরাম যেখানে বোমা তৈরি করে লুকিয়ে রাখত। ঐ অঞ্চলে গিয়ে ঘোরাঘুরি করলাম ক'দিন, কিন্তু কোনো সাহেবের গতিবিধি আছে বলে শুনলাম না। তাছাড়া কোন সাড়াশব্দ না করে আশি টন মাল অন্য পাথরের মধ্যে থেকে ভেঙে ভেঙে বার করে নেওয়া সহজ নয়।

বুঝতে পারলাম যে কোন অজানা আকর থেকে মাল তোলা হচ্ছে, টাটানগরের কাছাকাছি কোথাও, আর সে জায়গাটা নিশ্চয় খুব জনবিরল। সঞ্জীব, তুমি আমার খুব উপকার করেছিলে ঘাটশিলার কাছে ঐ ম্যাঙ্গানিজ আকরের খবর দিয়ে। সেখানে সামান্য কিছু ম্যাঙ্গানিজ আছে সে কথা জিওলজিস্ট মাত্রই জানে, কিন্তু সে এত নিকৃষ্ট গ্রেডের যে কেউ খনির ইজারা নিতে পারে বলে ভাবিনি।

খবর নিয়ে জানলাম যে ল্যাংকাস্টার-এর মত সমজদার সাবধানী লোক একটা আকরের ইজারা নিয়ে কিছু কিছু কাজও করেছে। তখন আর কালবিলম্ব না করে নাম ভাঁড়িয়ে তোমার কোনো সাহিত্যিক বন্ধু সেজে বেড়াতে গেলাম। কাছাকাছি একটা ঝর্ণার ধারে পিকনিক করতে গিয়ে, যেন কতই পথ হারিয়ে, দেখে এলাম ল্যাংকাস্টার-এর খনি থেকে বেশ কিছু মাল চালান হয়েছে আর কুড়ি টন মত তখনও পড়ে আছে। তুমি একজন ট্রাকের মালিকের কাছে খবর নিয়ে আমাকে জানাও যে এখানকার মাল শোধনের জন্যে পাঠানো হচ্ছে রাখা-মাইন্স্-এ।

এর চেয়ে চমকপ্রদ সংবাদ হতে পারে না। তখন তোমাকে কিছু বলিনি, কিন্তু যে-কোনো বৈজ্ঞানিক বলতে পারত যে ও মাল আপগ্রেড করা অসম্ভব—সম্ভব হলে খনির কাছেই করা হত। আশি মাইল পেট্রোল পুড়িয়ে পাঠানো হত না। যাই হোক হাণ্টলিকে দেখলাম রেলের সকলেই চেনে। অনেক টাকা নাকি ঘুষ খেয়ে সরে পড়ে সে।

কেমন করে জানি না ল্যাংকাস্টার কিম্বা হাণ্টলি জানতে পারে যে ট্রাকে করে ম্যাঙ্গানিজ চালান দেওয়া সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলে তুমি। ওদের এখানে তৎপরতা বেড়ে যায় কাজের। আশি টন ম্যাঙ্গানিজ স্তূপটাকে অনেক লোক লাগিয়ে পুরনো তামাখনির মধ্যে ফেলে স্ল্যাগ চাপা দিয়ে আড়াল করে ফেলা হয়। আর তারপর একদিন প্রবল ঝড়জলের মধ্যে বাজ পড়ে হাণ্টলির অপঘাত মৃত্যু হয়। সময় তখন সবে সন্ধ্যা, দূর থেকে স্টেশনের লোকেরা দেখেছিল তীব্র উজ্জ্বল আগুন আর শুনেছিল আকাশ-ফাটা আওয়াজ। সেই দুর্যোগের মধ্যে ল্যাংকাস্টার রেলস্টেশনে গিয়ে টেলিফোনে চক্রধরপুরের কণ্ট্রোলকে হাণ্টলির মৃত্যুসংবাদ দিয়ে, পাদ্রী রোবসনকে পাঠাতে বলে। তারপর সেই রাত্রিতেই সে মোসাবনী খনির মিস্ত্রীকে দিয়ে কফিন বানিয়ে নিয়ে যায়।

তারা কোম্পানির ফোরেজ অধ্যক্ষ স্বজাতীয় ইঞ্জিনীয়ার মারা গেছে বলে সব সুবিধা করে দেয়। কবর দেওয়া হয় বাংলো-কম্পাউণ্ডে তেঁতুল গাছের নিচে।

এই সকল খবর সংগ্রহ করে আমাদের এ্যাডভান্স পার্টি। ওদের লোক দেখানো কাজ ছিল গ্রামের লোকেদের কাছ থেকে হরীতকী আমলকী আর কেন্দু পাতা সংগ্রহ করা।

ওরা থাকতে থাকতেই ভূতের আবির্ভাব হয় দু'জায়গাতে। মাঝে মাঝে চাঁদনী রাতে দূর থেকে দেখা যায় হাণ্টলির প্রেতাত্মা কবর থেকে উঠে তার পুরনো ব্যাটারীশূন্য ফোর্ড্ গাড়িটায় উঠে বসছে। প্রথম দিন সেই দৃশ্য দেখে ল্যাংকাস্টার-গৃহিণীর এমন আতঙ্ক হয় যে মোসাবনী থেকে ডাক্তার আসে। পরদিন সে গাড়ি টেনে নিয়ে তামা কোম্পানীর ঠিকাদারের কারখানায় ফেলে আসতে হয়। তারপর কেউ কেউ দেখেছে প্রেতাত্মা উঠে টলতে টলতে রাখা-মাইন্স্-এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। আর একটা ভূত আরও অনেক প্রাচীন কিংবদন্তীতে

www.BanglaBook.org

আছে। তার বিচরণ ক্ষেত্র হচ্ছে মাইল পাঁচেক দূরে একটা পাহাড়ের ওপর।

জনশ্রুতি হচ্ছে যে কেপ কপার কোম্পানীর কাজ নিয়ে একজন আইরিশ ম্যানেজার আসে সপরিবারে। সঙ্গে আসে তার বুড়ো বাবা। জংলী গাছগাছড়া ফল-ফুল দেখে বেড়ানো ছিল সেই বৃদ্ধের বাতিক। ঐ পাহাড়ের এক জায়গায় কয়েকটা কাঞ্চন গাছ দেখে সে মুগ্ধ হয়ে যায়। ও রকম ফুলের সৌন্দর্য নাকি কোথাও দেখেনি সে। ছেলের কাছে আবদার করে, মৃত্যু হলে যেন ওরই মধ্যে তাকে কবর দেওয়া হয়। তারপর ম্যানেজার সাহেব কোলারের সোনার খনিতে আরো অনেক বেশী আয়ের সম্ভাবনা দেখে যাওয়ার ব্যবস্থা করছিল, এমন সময় লোকজন ছুটে এসে খবর দেয় বুড়ো নিজের বুকে গুলি করে আত্মহত্যা করেছে। তাকে মাটি দেওয়া হয় সেই কাঞ্চনতলায়।

আজও পর্যন্ত বংশধরেরা নাকি ল্যাংকাস্টারকে টাকা পাঠায় কবরটার সংস্কারের জন্যে। ওখানে কোনো লোকালয় নেই। সেই বুড়োর প্রেতাত্মাকে দেখেছে খুব কম লোকে কিন্তু এখনও বন্দুকের গুম গুম শব্দ শোনা যায়।

পাঁচক এসে ডাক দিল আহার প্রস্তুত। ততক্ষণে গল্প এমন জমে উঠেছে যে বালক দুজন, সমরেশ বা সঞ্জীববাবু কেউই নড়তে চাইলেন না। পালিত সাহেব হেসে বললেন, 'গল্পের শেষটা ত পুলক আর তরুণ বলেই দিয়েছে। চল খেয়ে উঠে আরও একটু পরিষ্কার করে দেওয়া যাবে। খেতে খেতে জমবে না।'

তাড়াতাড়ি আহার সেরে ওরা তাঁবুর বাইরে চাঁদের আলোতে গুছিয়ে বসলে পালিত সাহেব বলে গেলেন।—

'আমাদের এই লটবহর নিয়ে ঘটা করে তাঁবু গেড়ে বসাটা ল্যাংকাস্টার সাহেবের মনঃপূত হয়নি। তবে তিনি আমার আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করেননি বলেই মনে হয়। বুদ্ধিমান লোক। প্রথম থেকে সাহায্য করবার জন্যে ব্যগ্রতা দেখালেন। আমি অকুণ্ঠভাবেই আমার কাজের পদ্ধতি জানালাম। বললাম খোঁড়াখুঁড়ি করবার টাকা বরাদ্দ হয়নি বলে কেবল ওপর ওপর দেখে নক্সা তৈরি করব। উনি কায়নাইট সম্বন্ধে সারগর্ভ কথা বলে এক ফাঁকে হাণ্টলির অপঘাত মৃত্যু আর প্রেতাত্মার দৌরাত্ম্যের কথা জানিয়ে দিলেন।

'আমি প্রকারান্তরে ধারণা করিয়ে দিলাম যে অলৌকিক ব্যাপারকে রীতিমত সমীহ করে থাকি এবং লোকজনদের সতর্ক করে দেব। সেদিন তিনি সেই আইরিশ ভূতের প্রসঙ্গ তোলেন নি। পরদিন ভোরে উঠে আমি গাড়িখানা নদীর ওপারে রেখে হেঁটে ব্রীজ পার হয়ে হাণ্টলির পরিত্যক্ত বাড়ির বাজপড়া অংশটা দেখে এলাম। দেখেই বুঝলাম বারুদ দেগে বজ্রপাতের অনুকরণ করা হয়েছিল।

'বোম্বাই বন্দর থেকে উলফ্রাম রপ্তানির ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়ার ফলে, হাণ্টলির তিরোধান অনিবার্য হয়ে পড়লে ও অনায়াসে যেখানে হোক পালিয়ে যেতে পারত। তবে এই আকস্মিক দুর্ঘটনা সৃষ্টি করবার কারণ কি হতে পারে? ভাবতে ভাবতে আমার ধারণা হল যে হাণ্টলি নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে। উলফ্রাম আর ঐ তেজস্ক্রিয় পাথর যারা খুঁজে বার করেছে, তারা যক্ষের মত আগলে থাকবে তবু পালাবে না—'

সঞ্জীববাবু বললেন, 'ল্যাংকাস্টার তাকে খুন করেনি কেমন করে জানলে?'

'ওদের লোকবলের এমন অভাব যে মেয়েটাকে পর্যন্ত দিনরাত খাটাচ্ছে। ওর ঘাড়ে যে বাক্সটা তরুণ দেখেছিল সেটা হচ্ছে গাইগার কাউণ্টার—ওর ওজন আছে। হাণ্টলিকে মেরে ওর লাভ কি? টাকাকড়ির ব্যবস্থা সবই ত হাণ্টলির করা—'

তরুণ বললে, 'তাছাড়া আমি ত দেখলাম ও লোকটা আমাদের মতই জলজ্যান্ত মানুষ—'

পুলক বললে, 'যে বুড়ো লোকটাকে ঐ পাহাড়ের কবর থেকে উঠতে দেখলাম সেও ত মনে হল মানুষ—'

পালিত সাহেব বললেন, 'ঐ ত ল্যাংকাস্টার—এখন বোঝা যাচ্ছে যে উলফ্রামের আকরটা নিশ্চয় ঐদিকে—সেই জন্যেই মাঝে মাঝে বারুদ দাগার শব্দ শোনা যায়। পাছে কারও কৌতূহল হয় সেই জন্যে পুরনো একটা ভূতের গল্পকে নতুন করে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ল্যাংকাস্টার সাহেব আমাকে সে গল্প শুনিয়েছিল যেদিন আমি টাটা কোম্পানির সিলিকার আকর দেখে ফিরছি। পথে স্টেশন ওয়াগন থামিয়ে সে আমার ফেরার অপেক্ষা করছিল। বেশ ভয়াবহ করেই বললে, তাছাড়া প্রচ্ছন্ন হুমকিরও আভাস ছিল। ওদিকে যাওয়া নাকি বিপজ্জনক।

'একদিন কয়েক খণ্ড উলফ্রাম দেখতে পেয়ে জানতে পারলাম কোথায় ট্রাক বোঝাই হত। একেবারে নিশ্চিত না হ'য়ে সরকারী সাহায্য চাইলাম না। খবর নিলাম যে আমি মোসাবনী বা ঘাটশিলা চলে যাওয়ার পর ভূতের আবির্ভাব হয়ে থাকে। পুলককে ইচ্ছে করেই পাহাড়ে রেখে চলে যাই। জানতাম যে আমাদের সকলের গতিবিধির ওপর নজর রাখবার জন্যে চর নিয়োজিত আছে, কিন্তু পুলককে কেউ দেখেনি—ও সবেমাত্র আজ এসেছে, তার ওপর বয়সের পক্ষেও বেশ ছোটখাট দেখতে। —ভাবলাম ওকে ঐ পাহাড়ের ওপর রেখে এলে হয়ত নতুন কোনো সন্ধান-সূত্র পাওয়া যেতে পারে—দেখছি যে ভুল করিনি—'

পুলক বলল, 'কিন্তু নমামা, আমি না থাকলেও রথীয়ারা ত ঐ দিকটায় গেলে—একই—'

পালিত সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, 'ওরা মরে গেলেও ঐ নালার মধ্যে নামত না—কাঞ্চনতলা সম্বন্ধে ওদের ভয় জন্মগত। তাছাড়া ওরা ঐ রকম অদ্ভুত কিছু ঘটতে দেখলে ছুটে পালাত —যেটুকু দেখত তার ওপর অনেক রঙ চড়িয়ে বর্ণনা দিত— আমি ওদের চেয়ে কিশোরদের তাজা মন দিয়ে দেখার ওপর অনেক বেশী ভরসা করি। এই দেখ না তরুণ তার স্বাভাবিক কৌতূহলের বশে কতখানি উপকার করল—'

পুলকের বাবা এতক্ষণ একটাও কথা বলেননি। এবার বললেন, 'তাহলে ল্যাংকাস্টার আর হাণ্টলিই টাকা কামিয়ে নেওয়ার লোভে এই দুঃসাহসিক কাজে নেমেছিল?'

পালিত সাহেব বললেন, 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু!'

১৩৭৪

www.BanglaBook.org

জলে ডাকাত ডাঙায় রাজা

পূর্ণেন্দু পত্রী

খুব বেশী দিন আগের কথা নয়। মাত্র ক'মাস আগের এক ভোর-বেলায় ঘুম ভেঙে উঠে খবরের কাগজের মাথায় বড় বড় কালো হরফের একটা খবরের দিকে দেশসুদ্ধ মানুষ একই সঙ্গে বিস্ময় ও আনন্দ মাখানো বড় বড় চোখে তাকিয়ে অভিভূত হয়েছিল। খবরটা ছিল : ভারতের গোয়া দখল। ভারতবর্ষের ভিতর থেকে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের অবসান। এ খবর নিশ্চয়ই তোমাদেরও চোখ এড়িয়ে যায়নি। বরং চোখ থেকে ক্রমশ নেমে এসে মনের গভীরে বাসা বেঁধেছে নানা প্রশ্নের আকারে। কারা এই পর্তুগীজ? কবে এরা দখল করেছিল ভারতবর্ষের মালাবার উপকূলের এই তিনটি ছোট ছোট রাজ্য—গোয়া, দমন, দিউ—গোয় যার রাজধানী? এবং কী করেই বা সাগর ডিঙিয়ে এই বিদেশীদের পক্ষে সম্ভব হল ভারতবর্ষের মাটিতে তাদের সাড়ে চারশো বছরের রাজ্যপাট গড়ে তোলা?

জানতে হলে ইতিহাসের অনেক পিছনের পাতা ওলটাতে হবে। ১৪৯৭ সালের জুলাই মাস। সেদিন শনিবার। টেগ্‌স্ নদীর মোহানায় বেলেম বন্দরের তটে প্রকাণ্ড এক ভিড়। এক-দিকে সাধারণ পর্তুগীজবাসী। অন্যদিকে রাজা ম্যানোয়েলের লোকজন। জনসাধারণের চোখেমুখে অনেকখানি কৌতুক, অনেক-খানি কৌতূহল। রাজার লোকজন এখানে কেন? কিসের জন্য বা পড়ে শোনানো হচ্ছে রাজার আদেশপত্র? নদীর জলে জাহাজের উপরেই বা এমন জাঁকজমক আর বিচিত্র সাজসজ্জা কিসের?

উত্তর এল—ভাস্কো-ডা-গামা যাবেন সমুদ্রে। ভারত আবি-ষ্কারে। বাণিজ্যে।

হো হো করে হেসে উঠল সাধারণ মানুষ। সমুদ্রের ওপারে আবার মাটি আছে নাকি? তাদের হাসি নিছক বিদ্রূপ নয়। তার পিছনে ছিল বিশ্বাস। মধ্যযুগের ইউরোপে এই রকম একটা বদ্ধমূল ধারণা প্রচলিত ছিল যে অতলান্তিক মহাসাগরের পশ্চিমে বা দক্ষিণে জল ছাড়া যদি কিছু থেকেই থাকে ত সেটা মরুভূমি। মানুষ বা সভ্যতা বলে কিছু নেই।

কিন্তু ভাস্কো-ডা-গামার অভিজ্ঞতা আলাদা। তিনি বিশ্বাস করেন অতলান্তিকের পারে কোনখানে ভারতবর্ষ আছেই। জল-পথে সে দেশ যতই অজ্ঞাত হোক, স্থলপথে অজানা নয়। বছর এগারো আগে স্থলপথে মুসলমানের ছদ্মবেশে ভারতবর্ষ ঘুরে গেছেন যে প্রথম পর্তুগীজটি তার নাম পিয়ো-ড-কোভিলহাম। তাঁর কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছেন তিনি ভারতবর্ষের বিবরণ।

সোনার দেশ ভারতবর্ষ। তার মাটির উপরে গাছে গাছে সোনার ফুল-ফল। মাটির নীচের খনিতে হীরে-পান্না-মুক্তো।

সোনার সুতো দিয়ে তারা বোনে 'মসলিন', পৃথিবীর হাটে—চীন, তুরস্ক, আরব, পারস্য, গ্রীস, রোমের বন্দরে-বাজারে—তার যেমন দর, তেমন সমাদর। ভারতবর্ষের সুগন্ধি মসলা যে কী অপূর্ব জিনিস—তার স্বাদ নাকি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত জিভে লেগে থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভারতবর্ষের পারদর্শিতার কথা না-হয় বাদই দেওয়া গেল।

সারি সারি চারখানা জাহাজ পাড়ি জমাল সমুদ্রে। যায়, যায়,—তবু তীরের চিহ্নমাত্র ছবি চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে বসে জাহাজের নাবিকরা হাতের হাল ছেড়ে। বহু কষ্টে তাদের সামলে আবার দিক্‌চিহ্নহীন দরিয়ায় জাহাজ জল কেটে এগিয়ে চলে।

যেতে যেতে, সত্যিই, কী আশ্চর্য, ঐ যে সবুজের ছবি আকাশের নীচে উঁকি মারছে! ভাস্কো-ডা-গামার বুকের ছাতি ফুলে উঠল আনন্দে উল্লাসে সাফল্যে। ১৪৯৮ সালের ২৭শে মে গামার জাহাজ যেখানে এসে থামল সেটা ভারতবর্ষের মালা-বার উপকূল। বন্দরের নাম কালিকট। সেখানকার রাজা জামো-রিন সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা জানালেন এই বিদেশী অতিথিকে। পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হল প্রচুর উপঢৌকনের। কালিকটের নাগরিকেরাও যথেষ্ট সম্মান জানাল বিদেশীকে। কিন্তু বিদেশীর আসল চেহারা ফুটে বেরুল কিছুদিন যেতে না যেতেই। তাদের

www.BanglaBook.org

জাহাজ থেকে মুখ তুলে দাঁড়াল কালোমুখো বিরাট বিরাট কামান। হাতের মুঠোয় ঝলসে উঠল ধারালো অস্ত্র রক্তের লোভে। নির্বিচারে শিশু-বৃদ্ধ-নারীকে তারা বন্দী করতে শুরু করল বিদেশে ক্রীতদাস করে চালান দেওয়ার জন্যে। ১৫০২ সালে গামা এমনি আটশো বন্দীকে হাত-পা-নাক-কান-কাটা অবস্থায় জামোরিনের দরবারে উপহার পাঠালেন। বীভৎসতা এমন চরমে উঠেছিল যে কুকুরের কান কেটে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল সেই সব বন্দীদের কানের জায়গায়। মুখে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল শুয়োরের মাংস। মুসলমানরাই তাদের পরম শত্রু। তাদের উপরই আক্রোশ-আক্রমণটা বেশী। কারণ কালিকটের মানুষকে খ্রীষ্টান করে তোলার পথে তারাই প্রধান বাধা।

পর্তুগালে তখন পোপের কর্তৃত্ব। গামার গোয়া অভিযানের সাফল্যের সংবাদ পেয়ে পোপ পর্তুগালের রাজা ম্যানোয়েলকে নতুন উপাধি দান করলেন—'ভারতবর্ষ, ইথিওপিয়া, আরব এবং পারস্যের জলপথ এবং বাণিজ্যের একমাত্র স্বত্বাধিকারী' নামে।

এর পর পর্তুগাল থেকে অ্যালভারেজ ক্যাব্রাল পিদ্রু এলেন ভারতে। এসেই ফ্যাকটরি গড়ে তুললেন কালিকটে। তারপর শুরু হল আমদানি রপ্তানি দুই ব্যবসাই পুরোদমে। পিদ্রু-র পর এলেন পর্তুগীজ সেনাবাহিনীর অধিনায়ক আলফাঁসো আবুকার্ক। ১৫১০ সালে বিজাপুর সুলতানকে হারিয়ে গোয়া দখল করলেন তিনি। গোয়ায় গভর্নর হয়েই মন দিলেন দুর্গ গড়ায়। নইলে ব্যবসা বাঁচাবে কে?

হিন্দুস্থানের সিংহাসনে তখন বাদশা আকবর। সব ধর্মের প্রতিই তাঁর সমান আকর্ষণ। সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম বাদ যাবার কথা নয়। তাঁর দরবারে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের ঘন ঘন আসা-যাওয়া। এই পাদ্রীরাই নানা উপহার-উপঢৌকনে তাঁর মনোরঞ্জন করে চাটগাঁ অর্থাৎ চট্টগ্রামের মাটিতে তাদের একটা সেরা বাণিজ্যের ঘাঁটি গড়ে তুলতে সাহায্য করল। ক্রমে চাটগাঁ থেকে বাংলাদেশের সাতগাঁ অর্থাৎ সপ্তগ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল তাদের বাণিজ্যের পথ। পর্তুগীজদের ভাষায় এই দু'জায়গার নাম হল—চট্টগ্রাম—পোর্টগ্রান্ডী ; অর্থাৎ বড় স্বর্গ। সপ্তগ্রাম—পোর্টপিকানো ; অর্থাৎ ছোট স্বর্গ।

বাংলাদেশে বাণিজ্য করতে এসে তারা প্রথমে কুঠি বানাল হুগলীতে। ব্যান্ডেলে আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা গীর্জার মূর্তিটা তাদের সেই অতীত দিনের স্মৃতি অথবা সাক্ষী।

পর্তুগীজরা শুধুমাত্র বাণিজ্য করায় মন দিলে ইতিহাসের গতি হয়ত অন্যরকম হত। কিন্তু বাণিজ্যের সঙ্গে তারা মেশাল দস্যুবৃত্তি। আর সারা ভারতবর্ষের মানুষকে খ্রীষ্টান বানিয়ে তোলার দুর্দমনীয় লোভ ক্রমশ বাড়িয়ে তুলল তাদের অত্যাচারের মাত্রা। মুসমানদের মসজিদ এবং হিন্দুদের মন্দিরকে তারা আগুনে পোড়াতে লাগল। গোয়ায় চার্চ তৈরী করে তারা জবরদস্তি শুরু করলে ধর্মান্তরকরণের জন্যে। কোচিনে খ্রীষ্টান ছাড়া কারও বাস করা চলবে না হুকুম জারী করে দিলে। জলে স্থলে সমান অত্যাচার। 'রাত্রিদিন বয়ে যায় হার্মাদের ডরে।' হার্মাদ কথাটা এসেছে 'আর্মাডা' অর্থাৎ রণ-তরী থেকে। পর্তুগীজরা যে বাণিজ্যের অধিকার পেয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করবে তা সম্রাট আকবর ভাবতে পারেননি। ক্রমশ তাঁর কাছেও হুগলীর সপ্তগ্রাম হয়ে উঠল 'বুলখকখানা' অর্থাৎ বিদ্রোহীদের আড্ডা। কিন্তু আকবর তাঁদের শায়েস্তা করতে পারেননি ঠিকমত, যতটা পেরেছিলেন তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর। পরের অধ্যায়ের জন্যে সে কাহিনী জমা রইল। ১৩৬৮

নিঝুম রাতে

সুনন্দা দাশগুপ্ত

চাঁদ থম্‌থম্‌ নিশুত রাতে ভূতুমপ্যাঁচা ডাকল যেই
ঝুপ্‌সী মতন গাছের আড়ে ফিনিকফোটা জোছনাতেই
ঠাহর করে দেখতে পেলাম পক্ষিরাজের পাখনাকেই।
ফুলকারী কাজ পাতার ফাঁকে
আধেক আলো নকশা আঁকে
চাঁপার বনে সবুজ বাতির চুমকী বসায় জোনাকটাও।
ফুলের গন্ধ মুচকি হেসে বলল আমায়—'কোথায় যাও?'

ভয় না পেয়ে পক্ষিরাজের লাগাম কষে ধরে
উড়াল দিলাম সোনার পাহাড় ক্ষীরের সরোবরে।
ছায়াপথে খুব বেড়িয়ে
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে,
তিরপূর্ণির ঘাট এড়িয়ে
বালুর সীমানাতে
পৌঁছে গেলাম যখন আমি দিকনগরের ঘাটে
ফটিক জলের পিপাসাতে তখন ছাতি ফাটে।

www.BanglaBook.org

হাত ঝুমঝুম পা ঝুমঝুম
লাল টুকটুক টিপ কুমকুম
স্নানের শেষে কাঁকনমালা আঁকল কপালটাতে।

একটুখানি নিই জিরিয়ে
মধুর গন্ধে বিভোর হয়ে
বিনিসুতোয় গেঁথে নিয়ে
বকুল ফুলের মালা
সীতেনাথের নাচন শেষে আবার চলার পালা।
নিদ্রাকলস পুণ্যিকলস যাত্রাকলস যত
মাথায় ছুঁয়ে আশিস নিলাম কঠিন আমার ব্রত।
বট বিরিক্ষে সাক্ষী থাকুক ব্যাঙ্গামাব্যাঙ্গমী
অন্তরীক্ষে সাক্ষী থাকুক মেঘেরা মৌসুমী
উথালপাথাল আকাশ পাতাল সমুদ্দুরের ঢেউ
মায়ের দেওয়া নামটি ধরে ডাকল নাকি কেউ?
তারপরেতে চাঁদের সাথে
অথৈ জলের কিনারাতে
মনপবনের নাওখানাতে
আমার বৈঠা বাওয়া
যুথীবনের মধুর আমেজ আনল মিঠে হাওয়া।
জামরুলবন ঝিরঝিরিয়ে
পদ্মপাতায় শিরশিরিয়ে
রাতের শিশির ঝিলমিলিয়ে
প্রাণভোমরার খোঁজে
পাথার পুরীর নিদমহলে আমিই গেলাম নিজে।

হীরেমনটা একলা জেগে
'কেও' 'কেও' বললে হেঁকে
আলোর ঝিলিক হঠাৎ লেগে,
অবাক কৌতূহলে
কুঁচবরণী রাজকন্যা কমল আঁখি মেলে।
ফুটল তখন রামধনুফুল
উজল আমার সেই সে বকুল-
ফুলের মালা তুলে দিলাম রূপকুমারীর হাতে।
জ্যোছ্না আলো মিলিয়ে গেল শুকতারাটির সাথে।

অবাক হয়ে শুধোই আমি—'রাজকন্যা কোথায় যাও?'
হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গেল ঝুমের বাজা নূপুরটাও।
আলোর ফুলকি ছড়িয়ে দিয়ে সূর্যিমামা এলেন পাটে
সোনার মতন রোদের গুঁড়ো ছড়িয়ে গেল মাঠে ঘাটে—
অমনি দেখি পৌঁছে গেছি রেলিং ঘেরা ছোট্ট খাটে।

১৩৮৬

www.BanglaBook.org

আসল টেনিদা

আশা দেবী

টেনিদার কথা নিয়ে লেখবার কোন পরিকল্পনা আগে ওঁর মনের মধ্যে না থাকলেও এটা বোধহয় ছোটদের জন্যে কলম ধরেই মনে হয়েছিল যে, ছোটদের কথা লিখতে হলে তাদের মত করেই লিখতে হবে। তাহলে লেখককে ফিরে যেতে হবে তাঁর ছোট-বেলার আনন্দ-বেদনাময় দিনগুলোর মধ্যে। তাঁকে ডুবে যেতে হবে সেই সব দুষ্টুমির ভেতর যা তখন তাঁকে আনন্দ দিয়েছিল। আজকের বয়স্ক মন দিয়ে, মাস্টারমশায়ের বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে চলবে না। তাদের মত করেই তাদের দেখতে হবে, ভালবাসা দিয়ে, ক্ষমা দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে যেমন বন্ধুকে দেখে তার সমপর্যায়ের বন্ধু। অভিভাবকের শাসনের তর্জনী সংকেত সেখানে থাকবে না।

সাহিত্যের কলম ধরে ছোটদের জন্যে উনি যখন লিখতে গিয়েছেন, কিংবা যখন উনি টেনিদার গল্প লিখতেন তখন নিজের দুষ্টুমি-ভরা মুখখানা হাসিতে ভরে যেত।

'কী লিখছো? ছোটোদের হাসির গল্প বুঝি? নায়ক কে?'

উনি আমার কোন কথায় কান না দিয়ে ময়নার মত কান খাড়া করে যেন কী শুনছেন। শুনছেন মন দিয়ে দোতলায় দুটি মহিলার বিচিত্র সংলাপ।

দুটি মহিলা গল্প করছিলেন। গল্পের সার মর্মটা এমনি—'আমার টেনু যখন ছোট ছিল তখন ওকে কাঁথা চাপা দিয়ে রোদে শুইয়ে রাখতাম। তখন আর কোথাও কিছু দেখা যেত না, শুধু খড়্গের মত একটা নাক। সে কী নাক!' উনি সংযোজন করলেন—'খড়্গ বলা ঠিক হয়নি, বলা উচিত ছিল ছোট কাটারী। —মানে টেনিটা তো তখন ছোট, ওর নাকও তখন ছোট। সুতরাং সেটা আর খড়্গ হবে কী করে? ওটাকে ছোট দা বা কাটারী বলা উচিত ছিল।'

'মানে? সব সময় মাস্টারী!'—আমি বিরক্ত হয়ে বললাম।

উনি একটু হেসে বললেন—'সেই যে কবিতাটা কী যেন—

"বাবা বলে নরু, তুই ভারি গরু
রোজ খাবি কানমলা?
বাবার কী ভুল, আমি এত ছোট
উচিত বাছুর বলা।"—

তা থাক, ওঁদের কথাগুলো শুনতে দাও।'

উনি সংলাপের দিকে কান খাড়া করলেন—

'ওমা, একদিন এক দাঁড়কাক ওটাকে মালপোয়া-টালপোয়া ভেবে ঠকাস করে এক ঠোকর। কাকটাকে নেচে নেচে এগিয়ে আসতে দেখেই আমি আগেই ভেবেছিলাম এমন একটা কিছু হবে। আমি একটা লাঠি নিয়ে আগের থেকে তৈরী ছিলাম তাই বেশী কিছু করতে পারেনি।'

'খুব ত রক্ষা পেয়েছে বলুন'—প্রতিবেশিনী মন্তব্য করলেন, 'রক্ষা পেয়েছে বটে, কিন্তু সে কি কান্না, যেন রামশিঙে বাজছে। তখন থেকেই ওর গলার আওয়াজ ওই রকম।' উনি বললেন : 'রাম শিঙে' না বলে 'দশরথ শিঙে' বললে আওয়াজটা যে খুব জোর তা বোঝা যেত।'

কিন্তু ওপর তলায় গল্পের বিষয়বস্তু ঘন ঘন বদলায়। এবার শুরু হলো থিয়েটার দেখার গল্প নিয়ে।

'সেবার ত আমরা সবাই থিয়েটার দেখতে যাব। সবার টিকিট হলো, টেনুর হলো না। কিন্তু থিয়েটারের গেটে যারা থাকে তারা ভীষণ বাজে লোক। রেলে সেবার অনেক কষ্টে ছাড়া পেয়েছি। টেনির লম্বা লম্বা ঠ্যাং দেখে বলে ওর বয়েস দশ বছর। ওর ঠ্যাং নিয়েই আমার বরাবর বিপদ!

আমিও ছাড়বো না। আমি বললাম—আমি ওর মা হ্যায়। একেবারে সাক্ষাৎ গর্ভধারিণী। তোম কিয়া জানতা। হামকো চেয়েতো তোম বেশী নাহি জানতা। চেক্যার 'সেলাম মাতাজী', বলে চলে গেল। কিন্তু এবার আর টেনির টিকিট করা ছাড়া বুঝি উপায় নেই। আমি অনেক ভাবলাম। শেষে এক ফিকির বের করলাম। রাত্রের ব্যাপার ত। শীতের সময় ওকে একটা চাদর চাপা-টাপা দিয়ে নিয়ে গিয়ে ত উপস্থিত হলাম।

'লোকে লোকারণ্য। আমরা ভেতরে ঢুকতে যাব, দরজায় দাঁড়ানো এক বুড়ি বললে, 'জি জি, তিকিট?'—মহিলার দাঁত নেই। মহিলা যেন কেমন কেমন করে কথা বলে। আমার ওকে দেখেই বেশ বিরক্ত লাগছিল কিন্তু কোনমতে একবার ঢুকে পড়তে পারলে হয়। তাই মুখে হাসি আনলাম।

'সবাই ঢুকে গেল ; ঠিক আমাকে ধরলে ক্যাঁক করে!—'আপনার কোলে? কোলে ওটা কী বলুন ত?'

'ও কিছু নয়, পানের বাটা।'

'মানে, পানের বাটার কী পা থাকে?'—বলেই মহিলা টেনির লম্বা লম্বা ঠ্যাং ধরে সড়াৎ করে আমার কোল থেকে নামিয়ে নিলে। ওগো বোমা! তখন থেকেই ওর ওই লম্বা লম্বা পা নিয়ে আমার বিপদ ছিল। হ্যাঁ, তবে ওই পা যেমন বিপদ করতো তেমনি বিপদ উদ্ধারও করতো।

সেবার বাড়িতে চোর পড়লো। টেনিটার জন্যেই সব রক্ষা গেল। চোর সবাইকে বাইরে থেকে শেকল বন্ধ করে যেই টেনির জানালার পাশ দিয়ে যেতে গেল, টেনি জানালার শিকের ভেতর দিয়ে লম্বা লাঠির মত পা বের করে এমন ল্যাং দিলে যে চোর ত চোর, চোরের কাকা পর্যন্ত পগার পার।'

ওদের গল্প শেষ হত না। কিন্তু বাধ্য হয়ে শেষ করতে

www.BanglaBook.org

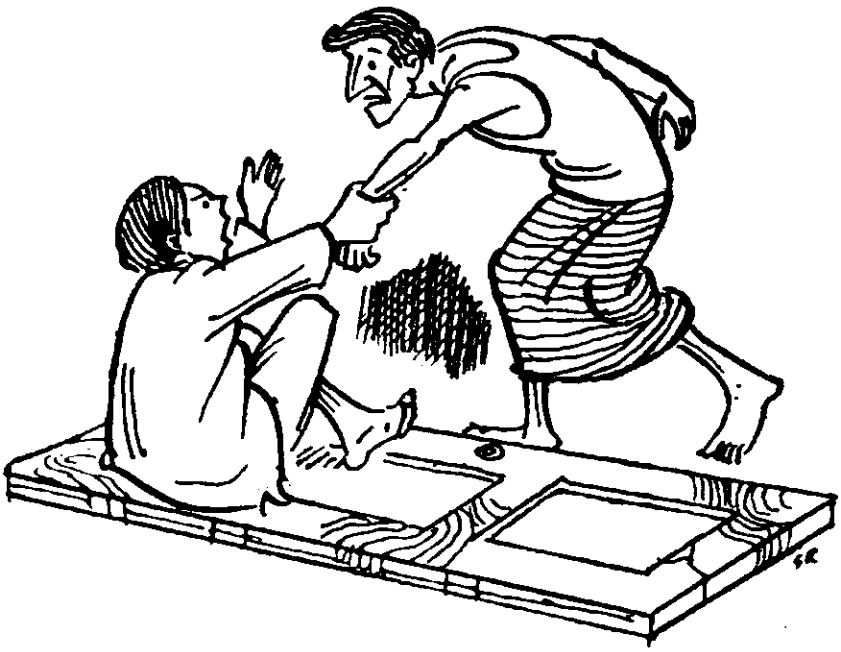

হলো। কে যেন মহিলাকে ডাকলো। কাজেই রণে ভঙ্গ দিয়ে ওঁকে যেতে হলো।

এইসব গল্পই হয়ত পরোক্ষভাবে ওঁর মনে দাগ কেটেছিল। হয়ত মনে হয়েছিল এমন একটি চরিত্র নিয়ে গল্প লিখলে কেমন হয়? ভালই হয়—এবং হলোও। টেনিদাকে নিয়ে শুরু করলেন গল্প। কিন্তু তখন টেনিদা আর বাস্তবের কেউ রইল না। কল্পনা আর বাস্তব মিশে একটা নতুন মানুষ সৃষ্টি হলো যাকে বাস্তবের টেনিদা বললেও ভুল হবে, আবার সম্পূর্ণ কল্পনা বললেও ভুল হবে।

একটা সুন্দর ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

টেনিদার বাড়ির সামনেই মতিলালবাবুর বাড়ি। বেঁটে-খাটো—গোল বলের মত মতিবাবুর মাথার সব নাটবল্টু ঢিলে। প্রতিদিন সকালে উঠেই টেনিদা তাঁর বন্ধুবান্ধব নিয়ে প্রাতরাশ সেরে সেই রকে এসে বসেন! আর অমনি 'খুলিল পশ্চিম-দ্বার অশনি নিনাদে'—মেঘনাদ বধ কাব্যের সেই পশ্চিমের দরজা দড়াম করে খুলে যেতেই ভেতর থেকে আওয়াজ এল মেঘ-মন্দ্রস্বরে 'গেল গেল—ধর ধর।'

সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনে হবে কে গেল এমন প্রসন্ন মধুর সকালে! আর কেন বা গেল! আর যদি গেল তবে তাকে কেনই বা ধরবো! এইসব কূট প্রশ্ন আপনার মনে আসতে আসতেই দেখা যাবে মতিলালবাবু এবং তাঁর স্ত্রী রক্ষাকালী সদর দরজার একটা পাল্লার তলায় চাপা পড়েছেন। এবং পরপাঠ তাঁদের উদ্ধারের কাজ পাঁচ ফুট লম্বা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন টেনিদা। দরজার পাল্লা সরিয়ে যুগলবন্দী মতিলালবাবু এবং মাসিমাকে বের করতেই চুষে খাওয়া আমের আঁঠির মত মতিলাল-মাসিমা দোতলায় বিলীন হলেন, এবং মতিলালবাবু টেনিদার একখানা হাত চেপে ধরে একেবারে দরজার পাল্লার ওপর বসে পড়ে শুরু করলেন—'আচ্ছা টেনি, আমার ভাড়াটের কি ব্যাভার দেখ! যখন ভাড়া নেয় তখনই আমি পৈ-পৈ করে বলে দিয়েছিলাম যে তোমাকে নটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে, নটা পাঁচ মিনিট হলে আর বাড়ি ঢুকতে পারবে না। কিন্তু আজ ক'দিন হল তার কাকার অসুখ না কি বলে রোজ নটা পনের মিনিটে বাড়ি ফেরে। আমিও দরজা খুলবো না—, সেও আসবেই। শেষে যখন দরজা কিছুতেই খুললাম না তখন ও দরজার ওপর বাইরেই শুয়ে রইল।

'আমি বাড়িওয়ালা। আমিও ছাড়বো না। বাড়ি আমার, দরজা আমার পয়সায় তৈরী, সুতরাং দিলাম ওর একটা পাল্লা ভেঙে। দেখ এবার কেমন শাস্তি। ভাড়াটেকে এবার বেশ জব্দ করেছি।'

'তা ত করেছেন'—টেনিদা বললেন, কিন্তু আপনার দরজাও তো ভাঙল, চোর-টোর ত ঢুকতে পারে।'

'ভাঙল ত ভাঙল। আমার দরজা ভাঙল তা ভাড়াটের কী? চোর যদি ঢোকে তখন সে কথায় আমি ফয়সালা করবো।'

ভাড়াটে ভজহরি ভেলিগুড় দিয়ে চা খাচ্ছিল। হঠাৎ রেগে গিয়ে সে ছুটে বেরিয়ে এল।—'দেখুন ত মশাই কী যন্ত্রণায় পড়া গেছে; দরজার সামনে ছাই ঢেলে ঢেলে পাহাড় তৈরী করে রেখেছে। কিছু বলবার উপায় নেই, বললেই বলবে, 'আমার বাড়ি আমি যেখানে খুশি ছাই ঢালবো। ইচ্ছে হয় ডিঙিয়ে যাও। এখুনি দরজার কাছে বাক্স এনে রেখে বলে যদি চুরি যায় তবে তোমার দোষ। তোমাকে দিয়ে বিশ বছর জেলের ঘানি ঘোরাব।'

টেনিদা বললেন, 'মতিবাবু—এসব কি?'

মুখের কথা তাঁর মুখেই রইলো। তিনি দ্রুতপদে ছুটে গিয়ে ঘরের ভেতর থেকে সশব্দে একটা টুল টেনে এনে ধাঁই করে তাতে চড়ে পড়ে একেবারে টেনিদার কানটা টেনে ধরে কানের কাছে মুখ এনে চিৎকার করে বলতে লাগলেন—'বাড়ি আমার, এ সব কথায় যে নাক গলাতে আসবে আজ তার কান ধরলাম। এর পর তার খড়্গের মত নাক কেটে কুচি কুচি করে দেব—, মনে থাকে যেন। আমার ভাড়াটেকে আমি মারি, কাটি, খুন করি তাতে তোর কি র‍্যা টেনু শর্মা?'

টেনিদা লক্ষহীন শুকতোর মত বিস্বাদ ফেকাসে মুখ করে নির্বাক হয়ে মতিবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল! ১৩৮৬

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কারু গেল সার্কাসে

শৈবাল চক্রবর্তী

কারু বলে গাঁয়ের ছেলেটা জন্তু পুষবে বলে তার মামার মাথা খাচ্ছিল, এতদিন মন খারাপ করে বসেছিল! হঠাৎ গাঁয়ে এক সার্কাস পার্টি এসে হাজির হল! নদীর ধারে চড়াইয়ের মাঠে তাদের পড়ল তাঁবু! শুধু সার্কাস নয়, নানা জিনিসের দোকান লাগল সেখানে! সমস্ত জায়গাটা গমগম করতে লাগল। ছেলেবুড়ো জোয়ানের ভিড় জমে গেল। হাতি, সিংহ, বাঁদর কতরকমের জন্তুই যে এসে গেল সেখানে তার ঠিক নেই! কারু ভাবল এতদিন বসে থেকে জন্তু ত পোষা হল খুব, তার চেয়ে যাই বরং পয়সা দিয়ে ক'টা জন্তু দেখেই আসি গে! উঁচু তাকের ওপর রাখা মাটির তৈরি লক্ষ্মীর ভাঁড়ে কাঠি ঢুকিয়ে সে এক পয়সা দু'পয়সা করে চার আনা বার করল। দু' আনা টিকিটের দাম, দু' আনায় সে ইচ্ছে মতন কিছু কিনে খাবে। পালে-পার্বণে পয়সা পেয়ে সে এই ভাঁড়ে ফেলে রাখে। পয়সা জমানো কারুর সয় না। আট আনা আন্দাজ জমে উঠলেই সে কাঠি দিয়ে খোঁচাখুঁচি আরম্ভ করে। ঠুন ঠুন করে যা পড়ে তা দিয়ে কারু লাটাই, ঘুড়ি বা তালপাতার ভেঁপু কিছু একটা কিনে ক'দিন খুব ফুর্তি করে।

বাবা রে বাবা কী চীৎকার! কারু এখন মেলায় ঢুকে পড়েছে! একটা ছোটো তাঁবুর সামনে এসে কারু দেখল একটা লোক ঢাকে দমাদম কাঠি পেটাচ্ছে আর মুখে একটা চোঙ লাগিয়ে এই কথাগুলো বলছে:

কোন যাদুকর দুনিয়া চালায়!
মুরগি ডাকে হাঁসের গলায়!

ওমা তাই নাকি! কারু প্রথমে ভেবেছিল লোকটার বুঝি মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তা না হলে এমন ভুল বকে! কিন্তু না; কারু দেখল তাঁবু থেকে যারা বেরুচ্ছে তাদের সবার চোখ ছানাবড়া! সে গুটিগুটি ধুতি পরা লোকটার কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আচ্ছা শুনুন, আপনি যা বলছেন তা কি সত্যি?'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে নিজের পুরুষ্টু গোঁফটা বেশ সযত্নে মুছে নিয়ে ভুরু দুটো কপালে তুলে সে বলল, 'ভেতরে গিয়েই দেখ না! যে লোক দুনিয়া চালায় সে কত বুদ্ধি রাখে!'

লোকটা কথা বলতে পারে খুব। কারু পকেট থেকে চারটে পয়সা বার করে দিতেই সে পর্দাটা তুলে ধরল। কারু ভেতরে ঢুকে দেখল যে একটা তেপায়া টেবিলের ওপর একটা ধেড়ে লাল মুরগি বসে। লোকটা সেখান থেকেই মিহি গলায় সুর ভেঁজে বলল—

'ডাকো তো সোনা প্যাঁকর প্যাঁক
ভর্তি হবে আমার ট্যাঁক॥'

অমনি মুরগিটা ঠিক হাঁসের মত গলায় প্যাঁক প্যাঁক করে ডেকে উঠল। কারু তো অবাক! এরকম কাণ্ড সে এই প্রথম দেখল।

আস্তে আস্তে ভিড় কমে এলে কারু গুঁফো লোকটার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা একটা কথা বলব?' লোকটা তখন তার থলি উপুড় করে পয়সা গুনতে লেগেছে। পয়সা গুনতে গুনতেই বলল, 'বল না, বল! একটা কেন, একশোটা কথা বললেও আমি এখন রাগ করব না! আজ আমার বিক্রি হয়েছে কত জানিস? এগারো টাকা সাত আনা।' ভরসা পেয়ে কারু বলল, 'আচ্ছা, বলুন না, মুরগিটাকে কি আপনি মন্তর-টন্তর কিছু পড়িয়েছিলেন?' লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আরে না না, অনেকে তা বলে বটে, কিন্তু ও কথাটা সত্যি নয়! আসল ব্যাপারটা কি জানিস? আমার হাঁস-মুরগির ব্যবসা আছে আর আছে যত এলেবেলে সখ! একদিন নেহাত মজা করবার জন্যেই একটা বড় দেখে মুরগির ডিম লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলাম হাঁসের খোপে। ভেবেছিলুম ধেড়ে হাঁসগুলো হয়ত চালাকি ধরতে পেরে ঠুকরে ভেঙেই দেবে। কিন্তু অনেকগুলো ডিমের মধ্যে ছিল বলে বোধ হয় বুঝতে পারেনি কিনা জানি না—বিশ দিন পরে দেখি, ওমা! হাঁস আর হাঁসের বৌ দুটিতে মিলে তা দিয়ে ডিমটি দিব্যি ফুটিয়ে দিয়েছে। আর আশ্চর্য কাণ্ড! বলব কি, বড় হতে সেই মুরগি দিব্যি হাঁসের গলায় ডাকছে। মুরগিদের সঙ্গে বিশেষ মাখা-মাখি নেই ওর। হাঁসের জোড়াকেই ও বাবা-মা বলে জানে। আমার বাড়িতে যদি আসিস ত দেখবি হাঁসেদের সঙ্গে ও কেমন সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে।'

এই পর্যন্ত বলে গুঁফো লোকটা হঠাৎ ঝনাৎ করে পয়সা-গুলো থলিতে ভরে সেটা ট্যাঁকে গুঁজে ফেলল। তারপর পকেট থেকে একমুঠো ভুট্টার দানা বার করে মুরগিটার সামনে দিল ছড়িয়ে, মুরগিটা খুঁটে খুঁটে তাই খেতে লাগল। লোকটা কারুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সবচেয়ে ও ভালোবাসে ফ্যানভাত ও আর সেদ্ধ। সত্যি কথা বলতে কি এখন ওই আমাকে খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে। ও না থাকলে আমার যে কি দশা হত তাই ভাবি।' লোকটা কথা বলছে, আর মুরগিটাও খাওয়া শেষ করে ফড় ফড় করে ডানা মেলে উড়ে তার কাঁধে এসে বসল! তাকে আদর করতে করতে লোকটা কারুকে বলল, 'আসিস না একদিন আমার বাড়ি। তালপুকুরের মোড় ঘুরলেই প্রথম টালির ঘরটাই আমার! ওখানে ভোলা মুরগিওলা বললে যে কেউ দেখিয়ে দেবে!'

কারু এবার সার্কাসের তাঁবুর দিকে এগোল। টিকিট

www.BanglaBook.org

কেটে ভেতরে ঢুকে সে দেখে যে খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। হাতিগুলো বল নিয়ে ছুটোছুটি করছে আর একটা খাঁচায় বন্ধ বাঘ থেকে থেকে হুংকার দিচ্ছে। বাঘের খেলা হবে সব শেষে। এটা সেটা খেলার পর শুরু হল শিম্পাঞ্জীদের সাইকেল চড়া। একটা ধেড়ে শিম্পাঞ্জীর মুখে আবার মস্ত চুরুট। ভক্ ভক্ করে ধোঁয়া ছাড়ছে আর চোখ মিটমিট করে তাকাচ্ছে যেন বিলেত-ফেরত কোন হোমরা-চোমরা। সেটাই হল পালের গোদা। শিম্পাঞ্জীগুলো সাইকেল চালাল ঠিক মানুষের মতন। পালের গোদাটা আবার একটা বাচ্চা দেখে শিম্পাঞ্জীকে টেনে পিঠের ওপর তুলল। সেই অবস্থায় সাইকেলে উঠে একপাক ঘুরতেই চটাপট সে কি হাততালি!

এরপর হল সিংহ-সিংহীর কুস্তি। একবার সিংহ সিংহীকে ফেলে তার বুকের ওপর উঠে দাঁড়ায় আর একবার সিংহী সিংহকে ল্যাং মেরে চিৎপটাং করে তার চারপাশে ঘুরে বেড়ায় বীরদর্পে। শিম্পাঞ্জী হল এদের বিচারক। ওইরকম খেলা চলতে চলতেই ঘণ্টা পড়ে গেল। এখন দশ মিনিট খেলা বন্ধ। সবাই ইচ্ছেমতন বাইরে ঘুরে আসতে পারে।

পেছনের ছোট দরজাটা দিয়ে কিলবিল করে লোক বেরুচ্ছিল। কারুও তাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। আসলে তার খিদে পেয়েছিল। খিদে মানে, সার্কাস বা মেলায় এসে পয়সা খরচ করে কিছু কিনে খাবার যে ইচ্ছেটা হয়, সেইটা আর কি। সার্কাসের পেছনটা জন্তু-জানোয়ারদের থাকবার জায়গা। কারু সেখানে এসে দেখল যে, বাচ্চা হাতিটা আখ চিবুচ্ছে। দেখে কারুর ভারি মজা লাগল। হাতিও তাহলে আখ খায়। কোনদিন হয়ত দেখবে চায়ের পেয়ালা হাতে হাতি খবরের কাগজ পড়ছে। হাতি যদি আখ খায়, কারু ভাবে, তাহলে বাঘের প্যাঁড়া আর জলহস্তীর জিলিপি খেতেই বা বাধা কোথায়। মামাকে বলতে হবে কথাটা। মামা ত শুনেই লাফিয়ে উঠবে! তারপর বলবে, দূর বাজে কথা। যা নিজের চোখে না দেখে মামা তা কিছুতেই বিশ্বাস করে না।

এমন সময় সিংহটা কোত্থেকে দৌড়তে দৌড়তে এল। দৌড়নো তা নয়, এ যেন খানিকটা জোড় পায়ে লাফানো। সেই কুস্তি-লড়া সিংহ দেখে দেখে ত কারু ঠক ঠক করে কাঁপতে লেগেছে! আস্ত কেশরওলা সিংহ তার সামনে! 'মামা' বলে যে একটা ডাক দেবে সে উপায়ও নেই। ঠোঁট দুটোকে কে যেন চাবিতালা দিয়ে এঁটে রেখেছে। সিংহটা লাফ দিয়ে আখগুলোর ওপর পড়ল, তারপর মোটা দেখে একটা আখ বেছে নিয়ে সেটাই দু'-হাতে বাগিয়ে ধরে কচমচ করে চিবোতে লাগল! কারু ভাবল সিংহটা ত দেখছি ভারি লোভী! আখও বাদ দিচ্ছে না। এমন সময় সিংহমশায়ের নজর পড়ল কারুর ওপর। ঠিক যেন একটা মানুষ কথা কইছে এমনি গলায় বলে উঠল—আরে খোকা, তুই এখানে? পরের খেলা দেখবি না? সে ত জব্বর খেলা! আগুনের রিংয়ের ভেতর দিয়ে ভোঁদারামের লাফ!

কারু বুঝল তার মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে সব সজারু ডাঁটা হয়ে গেছে, আর হাঁটু দুটো কাঁপছে ঠকঠক করে। একি দেখছে আর শুনছে সে! কিন্তু অবাক হবার আরও বাকি ছিল। সিংহটা হঠাৎ 'ধেত্তেরি' বলে গা ঝাড়া দিল আর অমনি ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল বাবরি চুল, রোগাপানা একটা লোক। দেখে তো কারু অবাক। আরে এই লোকটাই যে ক'দিন আগে হাতির পিঠে চেপে ঢেঁড়া পিটিয়ে বেড়াচ্ছিল তাদের পাড়ায়।

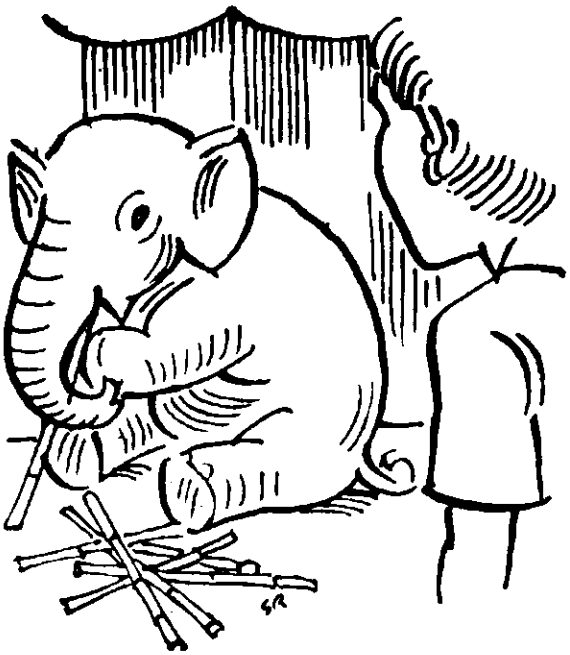

দুষ্টু হেবো বলছিল, এই নাকি সার্কাসের মালিক। বাব্বা, কি চেঁচাতেই পারে! লোকটা বলল, 'দূর ছাই, এ পোশাকটা যেন একটা বোকার মতন। যতক্ষণ ভোঁদারামের খেলা ততক্ষণ একটু জিরিয়ে নিই।' বলে সেই আখের গাদার ওপরেই আয়েস করে গা ঢেলে দিয়ে বলল, 'তা হ্যাঁ খোকা, তুই খেলা দেখবি না? পেট কামড়াচ্ছে বুঝি? ঠেসে ঘুগনি খেয়েছিস ত? তোদের যে কি, এই সার্কাসে কি রথের মেলাতে বেরুলেই তোরা পেট-পুরে খাবি ঘুগনি আর পাঁপর ভাজা। ছ্যা, ছ্যা, ওগুলোয় কি আছে? কিসসু নেই। খেতে হয় খা এই আখ। একেবারে ভিটা-মিনে ভরপুর।'

কারুর যে খিদে পেয়েছিল তা সে কেমনতরে ভুলে গিয়েছে। সার্কাসের সিংহটা যে একটা জলজ্যান্ত মানুষ বই আর কিছু নয়, এ যেন চোখে দেখেও ভাল মাথায় ঢুকছে না।

সার্কাসের মালিক তখনও বলে চলেছে, 'একি আমার পোশাক! ছ্যা, ছ্যা, হরেনটা ছুটিতে গেল আর মালিক হয়ে আমাকে কিনা গায়ে চড়াতে হল তালিমারা খোলস। ভাঁজে ভাঁজে আবার ছারপোকার বাসা। এখনও গা জ্বলছে।'

'হরেন কে?' কারুর মনে হল তার মুখ দিয়ে অন্য কেউ কথা বলছে।

'হরেন মানে, হরেন ঘোষ। তমলুকে বাড়ি। সাতদিন ছুটি নিয়ে মামার বিয়েতে গেল বরযাত্রী হয়ে, ব্যস সেই যে গেল আর দেখা নেই। সেই ত সিংহ সাজে বরাবর। আজ আট বছর এই খোলসটা গায়ে চড়াচ্ছে ও। ও নেই বলেই ত এই বোঝা আমার গায়ে চড়ল। এদিকে শিম্পাঞ্জীটা খোঁড়া হয়ে রইল।'

'কেন, শিম্পাঞ্জিটার কি হল? পড়ে-টড়ে গেছে বোধহয়?' কারু যেন কলের পুতুলের মত কথা কইছে।

'আরে না না, পড়বে কেন? খোঁড়া মানে কি আর হাত-পা-ভাঙ্গা? বড় শিম্পাঞ্জী ত দুটো। তা আমি যদি সিংহ সেজে

www.BanglaBook.org

বসে থাকি ত শিম্পাঞ্জী আছে কে? বাড়তি লোক বলতে ত একটিও নেই।'

'জন্তুগুলো বুঝি সব সত্যি নয়?' কারু যেন আলো দেখতে পায় সামনে।

আখের ছিবড়েগুলো মুখ থেকে থু থু করে ফেলে দিয়ে সার্কাসের মালিক বলে, 'সত্যি হলে আর কি রক্ষে ছিল?' বলে পান খাওয়া কালো দাঁতগুলো মেলে সে খানিক হাসল, তারপর বলল, 'কথায় বলে শুনিসনি?—

সার্কাসের সব খেল কি?
অনেক কিছুই ভেলকি।

দুনিয়ার যত খেলা তার অর্ধেকটাই ফক্কিকারী আর অর্ধেকটা খেলোয়াড়ের বাহাদুরী! ওই নে ঘণ্টা পড়ে গেল। ভোঁদারামের লাফ দেখবি ত যা দৌড়ে', বলে সার্কাসের মালিক টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে দুটো হাই তুলে বলল, 'আমার আবার লাস্ট ট্রিপের খেলা! 'জয় মা' 'জয় মা' বলে কপালে বার দুই হাত ঠেকাল সে! কারু দেখল তখনও তার পেছনে সিংহের ল্যাজটি দিব্যি নড়বড় করছে!

সার্কাসের মালিক আবার সিংহ সেজে তাঁবুর ভেতরে গেল। যাবার আগে কারু'র মুখের কাছে মুখ নিয়ে 'হালুম' করে ওঠে। কারু হেসে ফেলল। তার আর খেলা দেখতে ভাল লাগছিল না। মামাকে এসব বলার জন্য সে হাঁসফাঁস করছিল। খিদে-টিদে ভুলে সে এখন দৌড় দিল বাড়ির দিকে।

১৩৭৭

হাবুলের বুদ্ধি

রঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

নবীনবাবু খেতে বসেছেন। নবীনবাবুর আবার খাওয়ার শেষে একটু দৈ খাওয়া অভ্যেস। দৈ-এর ভাঁড়টা কিরণবালা পাতের পাশে রেখে যেতেই বাড়ির পোষা বেড়ালটা মুখ দিল।

সে দৈ খাওয়া চলে না, তাই কিরণবালা বাড়ির চাকর হাবুলকে ডেকে তার হাতে একটি টাকা দিয়ে বললেন, 'সামনের দোকান থেকে এক টাকার দৈ নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। দেরী করিসনে।'

'আচ্ছা। দেরী হবে কেন? এই আমি যাবো আর আসবো।'

গেট পর্যন্ত যেয়ে হাবুল দাঁড়িয়ে পড়লো। সেখান থেকে চেঁচিয়ে বললো, 'মিষ্টি দৈ আনব?'

কিরণবালা চেঁচিয়ে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

হাবুল সেই গেল, আর তার দেখা নেই। হাত চেটে চেটে এক সময় উঠে পড়লেন নবীনবাবু। দৈ খাওয়া তাঁর হল না।

বিকেল চারটের সময় যখন নবীনবাবু ঘুম থেকে উঠেছেন, হাবুল তখন ফিরলো খালি হাতে।

'কী ব্যাপার? এত দেরী হল কেন?' নবীনবাবু শুধোলেন।

হাবুল বললো, 'সামনের দোকানে মিষ্টি দৈ ছিল না। তাই ওরা বললো, শ্যামবাজার পাবি মিষ্টি দৈ। এত বেলায় ওখানে ছাড়া কোথাও মিষ্টি দৈ পাওয়া যাবে না। এই রাধাবাজার থেকে শ্যামবাজার যেতে বাস ভাড়া পঞ্চাশ পয়সা লাগলো। বাকি পঞ্চাশ পয়সার মিষ্টি দৈ দেবে না দোকানী। তাই ফিরে এলাম বাবু পয়সা নিতে।'

হাবুলের গলা শুনে কিরণবালা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'তোর আর মিষ্টি দৈ আনতে হবে না। বাকি পঞ্চাশ পয়সা ফেরত দে আমাকে? হতচ্ছাড়া পাজী ছেলে।'

হাবুল বললো, 'শ্যামবাজার থেকে বাসে ফিরতে সে পয়সাও ত বাস ভাড়ায় গেছে। হেঁটে এলে ত আরও দেরী হত ফিরতে।'

কিরণবালা বললেন, 'বুদ্ধির ঢেঁকি। যা, চান করে খেয়ে নে। আমাকে উদ্ধার কর খেয়ে নিয়ে।'

নবীনবাবু বললেন, 'আহা, অত রাগ করছো কেন। ওর যদি অত বুদ্ধি থাকতো, তাহলে ত অফিসেই চাকরী করতো।'

হাবুল চান করে খেতে বসলো। সে বুঝতেই পারলো না তার অপরাধ কোথায়!

কিরণবালার কোমরের যন্ত্রণাটা ক'দিন হল বেড়েছে। রাত্রে মোটেই ঘুমুতে পারেন না। ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার। ওষুধ আনা না হলে উপায় নেই!

নবীনবাবু বললেন, 'হাবুলকে পাঠাও না। ও ঠিক আনতে পারবে। আচ্ছা দাঁড়াও, আমিই ওকে বুঝিয়ে বলে দিচ্ছি।'

কিরণবালা বললেন, 'তাই দাও। আমার শরীরের যা অবস্থা, তাতে ডাক্তারখানা পর্যন্ত যাওয়া খুবই কষ্টকর।'

নবীনবাবু হাবুলকে ডেকে ওর হাতে পাঁচটি টাকার একখানি নোট দিয়ে বললেন, 'ডাক্তারবাবু যে ওষুধ লিখে দেবেন, সেই কাগজখানা ওষুধের দোকানে দেখাবি, বলবি, যা দাম লাগে কেটে নিয়ে বাকী পয়সা এই রুমালে বেঁধে দিন।'

'আচ্ছা', বলে হাবুল চলে গেল।

ডাক্তারবাবু সব শুনে ওষুধ দিলেন এক শিশি। বললেন, 'দাম এখন দিতে হবে না। দিনে চারবার খাবেন এই ওষুধ। প্রতিবারে দু'চামচ করে। বুঝলি? দু'দিনের ওষুধ দিলাম। পরশু এসে বলবি কেমন থাকেন।'

হাবুল বাজার থেকে ষোলখানা চামচে কিনে বাড়ি ফিরল। ওষুধ আর চামচেগুলো দিল কিরণবালাকে।

কিরণবালা ওষুধ আর ষোলখানা চামচে দেখে চমকে উঠে বললেন, 'এত চামচে আনলি কেন রে?'

'ডাক্তারবাবু বলেছেন।'

'ডাক্তারবাবু বলেছেন! কেন? অতগুলো চামচে দিয়ে কি হবে?'

হাবুল বললো, 'দিনে চারবার ওষুধ খাবেন। প্রতিবারে দু'চামচ করে। ওষুধ হল দু'দিনের। তা হলে ষোলখানা চামচেই ত লাগবে। আমি ষোলখানাই এনেছি। বেশী চামচে আনলাম কোথায়?'

১৩৮৫

www.BanglaBook.org

ছন্দ-যুদ্ধ

উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

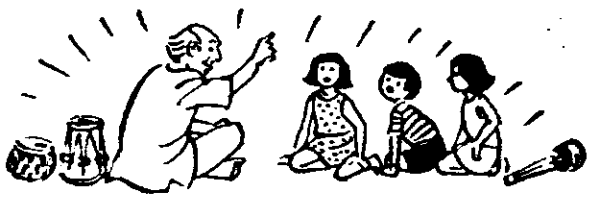

দাদু। আয় রে নমি আয় রে চাঁদু
চাঁদু। কী খেলা আজ খেলব দাদু?
দাদু। 'অগড়ুম বাগড়ুম ঘোড়াডুম সাজে'
নমি। পচা পুরনো একদম বাজে।
দাদু। (তবে) 'উলুকুটু ধুলুকুটু নলের বাঁশি'
চাঁদু। মান্ধাতা আমলের বিলকুল বাসি।
দাদু। (তা হলে) 'ইকির মিকির চাম চিকির'
খুকু। পুরনো খেলা খেলানোর ফিকির।
চাঁদু। দাদু! যখন তোমার দাদু
কিনুকে দুধ খেত
সেই সময়ের খেলা এসব
বিচ্ছিরি আর তেতো।
নমি। ওসব খেলা চলবে নাকো
নতুন খেলা চাই
দাদু। নতুন খেলা? তা হলে তো
ভাবিয়ে দিলি ভাই!
আদ্যিকালের মানুষ আমি
নতুন কি ছাই জানি
দাঁত পড়েছে চুল পেকেছে
দুই চোখেতে ছানি।
নমি। নতুন খেলা না জান তো
গল্প বলো তবে
খুকু। ভূত-পেত্নী শাঁখচুন্নীর
গল্প বলতে হবে।
দাদু। আচ্ছা তবে শোনো—
একটুখানি গল্প বলে
থামব আমি যবে
তোদের তখন গল্পটাকে
চালিয়ে যেতে হবে।
তারপরে ফের আমার পালা
করব আমি পেশ
এমনি করে গল্প-বলা
করতে হবে শেষ।

খুকু চাঁদু নমি। বেশ বেশ বেশ—
দাদু। এক যে ছিল ভূত
[আবৃত্তি] কান দুটো তার কুলোর মত
চোখ দুটো ঠিক চুলোর মত
(আর ঐ) হুলোর মতন মুখখানাতে
মুলোর মতন টুখ্
এক যে ছিল ভূত।
চাঁদু। শ্যাওড়া গাছে থাকত যে তার
শাঁখচুন্নী-পিসি
[আবৃত্তি] তালঢেঙা সে শুটকি ছিল
খ্যাংড়া চুলে ঝুঁটকি ছিল
সেই চুলে সে কলপ দিত
দাঁতে দিত মিশি
শাঁখচুন্নী-পিসি।
[প্রথমে আবৃত্তি পরে গান]
দাদু। হঠাৎ পিসি অকাপটাং
খুলুকে তাহার শ্রাদ্ধ
ভাঙা কাঁসর ঝালাই বাজে
ডিম্‌কুরাকুর বাদ্য।
নমি। বলোয়ারে রান্না করে
গন্না-কাটা ঠাকুর
ঝেলোয়ারি তরকারি সব
ফল-ফুলুরি-পাকুর।
চাঁদু। ইঁদুর দিয়ে লাউঘণ্ট
বাঁদর দিয়ে এঁচোড়
চামচিকে-চপ চাটনি ছুঁচো-
বেঙ-বেঙাচি-কেঁচোর
খুকু। হাতি-ভাজা হিপো-ভাতে
তিমি মাছের ছাই
(আর) শ্যাকশেয়ালীর মালাইকারি
তুলনা তার নাই।
(ও ভাই) তুলনা তার নাই।
দাদু। কেয়া মজাদার ভাজা

www.BanglaBook.org

[আবৃত্তি] বাঘ সিংহী ফালা ফালা
বেসম দিয়ে ভাজা
(ও ভাই) বেসম দিয়ে ভাজা।
নমি। উচ্ছিংড়ের চচ্চড়ি আর
কাঁকড়া বিছের টক
[প্রথমে আবৃত্তি পরে গান]
পচা মোষের পুরের ভাজা
খোশবায় ভকভক।
চাঁদু। নেমন্তন্ন খেয়ে ভূতের
পেটখানা জয়ঢাক
[আবৃত্তি] হুড়মুড়িয়ে ঘুমিয়ে প'ড়ে
জোরসে ডাকায় নাক।
দাদু। ফড়র্ ফড়র্ ফড়র্র্র্র্র্র্
গড়র্ গড়র্ গড়র্র্র্র্র্র্
[আবৃত্তি ও নাকডাকা]
ফট্ ফট্ ফুট্ টুস্স্স্স্স্
ভট্ ভটা ভুট্ টুস্স্স্স্স্
নমি। ফ-অ-অ-অ-ফোঁস্-স্-স্-স্
খুকু। ভ-অ-অ-অ-ভোঁস্-স্-স্-স্
দাদু। হুঁকো হাতে ঝিমুচ্ছিল
বেম্মদত্তি মামা
[আবৃত্তি] ইয়াব্বড় ভুঁড়িটা তার
হেঁড়েমুণ্ডু কুড়িটা তার
চমকে উঠে ধমকে বলে
থামা থামা থামা।
ওরে পাজী হতচ্ছাড়া
নাক-ডাকানি থামা
(নইলে) কান দুটো তোর পটকে দেব
চোখ দুটোকে চটকে দেব
ঘাড় গলা সব মটকে দেব
[আবৃত্তি] ঘষব নাকে ঝামা
কান-ফাটানো ঝড়-বওয়ানো
নাক-ডাকানি থামা।
দাদু। তেপান্তরের মাঠের ধারে
বদ্ধ জলার ওপর
[আবৃত্তি] এত্নিপুরের পেতনি ছিল
মাথায় পরে টোপর,
খুকু। সুড়ুত করে
গাছের থেকে
নেমে এল
চাঁদু। পুরুত ডেকে
ভূতের গলায়
মালা দিল
নমি। (আর) বিয়ের বাদ্যি
বেজে উঠল
ভোঁপর ভোঁপর ভোঁপর।
দাদু। এইবারেতে গুবগুবি আর
গীটার নিয়ে আয়
তালে তালে বাজিয়ে যাবি
ভুলিস নেকো তায়।
ছন্দ নিয়ে লুকোচুরি
ছন্দ নিয়ে হুড়োহুড়ি
ছন্দ নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি
হাসির কবিতায়।
চাঁদু। ঝট করে যা গুবগুবি আর
গীটার নিয়ে আয়।
[বাদ্য—গুবগুবি, গীটার, তবলা]
দাদু। ভাগ্যিস্! ডিম পাড়ে হাঁসেরা
[তবলা টুক্টুক্]
[প্রথমে আবৃত্তি, তারপর সংগত, তারপর গান]
তাই খায় প্লেট প্লেট
হাঁসডিম অমলেট
বুড়ো-বুড়ি খোকা-খুকু
ঘোষ বোস দাসেরা
ভাগ্যিস্! ডিম পাড়ে হাঁসেরা
[তবলা টুক্টুক্]
সাব্বাস্ সাব্বাস্ সাব্বাস্
চাঁদু। সাব্বাস্ সাব্বাস্ সাব্বাস্ বাস্রে
শোন্ ভাই হাঁস রে
শোন্ ভাই হাঁস।
দাদু। হুড়মুড় দুড়দাড়
ডিম পাড় এন্তার
এন্তার ডিম পাড়
বা-রো-মাস
শোন্ ভাই হাঁস
খুকু। কিন্তু ধরো
হঠাৎ যদি
কাল থেকে
[গুবগুবাগুব্ বাদ্য]
হাঁসের রাজা
হাঁসগুলোকে
কন ডেকে
[গুবগুবাগুব্ বাদ্য]
দাদু। কিংবা যদি মুৎফরক্কা
আইন করেন পাস
কাল থেকে কেউ ডিম পেড়ো না
ডিনটি পুরো মাস—
খুকু। কী মুস্কিল তাদের?
অমলেট না খেলে পরে
পেট ভরে না যাদের?
[গুবগুবি বাদ্যলহর]
নমি। বুড়ো-বুড়ি
খোকা-খুকু
খাবে কী?
[টুকটুক-তবলা]
খুড়ো-খুড়ী
মামা-মামী
শেষে মারা যাবে কি!
খাবে কী?
[টুকটুক-তবলা]

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুকু। কেমন করে
থাকবে বেঁচে
ঘোষ বোস আর দাসেরা
[প্রথম আবৃত্তি, পরে গুবগুবি বাদ্য আবৃত্তির তালে তালে]
হঠাৎ যদি
কালকে থেকে
ডিম না পাড়ে হাঁসেরা?

দাদু। হাঁসেদের তোশামোদ
করিতাম না
ডিম তারা না পাড়িলে
মরিতাম না।
যদি ঘোড়ায় পাড়িত ডিম
খেতাম ঘোড়ার ডিম।

চাঁদু। সস্‌প্যানে ভাজিতাম
মাথা করে হেঁট
ছ্যাকরা ঘোড়ার ডিমে
ডবল অমলেট।

দাদু। এইবারেতে
উচ্চাঙ্গের গান
মানে, ওস্তাদি ও উচ্চাঙ্গের
কবিতা ও গান
ঝট্‌ করে যা মৃদঙ্গ আর
তানপুরোটা আন।

দাদু। তেরেনা দেরেনা দেরে
দ্রিম্‌তানা দেরেনা
প্যালারাম গান গায়
কাছে কেউ ভেড়ে না।

চাঁদু। দ্রিমিকি দ্রিমিকি দেরে
গায় প্যালা গলা ছেড়ে

দাদু। তা ধিন্‌ তা ধিন্‌ তানা
ধিন্‌ তানা তেরে না
গান গায় প্যালারাম
কাছে কেউ ভেড়ে না।

খুকু ও নমি। গান গায় প্যালারাম
[গানের সুরে] কাছে কেউ ভেড়ে না
গান গায় প্যালারাম
কাছে কেউ ভেড়ে না।

চাঁদু। প্যালারাম গান গায়
ক্যানা করে সঙ্গত
দাদুরা কার্ফা তালে
হরেক রকম গত।

দাদু। এও যত গলা ছাড়ে
ওর চাঁটি তত বাড়ে
সম লয় বোল তালে
চলে জোর কসরত
গান গায় প্যালারাম
ক্যানা করে সঙ্গত।

নমি ও খুকু। গান গায় প্যালারাম
ক্যানা করে সঙ্গত
[গানের সুরে] গান গায় প্যালারাম
ক্যানা করে সঙ্গত।

খুকু। এ চায় ও হার মানে
ও চায় এ হেরে যায়
দুজনারই জিদ ক্রমে
পলে পলে বেড়ে যায়।

নমি। হেনমতে শেষাশেষি
বেড়ে ওঠে রেশারেশি
সঙ্গীত থেমে যায় শুরু হয় যুদ্ধ।

চাঁদু। হুল্লোড় তোলপাড়
সারা পাড়া সুদ্ধ

নমি ও খুকু। হুল্লোড় তোলপাড়
সারা পাড়া সুদ্ধ
[গানের সুরে] হুল্লোড় তোলপাড়
সারা পাড়া সুদ্ধ

দাদু। প্যালাকে ধরিয়া ক্যানা—
মারে তিন গাট্টা
ক্যানাও প্যালার পিঠে
চাট্‌ মারে আটটা

চাঁদু। বাঁয়া ডাঁয়া তানপুরো
তছনছ গুঁড়ো-গুঁড়ো
টেবিলের পায়া ভাঙে
ভেঙে পড়ে খাটটা

দাদু। পুলিশ আসিয়া পড়ে
ইয়া গালপাট্টা

নমি ও খুকু। পুলিশ আসিয়া পড়ে
ইয়া গালপাট্টা
[গানের সুরে] পুলিশ আসিয়া পড়ে
ইয়া গালপাট্টা

দাদু। ক্যানা কয় প্যালা আর
মানে কাজ নাই রে!
প্যালা কয় ক্যানা ঠিক
বলেছিস ভাই রে।

চাঁদু। হয়ে গেছে বাড়াবাড়ি
চল্‌ যাই তাড়াতাড়ি
হোটেলেতে গিয়ে চপ-
কাটলেট খাই রে।

দাদু। হতাশ পুলিশম্যান
চলে যায় বাইরে,

নমি ও খুকু। হতাশ পুলিশম্যান
চলে যায় বাইরে,
[গানের সুরে] হতাশ পুলিশম্যান
চলে যায় বাইরে।

১৩৬৮

www.BanglaBook.org

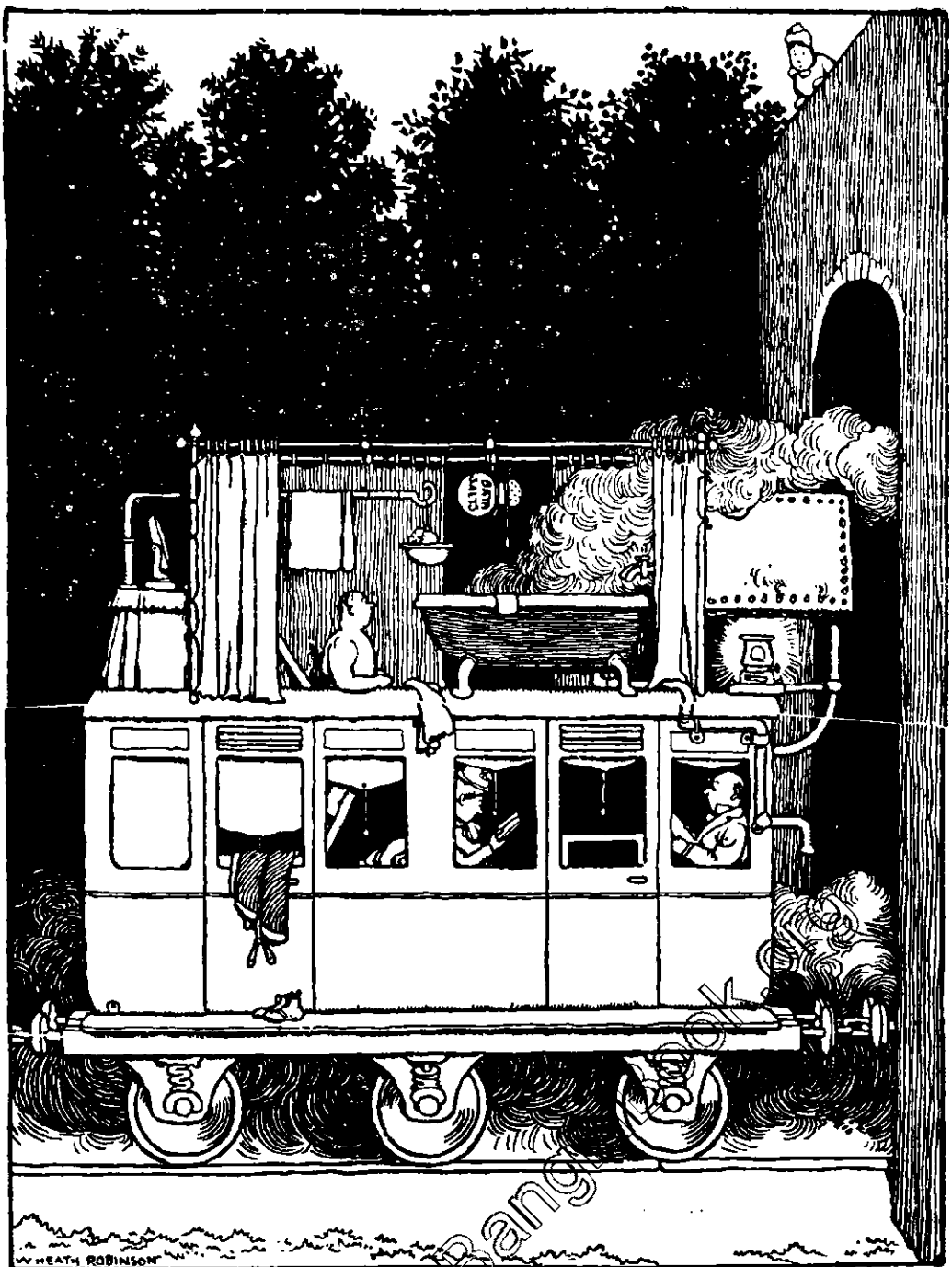

রেলকোম্পানি অনেক খাটিয়ে ব্রেন
চালু করে দিল ডবল-ডেকার ট্রেন।

www.BanglaBook.org

ক্রিকেট খেলার খোশ গপ্পো

সুজয় সোম

খবরটা শেষ পর্যন্ত আর গোপন থাকল না। ভারতীয় ক্রিকেট তারকাদের দেখতে তাই ভরসন্ধেবেলাতেও দমদম এয়ারপোর্টের ডোমেস্টিক লাউঞ্জের বাইরে উপচে পড়া ভীড়! তার ওপর যা আপ্যায়নের ঘটা। দেখে-শুনে শ্রীমতী কবিতা বিশ্বনাথ প্রায় মুচ্ছো যান আর কি! শুধু বেঙ্গসরকার, ঘাড়ঝুড়ি কিম্বা গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথকেই নয়, কবিতাকেও বড্ড জ্বালালেন অটোগ্রাফ শিকারীরা। কিন্তু কবিতার দাদা ডোরাকাটা স্পোর্টস গেঞ্জি পরা সুনীল মনোহর গাভাসকর অকাতরে অটোগ্রাফ বিলোলেও, বেজায় চটলেন ফোটোগ্রাফারদের ওপর। সুনীলের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ন নাকি বলেছেন, অত ঘন ঘন ফ্লাশ জ্বেলে ফোটো তুললে ওঁর চোখের বারোটা বেজে যাবে খুব শিগ্‌গিরি। অথচ ফোটোগ্রাফাররা শুনবেন না! 'টুরিস্ট কোচে' চেপে হোটেলে পৌঁছাবার কিছু পরেই আবার হাওড়া স্টেশনে ছুটলেন গাভাসকার, স্ত্রী মারসুনিলকে রিসিভ করতে। সেখানেও জন-অরণ্য। ভীড়ের মধ্যে এক কিশোর তাঁকে কী যেন দেবার জন্যে ছটফট করতে লাগল। কিন্তু পুলিশেরা কিছুতেই এগুতে দেবেন না ছেলেটিকে। সে দৃশ্য চোখে পড়াতেই সানি বললেন, 'ওকে ছেড়ে দিন। আসুক না।' বড্ড খুশি হয়ে ছুটে এসে সেই কিশোর লাল টুকটুকে একটি আপেল হাতে দিতেই মুচকি হেসে সুনীল বললেন, 'এখন পকেটে থাক। পরে খাব।'

পরদিন সকালে মাঠেও গেলেন ভারি খোশ মেজাজে। নেট-প্র্যাকটিশ করতে নেমেই লাইন করিয়ে দলের খেলোয়াড়দের দাঁড় করিয়ে এক ফটোগ্রাফারকে ডেকে বললেন, 'না, না, ব্যাটিং অর্ডারে নয়। হাইট অর্ডারে দাঁড়িয়েছি আমরা। নাও, ছবি তোলো।' সাটার টেপার ঠিক আগে একেবারে গোয়েন্দা ফেলুদার মতো একপেশে হাসি হেসে বলে উঠলেন, 'স্মাইল...।' সদ্য পূর্বাঞ্চলের কাছে হেরে এলেও অস্ট্রেলীয় খেলোয়াড়রাও দিব্যি হাসিখুশি। সবাই মিলে অনুশীলন চালালেন অনেকটা সময়। প্রথমে কিছুটা দৌড়-ঝাঁপ। তারপর প্ল্যাস্টিক সসার লোফা-লুফি। শেষে ক্যাচ প্র্যাকটিস।

খেলার প্রথম দিন—১৯৭৯ সালের ২৬শে অক্টোবর—সকাল সাড়ে আটটায় প্রায় একই সঙ্গে দু-দলের খেলোয়াড়েরা পৌঁছালেন ইডেনে। ক্লাব হাউসের সামনে 'টুরিস্ট কোচ' থেকে নেমেই এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে গাভাসকার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'স্টপ হিম, স্টপ হিম। ডোন্ট অ্যালাউ হিম টু এনটার।' গেটের পুলিশ অফিসারের হাতে অমনি সে ভদ্রলোক গ্রেপ্তার। হো-হো করে হেসে উঠলেন সানি। ভদ্রলোক তাঁর দলেরই লোক্যাল ম্যানেজার প্রাণতোষ চ্যাটার্জী। ব্যাপারটা নিছকই লেগ পুলিং।

গাভাসকার টসে হেরে গেলেন। অগত্যা সারাদিন কাঠ-ফাটা রোদে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফিল্ডিং করতে হলো। পিচ মোটেই বিষাক্ত না। বোলিংয়ের ছোবলও নিতান্তই মামুলি। ওদের রান উঠে গেল দু-উইকেটে ২২৭। অবিশ্যি খেলার শুরুতেই নাটক। দর্শকরা নিজেদের সিটে গুছিয়ে বসবার আগেই কপিলদেবের নির্ভেজাল আউট-সুইংগারে খোঁচা মেরে হিলডিচ কুপোকাৎ। অস্ট্রেলিয়ান শিবিরে শিহরণ! ড্রেসিং-রুমের টেলিভিশনের সামনে বসা দলনায়ক কিম হিউজ রীতি-মতো উত্তেজিত। অন্য খেলোয়াড়দের চাপা উৎকণ্ঠা। তারপরেই মাঠের মধ্যে অ্যালান বর্ডার আর গ্রাহাম ইয়ালপের দাপট দেখে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখগুলো নিমেষে খুশিতে ডগমগ! চারটে বেজে পাঁচ মিনিট গতে ইয়ালপের সেঞ্চুরি। অমনি ইডেনের আশী হাজার দর্শক অভিনন্দন জানালেন করতালিতে, পটকায়। পটকার শব্দে আঁতকে উঠে হোয়াটমোর জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা ক্র্যাকার ফাটাচ্ছে কেন! রাগ করে নাকি?'

দ্বিতীয় দিন হাল্কা ব্রেকফাস্ট সেরে মাঠে গেলেন ভারতীয়রা। ছ-সাতটা করে এগ-পোচ কিম্বা হাফ বয়েলড, সেইসঙ্গে চিকেন স্যান্ডউইচ আর কফি। আগের দিন রাত্রে সামান্য জ্বর হয়েছিল কপিলদেবের। তাই দ্রুত কয়েকটি ম্যাসাজ নিয়ে ফিট্ করে নিলেন নিজেকে। ম্যাসাজের সময় আচমকা চেঁচিয়ে উঠলেন: 'আরে ভাই, এরা যে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে!' মাঠে এসেই অস্ট্রেলিয়ান ম্যানেজার বব মেরিম্যান চুইংগাম বিলোলেন সকলকে, এমনকি দু-একজন দর্শককেও। ১১৪ রানে অপরাজিত ইয়ালপ ব্যাট করতে যাবার সময় বে-খেয়ালে হেড গিয়ারটি ফেলে যাচ্ছিলেন। জিওফ লসন সেটি দেবার জন্যে তাঁকে ডাকতেই এক দর্শক বলে উঠলেন: 'পিছু ডাক! ইয়ালপ এখুনি ফিরছেন তাহলে।' কথাটার ইংরিজি তর্জমা শুনে হেসে ফেললেন অস্ট্রেলিয়ানরা। ইয়ালপ শেষপর্যন্ত ফিরলেন ১৬৭ রান করে!

লাঞ্চের সময়ে ভারতীয় শিবির বেজায় থমথমে। তরতর করে রান যে বেড়েই চলেছে! গুমোট কাটাতে হিন্দি ফিল্মের গান ধরলেন বেঙ্গসরকার আর চেতন চৌহান। ভারি মিষ্টি গলা দুজনেরি। তার মধ্যেই হঠাৎ সকলকে অবাক করে দিয়ে কপিল-দেব পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলেন, 'আমি ঝুল খাব।' দুই লোক্যাল ম্যানেজার আর ড্রেসিংরুম-ইনচার্জ থ! ঝুল...! সেটি আবার কি বস্তু...! তারপরেই একজনের মনে হলো, ঝুল মানে ঝোল নয়তো? ঠিক তাই, বাঙালীরা পাতলা ঝোলে পাতি-লেবু টিপে খেয়ে দিব্যি শরীর ঠাণ্ডা রাখেন শুনে কপিল খেতে চাইছেন। তখুনি অবিশ্যি 'ঝুল' পাওয়া গেল না। পাঁচ-ছয় গ্লাস ঘোল খেলেন। মহিষের দুধ খেতেও বড্ড ভালোবাসেন

www.BanglaBook.org

কপিল। জিজ্ঞেস করতেই বললেন, 'দিনে চার-পাঁচবার বড় বড় গ্লাস ভরে দুধ খাই। ভেজাল মেশানো না, একেবারে খাঁটি দুধ। আমাদের বাড়িতে দু-তিনটে মোষ আছে।' খাওয়া-দাওয়া সেরেই এক খিলি পান চেয়ে নিয়ে মুখে পুরবার আগে ফিক্ করে হেসে গাভাসকার জিজ্ঞেস করলেন, 'জর্দা-টর্দা নেই তো?'

তিনটে বাহান্ন মিনিটে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ। মন্দ ফিল্ডিংয়ের ফাঁক গলে ৪৪২ রানের শাসানি। কিন্তু ভারতীয় ইনিংসের শুরুতেই দুর্ঘটনা। রডনি হগের বলে গাভাসকার লেগ বিফোর উইকেট। অমনি নব্ ঘুরিয়ে ড্রেসিং-রুমের টেলিভিশন বন্ধ করে দিলেন কিরমানি। লসন আর পোর্টার নেচে নিলেন একরাউন্ড। গম্ভীর মুখে প্যাভিলিয়নে ফিরে একটা লম্বা সোফায় গা এলিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থেকে, একসময়ে ড্রেসিংরুমের বিষণ্ণতা কাটিয়ে গাভাসকার বলে উঠলেন, 'কাম অন বয়েজ। নার্ভাস হয়ো না। দিস ইজ্ ক্রিকেট।'

তৃতীয় দিনের খেলা শুরু হতে তখনো কিছুটা দেরি। ক্লাব হাউসের সামনে আচমকা বিশ্বনাথের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল এক কিশোর: 'জয় বাবা বিশ্বনাথ! এখন তুমিই ভরসা। সেঞ্চুরি চাই, সেঞ্চুরি।' দেখে-শুনে কারসন ঘাউড়ি মন্তব্য করলেন: 'ওহ, রিয়েলি! পিপ্‌ল আর ফ্যানটাসটিক হিয়ার।' একটু পরেই শুরু হলো ঢিমেতালের বিরক্তিকর ক্রিকেট। ভারতীয় ইনিংস ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল না। তবু মুভি ক্যামেরা বের করে বল-টু-বল ছবি তুললেন পোর্টার। শর্টস্ পরে খালি গায়ে 'দ্য ফাউনটেন হিরো' বইটি পড়া শেষ করেই গাভাসকার সাদা প্যান্টের ওপর গাঢ় সবুজ গেঞ্জিটা চাপিয়ে ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে খেলা দেখলেন কিছুক্ষণ, মনসুর আলি পাতৌদির পাশে বসে। লাঞ্চের পরেই কিন্তু পত্রপাঠ ঘুমের দেশে। লোক্যাল ম্যানেজারদের সঙ্গে ঘাউড়ি-কপিলদেব জমালেন আড্ডা। এক সময়ে ঘাউড়ি বলে উঠলেন, 'কপিল হলো কলকাতার হিরো।' অমনি বাধা দিলেন কপিল: 'আরে না, না। কলকাতার ছোটরাই আমার বেশি ফ্যান। ওরা আমাকে বলে 'গুরু।' হিরো হলে তুমি। তোমার কেমন হিরো হিরো চেহারা।'

বিরতির দিন মাহিন্দর অমরনাথ, নরসিমা রাও, কারসন ঘাউড়ি আর অরুণলাল, সেইসঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার অ্যান্ড্রু হিলডিচ এবং ব্রুস ইয়ার্ডলি ইডেনে প্র্যাকটিস করলেন কিছুক্ষণ। আবার দু-দলের অনেকেই কখনো হোটেলের সুইমিং পুলের ধারে রোদে গা এলালেন, কিম্বা তাস খেললেন। কখনো বা ডাইভ দিয়ে পড়লেন জলে। গাভাসকার আগে থেকেই ঠিক করে রেখে-ছিলেন এদিন সকালে গঙ্গায় গিয়ে স্নান করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ইচ্ছে করল না। লোক্যাল ম্যানেজারকে বললেন, 'না বাবা! গঙ্গা চান-টান করে কাজ নেই। শেষে যদি ডুবে যাই!' তবে মার্কেটিংয়ে বেরোলেন প্রায় সকলেই। নানান কিছু কেনা হলো। তার মধ্যে ঘাউড়ি, কপিলদেব, বিশ্বনাথ আর কিরমানি কিনলেন একগাদা ফ্যাশান্যবল চটি। এক ফাঁকে ভারতীয় দলের ম্যানেজার মান সিং পুজো দিয়ে এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

ঊননব্বই রানের মাথায় বাঁ-হাতের কনুইয়ে 'টেনিস এলবো' নামক যন্ত্রণাদায়ক ব্যথায় কাতর হয়ে রীতিমতো সেট ব্যাটস্‌ম্যান দিলীপ বেঙ্গসরকার মাঠ ছেড়েছিলেন আগের দিন। দলপতি গাভাসকারও ওকে তখন বলেছিলেন, 'সেঞ্চুরি না করে চলে এলে?' সে ভুলের মাসুল কড়ায়-গন্ডায় গুনে দিলেন চতুর্থ দিনে এক বলে আউট হয়ে। মাত্র চার রানের জন্যে বিশ্ব-

নাথের হাতের মুঠো থেকেও সেঞ্চুরি পিছলে গেল। কপিলদেব আউট হবার সঙ্গে সঙ্গে দু-টাকার নোটে গাঁথা একটা মালা নিয়ে বেড়া টপ্‌কে মাঠে ঢুকে পড়লেন এক যুবক। অবিশ্যি কপিলের কাছে পৌঁছবার আগেই সে বেচারা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার! এক পুলিশ অফিসার ঠাট্টা করে বললেন, 'দু-টাকার নোটের মালা কপিল নেন না। একশো টাকার নোট চাই।' অমনি পকেট থেকে একগাদা একশো টাকার নোট বের করে ফেললেন ছেলেটি।

ঠিক একটা পঁয়ত্রিশে ৩৪৭ রানে ভারতীয় ইনিংস চুকল। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে জরুরী পরামর্শ সেরে ব্যাট বাগিয়ে মাঠে নামলেন হিলডিচ আর ইয়ালপ। কিন্তু চা-পানের পরই নাটকের রীতিমতো ক্লাইম্যাক্স। একের পর এক আউট। ঘাউড়ির বলে উই-কেট ভাঙল। ইডেন বিরাট এক লম্ফ দিয়ে উত্তেজনার চূড়োয় উঠে বসল। কারো প্যাডে বল লাগলেই আশী হাজার দর্শকের কোরাস: 'হাউজ দ্যাট।' কান্ড দেখে লসন বলেই ফেললেন, 'আমরা খেলছি এগারো জনে। ওরা আশী হাজার এগারো জন।' খেলার শেষে ভারতীয় শিবিরে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে দেখে গাভাসকার বললেন, 'মিঃ রে, সিদ্ধার্থের ছেলে উইকেট ভাঙতে দেখেছেন কখনো?' তারপর সেদিন দু-তিন সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে চাপাস্বরে কথা বলে ডাক-লেন ঘাউড়িকে: 'কিট, তোমায় ডাকছেন মিঃ রে। কী যেন উপহার দিতে চান।' কারসন হাসিমুখে এসে দাঁড়াতেই সিদ্ধার্থবাবু তাঁর হাতে তুলে দিলেন সেই ভাঙা উইকেটের তিনটি টুকরো। ড্রেসিংরুম ছাড়ার সময়ে সিদ্ধার্থবাবু বলে গেলেন, 'সানি, কাল তোমার সেঞ্চুরি দেখতে আসব।' রাত্তিরে গোটা অস্ট্রেলিয়ান দল ডিনার সারলেন দিলীপ দোশির বাড়িতে।

শেষ দিনের খেলা একঘণ্টা গড়াতে-না-গড়াতেই ছয় উই-

www.BanglaBook.org

কেটে ১৫১ রানে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দিলেন হিউজ। প্যাভেলিয়নে ফেরার পথে তাঁর 'স্পোর্টিং' মনোভাবের জন্যে সোচ্চার হাততালিতে তারিফ জানালেন দর্শকরা। ড্রেসিংরুমে ঢুকেই হিউজ বললেন, 'ওয়ান্ডারফুল। এত ভালো দর্শক কোথাও পাইনি।' একশো সাতাশী মিনিট, সেই সঙ্গে ম্যান্ডেটারি কুড়ি ওভারে ২৪৭ রান তোলার রীতিমতো স্পর্ধিত চ্যালেঞ্জ!

গাভাসকার অ্যান্ড কোং আলোচনা করে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে ফেললেন। শুরুটা মন্দ হলো না। লাঞ্চের আগের সাঁইত্রিশ মিনিটে কোনো উইকেট না-খুইয়ে রান উঠল তেইশ। কিন্তু লাঞ্চের পরে খেলা খানিকদূর গড়াতেই ছন্দপতন। গাভাসকার, বিশ্বনাথ প্যাভেলিয়নে ফিরলেন। পাঞ্জাবী রাগী যুবক যশপাল শর্মা এরপর ভারি হিংস্র হয়ে উঠলেন। হুড়মুড় করে বাউন্ডারির পর বাউন্ডারির ঔদ্ধত্য! তারি ফাঁক-ফুকরে চুরিও করলেন এন্তার খুচরো রান। স্পিন-পেস-সিম তছনছ। গনগনে রোদ্দুরে ইডেন উত্তেজনায় ফুঁসতে লাগল টগবগ করে। যেন 'রহস্য-রোমাঞ্চ' সিরিজের কোনো লোমহর্ষক, শ্বাসরুদ্ধকারী, বুক তোলপাড় করা উপন্যাসের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন সকলে। কিম্বা দেখছেন হিচককের ছবি। তিন ঘণ্টা দুর্গ আগলে বিদায় নিলেন বিশ্বস্ত রাজপুত চেতন চৌহান। এলেন নরসিমা রাও।

বিকেল চারটে উনিশ মিনিট। ম্যান্ডেটারি ওভারের বাইশ বল বাকি। ভারতের রান চার উইকেটে ২০০। যশপাল অপরাজিত ৮৫। আচমকা অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স। যশপাল আলো কমের আবেদন জানালেন। অস্ট্রেলিয়ান দলনায়ক বললেন, 'ব্যাটিং সাইড খেলতে না চাইলে আমাদের আপত্তির কি আছে?' তক্ষুনি ফুরিয়ে গেল পঞ্চম টেস্ট! ইডেনের স্কোরবোর্ডটিকে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো দেখাল।

কিন্তু ব্যক্তিগত ও জাতীয় মর্যাদালাভের জন্যে বাইশ বলে ৪৭ রান যোগাড় করা খুব কঠিন কাজ কি? যশের দাপটে ততক্ষণে অস্ট্রেলীয় বোলিং তো বিধ্বস্ত! খেলার শেষে যশ বললেন, 'আসলে হগ বাম্পার দিয়ে মারতে চাইছিল। আমার শরীর এমনিতে খুব ভালো না। পেটে এখনো একটা পেন হচ্ছে। তবু ঠিক করেছিলাম ওকে বেপরোয়াভাবে হুক করব। কিন্তু নরসিমা বলল, 'যশ, বল দেখা যাচ্ছে না। চোট লাগতে পারে।' তারপরেই আমরা না-খেলার সিদ্ধান্ত নিলাম।'

১৩৮৬

ব্যাঙ রোগী আর বদ্যি শেয়াল

সুবীর চট্টোপাধ্যায়

ব্যাঙ। গ্যাঙোর, গ্যাঙোর, গ্যাঙ।
ছুঁচোয় দিলো ল্যাঙ,
মুচড়ে গ্যাছে ঠ্যাং।
বাপরে, মারে, গেলাম মরে,
বাঁচাও, বাঁচাও ভাই।
বদ্যি বাড়ি হেঁটে যাবার
শক্তি আমার নাই।

ইঁদুর। চকর, চকর চল,
কি হয়েছে, বল।
আনছি আমি বদ্যি ডেকে
বদ্যিবাটির বাজার থেকে।

ব্যাঙ। গ্যাঙোর, গ্যাঙোর, গা,
পা চালিয়ে যা।
বাপরে, মারে, মরে গেলুম হায়,
আজকে আমার প্রাণটা বুঝি যায়।
গ্যাঙোর, গ্যাঙোর ; গায়,
বদ্যি নিয়ে আয়।

শেয়াল বদ্যি। হুক্কা-হুক্কা-হুক।
কেয়া হুয়া, পা ভেঙেছে?
আহা রে চুক, চুক।
হাঁ কর তো, জিভটা দেখি তোর,
দেখি কেমন গলায় আছে জোর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বল্লখানা আনতে পাঠাই
দেখতে হবে বুক।

ব্যাঙ। গ্যাঙোর, গ্যাঙোর, গ্যাঙ,
ছুঁচোয় দিলো ল্যাং।
বদ্যি মামা, দারুণ জোরে
মুচকে গ্যাছে ঠ্যাং।

শেয়াল বদ্যি। হুক্কা-হুয়া-হয়,
রোগটা সহজ নয়।
ইংরেজী নাম, দারুণ জটিল,
তাই তো আমার ভয়।

ব্যাঙ। গ্যাঙোর, গ্যাঙোর, গা,
আর যে বাঁচি না।
এবার বোধ হয় মরেই যাবো,
ঠাকুর ভগবান।
পাঁচশো গেঁড়ি মানত করি,
বাঁচাও আমার প্রাণ।

শেয়াল বদ্যি। হুক্কা-হুয়া, হুক্কা-হুয়া, হুক্কা-হুয়া হাই,
চিৎ হয়ে শোও, পেটটা তোমার
কাটতে হবে ভাই।
মুণ্ডুখানায় ছিদ্র করে
ঢালতে হবে পাঁক।
গলায় তোমার বাঁধবো দড়ি,
বন্ধ করো ডাক।

ব্যাঙ। গ্যাঙোর, গ্যাঙোর, গাঁক,
চিকিচ্ছে মোর থাক।
বদ্যি না ছাই, খুনে ব্যাটা,
বাঁচতে যদি চাই
এক লাফেতে এখান থেকে
পুলিশ পাড়া যাই।

শেয়াল বদি। হুক্কা-হুয়া হৈ,
আরে, আরে, একি ব্যাপার, রোগী গেল কই?
অপারেশন করবো বলে
করছি ছুরি ঠিক,
এমন সময় রোগী আমার
পালালো কোন দিক?
ইঁদুর ছুঁচো, কোথায় আছিস, দৌড়ে তোরা আয়,
খোঁড়া পায়ে, রোগী আমার ঐ পালিয়ে যায়।

ব্যাঙ। গ্যাঙোর, গ্যাঙোর, গাপ,
আবার দিলাম লাফ।
আজকে আমার প্রাণটা যেতো
মারতে গিয়ে ঠ্যাং।
দারুণ বাঁচা বেঁচে গেছি,
গ্যাঙোর গ্যাঙোর, গ্যাঙ। ১৩৭১

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেলা শেষের বাঁশী

ধূর্জটিপ্রসাদ দত্ত

শেষ বিকেলের হলুদ আলো গড়িয়ে গেল চিকন পাতা ছেয়ে
জল ভরতে পুকুর ঘাটে কলসী কাঁখে এলো গাঁয়ের মেয়ে,
সিঁদুর আমের লালঝুরি রঙ রঙিয়ে গেছে নীল আকাশের পাড়ে
বনহিজলের কাঁধ ডিঙিয়ে সুরুযমামা বাউরী নিশান নাড়ে।
বাঁশের আগায় নীলকণ্ঠ ঠিক যেন এক ছবির মতো বসে
দিন চলে যায় শ্যামার গানে বাতাস লেগে ঝাউয়ের পাতা খসে।
বোষ্টমী তার একতারাতে গুণগুণালো কোথায় আপন মনে
আলটপ্‌কা ঝাপসা ছায়া জমছে ঘন ঘুপচি ঝোপের কোণে,
বোঝাই খড়ের গাঁটরি পিঠে সার বেঁধে যায় ঝিমিয়ে গরুর গাড়ি
হাট পেরিয়ে খানিক পরে উজানগুলি উজিয়ে দেবে পাড়ি।
ঝাপটে ডানা বাউল বকের দল উড়ালি দিল মেঘের সাথে
সন্ধ্যে হল—শ্বেতপালকের লেখন দিয়ে লিখল বুঝি তাতে!
ইঁটখোলাতে চুল্লী জ্বলে—হালকা ধোঁয়ায় আবছা পটের লেখা
ময়না নদীর কাশফোটা চর দোলাই সাঁকো যায় না যেন দেখা।
চকমকিয়ে জোনাক পোকা পান্না মুঠো ছড়ায় রাশি রাশি
ঘরবিবাগী শুনলো একা পাহাড়তলির মন-ভোলানো বাঁশী।
এমনি সাঁঝে চাঁদের বাতি জ্যোছনাতে ঘর দেয় যদি না ভরে—
পথ-হারানো পথিক বলো বিন্‌-পিদিমে ফিরবে কেমন করে?

১৩৮২

নিজের পাড়ায়

নির্মলেন্দু গৌতম

নিজের পাড়ায় বীরত্ব তার
কেবল ডাকাডাকি,
অন্য কুকুর ঢুকবে পাড়ায়
সাধ্যি আছে নাকি?

এমনি করে ধমকে বেড়ায়
ঠিক যেন সে রাজা
ইচ্ছে হলেই পারবে দিতে
যেমন খুশি সাজা।

অন্য পাড়ায় যেই গেল সে
অমনি বড়ো বড়ো
অন্য কুকুর দেখলো সেথায়
ভয়েই জড়োসড়ো।

আর তো রাজা নয় সে এখন
এইখানে সে প্রজা
ল্যাজ নামিয়ে ছুট দেবে সে
নিজের পাড়ায় সোজা!

১৩৭৬

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

জীবন সর্দার

আকন্দি

আকন্দি—টুটুনের সখের পোকা। আকন্দ গাছে পেয়েছে বলে পোকাটার নাম রেখেছে—'আকন্দি'। টুটুন ইন্দা গ্রামের প্রকৃতি পড়ুয়া।

মেদিনীপুর খালটার ধারে গ্রামটার নাম জিনসহর। সেখানে বেড়াতে গিয়েছিল টুটুন শ্রাবণ মাসের এক তারিখে। খালের ওপর বাঁশের সাঁকো, তার কাছে যেতে গিয়ে আকন্দ ঝোপটায় তার চোখ আটকে গেল। সাঁকোর দিকে গেল না সে, ঝোপের দিকে গেল। পায়ে পায়ে সবুজে হলুদে রঙগীন পোকাটা টুটুনের হাত এড়িয়ে পিছিয়ে গেল। সামনের দিক থেকে ধরা গেল না। পেছন দিক থেকে পাতা সমেত একটি পোকা তুলে নিয়ে ব্যাগে ভরে নিল। তারপর, আরে একি! বড় বড় আরো দুটি এক পাতাতেই। সে দুটিও পাতাসহ চলে এল ব্যাগে। ঘরে ফেরার আগে, মুঠি করে পাতা থেকে আর একটি তেমন পোকা ধরে ফেলল সে। ধরার আগে পোকাটি উড়লো না, পাতা থেকে পাতায় লাফাল। আর একবার লাফাতেই টুটুনের মুঠোর ক্যাচ হয়ে গেল।

সেই সন্ধ্যায় টুটুনের বাড়িতে সুমনি এল পোকাগুলো দেখতে। টুটুনের খেলার সাথী সুমনি।

একটা কাগজের বাকসে পোকাগুলো রেখেছিল টুটুন। বাকসের চারপাশে ছোট ফুটো করে হাওয়া যাবার রাস্তা করে দিয়েছিল। একটা আতস কাচ নিয়ে বাকসের ঢাকনা তুলে দুজনে ঝুঁকে পড়ল। দুজনের আলাপঃ

কি পোকা রে?

ফড়িং।

ফড়িং! ডানা কোথায়, চারটে ডানা?

বলতে না বলতেই, একটা পোকা বাকসের গা বেয়ে উঠে এল, লাফিয়ে মেঝেতে নামলো, তারপর উড়ে বসলো দেয়ালে।

ঐ তো ডানা, ঐ তো ডানা, চেঁচিয়ে উঠলো একজন।

অন্যজন বাকসের ঢাকনা বন্ধ করে পোকাটাকে ধরতে গেল। ধরা গেল না। নিমেষে পোকাটা জানালা দিয়ে ফুরুৎ। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথায় গেল কে জানে।

সে-রাতের মত পোকা দেখা বাতিল করে টুটুন বড়দের কাছ থেকে ঐ পোকাটার কথা কিছু শুনে নিল।

ঐ পোকাগুলো ফড়িং, তবে জলফড়িং নয়, তাই চারটে ডানা মেলে থাকে না। ওরা ঘাসফড়িং-এর জাত ভাই। বলা চলে পাতা ফড়িং। আকন্দ পাতার সাথে ওদের গায়ের রং-এর এমন মিল যে দূর থেকে সহজে নজর পড়ে না। ওদেরও চারটে ডানা। পাতলা দুটি, ভারি দুটি। পাতলা দুটি ঢাকা থাকে ভারি দুটি দিয়ে। ওড়ার সময় নজর পড়ে চারটি ডানাই আছে। ঘাসফড়িং-এর শুঙ্গ আছে, ওদেরও আছে। ঘাসফড়িং শক্ত ঠোঁট দিয়ে ফুঁড়ে ফুঁড়ে খাবার খায়, এরাও তেমনি করে খায়। কিন্তু ঘাসফড়িংদের কেউ কেউ আমিষ খাবার খায়, কেউ বা নিরামিষ। এই পোকাগুলো কি খায়? জবাব মিলল ক'দিন বাদে।

পরের পাঁচদিন পড়াশুনায় মেতে রইল টুটুন। পোকাদের ধারেকাছে গেল কি গেল না। শনিবার ঘুম থেকে উঠেই পোকার বাকস খুলে সে অবাক! বড় একটা পোকা মরে পড়ে আছে। তার গায়ের রং সবুজ আর নেই! নীল, ঘন নীল হয়ে গেছে! তার চেয়েও অবাক ব্যাপার, ছোট একটা ডানাহীন 'আকন্দি' খোলস ছেড়েছে! তার সুন্দর বড় বড় ডানা পিঠের উপর লেপটে আছে। টুটুন একটা হিসেব করলো—চারটের একটা উড়ে গেল, একটি গেল মারা। যে দুটি রয়েছে—তার একটি ছোট, তার পিঠে খুদি খুদি ডানা। অন্যটি বড়োসড়ো শক্তিমান। কি খেতে দেয়া যায়! কতটা দেয়া যায়!

দুটি আকন্দ পাতা, কচি দেখে, তুলে এনে রেখে দিল পোকাদের বাকসে। খাবার দেবার আগে, দুজনকে দুটো আলাদা বাকসে রেখে দিয়েছিল। সে চায়নি 'আকন্দিরা' নিজেরাই মারামারি করে শেষ হয়ে যায়।

পাতা দিতেই ধরা পড়ে গেল পোকা দুটো নিরামিষ খাবারের ভক্ত। ঢাকনা তুলে টুটুন ওদের খাওয়ার ভঙ্গি দেখে নিল। পাতার উপরে বসে একধার থেকে একমনে কুরে কুরে খেয়ে যাচ্ছে দুজনেই। দরজা বন্ধ করে কান পেতে পাতা খাওয়ার একটা আলতো শব্দ শোনা গেল কি গেল না। যাক, খেয়ে নিক ওরা ওদের খুশি মত। টুটুন গেল খেলতে।

এর পর থেকে একমাস টুটুনের খাওয়া পড়া খেলা ঘুম—চারটে কাজের সাথে আর একটি যোগ হল, 'আকন্দি'দের আকন্দ পাতা যোগানো। ঠিক একমাস বাদেই আর একটি দুঃখের ঘটনা ঘটলো।

পিঁপড়েদের সার আগের রাতেও পোকাদের বাকসের ধারেকাছে ছিল না। ভোরের আলো ঘরে ঢুকতেই টুটুনের নজরে এল, লাখো পিঁপড়ে একটা বাকস ঘিরেছে। ব্যাপার কী! সেই ছোট 'আকন্দি' পিঁপড়ের শিকার হয়েছে। ওটা তো বেঁচে

www.BanglaBook.org

আছে। তবুও পিঁপড়ে কেন? পোকাটার গাঁটে গাঁটে পিঁপড়ে। গলায়, চোখে, পেটে, পায়ের ভাঁজে, ডানার নিচে—সবখানে পিঁপড়ে। টুটুন আর কত পারে পিঁপড়ে ছাড়াতে। টুটুন একা, পিঁপড়েরা অনেক, পোকাটা উড়তে পারছে না। তারপর হায়, টুটুনের ছলছল চোখের সামনে পোকাটা কাত হয়ে পড়ে গেল। একটা প্রশ্ন রয়ে গেল টুটুনের মনে—পোকাটার কি হয়েছিল, কিসের গন্ধে পিঁপড়েরা এসে হাজির হলো!

একটা পোকা রইল। টুটুনের শেষ 'আকন্দি' ওটা। কিন্তু ওটা যে ডিম দিয়ে বাকস ভরে দেবে টুটুন জানত না। পরের রোববার বাকস খুলেই, সাদা সাদা সরু ভাতের মত রাশি রাশি 'আকন্দি'র ডিম দেখে সে অবাক মেনে গেল। খুশি মনে সবাইকে জানিয়ে দিল, ডিম ফুটে ছানা বেরোলে একটা করে 'আকন্দি' সবাই পাবে। কিন্তু একটা ছানাও টুটুন কাউকে দিতে পারলে না। ডিম ফুটল না। একদিন দু'দিন করে দশ দিনে সেই বাকসের ভেতরে ডিমগুলো বেরঙ হয়ে পচে গেল। বাকসো বদল করতে হলো 'আকন্দি'টার। পিঁপড়ের ভয় সবচেয়ে বড় ভয়।

নতুন বাকসে 'আকন্দি'টা খায়-দায় কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ করে না। বড় বড় পাতা খেয়ে বড়সড়ো হয়েছে। নড়েচড়ে ধীরে ধীরে। আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহে পোকাটা খোলস ছেড়ে, আরো বড় আরো রঙীন হয়ে বেরোলো। তাকে দেখতে জানালার কাছে বাকসোটা মেলতেই—ফুড়ুৎ।

সেটাও গেল। রইল না আর কেউ। ১৩৮৪

সমুদ্রতীর

তারপর যেতে যেতে শেষে সেই ছোট্ট নদীটার সঙ্গে দেখা। নদীটা পেরিয়েই ফ্রেজারগঞ্জ, তারপর সমুদ্রতীর।

ছোট্ট নদীটা পেরোবার না ছিল নৌকো, না ছিল পুল। সাঁতরে নদী পার হলাম, আর হেঁটে হেঁটে পৌঁছে গেলাম সমুদ্রতীরে।

সমুদ্রতীরে হাওয়া ছিল খুব কিন্তু ঢেউ ছিল না একদম। সমুদ্রতীরে বালিও ছিল না—যেমনটা দেখেছি অন্য অন্য সব বেলাভূমিতে। এখানে শক্ত মাটি, কোথাও নীল, কোথাও পোড়া মাটির রঙ। ভেজা মাটিতে অনেকটা পথ হেঁটে এলাম, পায়ের ছাপ কোথাও পড়ল না।

সমুদ্রের বাঁধের উপর নারকেল গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলাম। দূরে যতদূর চোখ যায় ঘোলা জলের শেষ নেই। এখানেই গঙ্গা নদীর মোহনা, যত ঘোলা জল সেই বয়ে আনছে। আমাদের ডানদিকে মাইলকয়েক দূরে সাগরদ্বীপ, তার সামনে সমুদ্রের ভিতর ঘন জঙ্গলে ঢাকা জম্বুদ্বীপ। তীরে বসে দূরের দিকে কেবল চেয়ে থাকলে কত যে ভাবনা মনে ভিড় করে আসে। আমি ভাবছিলাম :

নদীর মোহনার কাছে নদীই যত মাটি আর বালি এনে জমা করে। কিন্তু অন্য জায়গায় সমুদ্রতীরে এত বালি কোথা থেকে এল? সমুদ্রতীরে বালি আর কিছু নয়—পাথরের গুঁড়ো। সমুদ্রের ঢেউ পাথরের উপর পড়ে, পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি হয়। পাথর ভেঙে যায়, গুঁড়ো হয়। যে বালুরাশি আজকে তুমি দেখতে পাও, তা হতে অনেক, অনেক বছর—যত বছর তুমি ভাবতে পার তার চেয়েও অনেক বছর—লেগেছে। আজও এই পাথর ভাঙার বিরাম নেই।

*

বসে থাকতে আমার আর ভাল লাগছিল না। উঠে দাঁড়ালাম। আমার নড়াচড়ার শব্দে কাঁকড়াগুলো গর্তে গিয়ে ঢুকল। গর্ত থেকে টেনে ওদের বার করা সোজা কাজ নয়।

চুপচাপ একটু বসে থাকলে কাঁকড়াগুলো নির্ভয়ে চলতে শুরু করে। চার-জোড়া পা নিয়ে ওরা সোজা চলে না, চলে পাশাপাশি। মাথা, গলা, বুক, পেট—সব একটা খোলের মধ্যে—আলাদা কিছু বোঝা যায় না। শুধু চোখ দুটো মুখ থেকে উপরে ড্যাব ড্যাব করে। চোখ দুটো এমনভাবে রয়েছে পিছনের দিকটাও ওরা ভালভাবে দেখতে পায়।

খাবার নিয়ে কিংবা কারণে অকারণে নিজেদের মধ্যে লড়াই ওদের লেগেই আছে। কত যে ওরা খেতে পারে দেখে আমার অবাক লাগে। সমুদ্রের ছোট ছোট পোকামাকড় ত খাচ্ছেই, মরা পচা সমুদ্রের অন্য প্রাণীও খেতে ওরা বাদ দিচ্ছে না।

চিল্কা হ্রদের তীরে বিচিত্র সব কাঁকড়া দেখেছি। নীল, গোলাপী, কালো, ডোরাকাটা আর বিন্দু-ওয়ালা বড় ছোট অনেক ধরনের কাঁকড়া হয়। কিন্তু সবচেয়ে মজা লাগবে 'সন্ন্যাসী কাঁকড়া'কে দেখে। এক জাতের কাঁকড়া খুঁজেপেতে সমুদ্রের কোনো খালি শামুকের খোলা যোগাড় করে, তারই ভিতর থেকে যায়। খোলাটাকেই সে ঘর করে নেয়। সেখান থেকে কখনও বেরোয় না, ঘর নিয়েই চলে বেড়ায়।

*

কাঁকড়া দেখতে দেখতে অনেকটা দূর এগিয়ে গিয়েছিলাম সমুদ্রের দিকে। খেয়াল ছিল না। খেয়াল হল সমুদ্রের জলকে গুটি-গুটি ডাঙার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে। জোয়ার এসে গিয়েছে। আমি কিছুক্ষণ জলে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভেবেছিলাম হয়ত জলের অনেক গাছ জোয়ারের টানে ভেসে ভেসে আসবে। কিছুই এল না।

তীরভাঙ্গা ঢেউ যেখানে নেই, সেই শান্ত সমুদ্রের জলেই বেশি গাছগাছড়া দেখেছি। কোনো কোনো গাছ জলে ভেসে বেড়ায়, কোনো জাতের আবার মাটি বা পাথর চাই আঁকড়ে ধরার জন্য। সমুদ্রের এই গাছগুলো এত শক্ত করে আঁকড়ে থাকে যে বড় বড় ঢেউ তাদের ছিঁড়ে ফেলতে পারে কিন্তু উপড়ে নিতে পারে না।

জলের আগাছাগুলোর গা বড় পিচ্ছিল। কেন বলতে পার? ভাঁটার জল যখন সরে যায়, পিছল থাকার ফলে ওদের গা বাতাসে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যেতে পারে না। গা শুকোলেই মরণ।

সমুদ্রের গাছগাছড়া একটা বিন্দুর মত ছোট থেকে বট-অশ্বত্থের মত বড় হতে পারে। ডাঙায় যেমন, জলেও তেমনি শস্যভোজী প্রাণীর অভাব নেই। সমুদ্রে এত গাছপালা না থাকলে তাদের কী উপায় হত!

সমুদ্রের জল বেড়ে বেড়ে কখন আমার হাঁটু ছুঁয়েছে বুঝিনি। পায়ে সুড়সুড়ি লাগতেই চমকে উঠলাম। একটা শামুক পিলপিলিয়ে আমার পা বেয়ে উঠছিল। সমুদ্র-শামুক চ্যাপ্টা একটা পা নিয়ে গুটি গুটি যেখানে খুশি চলে বেড়ায়। ভয় পেলে নরম বালি বা ভেজা মাটির তলায় লুকিয়ে পড়ে। ওদের খোলাটার উপরে দুটো সরু মুখ। ওরা এক মুখে জল নিয়ে অন্য মুখে বের করে দেয়। জলের সঙ্গে যদি কোনো ছোট পোকা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বা অন্য কোনো খাবার ভিতরে ঢোকে তা আর বেরিয়ে আসতে পারে না—সোজা চলে যায় পেটে। এমনি করেই ওরা খাবার খায়।

সমুদ্রতীরের ঝিনুক-শামুক-কড়িগুলোর রূপ আর রঙ দেখে চোখ ফেরানো যায় না। বেলাভূমিতে ঘুরে ঘুরে ঝিনুক কুড়োনোর ব্যতিক সমুদ্রতীরে গেলে সবারই হয়। আসলে ওরা মরা ঝিনুকের খোল। সমুদ্রের এই জাতের প্রাণীগুলোকে সহজেই দুটো ভাগে ফেলতে পার। এক জাতের একটা মাত্র খোল. অন্য জাতের (যেমন ঝিনুকের) খোলের দুটো ভাগ।

ঝিনুকের খোল দুটো একটুকু ফাঁক করে বাইরে থেকে জল টেনে নেয়। জল পেলেই ওদের 'খাওয়া আর হাওয়া'র কাজ মেটে। শামুকেরা তবু চলতে পারে, ঝিনুকেরা চলতেই পারে না। বন্দী ঝিনুকের কান্না জমে জমে কী করে মুক্তো তৈরী হয় সে অন্য সময় তোমাদের বলব।

*

জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গে জেলেডিঙিগুলো তীরের কাছে চলে এল। তাদের সঙ্গে উড়ে উড়ে এল গাংচিলেরা। ডাঙায় যেখানে জেলেরা জাল নামাল, অনেক লোকের ভিড়ের সঙ্গে আমি সেখানে মিশে গেলাম। ওদের জালে ছোটবড় নানান মাছের সঙ্গে ধরা পড়েছে দু-একটা 'জেলি-মাছ'।

জেলি-মাছ মোটেই মাছ নয়। মাছের মত ওদের আঁশ, কাঁটা, পাখনা, লেজ বা মাথা কিছুই নেই। জেলির মত থলথলে আর জলে থাকে বলেই হয়ত ওদের ওই নাম হয়েছে।

আমি তন্ময় হয়ে সমুদ্র থেকে তোলা নানা রঙের মাছগুলো দেখছিলাম। ভিড়ের ভিতর কে যেন আমার হাত ধরে টানল। ফিরে তাকালাম। ও নীলাঞ্জন!

সে আমাকে বললে, আজকে তুমি অকারণ যেমন খুশি সমুদ্রতীরে ঘুড়ে বেড়িয়েছ। সমুদ্রতীরে প্রকৃতি-পড়ুয়াদের নিয়ম একটুও মাননি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী সেগুলো?

ফেরার পথে চলতে চলতে সে আমাকে এই নিয়মগুলো শেখালে:

১। সমুদ্রতীরের মাটি বালি বা পাথর কেমন তা দেখতে হবে। আর দেখতে হবে তাদের সঙ্গে সমুদ্রতীরের প্রাণীদের কী সম্পর্ক।

২। সমুদ্রতীরে বা তীরের কাছে জলে কোন কোন প্রাণীকে দেখা যাচ্ছে? কোথায় তারা থাকে, কী তারা খায়, কী ভাবে খায়—সব খবর জানতে হবে।

৩। সমুদ্রের উদ্ভিদ আর প্রাণীদের কী সম্পর্ক? কী ভাবে তারা মানুষের উপকার বা অপকারে আসে তাও জানতে হবে।

৪। জ্যান্ত বা মরা—সমুদ্রের কোনো কিছুই হাত দিয়ে প্রথমে ছোঁবে না। ১৩৭০

মেঠো পথ, দুষ্টু শেয়াল ও আমি

'ক্যা হুয়া,' 'ক্যা হুয়া,'—সমস্ত রাত থেকে থেকে ওরা ডেকেছে। আমার ঘুম ভাঙেনি—খুব সকালে বাড়ির সকলের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল।

সাদা হাঁসটা কোথায়? খাঁচা কেন খালি? সাদা হাঁসটা ভোর না হতেই নিরুদ্দেশ!

নিরুদ্দেশ, না কেউ নিয়ে গেল? গোয়েন্দাগিরি শুরু করলাম। শুনেছি আসামী প্রমাণ না রেখে যায় না। খাঁচাটার চারপাশ পরীক্ষা করলাম। দু-এক ফোঁটা শুকিয়ে-আসা রক্ত (ঘটনাটা তা হলে বেশীক্ষণ আগে ঘটেনি), দু-একটা ছেঁড়া সাদা পালক (ধস্তাধস্তি হয়েছিল তা হলে), আর চারপাশে কুকুরের পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম।

আমার মনে সন্দেহ রইল না, এ কাজ পাড়ার কোনো কুকুরের। তাদের মুখ দেখলাম। কারও মুখেই রক্তের দাগ নেই। খাঁচার চারপাশের পায়ের ছাপের সঙ্গে তাদের পায়ের ছাপ মিলল না। তবে? তবে নিশ্চয়ই ও পাড়ার ভুলোর কাজ।

ভুলোকে আমি ডরাই। একটা লাঠি নিলাম তাই। আর নিলাম দূরবীনটা। আতস কাঁচটাও নিতে ভুললাম না।

ও পাড়ায় যেতে হলে একটা খাল পেরোতে হয়। খালের উপর কাঠের পুল। পুলের উপর রক্তের ফোঁটা দেখলাম। চোখে দূরবীন জুড়ে ভুলোকে খুঁজতে শুরু করলাম তক্ষুনি।

পুল থেকে নেমে রাস্তাটা চলে গেছে ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে। রাস্তা থেকে কয়েক শ' গজ দূরে ক্ষেতের মাঝে একটা খেজুর গাছ। আমার দূরবীন সেদিকে ফেরাতেই দেখতে পেলাম:

সাদা হাঁসটা মুখে করে ছুটে পালাচ্ছে, ভুলো কুকুর নয়—একটা লেজমোটা লাল-শেয়াল।

লাঠি উঁচিয়ে আমি তার পেছনে ছুটলাম। সে আরও জোরে ছুটল। আমি দাঁড়ালাম। সেও দাঁড়াল। আমি নীচু হয়ে একটা ঢিল কুড়োলাম। মুখ তুলে দেখি সে 'হাওয়া'।

সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি ছুটে সেখানে গেলাম। পায়ের ছাপ রয়েছে দেখলাম। ঠিক কুকুরের পায়ের ছাপের মতোই। শেয়াল আর কুকুর তবে কি এক!

কথাটা নীলাঞ্জনকে বললাম। সে বলল: শেয়াল কুকুর এক নয়, তবে এক জাতের দুই পরিবার। শেয়াল আর কুকুরের সব-চেয়ে বড়ো গরমিল—শেয়ালেরা থাকে গর্ত খুঁড়ে বনে-বাদাড়ে, কুকুর থাকে আমাদেরই কাছাকাছি। দু-এক শ্রেণীর কুকুর আছে যারা দল বেঁধে বনে বনেই কাটায়—ডিঙ্গো বা কড়গড়ি আর নেকড়েদের কথা বলছি।

শেয়াল-কুকুর দু'জাতই মায়ের দুধ খেয়ে বড়ো হয়। তার-পর নিজের খাবার নিজেকেই জোগাড় করে নিতে হয়। কিন্তু শেয়াল বেচারীরা খায় তাড়া।

কুকুরের মুখটা হাঁ করে তার দাঁতগুলো দেখো—চারটে ভাগ করতে পারবে। কামড়ে ধরবার, ছিঁড়ে খাবার, চিবিয়ে খাবার আর চিবিয়ে ভাঙবার। কুকুরের পায়ের দিকে লক্ষ করো—লম্বা পা, আবার চারটে নখ সব সময় বেরিয়েই আছে। গোটানো যায় না। এই ধরনের পা আর নখ থাকার ফলে, প্রকৃতি-পড়ুয়ারা নিশ্চয় বুঝতে পারছ, ওদের দৌড়ে শিকার ধরা বা পালাবার পক্ষে ভারী সুবিধা। শেয়াল এই সুযোগটা নেয়।

শেয়ালের মত দৌড়বাজ কম দেখেছি। কোনো অবস্থাতেই কুকুরের হাতে (!) তাদের ধরা পড়তে দেখিনি। তবে কুকুরের মত তারা আদর বা খাবার পায় না বলে, রাতের অন্ধকারে খাবার খুঁজতে বেরোয়। শেয়াল দিনে বেরোয় না, এই কথা বললে ভুল হবে। খালের ধারে ধারে, নির্জনে, দিনের বেলা আমি শেয়ালকে পা দিয়ে মাটি সরিয়ে কাঁকড়া খুঁজতে দেখেছি। মেঠো-ইঁদুরের গর্তের কাছে ওত পেতে বসে থাকতে

www.BanglaBook.org

দেখেছি। ইঁদুর, খরগোশ এই ধরনের ছোটো প্রাণী ছাড়া আর বড়ো কারও জন্য ওত পেতে থাকতে শেয়াল ভরসা পায় না। তেমন শরীর হওয়া চাই ত।

তবে শোনো, শেয়াল যে হারে মেঠো ইঁদুর সাবাড় করে তা না হলে ইঁদুরেরা চাষের বড়ো ক্ষতি করত। আরও কথা, মরা, পচা, গলা পশুপাখি খেয়ে শেয়াল আমাদের যে উপকার করে, তার সঙ্গে তুলনা চলে শুধু কাকেরই। শেয়াল মাংসাশী হলেও পাকা ফল পেলে ছাড়ে না।

শীতের শেষে, বসন্তের হাওয়া যখন বইতে শুরু করবে তখন কোনো সন্ধ্যায় মাঠে-বাটে ঘুরতে ঘুরতে, কোনো ঝোপের আড়ালে হয়ত মা-শেয়াল, বাবা-শেয়াল আর তাদের কয়েকটি ছানা তোমাদের চোখে পড়বে। দেখে মনে হবে, বাবা-শেয়াল এখুনি খাবার আনতে যাবে, আর ছানাদের মা তাদের 'ক্যা হুয়া' ডাক শেখাবে। যদি ভয় না পাও আর ওদের বিশ্বাস জয় করতে পার, তবে দেখবে কুকুরের মত ওরাও পোষ মানে।

১৩৭০

পাহাড় থেকে নেমে

পাহাড় থেকে নেবে, ফিরে উপর দিকে তাকিয়ে আমার মাথা ঘুরে গেল। এত উঁচুতে উঠেছিলাম কি করে। কত উঁচুতে উঠেছিলাম সে কথা পরে বলছি, কেন উঠেছিলাম আগে শোনো:

ছোটবেলায় উইঢিবি দেখে পাহাড়ের কল্পনা করেছি। পরে দূর থেকে টিলা দেখেই খুশি হয়ে ভেবেছি—এরা এখানে কি করে এল? নুড়ি কুড়িয়ে জমিয়ে রাখতুম তখন থেকে।

নীলাঞ্জন একদিন এসে বললে, চল পাহাড় দেখে আসি। কেন, কোথায়, কিছু ভাবলুম না, তৈরী হয়ে নিলাম। সঙ্গে নিলাম, নীলাঞ্জনের কথামত একটি হাতুড়ি, একটি ছেনী। এ দুটি দিয়ে সহজে পাথর কাটা যাবে, ভাঙ্গা যাবে। আতস কাচ নিলাম একটি—পাথরের ভেতরে দানাগুলোর গড়নধরন বড় করে দেখার জন্যে। কম্পাস আমার পকেটে রাখলাম, দিক ঠিক রাখতে হবে সবসময়ে। নোটবই পেন্সিল ত নিলামই আর নিলাম কিছু তুলো আর কাগজের থলে। পাথরের নমুনাগুলো তুলোয় ঢেকে কাগজে ভরে রাখব তাই। সব কিছু ভরে নিলাম আমার পিঠ-ঝোলায়, হাতে পাহাড় চড়ার লাঠি নিয়ে বললাম—আমি তৈরী।

হিমালয় দেখার আগে ছোট বড় সব পাহাড় দেখে নিলাম। পাহাড় সব জায়গায় সমান উঁচু নয়। কোথাও একা একটি ছোট পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও সার বেঁধে পর পর কয়েকটি পাহাড় দাঁড়িয়ে। আমি ভাবতুম কি দিয়ে তৈরী এরা, কেমন করে তৈরী। পাথর—কথাটা শুনলেই মনে হয় লোহার মত শক্ত কিছু। কোন কোন পাথর তেমন বটে, কিন্তু কাছে গিয়ে হাতে নিয়ে দেখলাম, দু' আঙ্গুলের চাপেই কত পাথর গুঁড়িয়ে যায়। পাহাড়ের গা বেয়ে হেঁটে হেঁটে দেখি ওর সবটাই পাথর নয়, মাটিও।

নীলাঞ্জন বললে, পাহাড় তা পাথরের হোক আর মাটির হোক—পৃথিবীর নড়াচড়ার ফলেই গড়া। কোথাও সোজা উঠেছে, কোথাও কাত হয়ে রয়েছে, আবার কোথাও 'পলি-পাথরে' পৃথিবীর চাপের হেরফেরে ঢেউ-এর নকশা ফুটে উঠেছে। আমি জানি, নীলাঞ্জন একথা বই পড়ে শিখেছে। কিন্তু আমি পাথর থেকে পাথরের তফাত বুঝি না। কত না রং-বেরং-এর পাথর দেখি, ঐ রং-এর রহস্য বুঝি না। নকশা আঁকা পাহাড়ের ভাঁজ দেখে, পাথরের গা দেখে অবাক হই। বাস, আর কিছু না। যা দেখি তার মানে না বুঝলে অন্ধ বই আর কী! একটি পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে দেখি, মাইল খানেক জায়গা জুড়ে কি চমৎকার এক ময়দান। কি করে অমন হল বুঝিনি। পাহাড়ের ধাপে ধাপে ঝরণা নেমে আসছে, দেখছি কি করে ধাপ হল পাহাড়ের গায়, আর ভেবেছি। গভীর গিরিখাত দিয়ে তীক্ষ্ণ বেগে নদীকে যেতে দেখে ভেবেছি—ঐ খাদের মধ্যে নদীটি কি করে গিয়ে পড়ল! প্রকৃতি যে অকারণে এমন নয় এখন বুঝি।

ভারতবর্ষের পাহাড়গুলো দেখে নিলাম ধীরে ধীরে। পাহাড় বলেই, এক শ্রেণীর সাথে অপরের যত না মিল, গরমিল কিছু কম নয়। সবগুলো মাথায় সমান উঁচু নয়। চূড়া, খাঁজ, ভাঁজ ও ধারগুলোও দেখতে অনেক পাহাড়ে অনেক রকম। হিমালয় কোথাও এত উঁচু যে তার মাথায় সারা বছরই বরফ ভরা। তার বরফ চূড়া থেকে নেবে, গা বেয়ে, কত নদী সারা বছর গভীর খাত বেয়ে যাচ্ছে, ভারতের আর কোথাও কোন পাহাড়ে এমনটি নেই। কোন পাহাড়ের মাথা তীরের ফলার মত, কোথাও তাঁবুর মত, পিরামিডের মত, কোথাও দেখলাম পাহাড়ের মাথা একদম সমতল বা ঢেউ খেলানো। বাংলাদেশের ভেতরে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মানভূমের পাহাড়গুলো খুব উঁচু নয়, তাতে অবিরল ঝরঝর ঝরণা নেই বড়, গায়ে খাঁজ বা ভাঁজ কম। রোদ জল হাওয়ায় কোনটির উপরকার মাটি গাছ উঠে গিয়ে নেড়া পাহাড় দেখা দিয়েছে। কোনটিতে এখনও গাছ ঝোপঝাড় রয়েছে। হাজার হাজার বছর পরে যদি ফিরে আসতে পারি দেখব ওরাও হয়ত নেড়া হয়ে গেছে, নেড়া পাহাড়গুলো উধাও।

পাহাড় যে উধাও হতে পারে নিজের চোখে দেখলাম। দু-দিন সারারাত সারাদিন বৃষ্টি হল এক পাহাড়ে। বৃষ্টির জল মাটি চুঁইয়ে পাহাড়ের গা' নরম করে দিল। মাটি হয়ে গেল কাদা। ভারি পাথরের চাপ সহ্য করতে না পেরে পাহাড়ের ঢালু গা হুড়মুড় নেবে গেল। এই ধস নাবার জন্য বৃষ্টি যেমন দায়ী হতে পারে, নদী যেমন দায়ী হতে পারে, মানুষও দায়ী হতে পারে। বন কেটে সাফ করে দিয়ে, পাহাড় কাটিয়ে পথ করায় আর ধাতুর খোঁজে পাহাড় খোঁড়ায় ধস নাবার পথ হয়ে থাকে—যদি বৈজ্ঞানিকের সুপরামর্শ না থাকে। ধস নাবা মানে পলকে পালটে গেল পাহাড়ের চেহারা। কিন্তু প্রতিদিন রোদ জল হাওয়া পাহাড়ের চেহারা টুকিটাকি কত যে পালটে দিচ্ছে তা একবার দেখে বোঝা যায় না। পাহাড়ী নদীর ধারে নুড়িগুলো কি মোলায়েম! কেন? নুড়িগুলো হলই বা কি করে?

একটি উত্তর নীলাঞ্জন দিলে, বড় বড় পাথরের ফাটলে জল ঢুকে আর শীতে সে জল জমে বরফ হয়ে আয়তনে বেড়ে পাথর ফাটিয়ে নুড়ি বানিয়েছে। নদীর স্রোতে ঘষে ঘষে নুড়ি হয়েছে মোলায়েম; আর একটি উত্তর হতে পারে, হাজার হাজার বছর ধরে তুষার-নদীর ঘষায় বড় পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে নুড়ি হয়েছে। বাতাস আর জলে যে গ্যাস আছে পাথরের সাথে তাদের 'ভাঙ্গা-গড়ার' সম্পর্ক আছেই। গ্যাস তাপ চাপ আর পাথর ভাঙ্গা-গড়ার কি খেলা খেলছে পাহাড়ে পাহাড়ে সহজে তা বোঝা যায় না।

যমুনা নদীকে এক জায়গায় আমাকে পার হতে হল, যেখানে নদীর দুই পারে দুই রং-এর পাহাড়। যে পার ছেড়ে এলাম তা কালো আর হলদে, তার অন্য পার সাদা—শ্বেত-

www.BanglaBook.org

পাথরের পাহাড়। পাহাড়ে পথ যদিও খুব উঁচু কিন্তু চলতে খুব শীত করছিল না। এপারে এসে ঠান্ডা লাগল বেশি। নীলাঞ্জন বললে, সূর্যের আলো আর তাপ দু'দিকের পাহাড়ই সমান সমান পাচ্ছে। কিন্তু সাদা পাথর গরম কম হচ্ছে ওপারের রঙিন পাথরের চেয়ে। সাদা পাথরের পাহাড়ে তাই ঠান্ডা লাগল হঠাৎ এসে।

হঠাৎ গিয়ে হাজির হলাম এক তুষার নদীর বুকে। পাহাড় দেখব বলে বেরিয়েছি। বরফচূড়া পাহাড় দূর থেকে দেখেছিলাম। এখন নিজেই এসে দাঁড়িয়েছি বরফের উপর। বরফের নদীর উপর। এ যে কী বিস্ময়! পাহাড় বেয়ে উঠে এমন জায়গায় এলাম যেখানে হাত বাড়ালেই বরফ। কী বিস্ময়!

পথে একটু বৃষ্টি পেয়েছিলাম। ঝর-ঝর নয়, ইলশে গুঁড়ি। মাথায় কাঁধে গোঁফে দাড়িতে হাত দিয়ে দেখি ঝুরো ঝুরো বরফ। পাহাড়ের মাথায় যেখানে দিনের পর দিন বরফ জমে, সে বরফ পাথরের মত শক্ত। কি করে তা সম্ভব?

নীলাঞ্জন বললে, উপরের বরফের চাপে নীচের বরফ জমে শক্ত হয়ে গিয়েছে। সে কি একদিনে? কত শত বছরে কে জানে!

শক্ত বরফের উপর দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে চোখ মানা মানে না। নীলাঞ্জন বক বক করছে—পাহাড়ের চূড়ার কাঁধে খাঁজে যে বরফ জমে তারা চলতে থাকে ঢাল বেয়ে। তারও উপর, আরও উপর থেকে, যেখানে চিরতুষার সেখানেও এক অবস্থা। ছোট ধারা বেয়ে, ধীরে ধীরে, পাহাড়ের কোন না কোন ফাঁক দিয়ে বরফের স্রোত বেরিয়ে আসে খোলা একটি জায়গায়। তৈরী হল এইখানে বরফের নদী। সে বরফ গলে যে জল হচ্ছে তা থেকে জন্ম নিয়েছে একটি নদী। পাহাড় ঘুরে ঘুরে আমি নদীর উৎস মুখে হাজির হলাম। তারপর নেবে, ফিরে উপর দিকে তাকিয়ে আমার মাথা ঘুরে গেল! এত উঁচুতে উঠেছিলাম কি করে!

১৩৭৫

যে মিছিলের শেষে মানুষ

মাটি আর মানুষের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা পড়াশুনা করেন, 'শিবালিক' নামটি তাঁদের খুব চেনা। শিবালিক বলতে আমি শিবালিক পর্বত শ্রেণীকে বোঝাতে চাইছি।—গত শতাব্দীর শেষাশেষি ঐ পর্বতশ্রেণীর কোন কোন জায়গা খুঁড়ে বানর জাতীয় প্রাণীর কয়েকটি দাঁত ও চোয়ালের অংশ পাওয়া গিয়েছে; বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বললেন, ঐ দাঁত ও চোয়ালের অংশ কোটি বছর আগের—মিওসিন বা প্লিওসিন যুগের। মানুষের ক্রমবিকাশ বুঝতে এ আবিষ্কার কাজে এল। আর যত কারণ থাকুক 'শিবালিক' বিখ্যাত এই কারণেও। মানুষ কোথা থেকে এল, কেমন করে এল এসব প্রশ্নের উত্তর এমনি করে মাটি খুঁড়েই পাওয়া।

প্রশ্ন মনে যত সহজে জেগেছে, উত্তর তত সহজে মেলেনি। সহজ করে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে যত জন যত কাহিনী বলেছেন, তার ভেতর, লুক্রেসিয়াসের লেখা 'প্রকৃতি রহস্যের' কবিতার ভাবটি আমাদের ভাল লাগবে। ওঁর জন্ম খৃষ্টের জন্মেরও পঁচানব্বুই বছর আগে, গ্রীসে। তাঁর প্রকৃতির সৃষ্টি রহস্যের কবিতার ভাবটি—পৃথিবী যখন খুব উর্বর হয়ে উঠল তখন গাছপালায় ভরে গেল দশদিক। আর, পৃথিবীর জঠর থেকে জন্ম নিল পশু পাখি আর মানুষ। কেউ কেউ বলেন 'মাটি থেকে মানুষ জন্ম নিল' তাঁরই নাকি প্রথম কল্পনা। আজকে আমরা, বিজ্ঞানে বিশ্বাসী মানুষ, জীবজগতের সব কিছুর একই উৎস, এই মতকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি।

এই বিশ্বাস অবশ্য একদিনেই গড়ে ওঠেনি। বহুযুগ আগে থেকেই মানুষের মনে অনেক প্রশ্নের সাথে এই প্রশ্নটাও ছিল—মানুষ কোথা থেকে এল! বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আরিসটোটল প্রথম চেষ্টা করেন। একথা তোমাদের অজানা নয় যে ইনিই প্রথম মানুষের সাথে আর সব স্তন্যপায়ী প্রাণীদের তুলনামূলক বিচার করেন। মানুষের দেহের গড়ন, বিভিন্ন অংশের কাজ-কারবার সবকিছু খুঁটিয়ে দেখে প্রাকৃতিক জগতে মানুষের স্থান ঠিক করেন। আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি, কথা বলে মনের ভাব বোঝাতে পারি, আর সবচেয়ে বড় কথা বুদ্ধি আর যুক্তি দিয়ে সকল কাজ সারতে পারি—মানুষের এই বিশিষ্টতা নিয়ে গবেষণা করছিলেন আরিসটোটল। তিনি মারা যান খৃষ্ট জন্মের তিনশ বাইশ বছর আগে। বেঁচেছিলেন বাষট্টি বছর। তারপর 'মানুষ' নিয়ে গবেষণা এগিয়ে চলল পেছন দিকে, তার মানে, ইতিহাসের কালকে পেছনে ফেলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে। সে যুগকেও পেছনে রেখে এমন এককালে, মাটি খুঁড়ে বের হল এমন সব নিদর্শন যা নিয়ে প্রমাণ করা গেল বংশ বংশ ধরে রূপান্তর ঘটেছে জীবজগতের পরিবেশের চাপে আর বাঁচবার তাগিদে। এই তত্ত্বের জনক যে চার্লস ডারউইন—সে কথা তোমাদের জানা।

বিগ্‌ল্ জাহাজটি চেপে পাঁচ বছর পৃথিবী ঘুরে কত অজানা জায়গা থেকে কত না গাছপালা, মাটি ও পাথর, পশু-পাখি তিনি কুড়িয়ে গুছিয়ে নিয়ে ভাবতে বসলেন। সৃষ্টির শুরুতে প্রাণের সাড়া যখন জেগেছিল তা দেখতে কেউ হাজির ছিল না, ডারউইনের 'চিন্তা' গিয়ে হাজির হল সেখানে। তাঁর গবেষণা জ্ঞানের এমন একটি 'জানালা' খুলে দিয়েছে যা দিয়ে ক্রমবিকাশের মিছিলটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে স্পষ্ট। যে মিছিলের সবশেষে মানুষ, আমরা।

সবার পিছে আছি বলেই সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব আমাদের। দেখবে, প্রকৃতির মধ্যে একের সাথে অন্যের আত্মীয়তা কি আমাদের তা খুঁজে বার করতে হবে। একটু লক্ষ করলেই দেখবে, প্রকৃতির সব কিছুই একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। গাছপালার চাই মাটি আর হাওয়া আর আলো: প্রাণীদের চাই গাছপালা। আবার মানুষের চাই গাছপালা, পশুপাখি সবকিছুই। কাঠঠোকরা পাখি গাছ ঠোকরায়। তাতে গাছ আর পাখিটির কার কি লাভ! আমাদেরই দায়িত্ব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে রহস্য ভেদ করা।

স্থিতিস্থিত, প্রকৃতির এত রূপগুণের কারণ কি তাও খুঁজে দেখতে হবে আমাদেরই। গাছের পাতার আকার, ফুলের রং, বীজের গড়ন কেন রকমারি হয়? পশুপাখির লোম বা পালকের এত বাহার কেন? হাত পা ঠোঁট দাঁত নখের কেন বিশেষ বিশেষ ধরন? পাখির ডাকের মানে কি? বলতে পার, কেঁদোবাঘের ডোরাকাটা আর চিতাবাঘের গায়ে চক্র থাকায় কার কি সুবিধে? এ সবকিছুরই উত্তর দিতে পারবে, যদি প্রকৃতি পড়ুয়া হও।

প্রকৃতি পড়ুয়ারাই ত জল জংগল পাহাড় প্রান্তর ঘুরে প্রকৃতির কার্য-কারণের খোঁজ করে।

১৩৭৮

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাত পাকাবার আসর

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

দমকল ও গরু

নির্মালা বন্দ্যোপাধ্যায়—৯ বছর

আমরা তখন চুঁচড়োয় ছিলাম। বাড়ির পাশে একটা গলি ছিল। সেটা আমাদের বাড়িরই অংশ ছিল, কিন্তু বাড়ি থেকে সরাসরি সেখানে যাবার পথ ছিল না। সেটা আঁস্তাকুড় মত ছিল। তার একটা মুখ ছিল বন্ধ, আর এক মুখ রাস্তার ওপর। গলিটার মধ্যে একটা বাঁক ছিল। একদিন একটা গরু সেই গলিতে ঢুকে পড়েছে, আর বাঁক পেরিয়ে একেবারে এ মুখে এসে পড়েছে। তারপর আর বেরুতে পারছে না। এ মুখ ত বন্ধ, আর পিছু হটে বাঁক পেরুতেও পারছে না। বাঁকের এদিকটা আবার বড্ড সরু, তাই ঘুরে দাঁড়াতেও পারছে না। কখন ঢুকেছে জানি না, আমরা বিকেলের দিকে যখন দেখলাম তখন রোদ্দুরে ও একেবারে হাঁপিয়ে গেছে। আমরা কতকগুলো তরকারীর খোসা আর এক বালতি জল ওকে জানলা দিয়ে দিলাম, ও সব খেয়ে নিল। খুব খিদে আর তেষ্টা পেয়েছিল নিশ্চয়। তারপর আমরা প্ল্যান করতে লাগলাম কি করে ওকে বের করা যায়। কার গরু কিছুতেই জানা গেল না। কেউ কেউ বলল, গলির পাঁচিলে উঠে ওকে দড়ি বেঁধে টেনে তোলা হোক। দিদি বলল, তোমাদের কর্ম নয়, দমকল ডাক।

অগত্যা দমকলে খবর দেওয়া হল। দমকলের লোক এসে ব্যাপার দেখে ত অবাক। তখন দুজন পাঁচিলে উঠে গরুটাকে পেরিয়ে গলির এ মুখে ঢুকে ওর শিং ধরে ঠেলতে লাগল, আর এদিক থেকে একজন ল্যাজ ধরে টানতে লাগলেন। যিনি ল্যাজ টানছিলেন তিনি নিশ্চয় অফিসার ছিলেন, কারণ শিং-এর লোকেরা মাঝে মাঝে তাঁর কাছে অনুযোগ করছিল—'স্যার, গুঁতোচ্ছে।' তারপর টানতে টানতে আর ঠেলতে ঠেলতে ওকে বাঁক পার করে দিতেই ও এদিকে এসে চওড়া জায়গা পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে রাস্তা লক্ষ করে ছুটতে লাগল। ল্যাজের অফিসারও ওর সামনে পড়ে গিয়ে ছুটে পালাতে লাগলেন। ছুটতে ছুটতে তাঁর টুপি পড়ে গেল। এরা চ্যাঁচাতে লাগল—'স্যার, আপনার টুপি পড়ে গেল'। রাস্তায় পড়েই গরুটা ছুটে পালাতে লাগল। ওকে ধরতে পারলে গরু ছেড়ে রাখার অপরাধে ওর মালিককে পুলিশে দেওয়া যাবে, তাই দমকলের লোকেরাও দড়ি নিয়ে ওর পিছনে ছুটতে লাগল। অনেকটা রাস্তা মানুষে গরুতে দৌড় হল, তারপর দৌড়ে হেরে দমকলের লোকরা ফিরে এল। তখন দমকলের গাড়িটা আবার ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চলে গেল। দমকল দেখে বাড়ির সামনে অনেক লোক জমে গিয়েছিল, ব্যাপার দেখে তারাও হাসতে হাসতে চলে গেল। আমিও ঘটনাটা সন্দেশের জন্যে লিখে ফেললাম।

১৩৭২

সে এক সামান্য কর্মী

বাসব চট্টোপাধ্যায়—১৩ বছর

পাঁচিলের ওপর আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ডেঁয়োরাজ্যের এক সামান্য শ্রমিক। ঘুরে বেড়াচ্ছিল বললে ঠিক বলা হবে না—একে ঠিক পাহারা দেওয়াও বলা চলে না। চিন্তা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে যেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কি পর্যবেক্ষণ করছিল। মনে তার ভীষণ আশঙ্কা, আকাশে বাতাসে তার রাজ্যের কি যেন এক অমঙ্গল ঘোষিত হচ্ছে। তার মনে তাই আর সুখ নেই।

কিন্তু হঠাৎ—একি? কোথায় যেন গুরুগুরু শোনা গেল না? টুকুদের উঠোনটায় যেখানটায় সূর্য না ডোবা পর্যন্ত রোদে ফেটে যেতে থাকে সেখানে যেন কিসের কালো ছায়া পড়েছে। ঈশান কোনটি কালোয় কালো, বইতে শুরু করেছে ঠাণ্ডা বাতাস, তাতে আবার বৃষ্টির গন্ধ মাখা। ঠাণ্ডা বাতাসে অবশ্য শরীর জুড়িয়ে গেল। কিন্তু তার ত বুক ভরে নিঃশ্বাসটুকু নেবার সময়ও যে নেই। দৌড়ে ফিরে চলল সে তার গর্তে। সামলাতে হবে তার বিশাল রাজ্য আসন্ন কালবৈশাখীর করাল কবল থেকে। রাজ্যটি বিশাল কিন্তু অলস রাজা—নিষ্কর্মা রাণী—শুধুমাত্র ডিম পাড়া ছাড়া অন্য কোন কাজ পারে না, জানে না। শত শত অসহায় বাচ্চা, অজস্র ডিম, সঞ্চিত খাদ্য—আর হাজার হাজার বীর কর্মী কর্তব্যনিষ্ঠ পিঁপড়ে ভাই।

সাজ সাজ রব পড়ে গেল রাজ্যে। মুহূর্তে সমস্ত রাজ্যের সব কিছু গুছিয়ে দিয়ে চলল ডিম মুখে কর্মীরা। ক্ষুদে ক্ষুদে ছ'টি পায়ে তাদের অসীম ব্যস্ততা—বৃষ্টি নামার আগেই নিরাপদ জায়গায় পেঁছিতে হবে, যেখানে বিন্দুমাত্র জলও ঢোকে না।

হৈ হৈ করে এসে পড়ল ঝড়, শিলাবৃষ্টি হতে লাগল। কিন্তু ততক্ষণে কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মীরা সমস্ত রাজ্যটি মাথায় করে নিরাপদে ভাঁড়ার ঘরের ফাটলে ঢুকে পড়েছে। এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সেই সামান্য অসামান্য কর্মীটি।

১৩৭৬

উদাস বাউল

কৃষ্ণা সরকার—১৫ বছর

উদাস বাউল একলা চলে পথে,
একতারাতে বাজছে কি এক সুর।
সামনে তাহার শীর্ণকায় নদী
বলছে যেন পথটা অনেক দূর।

লাল পলাশের মাতাল হাওয়া আজি
আসছে যেন কোন সুদূরের থেকে।
ওই যে দূরের ঘন বনের রেখা,
পথটা যেন সেথায় গেছে বেঁকে।

উদাস মনের পথিক বাউল ওগো
যাবে তুমি কোনখানেতে ভাই?
কেউ জানে না সেই ঠিকানা তব
কতদূর সে কারও জানা নাই।

নীল গগনের সুদূর প্রান্ত রেখায়
সাদা কালো মেঘের রাশে রাশে
উদাস হিয়ার কল্পনারা সব
মুখ লুকায়ে রয় যে পাশে পাশে।

বাউল পথিক হারায়েছে যেন
তাহার ক্ষুদ্র উদাস ব্যাকুল মন।
নীল আকাশের রেখায় রেখায় তারে
ডাকছে দূরের লাল পলাশের বন।

একলা বাউল সেই পথেতেই যায়
যেখানে তার মনকে খুঁজে পায়।

১৩৮২

আমার ভূত দেখা

সিদ্ধার্থ প্রধান—৮ বছর

গরমের ছুটিতে সবাই বাইরে বেড়াতে যায়, আমরাও দেশে যাই আম খেতে। আমাদের দেশের বাড়িতে অনেক ভূত আছে। সামনের পুকুরে আছে যক্ষ, অনেকেই তাকে দেখেছে, পিছনের খালের পেত্নীরা কাঁচা মাছ খেয়ে কাঁটাগুলো ধারে ধারে ফেলে রাখে, ঢেঁকি ঘরে একটা মদ্দো ভূত আছে, রাত দুপুরে সে নাকি ঢেঁকিতে পাড় দেয়। আর পশ্চিম ধারের বেলগাছে থাকে ব্রহ্মদত্যি, বিরাট চেহারা নিয়ে রাত দুপুরে সে গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে থাকে। আমরা যখনই দেশে যাই তার কয়েকদিন আগে তারা দেখা দেয়। কিন্তু কখনও আমরা থাকতে তারা দেখা দেয় না। আমরা দেশে গেলেই সারাক্ষণ বাগানে বাগানে ঘুরি; আম, জাম, জামরুল, লিচু—কত যে মজা! ঘুরতে ঘুরতে সেদিন দলছাড়া হয়ে আমরা তিন ভাই চলে গিয়েছিলাম পশ্চিম ধারে বেলগাছের দিকে। হঠাৎ শুনি কুকুরের ডাক, কুকুরের খোঁজ করতে গিয়ে দেখি ছাগল ডাকছে, তার পরেই শুনলাম দুই বেড়ালে ঝগড়া করছে, বেড়াল দেখতে পেলাম না। কিন্তু তার পরেই ঘোড়া ডাকছে শুনে বুঝলাম যে এটা একটা ভৌতিক ব্যাপার! আমার দুই ভাই চিৎকার করে

www.BanglaBook.org

পালিয়ে গেল, কিন্তু আমি এত ভয় পেয়েছিলাম যে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। গলা দিয়ে একটুও আওয়াজ বেরুল না। ওদের চিৎকারে যখন লোকজন বেরিয়ে এল তখনও আমি দাঁড়িয়ে। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বংশীধর হরবোলা। সবাই তাকে বকতে লাগল ও আমার খুব প্রশংসা করতে লাগল, এমন সাহসী ছেলে তারা আর দেখেনি।

১৩৮২

ছুটির শেষে

অবন্তী অধিকারী—৮ বছর

গরমের ছুটি হল শেষ, স্কুল গেল খুলে;
খেলাধুলো হৈ হৈ, মাতামাতি রৈ রৈ,
হায় হায়! সব গেছি ভুলে!
পড়াশুনা খালি পড়াশুনা
কোথাও বেড়াতে যাওয়া মানা,
স্কুলে গিয়ে খেয়ে খুব বকা—
আমরা সবাই ভ্যাবাচাকা;
গরমের ছুটি ছিল ভালো
ওরে ভাই খেলা তো ফুরালো!

১৩৮৬

ঝলমলীর পরিবর্তন

চান্দ্রেয়ী গোস্বামী—১০ বছর

ছোট্ট একটি মেয়ে। তার নাম টুম্পা। সে খুব সুন্দর দেখতে ছিল। বাবা-মার একমাত্র আদরিণী ছিল সে। তাদের বাড়ির সামনে ছোট্ট একটি বাগান ছিল। সেই বাগানে ছিল—হরেক রকম ফুল, তারা নাচে দোদুল-দুল। তাছাড়া ছিল—হরেক রকম প্রজাপতি, তাদের গায়ে হীরেমোতি। তাছাড়া—নানা রংয়ের শাখী, তাদের গায়ে সবুজ রাখী, আর ছিল সেই মিষ্টি মেয়ে। যার কথা আজ তোমাদের বলছি। সেই সংসার ছিল—সোনার সুখের সেই সংসার, কোনো দুঃখ নেই যে তাহার।

একদিন বাবা-মা ডাকতে সে ঘরে এল। তার মা বললেন, 'টুম্পারাণী, আজ থেকে তোমার ভালো নাম হল ঝলমলী।'

খুব আনন্দিত হয়ে ঝলমলী লাফাতে লাফাতে বাগানে দৌড়ে গেল। সূর্যের আলোতে তার মুখ ঝলমল করতে লাগল। তখন মখমলী নামে একটি সুন্দর ফুলকাটা রংয়ের প্রজাপতি তাকে দেখল। ভাবল, 'এর সঙ্গে আমার নামের মিল আছে। আমি এর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবো।' মখমলী তখন ঝলমলীর দিকে তাকিয়ে চোখের একটি পলক ফেলল। চোখের নিমেষে ঝলমলী আরো সুন্দর ফুলকাটা প্রজাপতি হয়ে গেল। তারপর তাদের বন্ধুত্ব অটুট রইল।

১৩৮৫

'যদি হই'

অনীতা চট্টোপাধ্যায়—১৫ বছর

আঁকাবাঁকা-শিং-অলা পাহাড়ী হরিণ যদি হই—
তবে ওই
ঘুমন্ত-পাহাড়টা একছুটে যাই পেরিয়ে—
জাফরানি-রোদ্দুরে সবুজ অরণ্যের এক মুঠো
বাতাস নিয়ে!

কর্কশ-পাথরের ভিজিয়ে শরীর
গান-গাওয়া ঝর্ণারা নামে ঝিরঝির,
ওইখানে কান পেতে শুনি সারারাত—
কোন্ পথে ঘুম-চোখে আসছে প্রভাত?
রাত্তিরে বিছানায় জেগে যদি বলো, 'রুণি কই?'
জেনো, ওই
চাঁদ-ওঠা আকাশের সব তারা জানে—
রুণি গেছে বহুদূরে; থম্‌থমে দেবদারু-বন তাকে
টানে।

প্রান্তর হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকে—
তাই বলে ভোলেনি সে মা-কে!
খেলার মাঠের ভিড়ে বুলো যদি খোঁজে, 'রুণি কই?'
বলো, ওই
সবুজ ঘাসের জমি দু-পায়ে মাড়িয়ে
রুণি গেছে বহুদূরে—পায়ে তার হরিণের গতিবেগ
নিয়ে;
কোনোদিন ফুরোনো-খেলা তাকে ডাকে—
তা বলে সে ভোলেনি বুলাকে!

আঁকাবাঁকা-শিং-ওলা পাহাড়ী হরিণ যদি হই—
তখন তো তোমাদের রুণি আমি নই, আর নই,
খেলাঘরে-ইস্কুলে—কোথাও খুঁজো না আমাকে—
পথ ডাকে,
তাই গেছি বহুদূর, কিচ্ছু না বলে,
শুধু রোববারে-ভরা জীবনের কোলে।
কথা যে শুনি না কারো, লক্ষ্মী-সোনার খুকু নই—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তবু ওই—
পথ-ভোলা ঘরছাড়া খুকুটাকে ভেবে
মায়ের দু-চোখ বেয়ে আসুক না নেবে
ক'টি ছোট ফোঁটা ঝিক্‌মিকে—
মাগো, ঘর ছেড়ে গেছে বলে তুমি যেন ভুলো না
রুণিকে।

১৩৭৯

রোদ বৃষ্টি রোদ

রূপালী বেগম—১০ বছর

রবিবার সকালে সূর্যের আলোয় চারিদিক ঝিক-মিক করছিল। দুপুর যখন একটা তখন আকাশে একরাশ কালো মেঘ এসে হাজির হল। মনে হল সূর্যের আলো আস্তে আস্তে নিভে যাচ্ছে। মেঘগুলো খুব ছুটোছুটি করছিল, তাই মনে হল বৃষ্টি আর হবে না। যেই না এরকম ভাবলাম, অমনি চারিদিক জল ভরিয়ে বৃষ্টি নামলো। কিন্তু একটু পরেই বৃষ্টি ঝরা থেমে গেল। তারপর আবার আকাশ পরিষ্কার হল। আর সূর্যের আলো আবার ঝিকমিক করে চারিদিক রাঙিয়ে দিল। তখন মনে হল যেন সূর্যিমামা মিটমিট করে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন।

১৩৮৭

টবিতা

সুদীপ্তা পাল—১০ বছর

দু'বেলাই ভাত খাই টাত খেতে পাই না
পয়সা পেলেই খুশী, টয়সা তো চাই না।
ঘুম আসে রোজ রাতে টুম কভু আসে না,
আহ্লাদে হাসে সব, কোথা কেউ টাসে না।
ঠিক কাকে বলে জানি, ঠাক তবু বুঝি না,
হারালে খুঁজতে হয়, টারালে তো খুঁজি না।

১৩৮৯

অঙ্ক শিক্ষা

শুভব্রত রায়—১৪ বছর

এ কেবল দিনে-রাত্রে চক ঘষে বোর্ড গাত্রে
বৃথা চেষ্টা অঙ্ক শিখাবারে
কহিলা, 'দেখিতে হবে কতটা পিটিলে তবে
ছেলেগুলি শিখে একেবারে।'
এই বলে মহাপাত্র হাতে লয়ে বেত মাত্র
আরম্ভিলা অঙ্ক শিখাবারে,
বেতায়ে সে ছেলেদেরে করে দিল একটেরে,
তবু কেহ অঙ্ক নাহি পারে!

১৩৭২

একটি শীতের রাত্রি

সরসিজ সেনগুপ্ত—৭ বছর

একদিন রাত্তির বেলায় পড়ল বেজায় শীত। সেদিন সারাদিন সূর্য উঠল না, মেঘে আকাশ ভরা থাকল।

লেপের তলায় শুয়েও শীত যায় না। গরম জামা পরেও শীত যায় না। সেদিন সারারাত ধরে বৃষ্টি পড়তে লাগল। পুরো ছাদ ভিজে গেছে।

রাত্তির বেলায় সেদিন আমাদের রান্নাঘরের দরজার তলা দিয়ে হাওয়া আসছিল। সেদিন জল ছুঁলে মনে হচ্ছিল বরফ ছুঁচ্ছি। খালি পায়ে মাটিতে পা রাখা যাচ্ছিল না। সব জিনিস যেন বরফ হয়ে আছে। সেদিনকার কথা চিরজীবন মনে থাকবে।

১৩৮২

---

www.BanglaBook.org

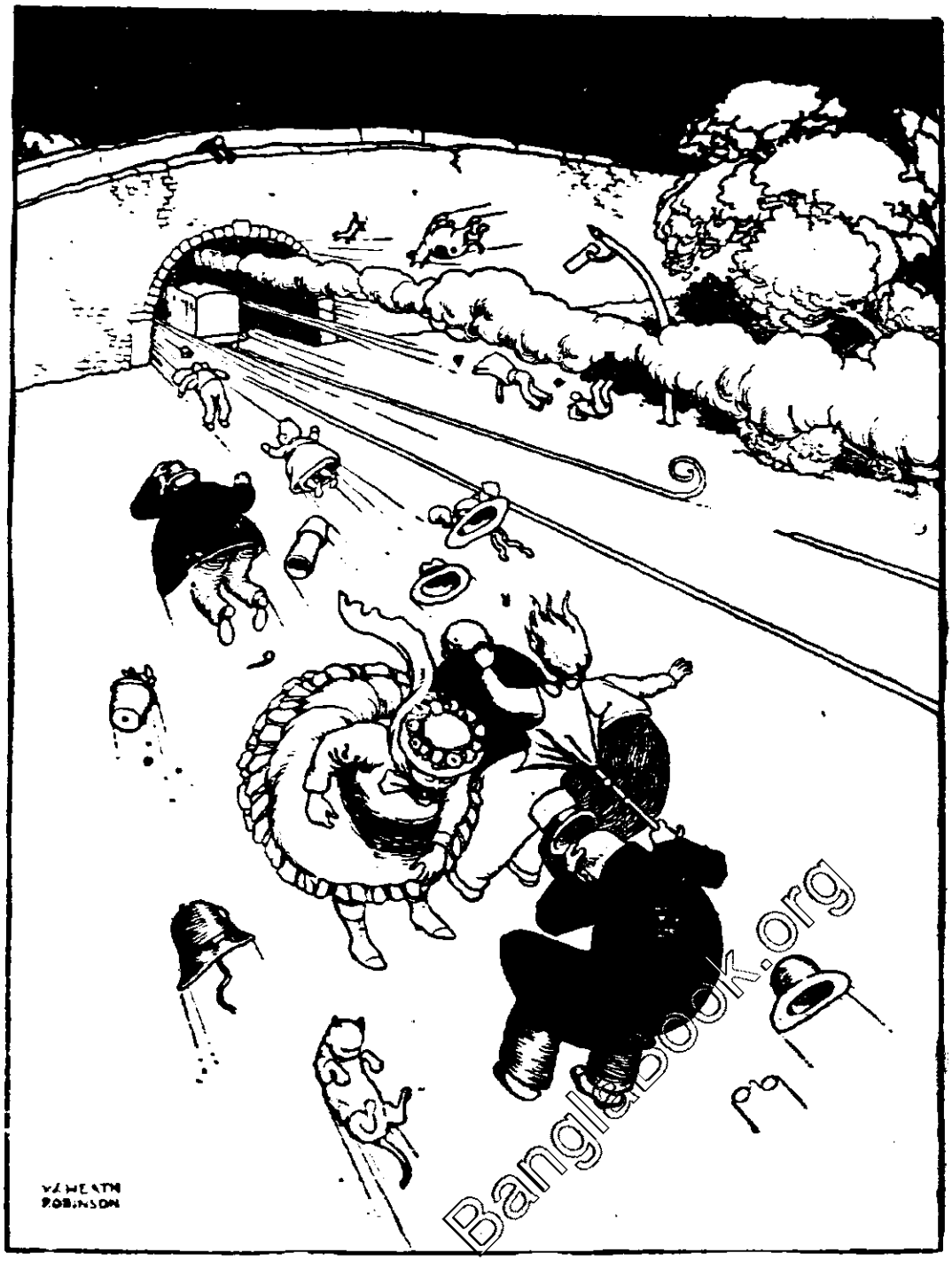

ঝড়ের বেগেতে মেল ট্রেন ছোটে
লোকে হিমশিম খেল তার চোটে।

www.BanglaBook.org

গোয়েন্দা ফেলুদার উপন্যাস

গোলোকধাম রহস্য

সত্যজিৎ রায়

'জয়দ্রথ কে ছিল?'

'দুর্যোধনের বোন দুঃশলার স্বামী।'

'আর জরাসন্ধ?'

'মগধের রাজা।'

'ধৃষ্টদ্যুম্ন?'

'দ্রৌপদীর দাদা।'

'অর্জুন আর যুধিষ্ঠিরের শাঁখের নাম কি?'

'অর্জুনের দেবদত্ত, যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয়।'

'কোন অস্ত্র ছুঁড়লে শত্রুরা মাথা গুলিয়ে সেমসাইড করে বসে?'

'ত্বাষ্ট্র।'

'ভেরি গুড।'

যাক বাবা, পাশ করে গেছি! ইদানীং রামায়ণ-মহাভারত হল ফেলুদার যাকে বলে স্টেপ্‌ল রীডিং। সেই সঙ্গে অবিশ্যি আমিও পড়ছি। আর তাতে কোন আপশোষ নেই। এ ত আর ওষুধ গেলা না, এ হল একধার থেকে নন্‌স্টপ ভুরিভোজ। গল্পের পর গল্পের পর গল্প। ফেলুদা বলে ইংরিজিতে বইয়ের বাজারে আজকাল একটা বিশেষণ চালু হয়েছে—আনপুটডাউ-নেব্‌ল। যে বই একবার পড়ব বলে পিকআপ করলে আর পুট ডাউন করবার জো নেই। রামায়ণ-মহাভারত হল সেইরকম আন-পুটডাউনেব্‌ল। ফেলুদার হাতে এখন কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের দ্বিতীয় খণ্ড। আমারটা অবিশ্যি কিশোর সং-স্করণ। লালমোহনবাবু বলেন ওঁর নাকি কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনেকখানি মুখস্থ; ওঁর ঠাকুমা পড়তেন, সেই শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে। আমাদের বাড়িতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ নেই; ভাবছি একটা জোগাড় করে জটায়ুর স্মরণশক্তিটা পরীক্ষা করে দেখব। ভদ্রলোক আপাতত ঘরবন্দী অবস্থায় পুজোর উপন্যাস লিখছেন, তাই দেখা-সাক্ষাৎটা একটু কম।

বই থেকে মুখ তুলে রাস্তার দরজাটার দিকে চাইতে হল ফেলুদাকে। কলিং বেল বেজে উঠেছে। হিজলীতে একটা খুনের রহস্য সমাধান করে গত শুক্রবার ফিরেছে ফেলুদা। এখন আয়েশের মেজাজ, তাই বোধহয় বেলের শব্দে তেমন আগ্রহ দেখাল না। ও যা পারিশ্রমিক নেয় তাতে মাসে একটা করে কেস পেলেই দিব্যি চলে যায়। জটায়ুর ভাষায় ফেলু-দার জীবনযাত্রা 'সেন্ট পার্সেন্ট অনাড়ম্বর'। এখানে বলে রাখি, জটায়ুর জিভের সামান্য জড়তার জন্য 'অনাড়ম্বর'টা মাঝে মাঝে 'অনারম্বড়' হয়ে যায়। সেটা শোধরাবার জন্য ফেলুদা ওঁকে একটা সেনটেন্স গড়গড় করে বলা অভ্যেস করতে বলেছিল; সেটা হল—'বারো হাঁড়ি রাবড়ি বড় বাড়াবাড়ি।' ভদ্রলোক এক-বার বলতে গিয়েই চারবার হোঁচট খেয়ে গেলেন।

ফেলুদা বলে, 'নতুন চরিত্র যখন আসবে, তখন গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি বর্ণনা দিয়ে দিবি। তুই না দিলে পাঠক নিজেই একটা চেহারা কল্পনা করে নেবে; তারপর হয়ত দেখবে যে তোর বর্ণনার সঙ্গে তার কল্পনার অনেক তফাত।' তাই বলছি, ঘরে যিনি ঢুকলেন তাঁর রং ফর্সা, হাইট আন্দাজ পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি, বয়স পঞ্চাশ-টঞ্চাশ, কানের দু'পাশের চুল পাকা, থুতনির মাঝখানে একটা আঁচিল, পরনে ছাই রঙের সাফারি স্যুট। ঘরে ঢুকে যেভাবে গলা খাঁকরালেন তাতে একটা ইতস্তত ভাব ফুটে ওঠে, আর খাঁকরানির সময় ডান হাতটা মুখের কাছে উঠে আসাতে মনে হল ভদ্রলোক একটু সাহেবীভাবাপন্ন।

'সরি, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসতে পারিনি,' সোফার এক পাশে বসে বললেন আগন্তুক—'আমাদের ওদিকে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়িতে লাইনগুলো সব ডেড।'

ফেলুদা মাথা নাড়ল। খোঁড়াখুঁড়িতে শহরের কী অবস্থা সেটা আমাদের সকলেরই জানা আছে।

'আমার নাম সুবীর দত্ত।'—গলার স্বরে মনে হয় দিব্যি টেলিভিশনে খবর পড়তে পারেন।—'ইয়ে, আপনিই ত প্রাইভেট ইনভেস্‌—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমি এসেছি আমার দাদার ব্যাপারে।'

ফেলুদা চুপ। মহাভারত বন্ধ অবস্থায় তার কোলের উপরে, তবে একটা বিশেষ জায়গায় আঙুল গোঁজা রয়েছে।

'অবিশ্যি তার আগে আমার পরিচয়টা একটু দেওয়া দরকার। আমি করবেট অ্যান্ড নরিস কোম্পানীতে সেলস্‌ এগ-জিকিউটিভ। ক্যামাক স্ট্রীটের দীনেশ চৌধুরীকে বোধহয় আপনি চেনেন। উনি আমার কলেজের সহপাঠী ছিলেন।'

দীনেশ চৌধুরী ফেলুদার একজন মক্কেল সেটা জানতাম।

'আই সী,' ভীষণ সাহেবী কায়দায় গম্ভীর গলায় বলল ফেলুদা। ভদ্রলোক এবার তাঁর দাদার কথায় চলে গেলেন—

'দাদা একালে বায়োকেমিস্ট্রিতে খুব নাম করেছিলেন। গৌরব দত্ত। ভাইরাস নিয়ে রিসার্চ করেছিলেন। এখানে নয়, আমেরিকায়। মিশিগ্যান ইউনিভার্সিটিতে। ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে করতে একটা এক্সপ্লোশন হয়। দাদার প্রাণ নিয়ে টানা-টানি হয়; কিন্তু শেষে ওখানকারই হাসপাতালের এক ডাক্তার ওঁকে বাঁচিয়ে তোলে। তবে চোখ দুটোকে বাঁচানো যায়নি।'

'অন্ধ হয়ে যান?'

'অন্ধ। সেই অবস্থায় দাদা দেশে ফিরে আসেন। ওখানে থাকতেই একজন আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করেন; অ্যাক্সি-

www.BanglaBook.org

ডেন্টের পর মহিলা দাদাকে ছেড়ে চলে যান। তারপর আর দাদা বিয়ে করেন নি।'

'তাঁর গবেষণাও ত তাহলে শেষ হয় নি?'

'না। সেই দুঃখেই হয়ত দাদা প্রায় মাস ছয়েক কারোর সঙ্গে কথা বলেন নি। আমরা ভেবেছিলাম হয়ত মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শেষে ক্রমে মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন।'

'এখন কী অবস্থা?'

'বিজ্ঞানে এখনো উৎসাহ আছে সেটা বোঝা যায়। একটি ছেলেকে রেখেছেন—ওঁর হেল্পার বা সেক্রেটারি বলতে পারেন—সেও বায়োকেমিস্ট্রির ছাত্র ছিল—তার একটা কাজ হচ্ছে সায়েন্স ম্যাগাজিন থেকে প্রবন্ধ পড়ে শোনানো। এমনিতে যে দাদা একেবারে হেল্পলেস তা নন; বিকেলে আমাদের বাড়ির ছাতে একাই লাঠি হাতে পায়চারি করেন। এমন কি বাড়ির বাইরেও রাস্তার মোড় পর্যন্ত একাই মাঝে মাঝে হেঁটে আসেন। বাড়িতে এঘর ওঘর করার সময় ওঁর কোনো সাহায্যের দরকার হয় না।'

'ইনকাম আছে কিছু?'

'বায়োকেমিস্ট্রির উপর দাদার একটা বই বেরিয়েছিল আমেরিকা থেকে, তার থেকে একটা রোজগার আছে।'

'ঘটনাটা কী?'

'আজ্ঞে?'

'মানে, আপনার এখানে আসার কারণটা...'

'বলছি।'

পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন সুবীর দত্ত—

'দাদার ঘরে কাল রাত্তিরে চোর এসেছিল।'

'সেটা কী করে বুঝলেন?'

ফেলুদা এতক্ষণে হাত থেকে মহাভারত নামিয়ে সামনের টেবিলের উপর রেখে প্রশ্নটা করল।

'দাদা নিজে বোঝেন নি। ওঁর চাকরটাও যে খুব বুদ্ধিমান তা নয়। নটার সময় ওঁর সেক্রেটারি এসে ঘরের চেহারা দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারে। ডেস্কের দুটো দেরাজই আধখোলা, কাগজপত্র কিছু মেঝেতে ছড়ানো, ডেস্কের উপরের জিনিসপত্র ওলটপালট, এমন কি গোদরেজের আলমারির চাবির চারপাশে ঘষটানোর দাগ; বোঝাই যায় কেউ আলমারিটা খোলার চেষ্টা করেছে।'

'আপনাদের পাড়ায় চুরি হয়েছে ইদানীং?'

'হয়েছে। আমাদের বাড়ির দুটো বাড়ি পরে। পাড়ায় এখন দুটো পুলিশের লোক টহল দেয়। পাড়া বলতে বালিগঞ্জ পার্ক। আমাদের বাড়িটা প্রায় আশি বছরের পুরোন। ঠাকুরদার তৈরি। খুলনায় জমিদারী ছিল আমাদের। ঠাকুরদা চলে আসেন কলকাতায় এইটিন নাইনটিতে। রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ম্যানুফ্যাকচারিং-এর ব্যবসা শুরু করেন। কলেজ স্ট্রীটে বড় দোকান ছিল আমাদের। বাবাও চালিয়েছিলেন কিছুদিন ব্যবসা। বছর ত্রিশেক আগে উঠে যায়।'

'আপনার বাড়িতে এখন লোক ক'জন?'

'আগের তুলনায় অনেক কম। বাবা-মা দুজনেই মারা গেছেন। আমার স্ত্রীও, সেভেনটি ফাইভে। আমার দুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, বড় ছেলে জার্মানিতে। এখন মেম্বার বলতে আমি, দাদা, আর আমার ছোট ছেলে। দুটি চাকর আর একটি রান্নার লোক আছে। আমরা দোতলায় থাকি। একতলাটা দু'ভাগ করে ভাড়া দিয়েছি।'

'কারা থাকে সেখানে?'

'সামনের ফ্ল্যাটটিতে থাকেন মিঃ দস্তুর। ইলেকট্রিক্যাল গুড্‌সের ব্যবসা। পিছনে থাকেন মিঃ সুখওয়ানি, অ্যান্টিকের দোকান আছে লিন্ডসে স্ট্রীটে।'

'এদের ঘরে চোর ঢোকে নি? শুনে ত বেশ অবস্থাপন্ন বলে মনে হয়।'

'পয়সা ত আছেই। ফ্ল্যাটগুলোর ভাড়া আড়াই হাজার করে। সুখওয়ানির ঘরে দামী জিনিস আছে বলে ও দরজা বন্ধ করে শোয়। দস্তুর বলে বন্ধ ঘরে ওর সাফোকেশন হয়।'

'চোর আপনার দাদার ঘরে ঢুকেছিল কি নিতে অনুমান করতে পারেন?'

'দেখুন, দাদার অসমাপ্ত গবেষণার কাগজপত্র দাদার আলমারিতেই থাকে, আর সেগুলো যে অত্যন্ত মূল্যবান তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবিশ্যি সাধারণ চোর আর তার মূল্য কি বুঝবে। আমার ধারণা চোর টাকা নিতেই ঢুকেছিল। অন্ধ লোকের ঘরে চুরিটা একটা সুবিধে আছে সেটা ত বুঝতেই পারেন?'

'বুঝেছি'; বলল ফেলুদা, 'অন্ধ মানে বোধহয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই, কারণ চেক সই করা ত...'

'ঠিক বলেছেন। বই বাবদ দাদা যা টাকা পান সব আমার নামে আসে। আমার অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। তারপর আমি চেক কেটে টাকা তুলে দাদাকে দিয়ে দিই। সেই ব্যাঙ্কের টাকা সব ওই গোদরেজের আলমারিতেই থাকে। আমার আন্দাজ হাজার ত্রিশেক টাকা ওই আলমারিতে রয়েছে।'

'চাবি কোথায় থাকে?'

'যতদূর জানি, দাদার বালিশের নিচে। বুঝতেই পারছেন, দাদা অন্ধ বলেই দুশ্চিন্তা। রাত্তিরে দরজা খুলে শোন, চৌকাঠের বাইরে শোয় চাকর কৌমুদী, যাতে মাঝরাত্তিরে প্রয়োজনে ডাক দিলে আসতে পারে। ধরুন যদি তেমন বেপরোয়া চোর হয়, আর চাকরের ঘুম না ভাঙে, তাহলে ত দাদার আত্মরক্ষার কোনো উপায় থাকে না। অথচ পুলিশে উনি খবর দেবেন না। বলেন ওরা কেবল জানে জেরা করতে, কাজের বেলায় ঢুঢু, সব ব্যাটা ঘুষখোর ইত্যাদি। তাই আপনার কথা বলতে উনি রাজী হলেন। আপনি যদি একবারটি আমাদের বাড়িতে আসেন, তাহলে অন্তত প্রিভেনশনের ব্যাপারে কী করা যায় সেটা একটু ভেবে দেখতে পারেন। এমন কি বাইরের চোর না ভেতরের চোর সেটাও একবার—'

'ভেতরের চোর?'

আমি আর ফেলুদা দুজনেই উৎকর্ণ, মানে কান খাড়া।

ভদ্রলোক চুরুটের ছাই অ্যাশট্রেতে ফেলে গলাটা যতটা পারা যায় খাদে নামিয়ে এনে বললেন, 'দেখুন মশাই, আমি স্পষ্টবক্তা। আপনার কাছে যখন এসেছি, তখন জানি ঢেকেঢুকে কথা বললে আপনার কোনো সুবিধে হবে না। প্রথমত আমাদের দুজন ভাড়াটের একটিকেও আমার খুব পছন্দ না। সুখওয়ানি এসেছে বছর তিনেক হল। আমি নিজে জানি না, কিন্তু যারা পুরোন আর্টের জিনিস-টিনিস কেনে, তেমন লোকের কাছে শুনেছি সুখওয়ানি লোকটা সিধে নয়। পুলিশের নজর আছে

www.BanglaBook.org

ওর ওপর।'

'আর অন্য ভাড়াটে?'

'দস্তুর এসেছে মাস চারেক হল। ও ঘরটায় আমার বড় ছেলে থাকত, সে পার্মানেন্টলি দেশের বাইরে। ডুসেলডর্ফে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চাকরি করে, জার্মান মেয়ে বিয়ে করেছে। দস্তুর লোকটা সম্বন্ধে বদনাম শুনিনি, তবে সে এত অতিরিক্ত রকম চাপা যে সেটাই সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর, ইয়ে—'

ভদ্রলোক থামলেন। তারপর বাকি কথাটা বললেন মুখ নামিয়ে, দৃষ্টি ছাইদানিটার দিকে রেখে।

'শংকর, আমার ছোট ছেলে, একেবারে সংস্কারের বাইরে চলে গেছে।'

ভদ্রলোক আবার চুপ। ফেলুদা বলল, 'কত বড় ছেলে?'

'তেইশ বছর বয়স। গত মাসে জন্মতিথি গেল, যদিও তার মুখ দেখি নি সেদিন।'

'কী করে?'

'নেশা, জুয়া, ছিনতাই, গুণ্ডাগিরি কোনটাই বাদ নেই। পুলিশের খপ্পরে পড়েছে তিনবার। আমাকেই গিয়ে ছাড়িয়ে আনতে হয়েছে। আমাদের পরিবারের একটা খ্যাতি আছে সেটা ত বুঝতেই পারছেন, তাই নাম করলে এখনো কিছুটা ফল পাওয়া যায়। কিন্তু সে নাম আর কদ্দিন টিকবে জানি না।'

'চোর যেদিন আসে সেদিন ও বাড়িতে ছিল?'

'রাত্তিরে খেতে এসেছিল—সেটাও রোজ আসে না—তারপর আর দেখি নি।'

ঠিক হল আজই বিকেলে আমরা একবার যাব বালিগঞ্জ পার্কে। কেসটাকে এখনো ঠিক কেস বলা যায় না, কিন্তু আমি জানি। বিস্ফোরণে অন্ধ হয়ে যাওয়া বৈজ্ঞানিকের ব্যাপারটা ফেলুদার মন টেনেছে। তার মাথায় নিশ্চয়ই ঘুরছে ধৃতরাষ্ট্র।

খবরের কাগজের কাটিং-এর বাইশ নম্বর খাতা থেকে মিশিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে বিস্ফোরণে উদীয়মান বাঙালী জীবরাসায়নিক নীহাররঞ্জন দত্ত-র চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার খবরটা খুঁজে বার করে দিতে সিধু জ্যাঠার লাগল সাড়ে তিন মিনিট। তার মধ্যে অবিশ্যি দু'মিনিট গেল ফেলুদা অ্যান্দিন ডুব মেরে থাকার জন্য তাকে ধমকানিতে। সিধু জ্যাঠা আমাদের সত্যি জ্যাঠা না হলেও আত্মীয়ের বাড়া। কোনো অতীতের ঘটনার বিষয় জানতে হলে ফেলুদা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে না গিয়ে সিধু জ্যাঠার কাছে যায়। তাতে কাজ হয় অনেক বেশি তাড়াতাড়ি আর অনেক বেশি ফুর্তিতে।

ফেলুদা প্রসঙ্গটা তুলতেই সিধু জ্যাঠা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'নীহার দত্ত? যে ভাইরাস নিয়ে রিসার্চ করছিল? এক্সপ্লোশনে চোখ হারায়?'

বাপ্‌রে বাপ্‌!—কী স্মৃতিশক্তি! বাবা বলেন শ্রুতিধর। ফেলুদা বলে ফোটোগ্রাফিক মেমরি; একবার কোনো ইন্টারেস্টিং খবর পড়লে বা শুনলে তৎক্ষণাৎ মগজে চিরকালের মত ছাপা হয়ে যায়। —'কিন্তু সে ত একা ছিল না!'

এ খবরটা নতুন।

'একা ছিল না মানে?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

তার মানে, যদ্দুর মনে পড়ছে—' সিধু জ্যাঠা ইতিমধ্যে তাঁর বুকশেল্‌ফের সামনে গিয়ে খবরের কাটিং-এর খাতা টেনে বার করেছেন—'এই গবেষণায় তাঁর একজন পার্টনার ছিল—হ্যাঁ এই যে।'

বাইশ নম্বর খাতার একটা পাতা খুলে সিধু জ্যাঠা খবরটা পড়লেন। ১৯৬২-র খবর। তাতে জানা গেল যে নীহার দত্তের গবেষণার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কাজ করছিলেন আরেকটি বাঙালী বায়োকেমিস্ট, নাম সুপ্রকাশ চৌধুরী। অ্যাক্সিডেন্টে চৌধুরীর কোনো ক্ষতি হয় নি, কারণ সে ছিল ঘরের অন্য দিকে। এই চৌধুরীর জন্যই নাকি নীহার দত্ত নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন, কারণ আগুন নেবানো ও তৎক্ষণাৎ নীহার দত্তকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থাটা চৌধুরীই করেন।

'এই চৌধুরী এখন—?'

'তা জানি না,' বললেন সিধু জ্যাঠা। 'সে খবর আমার কাছে পাবে না। এদের জীবনে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটলে যদি সেটা খবরের কাগজে স্থান পায় তবেই সেটা আমার নজরে আসে। আমি যেচে কারুর খবর নিই না। কী দরকার? আমার খবর ক'জন নেয় যে ওদের খবর আমি নেব? তবে এটা ঠিক যে, এই চৌধুরী যদি বিজ্ঞানের জগতে সাড়া জাগানো একটা কিছু করত, তাহলে সে খবর আমি নিশ্চয়ই পেতাম।'

২

সাতের এক বালিগঞ্জ পার্কের বাড়িতে যে বয়সের ছাপ পড়েছে সেটা আর বলে দিতে হয় না। এটাও ঠিক যে বাড়ির মালিকের যদি সে ছাপ ঢাকবার ক্ষমতা থাকত, তাহলে ঢাকা পড়ত নিশ্চয়ই। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে দত্ত-পরিবারের অবস্থা এখন খুব একটা ভালো নয়। বাগানটা বোধহয় বাড়ির পিছন দিকে। সামনে একটা গোল ঘাসের চাকতির উপর একটা অকেজো ফোয়ারা, সেই গোলের দু'পাশ দিয়ে নুড়িবেছানো রাস্তা চলে গেছে গাড়িবারান্দার দিকে। গেটের গায়ে শ্বেতপাথরের ফলকে 'গোলোকধাম' দেখে ফেলুদা কৌতূহল প্রকাশ করাতে সুবীরবাবু বললেন যে ওঁর ঠাকুরদাদার নাম ছিল গোলোকবিহারী দত্ত। বাড়িটা তিনিই তৈরি করেছিলেন।

গোলোকধাম যে এককালে দ্যাখণ বাড়ি ছিল সেটা এখনো দেখলে বোঝা যায়। গাড়িবারান্দা থেকে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে শ্বেতপাথরের বাঁধানো ল্যান্ডিং-এর বাঁ দিক দিয়ে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। সামনে একটা দরজা দিয়ে ভিতরে করিডর দেখা যাচ্ছে, তার ডান দিকে নাকি পর পর দুটো ফ্ল্যাট। বাঁ দিকে একটা প্রকাণ্ড হলঘর, যেটা দত্তরা ভাড়া দেন নি। এই ঘরে নাকি এককালে অনেক খানাপিনা গানবাজনা হয়েছে।

হলঘরের ঠিক ওপরেই হল দোতলার বৈঠকখানা। আমরা সেখানেই গিয়ে বসলাম। মাথার ওপর কাপড়ে মোড়া চিরকালের মত অকেজো ঝাড়লণ্ঠন, তার যে কত ডালপালা তার ঠিক নেই। একদিকে দেয়ালে গিল্ট-করা ফ্রেমে বিশাল আয়না, সুবীরবাবু বললেন সেটা বেলজিয়াম থেকে আনানো। মেঝেতে পুরু গালিচার এখানে ওখানে খুবলে গিয়ে দাবার ছকের মত সাদা-কালো শ্বেতপাথরের মেঝেটা বেরিয়ে পড়েছে।

সুবীরবাবু সুইচ টিপে একটা স্ট্যান্ডার্ড ল্যাম্প জ্বালিয়ে

www.BanglaBook.org

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিতে ঘরের অন্ধকার খানিকটা দূর হল। আমরা সোফায় বসতে যাব, এমন সময় বাইরের করিডর থেকে একটা শব্দ পাওয়া গেল—খট্ খট্ খট্ খট্।

লাঠি আর চটি মেশানো শব্দ।

শব্দটা চৌকাঠের বাইরে এসে মুহূর্তের জন্য থামল, আর তার পরেই লাঠির মালিকের প্রবেশ। সেই সঙ্গে আমরা তিনজনেই দণ্ডায়মান।

'অচেনা গলায় আওয়াজ পেলাম—এ'রা ঐলেন বুঝি?'

গম্ভীর গলা, ছ'ফুট লম্বা চেহারার সঙ্গে সম্পূর্ণ মানানসই। এনার চুল সব পাকা, কিছুটা এলোমেলো, চোখে কালো চশমা, পরনে আদ্দির পাঞ্জাবী আর সিল্কের পায়জামা। বিস্ফোরণ যে শুধু চোখই নষ্ট করে নি, মুখের অন্যান্য অংশেও যে তার ছাপ রেখে গেছে, সেটা ল্যাম্পের চাপা আলোতেও বোঝা যাচ্ছে।

সুবীরবাবু দাদাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলেন।—'বোস, দাদা।'

'বসছি। আগে এ'দের বসাও।'

'নমস্কার,' ফেলুদা বলল, 'আমার নাম প্রদোষ মিত্র। আমার বাঁ পাশে আমার কাজিন তপেশ।'

আমিও খাটো গলায় একটা নমস্কার বলে দিলাম। শুধু হাত জোড় করাটা ত অন্ধ লোকের কাছে মাঠে মারা যাবে।

'আমারই মত হাইট বলে মনে হচ্ছে মিত্তির মশাইয়ের, আর কাজিন বোধ করি পাঁচ সাত কি সাড়ে সাত।'

'আমি পাঁচ সাত', বলে ফেললেন তপেশরঞ্জন মিত্র।

মনে মনে ভদ্রলোকের আন্দাজের তারিফ না করে পারলাম না।

'বসুন এবং বোস' বলে ভাইয়ের সাহায্য না নিয়েই আমাদের সামনের সোফায় বসে পড়লেন নীহার দত্ত।—'চায়ের কথা বলেছ?'

'বলেছি', বললেন সুবীর দত্ত।

ফেলুদা অভ্যাসমত ভনিতা না করে সোজা কাজের কথায় চলে গেল।

'আপনি যে রিসার্চ করছিলেন, সে ব্যাপারে বোধ হয় আপনার একজন পার্টনার ছিল, তাই না?'

সুবীরবাবুর উসখুসে ভাব দেখে বুঝলাম যে এ ব্যাপারটা তিনিও জানতেন, এবং আমাদের না বলার জন্য অপ্রস্তুত বোধ করেছেন।

'পার্টনার নয়,' বললেন নীহার দত্ত—'অ্যাসিসট্যান্ট। সুপ্রকাশ চৌধুরী। সে আমেরিকাতেই পড়াশুনা করেছিল। পার্টনার বললে বেশি বলা হবে। আমাকে ছাড়া তার এগোনোর পথ ছিল না।'

'তিনি এখন কোথায় বা কী করছেন সে খবর জানেন?'

'না।'

'অ্যাক্সিডেন্টের পর তিনি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন নি?'

'না। এটুকু বলতে পারি যে তার একাগ্রতার অভাব ছিল। বায়োকেমিস্ট্রি ছাড়াও অন্য পাঁচ রকম ব্যাপারে তার ইন্টারেস্ট ছিল।'

'বিস্ফোরণটা কি অসাবধানতার জন্য হয়?'

'আমি নিজে সজ্ঞানে কখনো অসাবধান হই নি।'

চা এল। ঘরটা কেমন যেন থমথম করছে। সুবীরবাবুর দিকে আড়চোখে দেখলাম। তাঁরও যেন তটস্থ ভাব। ফেলুদা একদৃষ্টে চেয়ে আছে কালো চশমাটার দিকে।

চায়ের সঙ্গে সিঙাড়া আর রাজভোগ। আমি প্লেটটা হাতে তুলে নিলাম। ফেলুদা যেন খাওয়ার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই। ও একটা চারমিনার ধরিয়ে নিয়ে বলল—

'আপনি যে ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা করছিলেন, সেটা তাহলে অসমাপ্তই রয়ে গেছে!'

'সে দিকে কেউ অগ্রসর হলে খবর পেতাম নিশ্চয়ই।'

'সুপ্রকাশবাবু সে নিয়ে আর কোনো কাজ করেন নি সেটা আপনি জানেন?'

'এটুকু জানি যে আমার নোট্স ছাড়া তার কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। গবেষণার শেষ পর্বের নোট্স আমার কাছে ছিল, আমার ব্যক্তিগত লকারে। তার নাগাল পাওয়া বাইরের কারোর সাধ্যি ছিল না। সেসব কাগজপত্র আমার সঙ্গেই দেশে ফিরে আসে, আমার কাছেই আছে। এটা জানি সে গবেষণা সফল হলে নোবেল প্রাইজ এসে যেত আমার হাতের মুঠোয়। ক্যানসারের চিকিৎসার একটা রাস্তা খুলে যেত।'

ফেলুদা চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়েছে। আমিও ইতিমধ্যে চুমুক দিয়ে বুঝেছি এ চা ফেলুদার মত খুঁতখুঁতে লোককেও খুশি করবে। কিন্তু চুমুক দিয়ে তার মুখের অবস্থা কী হয় সেটা আর দেখা হল না।

ঘরের বাতি নিভে গেছে। লোড শেডিং।

'ক'দিন থেকে ঠিক এই সময়টাতেই যাচ্ছে', সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে বললেন সবীরবাবু।—'কৌমুদী!'

বাইরে এখনো অল্প আলো রয়েছে; সেই আলোতেই সুবীরবাবু চাকরের খোঁজে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'বাতি গেল বুঝি?' প্রশ্ন করলেন নীহার দত্ত। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এতে আমার কিছু এসে যায় না।'

গ্র্যান্ডফাদার ক্লকটা ঠিক এই সময় আমাদের চমকে দিয়ে বেজে উঠল—ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং। ছ'টা।

সুবীরবাবু ফিরলেন, পিছনে মোমবাতি হাতে চাকর কৌমুদী।

মাঝের টেবিলে মোমবাতি রাখায় সকলের মুখ আবার দেখা যাচ্ছে। নীহারবাবুর কালো চশমার দুই কাচে দুটি কম্পমান হলদে বিন্দু। মোমবাতির শিখার ছায়া।

ফেলুদা আবার আরেকটা চুমুক দিয়ে আবার চশমার দিকে চেয়ে বলল, 'আপনার গবেষণার নোট্স যদি অন্য কোনো বায়োকেমিস্টের হাতে পড়ে তাহলে তাঁর পক্ষে সেটা লাভজনক হবে কি?'

'নোবেল প্রাইজটাকে যদি লাভ বলে মনে করেন তাহলে হতে পারে বৈকি।'

'আপনার কি মনে হয় এই কাগজপত্র চুরি করার জন্য চোর আপনার ঘরে ঢুকেছিল?'

'সেরকম মনে করার কোনো কারণ নেই।'

'আরেকটা প্রশ্ন। আপনার এই নোট্সের কথা আর কে জানে?'

'বৈজ্ঞানিক মহলে অনেকেই এটার অস্তিত্ব অনুমান করতে পারে। আর জানে আমার বাড়ির লোকেরা আর আমার সেক্রে-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টারী রণজিৎ।'

'বাড়ির লোক বলতে কি একতলার দুই ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের কথাও বলছেন?'

'তারা কী জানে না-জানে তা আমি জানি না। এরা ব্যবসাদার লোক। জানলেও কোনো ইন্টারেস্ট হবার কথা না। অবিশ্যি আজকাল ত সব জিনিস নিয়েই ব্যবসা চলে; এ ধরনের কাগজপত্র নিয়েই বা চলবে না কেন। বিজ্ঞানী হলেই ত আর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয় না।'

নীহারবাবু উঠে পড়লেন; সেই সঙ্গে আমরাও।

'আপনার ঘরটা একবার দেখতে পারি কি?' ফেলুদা প্রশ্ন করল। ভদ্রলোক চৌকাঠের মুখে থেমে গিয়ে বললেন, 'দেখবেন বৈকি। সুবীর দেখিয়ে দেবে। আমি ছাতে সান্ধ্যভ্রমণটা সেরে আসি।'

করিডরে বেরিয়ে এলাম চারজনে। অন্ধকার আরো ঘনিয়ে এসেছে। করিডোরের ডাইনে বাঁয়ে ঘরগুলোর ভিতর থেকে মোমবাতির ক্ষীণ আলো বাইরে এসে পড়েছে। নীহারবাবু লাঠি ঠক্ ঠক্ করে ছাতের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। শুনলাম তিনি বলছেন, 'স্টেপ গোনা আছে। সতের স্টেপ গিয়ে বাঁয়ে ঘুরে সিঁড়ি। সেভেন প্লাস এইট—পনেরো ধাপ উঠে ছাত। প্রয়োজন হলে খবর দেবেন...'

৩

নীহারবাবুর বেশ বড় ঘরের একপাশে অনেকখানি জুড়ে পুরোন আমলের খাট। খাটের পাশে একটা ছোট গোল টেবিল। তাতে ঢাকনি-চাপা গেলাসে জল, আর তার পাশে রাঙতায় মোড়া গোটা দশেক বড়ি। বোধহয় ঘুমের ওষুধ।

এই টেবিলের পাশে জানালার সামনে একটা আরাম কেদারা। তার পিঠে অনেক দিনের ব্যবহারের ফলে বেতের বুনুনিতে কালসিটে পড়ে গেছে। মনে হল এই আরাম কেদারাতেই বেশির ভাগ সময় কাটান নীহারবাবু।

এছাড়া আছে একটা কাজের টেবিল—যার উপর এখন একটা মোমবাতি টিমটিম করছে—একটা স্টীলের চেয়ার, টেবিলের উপর লেখার সরঞ্জাম, চিঠির র‍্যাক, একটা পুরোনো টাইপরাইটার আর এক তাড়া বৈজ্ঞানিক পত্রিকা।

এই টেবিলের পাশেই, দরজার ঠিক বাঁয়ে, রয়েছে গোদরেজের আলমারিটা।

ঘরে ঢুকেই একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফেলুদা তার মিনি টর্চ দিয়ে আলমারির চাবির গর্তটা ভালো করে দেখে বলল, 'খোলার চেষ্টার অভাব হয় নি। গর্তের চারপাশে দাগ।' তারপর এগিয়ে গিয়ে বেডসাইড টেবিল থেকে বর্ষীয়ান পাতাটা তুলে নিয়ে বলল, 'সোনেরিল।...বুঝেছিলাম নীহারবাবু বেশ কড়া ওষুধ খান। না হলে ঘুম ভেঙে যাবার কথা।'

তারপর চৌকাঠের বাইরে দাঁড়ানো চাকর কৌমুদীর দিকে ফিরে বলল, 'তোমার ঘুম ভাঙল না? তুমি কিরকম পাহারা দাও বাবুকে?'

কৌমুদীর মাথা হেঁট হয়ে গেল। সুবীরবাবু বললেন, 'ও বেজায় ঘুমকাতুরে। এমনিতেই তিনবার না ডাকলে ওঠে না।'

বাইরে থেকে পায়ের আওয়াজ পেয়েছিলাম আগেই; এবার একটি বছর ত্রিশেকের ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকলেন। রোগা, চোখে চশমা, চুল কোঁকড়া। সুবীরবাবু আলাপ করিয়ে দিতে বুঝলাম ইনিই নীহারবাবুর সেক্রেটারি, নাম রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'কে জিতল?'

ফেলুদার অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন করা হয়েছে সেক্রেটারি মশাইকে। রণজিৎবাবুর ফ্যালফেলে ভাব দেখে ফেলুদা হেসে বলল, 'আপনার পাতলা টেরিলিনের সার্টের পকেটে স্পষ্ট দেখছি খেলার টিকিটের কাউন্টারফয়েল। তার উপর রোদে মুখ ঝলসানো—লীগের বড় খেলা দেখে এলেন সেটা অনুমান করাটা কি খুব কঠিন?'

'ইস্টবেঙ্গল,' হেসে বললেন রণজিৎবাবু। সুবীরবাবুর মুখেও তারিফ আর বিস্ময় মেশানো হাসি।

'আপনি এখানে কদ্দিন কাজ করছেন?'

'চার বছর।'

'নীহারবাবু তাঁর বিস্ফোরণের ঘটনার বিষয় কখনো কিছু বলেছেন?'

'আমি জিগ্যেস করেছিলাম,' বললেন রণজিৎবাবু, 'কিন্তু উনি খুলে কিছু বলতে চান নি। তবে চোখ গিয়ে যে সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছে সেটা উনি মাঝে মাঝে নিজের অজান্তেই বলে ফেলেন।'

'আর কিছু বলেন?'

রণজিৎবাবু একটু ভেবে বললেন, 'একটা কথা বলতে শুনেছি যে, উনি যে এখনো বেঁচে আছেন তার কারণ হল যে ওঁর একটা কাজ এখনো অসমাপ্ত রয়ে গেছে। সেটা কী কাজ আমি জিগ্যেস করতে সাহস পাই নি। মনে হয় উনি এখনো আশা রাখেন যে ওঁর গবেষণাটা শেষ করবেন।'

'নিজে ত আর পারবেন না। অন্য কাউকে দিয়ে করাবেন এটাই হয়ত ভেবেছেন। তাই নয় কি?'

'তাই বোধহয়।'

'আপনার এখানে ডিউটি কতক্ষণ?'

'ন'টায় আসি, ছ'টায় যাই। আজ খেলা দেখার জন্য তাড়াতাড়ি ছুটি চেয়েছিলাম, উনি আপত্তি করেন নি। তবে বাইরে গেলেও সন্ধেবেলা একবার এখানে হয়ে যাই। যদি ওঁর কোনো...'

'গোদরেজের চাবি কোথায় থাকে?' ফেলুদা হঠাৎ প্রশ্ন করল।—'টাকা আর গবেষণার নোট্স কী অবস্থায় থাকে সেটা একবার দেখে নিতে চাই।'

'ওই বালিশের নিচে।'

ফেলুদা এগিয়ে গিয়ে বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে পাঁচটা চাবি সমেত একটা রিং বার করে আনল। তারপর তা থেকে প্রয়োজনীয় চাবিটা বেছে নিয়ে আলমারি খুলল।

'টাকা কোথায় থাকে?'

'ওই দেরাজে।'—রণজিৎবাবু আঙুল দেখালেন।

ফেলুদা দেরাজটা টেনে খুলল।

'সে কী!'

রণজিৎবাবুর চোখ কপালে। মোমবাতির আলোতেই বুঝলাম তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

দেরাজের মধ্যে একটা পাকানো কাগজ—খুলে দেখা গেল সেটা কুষ্ঠী—আর একটা কাশ্মীরী কাঠের বাক্সে কিছু পুরোন

www.BanglaBook.org

চিঠিপত্র। আর কিছু নেই।

'এ কী করে হয়?'—রণজিৎবাবুর গলা দিয়ে যেন আওয়াজ বেরোতে চাইছে না।—'তিনটে বান্ডিল করা একশো টাকার নোট...সব মিলিয়ে প্রায় তেত্রিশ হাজার...'

'গবেষণার কাগজপত্র কি এই অন্য দেরাজটায়?'

রণজিৎবাবু মাথা নাড়লেন। ফেলুদা দ্বিতীয় দেরাজটা খুলল।

এটা একেবারেই খালি।

বাইরে পায়ের শব্দ—খট্ খট্ খট্ খট্। নীহারবাবু ছাত থেকে নামছেন।

'মিশিগ্যান ইউনিভার্সিটির একটা লম্বা সীলমোহর লাগানো খাম ছিল গবেষণার নোট্স...' রণজিৎবাবুর গলা খটখটে শুকনো।

'আজ সকালে ছিল টাকা আর কাগজপত্র?'

'আমি নিজে দেখেছি,' বললেন সুবীরবাবু।—'একশো টাকার নোটের নম্বরগুলো সব নোট করা আছে। দাদাই এ ব্যাপারে ইনসিস্ট করতেন।'

ফেলুদা থমথমে ভাব করে বলল, 'তার মানে গত মিনিট পনেরোর মধ্যে—অর্থাৎ লোড শেডিং হবার পরেই—ব্যাপারটা ঘটেছে। আমরা যখন বৈঠকখানায় ছিলাম তখন।'

নীহারবাবু ঢুকলেন ঘরে। তাঁর মুখ দেখে বুঝলাম তিনি বাইরে থেকে সব শুনেছেন।

আমরা পথ করে দিতে ভদ্রলোক এগিয়ে গিয়ে তাঁর আরাম কেদারায় বসলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বোঝো!—গোয়েন্দার নাকের সামনে দিয়ে নিয়ে গেল।'

'সামনের সিঁড়ি ছাড়া দোতলায় ওঠার অন্য সিঁড়ি আছে?' নীহারবাবুর ঘর থেকে করিডরে বেরিয়ে এসে সুবীরবাবুকে জিগ্যেস করল ফেলুদা।

সুবীরবাবু বললেন, 'জমাদারের সিঁড়ি আছে পিছন দিকে।'

'লোড শেডিং কি রোজই এই সময় হয়?'

'তা দিন দশেক হল হচ্ছে। অনেকে ত ঘড়ি মেলাতে শুরু করেছে। ছটায় যায়, আসে দশটায়।'

ভাবতে চেষ্টা করলাম ফেলুদার গোয়েন্দা জীবনে এরকম অদ্ভুত ঘটনা আর ঘটেছে কিনা। একটাও মনে পড়ল না।

'নিচের বাসিন্দারা কেউ ফিরেছেন কি?' সিঁড়ির মুখটায় এসে ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'সেটা একবার খোঁজ করা যেতে পারে', বললেন সুবীরবাবু, 'মোটামুটি এই সময়টাতেই আসে।'

নিচের ল্যান্ডিং-এ সিঁড়ির উল্টোদিকে মিঃ দস্তুরের ঘরের দরজা। সেটা এখন বন্ধ, আর ঘর যে অন্ধকার সেটা বাইরে থেকেই বোঝা যায়।

'সুখওয়ানির ঘরে যেতে হলে পিছন দিক দিয়ে যেতে হবে', বললেন সুবীরবাবু।

বাড়ির পূব দিক দিয়ে গিয়ে বাগানের পাশের পথ দিয়ে সুখওয়ানির ঘরের দিকে এগোলাম আমরা। ঘরে ফ্লুওরেসেন্ট আলো জ্বলছে, ব্যাটারি লাইট, যেমন আজকাল চালু হয়েছে।

পায়ের আওয়াজ শুনে ভদ্রলোক বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। ফেলুদার টর্চের আলো দেখতে পাচ্ছেন, অথচ মানুষগুলো কে বোঝার উপায় নেই। সুবীরবাবু ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন—

'একটু আসতে পারি কি?'

গলা চিনতে পেরে ভদ্রলোকের চাহনি পালটে গেল।

'সার্টন্লি, সার্টন্লি!'

ফেলুদার পরিচয় পেয়ে ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'ইউ সী, মিস্টার মিটার—আমার ঘরভর্তি ভ্যালুয়েবল জিনিস। চুরির কথা শুনলে আমার হৃৎকম্প হয়। আজ সকালে যখন শুনলাম যে রাত্রে চোর এসেছিল, বুঝতেই পারেন তখন আমার কী মনের অবস্থা!'

সত্যি, এত দামী জিনিস যে একটা ঘরে থাকতে পারে সে আমার ধারণাই ছিল না। তান্ডবমূর্তি, ভৈরবমূর্তি, বুদ্ধমূর্তি ইত্যাদি পাথর, পেতল আর ব্রঞ্জের স্ট্যাচুয়েটের সংখ্যাই অন্তত গোটা তিরিশ। তাছাড়া ছবি, বই, পুরোন ম্যাপ, নানারকম পাত্র, ঢাল-তলোয়ার, পিকদান, গড়গড়া, আতরদান এসব ত আছেই। ফেলুদা পরে বলেছিল, 'টাকা থাকলে অন্তত বই আর প্রিন্টগুলো সব কিনে ফেলতাম রে তোপ্সে!'

ভদ্রলোককে জিগ্যেস করতে বললেন তিনি নাকি লোড শেডিং-এর ঠিক দশ মিনিট আগে ফিরেছেন।

'এই দশ মিনিটের মধ্যে কেউ এদিকটা এসেছিল কি? দোতলায় যাবার একটা সিঁড়ি রয়েছে আপনার ঘরের পিছনেই; ওদিক থেকে কোনো আওয়াজ পেয়েছিলেন?'

ভদ্রলোক বললেন উনি এসেই স্নানের ঘরে ঢুকেছিলেন।—'আর তাছাড়া এই অন্ধকারে দেখার প্রশ্ন আর উঠছে কি করে? আর ইয়ে, ভালো কথা, আপনারা কি বাইরের লোককে সন্দেহ করছেন?'

'কেন বলুন ত?'

'আপনারা মিঃ দস্তুরের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

ভাবটা যেন, আমরা দস্তুরের সঙ্গে কথা বললেই বুঝে যাব যে তাকে ছাড়া আর কাউকে সন্দেহ করা চলতে পারে না।

ফেলুদা কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক বললেন, 'হি ইজ এ মোস্ট পিকিউলিয়ার ক্যারেকটার। আমি জানি আমার প্রতিবেশী সম্বন্ধে এরকম করে বলা উচিত নয়, কিন্তু আমি ওকে কিছুদিন থেকেই ওয়াচ্ করছি। গোড়ায় আলাপ হবার আগে শুধু ওর নাকডাকার শব্দ পেতাম ওর জানালা দিয়ে। আমার বিশ্বাস সে শব্দ দোতলা অবধি পৌঁছে যায়।'

সুবীরবাবুর ঠোঁটের কোনে হাসি দেখে মনে হল সুখওয়ানি খুব বাড়িয়ে বলে নি।

'তারপর আলাপ হয়। যখন একদিন সকালে ও আমার টাইপরাইটারটা ধার নিতে আসে আমার ঘরের জিনিসপত্রের দিকে যেরকম লোলুপ দৃষ্টি দিচ্ছিল সেটা আমার মোটেই ভালো লাগে নি। স্বাভাবিক কৌতূহলবশে জিগ্যেস করলাম ও কী করে। বলল ইলেকট্রিকাল গুড্সের ব্যবসা। আরে বাপু, তাই যদি হবে, তাহলে এই লোড শেডিং-এর বাজারে ঘরে একটা ব্যাটারি লাইট আর পাখার ব্যবস্থা কর নি কেন? সমস্ত ব্যাপারটাই সন্দেহজনক।'

ভদ্রলোক থামলেন, আর আমরা সেই ফাঁকে উঠে পড়লাম। ফেলুদা বেরোবার আগে বলল, 'অস্বাভাবিক কিছু দেখলে মিঃ দত্তকে জানালে আমাদের কাজের খুব সুবিধা হবে।'

পূবের গলিটা দিয়ে বাড়ির সামনের দিকে এগোনর সময়ই একটা ট্যাক্সির হর্ন পেয়েছিলাম, এবার দেখলাম একটি ভদ্রলোক নুড়ি ফেলা পথের উপর দিয়ে গাড়িবারান্দার দিকে এগিয়ে আসছেন। আবছা আলোতেও দেখতে পাচ্ছি ভদ্রলোক মাঝারি

www.BanglaBook.org

হাইটের এবং মোটা, পরনে খয়েরি টেরিলিনের সুট, পরিচ্ছন্ন করে ছাঁটা কাঁচা-পাকা মেশানো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। রংটা বোধহয় বেশ ফরসাই। হাতের ব্রীফকেসটা দেখে নতুন বলে মনে হয়।

ভদ্রলোক আমাদের দিকে ফিরতেই সুবীরবাবু তাঁকে গুড ইভনিং জানালেন। তাতে উনি কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। বুঝলাম এ বাড়িতে কারুর মুখ থেকে গুড মর্নিং, গুড ইভনিং শুনতে অভ্যস্ত নন।

'গুড ইভনিং, মিঃ ডাট্।'

অদ্ভুত খ্যানখ্যানে গলার স্বর। কথাটা বলেই চলে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক. ফেলুদা চাপা ফিস্‌ফিসে গলায় সুবীরবাবুকে বললেন. 'ওকে থামান।'

সুবীরবাবু তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করলেন।

'ইয়ে, মিঃ দস্তুর!'

দস্তুর থামলেন। সুবীরবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও এগিয়ে গেলাম।

সুবীরবাবু সংক্ষেপে আজকের ঘটনাটা বলতে ভদ্রলোকের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

'এই মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে এত ঘটনা ঘটে গেল? ইওর ব্রাদার মাস্ট বি টেরিব্‌লি আপসেট!'

ফেলুদা বলেছিল যে অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় মানুষের গলার স্বর এত বদলে যেতে পারে যে অনেক সময় চেনাই যায় না। মিঃ দস্তুর ইংরেজিতে আতঙ্ক ও বিস্ময় মেশানো স্বরে এই কথাগুলো বলার সময় লক্ষ করলাম যে খ্যানখেনে ভাবটা একেবারেই নেই। প্রায় মনে হয় যেন আরেকজন মানুষ কথাটা বলল।

'আপনি যখন এলেন তখন কাউকে বেরোতে দেখলেন এ বাড়ি থেকে?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'কই, না ত?' বললেন মিঃ দস্তুর। 'অবিশ্যি এমনও হতে পারে যে অন্ধকারে দেখতে পাই নি। থ্যাংক গড যে আমার ঘরে কোনো মূল্যবান জিনিস নেই!'

'কে?'

প্রশ্নটা এল দোতলার ল্যান্ডিং থেকে। নীহারবাবুর গলা। আমরা সবাই গাড়ি-বারান্দার সিঁড়ির কাছটায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, এবার ভিতরে ঢুকে উপরে চেয়ে দেখলাম অন্ধকারেও নীহারবাবুর কালো চশমাটা চকচক করছে।

'ইটস্ মী, মিস্টার ডাট,' দৃষ্টি উপরে করে বললেন দস্তুর —'আপনার ভাই এই মাত্র আপনার লস্-এর কথাটা বলল। আমি আপনাকে আমার সহানুভূতি জানাচ্ছি।'

চশমাটা সরে গেল। আর তার পরেই মিলিয়ে এল চটি আর লাঠির শব্দ।

'আপনারা একটু বসে যাবেন না আমার ঘরে?' বললেন মিঃ দস্তুর।—'সারাদিন কাজের পরে একটু সঙ্গ পেলে ভালো লাগে।'

ফেলুদা আপত্তি করল না। তার কারণ অবিশ্যি আমি জানি। যে বাড়িতে ক্রাইম ঘটেছে, সে বাড়ির লোকেদের চিনে রাখা গোয়েন্দার গোড়ার কাজ।

সুখওয়ানির ঘরের পর মিঃ দস্তুরের বৈঠকখানার নেড়া ভাবটা সত্যিই দেখবার মত। আসবাব বলতে একটা সোফা, দুটো কাউচ, একটা রাইটিং ডেস্ক আর একটা বুকশেল্‌ফ। সোফার সামনে একটা নিচু টেবিল আছে বটে, তবে সেটা নেহাতই ছোট। তারই উপর একটা মোমবাতি রাখা ছিল। ফেলুদা সেটা ওর লাইটার দিয়ে জ্বালিয়ে দিল; এখন দেখলাম দেয়ালে একটিমাত্র ক্যালেন্ডার ছাড়া আর কিছুই নেই।

www.BanglaBook.org

ভদ্রলোক ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন বোধহয় চাকরকে ডাকতে ; ফিরে আসতে ফেলুদা তাঁকে একটা সিগারেট অফার করল।

'নো, থ্যাঙ্কস্। ক্যানসারের ভয়ে ধূমপানটা বছর তিনেক হল ছেড়ে দিয়েছি।'

'অন্যের ধূমপানে আশা করি আপত্তি নেই। আপনার অ্যাশট্রেতে অলরেডি একটা আধখাওয়া সিগারেট পড়ে আছে।'

ফেলুদা টুকরোটা তুলে নিয়ে বলল, 'আমারই ব্র্যান্ড।' চারমিনারের টুকরো আমিও দূর থেকেই চিনতে পারি।

দস্তুর বলল, 'অনেকবার ভেবেছি সুখওয়ানির মত আমিও আলো-পাখার একটা ব্যবস্থা করে নিই। তারপর যখনই মনে হয়েছে যে কলকাতার শতকরা নব্বই ভাগ লোককে গরম আর অন্ধকার ভোগ করতে হচ্ছে, তখনই মনটা খারাপ হয়ে যায়। সেই কারণে আমিও'...

'আপনার ত ইলেক্‌ট্রিক্যাল গুডস্-এর ব্যবসা?'

'ইলেক্‌ট্রিক্যাল?'

'সুখওয়ানি যে বলছিলেন—'

'সুখওয়ানি ওই রকমই বলে। ইলেক্‌ট্রিক্যাল নয়, ইলেক্‌ট্রনিকস্। বছর খানেক হল শুরু করেছি।'

'আপনি নিজেই?'

'না, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে পার্টনারশিপে। আমি বোম্বাই-এর লোক, তবে অনেকদিন দেশের বাইরে। জার্মানিতে একটা কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মে কাজ করতাম। বন্ধু কলকাতা থেকে লিখল এখানে চলে আসতে। পয়সা ওর, আমি যোগাচ্ছি অভিজ্ঞতা।'

'কবে এলেন কলকাতায়?'

'গত নভেম্বরে। বন্ধুর বাড়িতে ছিলাম মাস তিনেক; এই ফ্ল্যাটের খবরটা পেয়ে এখানে চলে আসি।'

চাকর কোল্ড ড্রিঙ্কস্ নিয়ে এল। থাম্‌স আপ। মিঃ দস্তুর ফেলুদার পরিচয় আগেই পেয়েছেন, এবার গলাটা নামিয়ে বললেন, 'মিঃ মিটার, আমার ঘরে মূল্যবান জিনিস নেই ঠিকই, কিন্তু একটা কথা আপনাকে না বলে পারছি না। আমার প্রতিবেশীটি কিন্তু খুব সিধে লোক নন। তার ঘরে নানারকম গোপন কারবার চলে। গর্হিত ব্যাপার।'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'আমার স্নানের ঘর আর ওর স্নানের ঘর লাগোয়া। দুটোর মাঝখানে একটা বন্ধ দরজা আছে। সে দরজায় কান লাগালে মাঝে মাঝে ওর শোবার ঘর থেকে কথাবার্তা শোনা যায়।'

ফেলুদা গলা খাক্‌রিয়ে বলল, 'এই ভাবে কান লাগানোও একটা গর্হিত ব্যাপার নয় কি?'

মিঃ দস্তুর একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে বললেন, 'সেটা করতাম না। যখন দেখলাম যে আমার চিঠি ভুল করে ওর হাতে পড়লে ও জল দিয়ে খাম খুলে তারপর আবার আঠা দিয়ে সেঁটে ফেরত দেয়, তখন একটা পালটা দুষ্টুমি করার লোভ সামলাতে পারলাম না। আমি নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। কিন্তু উনি যদি আমার পিছনে লাগেন তাহলে আমিও ওকে ছাড়ব না, এই বলে দিলাম।'

কোল্ড ড্রিঙ্কসের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা উঠে পড়লাম।

গেটের কাছে এসে ফেলুদা দারোয়ানকে জিগ্যেস করল গত আধ ঘণ্টার মধ্যে কাউকে ঢুকতে বা বেরোতে দেখেছে কিনা। সে বলল সুখওয়ানি আর দস্তুরকে ছাড়া আর কাউকে দেখে নি। এটা আশ্চর্য না। সাতের এক বালিগঞ্জ পার্কের কম্পাউন্ড ওয়াল রয়েছে বাড়ির চারিদিক ঘিরে। পিছন দিকের একটা বাড়ি নাকি খালি পড়ে আছে আজ কয়েক মাস যাবৎ। জোয়ান চোর হলে পাঁচিল টপকে আসায় কোনো অসুবিধা নেই—যদিও আমাদের সকলেরই মন বলছে এ কাজ বাড়ির লোকেই করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার বলছে—ভেতরের লোকই যে বাইরের লোককে দিয়ে কাজটা করায় নি তারই বা বিশ্বাস কী?

আমাদের গাড়ি নেই। সুবীরবাবু বলেছিলেন তাঁর গাড়িতে আমাদের বাড়ি পৌঁছে দেবার কথা, কিন্তু ফেলুদা বলল হেঁটে গিয়ে ট্যাক্সি পেতে কোনো অসুবিধা হবে না।

'পুলিশে একটা খবর দিলে ভালো করতেন কিন্তু।'

ফেলুদার এ প্রস্তাবটা আমার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। সুবীরবাবুও বেশ একটু অবাক হলেন। বললেন, 'কেন বলছেন বলুন ত!'

'পুলিশ সম্বন্ধে আপনার দাদার ধারণা যাই হোক না কেন, পলাতক চোর ধরার যে সব উপায় পুলিশের আছে কোনো প্রাইভেট ইনভেসটিগেটরের তা নেই। বিশেষ করে যখন এতগুলো টাকা, তখন পুলিশকে বলাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। নোটের নম্বর লেখা আছে বলছেন। কাজটা এমনিতেই অনেকটা সহজ হয়ে যাবে।'

সুবীরবাবু বললেন, 'আপনাকে যখন আসতে বলেছি, এবং দুর্ঘটনা যখন একটা ঘটেছে, তখন আপনাকে বাদ দেবার কথা আমি ভাবতেই পারি না। পুলিশ আসুক, কিন্তু তার পাশে আপনিও থাকলে শুধু আমিই নিশ্চিন্ত হব না, দাদাও হবেন। অবিশ্যি, সত্যি বলতে কি, চোর যে কে সেটা কারুর সাহায্য ছাড়াই আমি বলতে পারি।'

'আপনার ছেলের কথা বলছেন কি?'

সুবীরবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।—'এ শঙ্কর ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। সে জানে এ পাড়ায় ছটায় বাতি নিভে যায়। ডানপিটে ছেলে, পাঁচিল টপকানো তার কাছে কিছুই নয়। তার পর পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে জ্যাঠার ঘরে ঢুকে আলমারি খোলা—এসবই ত তার কাছে নস্যি!'

'কিন্তু নীহারবাবুর গবেষণার কাগজপত্র নিয়ে সে কী করবে? বৈজ্ঞানিক মহলে কি তার খুব যাতায়াত আছে?'

'সেটার দরকার কি বলুন! সে ত সেই কাগজপত্রের বিনিময়ে তার জ্যাঠার কাছ থেকেই টাকা আদায় করতে পারে। এই কাগজপত্রের দাম যে দাদার কাছে কতখানি সেটা ত সে খুব ভালোভাবেই জানে!'

এই অল্প সময়ের মধ্যে এত রকম ঘটনা ঘটার ফলে মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছিল। তার পরেও একই দিনে যে আরো কিছু ঘটতে পারে সেটা ভাবতেই পারিনি। অবিশ্যি সেটার কথা বলার আগে বাড়ি ফিরে এসে ফেলুদা আর আমার মধ্যে যে কথা হয়েছিল সেটা বলা দরকার।

রাত্রে খাবার পরে ফেলুদার ঘরে গিয়ে দেখি সে খাটে চিত হয়ে শুয়ে সিলিং-এর দিকে চেয়ে পান চিবোচ্ছে আর চারমিনার ফুঁকছে। আমিও গিয়ে খাটে বসলাম। যে প্রশ্নটা গোলোকধাম থেকেই মনে খোঁচা দিচ্ছিল সেটা না বলে পারলাম না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তুমি কেসটা ছেড়ে দিতে চাইছিলে কেন ফেলুদা?'

ফেলুদা পর পর দুটো মোক্ষম রিং ছেড়ে বলল, 'কারণ আছে রে, কারণ আছে।'

'কারণ ত বললেই তুমি—পালানো চোর ধরা পুলিশের পক্ষে আরো সহজ—বিশেষ করে যদি অনেক টাকা নিয়ে পালায়।'

'সুবীরবাবুর ছেলেই নিয়েছে বলে তোর মনে হয়?'

'আর কে নেবে বল। বাড়ির লোকে নিয়েছে সে ত বোঝাই যাচ্ছে। দস্তুর ত ছিলেনই না। সুখওয়ানি চুরি করে দিব্যি ঘরে বসে থাকবেন সেটাও যেন কেমন কেমন লাগে। রণজিৎবাবুও এলেন চুরির পরে। আর আছে চাকরবাকর...'

'কিন্তু ধর যদি মক্কেল নিজেই কিছু করে থাকেন?'

আমি অবাক হয়ে চাইলাম ফেলুদার দিকে।

'সুবীরবাবু!'

একটু মাথা ঠাণ্ডা করে চুরি আবিষ্কারের ঠিক আগের ঘটনাগুলো ভেবে দেখ।'

আমি চোখ বুজে কল্পনা করলাম আমরা চারজনে বৈঠকখানায় বসে আছি। চা এল। আমরা চা খাচ্ছি। ফেলুদার হাতে কাপ। ঘরের বাতি নিভল। তারপর—

ধাঁ করে একটা জিনিস মনে পড়ে গিয়ে বুকটা কেঁপে উঠল।

'লোড শেডিং-এর সঙ্গে সঙ্গে সুবীরবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, ফেলুদা—চাকরকে ডাকতে!'

'তবে!—ভেবে দেখ আমার পোজিশনটা কী হবে যদি বেরের যে সুবীরবাবুই আলমারি খুলেছিলেন। এটা অসম্ভব নয় এই কারণেই যে ওই একটি লোক সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। চাকরের কথা যেটা বলেছেন সেটা অবিশ্যি অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ধর যদি শেয়ার বাজারে বা রেসের মাঠে বা জুয়োর আড্ডায় ভদ্রলোকের অনেক টাকা খোয়া গিয়ে থাকে, বাজারে একগাদা ধারদেনা থাকে, তাহলে তাঁর পক্ষে টাকাটা নেওয়া খুব আশ্চর্য কী?'

'কিন্তু উনি ত নিজেই এলেন তোমার কাছে! উনিই ত তোমায় গোয়েন্দা অ্যাপয়েন্ট করলেন!'

'উনি যদি খুব উচ্চস্তরের ধূর্ত ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে নিজের উপর যাতে সন্দেহ না পড়ে তার জন্যে ঠিক ওই কাজটাই করা কিছুই আশ্চর্য নয়।'

এর পরে আর কোনো কথা বলা যায় না।

ফেলুদা কালী সিংহের মহাভারতটা হাতে নিয়ে রিডিং ল্যাম্পটা জ্বালিয়েছে দেখে আমি খাট থেকে উঠে পড়লাম।

বসবার ঘরে আসতেই বাইরে থেকে একটা শব্দ পেলাম। স্কুটার। একটা নয়, একটার বেশি।

নির্জন নিস্তব্ধ পাড়াটাকে কাঁপিয়ে যেন আমাদের বাড়ির সামনেই এসে থামল।

আর তার পরেই আমাদের দরজার কলিং বেল বেজে উঠল।

দিনকাল ভালো নয়, আর তাছাড়া আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে বেটাইমে লোক এলেও স্কুটারে আসে না।

আমি দরজার দিকে না গিয়ে আগে ফেলুদার পর্দাটা ফাঁক করে একবার উঁকি দিলাম। ফেলুদা বই রেখে খাট থেকে উঠে পড়েছে। বলল—'দাঁড়া।' অর্থাৎ তুই খুলিস না, আমি খুলছি।

দরজা খুলতেই যিনি প্রবেশ করলেন, তিনি যে শয়তানের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবতার সেটা বুঝতে পাঁচ সেকেন্ডও লাগল না। বসবারও দরকার নেই ; ঘরে ঢুকে পিঠ দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে ফেলুদার দিকে ঘোলাটে চোখ করে তাকিয়ে কথার চাবুক আছড়াতে শুরু করলেন সুবীর দত্তর ছেলে শঙ্কর দত্ত।

'শুনুন মশাই, আমার বাবা আমার বিষয়ে কী বলেছেন জানি না, কিন্তু গেস করতে পারি। এইটুকু শুধু বলে দিচ্ছি আপনাকে—আমার পেছনে টিকটিকি লাগিয়ে কারুর বাপের সাধ্যি নেই কিছু করে। আপনাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি ; আমি একা নই। আমাদের গ্যাং আছে। বেশী ওস্তাদী করলে পস্তাবেন। বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব এই বলে দিলাম।'

শঙ্কর দত্ত যেরকম নাটকীয় ভাবে ঢুকেছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই বেরিয়ে গেলেন স্পীচ ঝাড়া শেষ করে। তারপরই আওয়াজ পেলাম তিনটে স্কুটার স্টার্ট নিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে বেরিয়ে চ'লে গেল।

ফেলুদা এতক্ষণ স্থির হয়ে ছিল। স্নায়ুর উপর অসাধারণ দখল আছে বলেই এত অপমানেও ও পাথর। ও বলে প্রচন্ড রাগে যে ফেটে পড়ে তার চেয়ে সেই রাগ যে দমিয়ে রাখতে পারে তার মনের জোর বেশি।

স্কুটারের শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই কিন্তু ফেলুদা ঝড়ের বেগে গায়ে একটা পাঞ্জাবি চাপিয়ে পকেটে তার মানিব্যাগটা নিয়ে নিয়েছে।

'চ' তোপ্‌সে—ট্যাক্সি...'

তিন মিনিটের মধ্যে সাদার্ন এভিনিউতে একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়লাম দুজনে। উত্তর দিকে গেছে স্কুটার-গুলো এটা জানি।

'ল্যানসডাউন ধরুন', বলল ফেলুদা। বড় রাস্তায় খোঁড়া-খুঁড়ি, তাই ল্যানসডাউন রোড ধরেই যাবে ওরা এটা আমারও মনে হয়েছিল।

পৌনে এগারোটা। সাদার্ন এভিনিউ প্রায় ফাঁকা। ট্যাক্সি চালক বাঙালী, আমাদের মুখ চেনা। বললেন, 'কাউকে ফলো করবেন, স্যার?'

'তিনটে স্কুটার', চাপা গলায় বলল ফেলুদা।

আন্দাজে ভুল নেই। এলগিন রোডের মোড়ের কাছে এসে স্কুটার তিনটের দেখা পাওয়া গেল। শঙ্কর একাই বসেছে একটায়, অন্য দুটোয় দুজন করে লোক। এরা সব মার্কামারা মস্তান সেটা আর বলে দিতে হয় না। আমাদের ট্যাক্সি ওদের লেজ ধরে চলতে লাগল।

লোয়ার সার্কুলার রোড, ক্যামাক স্ট্রীট পেরিয়ে স্কুটারগুলো পার্ক স্ট্রীটে পড়ে বাঁ দিকে ঘুরল। এঁকেবেঁকে সাপের মত চালানোয় বোঝা যাচ্ছে এদের বেপরোয়া ফুর্তির ভাবটা। ফেলুদা রাস্তার আলো বাঁচিয়ে ভিতর দিকে চেপে বসেছে, তার মাথায় কি খেলছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

মিরজা গালিব স্ট্রীট দিয়ে কিছুদূর গিয়ে স্কুটারগুলো আবার বাঁয়ে ঘুরল। মার্কুইস স্ট্রীট। রাস্তা সরু হয়ে আসছে, পাড়া অন্ধকার, বাতিগুলো টিমটিমে। যাতে ওরা সন্দেহ না করে তাই ফেলুদার আদেশে আমাদের ড্রাইভার ট্যাক্সির স্পীড কমিয়ে ওদের সঙ্গে দূরত্বটা একটু বাড়িয়ে নিল।

আরো দুটো মোড় ঘুরে দেখলাম স্কুটারগুলো একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে।

'চালিয়ে বেরিয়ে যান', বলল ফেলুদা।

বাড়ি না। এক ধরনের হোটেল। নাম নিউ কোরিনথিয়ান লজ। নিউ? বাড়ির বয়স কম করে একশো বছর।

ফেলুদার কাজ শেষ। বুঝলাম এদের ডেরাটা জানার দরকার ছিল।

বাড়ি যখন ফিরলাম তখন এগারটা চল্লিশ। ভাড়া উঠেছে উনিশ পঁচাত্তর।

৪

পরদিন ভোরে সিধু জ্যাঠার আবির্ভাবটা একেবারে আন্‌-এক্সপেকটেড। উনি সকালে হাঁটতে বেরোন জানি, কিন্তু সেটা লেকের দিকে। আমাদের বাড়িতে আসার মানেই কোনো একটা বিশেষ কারণ আছে।

'খাতার ওজন অনেক, তাই খবরটা কপি করে এনেছি,' বললেন সিধু জ্যাঠা।—'সুপ্রকাশ কিনা জানি না, তবে এস. চৌধুরী বলে লিখেছে, আর বায়োকেমিস্ট সেটাও লিখেছে।'

'কবেকার খবর?'

'উনিশশো একাত্তর। মেক্সিকোতে একটা ড্রাগ কোম্পানীর উপর পুলিশের হামলায় একটি বাঙালী বায়োকেমিস্ট ধরা পড়ে, নাম এস. চৌধুরী। ভেজাল ড্রাগের ব্যবসা চালাচ্ছিল ; তার ফলে সব মারাত্মক ব্যাধি দেখা দিয়েছিল। লোকটার জেল হয়। এইটুকুই খবর। আসলে মাথায় ঘুরছে সুপ্রকাশ, তাই এস. চৌধুরীর সঙ্গে নামটা ঠিক কানেক্ট করতে পারি নি। অবিশ্যি এ সেই একই এস. চৌধুরী কি না—'

'একই,' গম্ভীর ভাবে বলল ফেলুদা।

সিধু জ্যাঠা উঠে পড়লেন। তাঁর আজ চুল কাটার দিন, নাপিত এসে বসে থাকবে। ফেলুদার পিঠ চাপড়ে, আমার কান ধরে একটা মোচড় দিয়ে, মালকোচাটা একটু ভালো করে গুঁজে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

ফেলুদা খাতা খুলে হিজিবিজি লেখা শুরু করেছে দেখে আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। পর পর তিনটে প্রশ্ন লেখা রয়েছে খাতায়—

১) চাবির গর্তের ধারে আঁচড়ের বাড়াবাড়ি কেন?

২) 'কে'-র অর্থ কী?

৩) অসমাপ্ত কাজটা কী?

প্রশ্নগুলো সত্যি সে সম্বন্ধে আমিও খানিকটা না ভেবে পারলাম না।

আলমারির চাবির গর্তের চারিধারে আঁচড় কালই ফেলুদার টর্চের আলোয় দেখেছিলাম। এটায় খটকা লাগার একটা কারণ থাকতে পারে। রীতিমত জোরে ঘষা না লাগলে ইস্পাতের ওপর এরকম দাগ পড়তে পারে না। নীহারবাবুর ঘুম কি এতই গভীর যে এত ঘষাঘষিতেও ঘুম ভাঙবে না?

'কে'-র ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারি নি। তারপর মনে পড়ল যে মিঃ দস্তুরের গলা শুনে দোতলার ল্যান্ডিং থেকে নীহারবাবু 'কে' বলে উঠেছিলেন। ফেলুদা এই 'কে' প্রশ্নে খটকার কারণ কী দেখল সেটা বুঝলাম না।

অসমাপ্ত কাজের কথাটাও নীহারবাবুই বলেছেন। অন্তত রণজিৎবাবু তাই বলেন। সেটা যে উনি ওঁর গবেষণার বিষয়

www.BanglaBook.org

বলছিলেন সেটা কি ফেলুদা বিশ্বাস করে না?

ফেলুদা আরো কি সব লিখতে যাচ্ছিল, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। ওর ঘরেই এক্সটেনশন ফোন; বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে রিসিভারটা তুলে নিল।

'হ্যালো।'

দু'চারবার হুঁ হুঁ করে এবং শেষে 'আমি এক্ষুনি আসছি' বলে ফোনটা রেখে ফেলুদা আলনা থেকে সার্ট ও ট্রাউজার সমেত হ্যাঙ্গারটা একটানে নামিয়ে নিয়ে বলল, 'তৈরি হয়ে নে। গোলোকধামে খুন।'

আমার বুক ধড়াস।

'কে খুন হল?'

'মিঃ দস্তুর।'

বড় রাস্তা থেকে বালিগঞ্জ পার্কে ঢুকতেই দূরে সাতের একের সামনে দেখলাম পুলিশের ভ্যান আর লোকের জটলা। তাও সাহেবী পাড়া বলে রক্ষে নইলে ভীড় আরো অনেক বেশি হত।

কলকাতার পুলিশ মহলে ফেলুদাকে চেনে না এমন লোক নেই। গোলোকধামে ঢুকতেই ওকে দেখে ইন্সপেক্টর বকশী হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এসে বললেন, 'এসে পড়েছেন? গন্ধে গন্ধে হাজির?'

ফেলুদা ওর একপেশে হাসিটা হেসে বলল, 'সুবীরবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে সম্প্রতি; ফোন করেছিলেন, তাই চলে এলাম। আপনাদের কাজে কোনো ব্যাঘাত করব না গ্যারান্টি দিচ্ছি। খুনটা হল কি ভাবে?'

'মাথায় বাড়ি। একটা নয়, তিনটে। ঘুমন্ত অবস্থায়। লাশ নিয়ে যাবে এইবার পোস্টমর্টেমের জন্য। ডাঃ সরকার একবার এসে দেখে গেছেন। আন্দাজ রাত দুটো থেকে তিনটের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে।'

'লোকটার সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলেন?'

'খুব গণ্ডগোল। সুটকেস গুছোতে শুরু করেছিল। সটকাবার তালে ছিল।'

'টাকাকড়ি গেছে কিছু?'

'মনে ত হয় না। খাটের পাশের টেবিলে ওয়েলেটে শ'তিনেক টাকা রয়েছে। বাড়িতে ক্যাশ বেশি রাখত বলে মনে হয় না। অথচ ব্যাঙ্কের জমার খাতা, চেক বই এসব কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। একটা সোনার ঘড়ি পাওয়া গেছে বালিশের পাশে। এখনো ভালো করে সার্চ করা হয় নি; এবার করবে। এ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে তা থেকে লোকটার সঠিক পরিচয় কিছু পাওয়া যায় নি।'

সুবীরবাবু মিনিটখানেক হল এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন। মিঃ বকশীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'সুখওয়ানি বেজায় তম্বি করছে। বলছে তার নাকি একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ডালহাউসিতে। আমি বলেছি জেরা না হওয়া পর্যন্ত ছাড়া যাবে না।'

'ঠিকই বলেছেন,' বললেন মিঃ বকশী। 'অবিশ্যি জেরাতে আপনিও বাদ যাবেন না।'

শেষের কথাটা হালকা হেসে বললেন মিঃ বকশী। সুবীরবাবু মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন যে সেটা তিনি জানেন।

'তবে আমার দাদাকে যত অল্পের উপর দিয়ে সারতে পারেন ততই ভালো।'

'ন্যাচারেলি।'

'ঘরটা একবার দেখতে পারি কি?' ফেলুদা জিগেস করল।

'নিশ্চয়ই!'

বকশীও ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলেন, পিছনে আমি। ঘরে ঢোকার আগে ফেলুদা সুবীরবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'ভালো কথা, আপনার ছেলে কাল আমার বাড়িতে এসেছিল।'

'কখন!'—সুবীরবাবু অবাক।

ফেলুদা সংক্ষেপে কাল রাত্তিরের ঘটনাটা বলে বলল, 'সে কি কাল ফিরেছিল?'

'ফিরে থাকলেও টের পাই নি,' বললেন সুবীরবাবু। 'সকালে উঠে তাকে দেখি নি।'

'যাক্, তাহলে আপনার ছেলের ডেরার একটা সন্ধান পাওয়া গেল,' বললেন মিঃ বকশী, 'ওই হোটেলটা মোটেই সুবিধের নয়। বার দুয়েক রেড হয়ে গেছে ওখানে অলরেডি।'

কালকের দেখা ঘরের চেহারা আজ একেবারে পালটে গেছে। কাল ছিল অন্ধকার, আর আজ পুবের দুটো জানালা দিয়ে ঝলমল রোদ এসে সোফা আর মেঝের উপর পড়েছে। আশ্চর্য লাগল দেখে যে কালকের দেখা চারমিনারের টুকরোটা এখনো অ্যাশট্রেতে পড়ে আছে। ঘরে দুজন পুলিশের লোক রয়েছে, আর পুলিশের ফোটোগ্রাফার তাঁর কাজ শেষ করে সরঞ্জাম ব্যাগে পুরছেন।

খুনটা অবিশ্যি হয়েছে পাশের শোবার ঘরে। ফেলুদা বকশীর সঙ্গে সেই ঘরেই গিয়ে ঢুকল। আমি চৌকাঠ অবধি গিয়ে একবার বিছানার দিকে চেয়ে চাদরে ঢাকা লাশটা দেখে নিলাম। একজন পুলিশের লোক খানাতল্লাসী চালিয়ে যাচ্ছে। মেঝেতে একটা খোলা সুটকেসের মধ্যে দেখলাম কিছু জামাকাপড় ভাঁজ করে রাখা রয়েছে। তার পাশে মাটিতে দাঁড় করানো রয়েছে গতকাল দস্তুরের হাতে দেখা নতুন ব্রীফকেসটা।

আমি আরো মিনিট তিনেক বসবার ঘরে জিনিসপত্র দেখে কাটিয়ে দিলাম। কোনো কিছুতেই হাত দেওয়া চলবে না এটা জানি, তার উপর দুটো পুলিশই আমার দিকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে।

'চ' তোপ্‌সে।'

ফেলুদা বেরিয়ে এসেছে শোবার ঘর থেকে। 'আপনি আছেন কিছুক্ষণ?' বকশী প্রশ্ন করল।

'একবার বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করে যাব,' বলল ফেলুদা। 'ইন্টারেস্টিং কিছু পেলে বলবেন।'

সুবীরবাবু দোতলায় অপেক্ষা করছিলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে নীহারবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

ভদ্রলোক তাঁর আরাম কেদারায় চিত হয়ে শুয়ে আছেন। চোখে কালো চশমা, হাতের লাঠি পাশে খাটের উপর শোয়ানো। আগে দিন লাঠিটা ভদ্রলোকের হাতে দেখেছি, তাই সেটার মাথা যে রুপো দিয়ে বাঁধানো সেটা বুঝতে পারি নি। মাথার নকশার মধ্যে খোদাই করা জি বি ডি দেখে বুঝলাম লাঠিটা ছিল নীহারবাবুর ঠাকুরদা গোলোকবিহারী দত্তর।

আমরা এসেছি সে খবরটা দেওয়াতে নীহারবাবু কাত করা ঘাড়টাকে একটু সোজা করে বললেন, 'শব্দ পেয়েছি। পায়ের শব্দ। শব্দ আর স্পর্শ—এই দুই নিয়েই ত কাটিয়ে দিলাম বিশ বছর। আর স্মৃতি...কী হতে পারত, কী হল না। লোকে বলে

www.BanglaBook.org

দুর্ভাগ্য। আমি ত জানি এটা ভাগ্য-টাগ্য কিছু নয়। আপনি সেদিন জিগ্যেস করলেন বিস্ফোরণটা অসাবধানতার জন্য হয়েছিল কিনা; আজ আপনাকে বলছি মিঃ মিত্তির—সমস্ত ব্যাপারটা করা হয়েছিল আমার শ্রম পণ্ড করার জন্য। ঈর্ষা যে মানুষকে কত নিচে নামাতে পারে সেটা আপনি গোয়েন্দা হয়ে নিশ্চয়ই বোঝেন।'

ভদ্রলোক একটু থামলেন। ফেলুদা বলল, 'তার মানে আপনার ধারণা সুপ্রকাশ চৌধুরীই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী?'

'বাঙালী যে বাঙালীর সবচেয়ে বড় শত্রু সেটা আপনি মানেন কি?'

ফেলুদা একদৃষ্টে চেয়ে আছে কালো চশমার দিকে। নীহারবাবুও যেন উত্তরের অপেক্ষা করছেন।

ফেলুদা বলল, 'আপনি এখন যে কথাটা যে ভাবে আমাদের বলছেন, সেটা এর আগে কাউকে বলেছেন কি?'

'না বলি নি। কোনোদিন না। হাসপাতালে জ্ঞান হবার পর আমার এই কথাটাই প্রথম মনে হয়েছিল। কিন্তু বলি নি। বলে কী করব? আমার সর্বনাশ যা হবার তা ত হয়েই গেছে। যে এটার জন্য দায়ী, তার শাস্তি হলে ত আর আমি দৃষ্টি ফিরে পাব না, বা আমার গবেষণাও শেষ করতে পারব না।'

'কিন্তু আপনাকে চিরকালের মত অসহায় করে চৌধুরীরই বা কী লাভ হল বলুন। সে কি ভেবেছিল যে আপনার কাগজপত্রগুলো হাত করে সে-ই গবেষণা চালিয়ে নিজে নাম কিনবে?'

'নিশ্চয়ই তাই। তবে তার সে ধারণা ভুল। আমি ত বলেইছি আপনাকে। আমাকে ছাড়া এগোনোর পথ ছিল না তার।'

আমরা দুজনেই খাটে বসেছি। ফেলুদাকে দেখে বুঝতে পারছি সে গভীর ভাবে চিন্তা করছে। রণজিৎবাবু ইতিমধ্যে ঘরে এসে টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়েছেন। সুবীরবাবু কোনো কাজে বাইরে গেছেন।

ফেলুদা বলল, 'টাকার কথা জানি না, সেটা হয়ত পুলিশের পক্ষে উদ্ধার করা আরো সহজ, কিন্তু আপনার এত মূল্যবান কাগজপত্র আমি এ বাড়িতে উপস্থিত থাকতে চুরি হয়ে গেল, এটা আমি কিছুতেই মানতে পারছি না। ওগুলো উদ্ধার করার আপ্রাণ চেষ্টা আমি চালিয়ে যাব।'

'আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।'

আমরা আর বেশিক্ষণ থাকলাম না। পুলিশ তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বকশী ফেলুদাকে বলে দিলেন যে তাদের জেরা আর খানাতল্লাসীর কী ফল হয় সেটা ফোনে জানিয়ে দেবেন।

'আর নিউ কোরিনথিয়ান লজের খবরটাও জানাতে ভুলবেন না', বলে দিল ফেলুদা।

আমরা বাড়ি ফিরছি সাড়ে দশটায়। তখন থেকে শুরু করে দুপুরের খাওয়ার আগে পর্যন্ত ফেলুদা পায়চারি করে থেমে, শুয়ে-বসে, চোখ খুলে, চোখ বুজে, ভ্রূকুটি করে, মাথা নেড়ে, বিড়বিড় করে, মাঝে মাঝে ছোট বড় মাঝারি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুঝিয়ে দিচ্ছিল সে তার মনের মধ্যে নানারকম প্রশ্ন সন্দেহ খটকা দ্বন্দ্ব ইত্যাদির হুটোপাটি চলছিল। একবার হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'গোলোকধামের একতলার প্ল্যানটা তোর মোটামুটি মনে পড়ছে?'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'মোটামুটি।'

'সুখওয়ানির ঘর থেকে দস্তুরের ঘরে কীভাবে যাওয়া যায় বল ত?'

আমি আবার একটু ভাবলাম। তারপর বললাম, 'যদ্দুর মনে পড়ছে, দুটো ফ্ল্যাটের পাশ দিয়ে বাড়ির ভিতরে যে বারান্দাটা গেছে, তার মাঝখানে একটা দরজা রয়েছে, আর সে দরজাটা বোধ হয় বন্ধ থাকে। সেটা খোলা থাকলে সেই বারান্দা দিয়েই সোজা এক ফ্ল্যাট থেকে আরেক ফ্ল্যাটে চলে যাওয়া যেত।'

'ঠিক বলেছিস। তার মানে সুখওয়ানিকে যদি দস্তুরের ফ্ল্যাটে আসতে হয় তাহলে বাগান ঘুরে বাড়ি আর কম্পাউন্ড-ওয়ালের মধ্যের গলি দিয়ে একেবারে সামনে এসে সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়।'

কিন্তু সামনের কোল্যাপ্‌সিব্‌ল গেট কি মাঝরাত্তিরে খোলা থাকবে?'

'নিশ্চয়ই না।'

তারপর আবার পায়চারি শুরু করে বলতে লাগল—'X, Y, Z,...X, Y, Z...X হল গবেষণার কাগজ, Y হল টাকা, আর Z হল খুন। এখন কথা হচ্ছে—X, Y, Z, কি একই সূত্রে গাঁথা, না তিনটে আলাদা...'

আমি এক ফাঁকে বলে ফেললাম, 'ফেলুদা, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে যে সুপ্রকাশ চৌধুরী দস্তুর সেজে নীহারবাবুর বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে এসেছিলেন।'

আশ্চর্য হয়ে গেলাম দেখে যে ফেলুদা মোটেই আমার কথাটা উড়িয়ে দিল না। বরং আমার পিঠে দুটো চাপড় মেরে বলল, 'যদিও এ ধারণাটা আমার মাথায় আগেই এসেছে, তবুও বলতেই হয় আজকাল তোর চিন্তায় মাঝে মাঝে বেশ ঝিলিক দিচ্ছে। কিন্তু দস্তুর যদি সুপ্রকাশ হয়, তাহলে মনে করা যেতে পারে সে গবেষণার নোটসের লোভেই ওখানে আস্তানা নিয়েছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেই যদি খামটা চুরি করে থাকে তাহলে সেটা গেল কোথায়? আর তার পক্ষে নিজে চুরি করাটা সম্ভবই বা হয় কি করে? সে ত দোতলায় কোনদিন যায়ই নি।'

আমার সত্যিই মাথা খুলে গেছে। ব্যাপারটা ত জলের মত সোজা! বললাম, 'উনি যাবেন কেন? ধর যদি ওঁর সঙ্গে শঙ্কর দত্তর ষড় হয়ে থাকে? শঙ্করই কাগজটা চুরি করে ওকে এনে দিয়েছে, আর তার জন্য কিছু টাকাও পেয়ে গেছে!'

'এক্সেলেন্ট', বলল ফেলুদা। 'অ্যাদ্দিনে বলা যায় তুই আমার উপযুক্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট হলি। কিন্তু এতে ত খুনের রহস্যের

www.BanglaBook.org

সমাধান হচ্ছে না।'

'ধর যদি রণজিৎবাবু বুঝে থাকেন যে দস্তুর আসলে সুপ্রকাশ। রণজিৎবাবু ত নীহারবাবুর সব ব্যাপারই জানেন, আর সেই সঙ্গে নীহারবাবুকে দারুণ ভক্তিও করেন। যে লোক নীহারবাবুর ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিয়েছিল, তার উপর প্রচণ্ড আক্রোশে খুন করতে পারেন না রণজিৎবাবু?'

ফেলুদা মাথা নাড়ল।

'খুন জিনিসটা অত সহজ নয় রে তোপ্‌সে। রণজিতের মোটিভটাকে মোটেই জোরালো বলা চলে না। আসল আপশোষের ব্যাপার হচ্ছে যে দস্তুর লোকটার ঘরে সার্চ করে এখন অবধি কিছু পাওয়া গেল না। অত্যন্ত সাবধানী লোক ছিলেন এই দস্তুর।'

'আমার কী মনে হয় জান ফেলুদা?'

ফেলুদা পায়চারি থামিয়ে আমার দিকে চাইল। আমি বললাম, 'পুলিশের বদলে তুমি যদি সার্চ করতে তাহলে অনেক রকম ক্লু পেতে।'

'বলছিস?'

ফেলুদা নিজের ওপর কনফিডেন্স হারাচ্ছে এটা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না; কিন্তু ওর ওই 'বলছিস' কথাটাতে যেন ওটারই একটা আভাস পেলাম। আর তারপর যে কথাটা বলল তাতে মনটা আরো দমে গেল।

'এই গরম আর এই লোড শেডিং-এ আইনস্টাইনেরও মাথা খুলত কিনা সন্দেহ।'

দুটো নাগাত ইনস্পেক্টর বকশীর ফোন এল। দস্তুরের একটা জুতোর গোড়ালির মধ্যে একটা চোরা খুপরিতে আমেরিকান ডলার আর জার্মান মার্ক মিলে প্রায় সতের হাজার টাকা পাওয়া গেছে। কিন্তু এমন কোনো কাগজ বা দলিল পাওয়া যায় নি যা থেকে লোকটার বিষয় কিছু জানা যায়। ইলেকট্রনিকস্‌-এর নতুন কোনো দোকানের হদিস মেলে নি, দস্তুরের কোনো বন্ধুরও সন্ধান পাওয়া যায় নি। চিঠিপত্র প্রায় ছিল না বললেই চলে। একটি মাত্র ব্যক্তিগত চিঠি, আর্জেন্টিনা থেকে লেখা, যা থেকে বোঝা যায় যে সে দক্ষিণ আমেরিকায় কিছুদিন কাটিয়েছিল।

বকশীর দ্বিতীয় খবর হচ্ছে এই যে, নিউ কোরিনথিয়ান লজের ম্যানেজারকে ছবি দেখাতে সে শঙ্করকে চিনেছে; কাল সারারাত নাকি শঙ্কর কয়েকজন বন্ধু সমেত হোটেলের একটা ঘর ভাড়া করে সেখানে নেশা করেছে আর জুয়া খেলেছে। সকাল হতে তারা পাওনা চুকিয়ে দিয়ে চলে যায়। বকশী বললেন এবার শঙ্করকে ধরা নাকি 'এ ম্যাটার অফ মিনিট্‌স'।

ফেলুদা সব শুনেটুনে ফোনটা রেখে দিয়ে বলল, 'শঙ্করবাবু যদি হোটেলের পেমেন্টটা চুরির টাকায় করতেন তাহলে সুখ সুবিধে হত। যাই হোক, এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে খুনটা সে করে নি, কারণ সেই সময়টা তার অ্যালিবাই ছিল।'

অ্যালিবাই কথাটার মানে অবিশ্যি আমি অনেকদিন থেকেই জানি, কিন্তু যারা জানে না তাদের বাঙলায় কীভাবে বোঝানো যায় জিগ্যেস করাতে ফেলুদা বলল, 'ডিকশনারিতে যা লেখা আছে তাই লিখে দে'। তাই বলছি, অ্যালিবাই মানে হল—'অপরাধের অনুষ্ঠানকালে অন্যত্র থাকার অজুহাতে রেহাই পাইবার দাবী'। তার মানে 'আমার বাড়িতে যখন খুন হয় তখন আমি কোরিনথিয়ান লজে বসে জুয়া খেলছিলাম'—এটাই হবে শঙ্করের অ্যালিবাই।

টেলিফোনটা পেয়েও ফেলুদার উৎসাহ ভাব গেল না। তিনটে নাগাত দেখি ও পায়জামা ছেড়ে ট্রাউজারস পরেছে। বলল কতগুলো তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তাই বেরোচ্ছে। ফিরল প্রায় সাড়ে চারটের। আমি এই দেড় ঘণ্টা একটানা মহাভারত পড়ে প্রায় শেষ করে ফেলেছি।

মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদী নকুল সহদেব সবাই একে একে মরে গিয়ে ঠিক যখন অর্জুনের পতন হব-হব, তখন ক্রিং করে ফোনটা বেজে উঠল। আমিই ধরলাম। ফেলুদার ফোন, গোলোকধাম থেকে সুবীরবাবু কথা বলতে চাইছেন।

ফেলুদা তার ঘরেই ফোন ধরল; আমি বসবার ঘরের ফোনে কান লাগিয়ে দু' তরফের কথাই শুনে নিলাম।

'হ্যালো।'

'কে, মিঃ মিত্তির?'

'বলুন মিঃ দত্ত।'

'দাদার গবেষণার নোটস্‌ সমেত সীল করা খামটা পাওয়া গেছে।'

'দস্তুরের ঘরে ছিল কি?'

'ঠিক বলেছেন। খাটের পাটাতনের তলায় সেলোটেপ দিয়ে আটকে রেখেছিল। একদিকের সেলোটেপ খুলে গিয়ে খামটা ঝুলছিল। পেয়েছে আমাদের চাকর ভগীরথ।'

'আপনার দাদা জানেন খবরটা?'

'তা জানেন। তবে দাদার মধ্যে কেমন যেন একটা হাল-ছেড়ে-দেওয়া ভাব এসেছে। কোনো ব্যাপারেই যেন বিশেষ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। আজ সারাদিন চেয়ার ছেড়ে ওঠেন নি। আমি আমাদের ডাক্তারকে আসতে বলেছি।'

'আপনার ছেলের কোনো খবর আছে?'

'আছে। জি টি রোডে ওদের পুরো দলটাই ধরা পড়ে গেছে।'

'আর চোরাই টাকা?'

'সেটা নিলেও অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছে। অবিশ্যি চুরির ব্যাপারটা শঙ্কর সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে।'

'খুনের ব্যাপারে পুলিশ কী বলছে?'

'ওরা সুখওয়ানিকেই সন্দেহ করছে। তাছাড়া একটা নতুন ক্লু-ও পাওয়া গেছে। দস্তুরের জানলার বাইরে পড়ে থাকা একটা দলা পাকানো কাগজ।'

'কী লেখা আছে তাতে?'

'ইংরিজিতে একলাইন হুমকি—"অতিরিক্ত কৌতূহলের পরিণাম কী জান ত"?'

'সুখওয়ানি কী বলে?'

সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে। তার ঘর থেকে যে দস্তুরের ঘরে যাবার কোনো উপায় নেই সেটা ঠিকই, কিন্তু একটা ভাঙাটে গুণ্ডা পাইপ বেয়ে দোতলার বারান্দায় উঠে তারপর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসে অনায়াসেই সে কাজটা করতে পারে।'

'হুঁ...ঠিক আছে, আমি একবার আসছি।'

ফেলুদা ফোনটা রেখে দিয়ে প্রথমে আপন মনে বিড়বিড় করে বলল, 'X আর Y তাহলে একই লোক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে Z-কে নিয়ে।' তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'ডেসটিনেশন গোলোকধাম। তৈরি হয়ে নে তোপ্‌সে।'

www.BanglaBook.org

৫

আপনি চললেন নাকি?'

গোলোকধামের গেট দিয়ে ঢুকে দেখি রণজিৎবাবু আসছেন। বাইরে পুলিশ দেখে বুঝেছি বাড়িটার উপর নজর রাখা হয়েছে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বললেন রণজিৎবাবু, 'নীহারবাবু বললেন আজ আর আমাকে প্রয়োজন হবে না।'

'উনি আছেন কেমন?'

'ডাক্তার এসেছিলেন। বললেন বাড়িতে এতগুলো ঘটনা একসঙ্গে ঘটাতে শক্ পেয়েছেন। প্রেসারটা ওঠানামা করছে।'

'কথা বলছেন কি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বলছেন', আশ্বাসের সুরে বললেন রণজিৎবাবু।

'যে খামটা পাওয়া গেছে দস্তুরের ঘর থেকে সেটা একবার দেখব। আপনার খুব তাড়া না থাকলে আর একবারটি চলুন ওপরে। আলমারিতে আছে ত ওটা?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখব না কথা দিচ্ছি। এ বাড়িতে ত আর বিশেষ আসা-টাসা হবে না।'

'কিন্তু খাম ত সীল করা,' কিন্তু-কিন্তু ভাব করে বললেন রণজিৎবাবু।

'ত হলেও আমি জিনিসটা একবার শুধু হাতে নিয়ে দেখতে চাই।'

রণজিৎবাবু আর আপত্তি করলেন না।

আজও বাড়ি অন্ধকার, দশটার আগে আলো আসবে না, এখন বেজেছে মাত্র সোয়া ছটা। দোতলার বারান্দায় আর ল্যান্ডিং-এ কেরোসিন ল্যাম্প জ্বললেও আনাচে-কানাচে অন্ধকার।

রণজিৎবাবু আমাদের বৈঠকখানায় বসিয়ে সুবীরবাবুকে খবর দিতে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন যে নীহারবাবু যদি খামটা আলমারি থেকে বার করার ব্যাপারে আপত্তি করেন, তাহলে কিন্তু সেটা দেখানো সম্ভব হবে না।

'সেটা বলাই বাহুল্য', বলল ফেলুদা।

সুবীরবাবুকে দেখে বেশ ক্লান্ত বলে মনে হল। বললেন সারাদিন নাকি খবরের কাগজের রিপোর্টারদের ঠেকিয়ে রাখতেই কেটে গেছে।—'তবে একটা ভালো এই যে, দাদার নামটা লোকে ভুলতে বসেছিল, এই সুবাদে আবার মনে পড়ছে।'

মিনিটখানেকের মধ্যেই রণজিৎবাবু এলেন, হাতে লম্বা সাদা খাম। বললেন, 'নীহারবাবু আপনার নাম শুনেই বোধ হয় আপত্তি করলেন না। এমনিতে কাউকে দেখতে দিতেন না।'

'আশ্চর্য', ফেলুদা খামটা হাতে নিয়ে ল্যাম্পের তলায় এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখে মন্তব্য করল। আমার চোখে মনে হচ্ছে সাধারণ লম্বা খাম, পিছনে লাল গালার সীল, সামনের দিকে ওপরের বাঁ কোনে ছাপার হরফে লেখা "ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োকেমিস্ট্রি, ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগ্যান, মিশগ্যান, ইউ এস এ"। এতে যে আশ্চর্যের কী আছে জানি না। সুবীরবাবু আর রণজিৎবাবু বসে আছেন আবছা অন্ধকারে, তাঁদেরও মনের অবস্থা নিশ্চয়ই আমারই মত।

ফেলুদা সোফায় এসে বসল, তার দৃষ্টি তখনও খামটার দিকে। তারপর দুই ভদ্রলোককে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, শুধু আমাকেই উদ্দেশ্য করে কথা বলতে শুরু করল। ভাবটা স্কুল-মাস্টারের। এই মেজাজে অনেক সময় অনেক বিষয়ে অনেক জ্ঞান দিয়েছে ফেলুদা আমাকে।

'বুঝেছিস তোপসে, আশ্চর্য জিনিস এই ইংরেজি হরফ। বাংলায় সব মিলিয়ে গোটা দশ বারো ধাঁচের হরফ আছে, আর ইংরিজিতে আছে কম পক্ষে হাজার দুয়েক। একটা তদন্তের ব্যাপারে আমাকে এই নিয়ে কিছুটা পড়াশুনা করতে হয়েছিল। হরফের শ্রেণী আছে, জাত আছে, প্রতিটি শ্রেণীর আলাদা নাম আছে। যেমন এই বিশেষ ডিজাইনের হরফের নাম হল গ্যারামন্ড।'—ফেলুদা খামের উপর ছাপা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের দিকে আঙুল দেখাল। তারপর বলে চলল—

'এই গ্যারামন্ড টাইপের উদ্ভব ষোড়শ শতাব্দীতে, ফ্রান্সে। তারপর ক্রমে এই টাইপ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যান্ড, জার্মানি, সুইটজারল্যান্ড, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে শুধু যে এই টাইপের প্রচলন হয় তা নয়, ক্রমে এই সব দেশের নিজস্ব কারখানায় এই টাইপের ছাঁচ তৈরি করা শুরু হয়। এমন কি সম্প্রতি ভারতবর্ষেও এটা হচ্ছে। মজা এই যে, খুব ভালো করে দেখলে দেখা যায় যে এ দেশের গ্যারামন্ডের সঙ্গে অন্য দেশের গ্যারামন্ডের সূক্ষ্ম তফাৎ রয়েছে। কয়েকটা বিশেষ বিশেষ অক্ষরের গড়নে এই তফাৎটা ধরা পড়ে। যেমন এই খামের উপরের হরফটা হওয়া উচিত আমেরিকান গ্যারামন্ড, কিন্তু তা না হয়ে এটা হয়ে গেছে ইন্ডিয়ান গ্যারামন্ড। এমন কি ক্যালকাটা গ্যারামন্ডও বলতে পারিস।'

ঘরে থমথমে স্তব্ধতা। ফেলুদার দৃষ্টি খাম থেকে চলে গেছে রণজিৎবাবুর দিকে। লন্ডনে মাদাম তুসোর মিউজিয়ামে মোমের তৈরি বিখ্যাত লোকের মূর্তি ছবি দেখেছি; তার সব কিছু অবিকল মানুষের মত হলেও, শুধু কাচের চোখগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে মানুষটা জ্যান্ত নয়। রণজিৎবাবু জ্যান্ত হলেও, তার দৃষ্টিহীন চোখ দুটো দেখাচ্ছে অনেকটা সেই মোমের মূর্তির চোখের মত।

'কিছু মনে করবেন না রণজিৎবাবু, আমি এই খামটা খুলতে বাধ্য হচ্ছি।'

রণজিৎবাবু তাঁর ডান হাতটা তুলে একটা বাধা দেওয়ার ভঙ্গির মাঝপথে থেমে গেলেন।

একটা তীক্ষ্ণ শব্দের সঙ্গে ফেলুদার দু' আঙুলের এক টানে খামের পাশটা ছিঁড়ে গেল। তারপর সেই দু' আঙুলেরই আরেকটা টানে খামের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক তাড়া ফুলস্ক্যাপ কাগজ।

রুল টানা ফুলস্ক্যাপ।

তাতে শুধু রুলই আছে, লেখা নেই। অর্থাৎ যাকে বলে ব্লাঙ্ক পেপার।

কাচের চোখ এখন বন্ধ, মাথা হেঁট, দু' হাতের কনুই হাঁটুর উপর, হাতের তেলোয় মুখ ঢাকা।

'রণজিৎবাবু,'—ফেলুদার গলা গম্ভীর—'আপনি গতকাল সকালে এসে যে চোর আসার ইঙ্গিত করেছিলেন, সেটা একেবারে ধাপ্পা, তাই না?'

রণজিৎবাবুর মুখ দিয়ে উত্তরের বদলে বেরোল শুধু একটা গোঙানির শব্দ। ফেলুদা বলে চলল—

www.BanglaBook.org

'আসলে রাত্তিরে চোর এসেছে এমন একটা ধারণা প্রচার করার দরকার ছিল আপনার। কারণ আপনি নিজের চুরির জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, এবং সন্দেহটা যাতে আপনার উপর না পড়ে সেদিকটা দেখা দরকার ছিল। আমার বিশ্বাস সকালে চোর আসার ধাপ্পাটা দিয়ে দুপুরের দিকে সুযোগ বুঝে আপনিই আলমারি খোলেন এবং খুলে দুটি কাজ সারেন—তেত্রিশ হাজার টাকা এবং নীহারবাবুর গবেষণার নোট্‌স হস্তগত করা। আমার বিশ্বাস এই জাল খামটা কাল তৈরি ছিল না ; এটা আপনি রাতারাতি ছাপিয়ে নিয়েছেন। এটার হঠাৎ প্রয়োজন হল কেন সেটা জানতে পারি কি?'

রণজিৎবাবু এবার ফেলুদার দিকে চোখ তুললেন। তারপর ধরা গলায় বললেন, 'কাল বিকেলে দস্তুরের গলা শুনে নীহারবাবু ওকে সুপ্রকাশ চৌধুরী বলে চিনতে পেরেছিলেন! আমাকে বললেন, "বিশ বছর পরে লোকটার লোভ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আমার কাগজপত্র ওই সরিয়েছে।" তখন...'

'বুঝেছি। তখন আপনি ভাবলেন চুরিটা দস্তুরের ঘাড়ে চাপানোর এই সুযোগ। আপনিই ত পুলিশ চলে যাবার পর সেলোটেপ দিয়ে খামটাকে খাটের তলায় আটকে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন—ঠিক এমন ভাবে যাতে নিচু হলেই সেটা চোখে পড়ে, তাই না?'

রণজিৎবাবু প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

'আমায় মাপ করবেন! আমি ফেরত দিয়ে দেব! টাকা আর কাগজপত্র আমি কালই ফেরত দিয়ে দেব, মিঃ মিত্তির! আমি... আমি লোভ সামলাতে পারি নি! সত্যি বলছি, আমি লোভ সামলাতে পারি নি!'

'ফেরত আপনাকে দিতেই হবে। না হলে আপনাকে পুলিশের হাতে তুলে দেব সেটা বুঝতেই পারছেন।'

'আমি জানি,' বললেন রণজিৎবাবু।—'তবে একটা অনুরোধ। নীহারবাবু যেন জানতে না পারেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তিনি এ শক্‌ সহ্য করতে পারবেন না।'

'বেশ। তিনি জানবেন না এটা কথা দিচ্ছি। কিন্তু আপনি এত ভালো ছাত্র হয়ে এটা কী করলেন?'

রণজিৎবাবু ফ্যালফ্যাল করে ফেলুদার দিকে চাইলেন। ফেলুদা বলে চলল—

'আমি আপনার প্রোফেসর বাগচীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আপনার উপর আমার সন্দেহ পড়ে চাবির গর্তের পাশের দাগ দেখে। চোর অত সাবধানে কাজ করে না। বিশেষত যেখানে ঘরে লোক রয়েছে, দরজার বাইরে চাকর রয়েছে। যাই হোক, আপনার ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল ছিল সেটা উনি বললেন। পরীক্ষা দিলে আপনি ফার্স্ট ক্লাস পেতেন এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। হঠাৎ পড়াশুনা বন্ধ করে সেক্রেটারির চাকরিটা নেওয়া কি শর্ট কাটে নোবেল প্রাইজের লোভ?'

রণজিৎবাবু ভয়ে, লজ্জায়, অনুশোচনায় আর কথাই বলতে পারলেন না। ওঁর অবস্থা দেখে আমার মত ফেলুদারও যে মায়া হচ্ছিল সেটা ওর পরের কথা থেকেই বুঝলাম।

'আপনি এবার বাড়ি যেতে চান যেতে পারেন। কালকের জন্য আর অপেক্ষা করব না আমরা। আপনি আজই আসল কাগজপত্র আর টাকা নিয়ে চলে আসুন। একটু অপেক্ষা করুন, আপনার সঙ্গে যাতে পুলিশ থাকে তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এতগুলো টাকা নিয়ে যাতায়াত করাটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

সুবোধ বালকের মত মাথা নাড়লেন রণজিৎ ব্যানার্জি।

সুবীরবাবু তাঁর ছেলে সম্বন্ধে যাই বলে থাকুন না কেন, সে যে চুরি করে নি, সেটা জেনে তাঁর নিশ্চয়ই খানিকটা নিশ্চিন্ত লাগছে। অন্তত তাঁর চেহারা দেখে আর গলার স্বরে তাই মনে হল। বললেন, 'একবার দাদার সঙ্গে দেখা করে যাবেন কি?'

'নিশ্চয়ই', বলল ফেলুদা, 'সেটাই ত আসল কাজ।'

সুবীরবাবুর পিছন পিছন আমরা নীহারবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

'আপনারা এসেছেন?' চেয়ারে শোয়া অবস্থায় প্রশ্ন করলেন নীহারবাবু।

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বলল ফেলুদা। 'আপনার গবেষণার কাগজপত্রগুলো ফেরত পেয়ে নিশ্চয়ই খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছেন?'

'ওগুলোর আর বিশেষ কোনো মূল্য নেই আমার কাছে,' নিচু গলায় ক্লান্ত ভাবে বললেন নীহারবাবু। এক দিনে একজন মানুষ এত ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে সেটা আমার ধারণাই ছিল না। কালকেও দেখে মনে হয়েছে ভদ্রলোক রীতিমত শক্ত।

'আপনার কাছে মূল্য না থাকলেও আমাদের কাছে আছে', বলল ফেলুদা। 'বিশ্বের অনেক বৈজ্ঞানিকের কাছে আছে।'

'সে আপনারা বুঝবেন।'

'আপনাকে শুধু একটা প্রশ্ন করতে চাই। কথা দিচ্ছি এর পরে আর বিরক্ত করব না।'

নীহারবাবুর ঠোঁটের কোনে একটা ম্লান হাসি দেখা দিল। বললেন, 'বিরক্ত আর করবেন কি করে? বিরক্তির অনেক ঊর্ধ্বে চলে গেছি যে আমি!'

'তাহলে বলি শুনুন। কাল টেবিলের উপর দেখেছিলাম ঘুমের ট্যাবলেট দশটা। আজও দেখছি দশটা। আপনি কি কাল তাহলে ঘুমের ওষুধ খান নি?'

'না, খাই নি। আজ খাব।'

'তাহলে আসি আমরা!'

'দাঁড়ান।'

নীহারবাবু তাঁর ডান হাতটা ফেলুদার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। দুজনের হাত মিলল। ভদ্রলোক ফেলুদার হাতটা বেশ ভালো করে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন—

'আপনি বুঝবেন। আপনার দৃষ্টি আছে।'

বাড়িতে এসেও ফেলুদা গম্ভীর। কিন্তু তা বলে আমি অত রহস্যবরদাস্ত করব কেন? চেপে ধরে বললাম, 'ঢাক ঢাক গুড় গুড় চলবে না। সব খুলে বল।'

ফেলুদা ভিতরে রামায়ণে চলে গেল। ওর সাসপেন্স বাড়ানোর কিছু কায়দা আমি সত্যিই বুঝে উঠতে পারি না।

রামকে বনবাসে পাঠানোর ছ'দিন পর দশরথের হঠাৎ মনে পড়েছিল যে তিনি যুবরাজ অবস্থায় একটা সাংঘাতিক কুকীর্তি করে ফেলেছিলেন, আর সেই কারণেই আজ তাঁকে পুত্রশোক ভোগ করতে হচ্ছে। আচ্ছা, তোর মনে আছে সে কুকীর্তিটা কী?'

রামায়ণটা টাটকা পড়া ছিল না, কিন্তু এ ঘটনাটা মনে ছিল। বললাম, 'অন্ধমুনির ছেলে রাত্রে নদীতে জল তুলছিল কলসীতে। দশরথ অন্ধকারে শব্দ শুনে ভাবলেন বুঝি হাতি জল খাচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উনি শব্দভেদী বাণ মেরে ছেলেটিকে মেরে ফেলেছিলেন।'

'গুড। অন্ধকারে শব্দ শুনে লক্ষ্যভেদ করার এই ক্ষমতাটা ছিল দশরথের। নীহারবাবুরও ছিল।'

'নীহারবাবু!'—আমি প্রায় চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম।

'ইয়েস স্যার,' বলল ফেলুদা।—'রাত জাগতে হবে বলে ঘুমের ওষুধ খান নি। সবাই যখন ঘুমে অচেতন, তখন খালি পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে যান দস্তুর সুপ্রকাশের ঘরে। এই ঘরে এক কালে ওঁর ভাইপো থাকত। ঘর ওঁর চেনা। হাতে ছিল অস্ত্র—রুপো দিয়ে বাঁধানো জাঁদরেল লাঠি। খাটের কাছে গিয়ে লাঠি দিয়ে মোক্ষম ঘা। একবার নয়, তিনবার।'

'কিন্তু...কিন্তু...'

আমার এখনো সাংঘাতিক গোলমাল লাগছে। এসব কী বলছে ফেলুদা? লোকটা ত অন্ধ!

'একটা কথা কি মনে পড়ছে না তোর?' অসহিষ্ণুভাবে বলল ফেলুদা। 'সুখওয়ানি কী বলছে দস্তুর সম্পর্কে?'

বিদ্যুতের ঝলকের মত কথাটা মনে পড়ে গেল।—

'দস্তুরের নাক ডাকত।'

'এগজ্যাক্টলি!' বলল ফেলুদা।—'তার মানে বালিশের কোনখানে মাথা, কোন পাশে ফিরে রয়েছে, এ সবই বুঝতে পেরেছিলেন নীহারবাবু। যার শ্রবণশক্তি এত প্রখর, তার আর এর চেয়ে বেশি জানার কী দরকার? এক ঘায়ে যদি না হয়, তিন ঘায়ে ত হবেই!'

আমি কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থেকে ভয়ে ভয়ে বললাম, 'এই অসমাপ্ত কাজটার কথাই কি বলেছিলেন নীহারবাবু? প্রতিশোধ?'

'প্রতিশোধ,' বলল ফেলুদা, 'জিঘাংসা। অন্ধেরও দেহমনে প্রচণ্ড শক্তির সঞ্চার করতে পারে এই প্রবৃত্তি। এই জিঘাংসাই তাঁকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছিল। এখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। আর সেই কারণেই তিনি আইনের নাগালের বাইরে।'

আরো সতের দিন বেঁচে ছিলেন নীহাররঞ্জন দত্ত। মারা যাবার ঠিক আগে তিনি উইল করে তাঁর গবেষণার কাগজপত্র আর জমানো টাকা দিয়ে গেছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত মেধাবী সেক্রেটারী রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ১৩৮৭

সর্বেশ্বরের কুমীর শিকার

গঙ্গেশ বিশ্বাস

বাঘ যে কুমীরকে ভয় করে, খালে-খাঁড়িতে নামতে হলে সুন্দরবনের একটা কেঁদো বাঘকেও যে অনেক হিসেব করে জলে নামতে হয়, এমন আজব কথা কেউ সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু সুন্দরবনের ধনচী-তমলুকচড়া অঞ্চলের একটা প্রমাণ সাইজের কুমীরের গল্প যদি বলি, তাহলে শুধু বাঘ কেন, গণ্ডার হাতিও যে কুমীরকে সমীহ করবে, তেমন কথাও বিশ্বাস করতে হবে। একটা বড় কুমীর লম্বায় পঁচিশ ফুট, চওড়ায় তিন ফুট, আর খাড়াইতে আড়াই ফুট হওয়া অসম্ভব নয়। একটা এক টন ওজনের কুমীর নাকি বারো টন ওজনের মত বল খাটাতে পারে। একটা এদেশের হাতির ওজন তিন-চার টন। কাজেই একটা এক টন কুমীর যে বাগে পেলে একটা হাতীকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে—একবার জলে নেমে পড়তে পারলে, তখন আর কুমীরকে পায় কে!

সুন্দরবনের সব নদী-মোহানাতেই কম-বেশি কুমীর থাকে, তবে কয়েকটা জায়গায় কুমীরের উপদ্রব খুব বেশি। কুমীর সব থেকে বেশি সপ্তমুখী-নদীতে। এই নদীর পুবে রয়েছে কতকগুলো আবাদি দ্বীপ—বুড়াবুড়িতট, রাক্ষসখালি, এল-প্লট, এইচ-প্লট, এই সব। এই দ্বীপগুলোর ভেতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে জগদ্দল-নদী—ধারাগুলো সবই পড়েছে সপ্তমুখীতে। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার বনে-জঙ্গলে যেমনি সুন্দরবনী বাঘের দৌরাত্ম্য, ঠাকুরান-জগদ্দল-সপ্তমুখী নদীর আশপাশের গ্রামে তেমনি নদী-মোহানায় কুমীরের উপদ্রব। জোয়ারের সময় নদী বা সমুদ্রের জল নিচু এলাকার নিচু জমিতে ঢুকে পড়লে মাছ-কাঁকড়া খেতে এসে কোন কোন জন্তু পড়ে যায় কুমীরের মুখে। আবার মোটা জল আটকানোর জন্য আবাদি-দ্বীপের ধারে-ধারে যে বাঁধ আছে, তার বাইরের দিকের জঙলা জমিতেও জোয়ারের জলের সঙ্গে উঠে আসে মাছ আর কাঁকড়া। গাঁয়ের মেয়ে-বৌরা সেই সব কুড়োতে এলে, নদী বা খালের কুমীর সময়-সময় তাদের অলক্ষিতে এগিয়ে এসে কাউকে-কাউকে টেনে নিয়ে গিয়ে জলে ডুব মারে।

পনর-কুড়ি বছর আগে একবার জগদ্দল-নদীর ধারের গ্রামগুলোতে কুমীরের ভীষণ অত্যাচার শুরু হয়। জল-জঙ্গলের ধারেকাছেও যাবার উপায় ছিল না তখন। একদিন ভরা-জোয়ারের সময় এল-প্লটের দক্ষিণ দিকের বাঁধের ওপরে দাঁড়িয়ে একটা গোল জাল দিয়ে মাছ ধরছিল গ্রামের এক চাষী-বউ। বাঁধের বাইরের দিকে জল তখন মাত্র ফুটখানেক নিচে। বাইরের জঙ্গলটাতেও তখন জোয়ারের জল থৈ-থৈ করছে। কোথায় যে একটা মানুষখেকো কুমীর ওত পেতেছিল, বউটি তা জানতে পারেনি একটুও। হঠাৎ বাঁধের বাইরের জলের ভেতর থেকে একটা বিরাট মাথা ভেসে উঠল বউটির কাছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে গলা বাড়িয়ে খপ করে ধরল বউটার একটা পা। বউটি দুহাত

www.BanglaBook.org

দিয়ে বাঁধের মাটি আঁকড়ে ধরে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করল বটে, কিন্তু কুমীরের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে কেন! কিছু দূরে তার একটি দশ-বার বছরের ননদ দাঁড়িয়েছিল। বৌদিকে কুমীরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে মেয়েটি চিৎকার করতে-করতে ছুট লাগাল গাঁয়ের দিকে। কুমীরটা জল-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে টানতে টানতে বৌটিকে নিয়ে গেল নদীতে। মেয়েটার চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে আট-দশ মিনিটের মধ্যে বাঁধের ওপর জমে গেল বহু লোক। বাঁধের মাটিতে বউটির হাঁচড়-পাঁচড়ের দাগ দেখতে পেল সকলে, কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে না বউটির, না কুমীরটার, কারো কোন পাত্তা পাওয়া গেল না আর। তিন-চার দিন বাদে দেখা গেল এক মাইল দূরে, নদীটা যেখানে সপ্তমুখীতে পড়েছে, তার কাছে ভাসছে বৌটির ফুলে-ওঠা শরীর, আর তার পাশেই আধ-ভাসা হয়ে রয়েছে কুমীরটা। শিকার বাগিয়ে নিয়েই কুমীর সেটাকে জলের ভেতরে শরীরের চাপ দিয়ে ডুবিয়ে রাখে, যাতে সেটা বেশ পচে ওঠে। মাংস পচে নরম হলে কুমীর ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেতে থাকে তার পচান শিকারের মাংস।

নদী আর খালে ভর্তি সুন্দরবনের আবাদ-এলাকা। জল-জাল-ডিঙি নিয়েই সেদিকের লোকের কাজ-কারবার। বউটিকে ধরার মাসখানেক পরে জগদ্দল নদীর একটা শাখার ধার থেকে আবার একটা কুমীর সতীশ প্রধান নামের এক বুড়োকেও টেনে নিয়ে গেল নদীতে। সতীশ নদীতে জাল দিয়ে মাছ ধরছিল। পাড়ের ওপর মাছ ছড়িয়ে দিলে সেগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছিল তার এক নাতনী। নদীর ও-পারের একটা জঙ্গলা জায়গায় বসেছিল এই কুমীরটা। সতীশ কুমীরটাকে দেখতে না পেলেও কুমীরটা কিন্তু সতীশকে লক্ষ করছিল ঠিক। শাখাটার চওড়া সেখানে এক শ' গজের মত। এক সময় রাক্ষসটা বুড়োর অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে জলে নেমে এক ডুবে চলে এল নদীর এ পারে। নদীর ধার থেকে দশ-পনর হাত ওপরে, নদীর দিকে পেছন দিয়ে বুড়োটি তখন জাল থেকে মাছ ছাড়াচ্ছিল ; নাতনীটিও একমনে মাছ কুড়োতে ব্যস্ত। কুমীরটা পাড়ে উঠেই বুড়োর পা কামড়ে ধরে তাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল নদীর দিকে। কুমীরের মুখ থেকে তার আর বাঁচার আশা নেই বুঝতে পেরে বুড়ো মাটিতে পড়ে গিয়েও তার নাতনীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'তোর ঠাম্মাকে কইবি, তার বুড়াকে কুমীরে লই গ্যালা। হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল!'—দেখে-শুনে মনে হবে যেন আগে থেকেই ব্যবস্থা ছিল তাকে তখনই কুমীরের সঙ্গে যেতে হবে। তার কথাগুলো শেষ না হতেই রাক্ষসটা বুড়োকে টেনে নিয়ে ফেলল একেবারে নদীর ধারের জলকাদার মধ্যে।

বুড়াবুড়িতে, দাসপুর, এল-প্লট—এইসব এলাকায় যখন কুমীরের এই রকম অত্যাচার চলছে, চারদিকের লোকজন তখন কুমীর-বংশ কমানোর জন্য উঠে-পড়ে লাগল। এদের মধ্যে আবার সব থেকে উৎসাহী ছিল কয়ালের বাজারের সর্বেশ্বর বারুই।

কয়ালের বাজার এল-প্লটের এক গণ্ডগ্রাম। সর্বেশ্বরের চেহারা আর সাহস ছিল ভীমের মত। একবার সে একটা আসল সুন্দরবনী বাঘ মেরেছিল স্রেফ লাঠিপেটা করে—গাঁয়ে ঢুকে বাঁধের ওপর শুয়েছিল বাঘটা ; পেছন থেকে এসে সর্বেশ্বর হেঁতালের লাঠি দিয়ে এমন এক ঘা মেরেছিল বাঘের ঠ্যাঙে যে, ছাল ছাড়াবার পর দেখা গেল, জানোয়ারটার রাঙের কয়েক সের

www.BanglaBook.org

মাংস বনে গিয়েছে একেবারে চপের কিমা। তার এমন সাহস যে, শিকারীদের সঙ্গে জঙ্গলে গিয়ে দরকার পড়লে রাত-বিরাতেও মাচান থেকে নেমে বনের ভেতর দিয়েই হেঁটে চলে যেত দূর-দূর গ্রামে।

তার শরীরটা এখনকার মত আড়াইমনি হবার আগে এক সময় সে রণপায় চেপে দু'ঘণ্টার পথ ভাঙতে পারত এক ঘণ্টায়। আশপাশের দশ-বিশ গাঁয়ের সব লোকই চিনত তাকে। ভীমের বক-রাক্ষসকে চ্যালেঞ্জ করার মত সর্বেশ্বরই সব থেকে বেশি তোড়জোড় করে এগিয়ে এল কুমীরের মোকাবিলা করতে। কিন্তু কুমীর এমনি বেকায়দার প্রাণী যে, কামান-বন্দুক-বোমা, যা-ই থাক না হাতে, জলের তলায় নিপাত্তা হয়ে থাকে বলে, তাকে খতম করা তো দূরের কথা, তার দিকে বন্দুকটা একবার তাগ করাও মুশকিল—কখন কোথায় কি ভাবে যে থাকবে, তার কোনই নিশ্চয়তা নেই। কোথাও মানুষের একটু সাড়া পেলেই টুপ করে নেমে পড়বে জলে। তার কান আর চোখ, দু-ই সমান সজাগ। জলের মানুষখেকো কুমীর মারার চেয়ে বরং বনের মানুষখেকো বাঘ শিকার অনেক সহজ।

বিনা বন্দুকে দু-দুটো ভারি কুমীর মেরেছিল সর্বেশ্বর বারুই। তার চেহারার মত তার বুদ্ধিটাও ছিল অদ্ভুত। কামারকে দিয়ে চারটে কুমীর-মারা-বঁড়শি তৈরি করাল সে। এক-একটা বঁড়শি দেখতে অনেকটা নৌকোর নোঙরের মত, কিন্তু আকারে ছোট। এতে ছিল আট-দশ ইঞ্চি লম্বা একটা লোহার রড—তার এক ধারে ছিল একটা ছোট আংটা, আর এক-ধারে ছিল তিনমুখী তিনটি বড় বঁড়শি-কাঁটা। একটা এক-ফুটের মত লম্বা কলাগাছের ডুমোর ওপর একটা জ্যান্ত হাঁসকে বেঁধে দিয়ে তার ওপর বঁড়শিটা এমন ভাবে রাখা হল যাতে একটা কাঁটা থাকে হাঁসটার পেট আর গলার তলা দিয়ে, আর দুটো কাঁটা একটু উঁচু হয়ে থাকে হাঁসের পিঠের দু'পাশে। বঁড়শিটাও তার দিয়ে ভাল করে বেঁধে দেওয়া হল কলার ডুমোর সঙ্গে। বঁড়শির পেছনের আংটার সঙ্গে বাঁধা হল পাঁচ-ছ'হাত পাকান তারের কাছি, আর এই তারের কাছির শেষের দিকটা বাঁধা হল একটা পাটের কাছির সঙ্গে। নারকেলের কাছি কুমীর দাঁত দিয়ে কেটে ফেলে, কিন্তু পাটের কাছি দাঁতে জড়িয়ে যায় বলে, কুমীর পাটের কাছি কেটে পালিয়ে যেতে পারে না।

নদীর যে সব জায়গায় কুমীরের উপদ্রব ছিল বেশি, তেমন কয়েকটা জায়গা বেছে নিয়ে প্রত্যেক জায়গায় একটা করে হাঁস-বঁড়শি বসানো কলার ডুমো ভাসিয়ে দেওয়া হল। কাছিগুলো বেঁধে রাখা হল জায়গামত এক-একটা শক্ত গাছে।

কলগুলো ভাসান হয়েছিল বিকেলের দিকে একটা ভাটার মুখে। নদীতে আর তার শাখায় জল তখন কানায়-কানায়। বাঁধের যে জায়গায় বউটিকে কুমীরে ধরেছিল, সর্বেশ্বর আর তার দু'জন শাগরেদ গিয়ে বসল তার কাছাকাছি। নদীটা সেখান থেকে প্রায় একশো গজ দূরে। নদী আর বাঁধের মধ্যে ছিল নোনা জঙ্গল—গামা, বানী, ক্যাড়া, গরান, হেঁতাল—এই সব গাছের। গাছের ছোট-বড় ঝোপঝাড়। গাছগাছালির ফাঁকে-ফাঁকে হাঁসটা দেখা যাচ্ছিল পরিষ্কার। স্রোতের টানে সেটা একবার পাড়ে এসে ঠেকছিল, আবার কখনো বাতাসে সরে যাচ্ছিল নদীর কিছুটা ভেতরে। হাঁসটা অস্বস্তিতে এক-একবার ডানা-ঝটপটিয়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছিল। আর নিজের অসহায় অবস্থার জন্য প্যাঁক-প্যাঁক শব্দে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল করুণভাবে।

নদীর দিকে লক্ষ রেখে বসে থাকতে-থাকতে এক সময় সর্বেশ্বর দেখতে পেল, হেলিকপ্টারের মত বিশাল চেহারার কয়েকটা কাঁক, খুন্তে-বক আর হাড়গিলে এদিক-সেদিক থেকে উড়ে এসে জল-কাদার মধ্যে পড়ে থপাথপ গিলতে লাগল জোয়ারের জলে ভেসে আসা মাছ-কাঁকড়া-পোকামাকড়। বছরের বিভিন্ন সময়ে জলা-জঙ্গলে এমন অনেক বড়-বড় পাখি, নানা জাতের স্টর্ক, টীল, করাল, সাচকা, জলমুরগি, কাস্তেচরা, লাল-জির, রাঙামুড়ি প্রভৃতি নানা বর্ণের আর নানা চেহারার অসংখ্য দেশী-বিদেশী পাখি দেখে লাটের লোকেরা।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হল, তবু কোন মানুষখেকোর দেখা মিলল না। নদীর দিকটায় যখন আর নজর চলছিল না, সর্বেশ্বর তখন থেকে হাঁস-বঁড়শির কাছিটা ডান হাত দিয়ে ধরে থাকল, যাতে কাছির টানাটানি দেখে বুঝতে পারে বঁড়শিতে কুমীর পড়েছে। ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। তখন শীতকাল। তবু আকাশ ছিল মেঘলা। জঙ্গলের ভেতর উঁকি দিতে একটা তারাও ছিল না আকাশে। কেবল নিচের জলকাদার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা সামুদ্রিক প্রাণীকণার পচনজনিত একটা ম্লান আলো ছাড়া বাকি সব দিক গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। রাত একটু বাড়তে আশপাশ থেকে ভেসে আসতে লাগল সাপেধরা বেঙের কোঁকানোর আঁ-আঁ-ক আঁ-আঁ-ক আর্তরব। বড় গাছের উঁচুতে জোরে-জোরে 'টক্-খক্' ধরনের একটা বুক-কাঁপান বিকট শব্দ হচ্ছিল এখন-তখন। বাইরের কেউ হলে সে-শব্দে সে ভয় পেত নিশ্চয়ই, কিন্তু সেদিকের লোকেরা জানে সুন্দরবনের গাছে-গাছে তক্ষক সাপ অমনি শব্দ করে।

রাত নটা সাড়ে নটায় দলটা তাদের সামনের জলকাদার মধ্যে শুনতে পেল একটা থপ-থপ শব্দ। সর্বেশ্বরের মনের মধ্যে বিদ্যুৎ-চমকের মত হঠাৎ একটা আশঙ্কা উঁকি দিল—অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কোন কুমীর-রাক্ষস সরাসরি এগিয়ে আসছে না তো তাদের দিকেই! তিন-সেলের একটা টর্চ ছিল তাদের হাতে, কিন্তু সেটা জ্বালাতে ভরসা পাচ্ছিল না তারা। যদি কুমীর না হয়, তবে আধ-মাইলের মধ্যে থাকলেও, টর্চের তীব্র আলো চোখে পড়লে, রাক্ষসটা আর সহজে ভিড়বে না সেদিকে। কিন্তু টর্চ না জ্বেলেও তাদের উপায় ছিল না। টর্চ ফেলে চারদিক ভাল করে দেখতে চেষ্টা করল সর্বেশ্বর, কিন্তু গাছ-গাছালির জন্য একটু দূরের কিছুই স্পষ্ট বোঝা গেল না—মাছখেকো ভোঁদড়, ভুঁড়ো শেয়াল, না সত্যি কোন ধূসর-রঙা নোনাজলের কুমীর, আলো দেখে ভড়কে গিয়ে গাছের আড়ালে কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল কি-না, সকলে উঠে পড়ে কিছুটা খোঁজাখুঁজি করেও তা বুঝতে পারল না। সেখানে আর তখন বসে থেকে কাজ নেই বুঝে রাত্রির মত দলটা চলে গেল গাঁয়ের ভেতরে।

ভোর হতে-না-হতে অনেক লোকের কথাবার্তায় সর্বেশ্বরের ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের ভেতরে থেকেই সর্বেশ্বর বুঝতে পারল গাঁয়ের ধারের কলে একটা কুমীর আটকা পড়েছে—কে একজন এসে খবর দিয়েছে, বঁড়শির জায়গাটার নদীর জল তোলপাড় হচ্ছে। নদীর ধারে এসে সর্বেশ্বর দেখতে পেল, সত্যি একটা কুমীরই হাঁস-বঁড়শি গিলে ফেলেছে। সেটা এক-একবার জল তোলপাড় করছে, আবার কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকছে; কখনো ছুটে আসছে পাড়ের দিকে, কখনো দৌড় লাগাচ্ছে নদীর ভেতরের দিকে। কুমীরটা যে কখন আটকা পড়েছিল তা বোঝা

www.BanglaBook.org

গেল না, তবে তখনো বেশ তেজের সঙ্গে চিৎ হয়ে, উপুড় হয়ে অনেক খেল দেখাচ্ছিল ছাড়া পাবার জন্য। কুমীরটা যত বেশি উথালি-পাথালি করছিল, কাঁটাগুলো তত বেশি জোরে বসে যাচ্ছিল তার গলার ভেতরে। রাক্ষসটার জারিজুরি কিছুটা কমলে, সর্বেশ্বর সাবধানে কাছি টেনে-টেনে তাকে তুলে নিয়ে এল চড়ার ওপরের জঙ্গলের ভেতরে। কুমীরটা প্রথমে আসতে বেশ নারাজ ছিল, দাপাদাপি করে আপত্তি জানাচ্ছিল খুব, কিন্তু গলার কাঁটায় টান পড়তেই সুড়সুড় করে চলে এল ওপরে।

দেখতে-দেখতে আশপাশের গ্রামের লোক ভেঙে পড়ল নদীর পাড়ে। যে বউটিকে কুমীরে খেয়েছে তার ননদও এসেছিল মজা দেখতে। একটু রঙ্গ করার জন্য সর্বেশ্বর মেয়েটাকে কাছে ডেকে এনে অনেক বলে-কয়ে কুমীরের কাছিটা ধরিয়ে দিল তার হাতে। মেয়েটা কাছি ধরে একটু টান দিতেই কুমীরটা সুবোধ বালকের মত তার দিকে কিছুটা এগিয়ে গেল বটে, কিন্তু তারপর আবার কাছিতে টান পড়তেই শুরু করল ভীষণ দাপা-দাপি ছুটোছুটি। আশপাশের লোকজন ছিটকে সরে গেল দূরে। ভয় পেয়ে মেয়েটাও চিৎকার করতে করতে তীরের বেগে ছুট লাগাল বাঁধের দিকে। কুমীরটাকে দাপাদাপি করতে দেখে কয়েকজন জোয়ান লোক একটু এগিয়ে গিয়ে বড়-বড় বাঁশ দিয়ে ঢপাঢপ এলোপাতাড়ি পেটাতে লাগল তার ঘাড়ে-পিঠে। কিন্তু তার রকম-সকম দেখে মনে হল অত মার খেয়েও সে মোটেই কাবু হয়নি।

কাবু হবে কি করে—নোনাজলের কুমীরের পিঠের ওপর গণ্ডারের শিংয়ের ধরনের কঠিন হাড়-চামড়ার যেরকম সারি সারি শক্ত পাত থাকে তা থেকে বন্দুকের গুলিও ঠিকরে যায়—বাঁশের বাড়ি তো তার পিঠে এক রকম সুড়সুড়ি। পাছে ল্যাজের বাড়ি মেরে খতম করে দেয়, সেই ভয়ে কেউ তার বেশি কাছেও ভিড়তে সাহস করছিল না। গলায় কাঁটা বিঁধে থাকলেও কিন্তু রাক্ষসটার কান আর চোখ ছিল সব দিকে, আর তখনো তার শরীরে শক্তিও ছিল যথেষ্ট। অবশেষে দুপাশ থেকে লম্বা-লম্বা বাঁশ দিয়ে কুমীরটার শরীরের কয়েক জায়গায় শক্ত করে চেপে ধরে, তার পেছনের দিকের কতকগুলো কাঁটার মধ্য দিয়ে তার ল্যাজটা কোন-রকমে বেঁধে ফেলা হল একটা শক্ত দড়ি দিয়ে। চারজন জোয়ান লোক সেই দড়ি টেনে ধরতে বন্ধ হল তার ল্যাজ খেলান। গলার কাছি আর ল্যাজের দড়ি—দুদিক থেকে টেনে ধরলে সকলে এবার কুমীরটাকে বাঁশ পেটা করতে লাগল পাইকারী হারে। এক ঘণ্টার মত নানা ভাবে নিগ্রহের পর সাঙ্গ হল তার ভবলীলা।

বার বার গুঁতোগুঁতি করেও যখন সকলে দেখল যে কুমীর-বাবাজী আর নড়বে না কোন দিন, তখন তার মাপ নেওয়া হল—পুরো আট হাত, অর্থাৎ বার ফুট লম্বা। ছাই-রঙের একটা বনেদী সুন্দরবনী কুমীর-প্রবর। কিন্তু সেটাই যে বৌটা বা বুড়োটাকে খেয়েছিল, তা প্রমাণ করা গেল না—নারী-পুরুষ, কারো চুলই ছিল না তার পেটের বিশাল গহ্বরে। তবু রাক্ষস-বংশের একটাকেও যমের বাড়ি পাঠাতে পারায় সর্বেশ্বরকে ঘিরে নাচতে লাগল গাঁয়ের অপগণ্ডের দল।

১৩৮৭

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

সাড়া

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

পথ বললো, হঠাৎ ডেকে,—
'আমার সাথে পাল্লা রেখে
ছুটতে পারিস কে?'
উথালপাথাল সাগর বলে
'আমার বুকের ঢেউয়ের মালা
গুনতে পারিস কে?'
চুপ করে সব রইলো যখন,
কেউ দিল না সাড়া,—
ছোট্ট তুতুন পথকে বলে,
'একটুখানি দাঁড়া!
সাগরজলের ঢেউ গোনাটাও
এমন কিছু নয়,—
তাড়াতাড়ি বলবো গুনে,
দেখবি কেমন হয়!
ছোট্ট দু'পায় ছুটবো আমি,
ছোট্ট হাতেই গুনবো ঢেউ,—
ছোট্ট বলেই আমায় কি আর
হারিয়ে দিতে পারবি কেউ!'

১৩৮৪

খাতার পাতায়

সুনির্মল চক্রবর্তী

খাতার পাতায় বুবুনসোনা
যেই এঁকেছে বাঘ
অমনি সেটা হাতপা ছুঁড়ে
দেখায় কত রাগ।
এবার দেখ বাঘের পাশে
বসল বাঘের ছানা
ছোট্ট কিনা, তাই দেখ তার
হাত-পা ছোঁড়া মানা।
বাঘবাবাজী ভাবছে চেয়ে
বুবুনসোনার দিকে
এইবারেতে কামড়ে খাব
ছোট্ট মানুষটিকে।
বুবুন কিন্তু পাচ্ছে না ভয়
ভয় পাবে সে কাকে?
খাতায় বন্দী করে তো সে
রেখেছে বাঘটাকে।

১৩৮১

কুস্তিডাঙার খাস্তগীর

জগদানন্দ গোস্বামী

কুস্তিডাঙার মস্ত মাঠে খাস্তগীরের বাস,
স্বাস্থ্যটাকে আস্ত রাখার চেষ্টা বারো মাস।
পেস্তা দিয়ে পাঁঠার মাথা, পোস্ত দিয়ে হাঁস,
দিস্তা দশেক রুটির ভোজেও নেইকো কোনো ত্রাস।
হস্তী গোটা হস্তে তোলা খাস্তগীরের খেল,
তুষ্টি আসে মুষ্টি দিয়ে ভাঙলে পাকা বেল।
খাস্তগীরের চোস্ত বপু দেখ যারা চাও,
আমার কাছে লিষ্টি নিয়ে কুস্তিডাঙায় যাও।

১৩৮১

www.BanglaBook.org

লেখকের পরিচয়

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩ ময়মনসিংহ—১৯১৫ কলকাতা) আধুনিক বাংলা শিশুসাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ। বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীতজ্ঞ, প্রবন্ধকার, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, গল্প লেখক ও প্রকাশক, সম্পাদক। সন্দেশের প্রতিষ্ঠাতা। হাফ-টোন্ ব্লক প্রিন্টিং ইত্যাদিতে অনেক উন্নতি করেন। বিলেতেও সে-সব সমাদৃত। তাঁর ইউ রায় এন্ড সন্সে অতি উঁচুদরের ছাপার কাজ হত। প্রধান প্রকাশিত বই—সেকালের কথা, টুনটুনির বই, ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত, মহাভারতের গল্প, হারমোনিয়াম শিক্ষা, বেহালা শিক্ষা ইত্যাদি।

পুণ্যলতা চক্রবর্তী (১৮৮৯—১৯৭৪, কলকাতা) উপেন্দ্রকিশোরের মেজ-মেয়ে। সন্দেশে অতি সরস ছোট ছোট সত্যি ঘটনার কথা লিখতেন। কর্মময় জীবনে সাহিত্য সাধনার জন্য বেশি সময় পেতেন না। উদার চিত্ত, অতি বুদ্ধিমতী। প্রধান প্রকাশিত বই—'ছেলেবেলার দিনগুলি', 'ছোট ছোট গল্প'।

জগদিন্দ্র ভৌমিক—জন্ম ১৯৩০। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের অধ্যক্ষ। রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা ও বিশ্বভারতীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা শিল্পী ও লেখক বিষয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। ঐ সব বিষয়ে প্রকাশিত বই-ও আছে। রবীন্দ্রনাথের King and Rebel-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন। অনুবাদক বলে খ্যাতি আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১ জোড়াসাঁকো, কলকাতা) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিশ্বকবি বলে স্বীকৃত। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে সমান গুণী। নতুন ধরনের নাট্যকার। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের জন্মদাতা। সামাজিক উপন্যাস লিখেছেন। মানুষের মনের সমস্ত ভাব ও অনুভূতি নিয়ে দু-হাজারের বেশি গান লিখেছেন। অদ্বিতীয় গল্পকার। ধর্মপ্রাণ। শিক্ষাব্রতী। সমাজোন্নয়নে ব্রতী। ছোটদের জন্য উল্লেখযোগ্য রচনা—সহজ পাঠ, শিশু, শিশু ভোলানাথ, সে, খাপছাড়া, ছেলেবেলা, মুকুট, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, অচলায়তন ইত্যাদি বহু নাটক ও গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য প্রণেতা। সর্বজন-বিদিত এই মানুষটির বিষয়ে বেশি লেখার প্রয়োজন নেই।

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯০৯—১৯৬৯) অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র। খ্যাতনামা লেখক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র। ছোটদের জন্য ভ্রমণকাহিনী আর আদর্শবাদী গল্প লিখে নাম করেছেন। উল্লেখযোগ্য বই—সোনার ঝরণা, বোর্ডিং স্কুল, বাবুইয়ের অ্যাডভেঞ্চার, লাফাযাত্রী, চরণিক, দক্ষিণের বারান্দা (স্মৃতিচারণ) ইত্যাদি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯—১৯৭০ পূর্ণিয়া) ঐতিহাসিক উপন্যাস ও অসাধারণ ছোট গল্প রচয়িতা। গোয়েন্দা ও অলৌকিক কাহিনীতে দক্ষ। বড়দের উল্লেখযোগ্য বই—জাতিস্মর, গৌড়মল্লার, তুঙ্গভদ্রার তীরে, কহেন কবি কালিদাস ইত্যাদি। ছোটদের জন্য সদাশিবের গল্পগুলি চমৎকার।

সুখলতা রাও (১৮৮৬—১৯৬৯ কলকাতা) উপেন্দ্রকিশোরের বড় মেয়ে। প্রধানতঃ সন্দেশ পত্রিকাতে লিখতেন। ভালো পাঠ্য-পুস্তকও রচনা করেছেন—নিজে পড়, নিজে শেখ, খেলার পড়া ইত্যাদি। কবিতার বই—নতুন ছড়া ইত্যাদি। দেশ-বিদেশের গল্প মিষ্টি বাংলায় ছেলেমেয়েদের দিয়েছেন—গল্পের বই, আরো গল্প, গল্প আর গল্প, নানান দেশের রূপকথা, লালিভুলির দেশে ইত্যাদি।

ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০—১৯৬০ শান্তিনিকেতন) ১৯০৮ সালে শান্তিনিকেতনে আসেন। বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ভারতের মধ্যযুগের ধর্মসাধনা তাঁর অনুশীলনের বিষয়। বাগ্মী ও গীতিরসিক। নানান ভারতীয় ভাষায় সুপণ্ডিত। পূর্ববাংলার গীতিকাব্য উদ্ধার করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য বই—কবীর, দাদু, ভারতের সংস্কৃতি, যুগগুরু রামমোহন, বাংলার বাউল ইত্যাদি। মাঝে মাঝে ছোটদের গল্প রচনা করতেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮—১৯৭১, বীরভূম) বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও গল্পকারদের একজন। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার থেকে সব শ্রেষ্ঠ ভারতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। বড়দের জন্য লিখতেন। কিছু কিছু ছোটদের উপযুক্ত। প্রধান কয়েকটি বই—কবি, রাইকমল, গণদেবতা, জলসাঘর, ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, মন্বন্তর, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, সন্দীপন পাঠশালা, আরোগ্য নিকেতন ইত্যাদি।

নরেন্দ্র দেব (১৮৮৯—১৯৭১ কলকাতা) ওমর খৈয়াম ও মেঘদূতের অনুবাদ করে খ্যাতি পেয়েছিলেন। পি-ই-এনের কলকাতা শাখার সম্পাদক ছিলেন। ছোটদের পত্রিকার সহৃদয় সম্পাদক। নানান কাগজে ছোটদের জন্য গল্প কবিতা লিখতেন।

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪, ঢেনকানল) বিশিষ্ট আই-সি-এস্, বিচক্ষণ প্রবন্ধকার। বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। অসাধারণ ছড়াকার। উল্লেখযোগ্য বই—সত্যাসত্য, পথে-প্রবাসে, জিয়ন-কাঠি, উড়কি-ধানের-মুড়কি ইত্যাদি।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৮ কলকাতা—১৯৬১ দেরাদুন) রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কৃষিবিদ, পল্লীউন্নয়নে বিশেষজ্ঞ, শিল্পী। নানা দিকে প্রতিভা। উল্লেখযোগ্য বই—প্রাণতত্ত্ব, অভিব্যক্তি, পিতৃস্মৃতি ইত্যাদি। ইংরিজিতেও পিতৃস্মৃতি লিখেছিলেন।

যোগেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮২, আজমের—১৯৭৪ দিল্লী) শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদির বন্ধু। ১৯০৭ সালে ছোট গল্প লিখে প্রথম কুন্তলীন পুরস্কার পান। দিল্লী-সিমলায় কর্মজীবন। অবসর নিয়ে প্রবাসী, কথাসাহিত্য ইত্যাদিতে লিখতেন। মধ্যযুগের ভক্ত কবিদের বিষয়ে পড়াশুনো করেছিলেন। প্রধান প্রকাশিত পুস্তক—কবীর বাণী, দাদুবাণী। সন্দেশে সেকালের দিল্লী-সিমলার জীবনযাত্রা বিষয়ে তিনটি অতি সরস রচনা বেরিয়েছিল।

অজিত দত্ত (১৯০৭ ঢাকা—কলকাতা) ইংরিজি সাহিত্যের ছাত্র। তখন থেকেই কাব্য রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ কুসুমের মাস, পাতালকন্যা, নষ্ট চাঁদ, ছড়ার বই, আলপনা, ইত্যাদি।

অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো) (১৯০২, কলকাতা) যুগান্তরের

www.BanglaBook.org

ছোটদের পাতভাড়ির পরিচালক, সব-পেয়েছির আসরের প্রতিষ্ঠাতা। প্রবন্ধকার, নাট্যকার, কবিতা ও গল্প লেখক। উল্লেখযোগ্য বই—গল্প সঞ্চয়ন, সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে, স্বপনবুড়োর শৈশব, স্বপনবুড়োর শিশুনাট্য ইত্যাদি।

শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৫ মালদহ—১৯৮০ কলকাতা) রাজদ্রোহমূলক কাজের জন্য জেলে গেছিলেন। বহু চিন্তাশীল প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছেন। পরে ছোট বড়দের সরস গল্প-উপন্যাস লিখে প্রবাদ-বাক্যের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছেন। পরিস্থিতি রচনা আর কথার খেলার জন্য বিখ্যাত। উল্লেখযোগ্য বই—বাড়ি থেকে পালিয়ে, মন্টুর মাস্টার, হাতির সঙ্গে হাতাহাতি, বাজার করার হাজার ঠেলা, যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্ধন, দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ইত্যাদি।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪—১৯৬৬) ভারতী গোষ্ঠীর লেখক। বড়দের ও ছোটদের গল্প লিখতেন। ছোটদের জন্য উল্লেখযোগ্য বই—মা কালীর খাঁড়া, চালিয়াৎ চন্দর, ভারতের রূপকথা, অবাক পৃথিবী, ভুতুড়ে, ছোটদের প্রিয় গল্প, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ইত্যাদি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪ কাশী) কল্লোল গোষ্ঠীর একজন। অসাধারণ কবি ও গল্প লেখক। বহু বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বহু পুরস্কারপ্রাপ্ত। আজকাল ছোটদের জন্যেই লেখেন। এদেশে দুঃসাহসিক অভিযানের কথা ও বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের পথিকৃৎদের অন্যতম। রহস্যময় ও সরস রচনা। উল্লেখযোগ্য ছোটদের বই—ঘনাদার গল্পের নানা সংগ্রহ, কুহকের দেশে, ড্র্যাগনের নিশ্বাস, পিঁপড়েপুরাণ, ময়ূরপঙ্খী ইত্যাদি।

অরুণনাথ চক্রবর্তী (১৮৮৩, দার্জিলিঙ—১৯৭২ কলকাতা) উপেন্দ্রকিশোরের জামাতা। ইংরিজি সাহিত্যের কৃতি ছাত্র। সরস সুপণ্ডিত। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। বনে জঙ্গলে পাহাড়ে বহু অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কোনো প্রকাশিত বই নেই।

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য (১৯০৯ বরিশাল) বিশিষ্ট অধ্যাপক, প্রকাশক, বহু বছর ধরে রামধনু পত্রিকার সম্পাদক। শিশুসাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। সন্দেশের লেখক। উল্লেখযোগ্য বই—বিজ্ঞানবুড়ো, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, আকাশের গল্প, জন্মদিনের উপহার ইত্যাদি।

প্রবাসজীবন চৌধুরী (১৯১৬ শ্রীরামপুর—১৯৬১ কলকাতা) দার্শনিক, বিজ্ঞানী, বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন। দেশ-বিদেশে সমাদৃত। পদার্থ-বিদ্যা, দর্শন ও ইংরিজির অধ্যাপক। কবি ও গল্প-লেখক। উল্লেখযোগ্য বই—ঈশ্বর সন্ধানে, সৌন্দর্য দর্শন, বহু জ্ঞানগর্ভ ইংরিজি বই ইত্যাদি।

লীলা মজুমদার (১৯০৮, কলকাতা) উপেন্দ্রকিশোরের ভাইঝি। সন্দেশের একজন সম্পাদক। বড়দের ও ছোটদের অনেক গল্প, উপন্যাস, জীবনী, নাটিকা, রম্যরচনা লিখেছেন। সহজ ভাষায় সরস ভাবে লেখা তাঁর বিশেষত্ব। উল্লেখযোগ্য ছোটদের বই—দিনদুপুরে, পদিপিসির বর্মী বাক্স, হলদে পাখির পালক, টংলিং, গুপির গুপ্ত খাতা, বাতাস-বাড়ি, ভুতোর ডাইরি, হাতি হাতি ইত্যাদি।

জসীমউদ্দীন (১৯০৩—১৯৭৬ ফরিদপুর) পল্লীজীবনের মধুর ছবি এঁকেছেন কবিতায়। উল্লেখযোগ্য বই—নক্শী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, বালুচর ইত্যাদি। স্মরণের সরণী বাহি একটি স্মৃতি-কথার বই।

সৈয়দ মুজতবা আলি (১৯০৪—১৯৭৪ শ্রীহট্ট) সুপণ্ডিত, সরস সাহিত্যিক। ছোট গল্পে ও রম্যরচনায় সিদ্ধহস্ত। ভাষাবিৎ, অধ্যাপক। উল্লেখযোগ্য বই—দেশে-বিদেশে, পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠি, চাচা-কাহিনী, অবিশ্বাস্য, ধূপছায়া, শবনম, চতুরঙ্গ ইত্যাদি ছোট বড় সকলের উপভোগ্য।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯, কৃষ্ণনগর) পরিচয়ের ও সন্দেশের প্রাক্তন সম্পাদক। প্রতিভাবান কবি ও ভাষাবিৎ। উল্লেখযোগ্য বই— কথার কথা, পদাতিক, যত দূরেই যাই, কাল মধুমাস, ছেলে গেছে বনে, একটু পা চালিয়ে ভাই ইত্যাদি।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪ কলকাতা) কবি ও সাংবাদিক। আনন্দমেলার সম্পাদক। উল্লেখযোগ্য বই—কলকাতার যীশু, নীল নির্জন, উলঙ্গ রাজা ইত্যাদি।

অমিয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী (জন্ম ১৯২২, বাড়িশা) কবিতা, গল্প, সমালোচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখেন। প্রকাশিত বই—চৈত্ররথ (কবিতা)।

হাসিরাশি দেবী (১৯১১, ২৪ পরগণা) গল্প, উপন্যাস, কবিতা নাটিকা, প্রবন্ধ—সবই লেখেন। অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য বই—রাজকুমার জাগো, বকবাবাজি ও কাঁকড়ামাসি, কুশদহের ইতিহাস, আচার্য অভেদানন্দ, কালী ইত্যাদি।

মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু (১৯৪১, ২৪ পরগণা) গল্প প্রবন্ধ নাটক কবিতা সবই লেখেন। নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দুটি কাগজ সম্পাদনাও করেছেন—সময় ও শ্রুতি, ছড়াছড়ি। প্রকাশিত কবিতার বই—আলোর মধ্যে অগ্নিকণা।

করুণাময় বসু (১৯০৭, টাকী) আগে বড়দের জন্য লিখতেন, পরে শিশুসাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হন। কবিতা ছাড়া আর কিছু লিখতে ভালোবাসেন না। সন্দেশে ও অন্যান্য পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত হয়। কোনো বই বেরোয়নি।

বেণু গঙ্গোপাধ্যায় (আদিত্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়) জন্ম ১৯১২ বাঁকুড়া। প্রধানতঃ কবি। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ভ্রমণকাহিনীও লিখতেন। অধ্যাপনা করতেন। প্রধান প্রকাশিত রচনা—ভারতের বীর সন্তান (কবিতা), তি-তি পায়রা (ছড়া), ছিদামপুরের ছাত্রাবাস (নাটিকা), মহাজীবন কাহিনী (প্রবন্ধ), স্বাধীনতার দুর্গপ্রহরী (ভ্রমণ), দুর্গে-দুর্গে (ভ্রমণ)।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮ দিনাজপুর—১৯৭০ কলকাতা) সমালোচক, সাংবাদিক, অধ্যাপক, বিশিষ্ট লেখক, ছোটদের ও বড়দের জন্য। অসাধারণ রসবোধ। উল্লেখযোগ্য ছোটদের বই—টেনিদার গল্পগুলি, ঝাউবাংলার রহস্য, তপন-চরিত, চার মূর্তি, ঘণ্টাদার কাবলকোর্ক, কম্বল নিরুদ্দেশ ইত্যাদি।

সুবিমল রায় (১৯১৭—১৯৭৭ কলকাতা) উপেন্দ্রকিশোরের ছোট ছেলে। সুরসিক খামখেয়ালী। অধ্যাপক, সাধক। উল্লেখযোগ্য গল্প-সংগ্রহ—'প্রেতসিদ্ধের কাহিনী ও অন্যান্য রচনা।'

ননীগোপাল মজুমদার (১৯১২, ঢাকা) নামকরা শিশু-চিকিৎসক। বিশিষ্ট স্বাস্থ্য পত্রিকার সম্পাদক। অল্প বয়স থেকে দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প ইত্যাদি লিখেছেন। পরে প্রবন্ধ ও নাটকও লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য বই—রত্ননেশা, ট্যাঁসুরাম, বাহাদুর, তাই নাকি, ইত্যাদি।

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৪, চুঁচুড়া, হুগলী) বিশিষ্ট শিল্পী, দেশকর্মী, সরস কবি। রাজনৈতিক আন্দোলনে জেলে গেছেন। উল্লেখযোগ্য বই—অচিরা, গুসন্ধানে, তিন্তিড়ী, ব্রতী ইত্যাদি।

রণজিৎ রায় (১৯০৬ যশোহর) বিশিষ্ট আই-সি-এস্।

www.BanglaBook.org

যেমন পড়াশুনো করেছেন, তেমনি বন্য জন্তু শিকারে নাম করেছেন। এই সব অভিজ্ঞতা তাঁর কলম থেকে অপূর্ব সত্য গল্প হয়ে রূপ নিয়েছে। উল্লেখযোগ্য বই—শিকার-কাহিনী।

নলিনী দাশ (১৯১৬ কলকাতা) উপেন্দ্রকিশোরের দৌহিত্রী ও সন্দেশের আরেকজন সম্পাদক। চারজন কিশোরী গোয়েন্দার অসমসাহসিক কীর্তিকলাপ নিয়ে অধিকাংশ গল্প উপন্যাস। অতিশয় জনপ্রিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন। বেথুন কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা। উল্লেখযোগ্য বই—রা-কা-যে-টে-না-পা, মধ্যরাতের ঘোড়শোয়ার, অঞ্জনগড়ের রহস্য, হাসা ও রহস্যের গল্প, গোয়েন্দা গণ্ডালু ইত্যাদি।

মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৮ কলকাতা) বিশেষভাবে নানান সামাজিক সমস্যার গল্প লেখেন। নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী। অধ্যাপনা করেন। সন্দেশের নিয়মিত লেখিকা। অতি সরস ও সতেজ। ছোটদের জন্য অপূর্ব সব গল্প রচনা করেছেন। ডাকাতের গল্পে অদ্বিতীয়া। দুঃখীর প্রতি গভীর মমতা। ছোটদের জন্য কয়েকটি অসাধারণ বই—ঝাঁসির রানী, সোনা নয় রূপো নয়, বিপন্ন আয়না ইত্যাদি।

সুনির্মল বসু (১৯০২ গিরিডি—১৯৫৭ কলকাতা) বিশিষ্ট শিশু-সাহিত্যিক। 'কিশোর এশিয়া'র পরিচালক। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটিকা, প্রবন্ধ সবই লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য বই—ছানাবড়া, বেড়ে মজা, হৈ চৈ, হুলুস্থুল, আনন্দনাড়ু, ছন্দের টুংটাং, কিপ্টে ঠাকুরদা ইত্যাদি।

সৌরেন্দ্রকুমার পাল (১৯২২, পাটনা) বন্যপ্রাণী ও শিকার বিষয়েই প্রধানতঃ চর্চা করেন। জীবজন্তুর অপ্রত্যাশিত বিচিত্র ব্যবহার অনুশীলন করেন এবং প্রধানতঃ এই সব বিষয়েই লেখেন। কিছু প্রবন্ধ গল্প কবিতাও রচনা করেছেন। সন্দেশ মৌচাক ইত্যাদিতে লিখে থাকেন। এখনো কোনো বই বেরোয়নি।

আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯ কলকাতা) বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। বহু পুরস্কার প্রাপক। ছোটদের জন্যও অনেক ভালো গল্প উপন্যাস লিখেছেন, যেমন—রাজকুমারের পোষাকে, গজ উকিলের হত্যারহস্য ইত্যাদি।

আদিনাথ নাগ (১৯৩৩ বর্ধমান) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত। ছড়া কবিতা গল্প ও চিকিৎসা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। সন্দেশে, আনন্দমেলায়, পক্ষিরাজ ইত্যাদিতে লেখেন। উল্লেখযোগ্য ছড়ার বই—হুটপটাং, হিজলগলের দেশ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪ ফরিদপুর) আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। কবি, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্প লেখক। ছোটদের উল্লেখযোগ্য বই—ভয়ংকর সুন্দর, পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক। বড়দের জন্যেও গল্প উপন্যাস কবিতা লিখে খ্যাতি পেয়েছেন।

গৌরী ধর্মপাল (১৯৩১ কলকাতা) সন্দেশের নিয়মিত লেখিকা। অসাধারণ রূপ-কথা লেখেন। কবিও বটে। উপরন্তু সার্থক অধ্যাপিকা। উল্লেখযোগ্য বই—মালশ্রীর পঞ্চতন্ত্র। কাদম্বরী। ঘোড়া যায়। বেদ ও শ্রীঅরবিন্দ ইত্যাদি। দুটি ছোটদের বই যন্ত্রস্থ—চোন্দ পিদিম। চাঁদনি।

পরিমল গোস্বামী ( ) সাংবাদিক, সরস গল্প লেখক, ফোটগ্রাফি ইত্যাদি বিষয়ে উত্তম প্রবন্ধ লিখেছেন। পত্র-রসিক। উল্লেখযোগ্য বড়দের বই—ডিটেক্‌টিভ শিবনাথ, স্মৃতিচিত্রণ, আমি যাঁদের দেখেছি, ম্যাজিক লণ্ঠন, সপ্তপন্থ, পথে পথে, বনপথের পাঁচালী। ছোটদের জন্যে—আষাঢ়ে দেশে, মেরুপথের যাত্রীদল, স্কুলের মেয়েরা, রোল-নম্বর ২০৫ ইত্যাদি। দক্ষ ফটোগ্রাফার ছিলেন। সে বিষয়ে বই লিখেছেন ক্যামেরার ছবি ইত্যাদি।

সত্যজিৎ রায় (১৯২১ কলকাতা) সুকুমার রায়ের একমাত্র সন্তান। প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ। বিশ্ববিখ্যাত ফিল্ম-পরিচালক। গোয়েন্দা গল্প ও ফ্যানটাসি লিখে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। সন্দেশের নতুন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদকদের অন্যতম। প্রধান প্রকাশিত বই, প্রফেসর শঙ্কুর নানান গল্প সংগ্রহ, বাদশাহী আংটি, এক ডজন গপ্পো, আরো এক ডজন, একেই বলে শুটিং ইত্যাদি।

রবীন্দ্রলাল রায় (১৯০৫—১৯৭৮ কলকাতা) কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভাইপো। শিক্ষক, সরকারি কর্মী, দক্ষ অভিনেতা, অদ্বিতীয় ক্যারিকেচারিস্ট, অতি সুরসিক। ছোটদের জন্য ছোট গল্প লেখায় সুনিপুণ। উল্লেখযোগ্য বই—নতুন কিছু বলি তো হাসব না ইত্যাদি।

শিবশঙ্কর মিত্র (১৯০৯, খুলনা) বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক। স্বাধীনতা সংগ্রামী হয়ে ১২ বছর কারাবাস করেছেন। দশ বছর ধরে সুন্দরবনের অভিজ্ঞতার ফলে বন-বিজ্ঞানী হয়ে উঠেছেন। উল্লেখযোগ্য বই—সুন্দরবনের আর্জান সর্দার, সুন্দর বন, বন-বিবি, রয়্যাল-বেঙ্গলের আত্মকথা, লেনিন ইত্যাদি।

সুলতা সেনগুপ্ত (১৯১০ কলকাতা) বহু গল্প কবিতা রচনা করেছেন। সন্দেশের নিয়মিত লেখিকা। উল্লেখযোগ্য বই—সোনালী দিন।

বিমল দত্ত

চুণী দাশ (১৯৩৯) ছোটদের পত্রিকা 'কাকলি'র পরিচালক। গল্প লেখক ও কবি। উল্লেখযোগ্য বই—'টুকির জন্য ছড়া'।

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৩২, কলকাতা) এক কালে শরীর-চর্চায় নাম করেছিলেন। প্রধানতঃ কবিতা ও ছড়া লেখেন। উল্লেখযোগ্য ছোটদের বই—'চটপটি'।

সুধীন্দ্র সরকার (১৯৪৮, খুলনা) সন্দেশে, আনন্দমেলায় ও নানা পত্রিকায় গল্প ছড়া কবিতা লেখেন। অভিনয়ে ও আবৃত্তিতে দক্ষ। প্রথম প্রকাশিত বই—টাক-ডুমাডুম।

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার (১৯৪৩ হাওড়া) সন্দেশের নিয়মিত লেখক। কবি ও ছড়াকার। অসাধারণ রসবোধ। উল্লেখযোগ্য বই—মজার ছড়া।

রেবন্ত গোস্বামী (১৯৩৪, নদীয়া) কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসের কর্মচারী। নানা পত্রিকায় গল্প উপন্যাস লেখেন। উল্লেখযোগ্য বই—কচি পাতার রঙ, অরুমিতুদের কথা ইত্যাদি।

শামসুল হক (১৯৩৬, ২৪ পরগনা) কবিতা গল্প উপন্যাস রচয়িতা। অনুবাদক। উল্লেখযোগ্য বই—চন্দন বিল, দিশী ছড়া, সমাধিভূমি ইত্যাদি।

[illegible] দে (১৯৩৫, সালিখা) কবি ও শিল্পী। উল্লেখযোগ্য বই—ইস্টিশানের মিষ্টি গান, আঁকন-বাঁকন, ভয় তাড়ুয়া।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫, ময়মনসিংহ) বাবার শৈশব। সাংবাদিক, লেখক, রস-রচয়িতা। আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। ছোটদের উল্লেখযোগ্য বই—মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি, হেতমপুরের গুপ্তধন ইত্যাদি।

নবনীতা দেব সেন (১৯৩৮, কলকাতা) সম্ভাবনাময়ী লেখিকা। স্মৃতিচিত্র, ভ্রমণ কাহিনী, গল্প, কবিতা, সবেতেই দক্ষ। কবি নরেন দেব আর রাধারানী দেবী এঁর মা-বাবা। যাদবপুর বিশ্ব-

www.BanglaBook.org

বিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন। প্রধান বই—স্বাগত দেবদূত, আমি অনুপম। ছোটদের—মাসিয়ে হুলোর হলিডে।

সজীব চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৬, বরাহনগর) গল্প উপন্যাস কবিতা প্রবন্ধ নাটক—সবই লেখেন। সংগীত ও চিত্রকলায় দক্ষ। উল্লেখযোগ্য ছোটদের বই—দুই মামা, নবেন্দুর দলবল, রুকুসুকু, অ্যাকোয়েরিয়ম ইত্যাদি।

অশোক মুখোপাধ্যায় (১৯২৫, কলকাতা) ইংরিজির অধ্যাপক। ভারি সুরসিক। উল্লেখযোগ্য বই—লেখো তুমি পদ্য নাকি?

জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩, কলকাতা) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তদন্ত ও গোয়েন্দা কর্মের গল্প লেখেন। তাছাড়া কবিতা, নাটিকা। উল্লেখযোগ্য বই—সত্যি গোয়েন্দা, পুলিসের ডাইরি থেকে, কঙ্গোর জঙ্গলে ইত্যাদি।

প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত (১৯০৪, সিলেট) জীবনালেখ্য, প্রবন্ধ, রূপকথা, গল্প লেখেন। গীতবিতানের প্রতিষ্ঠাতা। সংগীতরসিক। উল্লেখযোগ্য বই—রবিচ্ছবি।

অজেয় রায় (১৯৩৭, শান্তিনিকেতন) বেশ কিছু চিত্তাকর্ষক দুঃসাহসিক অভিযানের ও সত্যিকার বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প উপন্যাস লিখেছেন। বাংলার পল্লীর ও মফস্বলের জীবনের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়। খেলাধুলো, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ে চর্চা করেছেন। ভালো অভিনেতা। সুরসিক। উল্লেখযোগ্য বই—মুংগু, কেল্লা পাহাড়ের গুপ্তধন, আমাজনের গহনে, ফেরোমন ইত্যাদি।

শিশিরকুমার মজুমদার (১৯২৩, কলকাতা) প্রতিভাসম্পন্ন আদর্শবাদী লেখক। নদী বিষয়ে অভিজ্ঞ। দুঃসাহসিক অভিযানের অনেক গল্প লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য বই—আকাশে আগুন পাতালে আগুন, তুফান দরিয়ার পরাণ মাঝি, সিন্ধুতলের সন্ধানী, পাতালপুরী অভিযান ইত্যাদি।

প্রদীপকুমার রায় (১৯২৮, রংপুর) নানা পত্র-পত্রিকায় ছড়া নাটক কবিতা লিমেরিক লেখেন। উল্লেখযোগ্য বই—ছড়া ও নাটিকার সংকলন, চতুরঙ্গ।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৯২, রাণাঘাট) ১৯১০-এ শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা শুরু। ১৯১৮ থেকে গ্রন্থাগারের ভার নেন। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে বহুকাল কাটিয়েছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তথ্য সংগ্রহ করে, অভাবনীয় যত্ন সহকারে রবীন্দ্র-জীবনী চার খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। যত দিন যাবে এর মূল্য তত বাড়বে। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা সম্বন্ধে বই লিখেছেন। দেশ-বিদেশ থেকে বহু পুরস্কার পেয়েছেন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই—ভারত পরিচয়, ভারতে জাতীয় আন্দোলন, নব-জ্ঞান-ভারতী, শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী, পৃথিবীর ইতিহাস, ফিরে ফিরে চাই ইত্যাদি।

তমাল চট্টোপাধ্যায়—

প্রণব মুখোপাধ্যায় (১৯৫১, শিবপুর) অধ্যাপক, গল্পলেখক, আসলে কবি। অতি সুরসিক, সূক্ষ্ম কল্পনাপ্রবণ মন। উল্লেখযোগ্য বই—(কবিতা সংকলন) জল-মাটি-হল্লা। সন্দেশের জনপ্রিয় লেখক ও বন্ধু।

বাণী রায় (১৯১৯, পাবনা) প্রতিভাসম্পন্ন কবি, গল্পকার ও সমালোচক। বেশির ভাগ লেখা বড়দের জন্য। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—জুপিটার, সপ্তসাগর, হাসিকান্নার দিন ইত্যাদি। সেকালের নামকরা লেখিকা গিরিবালা দেবীর কন্যা। ছোটদের জন্যে সন্দেশে অনেক সরস গল্প কবিতা লিখেছেন।

সন্দীপ রায় (১৯৫৩, কলকাতা) সত্যজিৎ রায়ের একমাত্র সন্তান। দক্ষ চিত্রশিল্পী, লেখক। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পড়াশুনো থেকে লেখেন। বাপের সহকারী হয়ে কাজ করে, এখন নিজে সত্যজিতের 'ফটিকচাঁদ' গল্পের ফিল্ম পরিচালনা করছেন।

অমিতানন্দ দাশ (১৯৪৭, কলকাতা) নলিনী দাশের একমাত্র সন্তান। বিজ্ঞানের কৃতি ছাত্র। বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ও ফ্যান্টাসি লেখেন। সন্দেশ প্রকাশ করার কাজে অমূল্য সাহায্যকারী। ফ্যানটাস্টিক, বিস্ময়, আশ্চর্য ইত্যাদি কাগজের সঙ্গে জড়িত।

বিশ্বপ্রিয় (বিশ্বনাথ সান্যাল) জন্ম ১৯৩৭, বরানগর। কবিতা, ছড়া বিশেষ করে, তাছাড়া গল্প, উপন্যাস, নাটিকা লেখেন। এক সময় গান লিখতেন। নানা কাগজে লিখতেন ও লেখেন। প্রকাশিত বই—আমার বই।

হিতেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৯০৫, মৈমনসিংহ) উপেন্দ্রকিশোরের ভাইপো। হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট। অভিনয়ে উৎসাহী। নাটক রচনা করেন। নিজের নাটক-গোষ্ঠী আছে। সরস রচনা দিয়েছেন সন্দেশে। কোনো বই বেরোয়নি।

অজয় হোম (১৯১৩, কলকাতা) প্রধানতঃ পাখি ও জীবজন্তু বিষয়ে প্রবন্ধ ও ক্রিকেটের আলোচনা লেখেন। ফ্যান্টাসিতেও হাত দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য বই—বাংলার পাখি, মরণ-ঘুম, (ফ্যান্টাসি) ইত্যাদি। প্রধান সম্পাদক 'প্রকৃতিজ্ঞান'।

শৈল চক্রবর্তী (১৯০৯, হাওড়া) প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী ও উঁচুদরের শিশুসাহিত্যিক। ছবিতে, ছড়ায়, গল্পে প্রবন্ধে দক্ষ। ভারতজোড়া খ্যাতি। উল্লেখযোগ্য বই—মানুষ এল কোথা থেকে, ছোটদের ক্রাফ্‌ট, কালো পাখি, গল্প-কথার দেশে, স্বর্গের সন্ধানে মানুষ, কার্টুন, সবুজ আয়না, চিত্রে বুদ্ধ-জীবনকথা ইত্যাদি।

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ( ) প্রতিভাসম্পন্ন গল্পলেখিকা। এঁর স্বামী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। উল্লেখযোগ্য বই—ববির বন্ধু, হনুমানুষ ইত্যাদি।

সুকুমার দে সরকার (১৯১০ কলকাতা) জীবজন্তুর জীবনযাত্রা বিষয়ে চমৎকার গল্প লিখতেন। অন্যান্য বিষয়েও সিদ্ধহস্ত। উল্লেখযোগ্য বই—ময়ূরকণ্ঠী বন, হিমের দেশে, অরণ্যরহস্য, বাঘ মারার গল্প, ভাল্লুকদাদার গল্প, হানাবাড়ি, রাত্রি যখন নামে, বনের গল্প।

বারীন বসু (১৯৪৯-১৯৭৯, কলকাতা) কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীত শিক্ষক, নাট্যকার, নাট্য-পরিচালক। ছবিও আঁকতেন। উল্লেখযোগ্য বই—অনেকখানি, বেদি, আলোর রং, ইলাডিং-বিলাডিং, বাবু-সোনার হিজিবিজি, সাহেবী ছড়া ইত্যাদি।

অশোকানন্দ দাশ (১৯০১) সন্দেশের অক্লান্তকর্মী প্রকাশক, নিউ স্ক্রিপ্টের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। আবহাওয়াবিৎ। সন্দেশ সম্পাদক নলিনী দাশ এঁর স্ত্রী। প্রবন্ধকার। কোনো প্রকাশিত বই নেই।

বাণী চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৪, কলকাতা) ছড়া, প্রবন্ধ, গল্প লেখেন। অনুবাদ করেন। স্বামী শান্তিময়ের সঙ্গে 'পরমাণু জিজ্ঞাসা' প্রণয়নের জন্য পুরস্কৃত। উল্লেখযোগ্য বই—সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মানুষ যেদিন হাসবে না, পৃথিবী ও মহাকাশ, মেঘনাদ সাহা ইত্যাদি।

শিবানী রায়চৌধুরী (হ্যাম্পসন) [১৯৪৩, মুর্শিদাবাদ]।

www.BanglaBook.org

সন্দেশে আগে ছোটদের সুন্দর গল্প লিখেছেন। এখন বিলেত-বাসিনী। শিক্ষা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষা বিষয়ে বই প্রকাশিত হয়েছে। একটি গল্পের বই-ও হচ্ছে। এ-সবই ইংরিজিতে।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪২, টাকী) যুগান্তর পত্রিকার সাংবাদিক। খেলাধুলা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, এ বিষয়ে ৩০টির বেশি বই বেরিয়েছে। উপন্যাস লিখেছেন। অনুবাদ করেছেন। সন্দেশেও বহু রচনা বেরিয়েছে। আগে ক্রিকেট খেলতেন। খেলতে গিয়ে জখম হয়ে খেলা ছাড়তে হয়।

ভবানীপ্রসাদ দে (১৯৫০ ——) সন্দেশের নিয়মিত লেখক। চমৎকার ছোট গল্প প্রবন্ধ লেখেন। শিশুসাহিত্য পরিষদের সম্পাদক। অন্যান্য পত্রিকাতেও লেখেন। কোনো বই বেরোয়নি।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৭-১৯৭৬ কলকাতা) এক সময় ছোটদের মাসিকপত্র রংমশালের মালিক ও সম্পাদক ছিলেন। সরস কল্পনাময় লেখা। উল্লেখযোগ্য ছোটদের বই—ছাতুবাবুর ছাতা, ঘনশ্যামের ঘোড়া, ময়াবী সিঁড়ি, ছায়ামূর্তি ইত্যাদি।

সুফি (নরেন রায়) জন্মকাল জানা নেই। চল্লিশের উপরে বয়স। শিল্পী, বিশেষ করে কার্টুন আঁকেন। জন্মস্থান—কুমিল্লা। স্কুল ও কলেজে পড়া শিবপুরে। কার্টুন আঁকাই পেশা। আঁকা শুরু ১৯৫০/৫১। শুকতারা পত্রিকার নির্দেশনার সঙ্গে যুক্ত। যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী, শংকর্স উইক্‌লি, ক্যারাভ্যান, কিছু উর্দু ও হিন্দী পত্রিকায় ও নানা রকম বিজ্ঞাপনের কাজে কার্টুন আঁকেন। গল্পের ছবি ও বইয়ের প্রচ্ছদপটও আঁকেন। ছোটদের ও বড়দের জন্য লিখেছেন।

সুরুচি সেনগুপ্ত

তুষারকান্তি বসু (১৯৩৩, জলপাইগুড়ি জেলা) বনজঙ্গলের পরিবেশে মানুষ। শিকারের শখ। নাটক প্রবন্ধ ছোট গল্প কবিতা লেখেন। বড় ছোট সকলের জন্যেই লেখেন। নানা কাগজে প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য বই—যেখানে দেখিবে ছাই, মৃত্যুর জন্ম ইত্যাদি।

শ্যামলী বসু (১৯৩৭, কলকাতা) গল্প, উপন্যাস, কবিতা লেখেন। জীবনীকার বলে পরিচিত। উল্লেখযোগ্য বই—নিবেদিতা, বিবেকানন্দ, মধুসূদন, শিকারী ও শিকার ইত্যাদি।

রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী (১৯২৮, বিষ্ণুপুর) প্রকাশিত বই নেই কিন্তু নানা পত্র-পত্রিকায় ছোটদের ও বড়দের জন্য কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প নিয়মিত লেখেন।

দে-না-বি, বিশ্বনাথ দে (১৯২৮, পাবনা) নানান পত্রিকায় কবিতা, রম্যরচনা, প্রবন্ধ লেখেন।

নজিল সেন (১৯২৬, কলকাতা) ছাত্রাবস্থায় বক্সিং আর ওয়েট্‌-লিফ্‌টিং চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। গল্প উপন্যাস কবিতা নাটক লেখেন। লোমহর্ষণ লেখা ভালোবাসেন। উল্লেখযোগ্য বই—ডাকাবুকো, রাতের আতঙ্ক, নীল পাখির পালক, চিতার থাবা, রাজস্থান রহস্য।

অমল চক্রবর্তী (১৯৩৭, কলকাতা) চিত্রশিল্পী। রাজনৈতিক কার্টুনে সিদ্ধহস্ত। আগে অন্যান্য পত্রিকায়, এখন অমৃতবাজার যুগান্তরের সঙ্গে যুক্ত। ২০ বছর ধরে সন্দেশে কার্টুন আঁকেন। বিদেশেও খ্যাতি পেয়েছেন।

উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (১৯৩৯, কলকাতা) অধ্যাপক। সম্পাদক। উল্লেখযোগ্য বই—বিচিত্র বাঘ-শিকার, বোতল-ভূতের রহস্য, তাল-বাতাসী ইত্যাদি।

আর এস্ ফজরুল ইস্‌লাম

বুদ্ধদেব গুহ (১৯৩৬, কলকাতা) অতি জনপ্রিয় লেখক। শিকারে ও ভ্রমণে আগ্রহী। এখন বন্দুক ছেড়ে ক্যামেরা ধরেছেন। বন-তথ্যে দক্ষ। পশুপাখি ও বনবাসীদের সঙ্গে গভীর সহানুভূতি। আদর্শবাদী ও হৃদয়বান লেখক। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই—জঙ্গলমহল, ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে, গুগুনোগুম্বারের দেশে, টাঁড়বাধোয়া, বনবিবির বনে ইত্যাদি।

শুভ্রবন্তী পাল (১৯৫৯, খড়দহ) অধ্যাপিকা। নানা পত্রিকায় ছোটদের ও বড়দের জন্য লেখেন। কোনো বই এখনো প্রকাশিত হয়নি।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৯৫ ফরিদপুর—১৯৮১ কলকাতা) প্রতিভাবান সহৃদয় প্রকৃতিবিজ্ঞানী। জগদীশ বসুর আহ্বানে ১৯২১ থেকে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত। অসংখ্য বিষয়ে গবেষণা করেছেন। শিক্ষার্থীদের জন্য 'করে দেখ' অমূল্য সম্পদ। জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার অলিখিত সম্পাদক। বহু উচ্চ সম্মানে ভূষিত। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই—আধুনিক আবিষ্কার, বাংলার মাকড়সা, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, বাংলার কীট-পতঙ্গ, মনে পড়ে, বাংলার পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি। তাছাড়া অগুন্তি ইংরিজি প্রবন্ধ।

জয়িতা (বন্দ্যোপাধ্যায়) মিত্র (১৯৫২, ভদ্রেশ্বর) বিশ্বভারতীর কৃতী ছাত্রী। কলকাতায় বাংলা সাহিত্যের শিক্ষয়িত্রী। সন্দেশে এবং অন্য পত্রিকায় অল্প বয়স থেকে কবিতা, গল্প লিখছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা করেন। এখনো কোনো বই বেরোয়নি।

সুধীরকুমার চৌধুরী (১৮৯৭ কলকাতা) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সীতা দেবীর স্বামী। প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ ইত্যাদির সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন। বড়দের জন্য উপন্যাস, গল্প, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবাসী কার্যালয় থেকে এবং নানা কাগজে বেরিয়েছে। অতিশয় সুরসিক লেখক। ছোটদের জন্যেও মাঝে মাঝে লিখে থাকেন।

কার্তিক ঘোষ (১৯৪৬, প্রতাপনগর) ছোটদের ছড়া, কবিতা, গল্প উপন্যাস লেখেন। ছাত্রাবস্থা থেকে আঁকা, অভিনয় ভালোবাসেন। শিশুসাহিত্যের একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য বই—টুম্পুর জন্যে, হিজিবিজির দেশে, পাতার বাঁশি, চল চিড়িয়াখানা, টুকুনের টাট্টু, বাঘের বন্ধু ইত্যাদি।

অসিতবরণ হাজরা (১৯৩৩, কলকাতা) প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও কর্মময় জীবন কাটাচ্ছেন। ছোটদের জন্য কবিতা, ছড়া, গল্প লেখেন। শিক্ষা বিষয়ে অনুরাগী এবং অনুশীলনও করেছেন। সন্দেশে ও অন্য কাগজে আর 'শিক্ষক' পত্রিকায় লেখেন।

বিনোদ বেরা (১৯৩৭, কাঁথি) ১৪ বছর বয়সে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শেখেন। রাঙ্গাবেলিয়ায় চাষবাস নিয়ে থাকেন। কবিতা ও গল্প লেখেন। প্রধান কবিতার বই—মীরা ও মৌমাছি, অশোক কুঞ্জ ইত্যাদি। গল্পের বই—স্বপ্নসম্ভব।

রণজিৎ গোস্বামী (১৯১৬, ঢাকা) প্রাক্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লেখেন। আকাশবাণীর সঙ্গে যুক্ত। উল্লেখযোগ্য ছোটদের বই—সুড়সুড়ি, মাশুল, সোনা সোনা রোদ, রঙ্গীন খেলনা ইত্যাদি।

আশানন্দন চট্টরাজ (১৯৩৪, বীরভূম) কিছু গল্প আর অজস্র নাটক, কবিতা, ছড়া, গান লিখেছেন। রেডিওতে, রেকর্ডে, বাউলদের কণ্ঠে অনেক গান শোনা যায়। নানান পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়। প্রধান প্রকাশিত বই—ঝুমঝুমি, বীরভূম বাউল,

www.BanglaBook.org

রাঙ্গামাটির গান ইত্যাদি।

বঙ্কীপদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৪০, হাওড়া) নাটক ছাড়া সব-ই লেখেন। ভ্রমণ ভালোবাসেন। সে বিষয়েও লেখেন। বড়দের জন্যে অনেক বই লিখেছেন। ছোটদের জন্য লেখা কয়েক খণ্ড পাণ্ডব-খোয়েন্দা বলে অ্যাডভেঞ্চারের গল্প বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

রাম চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩, গুড়াপ) গল্প কবিতা লেখেন, শিক্ষকতা করেন। কোনো বই বেরোয়নি। 'দ্রৌপদী দাদুর স্বাদশী' বলে সরস গল্পের বই শীঘ্রই বেরোচ্ছে।

পৃথ্বীরাজ রায় (১৯৪১, ঢাকা) ইংরিজিতে নানা প্রবন্ধ ছাড়া, বাংলায় ছোটদের জন্য কবিতা ও লিমারিক লেখেন। পেশা হল সাংবাদিকতা। এখনো কোনো বই বেরোয়নি।

বীণা দেবী (ইন্দুপ্রভা সেনগুপ্ত) জন্ম ১৯০৬, খুলনা। জাত কবি। রংমশাল, শিশুসাথী, মাসপয়লা থেকে সন্দেশ, আনন্দ-মেলায় বহু কবিতা দিয়েছেন। প্রকাশিত বই—পুষ্পাঞ্জলি।

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩, বরিশাল) ছড়া কবিতা নাটিকা গল্প সবই লেখেন। পৌর বিভাগের কর্মচারী। উল্লেখযোগ্য বই—মজার মজার ছড়া, অং-বং-চং, ডুডুম-ডুম, লাগ ভেল্কি লাগ, বকম-বকম ইত্যাদি।

সর্বাণী দাশগুপ্ত (১৯৫১, কলকাতা) সন্দেশের প্রিয় কবি। প্রতিবন্ধী হয়েও জীবনে সাফল্য এসেছে। প্রতিভাসম্পন্ন গায়িকা, মার্গসঙ্গীতে সঙ্গীতভূষণ উপাধি পেয়েছেন। কাব্য রচনার জন্য শিশুসাহিত্য সংসদ পুরস্কার পেয়েছেন।

যাদুকর এ সি সরকার (১৯৩০, টাঙ্গাইল) দেশে বিদেশে খ্যাত যাদুকর। নানা দেশে ভ্রমণ করেছেন। বিজ্ঞান বিষয়ে অনুশীলন করেছেন ও যাদুর খেলায় বিজ্ঞানের সাহায্য নেন। হিন্দী ও অন্যান্য ভাষা জানেন। উল্লেখযোগ্য বই—আনন্দ চুমকী, আধুনিক ম্যাজিক, ম্যাজিক ও ভোজবাজি, ম্যাজিক দেখানো ছড়া, দেশ বেড়ানি ছড়া, গল্পে ভরা যাদুর মায়া ইত্যাদি।

ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৪, কলকাতা—১৯৮০ বর্ধমান) কবি প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ'র স্বামী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী। বোলপুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। সন্দেশে ও অন্যান্য পত্রিকায় আশ্চর্য সরস গল্প লিখতেন।

রুশু চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৪৮, কলকাতা) ইংরিজিতে এম-এ। নানা পত্রিকায় ইংরিজিতে ও বাংলায় গল্প লেখেন। মূল রুশ থেকে চেকভ অনুবাদ করছেন। পিয়ানো বাজান। কবি কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা।

কানাই পাকড়াশী

তারাপদ রায় (১৯৩৬, টাঙ্গাইল) অর্থনীতিবিদ। সরকারী কর্মচারী। উল্লেখযোগ্য ছোটদের বই—ডোডো তাতাই, আবার ডোডো তাতাই ইত্যাদি।

ধীরেন্দ্রলাল ধর (১৯১৩, কলকাতা) শিশুসাহিত্যের অক্লান্ত সেবক। লেখক, সম্পাদক। ঐতিহাসিক গল্প ও নাটিকা এ'র বিশেষত্ব। উল্লেখযোগ্য বই—গল্প হলেও সত্যি, যুদ্ধের গল্প, অসি বাজে ঝন্‌ঝন্‌, মন্দিরে মন্দিরে, প্রিয়দর্শী অশোক ইত্যাদি।

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ (১৯০৫, নাইরোবি, পূর্ব আফ্রিকা) পূর্ব আফ্রিকায় শৈশব ও কৈশোর কেটেছিল। বলিষ্ঠতা, সরসতা, উদারতা, কাল্পনিকতা এ'র বিশেষত্ব। নামকরা ভূতত্ত্ববিৎ। পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ভ্রমণ করেছেন ও সে বিষয়ে নানা পত্রিকায় লিখেছেন। সন্দেশের নিয়মিত লেখক। দক্ষ ফটোগ্রাফার ও কবি। ভারতের বন ও খনি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। প্রবন্ধ ও সমালোচনা, ভ্রমণকাহিনী, গল্প লেখেন। প্রথম বই—জঙ্গলে-জঙ্গলে।

পূর্ণেন্দু পত্রী (১৯৩১, বাগনান) চিত্রপরিচালক, শিল্পী, কবি, প্রবন্ধকার, গল্পলেখক। স্থানীয় ইতিহাস এ'র বিশেষত্ব। উল্লেখযোগ্য বই—কলকাতার রাজকাহিনী, কি করে কলকাতা হল, ছড়ায় মোড়া কলকাতা, দাঁড়ের ময়না, কাজের কথা, মানুষের মতো মানুষ ইত্যাদি।

সুনন্দা দাশগুপ্তা (১৯২৯, রাঁচি) প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা লেখেন। অনুবাদ করেন। অনেকদিন শিশুসাথী সম্পাদন করেছেন। ছবি আঁকা ও গানে দক্ষ। নানা কাগজে লেখেন।

আশা দেবী (১৯২৫, কাশী) লেখিকা, গবেষক, শিক্ষাবিৎ। জনপ্রিয় লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ'র স্বামী ছিলেন। ইনিও ভারি সরস লেখিকা। উল্লেখযোগ্য বই—শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ, ঘুমতি নদীর ঢেউ, হাসির গল্প, কুট্টিপিসি এন্ড কোং, লাল তারা নীল তারা, রঙীন বেলুন ইত্যাদি।

শৈবাল চক্রবর্তী (১৯৩৯, কলকাতা) সরস গল্প লিখে ইনি নাম করেছেন। সন্দেশের নিয়মিত লেখক। শিল্পী শৈল চক্রবর্তীর ছেলে। উল্লেখযোগ্য বই—ছড়ার বই, হাসির গল্প ইত্যাদি।

রঞ্জিৎবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক (১৯০৯, কলকাতা) ছোটদের জন্য সরস কবিতা, নাটিকা, কবির লড়াই রচনা করে খ্যাতি পেয়েছেন। নিজে দক্ষ ভাবে ঐ সব মঞ্চস্থ করেন। উল্লেখযোগ্য বই—রবিবারের দেশে, ছোটদের অ-আ-ক-খ, কবির লড়াই, হাসির কবিতা।

সুজয় সোম (১৯৫৯, কলকাতা) ছোটবেলা থেকে অভিনয় ইত্যাদির শখ। খেলাধুলা, ঐতিহাসিক ঘটনা ইত্যাদি নিয়ে পত্রিকায় লেখেন। ফিল্ম তৈরি বিষয়ে উৎসাহী। ছোটদের নতুন পত্রিকা 'সবজান্তা ও মজারু'র সহ-সম্পাদক।

সুবীর চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৫, নবদ্বীপ) গল্প কবিতা নাটক সব-ই লিখেছেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। সন্দেশের জনপ্রিয় সরস লেখক। কোনো বই বেরোয়নি।

ধূর্জটিপ্রসাদ দত্ত (১৯৫০ বাঁকুড়া—১৯৮১ কলকাতা) অতিশয় গুণী কবি ও গল্পলেখক। চমৎকার গাইতেন ও ছবি আঁকতেন। পাখি সম্বন্ধে উৎসুক ছিলেন। অকালে শোচনীয় ভাবে মৃত্যুবরণ করেন। একটি কাব্য সংকলন প্রকাশিত হবে।

নির্মলেন্দু গৌতম—গল্প কবিতা নাটক লেখেন। ছোটদের মাসিক-পত্র তেপান্তরের সম্পাদক। উল্লেখযোগ্য বই—সিন্দুকের চাবি, রস থেকে রসগোল্লা ইত্যাদি।

জীবন সর্দার—গত ২০ বছর ধরে সন্দেশের প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তরের ও পাঠশালার পরিচালক। জন্ম ১৯৩৫, মুন্সিগঞ্জ। ছোটদের জন্য উদ্ভিদ, প্রাণী ও প্রকৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ও উপন্যাসও লিখছেন। প্রকাশিত বই—প্রকৃতি বিষয়ক পাঠ্য পুস্তক, পাখি সব ইত্যাদি।

গণেশ বিশ্বাস (জন্ম ১৯১৭, টাঙ্গাইল) নানা রসের গল্প, প্রবন্ধ লেখেন। প্রধানতঃ জীবন-ভিত্তিক। তাছাড়া বিজ্ঞান বিষয়েও লিখে থাকেন। পেশা অধ্যাপনা। এখনো কোনো ছোটদের বই বেরোয়নি।

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৪৮, কলকাতা) সাধারণতঃ নানান পত্রিকায় ছোটদের জন্য গল্প, ছড়া, কবিতা ইত্যাদি

www.BanglaBook.org

লেখেন। এখনো বই বেরোয়নি।

সুনির্মল চক্রবর্তী (জন্ম ১৯৫৩, ঢাকা) ছড়া ইত্যাদি লেখেন। পেশা হিসাব-রক্ষক। প্রকাশিত বই—খাতায় পাতায় (ছোটদের উপভোগ্য ছড়া।)

জগদানন্দ গোস্বামী (জন্ম ১৯০৯, জন্ডাল) উপন্যাস ছাড়া সবরকম লেখেন। পেশা শিক্ষকতা। প্রকাশিত বই—পাঠান সূর্য (ঐতিহাসিক নাটক) আর 'বাউল সঙ্গীত'।

॥ শেষ ॥

['লেখকের পরিচয়' অংশে কোন কোন লেখকের জন্মসাল/জন্মস্থান এবং কিছু সংখ্যক লেখকের কোন পরিচিতিই যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও সংগ্রহ করা সম্ভবপর হ'য়ে ওঠেনি]

॥ ১৯৯ পৃষ্ঠার শব্দছকের উত্তর ॥

১ক	র	২তা	৩ল		৪স	৫ম	রে	৬দ	৭না
লে		৮জ	ব	৯র	দ	ন্ত		১০র	গ
১১জ	১২খ	ম		১৩দ	র		১৪স	বা	র
	১৫ব	হ	র		১৬দা	মো	দ	র	
১৭স	র	ল		১৮শ	লা		ল		১৯কো
২০দা	দা		২১হি		২২ন	২৩বা	ব	২৪জা	দা
২৫গ	র	২৬হা	জি	২৭র		২৮ট	ল	ম	ল
র		২৯না	বি	ক		না		বা	
		৩০বা	জি	মা	৩১ত		৩২ব	টি	৩৩কা
৩৪পা	প	ড়ি		৩৫রি	হা	র্সে	ল		লা

॥ ২৪১ পৃষ্ঠার হেঁয়ালির উত্তর ॥

জনগণমন অধিনায়ক জয় হে
ভারত ভাগ্যবিধাতা

সংকেত : এক অক্ষর বাদ দিয়ে প্রথম অক্ষর, দুই অক্ষর বাদ দিয়ে দ্বিতীয় অক্ষর, তিন অক্ষর বাদ দিয়ে তৃতীয় অক্ষর ইত্যাদি।

যেমন—

রাজভবন পেরিয়ে গরিং দক্ষিণ দিকে চলল। মর্তের শহর যেন ভীড়ে ফেটে পড়ছে। অলিম্পা গ্রহের প্রতিনিধি...

১৩৭১

'ব'-এর বাড়াবাড়ির উত্তর

বট, বৃক্ষ, বানর, বাঁশ, বাবুইয়ের বাসা, বক, বন, বাঁক, বাছুর, বেড়া, বাগান, বাঁধাকপি, বেঁজি, বালক, বালিকা, বাচ্চা, বেলুন, বই, বিস্কুট, বাঁশি, বন্দুক, বেতার, বাক্স, বিনুনি, বুদ্‌বুদ, বালা, বদন, ব্যাট, বরাম, বাটি, বাস্কেট, বল, বৃন্ত, বেত, বুটজুতো, ব্যাগ, বরফ, বালাপোষ, বাবু, ব্লাউজ, বেড়াল, বেয়ারা, বাংলো, বাউল, বেঞ্চি, বারস, বিমান, বাতি, বাল্‌ব, বারান্দা, বারি, বোতাম, বেল্ট, বুড়োআঙুল, বালিশ, বাঙ, বাবরি, বুটি, বাইসাইকেল, বাঘছাল, বাছু, বকলস, বাঁধন, ব্রহ্মতালু।

১৩৭১

www.BanglaBook.org

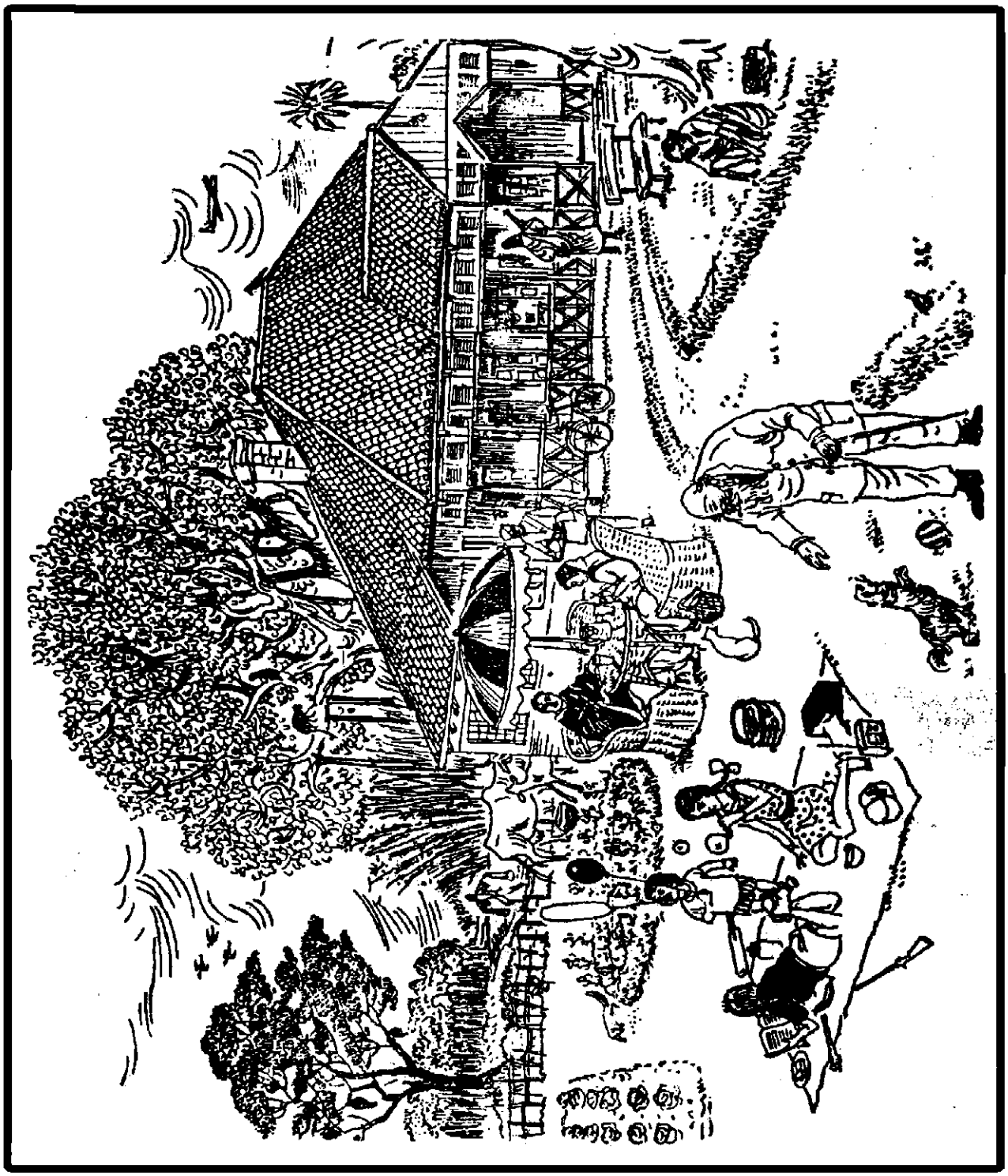

'ব'-এর বাড়াবাড়ি

উপরের ছবিতে যে 'ব'-কারের সিঁড়ি দুই ধাপ নীচে দিলে ঘাড়ে যায় বলে বলে দেখি।
শেষ পুরোনো একটা ট্রেনিংয়ে দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে বেশি ভাগ ছেলেরা পার হয়েছে ও কর্মী হয়েছে

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG